অনীশ দেব

কল্পবিজ্ঞান সমগ্র



কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

☢ *Disclaimer* ☢

অনীশ দেব

কল্পবিজ্ঞান সমগ্র



কেন এই নতুন রূপ?

মস্তবড় বইটি নতুন চেহারায় প্রকাশের সময়ে কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। নইলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, আপনাদের প্রিয় লেখক অনীশ দেব পত্রভারতী থেকে তৈরি করেছিলেন দুটি বই—২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে ‘কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র’ এবং ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ‘সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র’। দ্বিতীয় বইটা প্রাপ্তমনস্ক পাঠকের জন্য। মাঝে বইদুটি অনীশদার জীবিতকালেও দীর্ঘদিন আউট অফ প্রিন্ট ছিল, খোঁজ করেও আপনারা পাননি।

কিছুদিন আগে আলোচনাক্রমে ঠিক হল, বইদুটি একত্রে প্রকাশিত হবে ‘কল্পবিজ্ঞান সমগ্র’ নামে। কারণ—প্রথমত, আজকের পাঠক এইধরনের সংকলনে অনেক লেখা একসঙ্গে পেতে চান। দ্বিতীয়ত, কিশোরদের লেখা শুধু কিশোররা নন, সববয়সের পাঠকরাই ভালোবাসেন। আর অনীশদার লেখা কল্পবিজ্ঞান যে উচ্চতা ও মানের, তাতে তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যাওয়া কিশোর-কিশোরীরাই এর প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করতে পারবে, খুদেরা নয়। আর কে না জানে, এই একুশ শতকের তৃতীয় দশকে সতেরো-আঠারো বর্ষীয় কিশোর-তরুণ পাঠকরা সকলেই প্রাপ্তমনস্ক।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পুরোনো দুটি বইয়ের অনীশ দেব লিখিত ভূমিকা অপরিবর্তিত রাখা হল।

প্রকাশক

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

শুরুর আগে

ছোটদের জন্য লেখা কল্পবিজ্ঞান গল্পগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে দু-মলাটে বন্দি করা যায় কি না এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই ‘সমগ্র’-র কথা মাথায় আসে। শেষপর্যন্ত ‘সমগ্র’ যেটা তৈরি হল তাতে খুঁজে না পাওয়া চার-পাঁচটি গল্প বাদ থেকে গেল। তবুও আটাশটা গল্প নিয়ে ‘কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র’ খারাপ কী! এই বই তুলে দিলাম প্রীতিভাজনেষু তাপস মুখোপাধ্যায় ও অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়ের হাতে।

এই বইয়ের প্রযোজনায় আড়ালে থেকে যাঁরা আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন অনিতা রায়, বরুণ রায় ও মানস চক্রবর্তী। ওঁদের কাছে ঋণ থেকে গেল। স্নেহভাজন সুদীপ্ত মণ্ডল সুন্দর ছবি এঁকে বইটিকে অলঙ্কৃত করেছে। ওকে ধন্যবাদ জানাই।

এবারে বলি আশ্চর্য এক দম্পতির কথাঃ ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও চুমকি চট্টোপাধ্যায়। ওঁদের সাহিত্যবোধ এবং সাহিত্যপ্রীতি অবাক করে দেওয়ার মতো—একইসঙ্গে সাহিত্যিক প্রীতিও। ওঁদের সহযোগিতা না পেলে এই বই কখনও দিনের আলো দেখত না—শুধু চাঁদের আলো নিয়েই থাকত।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই তোমাকে—যে এই বইটা হাতে নিয়ে ভাবছ এর আটাশটা গল্প পড়বে কি না। পড়ো আর না-ই পড়ো, গল্পগুলো কিন্তু তোমার জন্যই লিখেছি। এই বই তোমারই জন্য, আর বইয়ের এত যে সাজগোজের ঘটা, সেও শুধু তোমার জন্য।

সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

যে-বইটা আপনি হাতে নিয়েছেন সেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় বই। তার কারণ, আড়াই দশকের লেখালেখি থেকে ছাব্বিশটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প এবং একটি উপন্যাস আমি বহু যত্নে বাছাই করে একগুচ্ছ রঙিন ফুলের মতো আপনার ব্যক্তিগত ফুলদানিতে সাজিয়ে দিতে পেরেছি। এই লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল নানান পত্রপত্রিকায়। তার মধ্যে ‘দেশ’ পত্রিকা যেমন আছে, তেমনই আছে ‘আজকাল’, ‘সানন্দা’, ‘বর্তমান’, ‘সাপ্তাহিক বর্তমান’, ‘যুগান্তর’ কিংবা ‘নবকল্লোল’-এর মতো পত্রিকাও। এই গল্পগুলো বই হয়ে বেরোল এই প্রথম। আর উপন্যাসটি ১৯৯৬ সালে একবার অকিঞ্চিৎকরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় কল্পবিজ্ঞান কিংবা সায়েন্স ফিকশন এখনও পর্যন্ত কিছুটা ব্রাত্য। কিন্তু আমরা, যারা কিছুতেই কল্পবিজ্ঞান গল্প লেখার ‘চুলকুনি’ বন্ধ করতে পারি না, মনের অন্দরের অন্দরমহলের আকাঙ্ক্ষা থেকে এই ধরনের গল্প-উপন্যাস ক্রমাগত লিখে চলেছি। আর আপনি—মানে, আপনার মতন আগ্রহী পাঠক—সেসব গল্প পড়েন, অথবা পড়বেন, এই ভরসাতেই আমাদের কলমে ক্লান্তি আসেনি।

হলফ করে বলতে পারি, এই সংকলনের লেখাগুলো আমাকে বরাবরই ‘পাঠক’ হিসেবে নাড়া দিয়েছে। এগুলোর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা বোধহয় তৈরি হয়েছে সেই কারণেই। সেই ভালোবাসার শরিক হওয়ার জন্যে আপনাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। আসুন, আমরা একসঙ্গে হাত ধরে বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে আরও একটু জায়গা তৈরি করে দিই।

অনীশ দেব

সূচিপত্র

সর্বজনপাঠ্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনি

উপন্যাস



সবুজ পাথর

ছোটকা একমনে জিনিসটা পরিষ্কার করছিল। মুখ তুলে হেসে বলল, 'এটার নাম হল ব্লাস্টার গান—যা দিয়ে ব্লাস্ট করা যায়। সহজ কথায় হাওয়া-বন্দুক। এ-জিনিস কাউকে তাক করে ফায়ার করলে সে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে!'

দশ-এগারো বছর বয়েসের দুই পালোয়ান চোখ গোল-গোল করে মুখ হাঁ করে ছোটকার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিল, তার কথাও শুনছিল। দেখতে দুজনকে হুবহু একরকম, এমনকী গায়ের লাল জামা আর নীল প্যান্টজোড়া পর্যন্ত ছবির মতো মিলে যায়।

এই মুহূর্তে যে-খোকাটি কোমরে দু-হাত রেখে ছোটকার কার্যকলাপের দিকে বাজপাখির মতো নজর মেলে তাকিয়ে আছে তার নাম চন্দ্রকান্ত। আর তার ঠিক পাশেই প্লাস্টিকের হালফ্যাশনের চেয়ারে আধ-বসা অবস্থায় যে-শ্রীমান পাথরের মূর্তির মতো নট-নড়নচড়ন, তার নাম ইন্দ্রকান্ত।

ওদের নাম দুটো সুন্দর হলে কী হবে, ছোটকা ওদের 'ঝালা-পালা' বলে ডাকে। প্রথমে ওরা বুঝতে পারেনি ছোটকা ওদের ওরকম একটা অদ্ভুত নাম রেখে বসে আছে। অল্প-অল্প করে বয়েসে বড় হয়ে উঠতেই ওরা ব্যাপারটা টের পেল। তখন সোজা গিয়ে হাজির ছোটকার দরবারে। সুবিচার চাই-ই চাই! মাথা নীচু করে মুখ গোমড়া করে দু-ভাই একযোগে অনুযোগ তুলল, 'ছোটকা, তুমি আমাদের ঝালা-পালা বলে ডাকো কেন? ওটা বাজে নাম।'

অভিমানে দু-জোড়া চোখ যেন জলে ভরে আসতে চায়।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ছোটকা সাততাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যমজ জুটির কাছে। মাথায় হাত রেখে বলল, 'জানিস, ছোট্টবেলায় তোরা দুজনে মিলে কান্নাকাটি চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বাড়িসুদ্ধ সবার কান ঝালাপালা করে দিতিস! সেসময় আমার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল, তোদের চিৎকারে পড়াশোনা একেবারে ডকে। রেগে গিয়ে চটাস করে বইপত্তর বন্ধ করে তোদের মাকে বলেছিলুম, 'বৌদি, আজ থেকে এ দুটোর নাম রাখলুম ঝালা-পালা। দাদা আদর করে যতই চন্দ্র-ইন্দ্র-বরুণ

ইত্যাদি দেবদেবীর নাম রাখুক, আসলে ঝালা-পালাই এদের লাগসই নাম!' ছোটকা এবারে একগাল হাসল, 'ব্যস, সেই থেকে তোদের নাম দুটো জমে গেল, বুঝলি! চন্দ্রকান্ত হল ঝালা, আর ইন্দ্রকান্ত হল পালা।'

ছোটকাকে ওরা দুজনেই খুব ভালোবাসে। যখন-তখন ওদের বেড়াতে নিয়ে যায়, খেলার জিনিস কিনে দেয়, খাবার খাওয়ায় হরেকরকম। সুতরাং কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে দু-ভাই-ই রাজি হল ছোটকার কথায়। শুধু একটা শর্ত ছিল, 'কিন্তু ছোটকা, তুমি ছাড়া ওই খারাপ নাম ধরে বাড়ির আর কেউ আমাদের ডাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

সুতরাং ওই শর্তেই রফা হয়েছিল ওদের।

ঝালা-পালার ছোটকা চাকরি করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। চাকরির নানা গল্প সে শোনায় চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে, শোনায় হাজাররকম তদন্তের কাহিনি। সুতরাং ছোটকাকে কাছে পেলেই ওদের প্রথম আবদার গল্প শোনানোর। আজ সেইরকম একটা আশা নিয়েই ছোটকার ঘরে এসেছিল ওরা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখে ছোটকা এক টুকরো ফ্লানেল নিয়ে কী একটা অস্ত্র একমনে পরিষ্কার করছে।

জিনিসটা দেখতে অদ্ভুত। অনেকটা রিভলভারের মতো, কিন্তু চেহারায় বেশ বদখত। প্রথমেই মোটা একটা সিসের নল—ইঞ্চি চারেক লম্বা। তবে তার মধ্যের ফুটোটা খুব সরু। তারপর লাগানো একটা সিসের বাক্স—তার গায়ে দুটো বোতাম। একটার রং লাল, অন্যটার কালো। বাক্সের শেষে রয়েছে চ্যাপটা ধাতুর বাঁট। তার সঙ্গে আংটা দিয়ে একটা খাটো চেন লাগানো।

যন্ত্রটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছোটকা বলল, 'প্রফেসর শঙ্কুর গল্প পড়েছিস তো? তাতে অ্যানাইহিলিন—মানে, নিশ্চিহ্নাস্ত্র নামে একটা যন্ত্রের কথা বলা আছে। এ হল সেই জিনিস। যাকে টিপ করে ফায়ার করব সে একেবারে পারমাণবিক ধুলো হয়ে যাবে। এই লাল বোতামটা টিপলে প্রচণ্ড শক্তির রেডিয়ো অ্যাকটিভ রশ্মি বেরিয়ে আসে। আর কালো বোতামটা টিপে দিলেই সব ঠান্ডা। এই অস্ত্রটা আমাকে অফিস থেকে নতুন দিয়েছে, বুঝলি! তদন্তের কাজে দিন-দিন যা বিপদ বাড়ছে!'

ব্লাস্টার সাফাইয়ের কাজ শেষ করে ছোটকা সেটা একটা বাক্সে বন্দি করে রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু চন্দ্রকান্ত হঠাৎ বলে উঠল, 'ছোটকা, তুমি সত্যি কথা আমাদের খুলে বললে না কিন্তু। অফিস থেকে তোমাকে যখন ব্লাস্টার দিয়েছে, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে নতুন কোনও তদন্তের ব্যাপার আছে, তাই না?'

ছোটকার মুখে বাহবা দেওয়ার হাসি ফুটে উঠল। ব্লাস্টারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। বলল, 'ঝালা-পালা, তোরা ঠিক ধরেছিস। একটা নতুন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে আমাকে। খুব বিপজ্জনক কাজ। কাউকে বলা বারণ। আর যদি তোদের বলি তা হলে উলটে

তোদের বিপদ বাড়বে। তবে খুব সংক্ষেপে ঝাপসাভাবে একটু আভাস দিতে পারি, তার বেশি একদম নয়। কী, শুনতে রাজি?'

ঝালা-পালা তো এককথায় রাজি!

'তবে শোন...' বলতে শুরু করল ছোটকা। তার ভুরু কুঁচকে গেল সামান্য। হাতের আঙুলগুলো আলতো করে বোলাতে লাগল ব্লাস্টারের সিসের বাক্সে। চন্দ্র ও ইন্দ্র টেবিলের আরও কাছে এসে দাঁড়াল।

'কাজটা আর কিছুই নয় রে, ভারতের বড়সড়ো বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটু খোঁজ-খবর।' ছোটকা ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। বিকেলের নীল আকাশে কালির ফুটকির মতো দুটো চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আবার, 'গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেশ গোলমাল হচ্ছে। যেমন আগে যারা জলদি-জলদি আবিষ্কার-টাবিষ্কার করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিত, এখন তারা সবাই কেমন যেন থিতিয়ে পড়েছে। এমনিতে কি গবেষণায় মানুষের ভাটা পড়ে না, তা পড়ে। কিন্তু এ যেন একেবারে ওলটপালট ব্যাপার! জ্ঞানীগুণী মানুষগুলো যেন রাতারাতি বোকা বনে গেছে। তাই রাষ্ট্রপতির নির্দেশে আমাদের গোপন তদন্ত বিভাগ এ-বিষয়ে তদন্তের ভার নিয়েছে। তারপর ঘুরে-ফিরে তারই কিছুটা দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে।'

ঝালা-পালা কিছু বলে ওঠার আগেই একটা চিৎকারে তিনজনের পিলে চমকে ওঠার জোগাড়।

'আমার ঘাড়ে—আমার ঘাড়ে ব্যা...ঘাড়ে ব্যা...ব্যা...।'

তীক্ষ্ণ ধাতব কণ্ঠস্বর কানে যেন পিন ফোটাচ্ছে। কাচের গেলাসে চামচ ঠুকলে যেরকম আওয়াজ হয় এটা যেন অনেকটা সেইরকম।

চিৎকার যে করছে সে তখনও ঘরে এসে ঢোকেনি। তবে এদিকপানেই ছুটে যে আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ছোটকা আস্তে-আস্তে বলল, 'আমার কথা শুনে ভ্যাঙাচ্ছে নাকি রে! তা শেষে আবার ব্যা-ব্যা করে ছাগলের ডাকটা জুড়ে দিয়েছে কেন?'

চন্দ্র ও ইন্দ্র এ-ওর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুক এ-ঘরে, মজা দেখাচ্ছি!'

ঠিক তক্ষুনি চিৎকারের মালিক ঘরে এসে ঢুকল। না, ছাগল নয়। তবে 'ব্যা ব্যা' চিৎকারটা সে এখনও করে চলেছে। তাকে দেখেই ঝালা-পালা একসঙ্গে ধমকে উঠল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু!'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাধ্য ছেলের মতো।

ছোটকা হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'ঝামেলাকে নিয়ে দেখছি ঝামেলার শেষ নেই।'

ঝামেলা নামধারী প্রাণীটি—উঁহু, বস্তুটি—একটি রোবট। না, রোবট ঠিক নয়, বরং বাচ্চা রোবট বললেই বেশি মানানসই হয়। কিন্তু যেহেতু সে রোবট, সেহেতু ঝালা-পালার আদেশে স্ট্যাচু না হয়ে তার উপায় ছিল না।

ঝামেলার উচ্চতা মাত্র তিন ফুট। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড ধাতুর তৈরি বলে সবসময় রুপোর মতো ঝকঝক করছে। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। কিন্তু আঙুলগুলো পর্যন্ত নিখুঁত করে তৈরি—ঠিক যেন একটা পুতুল। পুতুলের মতোই সবসময় ও জামা-প্যান্ট পরে থাকে। খুব জোরে ছুটতে না পারলেও হাঁটতে পারে হেলেদুলে। আর কথা বলতে পারে নিজের ইচ্ছেমতো—কিন্তু গলার স্বরটা রিনরিনে, মেয়েলি।

পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই বাচ্চা রোবটটা ছোটকাই তৈরি করে উপহার দিয়েছে ঝালা-পালাকে। দেওয়ার সময় বলেছিল, ‘দিনরাত্তির তোরা কান ঝালাপালা করিস, এবারে মেতে থাক ঝামেলাকে নিয়ে।’

ইলেকট্রনিক্স বিদ্যায় ছোটকার জুড়ি নেই। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই নাকি নানান অটোমেটিক জিনিস বানাত। চন্দ্র-ইন্দ্র সে-কথা শুনেছে বাবার কাছে। আর ঝামেলাকে তৈরি করতে গিয়ে কম কেরামতি দেখায়নি ছোটকা। বাচ্চা রোবটটার চোখ দুটো যেন টেনিসবল সাইজের কাচের গুলি—ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। আসলে ও-দুটো পুঞ্জাক্ষি, যেমনটা মাছির থাকে। অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি চোখ। তা ছাড়া, ঝামেলার চোখ দুটো এমন যে, একমাইল দূর পর্যন্ত ও স্পষ্ট দেখতে পায়। ঠিক টেলিস্কোপের মতো।

ঝামেলার কান দুটোও বিচিত্র। মানে, কানের জায়গায় রয়েছে দুটো ফুটো। কিন্তু তার ভেতরে নাকি এমন সব কলকবজা আছে যে, কোনও শব্দেরই ওর কান এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। মানুষ শুনতে পায় না এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো শুধু পশুপাখিরা শুনতে পায়—যাকে বলে আলট্রাসনিক। ঝামেলার শ্রবণশক্তি থেকে কোনও শব্দেরই রেহাই নেই। তাই ছোটকা মাঝে-মাঝে বলে, ‘এরকম একটা জম্পেশ রোবট তোদের প্রেজেন্ট করলুম—এটা আমাকে তদন্ত করতে হেল্প করতে পারত। কী চোখের নজর, আর কী কান! কিন্তু ঝামেলার তো একটাই ঝামেলা! ও এখনও সভ্যসমাজে ঘুরে বেড়ানোর মতো ভদ্রতা রপ্ত করতে পারেনি। যখন-তখন যা-তা গোলমাল বাধায়। তা ছাড়া, এখন তো ওর ট্রেনিং চলছে তোদের কাছে। পোষা কুকুর-বেড়ালের মতো ওকেও ট্রেনিং দিয়ে মানুষ করতে হবে, বুঝলি!’

ছোটকা ঠিকই বলছে। কারণ ঝামেলা এখনও সব বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। হুটহাট করে আটকে যায়, নয়তো ভুলভাল বলে বসে। যেমন এখন ‘ব্যা ব্যা’ করে চিৎকার করছিল।

সেকথা ছোটকাকে বলতেই ছোটকা বলল, 'ওর তো ঘাড়ের ভেতর ব্যাটারি থাকে। সেই ব্যাটারিতে কোনও গোলমাল হয়নি তো?'

চন্দ্র-ইন্দ্র একমত হল যে, সে-কথা ঝামেলাকেই জিগ্যেস করে দেখা যেতে পারে। অতএব চন্দ্র বলে উঠল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি। এদিকে এসো। কী হয়েছে বলো তো।'

স্ট্যাচু হয়ে থাকলেও ঝামেলা সবকিছু শুনছিল এতক্ষণ। সুতরাং আদেশ পেতেই তাড়াহুড়ো করে কীসব বলতে গিয়ে কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করল, টলমল করে ঘুরপাক খেল। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে সরু গলায় বলল, 'ব্যাটারি নয়, ব্যথা, ও-ঘরে খাটের তলায় আরশোলা ধরতে গিয়ে ঘাড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছি।'

ছোটকা হো হো করে হেসে উঠল ঝামেলার কথা শুনে। বলল, 'ও তো দেখছি এখনও চলতি ভাষায় কথা বলতে শেখেনি। অ্যাদ্দিনেও গুরুচণ্ডালি দোষ কাটাতে পারলি না তোরা! কিন্তু ও আরশোলা ধরে কেন, বল তো? প্রায়ই দেখি খাটের তলায়, নর্দমার ধারে, আরশোলার খোঁজে ঘোরাঘুরি করে। ও কি আরশোলা খায় নাকি রে?'

ইন্দ্রকান্ত ব্যাজার মুখে বলল, 'ঝামেলাকে এ-কথা জিগ্যেস করেছিলাম, ছোটকা। তাতে বলেছে, লক্ষ-লক্ষ বছরেও আরশোলার কোনও বিবর্তন হয়নি। অথচ বানরেরা মানুষ হয়ে তা থেকে রোবট হয়ে গেল। সুতরাং ঝামেলার কর্তব্য আরশোলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওদের বিবর্তনে সাহায্য করা।'

ইন্দ্র থামতেই ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'বানর তো মানুষ হয়েছে বুঝলাম, কিন্তু মানুষ থেকে কবে আবার রোবট হল!'

ইন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'কী জানি, ঝামেলার দারুণ বিশ্বাস, মানুষ থেকেই বিবর্তন হয়ে রোবট তৈরি হয়েছে। তাই জন্যে আমাদের সবাইকে ও নিজের পূর্বপুরুষ ভাবে। দেখো না, কথায়-কথায় বলে, কোন আদ্যিকালে তোমরা পড়ে রয়েছ ভাবলে দুঃখ পাই!'

ছোটকা আবার ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

ঝামেলা ওর পুঞ্জাক্ষি দিয়ে ছোটকার ঘরের আনাচকানাচ সার্চ করছিল আরশোলার খোঁজে। ছোটকার হাসি কানে ধাক্কা মারতেই হেলেদুলে ওদের কাছে এল। তারপর বলল, 'কী হইল, অট্টহাস্যের কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি?'

এবারে ঝালা-পালাও যোগ দিল ছোটকার অট্টহাসিতে। আর ঝামেলা কিছু বুঝতে না পেরে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাগল। ওর কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ ছোট ছোট বাতিগুলো দপ্দপ্ করে জ্বলছে আর নিবছে।

ঝামেলা সামান্য খুশি বা উত্তেজিত হলেই আলোগুলো অমন করে জ্বলে-নেবে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলা যখন বাড়ির বাইরে বেরোল, বিকেল তখন ঢলে পড়তে চলেছে, পশ্চিমদিকের আকাশ আপেল আর কমলালেবুর রঙে মাখামাখি। তারই মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানান ঘরবাড়ি-জন্তুজানোয়ারের চেহারা নিয়ে সাদাটে মেঘের জমাট পাহাড়।

রোজ বিকেলে চন্দ্রকান্ত ও ইন্দ্রকান্ত খেলতে বেরোয় মাঠে। খেলা বলতে বল পেটাপেটি বা এলোমেলো ছুটোছুটি হুটোপাটি। ওদের বাড়ির সঙ্গে আছে লাগোয়া বাগান, তাতে রংবেরঙের ফুল আর পাতাবাহার। বাগান পেরোলেই পিচের রাস্তা। তারপর রাস্তা পেরোলেই মখমলের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠ। মাঠেই এখানকার ছেলেমেয়েরা খেলা করে, লোকজন সব বেড়াতে বেরোয়।

সবুজ মাঠের পাশ ঘেঁষেই শুরু হয়েছে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছের দঙ্গল। তেমন ঘন নয় যে জঙ্গল বলা যাবে, কিন্তু তা বলে খুব তুচ্ছ করার মতনও নয়। নানান পাখি আর শেয়াল নাকি আস্তানা গেড়েছে ওই গাছের জটলার ভেতরে।

চন্দ্রকান্ত, ইন্দ্রকান্ত আর ঝামেলা পিচের রাস্তা পেরিয়েই ছুট লাগাল মাঠে। ঝামেলা জোরে ছুটতে পারে না, তাই পড়ে রইল সবার পিছনে। তার ওপর বেচারার হাতে ঝালা-পালা ওদের খেলার ফুটবলটা ধরিয়ে দিয়েছে। তবু হেলেদুলে টলতে-টলতে ঝামেলা যথাসম্ভব জোরে দৌড়োতে চেষ্টা করছে।

বিকেলের আলোয় অন্যান্য ছেলের দল নানান খেলা খেলছে। ঝালা-পালা আর ঝামেলাও রোজকারমতো ওদের খেলা শুরু করল।

খেলা পুরোদমে চলছিল, এমনসময় হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাচ্চা-রোবট ঝামেলা। কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল, তারপর বলে উঠল, ‘শব—শব—শব্দ! নতুন ধাঁচের শব্দ। খোঁজ করা দরকার।’

ঝালা-পালাও খেলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিগ্যেস করল অবাক হয়ে, ‘কোনদিক থেকে আসছে শব্দটা?’

শব্দটা ঝালা-পালার কানে আসছে না। কিন্তু ঝামেলা যখন শুনতে পাচ্ছে তখন শব্দটা নির্ঘাত আলট্রাসনিক।

ঝামেলা মনোযোগ দিয়ে শব্দটা ঠাহর করার চেষ্টা করছিল। মিনিটখানেক পর কী যেন একটা বলতেও শুরু করল ও। কিন্তু ওর মিহি গলা ছাপিয়ে একটা ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা তিনজন—

‘হাসছি মোরা হাসছি দেখো, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিনজনেতে জটলা করে ফোকলা হাসির পাল্লা দি।’

চমকে ফিরে তাকাতেই খুব চেনা মজার মানুষটাকে দেখতে পেল ওরা। প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল। নেড়া মাথায় অল্পস্বল্প খোঁচা-খোঁচা চুল, বেড়ালের গোঁফের মতো খ্যাংরা গোঁফ, কালো জামা, কালো প্যান্ট, পায়ে মোজা এবং বুট-জুতো। ভদ্রলোক নামকরা উদ্ভিদবিজ্ঞানী—বটানিস্ট। ঝালা-পালাদের তিনটে বাড়ির পরেই থাকেন। ভীষণ খামখেয়ালি

আর ভাবুক। তবে সুকুমার রায়ের 'আবেল-তাবোল'-এর প্রত্যেকটি ছড়া তাঁর মুখস্থ। ঝালা-পালা মানিকজোড়কে দেখলেই 'আবোল-তাবোল'-এর কোনও না কোনও ছড়া শুনিয়ে দেন প্রফেসর নিধিরাম।

ঝালা-পালাকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখেই প্রফেসর কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলেন, 'বলো দেখি, কোন ছড়া?'

ঝালা-পালা একসঙ্গে বলে উঠল, 'আহ্লাদী!'

'কারেক্ট! এই নাও টফি!' বলে ঝালা ও পালাকে একটা করে টফি দিলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'আচ্ছা আমি এবার চলি। চটপট কিছু গাছপালা খুঁজে বের করতে হবে।'

প্রফেসর নিধিরাম এখন যে মাঠ পেরিয়ে গাছপালার রাজ্যে ঢুকবেন সেটা ঝালা-পালা বেশ ভালো করেই জানে। রোজই বিকেলে উনি ওই আধা-জঙ্গলে ঢোকেন গাছের ছাল-পাতা, শিকড়-বাকড় জোগাড়ের সন্ধানে। তারপর তা নিয়ে কীসব এক্সপেরিমেন্ট চালান।

আসলে কিন্তু প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের নাম অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। ওঁর এই ছদ্মনামটা ঝালা-পালাই দিয়েছে ওদের ছোটকার অনুকরণে। কারণ প্রফেসর সেনশর্মা সর্বদা 'আবোল-তাবোল' আউড়ে বেড়ান, গাছের ছাল থেকে নতুন ধরনের তেল আবিষ্কার করেছেন, তৈরি করেছেন অতি বিকট গন্ধ ও ঝাঁঝওয়ালা বড়ি—যে বড়ির গন্ধে শস্যখেত থেকে কীটপতঙ্গ পালাবে, মশা-মাছিও চম্পট দেবে ত্রিসীমানা থেকে। সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখা ঝালা-পালারও বলতে গেলে একেবারে মুখস্থ। তাই ওরা দুজনেই জানে সুকুমার রায়ের 'সত্যি' গল্পের প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের কথা। নিধিরাম পাটকেল আবিষ্কার করেছিলেন গন্ধবিকট তেল আর কামানের দুর্গন্ধবিকট গোলা। তা ছাড়া, অজয়েন্দ্রবাবুর চেহারাও যেন অবিকল সুকুমার রায়ের আঁকা নিধিরামের ছবির মতো।

ওদের এই নতুন নামকরণ শুনে ছোটকা বেশ মজা পেয়েছিল।

আর ঝামেলা তিড়িং-তিড়িং লাফিয়ে মিহি গলায় আনন্দ প্রকাশ করে বলে উঠেছে, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'

ফুজিয়ামা জাপানের এক নামকরা আগ্নেয়গিরি। তার সঙ্গে উত্তেজনা বা আনন্দের যে কী সম্পর্ক তা একমাত্র ঝামেলাই জানে! তবে বেশি উত্তেজিত হলে বা খুশি হলে ওই কথাটা ওর বলা চাই-ই চাই।

প্রফেসর নিধিরাম চলে যেতেই ঝামেলা আবার বলল, 'শব্দটা এখনও রয়েছে। ওটা জঙ্গলের দিক থেকে আসছে।' বলে গাছ-গাছালির দিকে আঙুল দেখিয়ে সেদিকে হেলেদুলে ছুটতে আরম্ভ করল ঝামেলা। অগত্যা চন্দ্র-ইন্দ্রও ওর পিছনে দৌড়োল।

আকাশ অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাঠের লোকজন, ছেলেমেয়ে যে-যার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। কিন্তু ওরা তিনজন ছোট-ছোট পা ফেলে ছুটে চলেছে। ঝালা-পালা দেখল, ওরা জঙ্গলের যে-অংশ লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছে, একটু আগেই সেখানে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়েছেন প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল।

ছোটকা বলছিল, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার থিতিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রফেসর নিধিরামের আজব আবিষ্কারে মোটেও ভাটা পড়েনি। জঙ্গলে ঢুকে এখন তিনি কী করছেন কে জানে!

'ওই যে, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি!' উত্তেজনায় চিঁহি-চিঁহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ঝামেলা, 'একটি সবুজাভ প্র—প্র—পাথর! উহা হইতে আলো নির্গত হইতেছে!' বোঝা গেল, 'প্রস্তর' উচ্চারণ করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত 'পাথর' বলল ও।

যে সবুজ পাথরের কথা ঝামেলা বলছে সেটা ও একাই দেখতে পাচ্ছে। ঝালা-পালার তো ওর মতো টেলিস্কোপিক চোখ নেই!

জঙ্গলে ঢুকতেই সবুজ ঘাস মাপে অনেক বড় এবং ঘন হয়ে গেছে। ঝোপঝাড়ও চোখে পড়ছে কিছু-কিছু। এ ছাড়া সব বিশাল-বিশাল দেবদারু, শাল, শিমুল একপায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মাঠে তবু বা কিছু আলো ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। চারপাশে তাকিয়ে ঝালা-পালার গা শিরশির করতে লাগল। বাতাসের ঝাপটা গাছের অলিগলি পেরিয়ে গায়ে এসে লাগছে।

ঝামেলা কিন্তু বেশ নিশ্চিত পা ফেলে হেঁটে চলেছে সবার আগে। কখনও পায়ে-চলা সরু পথ ধরে, কখনও বা পথের বাইরে ঘাসঝোপ ঠেলে। মাথার ওপর থেকে ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচির। ওরা সব ঝাঁক বেঁধে বাসায় ফিরছে।

আরও কিছুটা এগোতেই ইন্দ্র চন্দ্রকে বলল, 'ফিরে চল, আর ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝামেলার চিৎকারে ওরা চমকে উঠল। 'ওঃ, পাইয়াছি রে, পাইয়াছি!'

ওরা তিনজনেই এবারে স্পষ্ট দেখতে পেল সবুজ পাথরটা। সরু পথের ডান দিকে বেশ কিছুটা ভেতরে ঘন ঘাসঝোপের ফাঁকে চুপটি করে বসে রয়েছে টেনিস বলের সাইজের একটা উজ্জ্বল সবুজ পাথর। ঠিক যেন একটা পান্না। ঝামেলা এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ডানহাতে তুলে নিল পাথরটা। তারপর এসে দাঁড়াল বাকি দুজনের কাছে। জিনিসটা চন্দ্রকান্তের হাতে দিল।

পাথরটার গা বলের মতো মসৃণ নয়, কারুকাজ করে নিপুণ হাতে কাটা। তা ছাড়া যে-জিনিসটা সবচেয়ে অবাক করে দেয় তা হল, পাথরটার ঠিক কেন্দ্রে একটা টকটকে লাল আলো জ্বলছে। সেই আলো পাথরের ভেতরে তৈরি করেছে এক অপূর্ব লালচে আভা। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে আলোর আভা চমকে দেওয়ার মতো জ্বলজ্বল করছে।

চন্দ্র বলল, 'পাথরটা হাতে কেমন যেন গরম-গরম ঠেকছে!'

ইন্দ্র অবাক হয়ে গেল এ কথাটা শুনে। হঠাৎ ও ঝামেলার দিকে তাকাতেই দেখে, ও দু-কানের ফুটোয় হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্র জিগ্যেস করতেই ঝামেলা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'শব্দে আমার কান ফেটে যাচ্ছে। তোমাদের তো আর কিছু না!'

আলট্রাসনিকে ঝামেলার কষ্ট হচ্ছে দেখে চন্দ্রকান্ত পাথরটা চট করে ওর হাফপ্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে কান থেকে হাত নামাল।

এমনসময় একটা শেয়ালের ডাক শুনতে পেল ওরা। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে তিনজন বাড়ির দিকে ছুট। ছুটতে-ছুটতে চন্দ্র বলল, 'ছোটকার ব্লাস্টারটা সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। শেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতাম।'

ঝামেলা দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা শেয়ালকে ভয় পাও! আমি একটুও ভয় পাই না!'

'তা হলে থাকো না। পালাচ্ছ কেন?' ইন্দ্র মুখ না ফিরিয়েই বলে উঠল।

ঝামেলা জবাব দিল, 'শৃগাল বড় অসভ্য। গা চেটে দিতে পারে। তাই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া যাইতেছি।'

চন্দ্র-ইন্দ্র ফিরে তাকালে দেখতে পেত, ঝামেলার কপালে লাল-নীল বাতিগুলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে উত্তেজনায়। আর এও দেখতে পেত, দূরের একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি ওদের লক্ষ করছে।

সে-রাতেই ছোটকার ঘরে মিটিং বসল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম মাথায় উঠল ঝালা-পালার। মাকে আদর-আবদার করে রাজি করিয়ে দুই যমজ পালোয়ান সোজা হাজির ছোটকার ঘরে। সন্ধেবেলাতেই পড়াশোনার ফাঁকে রহস্যময় সবুজ পাথর খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটা ইন্দ্রকান্ত বলেছিল ছোটকাকে। এও বলেছিল, পাথরটা থেকে আলো বেরোচ্ছে এবং আলট্রাসনিক শব্দও পাওয়া যাচ্ছে অবিরাম।

অবাক চোখে বহুক্ষণ ধরে পাথরটা দেখে ছোটকা ভুরু কুঁচকে আস্তে-আস্তে বলল, 'ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে রে। এ-পাথরটা সাধারণ পাথর নয়। সন্দেহ একটা হচ্ছে, তবে পরীক্ষা না করে

কারেক্টলি বলতে পারছি না। এটা নিয়ে আমি এক্ষুনি অফিসে যাব। সেখানে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট-ফেস্ট করে রাতে ফিরব। তখন তোদের সঙ্গে ডিটেলস আলোচনা করব, কেমন?'

ঝালা-পালা দেখল, ছোটকা হঠাৎ কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে গিয়ে পাথরটা ভালো করে কাগজে মুড়ে নিল। তারপর অফিসে বেরোবার পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল ঝটপট। শেষে ব্লাস্টারটাকেও গুঁজে নিল জামার ভেতরে বগলের নীচে। তারপর বলল ঝালা-পালাকে, 'কোনও ভয় নেই। যা, পড়তে বস।' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পরক্ষণেই বাইরে থেকে মোটরবাইক স্টার্ট দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। রওনা হয়ে গেল ছোটকা।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ঝামেলা চুপটি করে এতক্ষণ সব দেখছিল এবং শুনছিল। ছোটকা রওনা হয়ে যেতেই সেতার-বাজানো সুরে ও বলে উঠল, 'পাথরটা নিশ্চয়ই ট্রান্স...ট্রান্সমিটার। আলট্রাসনিক দিয়া সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।'

চন্দ্র ও ইন্দ্র অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকাল। ট্রান্সমিটার! জঙ্গলের মধ্যে ট্রান্সমিটার পড়ে থাকবে কেন? আর ওই ট্রান্সমিটার খবর পাঠাচ্ছিলই বা কাকে? ওরা দুজনে বহু ভেবেও কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। অতএব পড়ার ঘরে এসে বই নিয়ে বসে পড়ল। ঝামেলা কিছুক্ষণ ওদের সামনে বসে রইল। তারপর লিকলিকে হাত দিয়ে ফুটবলের মতো চকচকে মসৃণ মাথায় হাত বুলিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, 'যদি বলো তো একটু রান্নাঘরে যাই—।'

একটু থেমে ও আবার মিহি গলায় মিনমিন করে বলল, 'ওখানে আরশোলার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। কয়েকটা ধরি গিয়ে—।'

ঝামেলা টলতে-টলতে রওনা হয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ঝালা ও পালা যুক্ত ও মুক্তকণ্ঠে পড়তে শুরু করল। কিন্তু কোনও পড়াই ওদের মাথায় ঢুকছিল না। মনের মধ্যে শুধু সবুজ পাথরটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ছোটকা বেশ রাত করেই অফিস থেকে ফিরল। তারপর চটপট খাওয়া-দাওয়ার পালা সেরে ঘরে ফিরে দেখে ঝালা-পালা তার বিছানায় বসে অপেক্ষা করছে। ওদের চমৎকার চোখ দুটো কৌতূহলে চকচক করছে। ছোটকা চেয়ার টেনে ওদের কাছে এসে বসল। গম্ভীর গলায় বলল, 'যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। পাথরটা সাধারণ পাথর নয়—একটা নতুন ধরনের ট্রান্সমিটার।'

ঝালা-পালা বলল, 'জানতাম।'

'জানতি? কী করে জানলি?' ছোটকা তো অবাক।

খাটের তলায় কিছুক্ষণ ধরে খুটুরখাটুর শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎই সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ঝামেলা বেরিয়ে এল। বলল, 'আমি বলেছি। তা পাথরটা কোথায়? আওয়াজ পাইতেছি না যে!'

চন্দ্র ইন্দ্রকে বলল, 'ঝামেলাকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা কর। নইলে ফোড়ন কেটে সব আলোচনা পণ্ড করে দেবে।'

ইন্দ্র ঝামেলাকে বলল, 'তন্বীতমালতালীবনরাজিনীলা—এই কথাটা বানান করে উচ্চারণ করো দেখি। ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে প্র্যাকটিস করো, কাল সকালে জিগ্যেস করব।'

ঝামেলা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে তারপর ঘর ছেড়ে রওনা হল। আর একই সঙ্গে মিহি গলায় বানানটা করবার চেষ্টা করতে লাগল, 'ত—ত—তন্...'

ও চলে যেতেই ছোটকা হেসে ইন্দ্রকে বলল, 'দারুণ দিয়েছিস। ব্যাটা আজ রাতের মতো আচ্ছা জব্দ হয়েছে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তা শোন, ঝামেলা ঠিকই ধরেছে। পাথরটা আমি অফিসে রেখে এসেছি। ওটার ওপরে এখনও অনেকরকম এক্সপেরিমেন্ট চলছে। পাথরটা আমাদের বড়সায়েবকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কী করে তোরা পাথরটা পেলি গোটা ব্যাপারটা ভালো করে খুলে বল দেখি! কিচ্ছু বাদ দিবি না।'

তখন ঝালা-পালা পালা করে বলতে শুরু করল।

ছোটকা একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। বোঝা গেল সেও কম দুশ্চিন্তায় পড়েনি।

ওদের সবকথা শোনার পর ছোটকা চোখ ছোট করে প্রশ্ন করল, 'তোদের আগে প্রফেসর নিধিরাম, মানে প্রফেসর সেনশর্মা ওই জঙ্গলে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি তো রোজই ঢোকেন। রাজ্যের গাছ-পাতা জোগাড় করে ফিরে আসেন।'

'আজকে কখন ফিরলেন?'

'তা তো দেখিনি?' এবারে ঝালা-পালা সত্যিই অবাক হল। প্রফেসর নিধিরাম রোজই সন্ধে ঘনিয়ে আসার আগে বেরিয়ে আসেন জঙ্গল থেকে। আজ তো তাঁকে দেখা যায়নি! ঝালা-পালা ও ঝামেলা যখন জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিল তখন তো বেশ অন্ধকার করে এসেছে! জঙ্গলের ভেতরে প্রফেসরের কোনও বিপদ হয়নি তো? তিনি বেশ নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কার করছিলেন। তাইতেই হিংসে করে কেউ তাঁকে বিপদে ফেলেনি তো?

সন্দেহগুলো ছোটকাকে খুলে জানাতেই ছোটকার চুরুটের টান দ্বিগুণ জোরালো হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে সে বলল, 'ঝালা-পালা, অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তোদেরও কিছু কিছু খোলসা করে বলা দরকার। আজ সকালেই বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে-গোলমালের কথা বলছিলুম সেটা আসলে হল এইরকম: ভারতের মোট চারজন বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা একেবারে সবার সেরা। প্রথমজন ব্যাঙ্গালোরের প্রফেসর রায়না, দ্বিতীয়জন বম্বে আই আই টি-র প্রফেসর শ্যামমূর্তি, তিন নম্বর আমাদের অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। আর শেষজন মাদ্রাজের প্রফেসর চিদাম্বরম।'

ছোটকা দম নিতে একটু থামল। তারপর বারদুয়েক চোস্ত টান মারল চুরুটে। প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল যে এত নামকরা লোক সেটা ঝালা-পালা জানত না। এক পাড়ায় থাকেন বলেই হয়তো ওরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ওদের খুব খারাপ লাগল।

ছোটকা আবার বলতে শুরু করল, 'তোরা হয়তো জানিস না, গত বছরে প্রফেসর রায়না হঠাৎ দশদিনের জন্যে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের গোপন তদন্ত বিভাগ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে খুঁজে পায়নি। অবশেষে প্রফেসর রায়না নিজে-নিজেই একদিন ফিরে আসেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি দশদিন কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, এ-বিষয়ে একটি কথাও তাঁর কাছ থেকে আদায় করা যায়নি। হাজার তদন্ত করে আমরাও কিছু বের করতে পারিনি।

প্রফেসরের কাজকর্ম এরপর থেকে ঠিকঠাক চললে কারও আর চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু গোলমালটা বাধল ওইখানেই। মানুষটার গবেষণার বুদ্ধি আর নিত্যনতুন আবিষ্কারের মিছিল যেন তারপর থেকেই মুখ থুবড়ে পড়ল। ভারতের সামরিক বিভাগের জন্য বহু আবিষ্কার উপহার দিয়েছেন প্রফেসর রায়না। সুতরাং তাঁরাও চাপ দিতে লাগলেন গোপন তদন্ত বিভাগকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ফল কিছু পাওয়া গেল না।'

'কেউ ওঁকে ইনজেকশান দিয়ে পাগল বা বোকা করে দেয়নি তো, ছোটকা?' একরাশ আগ্রহ নিয়ে সমাধান জোগাতে চাইল ইন্দ্রকান্ত।

ছোটকা বলল, 'হতে পারে। জানি না। কারণ ফিরে আসার পর থেকে প্রফেসর রায়না লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দিয়েছেন। কেমন যেন খিটখিটেও হয়ে গেছেন। যাই হোক, এরপরে ঠিক একই ঘটনা ঘটল প্রফেসর শ্যামমূর্তির বেলায়। অবশ্য রায়নার মতো নিরুদ্দেশ তিনি হননি। কী একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে রাজস্থান গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসেই একেবারে অন্য মানুষ! নাঃ, এবারও আমরা রহস্যভেদ করতে পারিনি। শুধু ধরে নিয়েছি, খামখেয়ালি মানুষগুলোর বুদ্ধি হঠাৎ করেই অকেজো হয়ে গেছে।'

ছোটকার চুরুটটা নিবে এসেছিল। সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ছোটকা নতুন একটা ধরাল। তারপর বলল, এই দুটো ঘটনার পর গোপন তদন্ত বিভাগ বাকি যেসব নামি-দামি বিজ্ঞানী আছেন তাঁদের একটা লিস্ট বানাল। তাতে প্রথম নাম প্রফেসর অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। তখন বড়সায়েব আমাকে ডেকে বললেন, ওঁর ওপরে নজর রাখতে। তা আমি নজর রাখি, আর তোদের কাছ থেকেও মাঝেমধ্যে ওঁর খবরাখবর নিই। এতদিন তো কোনও গোলমাল হয়নি, আজই কেমন একটু চিন্তা হচ্ছে।'

ছোটকার কপালে করোগেটেড টিনের চালের মতো অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কাল সকালেই প্রফেসর সেনশর্মার খোঁজ করতে

হবে। তোরা দুজনে গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসিস। আমি চাই না আমাকে ভদ্রলোক সন্দেহ করুন।'

ঝালা-পালা এককথায় রাজি। কিন্তু ছোটকার মুখে তদন্তের পুরো ব্যাপারটা শোনার পর ওদের যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। সেটা ছোটকা বোধহয় কিছুটা আঁচ করল। কারণ খাট থেকে নেমে মানিকজোড় রওনা হতেই সে দুজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই রে। আমি তো আছি!'

ঝালা-পালা ফিরে এল ওদের ঘরে। ওরা দুজনে আলাদা একটা ঘরে শোয়—সঙ্গে শুধু থাকে ঝামেলা। ঝামেলার জন্য ঘরের একপাশে একটা ছোট্ট বিছানা পাতা আছে। রোবটের অবশ্য শোওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু ঝালা-পালাকে দেখে ঝামেলা সেই শুরু থেকেই বিছানায় শোওয়ার বায়না ধরেছে। তাই ওর জন্যেও বরাবর একইরকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ঘর অন্ধকার ছিল। চন্দ্রকান্ত সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঝামেলা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আর আপনমনে সেই বানানটা রপ্ত করে চলেছে।

দু-ভাই এ-ওর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ওরা শুনতে পেল, ঝামেলা বানান প্র্যাকটিস থামিয়ে বলছে, 'তোমাদের সব কথাই আমি এখান থেকে শুনিতে পাইয়াছি। কাল ইট-পাটকেলের বাড়ি যাওয়ার সময় আমাকেও নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। গুড নাইট।' তারপর আবার শুরু হল ওর বানান প্র্যাকটিস, 'ত, ম-এ আকার, ল-তমাল, তমাল...'

ঝালা-পালার মনে নানান চিন্তা জট পাকাচ্ছিল। আগামীকাল ইট-পাটকেলের—মানে নিধিরাম পাটকেলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে তো? নাকি দেখা যাবে উনিও প্রফেসর রায়নার মতো রাতারাতি উধাও হয়ে গেছেন!

এসব ভাবতে-ভাবতেই ঝালা-পালা ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের বাড়িটা ছবির মতন। ঝালা-পালাদের বাড়ির মতো এ-বাড়িতেও লাগোয়া বাগান আছে। দূর থেকেই বাগানের রঙিন ফুলগুলো ওদের তিনজনের চোখে পড়ল। তিনজন, কারণ, ঝামেলাও আছে ঝালা-পালার সঙ্গে। সেই কাকভোরে উঠেই ও 'তন্বীতমালতালীবন্র' বানান ও উচ্চারণ পাঁচ-পাঁচবার করে শুনিয়ে দিয়েছে দু-ভাইকে। তারপর তাড়া লাগিয়েছে অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য।

এখন সবে ছ'টা কি সওয়া ছ'টা বাজে। এই সাতসকালে ওরকম একজন নামজাদা বিজ্ঞানীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করাটা কি ঠিক হবে! অবশ্য যদি ইতিমধ্যেই তিনি উধাও না হয়ে গিয়ে থাকেন। ঝালা-পালার বুকের ভেতরটায় কেমন গুড়গুড় করছে। দু-ভাই হাত ধরাধরি করে

হাঁটছে। আর একটু পিছনেই ঝামেলা কিচিরমিচির করছে আর বলছে, ‘অহো, প্রাতঃকালের কী শোভা। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!’

নাঃ, ওদের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হল। বাগানেই পাওয়া গেল প্রফেসর নিধিরামকে। নরম মাটির ওপরে বসে ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন। ঝালা-পালা জানে, নিজের হাতেই উনি বাগানের পরিচর্যা করে থাকেন। তা ছাড়া, বাড়িতে ওঁর লোকজন বলতে একটিমাত্র কাজের লোক। রান্নাবান্না থেকে প্রফেসরের দেখাশোনা—সবই সে করে থাকে। আর আছে ইয়া এক বাঘা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কুচকুচে কালো তার গায়ের রং। সবুজ চোখ দুটো সবসময় জ্বলছে। ঠিক যেন হাউন্ড অব দি বাস্কারভিল্‌স্! কুকুরটার দৌলতে অচেনা কেউ বাড়ির আশেপাশে পর্যন্ত ঘেঁষতে পারে না। কুকুরটা প্রফেসরের কথা এমনভাবে মেনে চলে যে, মনে হবে সে বুঝি মানুষের ভাষা বোঝে।

কুকুরটাকে দেখলেই ঝালা-পালা ভয় পায়, কিন্তু ঝামেলা একটুও ভয় পায় না। কারণ একদিন কুকুরটা ছুটে এসে ঝামেলার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঝামেলার তো স্টিলের পা! সুতরাং ওর কিছু হয়নি। বরং ‘কেঁউ’ আওয়াজ তুলে অ্যালসেশিয়ানটা ছুটে পালিয়েছিল বাড়ির ভেতরে। আর তার একটা চোখা দাঁত ভেঙে পড়েছিল ঝামেলার পায়ের কাছে। তারপর থেকে ঝামেলাকে দেখলেই সাংঘাতিক কুকুরটা একটু ভয়ে-ভয়ে থাকে।

কুকুরটাকে বাগানে দেখা গেল না। এমনকী ওরা তিনজনে বাগানে ঢোকার পরেও তার কোনও ‘ঘেউ ঘেউ’ শোনা গেল না।

প্রফেসর নিধিরাম ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন। তাঁর হাতে-পায়ে জামায় মাটি মাখামাখি। পাশেই পড়ে রয়েছে একটা কোদাল আর একটা বেলচা। উনি ঝুঁকে পড়ে দু-হাত বাড়িয়ে বাগানের মাটির ওপরে হাত বোলাচ্ছেন। যেন এইমাত্র একটা গর্ত বুজিয়ে ফেললেন।

চন্দ্রকান্ত পিছন থেকে হঠাৎ বলে উঠল, ‘বাপ রে, কী ডানপিটে ছেলে! কোনদিন ফাঁসি যাবে, নয় যাবে জেলে।...বলুন তো, কোন ছড়া?’

যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল মুহূর্তে। প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল ক্যাঙারুর মতো এক ঝম্প-লাফ মেরে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একইসঙ্গে পিছন দিকে ঘুরে তাকাতে গিয়ে বে-তাল হয়ে উলটে পড়েন আর কী! তাঁর মুখ থেকে ‘কে? কে?’ বলে যে কান-ফাটানো চিৎকারটা বেরিয়ে এল সেটা কোনও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব বলে ঝালা-পালার মনে হল না। প্রফেসরের বিকট ভঙ্গিতে আঁতকে ওঠা দেখে ঝালা-পালা আর ঝামেলা, তিনজনেই যেন পালটা আঁতকে উঠল। ঝামেলা চিঁ-চিঁ করে কীসব শব্দ করতে লাগল, ওর কপালের আলোগুলো জ্বলতে শুরু করল দপ্‌-দপ্‌ করে। আর একইসঙ্গে তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল ও।

একটু পরেই প্রফেসর নিধিরাম নিজেকে সামলে নিলেন। মাটি মাখা হাত দুটো প্যান্টে ঘষে সাফ করতে চাইলেন। তারপর হোঁচট-খাওয়া গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এই সাতসক্কালে তোমরা কী মনে করে?'

চন্দ্রকান্ত হেসে বলল, 'যে-ছড়াটা বললাম, বললেন না তো সেটার নাম কী?'

প্রফেসর নিধিরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করার ভান করে বললেন, 'তোমার ছড়া তুমিই জানো। আমি কী করে তার নাম বলি!'

ঝালা-পালা দুজনেই অবাক হল প্রফেসরের কথায়। 'আবোল-তাবোল'-এর 'ডানপিটে ছেলে' ছড়াটার নাম বলতে পারছেন না! নাকি মশকরা করছেন ওদের সঙ্গে?

ঝামেলা হঠাৎই মিহি সুরে জানতে চাইল, 'সারা গায়ে মাটি মেখে এই সাতসক্কালে আপনিই বা কোন রাজকার্যে নিম-নিম-নিমগ্ন ছিলেন? জানিতে পারি কি?'

প্রফেসর নিধিরাম বেশ কৌতূহলী নজরে ঝামেলাকে লক্ষ করছিলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'এই...বাগানের একটু ভালো-মন্দ যত্ন করছিলাম।'

ঝালা ও পালা আড়চোখে কোদাল ও বেলচা দুটোর দিকে দেখছিল। দুটোরই গায়ে চাপ-চাপ মাটি লেগে রয়েছে। একটু আগেই ও দুটো দিয়ে কোনও গর্ত খুঁড়েছিলেন প্রফেসর। কিন্তু কেন?

ঝামেলা প্রফেসর নিধিরামের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ওর প্রকাণ্ড মাথাটা নড়ছিল এপাশ-ওপাশ। কেন জানি না মনে হচ্ছে, প্রফেসরের উত্তর ঝামেলাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ঘুরপাক খেতে-খেতেই ঝামেলা হঠাৎ গানের সুরে বলতে লাগল, 'ঘচাং-ফু, খাব তোকে—ঘচাং-ফু, খাব তোকে—।'

এটা যে একটা সিনেমার গানের লাইন সেটা ঝালা-পালা জানে। কিন্তু ঝামেলা যে কাকে খেতে চাইছে তা ঠিক ওরা বুঝতে পারল না। তা ছাড়া, ওদের মনের কোণে একটা ভয় বাসা বাঁধছিল—প্রফেসরের কালো রঙের বাঘা অ্যালসেশিয়ানটা কোথায়? এমনিতে প্রফেসর নিধিরামকে বহাল তবিয়তে হাজির দেখে ঝালা-পালা একটু খুশিই হয়েছিল। গতকাল রাতে তাঁর জন্যে ছোটকা তো কম চিন্তায় পড়েনি! কিন্তু এখন সেই খুশি ও স্বস্তির সঙ্গে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি ঢুকে বসে রয়েছে।

এদিকে প্রফেসর নিধিরাম ঝামেলাকে নির্ঘাত পাগল ভাবছিলেন। তিনি কিছু একটা করে ওঠার আগেই চন্দ্রকান্ত ধমক দিল ঝামেলাকে, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে। স্ট্যাচু!'

ঝামেলা স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক তক্ষুনি প্রফেসর নিধিরাম ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কাল ওই জঙ্গলে তোমরা একটা সবুজ পাথর কুড়িয়ে পেয়েছ?'

ঝালা-পালা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওই প্রশ্ন শুনে। সবুজ পাথরের কথা প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল জানলেন কেমন করে? ওরা যখন পাথরটা কুড়িয়ে ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তো নিধিরাম পাটকেলকে ওদের চোখে পড়েনি!

'সবুজ পাথরটা কোথায়?' নিধিরামের গলা খানিকটা কর্কশ হল। সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠায় নিধিরাম পাটকেলের নেড়া মাথা বেশ চকচক করছে।

ঝালা-পালা একটু চুপ করে থেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'আমাদের ছোটকার কাছে।'

নিধিরাম পাটকেলের মুখের রেখা নরম হল। মজা-মজা আজব ভাবটা ফিরে এল। ঝাঁটা গোঁফে বারদুয়েক তা দিয়ে তিনি বললেন, 'আসলে কী ব্যাপার জানো, পাথরটা আমার। গাছের পাতা খুঁটিয়ে পরখ করার জন্যে ওটা আমি তৈরি করেছি। কাল ওটা আমার পকেট থেকে অসাবধানে পড়ে গেছে। তোমাদের ছোটকাকে বলো পাথরটা যেন আজকের মধ্যেই আমাকে ফেরত দেয়।'

প্রফেসর নিধিরামের মিঠে-মিঠে কথাগুলোর মধ্যে যে একটা ভয় দেখানো ব্যঙ্গের সুর চাপা রয়েছে সেটা সহজেই বুঝতে পারল ঝালা-পালা। প্রফেসরের কথা শেষ হতেই ইন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে ঝামেলাকে বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি! এবারে বাড়ি চলো।'

ঝামেলা যেন প্রাণ ফিরে পেল। এবং প্রাণ ফিরে পেয়েই প্রফেসরকে বলল, 'আপনার কালো কুত্তাটি কোথায়? তাহাকে দেখিতে পাচ্ছি না!'

প্রশ্নটা শোনামাত্র প্রফেসর নিধিরামের মজারু মুখখানা ঝট করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে তিনি বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আছে—মানে, বাড়ির ভেতরেই আছে। সবসময়—ইয়ে—খুব গোলমাল করে কিনা, তাই ওকে...।'

ঝামেলা হাত তুলে তাকে থামতে বলল, 'থাক, আর পরিশ্রম করিয়া গুল মারতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। চলো, বাড়ি চলো।'

শেষের কথাগুলো অবশ্যই ঝালা-পালাকে লক্ষ্য করে। অতএব ওরা তিনজনে রওনা হয়ে পড়ল। আর কিম্ভূতকিমাকার প্রফেসর অজয়েন্দ্র সেনশর্মা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো রাগে-অপমানে ধকধক করে জ্বলছিল।

বাড়ি ফেরার পথে ঝালা-পালা ধমক দিল ঝামেলাকে, 'ছিঃ, ওঁর বাড়িতে তুমি কী অসভ্যতা শুরু করেছিলে? এইজন্যেই তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে নেই!'

ঝামেলা চটপট জবাব দিল, 'যমজ দাদাভাইরা, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ ওই ইটপাটকেল প্রফেসরটি একটি একনম্বরের মিথ্যেবাদী? প্রথম কথা, সবুজ পাথরটা কাল ওঁর পকেটে ছিল না। যদি থাকত, তা হলে তোমাদের 'আহ্লাদী' ছড়াটা শোনাবার সময়ে পাথরের আলট্রাসনিক শব্দ আমার কানে আসেনি কেন? আর দু-নম্বর মিথ্যে হল, কালো কুকুরটা প্রফেসরের বাড়িতে নেই।

আমি যখনই ও বাড়ির কাছাকাছি যাই তখনই কুকুরটার ফোঁস-ফোঁস, ফিশফাশ, বা ঘেউ-ঘেউ আমার আলট্রাসনিক শুনতে পাওয়া কানে ধরা পড়েই। আজ সেরকম কিছুই শুনিতে পাইলাম না। এখন কহ যমজ ভাইগণ, কী অন্যায় আমি করিয়াছি?'

ঝালা-পালা চলতে-চলতে পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাচ্চা রোবটটার দিকে। রোবটের বাচ্চা তখন নাকি গলায় বেসুরো গাইছে, 'ঘচাং-ফু, খাব তোকে—ঘচাং-ফু...।'

'প্রফেসর সেনশর্মার কুকুরটা কাল রাতে মারা গেছে।' ছোটকা আচমকাই ঘোষণা করল কথাগুলো।

ঝালা-পালার মুখ থেকে সকালের অভিযান-কাহিনি শোনার পর কয়েকটা চুরুটের শ্রাদ্ধ করে ও বারকয়েক 'হুম' শব্দ করে অফিসে বেরিয়ে পড়েছিল ছোটকা। তারপর সারাটা দিন কোথায়-কোথায় কাটিয়ে ফিরে এসেছে সন্ধের মুখে। এখন ছোটকা দু-ভাইকে নিয়ে আসর জমিয়েছে নিজের ঘরে। ঝামেলার উৎপাত থেকে রেহাই পেতে ইন্দ্রকান্ত ওকে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' শব্দটা বানান করে উচ্চারণ করতে দিয়েছে। ঝামেলা সে-চেষ্টাই করে যাচ্ছে ছোটকার ঘরের এককোণে হাঁটুগেড়ে বসে।

'প্রফেসরের বাড়ির কাজের লোকটিকে রাস্তায় ধরে জানতে পেরেছি কুকুর মারা যাওয়ার খবরটা।' ছোটকা বলল।

'তা হলে সকালবেলা প্রফেসর কি কুকুরটাকেই কবর দিচ্ছিলেন বাগানে?' চন্দ্রকান্ত নিজের সন্দেহটা ছুড়ে দিল ছোটকার দিকে।

'নির্ঘাত তাই।' ছোটকা বেশ জোর দিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে, কুকুর কবর দেওয়ার ব্যাপারটা অজয়েন্দ্র সেনশর্মা তোদের কাছে চেপে গেলেন কেন। পোষা কুকুর মারা গেলে যে দুঃখটুঃখ পাওয়ার কথা তা-ও উনি পেয়েছেন বলে মনে হল না...।'

ছোটকার কপালে একরাশ ভাঁজ পড়ল। ছোটকা বলে, যে যত বেশি বুদ্ধিমান, তার কপালে ভাঁজও পড়ে তত বেশি।

ছোটকা আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, '...আর ঝামেলার কথাগুলোও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। সবুজ পাথরের গল্পটা বানানো...কুকুরের মারা যাওয়ার ঘটনা চেপে যাওয়া...নাঃ, আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। ওই নিধিরাম পাটকেলের ওপরে আরও কড়া নজর রাখা দরকার...।'

চন্দ্র ও ইন্দ্র ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ভেতরে-ভেতরে। ওদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য যে করে হোক ছোটকাকে রাজি করাতেই হবে। কিন্তু মা-বাবা কি মত দেবে খুব সহজে? মনের কথা আর চেপে না রেখে মুখে প্রকাশই করে ফেলল ওরা।

ছোটকা খুব চিন্তিত গলায় বলল, ‘এ-তদন্তে বেশ বিপজ্জনক গন্ধ পাচ্ছি রে! শেষকালে কি তোদের দুজনকে বিপদে ফেলব?’

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের অনুনয় ও আগ্রহ-ভরা সুন্দর মুখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ছোটকা ‘না’ বলতে পারল না। ওরা মনের খুশিতে একেবারে জাপটে ধরল ছোটকাকে।

‘তবে শুধু নজর রাখা! তার বেশি কিছু নয় কিন্তু!’ ওদের সাবধান করে দিয়ে বলল ছোটকা, ‘রাত আটটায় আমরা বেরোব, কেমন?’

চন্দ্রকান্ত তখন ঘরের কোণে দাঁড়ানো ঝামেলাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ঝামেলা, এদিকে এসো। রাতে আমাদের সঙ্গে তুমিও যাবে, বুঝলে!’

ঝামেলা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চালে হেলে-দুলে ওদের কাছে এগিয়ে এল। তারপর একই ঢঙে বলল, ‘মানুষের চেয়ে রোবট অনেক উন্-উন্নত। এসব কাজে রোবটকে বাদ দিয়ে যে চলতে পারে না তাহা জানিতে আমার বাকি নাই।’

ছোটকা হেসে ওকে বলল, ‘খুব যে বড়-বড় কথা বলছ! পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটা তৈরি হয়েছে?’

‘তৈরি হয়নি আবার! উহা অতি সহজ শব্দ।’ একথা বলে ঝামেলা মিহি সুরে চিৎকার করে উচ্চারণ করল, ‘পুণ্ডরীখ্যাঁক্কো!’

ছোটকা ও ঝালা-পালা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল একসঙ্গে।

রাত ঠিক সাড়ে আটটার সময়ে প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরোলেন। ঝালা-পালা, ঝামেলা ও ছোটকা চারজনেরই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ঝালা-পালা গভীর শ্বাস টেনে বলল ফিশফিশ করে, ‘কোথায় যাচ্ছে, ছোটকা?’

ছোটকা ওদের পাশটিতেই দাঁড়িয়েছিল। ঠোঁটে আঙুল তুলে বলল, ‘শ-শ-শ! কোথায় যাচ্ছে সেটা এক্ষুনি টের পাবি।’

‘মানুষের ধৈর্য বড় কম!’ চাপা মিহি গলায় মন্তব্য করল ঝামেলা।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলার তেল চকচকে মাথায় একটা আদুরে চাঁটি বসিয়ে দিল। ছোটকা চাপাগলায় আবার সাবধান করল, ‘কী হচ্ছে কী!’

প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল তখন এপাশ-ওপাশ দেখে মাঠের দিকে রওনা হয়েছেন। এদিকটায় এমনিতেই লোকবসতি কম, তার ওপর রাত সাড়ে আটটা, ফলে সব নির্জন-নিঝুম। শুধু দু-একটা বাড়ির জানলা দিয়ে ছিটকে আসা আলো গড়িয়ে পড়েছে পিচের রাস্তায়।

প্রফেসরের বাড়ির কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাত দূরে ওরা চারজন শ্যেনদৃষ্টি মেলে মোতায়েন ছিল। না, প্রফেসরের ওপর নজর রাখার কোনও অসুবিধে তাতে হয়নি। কারণ, পঞ্চাশ হাত দূর থেকেও ঝামেলা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

অন্ধকার মাঠের পথে চলতে-চলতে প্রফেসর যখন আরও অন্ধকারে মিশে গেলেন তখন ছোটকা অনুসরণ করার উদ্যোগ করতেই ঝামেলা ছোটকার প্যান্ট ধরে টান মারল। বলল, ‘তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমি স্পষ্ট ওঁকে দেখতে পাইতেছি। জঙ্গলের দিকেই উনি যাচ্ছেন। আগে জঙ্গলে ঢুকে পড়ুন, তারপর আমরা ইটপাটকেল মহাশয়কে অনুসরণ করিব। তাহাই জুতসই হইবে নাকি?’

চন্দ্রকান্ত হেসে বলল, ‘ঠিকই বলিয়াছ, উহাই জুতসই হইবে।’

ইন্দ্র ও ছোটকা মুখ টিপে হাসল। তারপর আরও মিনিট চার-পাঁচ অপেক্ষা করে ওরা প্রফেসরকে অনুসরণ করল। ঝামেলা তাঁকে দেখতেও পাচ্ছিল আর তাঁর পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল।

অন্ধকারে ভিজে ঘাস মাড়িয়ে ওরা চলেছে। শরীর ভারী হওয়ায় ঝামেলার পা বসে যাচ্ছে নরম মাটিতে। ও বড় বেশি পিছিয়ে পড়ছে দেখে ঝালা-পালা বারবার ওকে তাড়া মারতে লাগল।

চলতে-চলতে হঠাৎই ঝামেলা চিৎকার করে উঠল, ‘সবুজ পাথর! সবুজ পাথর! প্রফেসর ইটপাটকেলের হাতে একটা সবুজ পাথর!’

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ছোটকা বলে উঠল, ‘তোরা আর এগোস না। আমি দেখছি!’ তারপর ব্লাস্টারটা জামার ভেতর থেকে বার করে তিরবেগে ছুটতে শুরু করল জঙ্গল লক্ষ করে। পলক পড়তে-না-পড়তেই ওদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল ছোটকার ছুটন্ত শরীরটা।

একটু পরে ঝালা-পালা আর ঝামেলাও মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করল সেদিকে। প্রফেসর সেনশর্মা তখন জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু প্রফেসরের হাতে ধরা সবুজ একটা পাথর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে—ঠিক যেরকম পাথর গতকাল ঝালা-পালা ও ঝামেলা কুড়িয়ে পেয়েছিল। পাথর থেকে বেরিয়ে আসা লালচে আভায় প্রফেসরের মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গলের মাটিতে একটা কাঁপুনি শুরু হল—যেন হালকা ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপরই জঙ্গলের বিশাল-বিশাল কতকগুলো গাছ সরে যেতে লাগল দু-পাশে। মাটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সেই ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসছে সবুজ আলোর আভা।

ছুটন্ত অবস্থাতেই ছোটকা প্রফেসরের কীর্তিকলাপ সব দেখতে পেয়েছিল। তাই চিৎকার করে বলল, ‘খবরদার! নড়াচড়া করলেই ব্লাস্টার দিয়ে উড়িয়ে দেব!’

কিন্তু প্রফেসর সেনশর্মা সে-কথায় কোনওরকম আমল না দিয়ে এগিয়ে চললেন ফাঁক হয়ে যাওয়া মাটির দিকে। দেখা গেল, সেই ফাঁক দিয়ে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে সবুজ আলোর ছটা।

প্রফেসর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন পিছনে। ছোটকা তখনও অনেকটা দূরে। তিনি হয়তো ভাবলেন, ছোটকা তাঁকে ধরার আগেই তিনি সিঁড়ি দিয়ে গর্তের ভেতরে নেমে যেতে পারবেন।

তাই ছুটলেন গর্ত লক্ষ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছোটকা ব্লাস্টার উঁচিয়ে ফায়ার করল।

না, কোনও শব্দ হল না। কোনও আগুনের ঝলকও দেখা গেল না। শুধু প্রফেসর নিধিরামের বাঁদিকে দাঁড়ানো একটা বিশাল ঝুপসি বটগাছ মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। অবশেষ বলতে পড়ে রইল তার পোড়া কিছু খাপছাড়া টুকরো। যে-চাঁদের আলো এতক্ষণ আড়াল হয়ে ছিল, তা এবার এসে পড়ল জঙ্গলের ঘাসে, লতায়-পাতায়, প্রফেসরের গায়ে।

ছোটকা গর্জন করে উঠল, 'এখনও বলছি সাবধান!' এবং পরক্ষণেই ব্লাস্টার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হতভম্ব প্রফেসর নিধিরামের ওপরে। প্রফেসর একটা চিৎকার করে ছোটকার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন। সবুজ পাথরটা তাঁর হাত থেকে তখন ছিটকে পড়েছে মাটিতে।

ঠিক সেই সময়ে ঝালা-পালা ও ঝামেলা হাজির হল ঘটনাস্থলে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে খুদে-খুদে দুই বীরপুরুষ ছোটকার সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রফেসরের ওপরে। চলতে লাগল চারটে শরীরের জটলা। ব্যাপার দেখে ঝামেলা এগিয়ে এল। চারটে মাথার মধ্যে ন্যাড়া মাথাটি বেছে নিয়ে ওর লোহার ডানহাতটা সজোরে বসিয়ে দিল ব্রহ্মতালুতে। পলকে সব ঝটাপটি শেষ। হাঁফাতে-হাঁফাতে ছোটকা আর ঝালা-পালা উঠে দাঁড়াল। অদূরে ছিটকে পড়া ব্লাস্টারটা কুড়িয়ে নিল ছোটকা। প্রফেসর নিধিরাম তখন অসাড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে।

ঝালা-পালা বলল, 'থ্যাংক য়ু, ঝামেলা।'

ছোটকা সবুজ পাথরটা কুড়িয়ে পকেটে ঢোকাল। তারপর ঝুঁকে পড়ে প্রফেসরের নাকের কাছে হাত রাখল। না, নিশ্বাস পড়ছে।

এমন সময় ঝামেলা মিহি সুরে চিৎকার করে উঠল, 'জলদি! গর্তটা আবার বুজিয়া যাইতেছে!'

চট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেদিকে নজর করল ছোটকা। তারপর 'কুইক'! বলে ছুটল সেদিকে। ঝালা-পালাও ছুটল কোনওরকম দেরি না করে।

অতি সহজেই ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঝামেলা পিছিয়ে পড়েছিল। ছোটকা হাত বাড়িয়ে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

ভেতরটা হালকা সবুজ আলোয় ঝকঝক করছে। দশ-বারোটা সিঁড়ি নামলেই একটা বিশাল ঘর। ঘরে বেশ কিছু অজানা-অচেনা যন্ত্রপাতি। দু-তিনজন মানুষও চলাফেরা করছে ব্যস্তভাবে। ছোটকা ওদের তিনজনকে দাঁড়াতে বলে পকেট থেকে দেশলাই-বাক্সের মাপের কী একটা জিনিস বের করল। তারপর সেটার গায়ে একটা ছোট বোতাম টিপে বাক্সটা রেখে দিল সিঁড়ির ধাপের এককোণে। ঝালা-পালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ট্রান্সমিটারটা দিয়ে আমাদের গোপন তদন্ত

বিভাগে খবর চলে যাবে আমরা কোথায় আছি। দশ মিনিটের মধ্যেই সিকিওরিটি ফোর্স চলে আসবে। কিন্তু এখানে কীসব কাণ্ড হচ্ছে বল দেখি!'

ওরা চারজনে সতর্ক পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়াল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে ছোটকা সবার আগে।

ঘরে যে ক'জন লোক ব্যস্ত ছিল তারা হঠাৎই যেন ওদের খেয়াল করল। তাদের প্রত্যেকের পরনে ধবধবে সাদা ফুলশার্ট ও ফুলপ্যান্ট। মাথায় সাদা টুপি। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, লোকগুলো দেখতে হুবহু একরকম। ছোটকা চাপা গলায় বলল, 'ঝালা-পালা, এখানে সবাই দেখছি তোদের মতো যমজ ভাই!' তারপর গম্ভীর স্বরে আদেশ করল ছোটকা, 'যে যেখানে আছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ো! নইলে হাওয়া-বন্দুক দিয়ে হাওয়া করে দেব!'

মোট তিনজন লোক ছিল ঘরে। তারা চটপট দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরের মূর্তির মতো।

ঝালা-পালার তো বুক দুরদুর করছে। ছোটকা একা সবাইকে সামলাতে পারবে তো! ঝামেলার মুখ থেকে নানান আজগুবি কিচিরমিচির শব্দ বেরোচ্ছে।

ছোটকা কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজা খুলে একটি লোক ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই ছোটকা অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'প্রফেসর রায়না!'

ততক্ষণে দাড়িওয়ালা দ্বিতীয় একজন ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে। তাকে দেখে ছোটকা আরও অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'একী! প্রফেসর শ্যামমূর্তি!'

ঝালা-পালার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। এই বিজ্ঞানী দুজন এই পাতালপুরীতে এলেন কেমন করে? ঝামেলা তখন ফিশফিশ করে বলছে, 'এসব কী হচ্ছে? আমার নেড়া মস্তকে কিছুই ঢুকিতেছে না।' আর নিজের তেলা মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

প্রফেসর রায়না ও প্রফেসর শ্যামমূর্তি হাসিমুখে ছোটকার কাছে এগিয়ে এলেন। অন্য তিনজন যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইল।

প্রফেসর রায়না বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই সিক্রেট ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্টের লোক। তা আমাদের দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?'

ছোটকার মুখে কোনও কথা ফুটল না। শুধু ব্লাস্টার বাগিয়ে ধরে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এবারে প্রফেসর শ্যামমূর্তি হেসে বললেন, 'ভয়ের কোনও কারণ নেই। ব্লাস্টারটা আপনি নামিয়ে রাখতে পারেন। জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন সব খুলে বলছি, আসুন, আমাদের সঙ্গে আসুন।'

রায়না ও শ্যামমূর্তি যে-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন সেই দরজার দিকেই এগিয়ে চললেন নিশ্চিন্ত পায়ে। কোনও ভয় নেই, আশংকা নেই, উত্তেজনা নেই। ঝালা-পালার যেন সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ঝামেলাও নিশ্চুপ।

ছোট দরজাটা পেরোতেই একটা ছোট ঘর। এখানেও হালকা সবুজ আলো। প্রফেসর রায়না ছোটকার দিকে ফিরে বললেন, 'এবারে আপনি আরও অবাক হবেন। দেখুন, সামনে কে বসে আছেন!'

কথাটা বলে রায়না সরে দাঁড়াতেই ওরা অবাক হয়ে দেখল ওদের সামনে বসে আছেন আদি ও অকৃত্রিম প্রফেসর অজয়েন্দ্র সেনশর্মা—নিধিরাম পাটকেল! ঝাঁটা গোঁফ চুমরে তিনি হাসছিলেন। ঝালা-পালাকে ছোটকার পিছনে দেখতে পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'বাপরে, কী ডানপিটে ছেলে! কোন দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে!...বলো দেখি, কোন ছড়া?'

ঝালা-পালা এতক্ষণে নির্ভয়ে হাসতে পারল। দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আবোল তাবোল'-এর ডানপিটে!'

'শাবাশ! এই নাও টফি!' বলে প্রফেসর নিধিরাম পকেট থেকে দুটো টফি বের করে এগিয়ে দিলেন চন্দ্র ও ইন্দ্রকে।

ওরা টফি নিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু আজ সকালেই আপনি এটা কোন ছড়া তা বলতে পারেননি!'

ঝামেলা নিজের লোহার হাতটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি যে জঙ্গলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এখানে এলেন কেমন করে?'

প্রশ্নের উত্তরটা শোনা গেল ওদের পিছন থেকে, 'অজ্ঞান উনি হননি, হয়েছিলাম আমি। আর ছড়ার নাম না বলতে পারাটাও আমারই দোষ।'

ছোটকা, ঝালা-পালা, ঝামেলা চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখে আর-একজন প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকজন অচেনা মানুষ। তাদের প্রত্যেকের হাতেই ব্লাস্টার গান।

ছোটকা প্রথমে ভীষণ অবাক হয়ে গেল, তারপর এগিয়ে গেল, ব্লাস্টার-হাতে একজন প্রৌঢ়ের দিকে। বলল, 'স্যার, আপনিও এসেছেন?'

ঝালা-পালা বুঝল, ইনি নির্ঘাত ছোটকার বড়সাহেব।

বড়সাহেব তখন দরাজ হেসে বললেন, 'এতবড় একটা অপারেশান, নিজে না এসে পারি?'

'কিন্তু স্যার, আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না!' ছোটকা দিশেহারা হয়ে বলল।

'প্রথমটা আমারও ঢোকেনি। কিন্তু ওঁকে গ্রেপ্তার করামাত্রই সব জানতে পারলাম। এ যেন রূপকথাকেও হার মানায়!'

বড়সাহেব দু-নম্বর প্রফেসর নিধিরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। বড়সাহেবের কথা শেষ হতে-না-হতেই দু-নম্বর নিধিরাম দু-হাত ঘাড়ের কাছে নিয়ে মাথা নীচু করে অনেক কসরত করে একটা মুখোশ ছাড়িয়ে নিল মুখ থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে তাজ্জব কাণ্ড!

কোথায় গেল প্রফেসর নিধিরামের চেহারা! কোথায় গেল তাঁর ঝাঁটা গোঁফ, কিংবা ঝুটো গোঁফ! যে-মানুষটা এখন ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে দেখতে অবিকল সাদা পোশাক পরা লোক তিন জনের মতো। অর্থাৎ, ওরা চারজন যেন একে অপরের ছবি!

ঝালা-পালা আর ছোটকার মুখের অবস্থা দেখে প্রফেসর রায়না হেসে বললেন, 'আসুন, সবাই মিলে আগে আয়েশ করে বসা যাক। তারপর সব আমি বুঝিয়ে বলছি।'

ছোট ঘরটাতেই সকলে এদিক-ওদিক জায়গা খুঁজে বসে পড়ল। শুধু ব্লাস্টার হাতে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রইল ঘরের দরজার কাছে। ঝালা-পালা গুটিসুটি মেরে ছোটকার গা ঘেঁষে। আর ঝামেলা তখন আসল প্রফেসর নিধিরামের গা টিপে-টিপে পরখ করছে। বাচ্চা রোবটটার কৌতূহল বড় বেশি!

প্রফেসর রায়না হুবহু একরকম দেখতে চারজন মানুষকে দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, এই চারজন হলেন প্ল্যানেট এক্স-এর বাসিন্দা। পৃথিবী থেকে বিশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে একটি গ্রহ। তার নাম আমরা দিয়েছি প্ল্যানেট এক্স। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এক্স গ্রহটির চেহারা-চরিত্র অবিকল আমাদের পৃথিবীর মতো। গাছপালা, প্রাণী, এমনকী মানুষের মতো বাসিন্দাও রয়েছে সেখানে। তবে সব বাসিন্দার চেহারাই হচ্ছে একরকম—ঠিক এই চারজনের মতো। কিন্তু প্রশ্ন হল, এক্স গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে কেমন করে এল, কেন এল! প্রথমেই বলে নিই, মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারে এক্স গ্রহ অনেক-অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের তুলনায়। অসীম মহাকাশের প্রায় কোনও জায়গাই ওদের কাছে আর দূর নয়। ফলে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছোনোটা ওদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা—।'

বড়সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'গত কয়েক বছরে পৃথিবীতে—বিশেষ করে ভারতে—যে উড়ন্ত চাকির ঘনঘন দেখা পাওয়া গেছে—'

'হ্যাঁ, তার জন্যে আমরাই দায়ী—' প্ল্যানেট এক্স-এর বাসিন্দা দু-নম্বর নিধিরাম জবাব দিল।

'এক্স গ্রহের একটা বিরাট সমস্যা ছিল—' প্রফেসর রায়না আবার বলতে শুরু করলেন, 'মহাকাশ অভিযানে পটু হওয়া ছাড়া আবিষ্কারের অন্যান্য দিকগুলোতে কোনও উন্নতিই করতে পারেনি ওরা। যেমন, যানবাহন, খাদ্যশস্য, কল-কারখানা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয়

জিনিস—সব বলতে গেলে অনেক বড় লিস্ট হয়ে যাবে। সুতরাং নিজেদের উন্নতি আর অগ্রগতির জন্য এক্স গ্রহের মানুষরা মহাকাশযানে চড়ে সারা মহাকাশ তন্নতন্ন করে খুঁজে চলল, যদি কোথাও কোনওরকমে সাহায্যের হদিশ পাওয়া যায়। এইভাবে খুঁজতে-খুঁজতে একদিন ওরা আমাদের পৃথিবী গ্রহকে খুঁজে পেল। অবাক হয়ে প্ল্যানেট এক্স-এর প্রাণীরা দেখল, আমাদের সঙ্গে ওদের কত মিল। তক্ষুনি ওরা ঠিক করল, অগ্রগতির ব্যাপারে সাহায্য আদায় করতে হবে পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই।

প্রফেসর শ্যামমূর্তি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। কালো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাকিটুকু আমিই বলি, প্রফেসর রায়না।'

একটু থেমে শ্যামমূর্তি সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'এক্স গ্রহের মানুষরা ঠিক করল তারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের চুরি করে নিয়ে যাবে তাদের গ্রহে। তারপর চুরি করা বিজ্ঞানীদের ওরা লাগিয়ে দেবে নানান গবেষণার কাজে। তখন ওরা যানবাহন, কল-কারখানা, খাদ্যশস্য—সবদিক দিয়েই এগিয়ে যাবে পৃথিবীর মতো। সুতরাং ওরা বিভিন্ন দেশের মাটির তলায় ঘাঁটি তৈরি করল। বছরের পর বছর ধরে লক্ষ করল পৃথিবীর মানুষের আচার-ব্যবহার। তাদের ভাষা শিখল, আদব-কায়দা শিখল। তারপর ছদ্মবেশে মাঝে-মাঝে মিশতেও লাগল মানুষের সঙ্গে। তারপর যেদিন তারা বুঝল সময় হয়েছে, তারা কিডন্যাপ করল প্রফেসর রায়নাকে। উদ্দেশ্য, তাঁকে জোর করে প্ল্যানেট এক্স-এ নিয়ে যাওয়া, নতুন-নতুন গবেষণা ও আবিষ্কার করতে বাধ্য করা। প্রফেসর রায়না ওদের অনেক বোঝালেন, তিনি উধাও হয়ে গেলে গোটা ভারতবর্ষের টনক নড়ে যাবে। সারা দেশে তোলপাড় শুরু হবে। হয়তো প্ল্যানেট এক্স-এর মানুষদের কয়েকটা ঘাঁটির সন্ধানও তারা বের করে ফেলবে। তখন সেই বিপদ ঠেকাতে ওদের একজন প্রফেসর রায়না সেজে চলে গেল তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করতে। অভিনয় সে ঠিকই করল—এই মুহূর্তেও হয়তো দু-নম্বর রায়না সেজে সে চলাফেরা করছে ব্যাঙ্গালোরে—কিন্তু গবেষণা বা আবিষ্কারের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ফলে দেশের মানুষ অবাক হয়ে ভাবল, রাতারাতি প্রফেসর রায়নার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। এরপর একই ঘটনা ঘটল আমার বেলায় এবং প্রফেসর সেনশর্মার বেলায়...।'

ছোটকার কাছে ক্রমশ ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছিল। পকেট থেকে সবুজ পাথরটা বের করে সে প্রফেসর শ্যামমূর্তিকে শুধোন, 'এটা দিয়ে কী কাজ করত ওরা?'

শ্যামমূর্তি বললেন, 'এক ঘাঁটি থেকে আর-এক ঘাঁটিতে যোগাযোগ রাখত এই অদ্ভুত ধরনের রেডিয়ো-আলট্রাসনিক ট্রান্সমিটার দিয়ে। এরকম ট্রান্সমিটার আগামী দুশো বছরেও আমরা তৈরি করতে পারব কি না সন্দেহ আছে। যাই হোক, এটা নিয়ে ছদ্মবেশী বিজ্ঞানীরাও ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, ঘাঁটির দরজা খোলা-বন্ধ করার সংকেত পাঠাত।'

ছোটকার বড়সাহেব ভারী গলায় কাশলেন, 'এবারে দু-নম্বর প্রফেসর সেনশর্মার কথাগুলো শোনা যাক।'

তখন প্ল্যানেট এক্স-এর চারটি প্রাণীর একজন মুখ খুলল, 'প্রফেসর সেনশর্মাকে গতকাল যখন আমরা জঙ্গল থেকে ধরে আনি তখন আমার পকেট থেকে একটা ট্রান্সমিটার পড়ে যায়। সেটা কুড়িয়ে পায় ওই যমজ ছেলে দুজন—।'

ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে সরু গলায় ফোড়ন কাটল, 'ওরা নয়, আমি পাইয়াছিলাম।'

নকল নিধিরাম সে-কথা যেন শুনতেই পেল না। সে বলে চলল, 'তারপর প্রফেসর সেনশর্মার কুকুরটাকে আমি মেরে ফেলতে বাধ্য হই। কাজের লোকটা আমাকে নকল বলে চিনতে না পারলেও কুকুরটার নজরকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। সেটাকে যখন বাগানে কবর দিচ্ছি তখন ওই ছেলে দুটো আমাকে দেখতে পায়—।'

'আমিও ছিলাম! তৎসহ আমিও ছিলাম!' ঝামেলা লাফাতে-লাফাতে দু-পা এগিয়ে এল সামনে।

নকল নিধিরাম তখন বলছে, 'আচমকা ওদের ছড়া শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। বিশেষ করে জেল আর ফাঁসি শব্দ দুটো শুনে। তা ছাড়া, সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' তো আমার মুখস্থ ছিল না! তবে কুকুরটাকে মেরে ফেলার জন্যে আমি সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত।' তারপর প্রফেসর সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রফেসর।'

প্রফেসর নিধিরাম হাসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

বড়সাহেব চারপাশে নজর বুলিয়ে ব্লাস্টারটা বাঁ-হাতের তালুতে বারকয়েক ঠুকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আর কী, এবারে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হোক। এখুনি ব্যাঙ্গালোর আর বম্বেতে ওয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। নকল রায়না আর নকল শ্যামমূর্তিকে গ্রেপ্তার করে যেন হেড অফিসে চালান দেওয়া হয়।'

ছোটকা আর ঝালা-পালাও ঘাড় নেড়ে সে-কথায় সায় দিচ্ছিল, কিন্তু ওরা অবাক হয়ে গেল প্রফেসর রায়নার কথা শুনে। তিনি বড়সাহেবকে বললেন, 'তার বোধহয় আর দরকার পড়বে না।'

সবার চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল। প্ল্যানেট এক্স-এর চার বাসিন্দা সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রফেসর রায়না বললেন, 'প্রথমত, কিডন্যাপ করার সময়টুকু ছাড়া এরা আমাদের বেশ রাজার হালেই রেখেছে। গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি। তা ছাড়া, বহুদিনের চেষ্টায় আজই আমি ওদের রাজি করাতে পেরেছি আমার প্রস্তাবে। ওদের বুঝিয়ে বলেছি, জোর-জবরদস্তি করে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আবিষ্কার আদায় করা যায় না। তার চেয়ে বরং সরকারি চুক্তি করে বিজ্ঞানী ধার করা ভালো। আমরা প্ল্যানেট এক্স-এ গিয়ে ওদের শিখিয়ে দেব আমাদের নানান প্রযুক্তিবিদ্যা। আর

বিনিময়ে ওরাও এখানে থেকে পৃথিবীর মানুষদের উপহার দেবে ওদের আধুনিক মহাকাশ অভিযানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কলাকৌশল। ওরা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওদের সমস্ত ঘাঁটিতে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছে। সুখের কথা, তারা রাজিও হয়েছে।'

ছোটকা বলল, 'এত সহজে রাজি হয়ে গেল?'

উত্তরটা দিল নকল নিধিরাম, 'রাজি না হয়ে উপায় কী! এতদিনে আমরা প্রফেসর রায়নার কাছ থেকে একটিও আবিষ্কার আদায় করতে পারিনি।' একটু হেসে সে বলল, 'এই বরং ভালো হল। প্ল্যানেট এক্স-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল প্ল্যানেট আর্থ-এর। আশা করি এ-বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাকবে!'

তারপর সে বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিফ, এ-বন্ধুত্বে আপনার আপত্তি নেই তো? নাকি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন?'

বড়সাহেব ভরাট গলায় হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করব, তবে বন্ধুত্বের হাতকড়া দিয়ে।' বলে তিনি হ্যান্ডশেক করলেন নকল নিধিরামের সঙ্গে।

তারপরই শুরু হয়ে গেল মিলন উৎসব। সবক'টা মানুষ একসঙ্গে খুশিতে মেতে উঠল। কেউ-কেউ গান ধরল হেঁড়ে গলায়। প্রফেসর নিধিরাম গলা ফাটিয়ে গোটা 'আবোল-তাবোল'টাই আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। ছোটকা ঝালা-পালাকে একসঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে হইহই করে নাচতে লাগল।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ঝামেলাও তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে শুরু করল। ওর কপালের লাল-নীল হলদে আলোগুলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে-নিবছে। আর একই সঙ্গে বাচ্চা রোবটটা ওর মিহি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'



টিরা গ্রহের ভয়ঙ্কর

একঃ প্রথম দুর্ঘটনা

অন্ধকার মহাকাশে মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। যেন দেওয়ালির উৎসব শুরু হয়েছে চারিদিকে। মহাকাশযান 'সোলার' ছুটে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। লক্ষ্য পৃথিবীর কক্ষপথ। সুদীর্ঘ অভিযান শেষ করে সোলার ঘরে ফিরে চলেছে।

অশোক চিরিমার নেভিগেশান প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। মুখ-চোখ ফ্যাকাশে। মহাকাশ-মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে ও। হঠাৎই ওর গোটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শরীরে কেমন একটা অস্বস্তি। বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছে।

ঠিক তখনই লম্বা-চওড়া চেহারার আর-একজন মানুষ নেভিগেশান রুমের খাটো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। অশোক চিরিমারের পিঠে আলতো থাপ্পড় মেরে হেসে বলল, 'যাক, শেষপর্যন্ত তাহলে বাড়ি ফেরা হচ্ছে! ওই কাঠখোট্টা রুক্ষ গ্রহে দু-মাস কাটিয়ে আমার মেজাজটাই কাঠখোট্টা হয়ে যাচ্ছিল।'

কথা বলতে-বলতে নেভিগেশান প্যানেলের টিভি-পরদায় চোখ রাখল ধনপত রাই। পরদায় একটা উজ্জ্বল লাল ফুটকি। পৃথিবী! সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে পুরু প্লাস্টিকের স্বচ্ছ আবরণ দেওয়া জানলার দিকে তাকাল ধনপত রাই। অন্ধকার মহাকাশে অসংখ্য তারার ফুটকি জ্বলছে।

'ঘরে ফেরার এত আনন্দ জানতাম না।' ধনপত রাই বলল। তারপর অশোকের পাশে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল, 'চিরিমার, তোমার আনন্দ হচ্ছে না?'

অশোক ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ধনপতের দিকে দেখলঃ 'আনন্দ হচ্ছে—তবে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে—।'

সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঝটকা মেরে উঠল অশোকের শরীর। চোখ বিস্ফারিত। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। ও ঝুঁকে পড়ল নেভিগেশান প্যানেলের ওপরে।

ধনপত রাই ওকে চেপে ধরল দু-হাতে। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'চিরিমার, কী হয়েছে! শরীর কেমন লাগছে?'

অতিকষ্টে ফিশফিশ করে জবাব দিল অশোক, 'রাই, শিগগির ডক্টর শ্রীবাস্তবকে খবর দাও। আমার বুকের ভেতরে খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শিগগির—।'

আবার ঝাঁকুনি খেল অশোকের দেহ। প্যানেলের ওপরে ওর হাতের বাঁধন শিথিল হল। অশোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল নেভিগেশান রুমের মেঝেতে।

ধনপত রাই তৎপর ভঙ্গিতে ওকে ধরতে চেষ্টা করল। চিত করে শুইয়ে দিল। জরুরি স্বরে বলল, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই, চিরিমার, এক্ষুনি ডক্টর শ্রীবাস্তবকে খবর দিচ্ছি।'

কিন্তু ততক্ষণে অশোক চিরিমারের দেহ যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। কাশির দমকে মুখ লাল, দম আটকে চোখজোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখের রং নীল। তীব্র আক্ষেপে শরীরটা ঝাঁকুনি খেতে-খেতে হঠাৎই স্থির হয়ে গেল। সব শেষ।

ধনপত রাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল নেভিগেশান প্যানেলের শেষ প্রান্তে। এক ঝটকায় তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। দ্রুত হাতে ডায়াল ঘুরিয়ে ব্যস্ত গলায় বলে উঠল, 'সোল কোল? নেভিগেশান রুম থেকে বলছি! শিগগিরই ডক্টর শ্রীবাস্তবকে এখানে পাঠিয়ে দিন। মনে হচ্ছে...।'

'কী মনে হচ্ছে?' ও-প্রান্ত থেকে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ভেসে এল।

'মনে হচ্ছে...' মেঝেতে পড়ে থাকা নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে ভয়ার্তভাবে একবার দেখল ধনপত রাই। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে নেভিগেশান রুম সুপারভাইজার অশোক চিরিমার এইমাত্র মারা গেছে।'

দুইঃ সন্দেহের সূত্রপাত

নিউম্যাটিক রিল্যাক্সার-এ আধশোয়া ভঙ্গিতে বসেছিলেন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব। পলিথিনের ব্যাগে বাতাস ঠেসে তৈরি বিচিত্র এই নিউম্যাটিক রিল্যাক্সার—আধুনিক আরামকেদারা। হেলান দিয়ে বসলেই চোখে ঘুমের আমেজ জড়িয়ে আসে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ডক্টর শ্রীবাস্তবের চোখে ঘুমের আমেজ নেই, বরং দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে আছে। সামনে পা ছড়িয়ে থমথমে মুখে তিনি তাকিয়ে আছেন অবজারভেশান পোর্টের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে বাইরের অন্ধকারের দিকে। অভিব্যক্তিহীন শূন্য দৃষ্টি। মাথার চুল এলোমেলো। ডান হাতের সরু-সরু আঙুলের ফাঁকে ধরা একগোছা কাগজ। সোলার মহাকাশযানে উপস্থিত একাশি জন অভিযাত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট। একটু আগেই কম্পিউটার রুম থেকে রিপোর্টগুলো তাঁর হাতে এসেছে। রিপোর্টগুলো দেখার পরই ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, একা লাগছে, আর ভয় করছে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার অগোছালো চুলে হাত চালিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর দশাসই লম্বা কাঠামো সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। শক্ত চোয়ালের ওপর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সরু গোঁফ। মাথার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে কপাল অনেকটা বড়। কপালে একটা নীল শিরা দপদপ করছে। দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ইশারা।

ডক্টর শ্রীবাস্তব ধীরে-ধীরে কথা বলেন, মার্জিত তাঁর আচরণ, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেন, সবসময় সকলের শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজখবর করেন, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ না হলেও তিনি পরিশ্রমী, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন। হয়তো এই কারণেই 'টিরা' গ্রহের দীর্ঘ অভিযানে বিশজন চিকিৎসকের মধ্যে থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্বজ্ঞানের জন্য সঙ্গী অভিযাত্রীরা তাঁকে ঠাট্টাও করে। বলে, 'ডক্টর, আপনি বড় বেশি ডাক্তারি করেন।'

ডক্টর শ্রীবাস্তব হেসে উড়িয়ে দেন সে-কথা। তিনি জানেন, এইসব গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাবধান হওয়াটা কত জরুরি। আর সাবধান ছিলেন বলেই না মেডিক্যাল রিপোর্টের মারাত্মক গরমিলটা তাঁর নজরে পড়েছে। এর আগে তিন-তিনটে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে মেডিক্যাল চেকআপে ঢিলেমির জন্যে পৃথিবীতে ফিরে আসা মহাকাশযানে গ্রহান্তরের মারাত্মক জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

টিরা গ্রহের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ বললে অনেক কমই বলা হয়। সৌরজগৎ থেকে ৮.২৬ আলোকবর্ষ দূরের তারা ম্যাক্সিমা সেন্টরি। আধুনিকতম মহাকাশযান সোলার হাইপারস্পেসের মধ্যে দিয়ে স্পেস জাম্প করে অনেক কম সময়ে অতিক্রম করেছে ৮.২৬ আলোকবর্ষের সুবিশাল দূরত্ব। পৃথিবীর অভিযাত্রী দল সেখানে পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দু-মাস সময় কাটিয়েছে। তন্নতন্ন করে অভিযান চালিয়েছে টিরা গ্রহের রুক্ষ জমিতে। কিন্তু সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছে। টিরা সম্পর্কে মানুষের এত আশা ছিল, এত উত্তেজনা ছিল, অথচ শেষপর্যন্ত নিট ফল হল শূন্য। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত শুধুই হতাশা। এই অভিযানের ফলাফলে কোনও কৃতিত্ব নেই, কোনও যশ নেই, কোনও আবিষ্কার নেই, কিচ্ছু নেই।

অন্তত একঘণ্টা পর্যন্ত ফলাফল সেইরকমই ছিল। কারণ তখনও মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো মোহন শ্রীবাস্তবের হাতে আসেনি, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। কিন্তু রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে স্টাডি করার পর অবয়বহীন বিকৃত এক আতঙ্ক জমাট বেঁধেছে ডক্টর শ্রীবাস্তবের মনে।

পায়চারি থামিয়ে বাইরে করিডরে এলেন। আঁধারি করিডরের শেষে ক্যাপ্টেন মিত্রের কেবিন। কেবিনের খাটো দরজার ওপরেই একটা ছোট্ট আলো জ্বলছে। ক্যাপ্টেন মিত্র ঘরেই আছেন তা হলে! দৃঢ় পায়ে সেদিকে এগোলেন ডক্টর। কলিংবেলে চাপ দিলেন। ক্যাপ্টেন কি বিশ্বাস করবেন

তাঁর কথা? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আর কোনও পথ খোলা নেই মোহন শ্রীবাস্তবের সামনে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন নীতীশ মিত্র ঘুরে তাকালেন। হেসে বললেন, 'আসুন ডক্টর, কী খবর বলুন—।'

মোহন শ্রীবাস্তব ক্যাপ্টেনের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনের পাশে একটা রিল্যাক্সার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'খবর খারাপ, ক্যাপ্টেন। একটা বিপদের আঁচ পেয়েছি আমি—।'

'বিপদ! কীসের বিপদ?' হালকা মেজাজে হাসলেন নীতীশ মিত্র, 'এই নিষ্ফলা অভিযানে বিপদটা আসবে কোত্থেকে?'

'তা জানি না, তবে এসেছে।' গম্ভীরভাবে বললেন শ্রীবাস্তব, 'আমাদের মহাকাশযানে একজন বিচিত্র মানুষ রয়েছে, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেন মিত্রের হালকা হাসি মিলিয়ে গেলঃ 'বিচিত্র মানুষ!'

'বিচিত্র শুধু নয়, অবিশ্বাস্য। মানুষটা দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, সুস্থ, জোয়ান—অথচ তার মরে যাওয়ার কথা।'

'মরে যাওয়ার কথা!' অবাক বিস্ময়ে ডক্টর শ্রীবাস্তবকে দেখলেন ক্যাপ্টেন, 'আপনি একজন ডাক্তার হয়ে এসব কী বলছেন!'

মেডিক্যাল রিপোর্টের কম্পিউটার আউটপুটগুলো ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিলেন মোহন শ্রীবাস্তবঃ 'এই মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো একবার দেখুন। আপনি তো জানেন, টিরা থেকে রওনা হওয়ার পরদিনই আমি প্রত্যেকের থরো মেডিক্যাল চেকআপের নির্দেশ দিয়েছিলাম। তাতে সোলার-এর একাশি জন যাত্রীর প্রত্যেককে মেডিক্যাল বোর্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছে—আপনি আমি কেউই বাদ যাইনি। কোনও অভিযান থেকে ফেরার পর এটাই সাধারণ নিয়ম—অভিযাত্রী দলের কেউ যে কোনও জীবাণু বা অন্য কিছু থেকে ইনফেক্টেড হয়নি সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যেই এত নিয়ম-কানুন।' একটু থেমে ডক্টর শ্রীবাস্তব যোগ করলেন, 'মেডিক্যাল চেকআপের যে-রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা ভারি অদ্ভুত—।'

ক্যাপ্টেন মিত্র একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল।

ডক্টর বলে চললেন, 'একাশি জনের মধ্যে আশি জনের কোনও গোলমাল নেই। তারা সসম্মানে পাশ করেছে পরীক্ষায়। কিন্তু একজন—' কথা থামিয়ে সেই বিশেষ রিপোর্টটি বের করলেন তিনিঃ 'এ-মানুটির সবকিছুই স্বাভাবিক—ব্লাড কাউন্ট, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, অ্যালবুমিন—গ্লোবিউলিন

রেশন, সবকিছু। কিন্তু ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে আমরা হোঁচট খেলাম—' সামনে পা ছড়িয়ে দিলেন ডক্টর। মেঝের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে নীতীশ মিত্রের চোখে সরাসরি চোখ রেখে বললেন, 'এই লোকটার বডিতে ব্লাড সুগারের কোনও নামগন্ধ নেই! ব্লাড সুগার জিরো।'

ক্যাপ্টেন মিত্রের মুখ কঠিন হল, চোখ বিস্ফারিত অবিশ্বাসেঃ 'কী বলছেন, ডক্টর! আমি ডাক্তার নই, তবে আমিও জানি যে ব্লাড সুগার ছাড়া কোনও মানুষ—।'

'বাঁচতে পারে না।' ক্যাপ্টেনের কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করলেন শ্রীবাস্তব। তারপর মাথা নাড়লেন সম্মতি জানিয়েঃ 'ঠিকই বলেছেন আপনি। তবে এখানেই শেষ নয়—আরও আছে। ব্লাড সুগারের কোনও হদিস না পেয়ে আমরা ব্লাড ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে দেখলাম। ক্রিয়েটিনিন তৈরি হয় শরীরের প্রোটিন ভেঙে। কিডনি এটাকে চটপট ছেঁকে বের করে দেয় রক্ত থেকে, আর ক্রিয়েটিনিন শরীর থেকে বেরিয়ে আসে ইউরিনের সঙ্গে। ক্রিয়েটিনিন ছেঁকে রক্ত থেকে বের করে না দিতে পারলে বিপদ নেমে আসে খুব তাড়াতাড়ি। একশো সিসি রক্তে সাধারণত ক্রিয়েটিনিন থাকে এক থেকে চার মিলিগ্রাম। এর পরিমাণ দশ মিলিগ্রামের ওপরে গেলেই রোগীর পক্ষে তা মারাত্মক। কখনও যদি এটা কুড়ি-পঁচিশের ওপরে চলে যায় তা হলে ডায়ালিসিস ছাড়া রোগীকে বাঁচানো অসম্ভব। ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু কুড়ি-পঁচিশের কাছাকাছি নিয়ে কোনও মানুষ সুস্থভাবে হাঁটা-চলা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকতেই পারে না। অথচ—' এক মুহূর্ত থামলেন মোহন শ্রীবাস্তব। কপালের কাল্পনিক ঘাম মুছলেনঃ 'পরীক্ষায় এই লোকটার ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু বেরিয়েছে একশো পঁয়তিরিশ!'

অপলকে ডক্টর শ্রীবাস্তবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন মিত্র। তারপর মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো নিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন। চুপচাপ সেগুলো উলটেপালটে দেখতে থাকলেন।

দেখা শেষ হলে অনেকটা আপনমনেই বললেন, 'স্যাম্পল নেওয়ার সময় যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে...অথবা ল্যাবরেটরির টেস্টে যদি কোনও বাজে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে...।' আচমকা মুখ তুলে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকালেন। বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, '...তা ছাড়া, কম্পিউটারও তো ক্যালকুলেশনে ভুল করতে পারে—মানে, প্রোগ্রামে যদি কোনও গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকে।'

মোহন শ্রীবাস্তব হেসে ফেললেনঃ 'ক্যাপ্টেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনার সন্দেহগুলো আপনার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকছে। তবুও বলি, না, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম কোনও গোলমাল হয়নি। আমার মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ওই বিচিত্র মানুষটির ব্লাড সুগার ও ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু পাওয়ার পর আমি তাকে

ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে হাসিমুখে ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির। সুস্থ-সবল চেহারা, অসুস্থতার ছায়া পর্যন্ত নেই। আমি আবার তার শরীর থেকে রক্ত নিলাম। তারপর অ্যানালিসিস করলাম আমি নিজেই। দ্বিতীয়বারে যে-রিপোর্ট পেলাম তাতে আবার দুশ্চিন্তা কমে না গিয়ে উলটে বেড়ে গেল। কারণ দ্বিতীয়বারের রক্ত একেবারে স্বাভাবিক—' হাত বাড়িয়ে একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব, 'এই যে, দু-বারের রিপোর্টই এতে আছে।'

ক্যাপ্টেনের আঙুল কেঁপে উঠল। অস্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, 'কোনও মানুষের রক্তের কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি এভাবে নিজে থেকে পালটে যেতে পারে—এরকম আচমকা?'

'না, পারে না। কাকতালীয়, দুর্ঘটনা, যা-ই বলুন না কেন, কোনওমতেই এটা সম্ভব নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। দু-বার রক্ত নেওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র কুড়ি ঘণ্টা। না, স্যাম্পল ওলটপালট হয়নি। কারণ প্রত্যেক স্যাম্পল-এর সঙ্গে ছিল নির্দিষ্ট নম্বর এবং যার স্যাম্পল তার আঙুলের ছাপ। আমরা সেগুলো চেক করে দেখেছি। একই লোকের শিরা থেকে দুটো ব্লাড স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে।'

টেবিলে রাখা ইন্টারকম টেলিফোন বেজে উঠল। নীতীশ মিত্র রিসিভার তুললেন। ও-প্রান্তের ধাতব স্বর ব্যস্তভাবে কী সব বলল। নীতীশ জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, এক্ষুনি যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঝটিতি ঘুরলেন ডক্টরের দিকেঃ 'ডক্টর শ্রীবাস্তব, নেভিগেশান রুমে আরও বড় বিপদ হয়েছে। সুপারভাইজার অশোক চিরিমার এইমাত্র মারা গেছে!'

তিনঃ ভয়ঙ্করের সূচনা

মানুষটার দেহে প্রাণ নেই।

মোহন শ্রীবাস্তব মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধনপত রাইয়ের বাহুতে হাত রেখে বললেন, 'ধনপত, তোমার কিছু করার ছিল না। তুমি ফোনে খবর দেওয়ার আগেই অশোক মারা গেছে।'

দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান ধনপতের চুল উসকোখুসকো, চোখ লালচে, ডানহাত মুঠো, করছে আর খুলছে। রুদ্ধস্বরে ধনপত বলল, 'আজ সকালবেলা ওকে দারুণ মেজাজে দেখেছি। সারাদিন ধরে আমার সঙ্গে কাজ করেছে, একটিবারের জন্যেও মনে হয়নি ও অসুস্থ। হঠাৎই কী করে যে এমনটা হল...!'

দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, ডক্টর?'

ইশারায় ধনপতকে নেভিগেশান রুমের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি। বললেন, 'অশোক চিরিমারের ব্লাড টেস্ট না করে আমি কিছু বলতে চাই না।'

দুজনেই চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। চোখে-চোখে অনেক কথাই যেন হয়ে গেল। অবশেষে ডাক্তারি ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করলেন শ্রীবাস্তব। অ্যালকোহল দিয়ে সিরিঞ্জ পরিষ্কার করে ঝুঁকে পড়লেন অশোকের মৃতদেহের ওপর।

ক্যাপ্টেন মিত্র দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। শ্রীবাস্তবের চোয়ালের রেখা কঠিন। সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ এঁকে দিয়েছে কেউ।

কাজ শেষ করে মোহন শ্রীবাস্তব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন 'ক্যাপ্টেন, দশ মিনিটের মধ্যে টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে আমি আপনার ঘরে হাজির হচ্ছি।'

দুজনেই বেরিয়ে এলেন নেভিগেশান রুমের বাইরে। ধনপত করিডরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'রাই, এখন থেকে তুমি হলে নেভিগেশান রুম সুপারভাইজার।'

'থ্যাঙ্ক য়ু, ক্যাপ্টেন।' ধনপত কাছে এগিয়ে এল।

'উইশ য়ু লাক।' একটু থেমে আবার বললেন নীতীশ, 'চিরিমারের বডিটা "সাব জিরো" রুমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তুমি একটু হেল্প কোরো।'

'ওকে ক্যাপ্টেন।' ধনপত রাই নেভিগেশান রুমে ঢুকে পড়ল।

আবছায়া করিডর ধরে ওঁরা দুজনে ফিরে চললেন। মোহন শ্রীবাস্তবের মুখে নতুন আশঙ্কার ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পনেরো মিনিট পরে ক্যাপ্টেনের ঘরে আশঙ্কা পরিণত হল আতঙ্কে।

'ব্লাড সুগার জিরো, ক্রিয়েটিনিন লেভেল একশো তিরিশের বেশি, আর এন পি এন একশো পঞ্চাশ!' অবসন্ন সুরে উচ্চারণ করলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব, 'অশোক চিরিমারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।'

'এন পি এন...' ক্যাপ্টেন একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

'নন-প্রোটিনাস নাইট্রোজেন। ক্রিয়েটিনিনের সঙ্গেই তৈরি হয়। নরমাল লেভেল প্রতি একশো সি সি রক্তে আট থেকে দশ মিলিগ্রাম। ক্রিয়েটিনিন বাড়লে এন পি এন-ও বাড়ে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এন পি এন-টাও চেক করেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না...।'

ডক্টরকে বাধা দিয়ে নীতীশ মিত্র বলে উঠলেন, 'তা হলে অশোক চিরিমারই সেই বিচিত্র মানুষ! কিন্তু আপনি না বললেন তার রক্ত আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে?'

শ্রীবাস্তব দু-হাতের আঙুলে জট পাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেটাই তো অবাক কাণ্ড, ক্যাপ্টেন! আমি যার কথা বলেছিলাম সে অশোক চিরিমার নয়।'

নীতীশ মিত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে অস্ফুটে বললেন, 'অশোক চিরিমার নয়!...তা হলে কে সে?'

'কমল সেনগুপ্ত। প্রেসার চেম্বারের মেইনটিনান্সে আছে। চিরিমারের রিপোর্ট এর আগে পুরোপুরি নরমাল ছিল।'

'ডক্টর, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমাদের স্টেরিলাইজেশানকে ফাঁকি দিয়ে কোনও জীবাণু হয়তো পৃথিবী থেকেই ঢুকে পড়েছে মহাকাশযানের ভেতরে—।'

'অসম্ভব! অবাস্তব!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন ডক্টর, রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেনঃ 'মহাকাশযান থেকে টিরার মাটিতে পা দেওয়ার আগে প্রত্যেকটি অভিযাত্রীর মেডিক্যাল চেকআপ করা হয়েছে। তখন কোনও গোলমাল ধরা পড়েনি। পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে টিরার মিল থাকায় কোনওরকম স্পেস স্যুট ছাড়াই আমাদের লোকজন টিরা গ্রহের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে। দু-মাস ধরে তারা নানা অভিযান চালিয়েছে। তারপর যখন তারা মহাকাশযানে ফিরে আসে তখন ডিসইনফেক্ট করার জন্য প্রত্যেককে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশানের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় সোলার-এর ভেতরে। তখন তো রোগজীবাণুর হদিস আমরা পাইনি! দু-মাসেও কারও কোনও রোগ হয়নি, অথচ এখন হঠাৎ—' ক্যাপ্টেনের খুব কাছে মুখ এনে শ্রীবাস্তব প্রশ্ন করলেন, 'এটাকে আপনার কি কোনও রোগ বলে মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন?'

নীতীশ সামান্য শিউরে উঠলেন। বাতানুকূল পরিবেশে তাঁর শীত-শীত করতে লাগল। তিনি চেষ্টা করে যুক্তি খুঁজে পেতে চাইলেনঃ 'ডক্টর—বহু স্পেসশিপকে আমি রোগের কবলে পড়তে দেখেছি। যেমন গত মাসে টাইটান উপগ্রহ থেকে যে স্পেসশিপটা ফিরে আসে তাতে প্লেগ-এর মারাত্মক জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। কোনও উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত মহাকাশযানটিকে জ্বালিয়ে দিতে হয়। ওই জীবাণু প্রতিটি যাত্রীর ফুসফুস অ্যাটাক করেছিল—এবং মাত্র ছ'ঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মহাকাশযানে। অতএব, আবারও ভেবে দেখুন, ডক্টর—।'

মোহন শ্রীবাস্তব কোনও কথাই শুনছিলেন না। চোখ বন্ধ করে রিল্যাক্সারে হেলান দিয়ে কী একটা বিষয় মনে করার চেষ্টা করছিলেন। খুব কাছাকাছি এসেও ব্যাপারটা তাঁর মনের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অশোক...অশোক চিরিমার..অশোক চিরিমার...মনে পড়েছে!

রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তব। লম্বা কাঠামো ঋজু করে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন দেওয়ালে আঁটা একটা ক্যাবিনেটের দিকে। মহাকাশযানের যাবতীয় মেডিক্যাল রিপোর্ট থাকে ক্যাপ্টেনের ঘরে, এই ক্যাবিনেটে।

'উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশান, ক্যাপ্টেন—' বলে ক্যাবিনেট খুললেন। নতুন-পুরোনো নানা কম্পিউটার প্রিন্টআউট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। কতকগুলো রিপোর্ট বেছে নিয়ে সেগুলো মিলিয়ে দেখলেন। বারবার চেক করলেন। তারপর থমথমে কালো মুখে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি জিতেছি, ক্যাপ্টেন—তবে না জিতলেই বোধহয় ভালো হতো...।'

নীতীশ মিত্র অবাক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন শ্রীবাস্তবের দিকে।

রিপোর্টগুলো আবার ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে রেখে মোহন শ্রীবাস্তব ক্যাপ্টেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'অশোক চিরিমার একবারের জন্যেও টিরার বুকে পা দেয়নি! গত দু-মাসের ওপর ও সোলারের সিক রুমে ছিল। টিরা থেকে রওনা হওয়ার দুদিন পরে ও সেরে ওঠে। গতকাল ওকে আমি লাস্ট ইঞ্জেকশান দিয়েছি। অর্থাৎ, যখন আমরা সবাই টিরার জমি চষে বেড়াচ্ছি তখন ও ছিল বিছানাবন্দি। ওর ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস হয়েছিল। একবারের জন্যেও অশোক চিরিমার মহাকাশযান ছেড়ে মাটিতে নামেনি।'

ক্যাপ্টেন মিত্রের চোখে-মুখে দিশেহারা উৎকণ্ঠা। পরাজিত কোণঠাসা মানুষের মতো নিরুপায় সুরে তিনি বললেন, 'এসবের কারণ কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, ডক্টর!'

রিল্যাক্সারে আবার বসলেন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, 'মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি। টিরা গ্রহের কোনও অদ্ভুত অজ্ঞাত প্রাণী আমাদের কয়েকজন অভিযাত্রীর দেহে ঢুকে পড়েছে!'

চারঃ অনুমান, আলোচনা, সিদ্ধান্ত

অতিকায় মহাকাশযান সোলার ছুটে চলেছে মহাশূন্যের শরীর ভেদ করে। পৃথিবীর হিসেবমতো চতুর্থ রাত শুরু হয়েছে। পঞ্চম দিনের শুরুতেই সোলার স্পেস জাম্প দেবে হাইপারস্পেসের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং মহাকাশযান পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ সাময়িকভাবে শেষ করে নীতিশ মিত্র এসেছেন শ্রীবাস্তবের কেবিনে।

দুজনের আলোচনা চলছিল। একসময় আলোচনায় ছেদ টেনে কফি তৈরি করতে উঠলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। কেবিনের একপাশে টেবিলে বসানো মাইক্রোওয়েভ কুকারে কফি তৈরি করে কাপে ঢাললেন। একটা কাপ এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের দিকে, অন্যটায় নিজে চুমুক দিলেন।

ক্যাপ্টেন মিত্র পায়চারি করছিলেন। কফির কাপ নিয়ে একটা রিল্যাক্সারে শরীর এলিয়ে বসলেন। তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ।

মোহন শ্রীবাস্তব নরম সুরে বললেন, 'কুল ডাউন, ক্যাপ্টেন, উত্তেজিত হবেন না।'

কফিতে চুমুক দিয়ে নীতীশ মিত্র জবাব দিলেন, 'উত্তেজিত না হয়ে উপায় কী! এই মহাকাশযানের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব আমার—আমি এই স্পেসশিপের ক্যাপ্টেন। এমনিতেই আমাদের টিরা অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দেশের মানুষের কোটি-কোটি টাকা খরচ করে শূন্য হাতে আমি ঘরে ফিরছি। টিরাতে কোনওরকম প্রাণের সন্ধান আমরা পাইনি, কোনও উদ্ভিদ সেখানে নেই, দামি খনিজ পদার্থের টিকিও দেখা যায়নি। তবুও আমরা প্রাণপণ খেটেছি। স্যাম্পল নিয়েছি পাথরের, মাটির, বাতাসের। ফটো তুলেছি, রিপোর্ট লিখেছি, তারপর কাগজপত্র গুটিয়ে রওনা হয়েছি বাড়ির দিকে। এ যেন পরীক্ষায় ফেল করে মার্কশিট হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার

মতো।...আর এখন, বাড়ি ফেরার পথে রওনা হওয়ার তিনদিন পর আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর কথাগুলো শোনালেন। টিরার অদ্ভুত অজ্ঞাত প্রাণী!' কফির কাপ টেবিলে নামিয়ে গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললেন, 'বিশ্বাস হতে চায় না, অথচ অশোক চিরিমার যে মারা গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই বিচিত্র মেডিক্যাল রিপোর্টগুলোকেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না!'

রিল্যাক্সার টেনে নিয়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি বসলেন ডক্টর শ্রীবাস্তবঃ 'ক্যাপ্টেন, একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। অশোক চিরিমার আর কমল সেনগুপ্তের শরীরে যে-অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেছে তা কোনও মানুষের শরীরে হওয়া অসম্ভব। আমাদের বডির মেটাবলিজ্‌ম্ নানান অবস্থার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু কতকগুলো জিনিস আছে যা হিউম্যান মেটাবলিজ্‌ম্-এর পক্ষে অসম্ভবঃ যেমন, জিরো ব্লাড সুগার, একশো তিরিশের ওপর ক্রিয়েটিনিন আর এন পি এন ভ্যালু, অথচ মানুষটা বেঁচে আছে!'

'হতে তো পারে টিরা গ্রহের কোনও-কোনও রোগজীবাণু—।'

'না, হতে পারে না!' এক ঝটকায় মোহন শ্রীবাস্তব সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কফি চলকে পড়ল তাঁর হাতে ধরা কাপ থেকেঃ 'কতবার একই কথা আপনাকে বলতে হবে, ক্যাপ্টেন? এটা নতুন কোনও রোগজীবাণুর ব্যাপার নয়, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা ঘটনা। হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেমে এ-ধরনের ঘটনা কোনওদিন ঘটতে পারে না, পারে না, পারে না!'

নীতীশ মিত্রের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কফির কাপ টেবিলে রেখে আবার রিল্যাক্সারে বসলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর হাত কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে কপালের নীল শিরা।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইলেন। তারপর ইতস্তত করে নীচু গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, 'টিরা গ্রহে কোনও প্রাণের সন্ধান তো আমরা পাইনি, ডক্টর।'

'না, পাইনি। আর কেন পাইনি তারও একটা ব্যাখ্যা আমি অনুমানে খাড়া করেছি।' ডক্টর শ্রীবাস্তব সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেনঃ 'টিরাকে আমরা যেরকম প্রাণহীন ভেবেছি সেরকম যদি না হয়, ক্যাপ্টেন? হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন পাগলের কল্পনা, কিন্তু তবুও ধরে নিন টিরা গ্রহে প্রাণ ছিল—চালাক, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল এবং শক্তিশালী প্রাণ। আমরা যখন টিরা গ্রহে নেমেছি তখন ওরা হয়তো তৈরি ছিল—হয়তো ওরা আগে থেকেই টের পেয়েছিল আমরা টিরায় ল্যান্ড করতে চলেছি। তারপর থেকে সর্বক্ষণ ওরা আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযান, খোঁজাখুঁজি যখন চলছিল তখন ওরা সবসময়েই ছিল আমাদের সঙ্গে, তবে অলক্ষ্যে, গোপনে। হয়তো ওরা আমাদের দেখা দিতে চায়নি, অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল ওদের। যদি এমন হয়, টিরার যেসব অংশে আমরা অভিযান চালিয়েছি সেগুলো আমাদের জন্যে আগেভাবেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। ওরাই তৈরি করে রেখেছিল যাতে আমরা কিছু দেখতে না

পাই, কিছু খুঁজে না পাই, কিছু জানতে না পারি টিরা সম্পর্কে, এবং ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে ফিরে যাই পৃথিবীতে—যেমন খালি হাতে আমরা রওনা হয়েছিলাম পৃথিবী থেকে।'

সামনে ঝুঁকে এলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। দু-হাত নেড়ে জোর দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেনঃ 'এবারে তর্কের খাতিরে ধরে নিন, টিরার প্রাণীদের আমাদের মতো নির্দিষ্ট কোনও চেহারা নেই। হয়তো ওরা নিছকই এক ধরনের জেলির মতো প্রোটোপ্লাজম—যে-কোনও ধরনের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হয়তো খুশিমতো ওরা যে-কোনও জিনিসকে নকল করতে পারে। এইরকম নকল কোনও চেহারা নিয়েই ওরা হয়তো আমাদেরই নাকের ডগায় বসে আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপের ওপরে নজর রাখছিল। কে বলতে পারে, ওরা হয়তো পাথর, বালি, কিংবা জল সেজে আমাদের দেখছিল। এমনকী—।'

'এমনকী মানুষের চেহারাও নিয়ে থাকতে পারে!' শ্রীবাস্তবের না-বলা কথাগুলোই উচ্চারণ করলেন ক্যাপ্টেন মিত্র। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখার বাইরে চলে গেছেন তিনি।

'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন।' ডক্টর শ্রীবাস্তব সমর্থন করলেন নীতীশ মিত্রকেঃ 'এবারে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে। মনে করুন, টিরার প্রাণীরা আমাদের গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চায়, আমাদের স্টাডি করে দেখতে চায়, পৃথিবীতে গিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চায় নিজেদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে—তা হলে বলুন, কী করে এসব কাজ ওদের পক্ষে সহজে করা সম্ভব?'

নীতীশ মিত্র নিশ্চুপ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের প্রশ্নের সুর শুনেই বোঝা যায় তার উত্তর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর মনে রয়েছে। অতএব দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে উত্তরটা তিনিই দিলেন।

'ক্যাপ্টেন, আমার অনুমান টিরার প্রাণীদের কেউ মানুষের চেহারা নিয়ে উঠে এসেছে আমাদের মহাকাশযানে। হয়তো টিরার পাথর-বালি ছড়ানো রুক্ষ প্রান্তরে ওরা খুন করেছে কমল সেনগুপ্তকে। তারপর তাকে নকল করে—চেহারায়, কথাবার্তায়, হাবভাবে, সবকিছুতে—ওদের একজন ঢুকে পড়েছে সোলারে। এই আশা নিয়ে ঢুকে পড়েছে যে, তাকে কমল সেনগুপ্ত মনে করে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে যাব। কিন্তু ধরুন, নকল করতে গিয়ে কোথাও যদি গরমিল হয়ে গিয়ে থাকে! মানছি, ওই বিচিত্র প্রাণী কমলের স্মৃতি পর্যন্ত চুরি করেছে, নইলে আপনাকে বা আমাকে নকল কমল চিনতে পারল কেমন করে! কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শরীরে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। অতএব সেই কারণেই নকল কমল জানতে পারেনি মানুষের রক্তের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন কীরকম হয়। আর সেখানেই তার পা ফেলতে ভুল হয়েছে। নিজের আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কমলকে নকল করতে প্রাণীটার সময় লেগেছে।

বাইরের খোলসটা হুবহু নকল করে সে তাড়াহুড়ো করে সোলারে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু তখন ভেতরটা পুরোপুরি বুঝে ওঠা হয়নি। সে পাগলের মতো তথ্য হাতড়ে চলেছে...দিশেহারা, বিভ্রান্ত...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেতরটা সঠিক নকল করা দরকার। ঠিক এইরকম বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার শরীর থেকে ব্লাড স্যাম্পল টানা হল। অতএব স্বাভাবিক কারণেই যে-'রক্ত' আমরা পেলাম তা ভুলভাল, গোলমেলে, অবাস্তব, অসম্ভব। প্রাণীটা কিন্তু বসে নেই। তার মন ও অনুভবের অদৃশ্য অ্যান্টেনা দিয়ে সে প্রতিমুহূর্তে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে সোলারের অন্যান্য অভিযাত্রীর কাছ থেকে, মহাকাশযানের নানান নথিপত্র থেকে—সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। এইভাবেই সে জানতে পারল মারাত্মক ভুলটা কোথায় হয়েছে। এও বুঝতে পারল ভুলটা মেডিক্যাল রিপোর্টে ধরা পড়েছে, এবং আমাদের চোখে পড়েছে। তখন আমাদের চোখে ধুলো দিতে, ভুল চাপা দিতে, সে খুন করল অশোক চিরিমারকে। তাকে নকল করল, তারপর মরে যাওয়ার ভান করল। ইচ্ছে করে রক্তে দেখিয়ে গেল 'কমল সেনগুপ্তের' মতো গোলমাল। এর কারণ, আমরা ভাবব কোনও রহস্যময় রোগের জীবাণু আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। আর বাড়ি ফেরার পথে সারাটা সময় এই রহস্যের সমাধান খুঁজে-খুঁজে হয়রান হবে আমাদের মস্তিষ্ক। কিন্তু কোনওমতেই সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে না। আমার এই ধারণা যদি সত্যি হয়, ক্যাপ্টেন?'

ক্যাপ্টেন মিত্র হাতে হাত ঘষলেন। মাথা নীচু করে গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, 'যদি তাই হয় তা হলে কমল সেনগুপ্ত কমল সেনগুপ্ত নয়! অশোক চিরিমার অশোক চিরিমার ছিল না!' আচমকা মুখ তুললেন তিনিঃ 'কিন্তু প্রমাণ কই, ডক্টর, প্রমাণ কই? কী করে নিঃসন্দেহ হব আমরা?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন।' কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, 'টিরার প্রাণীটি মানুষের দেহে ঢুকে পড়েছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চষে বেড়িয়েছে দেহের প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি কোষ, রাসায়নিক গঠন, অনুপাত, মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তার ছাপ। তারপর স-ব সে নকল করে ফেলেছে। এবং খুন করেছে মানুষটিকে। কমল সেনগুপ্তের রক্তাক্ত মৃতদেহ হয়তো পড়ে আছে টিরার কোনও খাদে। আর অশোক চিরিমারের মৃতদেহ সম্ভবত সোলারের ডিসপোজাল চেম্বার দিয়ে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে মহাশূন্যে। এখন এই নকল মানুষটা সব দিক দিয়েই আসল মানুষটির মতো—অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিখুঁত কপি করেছে ওরা। শুধু নকল দেহটার ভেতরে এককোণে রয়ে গেছে একটা শয়তান ভিনগ্রহের মন, শয়তানি মতলব নিয়ে শুধু ভাবছে...ওত পেতে রয়েছে।' শ্রীবাস্তব মাথার চুলে আঙুল চালালেন। হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'যত নিখুঁত নকলই ওরা করুক, ক্যাপ্টেন, হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেম এক বিচিত্র জিনিস—একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। সেইখানেই ফাঁদ পাতব আমি। তবে গোপনীয়তার খাতিরে আমার মতলবটা

এখনই আপনাকে খুলে বলতে পারছি না। কারণ, নিজেকে ছাড়া আমি এখন আর কাউকে বিশ্বাস করি না!'

দুজনে পরস্পরের চোখে চোখ রাখলেন। মোহন শ্রীবাস্তবকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে। ইঞ্জিনের চাপা গুনগুন শব্দ কেবিনের নিস্তব্ধতাকেও আরও প্রকট করে তুলেছে। ক্যাপ্টেন মিত্রের হাত ঘামছে। সোলারের একাশি জন মানুষ—নাকি ঊনআশি জন?...শুধু তাই নয়, টিরার ভয়ঙ্কর প্রাণী যদি একবার পৃথিবীতে পৌঁছোয় তা হলে গোটা মানবজাতির সর্বনাশ নেমে আসবে। ডক্টরকে সে-কথাই জিগ্যেস করলেন তিনি।

'প্রাণীটার উদ্দেশ্য কোনওরকমে একবার পৃথিবীতে পৌঁছোনো, তাই না?'

'হ্যাঁ—ভয়ঙ্কর মনে হলেও কথাটা সত্যি।'

'যদি আমরা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সোলারকে মহাশূন্যে উড়িয়ে দিই?' উত্তেজনায় দপদপ করছে নীতীশ মিত্রের মুখ।

'তাই দেব—যদি না ফাঁদ পেতে ধরতে পারি।'

'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই, ডক্টর—'।

'জানি। সোলারকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলে এতগুলো মানুষের প্রাণ যাবে, তা ছাড়া, ধুলো হয়ে যাবে কোটি-কোটি টাকার এই মহাকাশযান। সুতরাং শেষ চেষ্টা আমি করবই, ক্যাপ্টেন। এ পর্যন্ত এমন কোনও জালিয়াতি বা নকলের কথা আমি শুনিনি যা ধরা পড়েনি। সুতরাং টিরার প্রাণীকেও ধরা পড়তেই হবে। আমি হাতেনাতে প্রমাণ করে দেব যে-কমল সেনগুপ্ত আমাদের মহাকাশযানে এখন রয়েছে সে টিরার প্রাণী—একটা নকল পুতুল! এমন ফাঁদ পাতব যা আন্দাজ করা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর কল্পনার বাইরে।'

রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তবঃ 'খুব ঘুম পাচ্ছে, ক্যাপ্টেন। আপাতত গুড নাইট। একটা কথা, আমাদের আলোচনার ব্যাপারটা একটু গোপন থাকলে ভালো হয়—।'

শুভরাত্রি জানিয়ে নীতীশ মিত্র বেরিয়ে এলেন শ্রীবাস্তবের কেবিন থেকে। দুশ্চিন্তার ঢেউ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতরে। মাথা দপদপ করছে। তবুও কোথায় যেন একটা কৌতূহল খোঁচা মারছেঃ কী ফাঁদ পেতেছেন ডক্টর শ্রীবাস্তব? সেই ফাঁদে টিরা গ্রহের প্রাণী পা দেবে তো? কে জিতবে এই বুদ্ধির খেলায়?

পাঁচঃ হার-জিত

মানুষটা বাঙ্কে শুয়ে ছিল। নিশ্চল। ঘুমন্ত। তার মাথার ভিতরে, নিমীলিত দু-চোখের পিছনে অন্য একটা মন নড়ে উঠল—পিছল সরীসৃপের মতো। তারপর চিন্তা ও অনুভূতির অদৃশ্য অ্যান্টেনা ছড়িয়ে দিয়ে আর-একটা মনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। ভিনগ্রহী দুটো শয়তান মন কথা

বলতে লাগল। মহাকাশযানের দু-প্রান্তের দুটো কেবিনের মধ্যে যেন তৈরি হয়ে গেল অদৃশ্য টেলিফোন—যার অন্য নাম টেলিপ্যাথি। একটা মন নৃশংস, নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর অন্যজন ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা।

'আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমরা ধরা পড়ে গেছি। ডক্টর শ্রীবাস্তব আমাদের ধরে ফেলেছে...!'

'কক্ষনো না!' তীব্র স্বরে উত্তর দিল দ্বিতীয় মন।

'এখনও ফিরে যাওয়ার সময় রয়েছে! সোলার স্পেস জাম্প দেওয়ার পর আমরা অনেক দূরে চলে যাব। তখন আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকবে না।'

'ভীতু! বিশ্বাসঘাতক!' দ্বিতীয় মন রাগে গর্জে উঠল। সরীসৃপের মতো কিলবিল করে ফুঁসতে লাগলঃ 'এসব চিন্তা করার আগে তোমার মরে যাওয়া উচিত!'

'কিন্তু আমাকে সন্দেহ করছে যে!...ডক্টর আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। এত নিখুঁতভাবে নকল করেছি যে, কোথাও কোনও গরমিল নেই, অথচ...ডক্টর মনে-মনে কী মতলব ফেঁদেছে কে জানে...।'

ঘৃণা মেশানো শাসনের সুর ভেসে উঠল নীরব কণ্ঠেঃ 'ডক্টর শ্রীবাস্তব একটা গর্দভ, বুদ্ধু! ও কিছুতেই আমাদের ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু আমাকে যে কোণঠাসা করতে চাইছে!' আতঙ্ক আরও গাঢ় হয়েছে, তীব্র হয়েছে প্রথম মনে ঃ 'ডক্টরের মতলব আমি আঁচ করতে পারছি না। জানি না নকল করতে গিয়ে কোথাও কোনও ভুল করে ফেলেছি কি না—।'

মনঃসংযোগে শোনা গেল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসিঃ 'ডক্টর আমাকে সন্দেহ করে না—বরং বিশ্বাস করে। ভয় পেয়ো না। ডক্টর শ্রীবাস্তব একটা আস্ত বোকা। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা পৃথিবীতে নামবে। সেখানে এরকম কত তাজা মানুষ রয়েছে একবার ভাবো তো! সেখানে আমরা দিব্যি লুকিয়ে কাজ সারতে পারব—' নির্লজ্জ প্রত্যাশায় যেন লালা ঝরছে দ্বিতীয় মন থেকেঃ 'তারপর ওদের শেষ করে ওদেরই মহাকাশযান নিয়ে আমরা ফিরে আসব আমাদের দেশে। মহাকাশযান বোঝাই করে আর সবাইকে নিয়ে যাব পৃথিবীতে। ওঃ, তখন সেখানে হবে আমাদের নতুন বসতি...।' আনন্দে উল্লাসে টগবগ করে উঠল নীরব কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু ডক্টর...ওকে আমাদের খুন করতে হবে...।'

'না, না...তা হলে ওরা মহাকাশযান পৃথিবীতে নামাবে না। সবাই সন্দেহ করবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে ওরা মহাকাশযান উড়িয়ে দেবে মহাকাশে। তার চেয়ে বরং ডক্টরকে ওর খেলা খেলতে দাও। ভয় পেয়ো না একটুও।'

'কিন্তু টের পাচ্ছি, আমি কোণঠাসা হয়ে পড়ছি—কীভাবে তা বুঝতে পারছি না। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। এখনই। এখনও সময় আছে...।'

নিষ্ঠুর হাসির মধ্যে দিয়ে ঘৃণা ভরা নৃশংস মনটা যেন তার হাজারো অ্যান্টেনা দিয়ে উগ্র বিষ ঢেলে দিলঃ 'ভয় পেয়ো না। মনে রেখো, আমাদের একজন বেঁচে থাকলেই চলবে। তুমি...কিংবা আমি...।'

ক্যাপ্টেন নীতীশ মিত্রের কেবিনে ঢুকলেন মোহন শ্রীবাস্তব। ক্যাপ্টেন ফিরে তাকাতেই বলে উঠলেন, 'আমি জিতেছি, ক্যাপ্টেন। আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে নকল কমল সেনগুপ্ত। সে ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে।'

শ্রীবাস্তবের মুখে জয়ের হাসি। রিল্যাক্সারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। লাইটারটা হাতে নিয়ে খেলা করতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন মিত্র জয়ের খবরে তেমন যেন আশ্বস্ত হতে পারেননি। নীচু গলায় বললেন, 'ডক্টর, আপনার অনুমানই তা হলে সত্যি হল! আমি আর ভাবতে পারছি না। সবকিছু যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। কাল রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ঘুমোতে পারিনি। তা ছাড়া, আজ যতবারই কমলের মুখোমুখি হয়েছি ততবারই নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়েছে। ছেলেটা এত নিষ্পাপ, সরল—।'

ক্যাপ্টেনকে বাধা দিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'যে-কমল সেনগুপ্তকে আপনি দেখছেন সে ঘোর পাপী এবং কুটিল। প্রথম সুযোগেই সে আপনাকে আমাকে সবাইকে খতম করে দেবে। কিন্তু এখন আর তা হবে না। উলটে আমরাই তার ব্যবস্থা করব...।'

'কী প্রমাণ পেয়েছেন, ডক্টর?' অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে জিগ্যেস করলেন নীতীশ মিত্র।

পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। খাম থেকে বেরোল একটা ফিল্ম। সেটা আলোর দিকে ধরে একবার দেখলেন। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কমল সেনগুপ্তের পাকস্থলীর সনোগ্রাফিক ফিল্ম। সনিক জেনারেটার লাগিয়েছিলাম কেবিনের সিলিংয়ে, এবং ওর বাঙ্কের তলায় ফিল্ম প্লেটটা সেট করে অনেক কষ্টে লুকিয়ে এই ছবি তুলেছি। দেখুন—।'

ক্যাপ্টেন মিত্র ফিল্মটা দেখলেনঃ 'কীসের ছবি?'

'কাল রাতে কমল সেনগুপ্ত যা-যা খেয়েছিল তার ছবি।'

'কই, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না!' ক্যাপ্টেন অবাক হলেন।

শ্রীবাস্তব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেনঃ 'কমল আমার ফাঁদে পা দিয়েছে, তাই কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

ক্যাপ্টেন বিমূঢ় চোখে ডক্টরকে দেখতে লাগলেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

শ্রীবাস্তব হাসলেন। তারপর পকেট থেকে আর-একটা খাম বের করলেন। খাম থেকে বেরোল ছ'টা একই ধরনের ফিল্ম।

'ক্যাপ্টেন, কমলের ছবির সঙ্গে এই ছবিগুলো মিলিয়ে দেখুন। আমাদের মেডিক্যাল টিম বহু পরিশ্রমে গোপনে ছবিগুলো তুলেছে। অবশ্য আমি ছাড়া আর কেউ ছবি তোলার কারণ জানে না।' হাতের সিগারেটে গভীর টান দিলেন ডক্টর। ফিল্মগুলো রাখলেন ক্যাপ্টেনের ডেস্কের ওপরে। তারপর বললেন, 'ক্যাপ্টেন, কাল রাতে ক্রু-দের যে-খাবার দেওয়া হয়েছিল তাতে আমি গোপনে পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম—না, আপনার অনুমতি নিতে পারিনি—তার জন্যে আমি দুঃখিত। রাতের খাবার খেয়ে আজ সকলেই বদহজমের অভিযোগ করেছে—একমাত্র কমল সেনগুপ্ত ছাড়া। ওই ছ'টা ফিল্ম লক্ষ করলে দেখতে পাবেন স্টোনডাস্টের ছবি সনোগ্রাফে অত্যন্ত স্পষ্ট—যা কমলের ছবিতে নেই। অর্থাৎ, স্বাভাবিক কারণেই খাবারের সঙ্গে অজান্তে পাথরের গুঁড়ো খেয়ে ছ'জন অভিযাত্রী তা হজম করতে পারেনি। কিন্তু নকল কমল জানত না পাথরের গুঁড়ো তার হজম করা উচিত কি অনুচিত। আসল কমলের মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে এ-বিষয়ে কোনও খবর সে জানতে পারেনি—আর জানা সম্ভবও ছিল না। এ-খবর একমাত্র দিতে পারত হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেম—যার আচার-আচরণ টিরার অতিচালাক প্রাণীর পক্ষেও হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। অতএব পাথর হজম করে নকল কমল নিজেকে এক্সপোজ করে দিয়েছে! আর তার লুকোনোর পথ নেই!'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হাসলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। লাইটার জ্বেলে নতুন একটা সিগারেট ধরালেনঃ 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম ক্যাপ্টেন, এ-পর্যন্ত এমন কোনও জালিয়াতি বা নকলের কথা আমি শুনিনি যা ধরা পড়েনি। দরকার শুধু সময়...।'

ক্যাপ্টেন মিত্র একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখলেন। তারপর ডক্টরের হাত থেকে লাইটারটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'খবরদার!' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলেন মোহন শ্রীবাস্তবঃ 'ছোঁবেন না আমাকে!'

ডক্টরের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করলেন নীতিশ মিত্রঃ 'আমি লাইটারটা নিতে যাচ্ছিলাম, ডক্টর।'

সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন শ্রীবাস্তব। লজ্জিতভাবে লাইটারটা এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের ডেস্কে। বললেন, 'সরি, ক্যাপ্টেন, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। সবাইকেই আমি ভয় করতে শুরু করেছি। সবসময় টিরার প্রাণীর দুঃস্বপ্ন দেখছি। ওদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি। সবটাই

হয়তো বোকামি, কিন্তু আমি সাবধান থাকতে চাই, ক্যাপ্টেন...' ছোট্ট করে হাসলেন শ্রীবাস্তবঃ 'এখন চলুন, নকল কমলের একটা ব্যবস্থা করি।'

'কী ব্যবস্থা?' সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা ডক্টরের তালুর ওপর ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ডক্টর শ্রীবাস্তব সেটা লুফে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। তারপর ফিল্মগুলো খামে ভরে নিয়ে রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেনও উঠে দাঁড়ালেন তাঁর সঙ্গে রওনা হওয়ার জন্য।

শ্রীবাস্তবের চোয়াল শক্ত হল। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'চরম ব্যবস্থা। চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন...।'

ওঁরা দুজনে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেনের কেবিন ছেড়ে। করিডর ধরে এগোতে-এগোতে মোহন শ্রীবাস্তব বললেন, 'একটু আগে আমি কমলকে স্টারবোর্ডের দিকে স্পেস লকটা পরিষ্কার করতে বলে এসেছি। ও যদি স্পেস লকের মধ্যে থাকে তা হলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।'

ক্যাপ্টেন মিত্র কোনও কথা বললেন না। তিনি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন, কিন্তু ডক্টর শ্রীবাস্তবের র‍্যাঙ্ক তাঁর সমান। তা ছাড়া, মহাকাশযান ও অভিযাত্রীদের রোগজীবাণুমুক্ত রাখতে ডক্টর শ্রীবাস্তব যা ভালো বোঝেন করতে পারেন—ক্যাপ্টেনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। একই কারণে তিনি হুকুম চালাতে পারেন ক্রু-র ওপরে। গত এক দশকে রোগজীবাণুর জন্য বিভিন্ন মহাকাশ-অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। সেই কারণেই আজকাল যে-কোনও অভিযানে চিফ মেডিক্যাল ম্যান ক্যাপ্টেনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ—হয়তো বা তার চেয়েও বেশি। তবে নীতিশ মিত্র এটুকু আশা করেন, শ্রীবাস্তব যা করবেন তা বুঝে-শুনে দায়িত্ব নিয়েই করবেন।

মোহন শ্রীবাস্তব নিজের বোকামির কথা ভাবছিলেন। কমল সেনগুপ্ত ছাড়াও যে অন্য কেউ টিরার প্রাণী হতে পারে এই সন্দেহের কথা ওভাবে প্রকাশ করাটা ঠিক হয়নি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ব্যাপারটা যদি পাঁচকান হয় তা হলেই বিপদ! নিজের সন্দেহের কথা এই মুহূর্তে তিনি কাউকে জানাতে চান না।

স্টারবোর্ডের স্পেস লকের সামনে করিডরে অফিসার অংশুমান যাদবের সঙ্গে দেখা হল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর যাদবকে বললেন, 'নেভিগেশান রুমে গিয়ে ধনপত রাইকে বলো স্পেস জাম্পের জন্যে তৈরি হতে। আমরা একটু পরে আসছি—।'

যাদবকে সরিয়ে দিয়ে দুজন এগিয়ে গেলেন স্পেস লকের দরজার সামনে। ভারী ধাতব দরজা। দরজার ওপরের অংশে পুরু প্লাস্টিকের স্বচ্ছ প্যানেল বসানো। প্রেসার চেম্বারের ভেতরে কমল

সেনগুপ্ত কাজ করছে। একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করছে। নিখুঁত একজন মানুষ—চেহারা, চালচলন, সব।

হঠাৎই ক্ষিপ্র চিতার মতো দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শ্রীবাস্তব। এক ঝটকায় লক আটকে বেরোনোর পথ বন্ধ করে দিলেন। তারপর দরজার পাশেই একটা প্যানেলের লাল বোতামে চাপ দিলেন। চেম্বারের ভেতরে লাল আলো জ্বলে উঠল। মৃদু গুঞ্জন তুলে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্প কাজ শুরু করল। প্রেসার চেম্বারের বাতাস ক্রমশ বেরিয়ে যেতে লাগল।

লাল আলো দেখে কমল চমকে উঠল, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ছেড়ে ছুটে এল দরজার কাছে। আতঙ্কে চোখ বেরিয়ে আসছে, মুখে বিমূঢ় বিস্ময়।

'ডক্টর!' ও চিৎকার করে উঠল। ভারী দরজা ভেদ করে ওর ক্ষীণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ 'ডক্টর, শিগগির সবুজ বোতামটা টিপে দিন! দেখছেন না, আমার গায়ে প্রেসার স্যুট নেই!'

ক্যাপ্টেন মিত্রের ঠোঁট চিরে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে তিনি ডক্টরকে দেখছেন। কোনওরকমে বললেন, 'কী করছেন আপনি! ছেলেটা যে মরে যাবে!'

'ছেলেটা নয়, টিরার প্রাণী!' গম্ভীর গলায় শ্রীবাস্তব উত্তর দিলেন, 'আমাদের মতো ওরাও বায়ুমণ্ডলে অভ্যস্ত। অতএব বায়ুশূন্য অবস্থায় বাঁচতে পারবে না। চুপচাপ শুধু দেখে যান।' ডক্টরের চোখ প্লাস্টিক প্যানেলের ওপরে নিবদ্ধ।

কমল সেনগুপ্ত অন্ধ আতঙ্কে কাঁপছে। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল আবার, 'ডক্টর! ক্যাপ্টেন! সবুজ বোতামটা টিপে দিন, প্লিজ! ডক্টর, শিগগির করুন! নইলে আমি মরে যাব—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—।'

পাগল-করা রাগে, উত্তেজনায়, হতাশায়, কমল ঘুসি মারতে লাগল ধাতব দরজায়, প্লাস্টিক প্যানেলের ওপরে। ওর হাত ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। স্বচ্ছ প্যানেল লালে মাখামাখি হয়ে গেল। তারপর লাল থেকে ধীরে-ধীরে পালটে যেতে লাগল বিচিত্র বেগুনি রঙে।

কমল নিজের গলা আঁকড়ে ধরল, হাঁটুগেড়ে পড়ে গেল মেঝেতে। প্রেসার গেজ-এর কাঁটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে শূন্যের দিকে। কমল ছটফট করছে আহত সরীসৃপের মতো, কাশির দমকে কেঁপে উঠছে ওর শরীর।

হঠাৎই ওর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। শেষ আক্ষেপে মোচড় খেল ওর দেহ। তারপরই সব স্থির। নিস্পন্দ।

এবং কমল সেনগুপ্তের দেহে পরিবর্তন শুরু হল। আকৃতি পালটে যেতে লাগল ধীরে-ধীরে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবয়ব গলে-গলে মিশে যেতে লাগল—হাত-পা, চুল—অবশেষে রয়ে গেল

শুধু একতাল বেগুনি জেলি। যেন এক অতিকায় অ্যামিবা। তিরতির কাঁপন জাগছিল জেলির স্তরে। আচমকা সেটাও থেমে গেল। প্রাণের সব স্পন্দন শেষ।

প্যানেল থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নাড়লেন ডক্টর। অবসাদ ভরা শরীরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এই আমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ক্যাপ্টেন। আমি ভুল করিনি।'

ক্যাপ্টেন মিত্র কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই এক লহমায় টানটান হয়ে দাঁড়ালেন মোহন শ্রীবাস্তবঃ 'ক্যাপ্টেন, একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে! অশোক চিরিমার মরেছে, কিন্তু তার ভেতরের বেগুনি জেলি মরেনি! নকল কমল সেনগুপ্তেরই একটা অংশ তৈরি করেছিল নকল চিরিমার। সে মরে যাওয়ার ভান করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। আমি এক্ষুনি গিয়ে সাব জিরো রুম লক করে সিল করে দিয়ে আসছি। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে "মৃত" চিরিমারকে পরীক্ষা করে দেখব। আর এই প্রেসার চেম্বারটা আপনি সিল করে দিন। কেউ যেন এটা না খোলে। দেখি, ওদিকে আবার কোনও বিপদ হল কি না!'

শ্রীবাস্তব ক্ষিপ্র পায়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলেন। ঘটনাচক্রে অথবা দুর্ঘটনায় কোনও অভিযাত্রী মারা গেলে তার মৃতদেহ অক্ষত রাখার জন্যেই সাব জিরো রুমের ব্যবস্থা। কপাল ভালো বলতে হবে, এখন সেখানে একমাত্র অশোক চিরিমারের 'মৃতদেহ' রয়েছে। তার হাতে সোলারের অন্য কেউ আক্রান্ত হয়েছে কি না কে জানে! আবার কাউকে খুন করে শয়তানটা তাকে নকল করেনি তো! না, এখানে আর পরীক্ষা চালানোর সময় নেই। সামনেই বিপজ্জনক স্পেস জাম্প। অতএব যা করার পৃথিবীতে ফিরেই করতে হবে।

ছুটতে-ছুটতে সাব জিরো রুমে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর। দরজা বন্ধ। আশপাশে কেউ নেই। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুললেন। বরফ-ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় তাঁর চোখ-মুখ যেন জমে গেল। ঘরের মধ্যে সাদা ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ছে। ধাতব দেওয়াল, ধাতুর বাঙ্ক, সব—সব জায়গাতেই চাপচাপ বরফের স্তর জমে আছে। একটা বাঙ্কে নিশ্চল শুয়ে আছে মৃত অশোক চিরিমার। হাতে মুখে তুষারের কণা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মোহন শ্রীবাস্তব। দরজা বন্ধ করে লক করে দিলেন। কাউকে ডেকে সিল করার ব্যবস্থা করতে হবে এখুনি।

দরজা সিল করে কেবিনে ফিরে যেতে-যেতে তাঁর মনে হল, সাব জিরো রুমের ওই হিমশীতল তাপমাত্রায় টিরার প্রাণী কি আর বেঁচে আছে? স্পন্দনের ইশারা কি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে ওই বেগুনি জেলিতে?

পৃথিবীতে ফিরে গিয়েই সব প্রশ্নের উত্তর তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করবেন তিনি।

ছয়ঃ শত্রুর মুখোমুখি

পরদায় পৃথিবীকে বিশাল দেখাচ্ছে। সবুজ, উজ্জ্বল, প্রক্সিমা সেন্টরির দিকে যাত্রা শুরুর সময় যেরকম দেখা গিয়েছিল। স্পেস জাম্পের পরীক্ষায় নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়েছে সোলার। এখন তার গতি কমে আসছে। পৃথিবীর কক্ষপথে কয়েকবার পাক দেওয়ার পর নির্দিষ্ট 'ব্যালিস্টিক পাথ' ধরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে সোলার। অভিযাত্রীরা যার-যার নির্ধারিত জায়গায় তৈরি। মহাকাশযান নামার সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রত্যেকটি কর্মীকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে করতে হবে। সেখানে চুলচেরা ভুল হওয়ার উপায় নেই। সুতরাং প্রত্যেকেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

ছায়া-অন্ধকার করিডর ধরে মহাকাশযানের পিছনের অংশে এগিয়ে চলেছেন মোহন শ্রীবাস্তব। সঙ্গে সনোগ্রাফের ফিল্ম সমেত খাম দুটো। ক্যাপ্টেন মিত্রকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে এসেছেন যে, বিপদ কেটে গেছে। টিরার প্রাণী মৃত। একজন মারা গেছে বায়ুশূন্যতায়, অন্যজন হিম তাপমাত্রায়। অতএব সোলার এখন বিপদমুক্ত।

কিন্তু সবটাই শ্রীবাস্তব ভুল বুঝিয়েছেন। গালগল্প প্রচার বন্ধ করার জন্যই তাঁকে ক্যাপ্টেনের কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছে। এখন তিনি লাইফবোট রকেটে চড়ে একা রওনা হয়ে যাবেন পৃথিবীর দিকে। পৌঁছোবেন সোলারের আগে। ফিল্মগুলো কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেবেন সোলার-এর প্রতিটি যাত্রীকে যাচাই করার জন্য। বিপজ্জনক মহাকাশযানে নীতীশ মিত্রকে রেখে যেতে তাঁর খারাপ লাগছে, কিন্তু কোনও উপায় নেই। অন্যান্য যাত্রীর মতো ক্যাপ্টেনকেও তিনি সন্দেহ করেন। কে বলতে পারে, টিরার রুক্ষ ভূমি থেকে একজন, দুজন, না তিনজন—ক'জন ছদ্মবেশী প্রাণী উঠে এসেছিল সোলারে!

লাইফবোট রুমে মোট ন'টা রকেট ছিল। টর্চের আলোয় আটটা রকেটের ইগনিশান সার্কিট শর্ট করে দিলেন শ্রীবাস্তব। এগুলো ঠিক করতে এখন কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। অতএব পৃথিবীতে সবাইকে নামতে হবে সোলারে বন্দি হয়েই। তারপর...।

ন'নম্বর রকেটটা সোলারের আশ্রয় ছেড়ে গা ভাসাল মহাকাশে। সাবলীল গতিতে নেমে চলল উষ্ণ সবুজ পৃথিবীর দিকে।

টিরার প্রাণীরা অজেয় নয়। ডক্টর শ্রীবাস্তব ভাবলেন। ওদের একজনকে তিনি বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছেন, ফাঁদে ফেলেছেন, শেষ করেছেন। অতএব চেষ্টা করলে বাকিগুলোকেও পারবেন। শুধু দরকার সাহস, আর আত্মবিশ্বাস। মৃত্যুর সময় নকল কমল সেনগুপ্তের চোখে-মুখে পাগল করা রাগ ফুটে উঠেছিল। চরম ঘৃণায় টলটল করছিল চোখের দৃষ্টি। টিরার প্রাণী কমলের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখছিল। ফুঁসছিল রাগে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব শিউরে উঠলেন। কমল সেনগুপ্তের বেলায় ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল। কিন্তু এবারে?

একঘণ্টার মধ্যেই ক্যালকাটা কসমোড্রোমে ল্যান্ড করল শ্রীবাস্তবের লাইফবোট রকেট। তারপরই ব্যস্ত কথাবার্তা, উত্তেজনা, ছুটোছুটি, সনোগ্রাফ পরীক্ষা, সংশয় আতঙ্ক। একটা ম্যাগনেটিক কারে চড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল ধরে শব্দের গতিতে রওনা হয়ে গেলেন মোহন শ্রীবাস্তব। লক্ষ্যঃ কসমোড্রোম সিকিওরিটি ব্যুরো।

আকাশের দিকে রুপোলি নাক উঁচিয়ে বিশাল মহাকাশযান সোলার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন অপরূপ এক অতিকায় পাখি ডানা মেলার মুহূর্তে ছবি হয়ে গেছে। মনে-মনে সোলারের গঠনের তারিফ করলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর অটোমেটিক এলিভেটরে চড়ে সোলারের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে সবুজ য়ুনিফর্ম পরা চারজন কসমোড্রোম সিকিওরিটি পুলিশ। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে আলট্রাসনিক-শকার। টিগারে চাপ দিলেই লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসবে অদৃশ্য আলট্রাসনিক শক্তির ফোয়ারা। শব্দোত্তর তরঙ্গের জোয়ারে অদৃশ্য শত্রু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। বেশিক্ষণ ব্যবহার করলে তার করুণ মৃত্যুও ঘটবে।

ধাতব শব্দের আর্তনাদ তুলে ওপরে, আরও ওপরে, উঠতে লাগল এলিভেটর। এক সময় এসে থামল সোলারের প্রধান দরজার সামনে। সেখানে দুজন সিকিওরিটি অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডক্টরকে দেখেই তাঁদের একজন বললেন, ‘সবাই নেমে গেছে, ডক্টর শ্রীবাস্তব। আপনার কথা মতোই সকলকে সিকিওরিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে সোল ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—।’

‘থ্যাংক য়ু, অফিসার।’ নির্বিঘ্নে কাজ শেষ হওয়ার তৃপ্তি পেলেন মোহন শ্রীবাস্তব।

সিকিওরিটি কমান্ডার তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছেন। কমান্ডারই আদেশ দিয়েছেন সোলারের প্রতিটি যাত্রীকে সিকিওরিটি ফোর্স দিয়ে সোল ক্লিনিকে নিয়ে যেতে। অবশ্যই ডক্টর শ্রীবাস্তবের পরামর্শে। ক্লিনিকে প্রত্যেককে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে জেরবার করে ছাড়বেন শ্রীবাস্তব। একের পর এক নতুন-নতুন ফাঁদ পাতবেন। সময় লাগবে, ধৈর্যও লাগবে। তবে টিরার একটি প্রাণীও রেহাই পাবে না।

হঠাৎ কী মনে হতে মোহন শ্রীবাস্তব অফিসারকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, ‘স্পেসশিপ থেকে নামার সময় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের ফটো আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখা হয়েছে?...আর একটা বডি ছিল...।’

‘হ্যাঁ, ডক্টর। আমরা লিস্ট মিলিয়ে নিয়েছি। কোনও গরমিল হয়নি। অশোক চিরিমারের ডেডবডি আমরা সাবধানে নামিয়েছি। তারপর পাঠিয়ে দিয়েছি ক্লিনিকে। আপনার কথামতো বডিটা আমরা চেক করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনওরকম ডিফেক্ট পাইনি। তখন স্টেরিলাইজ্‌ড ব্যাগে ভরে নামিয়ে নিয়েছি।’

যাক, নিশ্চিন্ত। হাতে হাত ঘষলেন শ্রীবাস্তব। মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আরও বেশি শীত করছে। এখানে হাওয়ার দাপট অনেক বেশি। নীচে শুয়ে থাকা কলকাতাকে লিলিপুট-শহরের মতো দেখাচ্ছে। সোল ক্লিনিকে ফিরে গিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্ট শুরু করার জন্য তাঁর মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু, না। এখনও সামান্য একটু কাজ বাকি রয়েছে। স্টারবোর্ড স্পেস লক থেকে সংগ্রহ করতে হবে বেগুনি জেলির পিণ্ডটা—এতক্ষণে ওটা হয়তো শুকিয়ে এসেছে। তা ছাড়া কেবিন থেকে নিতে হবে কিছু নোটস, কয়েকটা রিপোর্ট। শুধু নোটস আর রিপোর্টের কথাই অফিসারকে বললেন তিনি। একজন সিকিওরিটি পুলিশের হাত থেকে একটা আলট্রাসনিক-শকার চেয়ে নিয়ে অফিসার দুজনকে বললেন, 'আপনারা অ্যালার্ট থাকুন। আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখবেন, আর-কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে। কেউ না!'

'ওকে, ডক্টর!' একসঙ্গে বলে উঠলেন দুজন অফিসার। কমান্ডারের নির্দেশ, ডক্টর শ্রীবাস্তবের কথা অক্ষরে-অক্ষরে শুনতে হবে। এত কাণ্ডকারখানার কী কারণ তা তাঁরা কেউই জানেন না।

শকার হাতে নিয়ে সোলারে ঢুকলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর চোখে ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই—যতক্ষণ না পৃথিবীকে বাঁচাতে পারছেন টিরার ভয়ানক শত্রুর হাত থেকে।

পিছনে প্রধান দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই করিডর আবছায়া অন্ধকার হয়ে গেল। অতিকায় মহাকাশযানে নিজেকে ভীষণ একা মনে হল ডক্টর শ্রীবাস্তবের। ইঞ্জিনের সেই চেনা গুঞ্জন নেই, নেই অভিযাত্রীদের কর্মব্যস্ততা। সব শান্ত, চুপচাপ, শূন্য।

করিডরে বাঁক নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চললেন তিনি। তাঁর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ধাতব দেওয়াল থেকে দেওয়ালে।

হঠাৎই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন প্রতিধ্বনি থেকে যেন শব্দের ধাঁধা তৈরি হচ্ছে। আর-একটা শব্দ কানে এল না! তাঁর পায়ের শব্দ নয়। একটু অন্যরকম। ডক্টর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। উৎকর্ণ। প্রতিটি স্নায়ু টান-টান। শকার যে-কোনওরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি।

ওই আবার! অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করলেন ডক্টর। সব আলো কি বিকল হয়ে গেছে? কবরখানার নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছে চারিদিকে। কপালে জন্ম নিচ্ছে নোনা ঘামের বিন্দু। এবারে স্পষ্ট শোনা গেল শব্দটা। পায়ের শব্দ! ভেসে এল করিডরের অন্য প্রান্ত থেকে।

সোলারে মোহন শ্রীবাস্তব একা নন! আরও কেউ রয়েছে...লুকিয়ে...গোপনে...।

কী ভীষণ বোকামি করেছেন তিনি! মহাকাশযানে একা ঢুকে পড়া তাঁর উচিত হয়নি। তিনি ছাড়া আরও একজন রয়েছে ভেতরে। তাঁর শত্রু! কিন্তু কে? সবাই তো নেমে গেছে সিকিওরিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে! তা হলে?

আলট্রাসনিক-শকার চারপাশে ঘুরিয়ে সতর্ক চোখে সব জরিপ করলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর মন তখন ব্যস্তভাবে একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

সোলারে এমন কেউ রয়েছে যে কমল সেনগুপ্তের পুরো ঘটনাটা জানে। সে জানে ভিনগ্রহের প্রাণী ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছে সোলারে। জানে, কেন মহাকাশযানের সব যাত্রীকে পাহারা দিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইজন্যই সে ভয়ে নামেনি সোলার থেকে—ধরা পড়ার ভয়ে। সে জানে ডক্টর শ্রীবাস্তবের সন্দেহের কথা।

এত সব জানে শুধু দুজন। একজন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব নিজে, আর দ্বিতীয় জন...।

'ক্যাপ্টেন মিত্র।' চিৎকার করে উঠলেন শ্রীবাস্তব, 'চালাকি করে কোনও লাভ নেই! পালাবার কোনও পথ নেই তোমার! সব আমি ফাঁস করে দিয়েছি। একজন ক্যাপ্টেন মিত্র আগেই নেমে গেছে সোলার থেকে। মহাকাশযানের চারিদিকে কড়া পাহারা। মাছি গলার জো নেই। তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ নকল নীতীশ মিত্র!'

বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে বিদ্রূপের কলরোল তুলে একসময় মিলিয়ে গেল কথার স্বনন। সব চুপচাপ। শত্রুর তরফ থেকে কোনও জবাব নেই। মোহন শ্রীবাস্তবের শরীর কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড ছুটে চলেছে পাগলা ঘোড়ার মতো উদ্দাম বেগে। একটা ভয় হঠাৎই তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলেন। ফিরে চললেন প্রধান দরজার দিকে।

দরজার কাছে পৌঁছেই শরীর হিম হয়ে গেল। দরজা ভেতর থেকে লক করা, এবং লকের চাবি উধাও। চেঁচিয়ে বা শব্দ করে কোনও লাভ নেই। বাইরে থেকে কেউ দরজা খুলতে পারবে না। যদি দরজা কাটতে হয়, তা হলে তো ঘণ্টাদুয়েকের ব্যাপার! ততক্ষণে...।

শ্রীবাস্তবের গলা বুজে আসতে চাইল ক্ষোভে, হতাশায়। অসহায় কান্না দলা পাকাতে লাগল বুকের ভেতরে। কী মারাত্মক ভুল করেছেন তিনি! একেবারে ভুলে গেছেন টিরার একজন অনায়াসে দুজন মানুষকে নকল করতে পারে। যেমন, একজন নকল করেছিল অশোক চিরিমার ও কমল সেনগুপ্তকে। বাকি অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মহাকাশযান থেকে নেমে গেছেন, তবে তাঁরই একটা অংশ থেকে গেছে সোলারের ভেতরে। এখনও যার চেহারা নীতীশ মিত্রের মতো। সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কীসের জন্য?

যতক্ষণ পর্যন্ত টিরার প্রাণী মহাকাশযানে বন্দি ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসহায়। এখন সে হয়তো মাথা খুঁড়ে মরছে কী করে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরোনো যায়। নৃশংস নিষ্ঠুর ভিনগ্রহীর মনে কোনও দয়া নেই, মায়া নেই। ডক্টরকে বাগে পেলেই সে শেষ করে দেবে। সুতরাং শ্রীবাস্তবই আগে খুঁজে বের করবেন তাকে।

সন্তর্পণে পা ফেলে ছায়া-ছায়া করিডর ধরে আবার এগিয়ে চললেন মোহন শ্রীবাস্তব। শব্দটা আবার শুনতে পেলেন তিনিঃ ওপরের ডেক থেকে আসছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে চলেছে সামনে। দ্রুতগতিতে বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় করিডর ধরে নিঃশব্দে ছুটলেন ডক্টর—যেদিকে চলেছে ওপরতলার পায়ের শব্দ সেদিকে।

খাড়া ধাতব সিঁড়ির কাছে পৌঁছে মোহন শ্রীবাস্তব হাঁফাতে লাগলেন। ওপরে একটা কেবিনের দরজা খুলল, বন্ধ হল। ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকেছে নকল নীতীশ মিত্র। ওপরের করিডর ছাড়া ওই কেবিন থেকে বেরোনোর দ্বিতীয় পথ নেই। শত্রুকে ফাঁদে পাওয়া গেছে। সুতরাং ধীরে-ধীরে চুপিসাড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন শ্রীবাস্তব। উঁকি মেরে দেখলেন। ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ছোট ফোঁকর দিয়ে লম্বা শরীরটাকে তৎপরভাবে ওপরের করিডরে তুলে ফেললেন ডক্টর। তারপর শকার উঁচিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে তৈরি হলেন।

'বেরিয়ে এসো, নীতীশ!' গর্জন করে উঠলেন তিনি, 'তোমার বাঁচার কোনও পথ নেই! স্পেসশিপটা ওরা তুলোধোনা করে খুঁজবে। দরকার হলে সোলারকে ওরা জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে—তোমাকে সমেত। এখনও বেরিয়ে এসো বলছি।'

কোনও শব্দ নেই। কোনও উত্তর নেই। দরজার পাল্লায় এক জোরালো লাথি বসিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব। পাল্লা খুলে গেল ভেতরে। কেবিন ফাঁকা! সেখানে কেউ নেই।

বিমূঢ় ভাবটা কেটে ওঠার আগেই একটা জোরালো আঘাত আছড়ে পড়ল শ্রীবাস্তবের হাতে। প্রতিটি স্নায়ু যেন চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়। শকার ছিটকে পড়ল যন্ত্রণাবিদ্ধ অসাড় হাত থেকে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষ হল। ঠনঠন। একটা ভারী শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডক্টরের ওপরে। কিন্তু আহত হলেও সহজাত ক্ষিপ্রতায় পলকে সরে গেলেন ডক্টর। দেখলেন নীতীশ মিত্রের দেহটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠলেন শ্রীবাস্তব। লাফিয়ে পড়লেন ছিটকে পড়া শকার লক্ষ করেঃ 'তোমার রেহাই নেই, নকল ক্যাপ্টেন! পাহারাদারদের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না!'

একটা ঠান্ডা হাসি ভেসে এল শত্রুর দিক থেকে। স্ফটিকের পাহাড় ঝুরঝুর করে খসে পড়ার মতো আলতো সেই হাসি। সরীসৃপের হাসি। তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাসি। এবং একটা ভারী ধাতব পিণ্ড ছুটে গেল ডক্টরকে লক্ষ্য করে। তখন তাঁর হাত সবে ঠিকরে পড়া শকারটা ছুঁয়েছে। ভারী ধাতুর আঘাতে ডানহাতের তালুর হাড়গোড় যেন গুঁড়ো হয়ে গেল। লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেল ডান বাহু বরাবর। মস্তিষ্কে পৌঁছে বৈদ্যুতিক শক অচেতন করে দিতে চাইল শ্রীবাস্তবকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এক রক্ত-হিম-করা দৃশ্য ডক্টরের চেতনাকে ঝাঁকুনি দিল প্রাণপণে।

কারণ, নীতীশ মিত্রের অবয়ব তখন ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছে অন্য এক চেহারায়। শ্রীবাস্তবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নীতীশ মিত্রের কাঠামো আরও লম্বা হল, চোয়াল শক্ত হয়ে ফুটে উঠল সরু গোঁফ, মাথার সামনের চুল অদৃশ্য হয়ে কপাল বিস্তৃত হল, সেখানে দপদপ করছে নীল শিরা। একটা জেলির তাল যেন নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করল নতুন মানুষ।

ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব!

মেঝেতে পড়ে থাকা শ্রীবাস্তব দেখলেন অবিকল তাঁরই চেহারার একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে হাসছে। টিরার ভয়ঙ্কর প্রাণীর দাবা খেলার শেষ চাল। আসল ডক্টরকে খুন করে নকল ডক্টর শ্রীবাস্তব নিরাপদে নির্বিঘ্নে নেমে যাবে মহাকাশযান থেকে। কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। সে সোল ক্লিনিকে গিয়ে আসল মানুষগুলোকে খতম করে মুক্তি দেবে নকল মানুষগুলোকে। তারা বুকভরা হিংসা ও লালসা নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। তারপর...।

নকল মানুষটা তখন দু-হাতে তুলে নিয়েছে ইস্পাতের তৈরি অস্বাভাবিক ভারী একটা কোল-বক্স। কয়েক মুহূর্ত...তারপরই সব শেষ হয়ে যাবে...প্রাণপণ শক্তিতে শরীরটাকে দু-পাক গড়িয়ে শকারের কাছে এগিয়ে গেলেন মোহন শ্রীবাস্তব। সুস্থ বাঁ-হাতে কোনওরকমে তুলে নিলেন আলট্রাসনিক-শকার। ভারী কোল-বক্সটা ছুটে আসছে তাঁর দেহ লক্ষ্য করে। ঝাঁকুনি দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে যন্ত্রণায় চোখ বুজে শকারের ট্রিগার টিপলেন ডক্টর। হাই এনার্জি আলট্রাসনিক ওয়েভ ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ল শত্রুকে লক্ষ্য করে। ঝনঝন শব্দে কোল-বক্স দেওয়ালে আছড়ে পড়ল। একটা মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল শত্রুর ঠোঁট চিরে। কেঁপে-কেঁপে প্রতিধ্বনি তুলে সেটা মিলিয়ে গেল সোলারের গহ্বরে-কন্দরে।

নকল শ্রীবাস্তবের দেহটা আবার নমনীয় হয়ে গেল। মেঝেতে আছড়ে পড়ল সশব্দে। অবয়বহীন হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল বেগুনি জেলির তাল। তখনও কাঁপছে তিরতির করে। কমল সেনগুপ্তের মতো।

শকারটা ফেলে দিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন মোহন শ্রীবাস্তব। হাতমুখ ঘাম ও রক্তে মাখামাখি। শরীর ক্লান্ত, দুর্বল। কিন্তু আত্মবিশ্বাস এখন যেন শতগুণ বেড়ে গেছে। সামান্য খোঁজ করতেই দরজার লকের চাবিটা দেখতে পেলেন তিনি। জেলির পিণ্ড থেকে কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিলেন। ধাতব চাবিতে এখনও এক অদ্ভুত উত্তাপ।

করিডর ধরে রওনা হওয়ার আগে আলট্রাসনিক-শকার থেকে জেলি লক্ষ্য করে আর-একবার ফায়ার করলেন শ্রীবাস্তব। জেলির কাঁপন স্থির হয়ে গেল। সব শেষ!

চোয়াল শক্ত করে সোলারের প্রধান দরজার দিকে এগোলেন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব। মনে-মনে উচ্চারণ করলেনঃ সোল ক্লিনিকে টিরার প্রাণী যদি কেউ থেকে থাকো তা হলে মরবার জন্যে তৈরি

হও। ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব তোমাদের খতম করতে আসছে।



ইনস্পেক্টর রনি ও অলৌকিক সার্কাস

সার্কাসের বাঘের খেলা থেকেই যত গোলমালের শুরু।

সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। একাই। কিন্তু সার্কাস দেখতে আমার এখন আর ভালো লাগে না। কারণ, সার্কাস দেখতে গেলে মনে পড়ে যায় আমার মেয়ে টুসির কথা। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকবার সার্কাস দেখেছি। ও বাঘ-সিংহের খেলা দেখতে ভালোবাসত। লাল-নীল-সবুজ রঙের ম্যাকাও পাখির কেরামতি দেখে ছোট-ছোট হাতে খুব হাততালি দিত। কতই বা বয়েস ছিল তখন ওর—বড় জোর আট। এখন যদি ও আমার পাশে থাকত তা হলে বয়েসটা আরও দু-বছর বেশি হতো।

বাঘের খেলা দেখাচ্ছিল রিং-মাস্টার। পরনে সোনালি রঙের পোশাক, হাতে বৈদ্যুতিক চাবুক। তাকে ঘিরে ন'টা হিংস্র ডোরা-কাটা বাঘ ভিজে বেড়ালের মতো বসে আছে। দেখে কে বলবে, এদের থাবার এক ঘায়ে এরকম আড়াইজন রিং-মাস্টার খতম হয়ে যেতে পারে!

সার্কাসটা একটু নতুনরকমের। বাঘের খেলা বা সিংহের খেলা দেখানোর সময়ে এরা কোনওরকম লোহার রেলিং ব্যবহার করে না। তার বদলে কাজে লাগায় অদৃশ্য ফোর্স ফিল্ড। সেটা পেরিয়ে জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ, কেউই দর্শকদের নাগাল পাবে না। এ ছাড়া, দর্শকদের সুবিধের জন্যে প্রায় দোতলা-সমান উঁচুতে টাঙানো রয়েছে চার-চারটে বিশাল মাপের লিকুইড ক্রিস্টাল টিভি পরদা। তাতে বাঘ আর রিং-মাস্টারের মুখের ক্লোজ আপ ছবি দেখা যাচ্ছিল।

আমার ঠিক পাশেই বসেছিল বছর পাঁচেকের একটা বাচ্চা মেয়ে। গায়ের রং কালো, তবে মুখখানা ভারী মিষ্টি। মাথা-ভরতি কোঁকড়া চুল। তাতে আবার লাল ফিতে বাঁধা। পরনে গোলাপি রঙের ফ্রক। সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা পুতুল।

বাচ্চা মেয়েটা হাত-পা নেড়ে ফুরফুর করে কথার খই ফোটাচ্ছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বাবা-মাকে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছিল। প্রশ্নের বিষয়ও যথারীতি বহুমুখী। যেমন, বাঘের লেজ

কেন রাস্তার কুকুরের মতো গোল পাকিয়ে থাকে না, বাঘ যদি সিংহের মতো দেখতে হতো তাহলে কী হতো, ডোরা-কাটা বাঘা বেড়ালের সঙ্গে বাঘের সত্যি-সত্যিই কোনও আত্মীয়তা আছে কি না, ইত্যাদি।

মেয়েটার বাবা শেষ পর্যন্ত আর না পেরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক মেয়ে দেখেছেন! কোথায় মন দিয়ে বাঘ দেখবে, তা না, খালি উদ্ভট সব প্রশ্ন—।'

আমি হাসলাম। মুখের পেশিতে সামান্য টান লাগল। একটা স্বাভাবিক জবাব দেওয়া দরকার। ভদ্রলোক যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন আমার বুকের ভেতরে রয়েছে একটা মাইক্রোপ্রসেসর চিপ, আর মস্তিষ্কের খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে অর্ধপরিবাহী স্মৃতিকোষ।

তাই অনেকক্ষণ সময় নিয়ে তারপর জবাব দিলাম, 'তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি! কী নাম তোমার?'

মেয়েটা চটপট বলে উঠল, 'আমার নাম শর্বরী। শর্বরী মানে রাত্রি—।'

ওর জবাব দেওয়ার ঢং দেখে আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম। ঠিক তখনই জোরালো সুরে বাজনা বেজে উঠল, আর সেটা ছাপিয়ে শোনা গেল বাঘের গর্জন।

সাধারণ সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর সময় কোনওরকম মিউজিক বাজানো হয় না। কিন্তু এই সার্কাসের সবই একটু অন্যরকম।

আমি শর্বরীকে বললাম, 'তুমি এক-দুই গুনতে পারো?'

ও ঝটিতি ছোট্ট মাথাটাকে কাত করে, প্রায় কাঁধে ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—।'

'তা হলে তুমি বাঘ গুনতে থাকো—।'

টুসিকে শান্ত করার জন্যে এই কৌশলটা মাঝে-মাঝে কাজে লাগাতাম আমি।

আমার কথায় শর্বরী ছোট্ট হাতের তর্জনী উঁচিয়ে 'এক-দুই' করে বাঘ গুনতে শুরু করল।

শর্বরীর মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'আপনি একাই সার্কাস দেখতে এসেছেন?'

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ—।'

এই অপরিচিত মানুষ দুজনকে কী করে আমি বলি, আমার আর কেউ নেই! টুসিকে নিয়ে শেষ যখন সার্কাস দেখতে এসেছিলাম তখন সঙ্গে সুনন্দা ছিল। এই শর্বরীর মতো টুসিও এসেছিল ওর মা-বাবার সঙ্গে। তারপর হল সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা। আমাকে নিয়ে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। শেষপর্যন্ত মানুষ জিতল বটে, তবে টুসি আর সুনন্দা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রোবট গবেষণায় তাক লাগিয়ে-দেওয়া এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার আমাকে নতুন জীবন দিলেন। ব্যাটারি, তার, মাইক্রোপ্রসেসর, আই সি চিপ, ধাতুর পাত এইসব কেমন করে যেন ঢুকিয়ে দিলেন আমার শরীরের নানা জায়গায়। সেইসঙ্গে কীসব জটিল প্রোগ্রাম চালু করে দিয়েছিলেন। ব্যস!

লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অপারেশন ডিভিশনের ইনস্পেক্টর রনি সরকার নতুন জীবন ফিরে পেল। কিন্তু কী অদ্ভুত আমার এই নতুন জীবন! থেমে যাওয়া জীবনকে আবার প্রাণের জোগান দিল ইলেকট্রনিক্স, আর বিশ্বকর্মা ডক্টর মজুমদার—আমার ঈশ্বর, আমার জীবনদাতা। প্রতি মাসে আমি একবার করে ওঁর কাছে যাই, রুটিন চেক আপের জন্যে।

আমার পুরোনো স্মৃতির প্রায় সবটুকুই মুছে গিয়েছিল, কিন্তু ধীরে-ধীরে সেগুলো ফিরে পাচ্ছি। টুসি আর সুনন্দার খোঁজ এখনও করিনি। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, 'এখনও সময় হয়নি—তুমি এখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যন্ত্র, আর পঞ্চাশ ভাগ মানুষ। তোমার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আরও সময় লাগবে। সেই সময়টা যাতে কম লাগে তার জন্যে তোমাকে স্বাভাবিক সব কাজকর্ম করতে হবে। আগের জীবনে যা যা করতে সেইসব কাজ করবে—।'

ডক্টর মজুমদারের পরামর্শেই আমার আজ সার্কাস দেখতে আসা। অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়েছি বিশ্রামের জন্যে। আজ তার দ্বিতীয় দিন।

শর্বরীর বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে তখনও আমাকে দেখছিলেন। শর্বরীর মাও আড়চোখে দেখছেন আমাকে। আমি একটু অস্বস্তি পেলাম। কারণ আমার অভিব্যক্তিগুলো এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ওঁরা সেটা ধরে ফেলেননি তো! তা ছাড়া, আমার গলার স্বরে সামান্য মেটালিক আওয়াজ থেকে গেছে। ফলে ওঁদের সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

কিছু একটা ভেবে বলতে যাব, তার আগেই শর্বরী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি বাঘ গুনতে পারব না। একবার আটটা হচ্ছে, একবার ন'টা হচ্ছে—।'

আমি এবার একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, 'বাচ্চা মেয়ে তো, ভালো করে গুনতে শেখোনি।'

আমার কথায় শর্বরী একেবারে চোখ গোল-গোল করে চেঁচিয়ে উঠল, 'না, আমি হানড্রেড পর্যন্ত কাউন্ট করতে জানি। বিশ্বাস না হয়—।'

তখনই বিশ্বাস হল আমার। দেখলাম, রিং-মাস্টার আটটা বাঘ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। অথচ একটু আগেই ন'টা বাঘ ছিল—আমি নিজে দেখেছি। আমার শরীরের ভেতরে রাখা ডিজিটাল কাউন্টারে সেই সংখ্যাটা ধরাও পড়েছিল। কিন্তু এখন আটটা। এটা কি ডক্টর মজুমদার বিশ্বাস করবেন? নাকি আমার প্রোগ্রাম বা সার্কিটের গোলমাল বলে ধরে নেবেন?

'দেখেছেন, ওই বাঘটা মাপে কীরকম বড়!' একটা বাঘের দিকে আঙুল তুলে মন্তব্য করলেন শর্বরীর বাবা। চোখের চশমাটা একবার নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে বসালেন।

বাঘটাকে আমিও দেখলাম। সত্যিই মাপে বেশ বড়। আর গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলোও যেন একটু অন্যরকম। আর একইসঙ্গে লক্ষ করলাম, বাঘের সংখ্যা এখন আবার নয়।

শর্বরীর বাবা-মা দুজনেই এটা লক্ষ করেছিলেন। চারপাশে তাকিয়ে বুঝলাম, আরও কয়েকজন যে ব্যাপারটা খেয়াল করেননি তা নয়। আর আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে রিং-মাস্টারের অসহায় হতভম্ব অভিব্যক্তি স্পষ্ট ধরা পড়ল। চার পাশে আলোর ফোয়ারা, বাজনার ছন্দ, টিভি-পরদায় বাঘের ছবি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। দেখলাম, সার্কাস-কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট গ্যালারিতে বেশ ভিড়। দু-একজন কর্তাব্যক্তি আঙুল তুলে এরিনার দিকে দেখাচ্ছেন। বাঘের গোলমালটা ওঁদেরও নজরে পড়েছে।

কী করব ভেবে ওঠার আগেই সেই প্রকাণ্ড বাঘটা হঠাৎই ফোর্স ফিল্ডের অদৃশ্য দেওয়াল লক্ষ করে লাফ দিল। সাধারণভাবে ফোর্স ফিল্ডে বাধা পেয়ে বাঘটার থেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছুই হল না। ওটা দিব্যি এসে পড়ল দর্শকদের এলাকায়।

আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হইচই।

চিৎকার-চেঁচামেচি-ছুটোছুটি। মাইকে বারবার ঘোষণা করা হতে লাগল, 'আপনারা শান্ত হন। বাইরে যাওয়ার সবক'টা দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তাকর্মীরা কাজে নেমে পড়েছে...।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! চেয়ার উলটে পড়ল, গ্যালারি ভেঙে পড়ল। আর বেপরোয়া ছুটোছুটি চলতেই থাকল। অথচ বাঘটাকে তখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

বাইরে যাওয়ার আটটা দরজাই দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা। সেখান দিয়ে বাঘটা যে বেরিয়ে যাবে তার কোনও উপায় নেই। আর রিং-মাস্টারের কাছে চুপচাপ বসে আছে আটটা ডোরা-কাটা পশু।

শর্বরীর বাবা-মা ভয়ে চিৎকার করছিলেন। বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কোথা দিয়ে পালাবেন বুঝতে পারছিলেন না। আমি শর্বরীকে কোলে তুলে নিলাম। মেয়েটা পালকের মতো হালকা। মাকে কাঁদতে দেখে ওরও মুখ কাঁদো-কাঁদো। ওকে কোলে নিয়ে এগোতে এগোতে বললাম, 'আপনারা আমার পেছনে-পেছনে আসুন—।'

সবুজ ইউনিফর্ম পরা নিরাপত্তাকর্মীর দল তখন তাঁবুর চারপাশটা ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শকার। ওরা হন্যে হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাঘটাকে খুঁজছে। আর বেয়াদব দর্শকদের শাসন করছে। কিন্তু বাঘের কোনও দেখা নেই। কোথায় গেল অত বড় জন্তুটা?

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছিলাম। আর একইসঙ্গে চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা দেখছিলাম। ছুটোছুটি-ধাক্কাধাক্কি-হইচই যেমন চলছিল তেমনই চলছে। রিং-মাস্টার আটটা বাঘ নিয়ে চলে যাচ্ছে এরিনা ছেড়ে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে অবিরাম। নিরাপত্তাকর্মীরা দিশেহারা দর্শকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

স্বাভাবিক কারণেই দর্শকের ভিড় দরজার কাছেই বেশি। আমি সেদিকে না গিয়ে দুটো দরজার মাঝ-বরাবর একটা ফাঁকা জায়গা লক্ষ করে এগোলাম। শর্বরীর বাবা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এখান দিয়ে কী করে বেরোবেন?'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা বা সময় কোনওটাই ছিল না। টের পেলাম, শর্বরীর মা আমার শার্টের পিঠের দিকটা খামচে ধরে আছেন।

সার্কাসের গোটা এলাকাটা প্লাইউড আর টিন দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে সুন্দর গোলাপি রঙের আস্তর থাকায় সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। বোঝা গেল দেওয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দেওয়ার পর।

শর্বরীকে ডানহাতে সামলে রেখে আমি প্রথম ঘুসিটা মেরেছিলাম বাঁ-হাতে। তাতেই বেশ বড়সড়ো একটা গর্ত হয়ে ফেটে গেল প্লাইউডের দেওয়াল। তার ওপাশের টিনও গেল তুবড়ে। কিন্তু এখান দিয়ে বেরোতে গেলে ভাঙতে হবে অনেকটাই, আর হাতেও খুব বেশি সময় নেই। তাই শর্বরীকে ওর মায়ের কোলে দিয়ে পরের ঘুসিটা মারলাম ডান হাতে। আর তারপরই ডানপায়ের দুটো জোরালো লাথি।

বেশ জোরে শব্দ হল। প্লাইউডের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে ওপাশের একটা টিন ভেঙে পড়ে গেল। শর্বরীদের ডেকে নিয়ে বেরোতে যাব, কোথা থেকে একজন নিরাপত্তাকর্মী ছুটে এল আমাদের সামনে। আমার দিকে শকার উঁচিয়ে বলল, 'ফ্রিজ! আপনাকে আমার সঙ্গে অফিসে আসতে হবে। আপনি কোম্পানির প্রপার্টি ড্যামেজ করেছেন—।'

আমি জামার বুকপকেট থেকে ম্যাগনেটিক আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে লোকটির দিকে উঁচিয়ে ধরলাম। কার্ডে আমার হলোগ্রাফিক ফটো রয়েছে। রয়েছে পরিচয়।

কার্ডটা ওর চোখের সামনে নেড়ে বললাম, 'ইনস্পেক্টর রনি সরকার অপারেশন ডিভিশন, লালবাজার! সরি অফিসার, এখন আপনার সঙ্গে যাওয়ার সময় নেই—পরে এসে কথা বলব—।' কার্ডটা আবার রেখে দিলাম পকেটে।

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটা শকার ফায়ার করতে যাচ্ছিল, তাই আমি বাঁ-হাতের তর্জনী শক্ত করে ওর কপালের ঠিক মাঝখানে এক টোকা মারলাম। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল। জানা কথা—হবেই। কারণ আমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো ইস্পাতের রড দিয়ে তৈরি। লোকটা কাত হয়ে পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে টাল সামলে নিল। আর একই সঙ্গে শকারটা মুগুরের মতো ঘুরিয়ে চালিয়ে দিল আমার মুখ লক্ষ্য করে। আমি আড়াআড়িভাবে বাঁ-হাত তুলে সেটা রুখে দিলাম। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হল। আর সংঘর্ষের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লোকটার হাতে গিয়ে পৌঁছোল। ও শকার ছেড়ে দিয়ে হাত ঝাঁকাতে লাগল। অবাক হয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

শর্বরী ততক্ষণে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আর দেওয়ালের ফোকর দিয়ে লোকজন বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। আমি নিরাপত্তাকর্মীর গাল টিপে ধরলাম বাঁ-হাতের দু-আঙুলে। ওর চোখ দেখে বুঝলাম, দু-গালে লোহা টের পেতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বললাম, 'এই দেওয়াল ভাঙা নিয়ে আমরা পরে কখনও কথা বলব, অফিসার। আমার নামটা মনে আছে তো! রনি সরকার, অপারেশন ডিভিশন, লালবাজার—।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে আমি দেওয়ালের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তাতে ফাঁকটা বোধহয় আরও খানিকটা বড় হয়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, শর্বরীরা আমার ঠিক পিছনেই আছে। ওদের পিছনে অন্যান্য লোকজনের ভিড়।

বাইরের খোলা মাঠে বেরোতেই ঠান্ডা বাতাস টের পেলাম। আমার শরীরের টেম্পারেচার সেন্সরগুলো ঠিকমতো কাজ করছে তা হলে! মাঝে-মাঝে ওগুলো গোলমাল করে। ওপরে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার আকাশে লালচে মেঘ জমেছে। দূরে হয়তো কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। শর্বরীর বাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'টালা পার্কের দরজার কাছে আমাদের গাড়ি রয়েছে—।'

আমি বললাম, 'আপনারা জলদি চলে যান। শর্বরীকে সামলে রাখবেন।'

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। তাঁর চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা। একটা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিলেন আমার বুকপকেটে। বললেন, 'একদিন সময় করে এলে সত্যি খুব খুশি হব।'

শর্বরীর মা ছোট্ট করে 'আসি' বললেন। ওঁর কাঁধে এলিয়ে-থাকা শর্বরী কচি গলায় বলল, 'টা টা, আঙ্কল—।'

আমি হাত নাড়লাম। ওঁরা একরকম ছুটে চলে গেলেন।

সার্কাস এলাকার বাইরেটা খোলা মাঠ। তার একটা পাশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাকা রাস্তায়। সার্কাস থেকে বেরিয়ে সেই ঢাল বেয়ে মানুষের ভিড় ছুটে চলেছে রাস্তার দিকে। সার্কাসে ঢোকার সময়ে দেখেছিলাম, বাইরেটায় ঘুগনি, ফুচকা, ভেলপুরি, গ্যাস বেলুন এসব বিক্রি হচ্ছে। এখন সেসব চোখে পড়ার উপায় নেই। শুধু দেখি তিনটে লাল-হলদে গ্যাস বেলুন সুতো-ছেঁড়া অবস্থায় ভেসে যাচ্ছে আকাশে।

আমি নীচের রাস্তায় নেমে এসে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালাম।

এদিকটা অন্ধকার। সার্কাস এলাকার হ্যালোজেন বাতির আলো এতদূর এসে পৌঁছোতে পারেনি। পেছনের পকেট থেকে মিনি সেলুলার ফোন বের করে অপারেশন ডিভিশনে যোগাযোগ করলাম। বললাম, 'টালা পার্কের কাছে "রকেট সার্কাস"-এ একটা ঝামেলা হয়েছে।'

ওপাশে ফোন ধরেছিলেন সার্জেন্ট রমাতোষ নন্দী। ভদ্রলোকের বুদ্ধি কম, তবে পরিশ্রম দিয়ে সেটা পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আর বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হলেও দেখায় পঁয়ষট্টির মতো।

নন্দী জিগ্যেস করলেন, 'সরকার, আপনি ওখানে কী করছিলেন?'

সত্যি কথাটাই বললাম, 'সার্কাস দেখছিলাম।'

কয়েক সেকেন্ড ওপাশে হাসির ফোয়ারা ছুটল। শুধু রমাতোষ নন্দী কেন, হেড কোয়ার্টারের প্রায় সকলেই জানে আমার সঙ্গে সার্কাস দেখার মতো কেউ নেই। আসল রনি সরকারের ছিল। রনির সেই পুরোনো জীবনের সঙ্গে নতুন জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা এখন আমাকে বলতে গেলে মানুষ বলেই মনে করে না। কিন্তু সম্পর্ক যে সত্যি একটা আছে সেটা মানি শুধু আমি আর ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার।

অনেকক্ষণ পর নন্দী বললেন, 'আপনি তো এখন ছুটিতে রয়েছেন—।'

'আমি এই মুহূর্তে লিভ ক্যান্সেল করছি। আপনি বসকে জানিয়ে দেবেন। আর এখানে জলদি কাউকে পাঠান। দুজন হলে কাজের সুবিধে হয়। আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।'

নন্দী কী একটা অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি টেলিফোনের সুইচ অফ করে দিয়েছি।

পরের টেলিফোনটা করলাম আর জি কর হাসপাতালে। ফোন করে 'রকেট সার্কাস'-এর গোলমালের কথা বলতেই ওরা বলল, একটু আগেই খবর পেয়েছে। এক্ষুনি ওরা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছে।

ফোনটা অফ করে পকেটে রেখে 'রকেট সার্কাস'-এর দিকে তাকালাম। বিশাল উঁচু তাঁবু। তাকে ঘিরে নানা রঙের আলোর নকশা। সার্কাসের কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস খেলার মডেলও তৈরি করা হয়েছে আলো দিয়ে। আর তার সঙ্গে তার মন-মাতানো বাজনা।

বাইরেটা এত জমকালো, অথচ ভেতরে আতঙ্ক! ফোর্স ফিল্ডকে অগ্রাহ্য করে একটা বাঘ এরিনার বাইরে পালিয়েছে এবং চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

হইচই এখন অনেক কমে গেছে। লোকজনের ছুটোছুটিও নেই। শুধু এখানে-ওখানে নানা জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তারই মধ্যে সার্কাসের নিরাপত্তাকর্মীরা ঘোরাফেরা করছে। আহত ক্ষতবিক্ষত মানুষদের ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের চাপে পায়ের নীচে পিষে কেউ মারা গেছে কি না কে জানে!

আমি ভারী-ভারী পা ফেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। পকেট থেকে রিমোট ইউনিট বের করে বোতাম টিপতেই গাড়ির অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। আমি ভেতরে ঢুকে বসতেই দরজাটা নিজে থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ইন্স্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সুইচ টিপে গাড়ির মাথায় বসানো ঘুরপাক খাওয়া লাল-নীল বাতি জ্বেলে দিলাম। এর ফলে লালবাজার থেকে যে-ই আসুক, আমাকে চট করে খুঁজে পাবে।

আমি ছুটিতে থাকলেও অফিস আমাকে গাড়িটা সবসময় ব্যবহার করতে দেয়। যেমন, এই মুহূর্তে আমার ঊরুর লাগোয়া সিকিওরিটি চেম্বারে একটা হেভি ডিউটি জেনারেটর গান রয়েছে। এটাও অফিস আমাকে সবসময় ব্যবহার করতে দেয়।

আমি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘরে এয়ারকুলার চলছিল। লুকোনো হলদে আলো সুদৃশ্য ঘরটাকে সমানভাবে আলোকিত করে রেখেছে। আমার সামনে সাদা ধবধবে টেবিল। টেবিলে পৃথিবীর একটা রঙিন ছবি। ছবিটা থেকে-থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রং পালটাচ্ছে। বোধহয় ক্রেমোস্ক্যান টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে।

টেবিলটা মাপে বেশ বড়। তার একদিকে আমি আর সার্জেন্ট সন্দীপ বর্মন। হেড কোয়ার্টার থেকে ওকেই পাঠিয়েছে। ও আমাকে এখনও ঠিক সহজভাবে নিতে পারে না, কিন্তু খুব একটা অপছন্দও করে না।

সন্দীপ বর্মন একটু আগেই এসে পৌঁছেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকতে-ঢুকতে আমি ব্যাপারটা মোটামুটি ওকে খুলে বলেছি। ‘রকেট সার্কাস’-এর নিরাপত্তাকর্মীরা এখনও আটটা দরজায় শকার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে আহত মানুষদের কাতর আর্তনাদ। এই নিরাপত্তাকর্মীরাই সম্ভবত ত্রাণের কাজে হাত লাগিয়েছে। ওদের একজনকে ডেকে জানালাম আমাদের পরিচয়। বললাম, সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাতে সন্দেহ-মাখা নজরে আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুজন অফিসার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চলার পথে দেওয়ালের ভাঙা জায়গাটা বর্মনের চোখে পড়ল। সেখানে একজন নিরাপত্তা কর্মী পাহারায় ছিল। ও সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ‘সরকার, এটা দেখেছেন?’

আমি ছোট্ট করে বললাম, ‘আমি ওখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।’

আমার কথা শুনে আমাদের সঙ্গের দুজন লোক অবাক হয়ে আমাকে খানিকক্ষণ দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

বর্মন পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে লাইটার জ্বেলে ধরাল। একটু ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বলল, ‘দেখবেন, বসকে যেন আবার ফস্ করে বলে দেবেন না। তা হলে আমার চাকরিটা লস হয়ে যাবে।’

আমি ঘাড় নাড়লাম। বর্মনের এই একটা মারাত্মক দোষ। ভীষণ সিগারেটের নেশা। অন ডিউটি অফ ডিউটি মানে না।

একটু পরেই আমরা একটা অফিসঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। কানে এল বাঘ অথবা সিংহের গর্জন। আর তারপরই হাতির ডাক। একজন নিরাপত্তা কর্মী বলল, ‘আপনারা এখানে একটু ওয়েট করুন—।’ তারপর সবুজ রঙের একটা প্লাস্টিকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

দরজার নেমপ্লেটে ঝকঝকে তামার ওপরে টানা-টানা সুন্দর হরফে লেখা রয়েছে—ড. পি. বিজয় রাঘবন। প্রোপ্রাইটার, রকেট সার্কাস।

বর্মন চাপা গলায় আমাকে বলল, 'কী-কী জিগ্যেস করবেন ভেবে রেখেছেন?'

আমি বর্মনের ঠোঁটের দিকে দেখলাম। ঠোঁট নড়া দেখে আমি কথা বুঝতে পারি। চাপা গলায় কেন, ফিশফিশ করে বললেও কারও কথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয় না। বর্মনের কথার উত্তরে বললাম, 'এখনও কিছুই ভাবিনি।'

এমনসময় ভেতর থেকে ডাক এল। বর্মন সিগারেটটা ফেলে দিল একপাশে। তারপর আমরা দুজনে ডক্টর রাঘবনের চেম্বারে ঢুকলাম।

সুন্দরভাবে সাজানো ঘর। ঘরের চার দেওয়ালেই সার্কাসের নানা খেলার রঙিন ফটোগ্রাফ। ড. রাঘবন লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আলতো করে ওঁর হাত ধরলাম, যাতে ব্যথা না লাগে। একই সঙ্গে ওঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

রাঘবন বেশ মোটাসোটা লোক। মাথার চুল প্রায় কদমছাঁট। গায়ের রং মাঝারি। ছাই রঙের একটা কোট পরে রয়েছেন—সেটা বোধহয় ঘরের তাপমাত্রার জন্যে। কপালে সাদা আর লাল টিপের ছোঁওয়া। গলায় চর্বির থাক।

পরিচয় দিয়ে আমি আর বর্মন বসলাম রাঘবনের মুখোমুখি চেয়ারে। আমি বেশ সাবধানেই বসেছি, কিন্তু তাও স্টিল ফ্রেমের চেয়ারে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হল। গদিটাও যেন বসে গেল অনেকটা।

রাঘবন নিজের চেয়ারে বসলেন। তারপর সামনে দাঁড়ানো লম্বা-চওড়া মানুষটিকে বললেন, 'কৃষ্ণন, তুমিও বসো, কথা আছে।'

রিং-মাস্টার কৃষ্ণনকে আমি আগেই চিনতে পেরেছি। এখন ওর পোশাক-আশাক পালটে গেছে, কিন্তু উপায় কী! কোনও মুখ একবার দেখলে সেটা আমি আর ভুলি না। তবে আমার এই অদ্ভুত ক্ষমতার সবটুকু কৃতিত্বই ডক্টর অভিজিৎ মজুমদারের।

কৃষ্ণন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। লক্ষ করলাম, ওর চোখেমুখে কেমন একটা বেপরোয়া রুক্ষ ভাব। হয়তো সবসময় বাঘ-সিংহ নিয়ে খেলা দেখায় বলে একটা আলগা অহংকার লেগে আছে।

রাঘবন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনস্পেক্টর সরকার, আমি আর কৃষ্ণন ওই বাঘের গোলমালের ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। আমাদের বাঘ ন'টা। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ আটটা বাঘ নিয়েই কৃষ্ণন শো করছে। কারণ আমাদের একটা ফিমেল বাঘ পদ্মিনী চারদিন আগে খাঁচায় মারপিট করে চোট পেয়েছে।'

রাঘবনের কথার খেই ধরে কৃষ্ণন বলল, 'নাকের পাশে আর কাঁধের কাছটায় বেশ চোট পেয়েছে। অনেকটা রক্ত পড়েছে। আমাদের দলের ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছেন, ইনজেকশানও দিয়েছেন। এ ক'দিন ধরে পদ্মিনী আলাদা খাঁচায় রয়েছে। একটু আগেই ওকে দেখে এলাম। এরিনায় ও আসেনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ন-টা বাঘ আমিও দেখেছি। তক্ষুনি কীরকম যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। সঙ্গে রঙিন আলোর ঝলকানি এবং ভিডিও টেলিফোনের পরদায় একজন নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা গেল। তার চোখেমুখে উত্তেজনা ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

রাঘবন গম্ভীর থমথমে গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, মনসুর?'

'স্যার, হাসপাতাল থেকে লোকজন নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছে। উন্ডেডদের আমরা গাড়িতে তুলে দিয়েছি। আর বাকিদের ফার্স্ট এইড দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু—।'

'কেউ মারাটারা যায়নি তো!'

'না, স্যার। টেন্ট এখন বলতে গেলে ফাঁকা। শুধু আমরাই চারপাশ গার্ড দিচ্ছি। আর তিনজন সুইপার টেন্ট ঝাঁট দিয়ে সাফ করছে।'

'গুড।' রাঘবন তৃপ্তির শব্দ করলেন জিভে। তারপর বললেন, 'তোমরা সবদিকে কড়া নজর রাখো। লালবাজার থেকে পুলিশ অফিসাররা এসেছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলছি। কৃষ্ণনও আমার কাছে আছে। লক্ষ রাখবে, টেন্ট থেকে অচেনা কেউ যেন তোমাদের নজর এড়িয়ে বেরোতে না পারে। আর উটকো কোনও লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। দিস ইজ মাই অর্ডার।'

'ওকে স্যার।' মনসুর ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিল। লোকটা যে ভয় পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন?

'কিন্তু একটা কথা ছিল, স্যার—।'

রাঘবন ভিডিয়ো ফোন অফ করতে গিয়ে থমকে গেলেন।

'কী কথা, মনসুর?'

'টেন্টের মধ্যে কিছু একটা ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটার চলার আওয়াজ পাচ্ছি, বুঝতেও পারছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

রাঘবন যে ঢোঁক গিললেন সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। তাঁর চোখ দুটো বড় হতে চাইছিল, কিন্তু তিনি ঝটিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। উত্তেজিত গলায় বললেন, 'হোয়াট দ্য হেল ডু য়ু মিন?'

'যা বলছি, সব সত্যি, স্যার। আমরা একটু নার্ভাস হয়ে গেছি।'

রাঘবন আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ইনস্পেক্টর সরকার, কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম। তবে এটা বুঝলাম, মনসুর মিথ্যে বলছে না। কারণ ঘণ্টাখানেক আগে, সার্কাস চলার সময়ে, বাঘটা যখন ফোর্স ফিল্ড অগ্রাহ্য করে লাফ দেয়, তখন আমি দেখেছি। লাফ দেওয়ার পরে বাঘটাকে আর দেখা যায়নি।

রাঘবনকে বললাম, 'মনসুর ঠিকই বলছে। চলুন, ওখানে গিয়ে দেখা যাক।'

ডক্টর রাঘবন ভিডিওফোনে বললেন, 'ওকে, মনসুর, আমি যাচ্ছি। তুমি চ্যাটার্জিকে বলো, স্ট্রং ফোর্স ফিল্ড অ্যাপ্লাই করে গোটা তাঁবুটাকে ঘিরে ফেলতে আর তোমরা প্রত্যেকে অ্যালার্ট থাকো।'

ফোন অফ করে দিলেন রাঘবন। আর তখনই কৃষ্ণন চাপাগলায় বলে উঠল, 'ওটা বাঘ নয়। হয়তো কোনও অপদেবতা, জিন।'

আমি অবাক হয়ে কৃষ্ণনকে দেখলাম। ও সত্যিই ভয় পেয়েছে। নইলে এরকম হাস্যকর কথা কখনও বলত না। ছেলে-ভোলানো গল্প তৈরি করতেই একমাত্র অপদেবতা-জিনজাতীয় বস্তুগুলো কাজে লাগে। বাস্তবের ডিকশনারিতে এদের নাম নেই, কখনও ছিল না।

আমরা চারজন উঠে দাঁড়ালাম প্রায় একই সঙ্গে। দরজার কাছে যেতেই দরজাটা নিজে থেকে খুলে গেল। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় বর্মন আমার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সরকার, এই প্রবলেম সল্ভ করতে গেলে পুলিশ দিয়ে কোনও কাজ হবে না, ম্যাজিশিয়ান দরকার।'

আমি বর্মনের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলাম। মুখের পেশিতে যথারীতি টান লাগল। তবে এটা ভেবে ভালো লাগল যে, আমি রসিকতা বুঝতে পারছি। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, রসিকতা বোঝাটা কোনও যন্ত্রমানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র সুস্থ মানুষই রসিকতা বুঝতে পারে। তা হলে আমি কী?

প্লাস্টিকের পাতে তৈরি মসৃণ রাস্তা ধরে আমরা এরিনার দিকে এগিয়ে গেলাম। জন্তু-জানোয়ারের চাপা গর্জন কানে আসছে। সার্কাসের খেলোয়াড়রা এখানে-ওখানে জটলা করছে। এরিনার এলাকায় ওদের ঢোকা এখন বারণ। তাই সিকিওরিটি গার্ডদের কাছ থেকে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে যে যার মতো গল্পগুজব করছে।

চলার পথে একজন লোক আমাদের দলে যোগ দিল। পরনে তার নিরাপত্তা কর্মীদের সবুজ ইউনিফর্ম। বুকে একটা লাল রঙের ব্যাজ লাগানো। তার চারপাশে নীল বর্ডার।

ডক্টর রাঘবনের পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে সে বলল, 'স্যার, ফোর্স ফিল্ড চালু হয়ে গেছে। তবে ফোর্স ফিল্ড দিয়ে ওই ইয়েটাকে বোধহয় ঠেকানো যাবে না।'

রাঘবন আমার আর বর্মনের সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনুদীপ চট্টোপাধ্যায় —'রকেট সার্কাস'-এর সিকিওরিটি চিফ। আমি চ্যাটার্জির সঙ্গে হাত মেলালাম। টের পেলাম, ওর

গায়ে চিফ হওয়ার শক্তি আছে।

আমাদের দু-পাশে ছোট-ছোট তাঁবু। তার দরজায়-দরজায় কৌতূহলী চোখমুখ। হ্যালোজেন বাতির আলোয় সেইসব মুখে ভয়ের ছাপও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। বর্মন চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছিল। রঙিন ফাইবার গ্লাসের খুঁটি, হ্যালোজেন বাতি, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে—'রকেট সার্কাস'-এর জাঁকজমকের কোনও খামতি নেই। ডক্টর রাঘবন কত টাকা ঢেলেছেন কে জানে!

ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় এগারোটা। কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই। আমার তো স্লিপ সার্কিট 'অন' না করলে ঘুম পায় না। সুতরাং যখন-তখন ঘুম পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। অনুদীপ চ্যাটার্জি পকেট থেকে একটা রিমোট কোল ইউনিট বের করে কয়েকটা বোতাম টিপল। বোধহয় ফোর্স ফিল্ড 'অফ' হয়ে গেল। তখন চ্যাটার্জি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন—।'

ইলেকট্রিক শকার হাতে তিনজন নিরাপত্তাকর্মী দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়তেই চ্যাটার্জি আবার রিমোট কোল ইউনিট বের করে তার বোতাম টিপতে লাগল।

আমি আর বর্মন তখন এরিনা ও তার আশপাশটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছি।

ডক্টর রাঘবন কোটটা খুলে নিলেন গা থেকে। সেটা বাঁ-হাতের ওপরে ঝুলিয়ে চ্যাটার্জিকে বললেন, 'সব লাইট অন করে দিতে বলো—।'

তার দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে সার্কাসের ভেতরটা চোখের পলকে দিন হয়ে গেল। সার্কাস চলার সময় আলোর বেশিরভাগটাই থাকে এরিনার মধ্যে। দর্শকদের বসার অংশে সেরকম একটা আলোর ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু এখন তফাত বোঝার উপায় নেই। গোটা তাঁবুটাই হ্যালোজেন আলোয় ঝকঝক করছে।

এখন কোনও মিউজিক বাজছে না। তবে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, চারটে টিভি-পরদা জীবন্ত। তাতে তাঁবুর বিভিন্ন অংশ ধরা পড়েছে। একটা পরদায় কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা যাচ্ছে। ভয়ার্ত মুখ। হাতের শকার যে কোনও মুহূর্তে খসে পড়তে পারে।

তাঁবুর মাথাটা ছুঁচোলো হয়ে কত ওপরে উঠে গেছে কে জানে! অদ্ভুত ধরনের এক পলিমার দিয়ে তাঁবুটা তৈরি। সেটা দেখতে অনেকটা ঘষা কাচের মতো। তাঁবুর ভেতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তবে ডক্টর রাঘবনের ঘরের মতো অত ঠান্ডা নয়। চারপাশের অসংখ্য ফাইবার গ্লাসের খুঁটিতে লাইট এমিটিং ডায়োড দিয়ে তৈরি বহুরকমের রোলিং ডিসপ্লে। তার কোনওটায় লেখা 'ধূমপান নিষেধ', আবার অন্য কোনওটায় লেখা 'রকেট সার্কাস যদি না দেখে থাকেন তা হলে আপনি রকেট কাকে বলে জানেন না, আর সার্কাস কাকে বলে তাও জানেন না।'

সন্দীপ বর্মন আবার সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সরকার, আমি আগে কখনও সার্কাস দেখিনি।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমরা এখানে সার্কাস দেখতে আসিনি।' টের পেলাম, কথাটা বলার সময় গলার স্বরে ধাতব ছোঁয়াটা মাথাচাড়া দিল।

তাঁবুর ভেতরে মোট বাইশজন নিরাপত্তাকর্মী আমার চোখে পড়ল। ওরা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুদীপ চ্যাটার্জিকে দেখেই ওরা খানিকটা তটস্থ হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

আমি কৃষ্ণনকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কখন প্রথম গোলমালটা টের পেয়েছিলেন?'

কৃষ্ণন বিরক্তভাবে আমার দিকে তাকাল। বোধহয় এর আগে ডক্টর রাঘবনও ওকে একই কথা জিগ্যেস করে থাকবেন।

একটু চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'আপনি তো খেলা দেখেছেন। রেখা যখন উঁচু টুলটায় উঠল, তখনই আমি একটা বাড়তি বাঘ টের পেলাম। কারণ, তখন রেখার দু-পাশে তিনটে আর চারটে—মোট সাতটা বাঘ থাকার কথা। কিন্তু দেখলাম, আটটা—মানে মোট ন-টা। তার মধ্যে আবার একটা বাঘ সাইজে বেশ বড়।'

অনুদীপ চ্যাটার্জি আমাদের ছেড়ে নিরাপত্তা কর্মীদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ির শব্দ কানে এল। সেইসঙ্গে কারও চিৎকার।

তাকিয়ে দেখি, অনুদীপ আর তিনজন নিরাপত্তাকর্মী এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে। আর ছ-সাতটা চেয়ার উলটে গেছে। দুজন কর্মী শকার চার্জ করেছে। কারণ শূন্যে বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ল না।

তাঁবু এলাকার মেঝেটা নকশা-কাটা প্লাস্টিকের তৈরি। ফলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আমার শরীরের যা ওজন তাতে এর ওপর দিয়ে দৌড়োনো ঠিক হবে না। বর্মন ব্যাপারটা আঁচ করল। এক ঝটকায় সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে হোলস্টার থেকে জেনারেটর গান বের নিল। সেটা উঁচিয়ে ছুটে গেল চ্যাটার্জির দিকে।

'মাই গড!' বলে ডক্টর রাঘবনও ছুটলেন সন্দীপ বর্মনের পিছু-পিছু।

কৃষ্ণন চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'হাওয়া-জিন ওদের ধাক্কা মেরেছে। আমি বাঘের সঙ্গে লড়তে ভয় পাই না, কিন্তু জিনের সঙ্গে তো আর জোর চলে না।' বলে কৃষ্ণন তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল।

আমি ওকে ডেকে বললাম, 'যাবেন না, কৃষ্ণন, দরজায় স্ট্রং ফোর্স ফিল্ড রয়েছে। তারচেয়ে আসুন, আমরা সবাই মিলে ওটাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করি।'

কৃষ্ণন দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি অটোমেটিক লক খুলে সিকিওরিটি চেম্বার থেকে হেভি ডিউটি জেনারেটর গানটা বের করে নিলাম। লেসার গানের তুলনায় এই বন্দুকে নিরাপত্তা অনেক বেশি।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, একটা কিছু তাঁবুর ভেতরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। ডক্টর রাঘবন কয়েকটা খুঁটির আড়ালে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। অনুদীপ চ্যাটার্জি নিজেকে সামলে নিয়ে রাঘবনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর নিরাপত্তাকর্মীরা আতঙ্কে গোলাপি দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিপদের আশংকা যে ঠিক কতটুকু তা ওরা বুঝতে পারছে না।

এই নাম-না জানা প্রাণীটা যদি অদৃশ্য হয় তা হলে সে কি অন্ধ! কারণ আলোকবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে অদৃশ্য প্রাণীকে অন্ধ হতেই হবে। তার শরীরের প্রতিটি অংশকেই হতে হবে বায়ুর মতো—অর্থাৎ, তার শরীরের প্রতিসরাঙ্কের মান হতে হবে প্রায় ১.০। তার চোখের বেলাতেও তাই। সেইজন্যেই ওই চোখে বায়ুমাধ্যম দিয়ে আসা আলোকরশ্মি কোনও প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারবে না।

এই প্রাণীটাও কি সেইরকম? কিন্তু এ যে মাঝে-মাঝে দিব্যি চোখে-দেখা-যায় এমন বাঘ হয়ে যাচ্ছে!

আমি আর কৃষ্ণন সামনে এগিয়ে গেলাম। এরিনার চারপাশ থেকে ফোর্স ফিল্ড তুলে নেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণন আমাকে বলে সেদিকে উঠে গেল। আর ঠিক তখনই একটা অর্ধেক বাঘ আমার চোখে পড়ল।

আমি কিছুতেই দৃশ্যটাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ঠিক পেটের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে একেবারে লেজের ডগা পর্যন্ত। শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে। এবং সেই অসম্পূর্ণ প্রাণীটা তিরবেগে ছুটছে।

ছুটতে-ছুটতেই সেটা সটান এসে ধাক্কা মারল কৃষ্ণনকে। সেই ধাক্কায় কৃষ্ণন ছিটকে পড়ল হাত-পাঁচেক দূরে, আর ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আমি জেনারেটর গান তাক করে ফায়ার করলাম—একবার, দু-বার।

আমি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই না। এবারও হলাম না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে স্তম্ভিত করে দিল।

জেনারেটর গানের হাই লেভেল ফায়ারিং-এ প্রাণীটা একটুও বিচলিত হল না। বরং চোখের পলকে ওটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেনারেটর গানের হাই লেভেল ফায়ারিং-এ ভীষণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসও থাকে। এই ফায়ারিং-এর তেজ সহ্য করার

ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও প্রাণীর নেই। অন্তত আমি তাই জানতাম। তাই স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম, এই বিচিত্র অদৃশ্য প্রাণীটা এল কোথা থেকে!

সন্দীপ বর্মন দূর থেকে চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছিল। আমি ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে ডক্টর রাঘবনকে চেঁচিয়ে বললাম, 'ডক্টর রাঘবন, এক্ষুনি একটা বড় জালের ব্যবস্থা করুন। নইলে এই জন্তুটাকে ধরা যাবে না। ওটা বাঘ নয়।'

কৃষ্ণন উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল এরিনার কিনারার কাছে। সেখানে একটা ফাইবার পোলের গায়ে একটা নাইলন দড়ির মই জড়ানো ছিল। সেটা খুলে নিয়ে ও তরতর করে ওপরে উঠে যেতে লাগল। ওর হাতের পেশি, চোয়ালের হাড় ফুলে উঠেছে।

আমি নীচ থেকে চেঁচিয়ে ওকে ডাকলাম, কিন্তু ও শুনল না। দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে একটা ট্যাপিজের ওপরে বসে পড়ল।

ততক্ষণে রাঘবন অনুদীপ চ্যাটার্জিকে নির্দেশ দিয়েছেন জাল নিয়ে আসার জন্যে। দুজন নিরাপত্তাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাটার্জি তাঁবুর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মী এপাশ-ওপাশ ছুটোছুটি করছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সন্দীপ বর্মন ছুটে এল আমার কাছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'সরকার, হেড কোয়ার্টারে খবর দিন। ওরা দু-গাড়ি ফোর্স পাঠাক—।'

একটা ব্যাপার আমাকে বেশ অবাক করেছিল। সেটা হল, অজানা এই প্রাণীটার আচরণ। এ-পর্যন্ত ওটা কারও কোনও ক্ষতি করেনি। ওটা যদি সত্যি-সত্যি একটা বাঘ হতো, তা হলে এর মধ্যে ক'জন যে ওটার হাতে খতম হতো কে জানে! বোধহয় কৃষ্ণনকে দিয়েই শুরু হতো খতমের খেলা। সুতরাং এটা বলা যায়, প্রাণীটা আর যাই হোক, বিপজ্জনক নয়।

সন্দীপ বর্মনের কথার জবাবে বললাম, 'ফোর্সের কোনও দরকার নেই। এখানে বিশ-বাইশ জন সিকিওরিটি গার্ডই তো আমাদের সাহায্যের জন্যে রয়েছে। তা ছাড়া, প্রাণীটাকে আমি মারতে চাই না—ওটাকে জ্যান্ত ধরতে চাই।'

'কিন্তু এরকম একটা ভয়ংকর প্রাণীকে আপনি—।'

বর্মনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বাধা দিলাম, 'এটাই তো সবচেয়ে বড় গোলমাল, বর্মন। যে-প্রাণী আমাদের চোখে অদৃশ্য, তাই আমাদের কাছে ভয়ংকর। যে-প্রাণী কখনও আমরা চোখে দেখিনি, তাকে সামনাসামনি হঠাৎ দেখতে পেলে আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে কোনও অস্ত্র দিয়ে তাকে ঘায়েল করা। অথচ সেই প্রাণীটা হয়তো নিরীহ, অসহায়।' একটু থেমে আমি আরও বললাম, 'আসল গোলমালটা কোথায় জানেন? মানুষই সবচেয়ে বেশি হিংস্র, বিপজ্জনক। আপনার

যদি এখানে ভয় করে তা হলে রাঘবনের চেম্বারে চলে যান। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। ইচ্ছে হলে মাঝে-মাঝে ফোনে খবর নেবেন।'

এইসব কথা বলার সময় আমার উত্তেজনা বাড়ছিল। আর সেইসঙ্গে ধাতব সুর ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ছিল।

বর্মন অপমানিত মুখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'আপনিই জিতলেন' বলে আবার ফিরে গেল ডক্টর রাঘবনের কাছে।

অদৃশ্য প্রাণীটার নড়াচড়া বা ছুটোছুটি বোধহয় থামেনি। কারণ, শব্দ কানে আসছিল, দর্শকদের জন্যে সাজানো চেয়ার থেকে-থেকেই উলটে পড়ছিল, ছিটকে পড়ছিল। নিরাপত্তাকর্মীরাও তাদের ভয়ার্ত ব্যস্ততা বজায় রেখেছে। নিজেদের মধ্যেই চ্যাঁচামেচি করে কীসব বলছে।

এমনসময় চ্যাটার্জি ফিরে এল। সঙ্গে সেই দুজন নিরাপত্তাকর্মী ও চারটে 'মাউস মোবাইল' বা 'মোমো'। চারটে মোমো বয়ে নিয়ে আসছে প্রকাণ্ড একটা নাইলনের জাল। বিশেষ ধরনের নাইলনের সুতোয় বোনা।

মোমোর আকৃতি অনেকটা বাচ্চাদের প্র্যামের মতো। কিন্তু চলে হাই পাওয়ার ব্যাটারিতে। গাড়িগুলোর রং কমলা আর কালো। সামনে হাতের মতো চারটে ধাতব রড বেরিয়ে আছে। আর পিছনে লেজের মতো একটা ক্র্যাঙ্ক চলার তালে-তালে নড়ছে। ঠিক যেন একটা নেংটি ইঁদুর। সেইজন্যেই নাম মাউস মোবাইল।

মোমোর ড্রাইভাররা বসে আছে গাড়ির পেটের ভেতর সেঁধিয়ে। তারা চারজন পাশাপাশি চালিয়ে নিয়ে আসছে গাড়ি। সামনে বেরিয়ে থাকা ষোলোটা রডের ওপরে রাখা আছে নাইলনের জালটা। রং তার সাদা, কিন্তু শঙ্খের মতো চিকচিক করছে। এরকম নাইলন আমি চিনি—খুব হালকা অথচ শক্তিশালী।

আমি চ্যাটার্জিকে বললাম, তাঁবুর একপাশ থেকে জালটা ঘিরে ধীরে-ধীরে টেনে নিয়ে আসতে। ঠিক যেমন করে পুকুরে ঘেরা-জাল দিয়ে মাছ ধরে।

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। চারটে মোমো আর জনাদশেক নিরাপত্তাকর্মী চ্যাটার্জির নির্দেশমতো কাজ শুরু করে দিল। তবে প্রত্যেকের মুখেই আতঙ্কের ছাপ।

আমি জেনারেটর গান সিকিওরিটি চেম্বারে রেখে দিলাম। ওটা যে এখন কোনও কাজে লাগবে না তা একটু আগেই বোঝা গেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণন এখনও ট্যাপিজের ওপরে বসে। ভূত-প্রেতের অহেতুক আতঙ্কই ওর বারোটা বাজিয়েছে।

সন্দীপ বর্মন আর ডক্টর রাঘবন ব্যস্তভাবে জাল টানার তদারকি করছিলেন। যে-দেওয়াল ভেঙে আমি সার্কাসের বাইরে বেরিয়েছিলাম, সেদিকটা থেকেই শুরু হয়েছিল জাল টানার কাজ। আর

আমি এরিনার এপাশে ঠিক ওদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

মোমোর ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ আর লোকজনের হইচই শব্দের তীব্রতা প্রায় ১১০ ডেসিবেলে নিয়ে গেল। কিন্তু এইসব শব্দের মধ্যে আর-একটা শব্দও শোনা যাচ্ছিল। সেটা ওই প্রাণীটার ছোটাছুটির শব্দ। এই জালের ফাঁদে প্রাণীটাকে ধরা যাবে তো!

আমাদের কপালে যে আরও দুঃখ আছে সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। জাল টানার কাজ আধাআধি হতেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, প্রাণীটার ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে জালের ওপিঠ থেকে। অথচ জাল যেভাবে টানা হচ্ছে তাতে জালের পাশ দিয়ে প্রাণীটার সটকে পড়ার কোনও পথ নেই। অন্তত পৃথিবীর কোনও প্রাণী হলে পারত না। তা ছাড়া, জালের ফুটোগুলোর মাপ এক বর্গইঞ্চির বেশি হবে না। তার ভিতর দিয়ে কি গলে বেরিয়ে যেতে পারে এই অদ্ভুত প্রাণী?

জাল টানার কাজ যতই শেষ হয়ে আসছে, আতঙ্কের মাত্রা তার সমানুপাতে বাড়ছে। একটা আস্ত ডোরা-কাটা বাঘ দিয়ে যার শুরু, তার শেষ যদি এইরকম হয় তা হলে ভয় পাওয়ারই কথা।

লোকজনের হইচই-চ্যাঁচামেচি চলছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'ডক্টর রাঘবন, জাল টেনে আর লাভ নেই। ওটা এভাবে ধরা পড়বে না। জাল গুটিয়ে ফেলতে বলুন—।'

সুতরাং চারটে মোমো আর নিরাপত্তাকর্মীরা ক্ষিপ্রগতিতে জালটাকে আবার ভাঁজটাজ করে ষোলোটা ধাতব হাতের ওপরে সাজিয়ে দিল। ইঞ্জিনের গর্জন তুলে মোমোগুলো বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে। রওনা হল রকেট সার্কাসের অন্দরমহলের দিকে।

কৃষ্ণন ওপর থেকে চিৎকার করে বলল, 'ইনস্পেক্টর সরকার, দেখলেন, আমার কথা ঠিক হল কি না!'

আমি শুধু একবার ওর দিকে তাকালাম। কিছু বললাম না। তখন আমি ভাবছি, কীভাবে প্রাণীটাকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখা যায়।

ডক্টর রাঘবন আমার কাছে এলেন। হাতের কোটটা কখন যেন একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখেছেন। এই শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও সামান্য ঘেমেছেন। কপালের টিপ ধেবড়ে গেছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে আমাকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'হোয়াট নেক্সট?'

সন্দীপ বর্মন গম্ভীর মুখে হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার সামনে। ওর চোখেমুখে তাচ্ছিল্যের ভাব। বোধহয় আমার দৌড় দেখতে চায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বর্মন বলল, 'তা হলে এবার হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ফোর্স চেয়ে পাঠাই। ওদের বলি দুটো অ্যানিহিলেটর কামান নিয়ে আসতে—।'

আমি চমকে বর্মনের দিকে তাকালাম। অ্যানিহিলেটর কামান! ওটাই আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। ওটা কোনও জিনিসের দিকে তাক করে ফায়ার করলে পলকে তার তাপমাত্রা ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। প্রায় সব ধাতু ওই তাপমাত্রায় গলে যায়, কোনও প্রাণী তো কোন ছার! অ্যানিহিলেটর ব্যবহার করা মানে এই বোবা প্রাণীটা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ততক্ষণে আর-একটা মতলব মাথায় এসে গেছে আমার। বর্মনকে বললাম, 'একটা শেষ চেষ্টা করে দেখি। তাতে কোনও কাজ না হলে হেডকোয়ার্টারে খবর দেব, ওরা অ্যানিহিলেটর কামান নিয়ে আসবে।' আমি চোখ ফেরালাম ডক্টর রাঘবনের দিকে, 'আপনার কাছে রং করার স্প্রে-গান আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। সার্কাসের যত পেইন্টিং-এর কাজ সবই আমাদের নিজের লোকেরা করে।'

'ক'টা স্প্রে-গান হতে পারে?'

'তা দশ-বারোটা তো হবেই।'

আমি বললাম, 'তা হলে চটপট লোক লাগিয়ে ব্যবস্থা করুন। আমি ওই অদৃশ্য প্রাণীটার গায়ে সাদা রং স্প্রে করে ওর চেহারাটা অন্তত দেখতে চাই।'

অনুদীপ চ্যাটার্জি চোয়াল শক্ত করে পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। আমার কথা শেষ হতেই হইহই করে দলবল নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। লোকটার উৎসাহের প্রশংসা করতে হয়।

বড়জোর মিনিট পনেরো। তারমধ্যেই দেখলাম ওরা তৈরি হয়ে নিয়েছে। মনে হল, প্রাণীটা যে নিরীহ এটা বোধহয় ওরা সকলেই আন্দাজ করেছে।

এবারে কাজে নেমে পড়ল সাতটা মোমো আর চারজন নিরাপত্তাকর্মী। ফলে মোট এগারোটা স্প্রে-গান ধোঁয়ার মতো সাদা রং ওড়াতে লাগল বাতাসে। কর্মীরা সকলেই নাকে-মুখে রুমাল বেঁধে নিয়েছে। মোমোর ড্রাইভাররাও মুখ ঢেকে নিয়েছে কাপড়ে।

শুধু তাদের কপাল আর চোখ দেখা যাচ্ছে। তাদের প্রায় কাঁধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে একজন করে নিরাপত্তাকর্মী স্প্রে-গান চালাচ্ছে।

সাদা ধোঁয়া উড়তে লাগল তাঁবুর বাতাসে। স্প্রে-গানের শব্দ, মুখ-ঢাকা অবস্থায় জড়ানো কথার হইচই, আর সাতটা মোমোর ইঞ্জিনের গর্জন বোধহয় শব্দের তীব্রতা ১২০ ডেসিবেলে নিয়ে গেল। আমি দরকারি বোতাম টিপে আমার শ্রবণ ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে নিলাম। নইলে কানে বড় লাগছিল।

ডক্টর রাঘবন রুমালে মুখ ঢেকে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'ইনস্পেক্টর সরকার, প্রাণীটাকে দেখার পর আমরা কী করব?'

আমি বললাম, 'জানি না। তবে যদি সম্ভব হয়, ওটার কয়েকটা খেলা আপনার সার্কাসের শো-তে কাল থেকে জুড়ে দেবেন।'

ডক্টর রাঘবন হাসলেন না। অনেকটা আপনমনেই বললেন, 'জুওলজি নিয়ে ডক্টরেট করেছি—এরকম কোনও প্রাণী যে পৃথিবীর কোথাও জন্ম নিতে পারে তা কখনও কল্পনাও করিনি। আমার বাবা এই রকেট সার্কাসের পত্তন করেছিলেন। তাঁর ভয়ডর বলতে কিছু ছিল না। আমারও ওই ব্যাপারটা বেশ কম—।'

আমি আঙুল তুলে ওপরে কৃষ্ণনের দিকে দেখালাম।

ডক্টর রাঘবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'ও রিং-মাস্টার হিসেবে খারাপ নয়। আগে আর-একটা কোম্পানিতে ট্যাপিজের খেলা দেখাত। সেখানে বাঘ-সিংহ নিয়ে তালিম নিত। ওই কোম্পানিতে রিং-মাস্টার হঠাৎই হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়—শো চলার সময়। তখন কৃষ্ণন সেই শো চালিয়ে দেয়। সেই থেকেই সার্কাসের সার্কিটে ওর নাম খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমার কাছে ও আছে চার বছর। কিন্তু কখনও এরকম ভয় পেতে দেখিনি—।'

এমনসময় বাড়তি একটা জোরালো শব্দ হল। চমকে তাকিয়ে দেখি কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা মোমো উলটে পড়ে গেছে। সাদা ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে ওটাকে দেখা গেলেও ওটার ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ, চাকার ভনভন, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মোমোর দুজন মানুষই ছিটকে পড়েছে গাড়ি থেকে। ওরা ওঠার চেষ্টা করছে। আর ওদের সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে চার-পাঁচজন নিরাপত্তাকর্মী।

রকেট সার্কাসের তাঁবু এখন বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। রঙিন যা কিছু ছিল—ফাইবারের খুঁটি, চেয়ার, নাইলনের দড়ি, ইলেকট্রনিক রোলিং ডিসপ্লে—সবই সাদা রঙের পোশাক পরে নিয়েছে। দশটা স্প্রে-গান চলছে তো চলছেই। স্প্রে-গানের ক্যানের রং ফুরিয়ে গেলে দুজন কর্মী তিনটে রঙের ড্রাম থেকে তড়িঘড়ি রং ভরতি করে দিচ্ছে ক্যানে। প্লাস্টিকের মেঝে, এরিনা, দেওয়াল, সব রঙে মাখামাখি। নিরাপত্তাকর্মীদের আলাদা করে চিনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনুদীপ চ্যাটার্জিকে আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু সন্দীপ বর্মনকে চট করে চিনতে পারলাম ওর হাতে ধরা জেনারেটর গানের জন্যে।

ডক্টর রাঘবনও রঙের হাত থেকে রেহাই পাননি। আর আমার অবস্থাও প্রায় একইরকম।

হঠাৎই এক তীব্র চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা করেছে একইসঙ্গে অন্তত তিনজন। ডক্টর রাঘবন আমার হাত খামচে ধরলেন উত্তেজনায়। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই হাত সরিয়ে নিলেন। অবাক চোখে দেখলেন আমার হাতের দিকে।

আমি সবসময় ফুলহাতা শার্ট পরি। তাই বাইরে থেকে ধাতুর কারিকুরি কিছু বোঝা যায় না। সুতরাং রাঘবনও কিছু বুঝতে পারলেন না। শুধু কোনওরকমে চাপা গলায় বললেন, 'ওরা বোধহয় প্রাণীটাকে দেখতে পেয়েছে!'

রাঘবনের কথাই যে ঠিক সেটা বুঝতে পারলাম লোকজনের পরিত্রাহি ছুটোছুটি দেখে। তবে বাকিরা খানিকটা দূরত্ব থেকে কিছু একটা দেখতে চেষ্টা করছে।

অকুস্থলটা এরিনার ডানদিকে, ঠিক পাশ ঘেঁষে।

আমি এগিয়ে চললাম সেদিকে। টের পেলাম, ডক্টর রাঘবন আমার পিছনেই রয়েছেন।

সাদা ধোঁয়ার মেঘ সরিয়ে খানিকটা এগোতেই প্রাণীটা নজরে পড়ল আমার। কী বিচিত্র তার চেহারা! তবে চেহারার নির্দিষ্ট কোনও বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই তা পালটাচ্ছে।

লম্বায় প্রায় কুমিরের মতো। লেজের অংশটার তিনটে মুখ রয়েছে। সারা গায়ে আর্মাডিলোর মতো বড়-বড় আঁশ। মাথাটা থ্যাবড়া মতো। গলার কাছে আট-দশটা ভাঁজ। পা কিংবা হাতের সংখ্যা ছয়। তাতে দুটো করে আঙুল মাঝে-মাঝেই আঙুলের সংখ্যা বেড়ে চারটে হয়ে যাচ্ছে। প্রাণীটার নাক বেশ বড়, তাতে বিশাল দুটো ফুটো। নাকটা ডাইনে-বাঁয়ে নড়ছে। নাকের দু-পাশে দুটো চোখ। এক-একটা চোখ যেন চার ইঞ্চি ব্যাসের মার্বেল। তার ওপরে সাদা রঙের আস্তরণ থাকা সত্ত্বেও নড়াচড়া করছে। হয়তো সবকিছু দেখতেও পাচ্ছে। মুখটা বন্ধ করে রাখলেও কী করে যেন একটা কালো জিভ বারবার বাইরে বেরিয়ে আসছে।

প্রাণীটা মাঝে-মাঝে নিজের শরীরটাকে ভাঁজ করে নিচ্ছিল। ওটার নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথবা রঙের রাসায়নিক ওকে অবশ করে দিয়েছে।

সবক'টা স্প্রে-গান থেমে গেছে। মোমোগুলোও দাঁড়িয়ে পড়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একটু আগের হইচই শব্দ হঠাৎই কমে গিয়ে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছে চাপা আলোচনা, গুঞ্জন।

বর্মন আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'সরকার, নিন, কাজ গুছিয়ে এবার চলুন।'

আমি তখন ভাবছিলাম, এটা ভিনগ্রহের প্রাণী নয়তো?

'কনট্যাক্ট' নামে একটি সংস্থা প্রায় দশ-বারো বছর ধরে ভিনগ্রহী প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছে। কলকাতায় গত বছরেই ওদের একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। সেখানে ওরা কম্পিউটার গ্রাফিক্সে তৈরি করা অন্তত পঞ্চাশরকমের ভিনগ্রহী প্রাণীর ছবি দেখিয়েছিল। আমাদের ডিপার্টমেন্টকে ওরা সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এ সি বিকাশ মিত্র ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ভিনগ্রহীদের সেই গ্রাফিক্স ছবিগুলো আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। এখন, এই প্রাণীটাকে দেখে, সেই ছবিগুলো আমার মনে পড়ে গেল। ছবিগুলোয় দেখা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এটার মধ্যে যেন দেখতে পাচ্ছি।

'কনট্যাক্ট' সংস্থাকে পৃথিবীর সব দেশই বেশ গুরুত্ব দেয়। কারণ, তার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে দুঁদে কল্পবিজ্ঞান লেখক, মনোবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রযুক্তিবিদ, পরিবেশবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, পুরাপ্রাণীবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ। ওদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল ওরা সম্মেলনে প্রকাশ করে। সুতরাং মনে-মনে খুঁজে পাওয়া মিলগুলো বেশ কয়েকবার খতিয়ে দেখে আমি জোরের সঙ্গে বললাম, 'ডক্টর রাঘবন, এই প্রাণীটা হয়তো অন্য কোনও গ্রহ থেকে কোনওভাবে আমাদের এখানে এসে পড়েছে। আমাদের এখুনি 'কনট্যাক্ট'-এ খবর দেওয়া দরকার।'

'কনট্যাক্ট?' অনুদীপ চ্যাটার্জি একটুকরো কাপড় দিয়ে মুখের রক্ত মুছছিল। অবাক হয়ে কথাটা বলল।

আমি জবাবে কিছু একটা বলতে যাব, ঠিক তখনই একটা তীক্ষ্ণ ভ্রমরগুঞ্জন শোনা গেল। মিহি শব্দটা এত তীক্ষ্ণ যে সকলেই চমকে উঠে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল। প্রাণীটার মধ্যেও যেন হঠাৎই একটু চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। আর তখনই ভেসে বেড়ানো আলোর বিন্দুটা আমাদের নজরে পড়ল।

এরিনার ঠিক মাঝখানে উড়ন্ত জোনাকিপোকার মতো একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু পাক খাচ্ছে দুরন্ত গতিতে, ওঠা-নামা করছে নির্দিষ্ট ছন্দে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শোনা যাচ্ছে ভ্রমরগুঞ্জনের শব্দ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, আমাদের অবাক চোখের সামনে, আলোর বিন্দুর ঘিরে-রাখা জায়গায় একটা অবয়ব দেখা দিল। প্রথমে ঝাপসা, তারপর ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই অদ্ভুত চেহারা। গলানো রুপোর মতো নমনীয় হয়ে নড়তে লাগল বেহিসেবিভাবে। যেন ঠিক করতে পারছে না, শেষপর্যন্ত কোন আকৃতি নেবে।

একটু পরেই মানুষের চেহারা নিয়ে স্থির হল সেই অবয়ব। তার সারা শরীর রুপোর পাতের মতো ঝকঝক করছে। ধারালো নাক-মুখ-চোখ। স্পষ্ট হাত-পায়ের পেশি।

অদ্ভুত মানুষটা সম্পূর্ণ রূপ নিতেই আলোর বিন্দুটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরই পরিষ্কার গলায় কেউ যেন বলে উঠল, 'আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, নিভিয়ালটাকে এতক্ষণ এখানে আটকে রাখার জন্যে। আমার আসতে আর-একটু দেরি হলেই ওটা হয়তো এখান থেকেও পালাত।'

আমরা সকলেই হতবাক। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছি রুপোলি মানুষটার দিকে। সে তার চকচকে চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেখল। তারপর আবার বলল, 'আমাকে দেখে অবাক হবেন না। ভয়ও পাবেন না। আমি আসছি বহুদূরের এক নক্ষত্রের একটি গ্রহ থেকে। এই নক্ষত্রটিকে আপনারা জিটা অরিওনিস নাম দিয়েছেন। আমরা খুব সহজে মনের কথা পড়ে ফেলতে

পারি, মস্তিষ্কের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি। আর অন্য কোনও প্রাণীর স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা নিজেদের স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করে নিতে পারি যখন-তখন। তাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

রুপোলি মানুষের চেহারা-নেওয়া ভিনগ্রহী প্রাণীটি নেমে এল এরিনা থেকে। তার শরীর থেকে কেমন এক অদ্ভুত আলোর আভা বেরোচ্ছে। ডক্টর রাঘবনের কাছে এসে সে বলল, 'ডক্টর, আপনার মতো আমিও একটা সার্কাসের মালিক। নানা গ্রহে ঘুরে-ঘুরে আমি সার্কাসের শো করি। আমার দলে হরেকরকম বিচিত্র জীবজন্তু রয়েছে। মাঝে-মাঝে এইসব প্রাণী সংগ্রহের জন্যে আমি অন্যান্য গ্রহে চলে যাই। সেখানকার পাহাড়ে, সমুদ্রে, জঙ্গলে, ঘুরে বেড়াই—।'

আমি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'এই নিভিয়ালটাকে কোথায় পেয়েছেন?'

'আপনাদের সৌরজগতের ছ-নম্বর গ্রহটির পঞ্চম উপগ্রহে—।'

'শনির উপগ্রহ—রিয়া?'

'হ্যাঁ, আপনারা ওই নামই দিয়েছেন ওটাকে। আপনারা ওটা আবিষ্কার করেছেন প্রায় ৩২০ বছর আগে। আর আমরা ওটার সন্ধান জেনেছি প্রায় ১০০০ বছর আগে। রিয়ার ব্যাস প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। বরফে ঢাকা। তাতে জমাট-বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড আর মিথেনই বেশি। কিছুদিন আগে সেখানে আমরা একটা অভিযান চালিয়েছিলাম। তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিন্দুক দেখতে পাই। সিন্দুকে একটা সতর্কবাণী লেখা ছিল—।'

'কী লেখা ছিল?' ডক্টর রাঘবন প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে নিভিয়ালটার কাছ থেকে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল। নিরাপত্তাকর্মীরা 'নড়ছে, নড়ছে!' বলে চিৎকার করে উঠল।

রুপোলি মানুষটি 'কোনও ভয় নেই' বলে এগিয়ে গেল প্রাণীটার কাছে। ডান হাতটা শূন্যে তুলে ধরল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। পরের মুহূর্তেই একটা সবুজ আলোর সুতো বেরিয়ে আসতে লাগল মানুষটির তর্জনীর ডগা থেকে। বিদ্যুতের রেখার মতো এঁকেবেঁকে সেই সবুজ প্রতিপ্রভ সুতো জালের মতো জড়িয়ে যেতে লাগল নিভিয়ালটার গায়ে।

প্রাণীটাকে এখন লক্ষ করে বেশ অবাক হলাম। ওটা শুধু যেন নড়ছে তাই নয়, ওটার গায়ের সাদা রং অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। আর শরীরের কোনও-কোনও অংশের রং হালকা নীল প্লাস্টিকের মেঝের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ফলে হঠাৎ করে প্রাণীটাকে জায়গায়-জায়গায় খাপছাড়াভাবে অদৃশ্য মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, প্রাণীটার শরীরের আকৃতিও এখন বেশ পালটে গেছে। লেজটা অনেক খাটো হয়ে গেছে। মাথাটা হয়ে গেছে সরু, লম্বা। হাত বা পায়ের সংখ্যা ছয়ের বদলে এখন চার।

প্রাণীটা নড়াচড়া করছিল, তবে মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করছিল না। এখনও পর্যন্ত ওর কোনও গর্জন শোনা যায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা সবুজ আলোর সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি হয়ে গেল।

কাজ শেষ করে রুপোলি ভিনগ্রহী ফিরে তাকাল আমাদের দিকে। ঠোঁট প্রসারিত করে হাসতে চেষ্টা করল।

'কী লেখা ছিল ওই সিন্দুকের গায়ে?' ডক্টর রাঘবন অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন আবার।

হাত তুলে ডক্টর রাঘবনকে আশ্বস্ত করল সে। বলল, 'বলছি। এবারে একটু নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। নিভিয়ালটাকে আমি হাই পাওয়ার লেসার লক দিয়ে বন্দি করেছি, এখন ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত।'

আগন্তুকের বাঁ-কাঁধের কাছটা কেমন যেন গলে গিয়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। সেটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে সে বাঁ-হাতটা শূন্যে তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে গলিত রুপো যেন সুষম স্রোতে প্রবাহিত হয়ে কাঁধের আকার আবার মেরামত করে দিল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম।' আগের কথার খেই ধরে বলতে শুরু করল সে, 'ওই সিন্দুকের গায়ে সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল, একটা আশ্চর্য প্রাণী বন্দি রয়েছে এই সিন্দুকের মধ্যে। নাম নিভিয়াল। একে ক্ষতিকর মনে হওয়ায় কোনও এক অজানা গ্রহ সিরা-টু-র বাসিন্দারা এই প্রাণীটাকে বন্দি করে চিরকালের জন্যে নির্বাসন দিয়েছে। ওরা প্রাণীহত্যা করে না। তাই এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ যেন এই সিন্দুকের কম্বিনেশন লক না খোলে।'

'আপনারা সেই লক খুললেন?' প্রশ্নটা করল সন্দীপ বর্মন। কখন যেন সে আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে-মুখে স্প্রে-গানের সাদা রং লেগে রয়েছে।

আগন্তুক জবাব দিল সঙ্গে-সঙ্গেই, 'হ্যাঁ, খুললাম। আমাদের দলে একজন তালা খোলার ওস্তাদ ছিল। সে-ই খুলে দিল লকটা। তখন প্রাণীটাকে বের করে আমরা মহাকাশযানে তুলে নিয়ে রওনা হলাম। আমাদের দলের সবাই তো খুব খুশি। এই প্রাণীটাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা নতুন খেলা চালু করা যাবে আমাদের সার্কাসে।

'প্রাণীটার কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার আমরা লক্ষ করলাম। ওটা ইচ্ছেমতো নিজের গায়ের রং খুব তাড়াতাড়ি পালটে ফেলতে পারে। আর ওটার আশ্চর্য ক্ষমতা হচ্ছে, পরিবেশ বা পটভূমির সঙ্গে গায়ের রং হুবহু মিলিয়ে দিতে পারে। ফলে তখন প্রাণীটাকে অদৃশ্য মনে হয়। ধরুন, কোনও দেওয়ালের সামনে ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেওয়ালটায় এলোমেলোভাবে পাঁচরকম রং লাগানো রয়েছে। ওই অবস্থায় ইচ্ছে হলেই এই নিভিয়ালটা দেওয়ালের রঙের নকশা হুবহু কপি করে

ফেলতে পারে নিজের গায়ে। তখন ওকে আপনি দেখতেই পাবেন না। অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হবে।'

উন্নত ধরনের বহুরূপী? রুপোলি আগন্তুকের কথা শুনে অন্তত তাই মনে হল। কিন্তু সিরা-টু-র বাসিন্দারা এই নিভিয়ালটাকে ক্ষতিকর মনে করেছিল কেন? সে-কথা জিগ্যেস করতেই আগন্তুক বলল, 'সেটা ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি। নিভিয়ালটা আপনাদের এখানে এসে কোনও শব্দ করেনি, তাই না?'

আমরা মাথা নেড়ে জানালাম, তাই।

'আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ওটা প্রায় সবসময় চিৎকার করে, কিন্তু তার সবটাই খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে—সুপারসনিক লেভেলে। এই কম্পাঙ্কের শব্দ সিরা-টু-র বাসিন্দারা বোধহয় সহ্য করতে পারেনি। এতে হয়তো ওদের শরীরের ক্ষতি হতো। সে যাই হোক, নিভিয়ালটাকে আমাদের খাঁচায় বন্দি করে ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক এঁটে দিয়েছিলাম। তার বাইরে থেকে প্রাণীটাকে আমরা কয়েকজন খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম। তাতে দেখলাম, ওটা খুশিমতো নিজের চেহারা পালটাচ্ছে। আবার কোনও জিনিসকে পছন্দ হলে তাকে হুবহু কপিও করে ফেলছে—।'

আমি ডক্টর রাঘবনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এবারে বুঝলেন তো আপনার টাইগার মিস্ট্রি! আর অর্ধেক বাঘের ব্যাপারটাও বোঝা যাচ্ছে। কৃষ্ণনকে এবার ওপর থেকে নেমে আসতে বলুন।'

ডক্টর রাঘবন হেসে এরিনার মাঝে এগিয়ে গেলেন। ওপরে তাকিয়ে হাত নেড়ে কৃষ্ণনকে নেমে আসতে বললেন। বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর কৃষ্ণন দড়ির মই বেয়ে নামতে শুরু করল।

রুপোলি আগন্তুক তখনও কথা বলছিল, 'নিভিয়ালটাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। ওটার অদৃশ্য হওয়া, সুপারসনিক চিৎকার, যখন-তখন চেহারা পালটানো, সবকিছুই আমাদের সার্কাসের পক্ষে ভালো। কিন্তু শুধু একটা ব্যাপারেই সমস্যা দেখা দিল—।'

আগন্তুকের চকচকে রুপোলি কপালে ভাঁজ পড়ল। চিন্তার সুরে সে বলল, 'কিছুতেই আমরা নিভিয়ালটাকে বন্দি করে রাখতে পারছি না। আর পারছি না বলেই হাইপারস্পেস দিয়ে আমাদের গ্রহে ফিরে যাওয়ার সময় কীভাবে যেন ওটা লক খুলে পালিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ করে আপনাদের সার্কাসে এসে হাজির হয়েছে। এখানে ওটার এসে পড়াটা নেহাতই একটা অ্যাকসিডেন্ট। স্পেস কার্ভেচার আর স্পেস হোলের ব্যাপার—যেমন করে হোক এসে পড়েছে। তারপর ওর কো-অরডিনেট হিসেব করে এখানে এসে পৌঁছোতে আমারও বেশ সময় লেগে গেল। এখন ওকে নিয়ে একটা স্পেস হোল দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব, ফিরে যাব আমাদের স্পেসক্র্যাফটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিভিয়ালটাকে হয়তো ছেড়েই দিতে হবে।'

'কেন, ছেড়ে দেবেন কেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কিছুতেই ওটাকে কম্বিনেশান লক দিয়ে আটকে রাখতে পারছি না। ওই সিন্দুকের কম্বিনেশান লকের গায়ে "প্রাইম লক" কথাটা লেখা ছিল। তার একটাই অর্থ হতে পারে। ওই কম্বিনেশানের নম্বরটা একটা মৌলিক সংখ্যা—প্রাইম নাম্বার।'

বর্মন আমার কাছে সরে এসে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'সরকার, প্রাইম নাম্বার ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

আমি নীচু স্বরে জবাব দিলাম, 'একটা পূর্ণসংখ্যা, যাকে ১ আর সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়—এ ছাড়া অন্য কোনও পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মেলে না। যেমন ১৩, ৫৯, ১৪৯, ৩৩৩১। কেন, এগুলো পড়েননি? ইস্কুলে ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ানো হয়।'

বর্মন হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, 'ওই একটা ব্যাপারেই আমি একটু বেশি উইক।'

আগন্তুক বলছিল তখনও, 'তারপর থেকে আমরা এমন একটা প্রাইম নাম্বার বের করার চেষ্টা করছি যেটা অন্তত দশ অঙ্কের হবে। কারণ সিন্দুকের প্রাইম লকে দশটা কম্বিনেশন ডিজিট ছিল। আমরা আন্দাজে একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে কম্বিনেশন লক সেট করেছিলাম, কিন্তু সেটা এই নিভিয়ালটা উৎপাদকে ভেঙে ফেলেছে। অর্থাৎ, সংখ্যাটা মৌলিক সংখ্যা ছিল না। ফলে উৎপাদকে ভেঙে ফেলামাত্রই লকটা খুলে ফেলেছে প্রাণীটা।'

'কী সংখ্যা দিয়েছিলেন?' ডক্টর রাঘবন এর মধ্যে কৃষ্ণনকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। উনিই কৌতূহলে প্রশ্নটা করলেন।

আগন্তুক বলল, '৪২৯৪৯৬৭২৯৭।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'এর উৎপাদক হল ৬৪১ আর ৬৭০০৪১৭। এই দুটো সংখ্যার গুণফল ওই দশ অঙ্কের সংখ্যাটা। তবে এই উৎপাদক দুটো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা।'

আড়চোখে দেখি বর্মন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুপোলি মানুষটা আমার দিকে এক-পা এগিয়ে এল। অনুনয়ের সুরে বলল, 'একটা দশ অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা বলে দিয়ে আমাকে বাঁচান। এই নিভিয়ালটাকে আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাই না।'

লক্ষ করলাম, সকলেই আমার দিকে প্রত্যাশা-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে। আমি একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা ভেবে নিয়ে ওটাকে "প্রাইম টেস্ট" প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিলাম। সঠিক উত্তর বেরোতে অন্তত দশ মিনিট লাগবে। আমি আগন্তুককে বললাম, 'দশ মিনিট অপেক্ষা করুন।'

এগারো মিনিট পর পরীক্ষা শেষ হল। তখন আমি মৌলিক সংখ্যাটা জানালামঃ '৫৭৬৩২১১৮৯৭।'

আগন্তুক সংখ্যাটা একবার শুনে নিয়েই বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু, আর ভয় নেই। আমি তা হলে এবার নিভিয়ালটাকে নিয়ে ফিরে যাই?'

আমরা সবাই পিছিয়ে দাঁড়ালাম। আগন্তুক নিভিয়ালটার কাছে গেল। ডান হাতটা শূন্যে তুলে নতুন ধরনের একটা ভঙ্গি করল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আর প্রাণীটাকে ঘিরে একটা লাল আলোর রেখা দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগল। সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যেই ওদের ঘিরে একটা প্রতিপ্রভ আলোর জালে তৈরি ঘনক দেখা গেল। নিভিয়ালটার চেহারা তখনও একটু-আধটু পালটাচ্ছে।

রুপোলি আগন্তুক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে হাসল। বলল, 'সুযোগ হলে আমাদের সার্কাস আপনাদের একদিন দেখাব—।'

কৃষ্ণন বিড়বিড় করে বলল, 'তার আর দরকার নেই। এর মধ্যেই ঢের সার্কাস দেখা হয়ে গেছে আমাদের।'

হঠাৎ লাল ঘনক সমেত ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। শুধু আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে ডক্টর রাঘবন সবাইকে সবকিছু গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আবার শুরু হল কর্মব্যস্ততা।

রাঘবন আমাদের ডেকে নিয়ে চললেন ওঁর অফিসঘরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় পাঁচটা।

রাঘবনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে আমি আর সন্দীপ বর্মন বেরিয়ে এলাম রকেট সার্কাসের বাইরে।

বর্মন বলল, 'সরকার, এই ব্যাপারটার রিপোর্ট আপনি নিজে লিখবেন, ও আমার দ্বারা হবে না।'

ঢালু জায়গাটা বেয়ে নামতে-নামতে আমি বললাম, 'ঠিক আছে—।'

'এখন তাড়াতাড়ি চলুন, ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে।'

'আমারও—' কথাটা বলেই আমি অবাক হলাম। আমার ঘুম পাচ্ছে! অথচ স্লিপ সার্কিট আমি 'অন' করিনি। ব্যাপারটা ডক্টর অভিজিৎ মজুমদারকে জানাতে হবে। আমার স্বাভাবিকভাবে ঘুম পাচ্ছে!

গাড়ির কাছে এসে আমি পকেট থেকে রিমোট ইউনিট বের করলাম। বোতাম টিপতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। চোখ পড়ল আকাশের দিকে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে।

শর্বরীর কথা মনে পড়ল। বুকপকেটে হাত রাখতেই ভিজিটিং কার্ডটা টের পেলাম। শর্বরীদের বাড়িতে একদিন যাব। ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমার দুঃখকষ্টের অন্ধকার রাতগুলো একদিন যেন শেষ হয়ে যায়।



ভয়ঙ্কর ভাইরাস

এক

ছোটকা একদৃষ্টে আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

ওটার গায়ে আলো ফেললেই ওটা সুড়সুড় করে অন্ধকার লক্ষ করে ছুটছে। তারপর অন্ধকারে পৌঁছেই একেবারে চুপ। যেন মাটির তৈরি খেলনা-আরশোলা।

আসলে আরশোলাটা মাটির তৈরি নয়। মাইক্রোপ্রসেসর, আই-সি চিপ আর ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি। ছোটকার হাতে তৈরি রোবট-আরশোলা। কিছুদিন হল ছোটকা 'ইনসেক্ট রোবট' নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছে।

ল্যাবরেটরির মেঝেতে আয়েশ করে বসে রোবট-আরশোলাটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল ছোটকা। ডান হাতের দু-আঙুলের ফাঁকে সরু চুরুট। কপালে ভাঁজ, চোখ ছোট। একটা টেবিলের ছায়ায় চুপটি করে দাঁড়ানো আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন ভাবছে।

ছোটকার দু-পাশে বসে ছিল হুবহু একইরকম দেখতে দুই রত্নঃ চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত। ওরা চোখ বড়-বড় করে ওদের ছোটকার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। সত্যি, ছোটকা যেন ইলেকট্রনিক-জাদুকর! সবসময় নতুন কিছু করে যমজ দুই ভাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

'কী ভাবছ, ছোটকা?' চন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

ঘরের দেওয়ালে ঘুরে বেড়ানো একটা টিকটিকির দিকে আঙুল দেখিয়ে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'পরে ভাববে, ছোটকা। আগে আরশোলাটাকে এদিকে টেনে নিয়ে এসো। নইলে টিকটিকিটা নেমে এসে ওটাকে টপ করে গিলে ফেলবে। তারপর...।'

ছোটকা ইন্দ্রের দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাসল। তারপর টর্চ জ্বেলে তাক করল আরশোলাটার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ছুট লাগাল অন্ধকার আস্তানার দিকে।

চন্দ্রকান্ত আরশোলাটার দৌড় দেখে হেসে ফেলল ঃ 'কী দারুণ! একেবারে আসল আরশোলার মতো!'

ছোটকা গম্ভীরভাবে বলল, 'বুঝলি, ঝালা-পালা, আরশোলা দিয়ে শুরু। তবে আমার টার্গেট হল নতুন মডেলের একটা অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গান তৈরি করা। যার ক্যারেকটার হবে ঠিক ওই রোবট-আরশোলার মতন। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ফাইটার প্লেন যদি ওই অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গানের ওপরে সার্চলাইটের আলো ফ্যালে তা হলে চাকা-লাগানো ফ্রেমে-বসানো বন্দুকটা অটোমেটিক কায়দায় অন্ধকারে ছুটে গিয়ে শেলটার নেবে। ইন্ডিয়ার ডিফেন্স রিসার্চ এখন এই ধরনের অটোমেটিক মোবাইল অস্ত্রশস্ত্রের ওপরে গবেষণা চালাচ্ছে—কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে।'

চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত যমজ দুই ভাই। বাচ্চা বয়েসে ওরা কান্নাকাটি করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত, কান ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা ওদের নাম রেখেছে 'ঝালা-পালা'।

ছোটকা কাজ করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। ডিফেন্স রিসার্চের সঙ্গেও কীরকম যেন যোগাযোগ আছে। আর ইলেকট্রনিক্স হল ছোটকার সবচেয়ে প্রিয় নেশা। সুযোগ পেলেই নিজের ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকে পড়ে।

গত সাতদিনে ছোটকা তিনটে রোবট-পোকা তৈরি করেছে। একটা শুঁয়োপাকা, একটা ঝিঁঝিপোকা, আর লেটেস্ট এই আরশোলা।

চন্দ্রকান্ত অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গান নিয়ে কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হঠাৎই শুনতে পেল খনখনে গলায় কে যেন বলছে, 'ভাইরে ভাই, আমার ভেতরে ভাই, সর্বনাশা ভাই, ওরে জবর ভাই...।'

একইসঙ্গে ধাতব পা ফেলার ঠংঠং আওয়াজ হচ্ছিল। চন্দ্র আর ইন্দ্র ইশারা করে চোখাচোখি করল। ছোটকা চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'একে নিয়ে তো মহা ঝামেলা!'

বলতে-না-বলতেই ঘরে ঢুকে পড়ল হাফপ্যান্ট পরা তিনফুট হাইটের বাচ্চা-রোবট ঝামেলা। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড—রুপোর মতো ঝকঝক করছে।

ছোটকা ওকে জিগ্যেস করল, 'তোমার আবার কী প্রবলেম হল?তোমার ভেতরে আবার 'ভাই' কীসের! একবার বলছ সর্বনাশা ভাই, একবার বলছ জবর ভাই—কী ব্যাপার বলো তো! তোমার দু-ভাই ঝালা-পালা তো এখানে বসে আছে!'

চন্দ্র বলল, 'ছোটকা, বাচ্চা-রোবট তো, ভেতরে আর বাইরে গুলিয়ে ফেলেছে।'

ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, এই দুই বিচ্ছু ভাইযুগলের কথা বলছি না। আরও ডেঞ্জারাস ভাই...ভাই...ভাইরাস।'

ছোটকা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'ও, তাই বলো! বেচারা ভাইরাস বলতে গিয়ে আটকে গেছে। কীরে, ঝালা-পালা, তোরা ঠিক করে ওকে ট্রেনিং দে! কথা বলতে গিয়ে বারে-বারে আটকে যায়—সাধু-চলতি ভাষা মিশিয়ে কথা বলে! তা ছাড়া এখানে ভাইরাস আসবে কোথা থেকে?'

'সে-ভাইরাস নয়। আমার অন্তরে কম্পিউটার ভাইরাস ঘুস গিয়া।'

ঝামেলা ওর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়তে-নাড়তে বলল। ওর কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো উলটো-পালটাভাবে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

'কম্পিউটার ভাইরাস!' ছোটকা কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'হতে পারে। কারণ, ক'দিন ধরেই দেখছি তুমি উলটোপালটা বকে চলেছ। আপনমনে দু-হাত তুলে নাচছ আর বেড়ালের মতো মিঁউ মিঁউ করে ডাকছ।'

ঝামেলা তখন কীর্তনিয়ার ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে আর হাতের আঙুলগুলো ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে তালে-তালে হাত ঘোরাচ্ছে। সেইসঙ্গে বিড়বিড় করে আওড়ে চলেছে ঃ 'ভাইরে ভাই, ওরে জবর ভাই। আমার ভেতরে ভাই, আমার বাইরে ভাই...।'

ঝালা-পালা ঝামেলাকে কাছে ডাকল।

ঝামেলা হেলেদুলে যমজ দু-ভাইয়ের কাছে এল।

চন্দ্র জিগ্যেস করল, 'তুমি এখন কী করছিলে?'

ঝামেলা বলল, 'দোতলার ভেরান্ডায় মর্নিং ওয়াক করছিলাম।'

মর্নিং ওয়াক! ছোটকা আঁতকে উঠল। এখন ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। রাত আটটার সময় রোবটটা মর্নিং ওয়াক করছে! নিশ্চয়ই ওটার ভেতরে বড়সড়ো কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। হয়তো রিয়েল টাইম ক্লকটাও অকেজো হয়ে গেছে।

'তুমি রাত আটটার সময় মর্নিং ওয়াক করছ!' ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ।' ঝামেলা উদাসীনভাবে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাদের নলেজে থাকা দরকার আমি ধীরে-ধীরে নিশাচর প্রাণী হয়ে যাইতেছি।'

এ-কথা শুনে ছোটকা আর ঝালা-পালা হাঁ করে বাচ্চা-রোবটটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝামেলা ছোটকারই হাতে তৈরি। ঝালা-পালাকে এই বাচ্চা রোবটটা ছোটকা প্রেজেন্ট করেছিল। সবসময় ঝামেলা বাধায় বলে ছোটকাই ওর নাম রেখেছে ঝামেলা। এখন ঝামেলা এক নতুন ঝামেলা নিয়ে হাজির হয়েছে ওদের সামনে।

বলে কী রোবটটা! ও ধীরে-ধীরে নিশাচর প্রাণী হয়ে যাচ্ছে!

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'শোন, কেস খুব সিরিয়াস। মনে হয় কম্পিউটার ভাইরাসের জন্যেই এরকম হচ্ছে। লাস্ট উইকে ওর প্রোগ্রামগুলো যখন আপগ্রেড করছিলাম তখন একটা ফ্লপি ওর মেমোরির সঙ্গে কানেক্ট করেছিলাম। তখনই হয়তো কোনও ভাইরাস প্রোগ্রাম ওর মেমোরিতে ঢুকে পড়েছে।

ঝালা-পালা ছোটকার কথা শুনল বটে, তবে ভালো করে কিছু বুঝতে পারল না।

ছোটকা বলল, 'এই চন্দ্র, আমার ঘরের টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে আয় তো!'

চন্দ্রকান্ত লাফিয়ে উঠে পড়ল। 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি' বলে ছুট লাগাল ছোটকার ঘরের দিকে।

ঝামেলা তখন বলছে, 'আমি নকটার্নাল, আমি নিশাচর। আমি নকটার্নাল, আমি নিশাচর।'

ঝামেলার ছোটখাটো সমস্যা হলে ছোটকা নিজেই ঠিকঠাক করে দেয়।

তবে ওর বড়সড়ো কিছু হলে ওকে পাঠানো হয় ড. প্রকাশ দেবনাথের কাছে। ডা. দেবনাথ গত পনেরো বছর ধরে 'রোবট ইনটেলিজেন্স', 'কম্পিউটার ভাইরাস' আর 'মেশিন লার্নিং সিস্টেম' নিয়ে গবেষণা করছেন। বিজ্ঞানীমহলে ওঁর গবেষণা দারুণ কদর পেয়েছে। 'রোবোটিক রিসার্চ' সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হলেই ভারত সরকারের উঁচুমহল থেকে ড. দেবনাথের ডাক আসে। তা ছাড়া ছোটকার 'ইনসেক্ট রোবট' গবেষণাতেও ড. দেবনাথ দরকার পড়লেই ছোটকাকে সাহায্য করছেন।

চন্দ্র ফোনটা নিয়ে এসে ছোটকার হাতে দিল। ছোটকা শেষ হয়ে আসা চুরুটটা হাত বাড়িয়ে একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর ড. দেবনাথের নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল।

ঝামেলা তখনও কীর্তনিয়ার ঢঙে নাচছিল আর ওর নিশাচর হয়ে যাওয়ার প্রবণতা নিয়ে যা-খুশি-তাই গাইছিল।

চন্দ্রকান্ত ওর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু হয়ে কথা বন্ধ করো।'

আদেশ পাওয়ামাত্রই বাচ্চা-রোবটটা ফ্রিজ শট হয়ে গেল। ছোটকা ততক্ষণে ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে।

'ড. দেবনাথ? আমি প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন। হঠাৎ কী মনে করে?'

'আর বলবেন না! আমাদের বাচ্চা-রোবটটাকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছি...।'

'কেন, ঝামেলা আবার কী ঝামেলা করল?' ড. দেবনাথ হেসে জানতে চাইলেন।

ছোটকা বলল, 'ও তো বলছে ওর ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে। তারপর এও বলছে, ও নাকি ধীরে-ধীরে নিশাচর হয়ে যাচ্ছে।'

ফোনের ও-প্রান্তে প্রকাশ দেবনাথ হাসিতে ফেটে পড়লেন। একটু পরে হাসির দমক সামলে নিয়ে বললেন, 'নিশাচর হয়ে যাচ্ছে! কখনও কোনও রোবটের এই টাইপের প্রবলেম হয়েছে বলে

শুনিনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...।' ড. দেবনাথের হাসি আর থামতেই চায় না।

ছোটকা বলল, 'মনে হয় ওর "লার্নিং সিস্টেম"-এর মধ্যেও কোনও গোলমাল হয়েছে।'

ঝামেলার মধ্যে একটি 'লার্নিং সিস্টেম' আছে। সেটা ওকে রোজকার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন-নতুন জিনিস শিখতে সাহায্য করে। এর ফলে ওর 'নলেজ বেস' ক্রমাগতই বাড়তে থাকে।

'ওকে নিয়ে চলে আসুন আমার কাছে। কখন আসবেন?' ড. দেবনাথ জানতে চাইলেন।

'আপনার যখন সুবিধে। যদি বলেন কাল সকালে...এই ধরুন দশটা নাগাদ...যেতে পারি।'

'উঁহু, কাল দশটায় আমার ইন্সটিটিউটে একটা মিটিং আছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সময় নিলেন প্রকাশ দেবনাথ। তারপর বললেন, 'আজ রাতে আসতে পারবেন? এলে আমার একটা দারুণ আবিষ্কার দেখাব। শুনলে আপনি চমকে যাবেন।'

'কী আবিষ্কার?'

'ফোনে বলব না—এলে বলব। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, এই নতুন ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোনও রিসার্চ পেপার ছাপাতে পারব না। তাতে সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে।'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ সরু হল।

এমন আবিষ্কার যেটা গোপন রাখাই ভালো!

ড. প্রকাশ দেবনাথ আগে কখনও এরকম কথা বলেননি। বরং উৎসাহ নিয়ে নতুন আবিষ্কারের কথা ছোটকাকে জানিয়েছেন। বলেছেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনাকে জানিয়ে রাখলাম, কারণ কখনও দরকার পড়লেই আমাকে ডাক দেবেন। দেশের জন্যে জান হাজির।'

সেই বিজ্ঞানীর মুখে আজ এরকম কথা!

'আপনার এই নতুন আবিষ্কার জানাজানি হলে কার সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

'আপনার, আমার, সবার। পৃথিবীর কোনও দেশই সেই বিপদের আওতা থেকে বাদ যাবে না।' ড. দেবনাথ সিরিয়াস গলায় বললেন।

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি ঝামেলাকে নিয়ে রওনা হচ্ছি। মনে হচ্ছে, আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার বাড়ি পৌঁছে যাব।'

মোবাইল ফোন অফ করে দিল ছোটকা।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ছোটকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ছোটকা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

ছোটকা শূন্য চোখে ল্যাবরেটরির একটা জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ভুলে গেছে রোবট-আরশোলার কথা, ঝালা-পালার কথা,

এমনকী ঝামেলার কথাও।

'কী হল, ছোটকা?' চন্দ্র অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করল।

ছোটকা যেন চমকে উঠল। বলল, 'শোন, তোরা লেখাপড়া নিয়ে বসে যা, নইলে বউদি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। আমি ঝামেলাকে নিয়ে বেরোচ্ছি—ড. দেবনাথের বাড়ি যাচ্ছি। মনে হয় ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'ঝামেলা স্ট্যাচু কাটাকুটি—।'

এ-কথা বলামাত্রই ঝামেলা একটা লম্বা হাই তুলে বলল, 'ভোর হয়ে গেছে? এক কাপ চা দাও—।'

ছোটকা বলল, 'ব্যাটা নিশাচরের অভিনয় করছে নাকি রে?'

চন্দ্র বলল, 'কে জানে! আবার ভাইরাসও হতে পারে।'

ছোটকা ঝামেলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ডাক্তারখানায় চলো। সেখানেই বোঝা যাবে তোমার অসুখটা আসলে কী। সত্যি-সত্যি তোমার ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে, নাকি তুমি এঁচোড়ে পাকা হয়ে উঠেছ...।'

ঝামেলা বলল, 'এঁচোড় পাকলে কাকের কী।'

ইন্দ্রকান্ত ওর ভুল শুধরে দিয়ে বলল, 'ভুল হল, ঝামেলা। কথাটা হচ্ছে, বেল পাকলে কাকের কী।'

ঝামেলা ওর বড়-বড় কাচের গুলির মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'জানি, জানি। জ্ঞান দেওয়াটা এই যমজদিগের হ্যাবিট হইয়া গিয়াছে। শোনো বৎসগণ, বেলটা আসলে বড় একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে বলিয়া বেল চেঞ্জ করিয়া এঁচোড় করে দিলাম।'

ছোটকা ওর হাত ধরে টান মারল। ঝামেলার ঢং নকল করে বলল, 'চলো, চলো, ঢের পাকামি হইয়াছে।

দুই

পৌনে ন'টা নাগাদ ড. প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে পৌঁছে গেল ছোটকা।

সল্টলেকের এ. ই. ব্লকে সবুজ বাগান দিয়ে ঘেরা চমৎকার দোতলা বাড়ি। সদর দরজার কাছে সাদা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় নুড়ি-ছড়ানো পথটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির পাশ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল ছোটকা। তারপর ঝামেলাকে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোল।

নুড়ির ওপর পা ফেলে হাঁটতে ঝামেলার বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তাই ছোটকা ঝামেলার হাত ধরে সামাল দিচ্ছিল—যাতে পঞ্চাশ কেজি ওজনের নেড়া মাথা রোবটটা কাত হয়ে পড়ে না যায়।

সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাথার ওপরে একটা নীল বাতি দপ করে জ্বলে উঠল। দরজার পাশেই লুকোনো স্পিকার থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠলঃ 'ড. প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে আপনাকে স্বাগত জানাই। দয়া করে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে নিজের পরিচয় জানান।'

ছোট্ট একটা ঘষা কাচের জানলায় আলো জ্বলে উঠল। তার নীচে লেখাঃ 'এখানে বুড়ো আঙুল চেপে ধরুন।'

ছোটকা এতটুকু অবাক হল না। কারণ, ড. দেবনাথের বাড়িতে ছোটকা আগেও বহুবার এসেছে। বাড়ি আর ল্যাবরেটরিকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রকাশ দেবনাথ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

রেকর্ডেড ভয়েসের নির্দেশমতো ঘষা কাচের জানলায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল ছোটকা। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যান্ত্রিক ঢঙে কথা শোনা গেলঃ 'পরীক্ষা করে পরিচয় যাচাই করা হয়েছে। প্রসেনজিৎ চৌধুরী ভেতরে আসতে অনুরোধ করছি।'

একটা স্লাইডিং প্যানেল পাশে সরে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথ খুলে গেল। ছোটকা আর ঝামেলা ভেতরে ঢুকল। স্লাইডিং প্যানেল আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঝামেলা আপনমনেই বলে উঠল, 'গোটা বাড়িটায় কেমন যেন যন্ত্র-যন্ত্র গন্ধ।'

ছোটকা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'যন্ত্র কখনও যন্ত্রের গন্ধ পায়!'

ঝামেলা অভিমানে ছোটকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজেকে যন্ত্র ভাবতে ওর ভালো লাগে না।

আলো-ঝলমলে ড্রইংরুমে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। ঝামেলা দু-চোখের ওপরে হাতের পাতা রেখে আলো আড়াল করার চেষ্টা করছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল, 'আমি নিশাচর। এখন বুঝিতে পারিতেছি, দিনের বেলা পেঁচকের কত কষ্ট।'

হঠাৎই ড্রইংরুমের শেষপ্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল। একজন লোক ছোটকাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

লোকটার চলার ভঙ্গিতে কেমন একটা হ্যাঁচকা মারা টান চোখে পড়ল। তারপর, আরও কাছে এলে, ছোটকা লক্ষ করল ওর মুখে একটা তেল-চকচকে ভাব। তা ছাড়া মাথার চুলও এমন পরিপাটিভাবে ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, মনে হচ্ছে যেন প্লাস্টিকের তৈরি।

লোকটার পরনে গাঢ় রঙের ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা চেক শার্ট। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। শরীরের তুলনায় পা দুটোকে সরু-সরু মনে হচ্ছে। আর ওর বাঁ-হাতের পাঞ্জা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। কারণ, ছোটকার সূক্ষ্ম নজর বুঝতে পারল, ওটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি।

ছোটকার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা। ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। তারপর বলল, 'আসুন, মিস্টার চৌধুরী, ডক্টর দেবনাথ আপনার জন্যে ল্যাবরেটরিতে ওয়েট করছেন।'

লোকটার গলার স্বর বেশ গম্ভীর, তবে তার সঙ্গে কোথায় যেন একটু ধাতব উপসুর মিশে রয়েছে।

ড. দেবনাথের বাড়িতে এসে এই লোকটাকে ছোটকা আগে কখনও দেখেনি। তাই জিগ্যেস করল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম রোবিদাস। র-এ ও-কার, ব-এ হ্রস্ব-ই...।'

'থাক, থাক—আর বানান করতে হবে না।'

ছোটকা বুঝল, রোবিদাস প্রকাশ দেবনাথের সাম্প্রতিক মডেলের রোবট। কিন্তু ওর বাঁ-হাতটা স্টিলের কেন? মানুষের মতো দেখতে রোবট তৈরি করতে চাইলে স্টিলের ওপরে পলিমারের চামড়া সেঁটে দেওয়াটাই রেওয়াজ। শুধু বাঁ-হাতের পাঞ্জাটুকু ঢাকা না দেওয়ার মানে কী?

'রোবিদাস' নামটা মনে-মনে আওড়াল ছোটকা। রোবট আর যন্ত্রদাস শব্দ দুটো জুড়ে কি নামটা ড. দেবনাথ তৈরি করেছেন?

ঝামেলা অবাক হয়ে রোবিদাসকে দেখছিল। কারণ, রোবটের মতো দেখতে নয় এমন রোবট ও আগে কখনও দেখেনি। কিংবা দেখলেও বুঝতে পারেনি।

ওরা তিনজনে যখন ড. দেবনাথের ল্যাবের দিকে এগোচ্ছে তখন ছোটকার নজর এড়িয়ে রোবিদাস ঝামেলাকে মুখ ভ্যাংচাল। জবাবে ঝামেলা রোবিদাসকে লাথি দেখাল।

রোবিদাস চাপা গলায় বলল, 'অ-অসভ্য, ছোটলোক...।'

ঝামেলা চোখ পাকিয়ে বলল, 'ব্যাটা লোহা-লক্কড় দিয়ে তৈরি বন্ডেড লেবার।'

ছোটকা পিছন থেকে কথাবার্তার আঁচ পেয়ে ঘুরে তাকাল। তারপর ঝামেলাকে ধমক দিলঃ 'ঝামেলা, কী হচ্ছে! জলদি এসো!'

ঝামেলাকে নিয়ে এই এক মুশকিল। কোনও রোবট ওকে কিছু বললেই ও মুখিয়ে ওঠে। ওর ধারণা, রোবটদের মধ্যে ও সবচেয়ে উন্নত। আর মানুষ বহু বিবর্তনের পর রোবটে এসে পৌঁছেছে।

ছোটকা আজ ঝামেলা ল্যাবের কাচের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল।

একগাল হাসি নিয়ে ছোটকাকে স্বাগত জানালেন প্রকাশ দেবনাথ।

ল্যাবটা মাপে বেশ বড়—অন্তত কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট। তার সঙ্গে লাগোয়া একটা অ্যান্টিচেম্বার আছে। ছোটখাটো মিটিং থাকলে সেখানে সেরে নেওয়া যায়। আর তার পাশেই

সফট্‌ওয়্যার রুম।

ল্যাবটা এয়ারকন্ডিশন্ড। পাঁচটা কম্পিউটার এদিক-ওদিক বসানো। তার মধ্যে দুটো চালু রয়েছে। এ ছাড়া নানানরকম মিটার আর যন্ত্রাংশ তিনটে ওয়ার্ক টেবল-এ গাদাগাদি করে রয়েছে। দুটো ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপও নজরে পড়ল।

ল্যাবে খুব হালকাভাবে আনন্দের সুর বাজছে—এরোপ্লেন ল্যান্ডিং-এর পর যেরকম ফুর্তির সুর বাজানো হয় অনেকটা সেইরকম। ড. দেবনাথ বলেন, এতে নাকি ঝরঝরে তরতাজা মেজাজে গবেষণা করা যায়। মিউজিক সিস্টেমের স্পিকারগুলো দেওয়ালে কোনও প্যানেলের আড়ালে বসানো—তাই চোখে পড়ছে না।

ড. দেবনাথ একটা কম্পিউটারে বসে কাজ করছিলেন। ছোটকাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, 'আরে আসুন, বসুন। অনেকদিন পর দেখা হল।'

ছোটকা একটা চেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ঝামেলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমার সৃষ্টি ঝামেলা এখন অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উলটোপালটা বকবক করে আমাদের সবার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'কোনও চিন্তা করবেন না,' ঝামেলার কাছে গিয়ে ওর নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন প্রকাশ দেবনাথঃ 'কালকের মধ্যেই ওকে মেরামত করে দিচ্ছি। আগে ওর অ্যাক্টিভিটি সুইচটা অফ করে কম্পিউটার হুক-আপ করে রুটিন প্রোগ্রামগুলো চেক-আপ করতে হবে।'

রোবিদাস একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ড. দেবনাথ ওকে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

রোবিদাস এগিয়ে আসতেই ঝামেলার সুইচটা অফ করে দিলেন প্রকাশ দেবনাথ, বললেন, 'এই রোবটাকে সফ্‌টওয়্যার রুমে নিয়ে গিয়ে রেসিডেন্ট রুটিনগুলো চেক করে নাও। তারপর "সুপারস্ক্যান" অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রামটা চালিয়ে ভাইরাস ডিটেক্ট করো। তারপর সেগুলো ক্লিন করা যায় কি না দ্যাখো।'

রোবিদাস 'ইয়েস, স্যার' বলে পঞ্চাশ কেজি ওজনের বাচ্চা রোবটটাকে অবলীলায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর আয়েশ করে পা ফেলে—যেন বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়েছে—হাঁটা দিল সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে।

রোবিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ছোটকা বলল, 'এটাই আপনার নতুন আবিষ্কার?'

প্রকাশ দেবনাথ সামান্য চমকে উঠে বললেন, 'না, না—এই রোবো-অ্যানড্রয়েডটা মাসদেড়েক হল তৈরি করেছি। আমার ল্যাবে বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করার জন্যে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার হয়ে পড়েছে। মানুষের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব নয়। আবার সাধারণ ডোমেস্টিক মোবাইল রোবট দিয়েও কাজ হবে না। তাই একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়ে চৌকস করে রোবিদাসকে তৈরি করেছি।

নামটা রেখেছি রোবট আর যন্ত্রদাস অ্যামালগাম করে। আর-একটা ব্যবস্থা রেখেছি—যখনই ও কাউকে নিজের পরিচয় দেয়, তখন নামের বানানটাও শুনিয়ে দেয়...।'

প্রকাশ দেবনাথ হাসলেন।

ছোটকাও হেসে বলল যে, হ্যাঁ, পরিচয় দেওয়ার সময় রোবিদাস ছোটকাকেও নামের বানানটা বলছিল।

'ওর বাঁ-হাতটা ওরকম ইস্পাতের খোলামেলা রেখে দিয়েছেন কেন? পলিমারের কোনও চামড়ার কোটিং দেননি...অথচ শরীরের বাকি অংশটা...।'

ছোটকার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন ড. দেবনাথঃ 'প্রথমে ভেবেছিলাম রোবিদাসকে অ্যানড্রয়েড মডেলে বানাব। তাতে ওকে দেখতে হুবহু মানুষের মতো হতো। এমনকী চামড়া, পেশি-টেশি সবই আসল বলে মনে হতো। পরে ভাবলাম, না, ও যে মানুষ নয়, রোবট, সেটা সবাইকে আমি জানাতে চাই। কারণ, যন্ত্র যন্ত্রই—সেটা ভুললে আমাদের চলবে না। রোবট যতই "বুদ্ধিমান" হোক, তার জায়গা সবসময় মানুষের নীচে—এমনকী সবচেয়ে নির্বোধ মানুষেরও নীচে।'

প্রকাশ দেবনাথকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হল।

ছোটকা বিখ্যাত বিজ্ঞানীটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

মুখটা রোগাটে। তাকে ঘিরে কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। ঠোঁটের ওপরে মানানসই গোঁফ। হাই পাওয়ারের চশমার কাচের আড়ালে দুটো বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো চোখ। চোখের পাতা ঘন-ঘন পড়ছে। আর বাঁ-গালে টোল পড়ার গর্ত।

'ইনস্টিটিউট অফ রোবোটিক্স'-এর সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট প্রকাশ দেবনাথ। এরকম আপাদমস্তক সিরিয়াস বিজ্ঞানী ছোটকা খুব কমই দেখেছে। বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রির বহু রিসার্চ প্রজেক্ট ড. দেবনাথের দায়িত্বে রয়েছে।

ড. দেবনাথ বিয়ে করেননি। বিয়ের কথা কেউ বললে বলেন, 'বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।' বাবা-মা-কে নিয়ে সল্টলেকের এই বাড়িতে থাকেন। তবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশিরভাগ সময়টাই ল্যাবে পড়ে থাকেন।

'এবার আপনার বিপজ্জনক আবিষ্কারের কথা বলুন।'

ড. দেবনাথ একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, বলছি।' তারপর একটি কম্পিউটারের কাছে গিয়ে চেয়ারে বসে খটাখট করে কয়েকটা বোতাম টিপলেন, ছোটকার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এই মনিটরটার দিকে তাকান, চৌধুরীসাহেব।'

ছোটকা মনোযোগ দিয়ে তাকাল কম্পিউটারের রঙিন পরদার দিকে। এবং অবাক হয়ে গেল।

কম্পিউটারের মনিটরে অসংখ্য ইংরেজি অক্ষর ঢেউ খেলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন নদীর জলে শ্যাওলা। তারপর অক্ষরগুলো একে-একে টপাটপ খসে পড়তে লাগল নীচে—'স্ট্যাটাস বার'-এর ওপরে, এবং চোখের সামনে উধাও হয়ে যেতে লাগল।

ছোটকা কম্পিউটারে এরকম ভূতুড়ে কাণ্ড কখনও দেখেনি। তাই চেয়ারটা কম্পিউটারের দিকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে মনিটরের ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়ল, ভালো করে দেখতে চাইল ব্যাপারটা।

মিনিটপাঁচেক ধরে চলল ড. প্রকাশ দেবনাথের 'ম্যাজিক'। তারপর কয়েকটা বোতাম টিপে তিনি কম্পিউটার 'শাট ডাউন' করে দিলেন। চেয়ারটা ছোটকার মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিয়ে বসলেন। উজ্জ্বল চোখে ছোটকাকে প্রায় মিনিটখানেক ধরে দেখলেন।

অবশেষে আলতো গলায় বললেন, 'দিস ইজ মাই ডেঞ্জারাস ডিসকাভারি। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান কম্পিউটার ভাইরাস। ইউনিক ভাইরাল প্রোগ্রাম। একে কিছুতেই ধ্বংস করা যায় না। তাই আমি এর নাম রেখেছি "অবিনাশ-২০০২"। দ্য আলটিমেট ভাইরাস প্রোগ্রাম।'

ছোটকা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকাল। সেখানে এখন নিরীহ স্বাভাবিক ছবি। একটু আগেই যে পরদায় অভিনব ঘটনা ঘটে গেছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

'অবিনাশকে আপনি বিপজ্জনক বলছেন কেন?' ছোটকা জানতে চাইল।

'বিপজ্জনক, কারণ, একবার কম্পিউটারে ঢুকে পড়লে এর হাত থেকে আর নিস্তার নেই। কম্পিউটারে সবরকম মেমোরিতে গোলমাল বাধিয়ে যত ডেটা স্টোর করা আছে সব একেবারে তছনছ করে দেবে। তা ছাড়া ধরুন কোনও নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে অনেকগুলো কম্পিউটার জুড়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা আছে। এই ভাইরাস সেই নেটওয়ার্কের যে-কোনও একটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই নেটওয়ার্ক সিস্টেম পুরোপুরি কোলাপ্স করে যাবে।'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সরু হল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'কোনও অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে এটাকে শায়েস্তা করা যাবে না?'

'না—যাবে না। কারণ, সাধারণত অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামগুলো ভাইরাল প্রোগ্রামের "সিগনেচার" খোঁজে—সিগনেচার মানে, ভাইরাল প্রোগ্রামের বিশেষ একটা সাঙ্কেতিক কোড। তারপর ওরা ভাইরাস তাড়ানোর কাজ শুরু করে। আমার তৈরি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা বারেবারে নিজের সিগনেচার বদলায়। রোগ-জীবাণুর ভাইরাস যেমন মিউটেট করে, অনেকটা সেইরকম। এ ধরনের কম্পিউটার ভাইরাসকে "পলিমর্ফিক ভাইরাস" বলে। আমার তৈরি অবিনাশ-২০০২ হল পলিমর্ফিক ভাইরাসের শেষ কথা।'

'তা হলে তো ইন্টারনেটে এই ভাইরাস ঢুকিয়ে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

‘হ্যাঁ, যাবে—গোটা ‘সাইবারস্পেস”টা দূষিত হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা লাটে উঠবে। তা হলেই বুঝুন, এই ভাইরাসটা কীরকম ডেঞ্জারাস!’

‘কোনও ক্রিমিনাল যদি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা হাতে পায় তা হলে...।’

‘তা হলে আর রক্ষে নেই।’ ছোটকার কথা শেষ করলেন প্রকাশ দেবনাথ, ‘যদি কোনও ক্রিমিনাল এই ভাইরাস হাতে পেয়ে কোনও দেশের ব্যাঙ্কিং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর ডিফেন্স কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ঢুকিয়ে দেয়, তা হলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আর ডিফেন্স ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। নেটওয়ার্কগুলো এমনভাবে কোরাপ্টেড হয়ে যাবে যে, আর ওগুলো ঠিক করা যাবে না।’ একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. দেবনাথ। তারপর বললেনঃ ‘সেইজন্যেই বলছিলাম, আমার এই নতুন আবিষ্কার জানাজানি হলে আপনার, আমার—সবার বিপদ। পৃথিবীর কোনও দেশই সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচবে না।’

‘তা হলে এরকম একটা আবিষ্কার আপনি করতে গেলেন কেন?’

‘ইচ্ছে করে কি আর করেছি!’ মুখ নীচু করে হতাশায় মাথা ঝাঁকালেন ড. দেবনাথঃ ‘মাসছয়েক ধরে আমি নতুন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম নিয়ে রিসার্চ করছিলাম। এই করতে-করতে একেবারে আচমকাই অবিনাশকে আবিষ্কার করে ফেলি। তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে ওটা নিয়ে গবেষণা করে যখন বুঝতে পারলাম কী ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি তখন ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। সেইজন্যেই আপনাকে বলেছি, টেলিফোনে বলা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা তো কাউকে-না-কাউকে জানানো দরকার। নিজের আবিষ্কারের কথা কাউকে বলতে না পারলে ভীষণ কষ্ট হয়। আপনাকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি...তাই আপনাকে বললাম।’

ছোটকা গালে কয়েকবার হাত ঘষল। একটা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে আনমনাভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নীচু গলায় জিগ্যেস করল, ‘আপনার এই অবিনাশের কথা আর কে-কে জানে?’

‘আপনি আর আমি—এ ছাড়া আর কেউ না।’

রোবিদাস কখন ঘরে ঢুকে পড়েছে ওরা কেউই খেয়াল করেনি। তাই রোবিদাস যখন কথা বলল, তখন দুজনেই সামান্য চমকে উঠল।

রোবিদাস গম্ভীর গলায় বলল, ‘বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ড. দেবনাথ। ওই রোবটটার মধ্যে তিনরকমের ভাইরাস পা-পা-পাওয়া গেছেঃ “ফু মাঞ্চু”, “ডেটাক্রাইম” আর “ডাইহার্ড-ফোর”। এখন সেগুলোর ক্লিনিং অ-অ-অপারেশান চলছে। ভাইরাসগুলো প-প-পরিষ্কার হয়ে গেলে আপনাকে জানাব। তখন যদি অ-অ-অন্য কোনও প-প-পরীক্ষা করতে বলেন করব।’

ড. দেবনাথ একটু বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে—তুমি যাও, ঝামেলার কাছে থাকো।'

রোবিদাস নিখুঁত ছন্দে হেঁটে সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে চলে গেল।

ছোটকা জিগ্যেস করল, 'রোবিদাস কি তোতলা? ঝামেলারও মাঝে-মধ্যে দু-একটা কথা আটকে যায়।'

ড. দেবনাথ হেসে বললেন, 'না, তোতলা নয়—তবে ওর ভয়েস সিন্থিসিস সিস্টেমে একটু ডিফেক্ট রয়ে গেছে। "অ" কিংবা "প" দিয়ে কোনও শব্দ শুরু হলে ও সেটা হোঁচট না খেয়ে উচ্চারণ করতে পারে না। যাই হোক, অবিনাশের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী বলুন...।'

ছোটকা বলল, 'পরামর্শ একটাইঃ আর কেউ যেন অবিনাশের কথা জানতে না পারে।' হঠাৎ কী ভেবে আরও বলল, 'আচ্ছা, অবিনাশকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না? তা হলে এই বিপজ্জনক ভাইরাসের আর কোনও চিহ্ন থাকবে না...।'

ড. দেবনাথ হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, 'এভাবে কি নিজের আবিষ্কারকে ধ্বংস করে ফেলতে মন চায়!'

ছোটকা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ল্যাবের এককোণে রাখা সবুজ রঙের টেলিফোনটা হঠাৎই বাজতে শুরু করল।

ড. প্রকাশ দেবনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো, ড. প্রকাশ দেবনাথ স্পিকিং...।'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে কেউ অদ্ভুতভাবে হাসল। তারপর ব্যঙ্গ মেশানো হিংস্র গলায় বলল, 'ড. প্রকাশ অবিনাশ দেবনাথ? নাকি অবিনাশের সঙ্গে টু থাউজ্যান্ড টু-টাও বলতে হবে?'

ড. দেবনাথের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রিসিভার ধরা হাতটা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল।

'কে? কে আপনি?' ভয়ার্ত গলায় জিগ্যেস করলেন।

'ধরে নিন আমার নামও অবিনাশ—তবে পদবি ভাইরাস নয়, চাকলাদার।' কথা শেষ হওয়ার পর আবার সেই চাপা হাসি।

ছোটকা ড. দেবনাথকে লক্ষ করছিল। তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আর ঠকঠকানি দেখে ছুটে চলে গেল তাঁর পাশে।

'কী হয়েছে, ড. দেবনাথ? কে ফোন করেছে?'

ড. দেবনাথ ফ্যালফ্যাল করে ছোটকার দিকে তাকিয়ে রইলেন—কোনও কথা বলতে পারলেন না।

অবিনাশ চাকলাদার তখন বলছে, 'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা আমার চাই, প্রকাশবাবু। তা না হলে আপনাকে খতম করে দেব।'

তারপরই লাইনটা কেটে গেল।

ড. প্রকাশ দেবনাথ তখন এয়ারকন্ডিশন্ড ল্যাবে দাঁড়িয়েও কুলকুল করে ঘামছেন।

তিন

ছোটকা কয়েক সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে রইল প্রকাশ দেবনাথের দিকে। তারপর ওরা দুজনে ফিরে এসে দুটো চেয়ারে বসল।

ছোটকা জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, কে ফোন করেছিল? আপনি এত ভয় পেয়ে গেলেন কেন?'

ড. দেবনাথ অবিনাশ চাকলাদারের কথা বললেন।

'কে এই অবিনাশ চাকলাদার? এই নামে কাউকে চেনেন?'

মাথা নাড়লেন প্রকাশ দেবনাথঃ 'না, চিনি না—।'

'ভয়েসটা কি চেনা মনে হল? হয়তো আপনার জানাশোনা কেউ গলার স্বর বদলে ফোন করেছিল।'

'সেরকম তো মনে হল না! কিন্তু লোকটা খবরটা পেল কেমন করে?'

'যেভাবেই পেয়ে থাক—পেয়েছে এখান থেকেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন চিন্তা করল ছোটকা—তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনার রিসার্চের সঙ্গে কারা-কারা যুক্ত আছে?'

'সে-কথা আমিও ভাবছি...' বিড়বিড় করে বললেন ড. দেবনাথ, 'দুজন রিসার্চ স্কলার আমার সঙ্গে এই ল্যাবে কাজ করে। এ ছাড়া আমার ইনস্টিটিউটের তিনজন সায়েন্টিস্ট আমার সঙ্গে জয়েন্টলি রিসার্চ করে। আমাদের রিসার্চ গ্রুপ থেকে যত রিসার্চ পেপার আমরা পাবলিশ করেছি তার সবক'টাতে আমাদের ছ'জনেরই নাম রয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও মনকষাকষি নেই—আমাদের সম্পর্ক এককথায় দারুণ। আমাকে প্রত্যেকেই খুব ভালোবাসে, রেসপেক্ট করে —।'

কোন এক ফাঁকে ছোটকা পকেট থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করে ফেলেছিল। তাতে কীসব লিখতে-লিখতে জিগ্যেস করল, 'আপনার ভাইরাস নিয়ে রিসার্চের কথা বাকি পাঁচজন জানত?'

'অবশ্যই জানত। একসঙ্গে কাজ করি—জানবে না!'

'তা হলে অবিনাশ...।'

'না, অবিনাশের কথা আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না।' বেশ জোরের সঙ্গে বললেন প্রকাশ দেবনাথ।

'তা হলে অবিনাশ চাকলাদার খবর পেল কোথা থেকে?'

'সেটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' প্রকাশ দেবনাথের মুখে কেমন একটা বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার চৌধুরী—খবরটা অবিনাশ চাকলাদার পেয়েছে আমার এই ল্যাব থেকেই...।'

'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা যে সর্বনেশে সেটা আপনি কবে বুঝতে পারলেন?'

'ছ'দিন আগে। সেদিন প্রথম বুঝতে পারলাম, বাজারে চালু কোনও অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে অবিনাশকে শায়েস্তা করা যাবে না। কারণ, সেদিন আমার টেস্টিং কমপ্লিট হয়েছিল। তখন আমি আমার তৈরি কয়েকটা অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম অবিনাশের ওপরে অ্যাপ্লাই করি। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তখনই নাম রাখলাম অবিনাশ-২০০২'। হঠাৎ কী ভেবে ড. দেবনাথ রীতিমতো আঁতকে উঠে বললেন, 'আরে! এই ভাইরাসটার যে নাম রেখেছি অবিনাশ-২০০২ সেটাই বা ওই অবিনাশ চাকলাদার জানল কেমন করে?'

ছোটকা একচিলতে হেসে বলল, 'সেটাই তো তখন থেকে ভেবে চলেছি।'

'আপনি এত প্রশ্ন করায় একটা কথা মনে পড়ছে।' হাতে হাত ঘষলেন প্রকাশ দেবনাথ। ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে কয়েক লহমা কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'ভাইরাসটার কী নাম রাখা যায় সেটা আমি ভাবছিলাম, আর একটা কাগজে নানানরকম নাম লিখছিলাম। প্রায় গোটা তিরিশেক নাম লেখার পর অবিনাশ নামটা আমার মাথায় আসে। তখন সঙ্গে ২০০২-টা জুড়ে দিই। তারপর...তারপর...বাকি নামগুলো কেটে দিয়ে সেই কাগজটা ল্যাবের লিটার বিনে ফেলে দিই...।'

কথা শেষ না করেই ল্যাবের একটা ওয়ার্ক টেবিলের দিকে প্রায় ছুটে গেলেন ড. দেবনাথ। টেবিলটার নীচে একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি রাখা ছিল। সেটার কাছে উবু হয়ে বসে ঝুড়িটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর পাগলের মতো ছেঁড়া দলাপাকানো কাগজগুলো হাঁটকাতে লাগলেন।

কয়েকমিনিট ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছোটকার কাছে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'কাগজটা নেই! অথচ ওই লিটার বিনেই আমি ফেলেছি। আর আমার অর্ডার না পেলে সুইপার লিটার বিন পরিষ্কার করে না।' বারকয়েক মাথা চুলকোলেনঃ 'কোথায় গেল বলুন তো কাগজটা?'

'অবিনাশ চাকলাদারের কাছে।' হেসে বলল ছোটকা। তারপর সিরিয়াস গলায় যোগ করল, 'আমার মোটামুটি যা জানার জেনেছি। কাল সকাল দশটা নাগাদ আমি আপনার কাছে আসব।

আপনার দুই স্কলার আর তিনজন কো-ওয়ার্কার-এর সঙ্গে কথা বলব। আর আপনি আজ রাতে বা কাল সকালে যদি আবার কোনও ভয়-দেখানো ফোন পান তা হলে বলবেন আপনি অবিনাশ চাকলাদারের যে-কোনও প্রস্তাবে রাজি আছেন। তারপর আমি এসে যা করার করব। তবে আপনি চাকলাদারের গলাটা খুব খুঁটিয়ে খেয়াল করবেন—যদি চেনা কোনও গলার আদল খুঁজে পান।'

প্রকাশ দেবনাথ ছোটকার কথায় বাধ্য ছেলের মতো ঘন-ঘন ঘাড় নাড়ছিলেন। ওঁর মুখে-চোখে একটা ভয়ের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটকার কথা শেষ হলে চাপা গলায় একবার বললেন, 'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

ছোটকা অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ানোর মতো সমস্যাটা নিয়ে এলোমেলো ভাবছিল। অবিনাশ চাকলাদার আসলে যে-ই হোক, অবিনাশ-২০০২ তার হাতে গেলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। আর ভাইরাল প্রোগ্রামটা নিয়ে সে যখন কাজে লাগাতে চাইছে, তার মানে ভাইরাল প্রোগ্রাম চালানোর ব্যাপারে তার ভালোই আইডিয়া আছে।

নাঃ, ঘুরে-ফিরে সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হচ্ছেঃ এই ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত পাঁচজনের একজনই অবিনাশ চাকলাদার নাম নিয়ে এই ভয়-দেখানো ফোনটা করেছে। কিন্তু লিটার বিন থেকে কাগজটা যখন সে হাতিয়ে নিতে পারল তখন ভাইরাস প্রোগ্রামটা গোপনে কপি করতে পারল না কেন!

সে-কথাই ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে জিগ্যেস করল।

উত্তরে ড. দেবনাথ বললেন, 'অবিনাশ-২০০২-এর পোটেনশিয়াল জানার পর আমি প্রোগ্রামটাকে সফ্টওয়্যার লক করে রেখেছি। তাতে কেউ চাইলেই ওটা কপি করতে পারবে না। তাকে আগে লকের কোডটা ব্রেক করতে হবে। আমার মনে হয়, অবিনাশ-২০০২-কে লুকিয়ে কপি করতে না পেরে অবিনাশ চাকলাদার হুমকির পথ বেছে নিয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে, আমি নিজে থেকে প্রোগ্রামটা কপি করে না দিলে ওর পাওয়ার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া আমার সফ্টওয়্যার লকের কোডটাও বেশ কঠিন। ওটা ব্রেক করা প্রায় অসম্ভব।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে—এবার উঠি।' ছোটকা উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়েঃ 'আপনি খুব কেয়ারফুল থাকবেন। অবিনাশ চাকলাদারের ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না। আচ্ছা, ঝামেলাকে কি কাল পাওয়া যাবে? নইলে আমার দুরন্ত ভাইপো দুটো আমাকে জ্বালাতন করে মারবে।'

ড. দেবনাথ আনমনা হয়ে কীসব ভাবছিলেন। ছোটকার কথায় হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, 'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কালই ওকে পেয়ে যাবেন।'

প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে একটা চুরুট ধরাল ছোটকা। এতক্ষণ চুরুট খেতে না পেরে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিল।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে মোবাইল ফোন থেকে বাড়িতে একটা ফোন করে দিল ছোটকা। বউদিকে বলল, 'চিন্তা কোরো না, বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব।'

বউদির কাছেই ছোটকা শুনল, ঝালা-পালা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকাল থেকেই ঝামেলার খোঁজ পড়ল।

ঝালা-পালা বায়না ধরল যে, ওরা ঝামেলাকে নিয়ে আসতে যাবে। তার ওপর কাল রাতে ড. দেবনাথের সঙ্গে ছোটকার টেলিফোনে কথাবার্তার সময়ে ওরা একটু রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল। কী একটা আবিষ্কার জানাজানি হলে নাকি সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে। তাই ওরা ছোটকাকে চেপে ধরল।

দু-ভাইয়ের স্কুলে যাওয়া মাথায় উঠল। ওরা শুনতে চাইল ড. প্রকাশ দেবনাথের আবিষ্কার আর সাঙ্ঘাতিক বিপদের গল্প।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল ছোটকা। দু-ভাই হাঁ করে ছোটকার কথা গিলতে লাগল।

সব শোনার পর চন্দ্রকান্ত বলল, 'কিন্তু কম্পিউটার ভাইরাসের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ছোটকা।'

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'আমারও ঠিক মাথায় ঢুকল না।'

ছোটকা হেসে বলল, 'আমিও কি পুরোপুরি বুঝেছি রে! সেইজন্যেই তো কাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে-বসে ইন্টারনেটে ভাইরাসের ওপরে পড়াশোনা করছিলাম। ১৯৪৯ সালে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল বলতে পারিস। তখন বেশিরভাগ মানুষ জানতই না যে, বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার তৈরি করে ফেলেছেন। সেই সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জন ফন নয়ম্যান সহগবেষকদের নিয়ে একটি রিসার্চ পেপার লেখেন। সেটার নাম ছিল "থিয়োরি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ কমপ্লিকেটেড অটোমেটা"। এতে নয়ম্যান যে-আসল কথাটি বলেছিলেন তা হল, কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে-নিজে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে—অনেকটা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির মতো। তখনও কম্পিউটার ভাইরাস নামটা চালু হয়নি। এই নামটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আমেরিকার লেই ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক ফ্রেড কোহেন। ১৯৮৪ সালে কম্পিউটার সিকিওরিটি নিয়ে আমেরিকায় একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে একটা গবেষণাপত্র ফ্রেড কোহেন পেশ করেছিলেন। তাতেই প্রথম তিনি "কম্পিউটার ভাইরাস" কথাটি ব্যবহার করেন। ড. কোহেনের মতে কম্পিউটার ভাইরাস হল এমন একটি প্রোগ্রাম যা অন্যান্য প্রোগ্রামে নিজের একটি কপি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই প্রোগ্রামগুলোকে সংক্রামিত করে।'

ছোটকা চুপ করতেই ঝালা-পালা মাথা চুলকোতে লাগল।

ছোটকা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'কী হল রে, মাথা চুলকোচ্ছিস কেন?'

ইন্দ্র বলল, 'এমনিতে ঠিকই আছে—তবে শেষটা কেমন গুলিয়ে গেল। প্রোগ্রামের মধ্যে প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দিলেই সেটা ভাইরাস হয়ে গেল!'

চন্দ্রও সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

ছোটকাও মাথা চুলকে একচিলতে হাসলঃ 'আমিও কি এ-ব্যাপারে খুব বেশি জানি রে! দাঁড়া, একটা এক্সাম্পল্ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। ধর, একটা অফিসে একজন কেরানিবাবু কাজ করেন। রোজ অফিসে এসে তিনি দেখেন তাঁর টেবিলে সেদিনকার কাজের ফিরিস্তি জানিয়ে একতাড়া কাগজ রাখা আছে। তিনি প্রথম কাগজটা তুলে নিয়ে ওপরওয়ালার লেখা নির্দেশগুলো পড়লেন। সেইমতো সব কাজ শেষ করলেন। তারপর নির্দেশ লেখা প্রথম কাগজটা লিটার বিনে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এরপর আমাদের কেরানিবাবু তুলে নিলেন দ্বিতীয় কাগজটা। তাতে লেখা নির্দেশগুলো পড়ে নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

'এখন ধরা যাক, সেই অফিসে একটা বদমাশ লোক লুকিয়ে ঢুকে পড়ল। সে কেরানিবাবুর কাগজের তাড়ার মধ্যে একটা বাড়তি কাগজ গুঁজে দিল। সেই কাগজটায় নির্দেশ দেওয়া আছেঃ এই কাগজটা দুবার কপি করে তোমার পাশের দুজন কেরানির টেবিলে কাগজের তাড়ার মধ্যে গুঁজে দাও। তখন কেরানিবাবু কী করবেন? বদমাশ লোকটার কাগজটা পেয়ে সেটাকে ওপরওয়ালার নির্দেশ বলে ভাববেন এবং তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে মূল কাগজটা লিটার বিনে ছুড়ে ফেলে দেবেন। তারপর নিয়মমাফিক টেবিল থেকে পরের কাগজটা তুলে নিয়ে আবার কাজে মন দেবেন।

'যে-দুজন নতুন কেরানি কাগজটা পেলেন তাঁরা কী করবেন? তাঁরাও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে বদমাশ লোকটার নির্দেশকে ওপরওয়ালার নির্দেশ ভেবে তার দুটো কপি করে আরও দুজন কর্মীর টেবিলে দিয়ে দেবেন। এর ফলে নির্দেশটা মোট চার কপি হয়ে গেল। এইভাবে প্রতিদিন কাগজটা কপি হয়ে হয়ে অন্যান্য কর্মীদের টেবিলে পৌঁছে যাবে এবং একইসঙ্গে বদমাশ লোকটার নির্দেশের কপির সংখ্যা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে থাকবে। ফলে কয়েকদিন পরেই দেখা যাবে ওই অফিসের সব কর্মী অন্য সব জরুরি কাজ ছেড়ে শুধু ওই নির্দেশটাকেই কপি করে চলেছে।'

থেমে একটু দম নিল ছোটকা। তারপর বলল, 'কম্পিউটার ভাইরাস ঠিক এভাবেই কাজ করে। ধরে নে, আমাদের কেরানিবাবু হল কম্পিউটার, আর তাঁর টেবিলে রাখা কাগজের তাড়া হল কম্পিউটার প্রোগ্রাম। আর বদমাশ লোকটার নির্দেশ লেখা কাগজটা হল ভাইরাল প্রোগ্রাম। ভাইরাস ইনফেক্টেড কম্পিউটারে ইনফেক্টেড প্রোগ্রামটা চালালেই তাতে লুকিয়ে থাকা ভাইরাল প্রোগ্রাম অন্যান্য প্রোগ্রামে কপি হয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর একসময় কম্পিউটারের মেমোরি ভরতি হয়ে গিয়ে সবকিছুর বারোটা বেজে যায়।'

ঝালা-পালা চোখ বড়-বড় করে বলল, "বাব্বাঃ, ভাইরাস মানে এত্তসব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। তা হলেই বোঝ, ঝামেলা বেচারির কী কষ্ট হচ্ছে!'

দাদা-বউদিকে বলে আগে ম্যানেজ করল ছোটকা। তারপর ঝালা-পালাকে নিয়ে সময়মতো বেরিয়ে পড়ল।

গাড়িতে ওঠার আগে ড. দেবনাথকে মোবাইল ফোন থেকে ফোন করে জানতে পারল, অবিনাশ চাকলাদার সকাল আটটা নাগাদ একবার ফোন করেছিল। একই ধরনের হুমকি দিয়ে সে ভাইরাসের কপি চেয়েছে। ওটা না পেলে সে প্রকাশ দেবনাথকে কিডন্যাপ করে খুন করবে।

ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে ড. দেবনাথ একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'...আমাকে থ্রেট করার সময় অবিনাশ চাকলাদার হঠাৎ হাঁচতে শুরু করে। বোধহয় ঠান্ডা লেগে থাকবে। কিন্তু তারপরই যখন সে আবার কথা বলতে শুরু করে তখন তার গলাটা কেমন যেন চেনা মনে হয়। তবে কোথায় এরকম গলা শুনেছি সেটা আমি ঠিক প্লেস করতে পারিনি।'

ছোটকা বলল, 'হাঁচির ঠিক পরে-পরেই হয়তো গলাটা চেঞ্জ করে উঠতে পারেনি। আর শুনুন, আমরা এখুনি আপনার বাড়ি রওনা হচ্ছি।'

ছোটকার মারুতি ছুটতে শুরু করল।

চার

প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছোতেই একটা হট্টগোল কানে এল।

ছোটকা আর ঝালা-পালা ড. দেবনাথের সদর দরজায় হাজির হওয়ামাত্রই দরজা খুলে গেল। ঝামেলা বেরিয়ে এল বাইরে। ওর গোল মাথায় বসানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে। আর ও উত্তেজিতভাবে তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচাচ্ছে।

ঝামেলা খুব খুশি হলে বা উত্তেজিত হলে এরকম করে। তবে তখন ও কেন যে জাপানের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নাম ধরে চেঁচায় তা কেউ জানে না।

ঝালা-পালা একসঙ্গে জানতে চাইল, 'ঝামেলা, কী হয়েছে?'

ঠিক তখনই ঝামেলার পিছনে রোবিদাসকে দেখা গেল। আর রোবিদাসের পিছনে বছর তিরিশের এক ফরসা রোগা যুবক। তার চোখে রিমলেস চশমা, থুতনিতে নুর, পরনে সবুজ টি-শার্ট আর কটন ক্যাসুয়াল।

ওদের দুজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঝামেলা বলল, 'এরা আমাকে কিডন্যাপ করে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া গর্দান মটকাইবে।'

ঝামেলাকে শান্ত করার জন্য ছোটকা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না—তুমি ভুল করছ। তোমার অসুখ করেছিল বলে এখানে সারাতে দিয়ে গিয়েছিলাম।'

ঝামেলা বিরক্তভাবে বলল, 'এরা আবার ডাক্তার নাকি? সব হাতুড়ি ডাক্তার! এই বাড়িটাই হাতুড়ি-নিবাস।'

ছোটকা বুঝল, ঝামেলা 'হাতুড়ে' বলতে গিয়ে 'হাতুড়ি' বলছে। আর মনে-মনে ভাবল, 'নাঃ, বাচ্চা-রোবটটা মহা খেপে গেছে দেখছি!'

ঝালা-পালা বহু কষ্টে নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে ঝামেলাকে শান্ত করল।

রোবিদাস সব দেখে-শুনে কোমর নাচিয়ে বলল, 'ঢ—ং! এরকম বাঁদুরে আদুরে রোবট কখনও দেখিনি। কী ইম্পেশেন্ট পে-পে-পেশেন্ট রে বাবা!'

ঝামেলা উত্তরে রোবিদাসকে লাথি দেখাল। বলল, 'তোতলা ডিফেক্টিভ মেশিন। সাহস থাকে বল তো, পাখির পিঠে পাকা পেঁপে...।'

রোবিদাস বারদুয়েক 'পা-পা—' বলে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল।

ঝামেলা হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

ছোটকা গাড়ির রিমোট ইউনিটটা ঝালা-পালাকে দিয়ে বলল, 'ঝামেলাকে নিয়ে তোরা গাড়িতে গিয়ে বোস—কোথাও যাবি না। আমি একটু পরে এসে তোদের ল্যাব-ট্যাবগুলো ঘুরিয়ে দেখাব।'

ঝালা-পালা ঝামেলাকে নিয়ে গাড়ির দিকে চলে যেতেই অচেনা যুবকটি প্রথম কথা বলল, 'আপনাদের রোবটটা ভারি ইন্টারেস্টিং তো!'

ছোটকা হেসে বলল, 'আসলে আমি ওটা তৈরি করেছি। আমার রোবোটিক্স-এ ফর্মাল নলেজ নেই বলে ওটা ওরকম উলটোপালটা লজিকে কাজ করে...।' একটু থেমে ছোটকা জিগ্যেস করল, 'আপনি কি ড. দেবনাথের ল্যাবে রিসার্চ করেন?'

যুবক মাথা নাড়লঃ 'হ্যাঁ—আমার নাম প্রভাস—প্রভাস দত্ত। এখানকার সিনিয়ার রিসার্চ স্কলার।'

'আমার নাম প্রসেনজিৎ চৌধুরী—ড. দেবনাথের বন্ধু। উনি ল্যাবে আছেন তো?'

'হ্যাঁ, আছেন। আসুন, ভেতরে আসুন।'

ল্যাবের দিকে যেতে-যেতে প্রভাস বলল, 'আমি রোবট কমিউনিকেশান নিয়ে গবেষণা করছি। সেইজন্যেই দুটো রোবটের ঝগড়া মন দিয়ে শুনছিলাম।'

ছোটকা হেসে বলল, 'রোবটদের কথাবার্তা বা ঝগড়া সবই খুব ইন্টারেস্টিং।'

প্রভাসের রোগাটে মুখে চশমার কাচদুটো ভীষণ বড় লাগছিল। তার ওপর ছোটকা লক্ষ করল, প্রভাস মাঝে-মাঝেই মাথাটা ডানদিকে সামান্য নাড়াচ্ছে—অনেকটা হেঁচকি তোলার মতো।

ল্যাবে ঢুকতেই ড. দেবনাথের সঙ্গে দেখা।

রোবিদাস তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তখন ঝামেলার নামে অভিযোগ করছেঃ '...জানেন স্যার, বদমাশ রোবটটা আমাকে লাথি দেখিয়েছে! তারপর বলেছে, পা-পা-পাখির...আর বলতে পা-পা-পারছি না। আপনি যেভাবেই হোক আমার তোতলামিটা সারিয়ে দিন। ওই বেঁটে নেড়া রোবটটার কাছে আমি হেরে গেলাম!'

ড. দেবনাথ কিছু বলার আগেই প্রভাস বলল, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই, রোবিদাস, ওটা আমি ঠিক করে দেব। তুমি আমার সঙ্গে এসো—।'

রোবিদাসকে নিয়ে প্রভাস ল্যাবের এক কোণে চলে গেল।

ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে বলল, 'ঝামেলাকে ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ও রোবিদাসের সঙ্গে যেরকম ঝগড়া বাধাল তাতেই বুঝেছি ও সেরে উঠেছে। ওর কাজই হল যত রাজ্যের ঝামেলা পাকানো। ওকে ভাইপোদের সঙ্গে গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে মনের আনন্দে মেতে থাকবে। এবারে বলুন, এদিকে কী খবর...।'

ড. দেবনাথ বললেন, 'একটা ব্যাপার হয়েছে, মিস্টার চৌধুরী। আজ সকালে কাজ শুরু করার পর আমার দুজন স্কলার—প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরী—ওরা রিপোর্ট করল যে, ওদের কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের অনেক ফাইল ডিলিট হয়ে গেছে...মানে, কেউ মুছে দিয়েছে।'

'হঠাৎ এভাবে কেউ ফাইল মুছতে যাবে কেন?'

'তা জানি না। তবে কম্পিউটারগুলো নিয়ে কেউ যে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তাতে ভুল নেই।'

ড. দেবনাথকে ল্যাবের একপাশে ডেকে নিয়ে গেল ছোটকা। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'প্রভাসের সঙ্গে তো আলাপ হল। বাকি চারজন কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ—অ্যান্টিচেম্বারে মিত্যুনকে নিয়ে টেকনিকাল আলোচনায় বসেছেন। মিটিং-এর ছুতো করে ওঁদের ডেকে এনেছি। চলুন, আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিই।'

'না, ড. দেবনাথ, এরকম আলটপকা আলাপ করালে ওঁরা সন্দেহ করবেন। বিশেষ করে অবিনাশ চাকলাদারের ব্যাপারটা আপনি যখন কাউকে বলেননি...।'

প্রকাশ দেবনাথ দাড়িতে হাত বুলিয়ে ঘাড় নাড়লেনঃ 'ঠিক বলেছেন। তা হলে?'

তা হলে কী সেটাই বলতে যাচ্ছিল ছোটকা, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে যেন প্রকাণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

মিউজিক সিস্টেমের মিউজিক আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে কারও কথা শোনা গেল।

কথা শুরু হওয়ামাত্রই ড. দেবনাথ ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। কারণ তিনি অবিনাশ চাকলাদারের গলা চিনতে পেরেছেন।

অবিনাশ চাকলাদার তখন বেশ স্পষ্ট গলায় বলছে, 'ড. প্রকাশ দেবনাথ, অবিনাশ চাকলাদার বলছি। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। আপনার নতুন আবিষ্কারটি আমার চাই—কম্পিউটার ভাইরাস অবিনাশ-২০০২। ওটা কালকের মধ্যে না পেলে ভারত একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে হারাবে। আমার কিছু করার নেই। আর হ্যাঁ, ভাইরাল প্রোগ্রামটা দেওয়ার আগে সফ্‌টওয়্যার লকটা খুলে দেবেন। মনে থাকে যেন, ডেডলাইন হল কাল রাত বারোটা। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে ধন্যবাদ।'

অবিনাশ চাকলাদারের কথা শেষ হতেই আবার আনন্দের বাজনা বাজতে শুরু করল।

ঘরের সবাই চুপ।

প্রভাস দত্ত নিজের সিট ছেড়ে চলে এল প্রকাশ দেবনাথের কাছে। ওর পিছন-পিছন রোবিদাস।

নাকের ডগায় চশমা ঠিক করে বসাল প্রভাস। মাথাটা দুবার নেড়ে বলল, 'স্যার, এসব কী ব্যাপার!'

ঠিক তখনই অ্যান্টিচেম্বার থেকে চারজন মানুষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল ল্যাবের ভেতরে।

প্রথমজন বেশ মোটাসোটা চেহারার, গায়ের রং ময়লা, মাথায় অকালে টাক পড়েছে। সে হাত-মুখ নেড়ে অবাক হয়ে বলল, 'মিউজিক সিস্টেমে হঠাৎ এ কী শুনলাম, স্যার? কে এই অবিনাশ চাকলাদার? অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসের ব্যাপারটাই বা কী?'

প্রকাশ দেবনাথ হঠাৎই যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ শান্ত হয়ে গেলেন। তারপর জবাব দিলেন, 'শোনো, মিত্যুন, উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই। বড়জোর দেশের স্বার্থে আমাকে মরতে হবে। তোমাদের কাউকে এতদিন বলিনি—আজ বলছি। দিন সাত-আট আগে একটা নতুন কম্পিউটার ভাইরাস আমি তৈরি করেছি। কোনও অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম ওটাকে ডিফাংক্ট করতে পারে না। তাই আমি ওটার নাম দিই অবিনাশ-২০০২। তারপর...।'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বললেন প্রকাশ দেবনাথ। দুজন স্কলার ও তিনজন বিজ্ঞানী স্তম্ভিত হয়ে তাঁর কথা শুনলেন। তারপর ওঁদের নিজেদের মধ্যে নানান কথার ফুলঝুরি শুরু হল। শান্ত ল্যাবটা হঠাৎই যেন অশান্ত হয়ে উঠল।

ড. দেবনাথ হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই—যদি কোনও বিপদ হয় আমার হবে, আর কারও নয়। গতকাল থেকে অবিনাশ চাকলাদারের হুমকির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। সেইজন্যেই আমি মিস্টার প্রসেনজিৎ চৌধুরীকে খবর দিয়েছি। উনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।' ছোটকার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন প্রকাশ দেবনাথঃ 'মিস্টার চৌধুরী ইলেকট্রনিক্সে এক্সপার্ট, তবে রোবোটিক্সেও সামান্য কিছু কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয়...। উনি আপনাদের

এই প্রবেলেমটা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আপনারা কাইন্ডলি ওঁকে একটু হেল্প করবেন। আপনাদের সবার কোপারেশন না পেলে অবিনাশ চাকলাদারকে ধরা সম্ভব নয়।'

উত্তরে সকলেই মাথা নেড়ে ড. দেবনাথের কথায় সায় দিল।

ছোটকা লক্ষ করল, প্রকাশ দেবনাথ তার আসল পরিচয়টা গোপন রাখলেন।

সেটা আরও স্পষ্ট হল যখন তিনি ছোটকার কাছে এগিয়ে এসে বাঁ-চোখ ছোট করে একটা দুষ্টু ইশারা করলেন, তারপর বললেন, 'আসুন, প্রসেনজিৎবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই...।'

পরিচয় হল।

প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরী রিসার্চ স্কলার।

আর বিজ্ঞানী তিনজন হলেন ড. ওয়াসিম খান, ড. কল্যাণ সেনবর্মা, আর ড. অশোক মিশ্র।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই শুরু হল ঝামেলা।

ড. মিশ্র বেশ বাজেভাবেই ড. দেবনাথকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি ইম্মরটাল, ইয়ানি কি অমর, ভাইরাস ডিসকাভার করেছেন, ফির ভি আমাদের বলেননি! কেন জানতে পারি?'

'ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।' প্রকাশ দেবনাথ হাত নেড়ে বোঝাতে চাইলেনঃ 'আমি ল্যাবে বসে কাজ করছিলাম, সাডেন্লি অবিনাশ-২০০২ তৈরি হয়ে গেল। তারপর...।'

মিশ্র বিরক্তভাবে হাত নাড়লেনঃ 'কম্পিউটার ভাইরাস কখনও সাডেন্লি তৈরি হয় না। ভাইরাল প্রোগ্রামকে অনেক মেহনত করে বানাতে হয়। তা ছাড়া পরদিন তো আপনি আমাদের বলতে পারতেন! আমরাও তো নয়া-নয়া আইডিয়া পেলে আপনাকে বলি, নিজেরা আপসমে ডিসকাস করি। উই ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিম, ম্যান!'

'জানি। তবে ভাইরাসটার পোটেনশিয়াল দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি এটা কোনও খারাপ লোকের হাতে পড়ে, তা হলে...।'

'আমরা খারাপ লোক! বুরা আদমি!' রাগে মুখিয়ে উঠলেন ড. মিশ্রঃ 'তো এখন যে ডেঞ্জার হল তার জন্যে কে দায়ী? কওন হ্যায় ইসকে জিম্মেদার?'

প্রকাশ দেবনাথ চুপ করে রইলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ছোটকা অশোক মিশ্রকে দেখছিল। গোলগাল ফরসা মুখ এখন লালচে। ঠোঁট দেখে মনে হয় পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। বয়েস পঞ্চাশ কিংবা তার কাছাকাছি। গায়ে লাল-হলুদে মাখামাখি রংচঙে শার্ট। লোমশ কবজিতে সোনালি ঘড়ি ঝকমক করছে।

অশোক মিশ্র সবার মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ড. দেবনাথের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে শক্ত গলায় বললেন, 'আপ হ্যায় জিম্মেদার, ড. দেবনাথ, সির্ফ আপ! তাই এ-

ব্যাপারে আপনি আমাকে জড়াবেন না। আই অ্যাম দ্য লাস্ট পারসন...আমি এখুনি লালবাজারে ইনফর্ম করছি।'

কথা বলতে-বলতে ড. মিশ্র ল্যাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ছোটকা তাঁকে বাধা দিল।

'একমিনিট, ড. মিশ্র। যাওয়ার আগে একটা কথা বলি। দয়া করে পুলিশে কোনও খবর দেবেন না। কারণ, আপনার জেনে রাখা দরকার, এই অবিনাশ চাকলাদার লোকটি আমাদের অচেনা নয়। সে এখন এই ঘরের মধ্যেই আছে।'

'তার মানে!'

'মানে খুব সিম্পল। আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন হল অবিনাশ চাকলাদার। নামটা তার অবশ্যই নকল—এমনকী গলার স্বরটাও। নইলে সে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত। সেইজন্যেই বলছি পুলিশে খবর দেবেন না—তাতে আপনারাই হ্যারাস্ড্ হবেন।'

ড. মিশ্রের সব সাহস হুউস করে উবে গেল। চোখের পলকে মুখে একটা কাচুমাচু ভাব ছড়িয়ে পড়ল। ছোটকার খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'হায় রাম! এ কী বলছেন আপনি! আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন! বিশওয়াস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

ছোটকা হেসে বলল, 'আপনি সায়েন্টিস্ট মানুষ—বিশ্বাস নয়, লজিক দিয়ে ভাবুন।'

অশোক মিশ্র বাকি চারজনের মুখের ওপর খুব ধীরে-ধীরে চোখ বোলালেন। এদের মধ্যে কে?

ড. ওয়াসিম খান এবার প্রকাশ দেবনাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সুপুরুষ দীর্ঘ চেহারা। পরনে সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। জামার হাতায় বিদেশি কাফলিঙ্ক। গা থেকে সুন্দর পারফিউমের হালকা গন্ধ বেরোচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথার ঝাঁকড়া চুলে বোধহয় কলপ দেওয়া।

'ড. দেবনাথ, মিস্টার চৌধুরীর কথা তো বুঝলাম! কিন্তু আমি ভাবছি, মিউজিক সিস্টেমের মধ্যে অবিনাশ চাকদা না কী যেন বললেন—তার ভয়েসের অডিয়ো সিডিটা কে ঢোকাল? মিউজিক সিস্টেমের সিডিগুলো কে চেঞ্জ করে?'

ড. দেবনাথ দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'জেনারালি রোবিদাস চেঞ্জ করে, তবে ইচ্ছে করলে যে-কেউ করতে পারে। ওই তো, ওই প্যানেলের পেছনে মিউজিক সিস্টেমটা রাখা আছে?' কথা বলতে-বলতে আঙুল তুলে ল্যাবের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একটা সাদা চৌকো প্যানেল দেখালেন প্রকাশ দেবনাথঃ 'ওটার পাশে অনেকগুলো সিডিও রাখা আছে—আপনারা তো সবাই জানেন! এই তো গত পরশু প্রভাস আমাদের সবার সামনেই সিডি চেঞ্জ করল!'

ড. মিশ্র তখন ড. কল্যাণ সেনবর্মার সঙ্গে চাপা গলায় উত্তেজিতভাবে কিছু একটা আলোচনা করছিলেন। বারবার সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ওয়াসিম খান রোবিদাসকে কাছে ডাকলেন, ‘রোবিদাস, মিউজিক সিস্টেম থেকে সিডিটা বের করে নাও তো! তারপর ড. দেবনাথকে দেখাও...।’

রোবিদাস অক্ষরে-অক্ষরে আদেশ পালন করল। প্যানেল সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে এবং অভ্যস্ত হাতে একটা সিডি বের করে নিল।

সিডিটা ড. দেবনাথের হাতে দিল রোবিদাসঃ ‘স্যার, এই নিন...।’

সিডিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন ড. দেবনাথ। এর মধ্যে অবিনাশ চাকলাদারের ভয়েস ওভারল্যাপ হল কেমন করে! তাঁর ল্যাবে বসেই কি কেউ এই কাজটা করেছে?

তিনজন বিজ্ঞানী আর দুজন রিসার্চ স্কলার প্রকাশ দেবনাথকে ঘিরে ধরলেন। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন প্রলয়ংকর সিডিটাকে। কী করে যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে ঢুকে পড়ল অবিনাশ চাকলাদারের হুমকি?

ছোটকা বলল, ‘ড. দেবনাথ, সিডিটা আপনি আলাদা করে রাখুন। আমরা পরে এর ভয়েস সিগনালটা অ্যানালিসিস করে দেখব। তারপর এই পাঁচজনের ভয়েসের সঙ্গে ম্যাচ করে দেখলেই ধরা পড়ে যাবে...।’

ছোটকাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ফেটে পড়লেন ড. সেনবর্মাঃ ‘দেন ডু ইট রাইট নাউ! আমরা জানতে চাই কে এরকম হুমকি দিচ্ছে। কে অবিনাশ-২০০২-কে হাতিয়ে গোটা পৃথিবীর সর্বনাশ করতে চাইছে!’

ছোটকা সেনবর্মাকে দেখল।

কালো মোটাসোটা চেহারা। ডান হাতের ফোলা-ফোলা আঙুলে তিন-তিনটে রঙিন পাথর। বিজ্ঞানী হয়েও জ্যোতিষশাস্ত্রের মায়া কাটাতে পারেননি। ঘন কালো ভুরুর নীচে ছোট-ছোট চোখ যেন গর্তে ঢুকে আছে। আর বাঁ গালে একটা পুরোনো কাটা দাগ।

ছোটকা হাত নেড়ে কল্যাণ সেনবর্মাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। বলল, ‘প্লিজ, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমরা যা স্টেপ নেওয়ার নিচ্ছি। ড. দেবনাথের সেফটির জন্যে আমরা ব্যবস্থা করছি।’

কিন্তু কে শোনে কার কথা! উত্তেজিত জটলা আর কথা চালাচালি চলতেই থাকল।

মিত্যুন ছোটকাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ‘মিস্টার চৌধুরী, ব্যাপার-স্যাপার খুব সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠেছে। সময় তো আর বেশি নেই। কিছু একটা করুন। নিজেদের মধ্যে সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে পড়লে আমরা মন দিয়ে গবেষণা করব কেমন করে?’

প্রভাস বলল, ‘আমাদের কি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত? আপনি কী বলেন?’

ছোটকা মাথা নাড়লঃ ‘না, না। বললাম তো, এখনই সব জানাজানি হলে বিপদ বাড়বে।’

ছোটকা হঠাৎ ঘড়ি দেখল। তারপর সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'আজ আমার একটু তাড়া আছে। কাল সকাল ন'টা নাগাদ আপনারা যদি ড. দেবনাথের এই ল্যাবে আসেন তা হলে ভালো হয়। আপনাদের সঙ্গে আমি আলাদাভাবে একটু কথা বলতে চাই।'

উত্তরে সবাই সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

ড. অশোক মিশ্র বললেন, 'কাল সকালে আমার একটা জরুরি মিটিং ছিল। এনি ওয়ে—নো প্রবলেম। আমি অন ডট ন'টায় হাজির থাকব।'

ড. দেবনাথ হেসে ওঁকে 'থ্যাংক ইউ' বললেন।

হঠাৎই ল্যাবের ফোন বেজে উঠল।

সব কথাবার্তা মুহূর্তে থেমে গেল। ঘরটা নিস্তব্ধ থমথমে হয়ে গেল।

ফোনটা বেজেই চলেছে, অথচ প্রকাশ দেবনাথ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

শেষ পর্যন্ত ছোটকা যখন ফোনটা ধরতে পা বাড়াল তখন প্রকাশ দেবনাথ বলে উঠলেন, 'আপনি ধরবেন না, মিস্টার চৌধুরী।' তারপর রোবিদাসকে বললেন, 'রোবিদাস, ফোনটা ধরো—।'

রোবিদাস এগিয়ে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে বলল, 'হ্যালো—।'

কিছুক্ষণ কথা শোনার পর 'এক্ষুনি বলছি' বলে রিসিভার জায়গামতো রেখে দিল। তারপর ড. দেবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার বাবা দোতলা থেকে ফোন করেছেন। আপনাকে একবার ওপরে ডেকেছেন।'

এতক্ষণে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন।

ড. মিশ্র গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমরা সব ডরপোক হয়ে গেছি।'

ড. ওয়াসিম খান চাপা গলায় মিশ্রকে বললেন, 'কী হচ্ছে, ড. মিশ্র! এখন হাসি-ঠাট্টার সময় নয়—প্লিজ!'

অশোক মিশ্র ড. খানের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

ড. দেবনাথ সবাইকে বললেন, 'এক্সকিউজ মি। আমি একটু ওপরে দেখা করে আসছি।'

ছোটকা ওঁর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি একটু আমার ভাইপো দুটোকে ল্যাবে ডেকে নিচ্ছি। ওদের বলেছিলাম, ল্যাবটা ঘুরিয়ে দেখাব।'

ড. দেবনাথ হেসে বললেন, 'অফ কোর্স'। তারপর ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকাও বেরিয়ে এল ল্যাবের বাইরে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ঝামেলার কোড নম্বর ডায়াল করল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলার শরীরে বসানো ইন্‌বিল্ট টেলিফোন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল। ঝামেলার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ছোটকা এই ব্যবস্থাটা মাসখানেক হল তৈরি করে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে ঝামেলা যমজ দু-ভাইকে সল্ট লেক এবং বিধান রায় সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিল, হঠাৎই ওর কানে সিগনাল বাজল। তারপরই ও ছোটকার কথা শুনতে পেল।

'ঝামেলা, তুমি ঝালা-পালাকে নিয়ে এখুনি ল্যাবে চলে এসো। ল্যাবে পাঁচজন লোক আছে—তুমি তাদের ফটো তুলে নেবে আর ভয়েস রেকর্ড করে নেবে। পরে ভয়েস সিগনালগুলো অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। তোমরা ল্যাবে এমনভাবে ঘুরে বেড়াবে যেন ল্যাব দেখতে এসেছ। চলে এসো, কুইক।'

টেলিফোন সিস্টেম অটোমেটিক অফ হয়ে গেল।

ঝামেলা তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল, 'চলো বৎসগণ, বসের ডাক আসিয়াছে।'

ঝালা-পালা বুঝল ছোটকা ওদের ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ওরা রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপে গাড়ি লক করে দিল।

ঝামেলা হেলেদুলে প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে মাথা নেড়ে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলঃ 'ইফ ইওর কল হিয়ার এনিবডি নো কাম দেন অ্যালোন চলো রে...ইফ ইওর কল হিয়ার এনিবডি...।'

সুরটা শুনে...ঝালা-পালা বুঝল ঝামেলা ইংরেজি অনুবাদ করে রবিঠাকুরের গান গাইছেঃ 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে..।' তবে শেষের 'চলো রে'-টা আর অনুবাদ করে উঠতে পারেনি।

পাঁচ

একতলা থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ দেবনাথের তন্দ্রা কেটে গেল। নীচের ল্যাব থেকে এল না শব্দটা!

অন্ধকারে চোখ গেল খোলা জানলার দিকে। কখন যেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঠিকরে পড়া রাস্তার আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রুপোর কুচি বলে মনে হচ্ছে।

কালরাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ার পর অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসেনি। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে অবিনাশ-২০০২ আর অবিনাশ চাকলাদারের কথা। আর চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও নেই। তারপরই কিছু একটা কাণ্ড করবে অবিনাশ চাকলাদার। লোকটা তাঁর খুব চেনা—অথচ অচেনা।

বিছানায় উশখুশ করতে-করতে একসময় তন্দ্রা এসে চোখ জড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর...হঠাৎই এই শব্দটা...।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে। নীচের ল্যাবের আলো জানলা দিয়ে ছিটকে পড়েছে বাগানের করবীর ঝোপে।

ক'টা বাজে এখন? প্রকাশ দেবনাথ পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে রাখা ছোট টেবিলের কাছে। টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিলেন। রাত দেড়টা।

এ সময়ে ল্যাবে আলো জ্বলাটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। রোবিদাস অনেক সময় সারা রাত কাজ করে। ও অ্যানড্রয়েড—তাই ও কখনও ক্লান্ত হয় না, ওর কখনও ঘুম পায় না।

কিন্তু শব্দটা কীসের হল?

ড. দেবনাথ ঘড়িটা হাতে পরে নিলেন। ছোট টেবিল থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে দিলেন। তারপর একটা হাফশার্ট গায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলেন।

করিডরটা সামান্য আঁধারি হলেও তাঁর কোনও অসুবিধে হল না। অভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন।

ল্যাবের দিক থেকে আরও একটা শব্দ ভেসে এল।

রোবিদাস ল্যাবে অনেক কাজ করে বটে তবে এতই গোছালো যে, তেমন একটা শব্দ-টব্দ হয় না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ল্যাবের কাছে চলে এলেন প্রকাশ দেবনাথ। কাচের দরজা দিয়ে ল্যাবের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। তবে রোবিদাসকে চোখে পড়ছে না। নিশ্চয়ই সফ্‌টওয়্যার রুমে আছে।

ল্যাবে ঢোকার জন্য কাচের দরজা ঠেলে পা বাড়ালেন ড. দেবনাথ।

সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাবের আলো নিভে গেল।

আচমকা লোডশেডিং হল নাকি?

না, তা তো নয়! কারণ দূরে এককোণে একটা কম্পিউটার 'অন' হয়ে রয়েছে!

'রোবিদাস! রোবিদাস!' চাপা গলায় ডাকলেন ড. দেবনাথ। তিনি চান না যে, চেঁচামেচিতে দোতলায় বাবা-মায়ের ঘুম ভেঙে যাক। ওঁদের ঘুম খুব পাতলা।

আবছা অন্ধকারে ল্যাবের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই ঘাড়ের কাছে শক্ত কিছু একটা চেপে ধরল কেউ। শক্ত আর ঠান্ডা।

তারপর হিসহিস করে বলল, 'এটা রিভলভারের সাইলেন্সারের নল।

টিগার টিপলে শব্দ বেশি হবে না, তবে কাজ হবে। একটুও নড়াচাড়া করবেন না।'

'রোবিদাস কোথায়?' কয়েকবার ঢোঁক গিলে কোনওরকমে জানতে চাইলেন ড. দেবনাথ।

'রোবিদাস অ্যান্টিচেম্বারে—ওর সুইচ "অফ" করা আছে। এখন যা বলছি শুনুন...।'

অদৃশ্য লোকটা এমনভাবে কথা বলছিল যে ফিশফিশ করে মন্ত্র পড়ছে—মন্ত্র পড়ে কাউকে নেশা ধরিয়ে দিতে চাইছে।

ফিশফিশ করে কথা বলার জন্য লোকটার গলার স্বর চেনা যাচ্ছিল না।

ড. দেবনাথ শরীরটাকে শক্ত কাঠের মতো করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বুকের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। এক্ষুনি যেন হৃৎপিণ্ডটা ভেঙেচুরে চৌচির হয়ে যাবে। একইসঙ্গে একটা শ্বাসকষ্টও টের পাচ্ছিলেন তিনি।

'ড. দেবনাথ...।' অন্ধকারে কানের পাশে ফিশফিশ করে কথা শুরু হলঃ 'অনেক চেষ্টা করেও আপনার সফ্‌টওয়্যার লকটা আমি খুলতে পারলাম না। সেজন্যে ধন্যবাদ জানাই। ইউ আর আ গ্রেট কম্পিউটার উইজার্ড!'

লোকটা কেন ফিশফিশ করে কথা বলছে? কেন লোকটা স্বাভবিক গলার কথা বলছে না? তা হলেই প্রকাশ দেবনাথ পেয়ে যেতেন অবিনাশ চাকলাদারের আসল পরিচয়।

কার গলা এটা? ড. ওয়াসিম খান? কল্যাণ সেনবর্মা, নাকি অশোক মিশ্র? আবার প্রভাস কিংবা মিত্যুনেরও হতে পারে। তবে যে-ই হোক, সে ল্যাবে ঢুকল কী করে?

ড. দেবনাথের মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো তীব্রভাবে ছটফট করছিল। ভয় তো পাচ্ছিলেনই, তবে তার সঙ্গে বেড়ে উঠছিল কৌতূহল।

'...অবিনাশ-২০০২-এর একটা আন-লক্‌ড কপি আপনি একটা সিডিতে তুলে রাখবেন। এতে কোনও অসুবিধে হবে না—কারণ, আপনার কাছে সিডি রাইটার আছে আমি জানি। সিডির বাক্সের ওপরে একটা লেবেল সেঁটে দেবেন। তাতে লেখা থাকবেঃ প্রকাশ দেবনাথ-২০০২। এই লেবেল দেখেই আমি বুঝে নেব। সিডিটা ল্যাবে ঢুকে ডানদিকের সেকেন্ড টেবিলটার ওপরে ফেলে রাখবেন। কাল বিকেল পাঁচটার পর থেকে সিডিটা যেন সেই জায়গামতো রাখা থাকে। আমি সময়মতো ল্যাবে ঢুকে ওটা তুলে নেব। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু আনলক দ্য ভাইরাল প্রোগ্রাম। যদি ওটা আনলক করতে ভুলে যান, তা হলে তার জন্যে অনেক বেশি দাম দিতে হবে। ওকে?'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে সাইলেন্সারের নল দিয়ে জোরালো খোঁচা দিল লোকটা।

'কে আপনি? ড. খান?' লোকটার পরিচয় জানতে চেয়ে খানিকটা আন্দাজেই ঢিল ছুড়তে চাইলেন প্রকাশ দেবনাথ।

উত্তরে চাপা ফিশফিশে হাসি শোনা গেল মাথার পিছন থেকে। তারপরঃ 'আমার নাম তো আপনি জানেন! অবিনাশ চাকলাদার...। মনে থাকে যেন...কাল বিকেল পাঁচটার পর। আর এই কথাটা কাউকে জানাবেন না। জানালে...' হিসহিস করে চাপা হাসিঃ 'জানেন তো কী হবে...আপনার ডেটা ফাইলটা দুনিয়ার হার্ড ডিস্ক থেকে ডিলিট হয়ে যাবে—আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

কথার শেষে জিভে আক্ষেপের 'চুক-চুক' শব্দ করল লোকটা। তারপর সাইলেন্সারের নলটা সরে গেল ড. প্রকাশ দেবনাথের ঘাড় থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। খুব ভালো করে নজর চালিয়েও তেমন কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। শুধু মনে হল, অন্ধকারের মধ্যে আরও একটা গাঢ় অন্ধকার যেন পিছলে পালিয়ে গেল।

'রোবিদাস! রোবিদাস!' চাপা চিৎকারে ডেকে উঠলেন প্রকাশ দেবনাথ।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে গেলেন সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে। ওই ঘরের দরজার পাশেই রয়েছে আলোর এম সি বি সুইচগুলো।

দেওয়াল হাতড়ে খুঁজে পেলেন গ্যাঙ্ড সুইচের ছোট্ট হাতলটা। কেউ ওটা টেনে নীচে নামিয়ে আলোগুলো অফ করে দিয়েছে।

হাতলটা ওপরে তুলতেই ল্যাবের আলো জ্বলে উঠল। সফ্‌টওয়্যার রুমেও জ্বলে উঠল চারটে টিউবলাইট।

তখনই দেখলেন, একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে আছে রোবিদাস।

ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের নীচে হাত দিলেন ড. দেবনাথ। ওর অ্যাক্টিভিটি সুইচটা কেউ অফ করে দিয়েছে।

সুইচটা অন করে দিতেই রোবিদাস নড়েচড়ে উঠল। ড. দেবনাথকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল, বলল, 'সরি, স্যার, আমি বোধহয় একটু ঘুমিয়ে প-প-পড়েছিলাম। এখুনি গিয়ে আপনার ডেটা প্-প্-প্রিন্টআউটগুলো নিয়ে নিচ্ছি।'

প্রকাশ দেবনাথ বুঝতে পারলেন অবিনাশ চাকলাদার এসে রোবিদাসকে জড়ভরত করে দেওয়ার আগে ও কতকগুলো ডেটার প্রিন্ট নিচ্ছিল। কিন্তু রোবিদাস কি দেখেছে, কে ল্যাবে এসে ঢুকেছে?

সে-কথাই জিগ্যেস করলেন রোবিদাসকে।

উত্তরে রোবিদাস জানাল যে, না কাউকে দেখতে পায়নি। ও সফ্‌টওয়্যার রুমে একটু ঢুকেছিল একটা ফ্লপি নিতে। তখনই হঠাৎ আলো নিভে যায়। আর তারপরই ও 'জ্ঞান' হারিয়ে ফ্যালে।

প্রকাশ দেবনাথ রোবিদাসের কথায় কেমন যেন ধন্দে পড়ে গেলেন। ওকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনোনি?'

'না, স্যার—ঠিক শুনতে পা-পা-পাইনি। আসলে একমনে কাজ করছিলাম তো...।'

রোবিদাসকে ওর কাজ করতে বলে ল্যাব ছেড়ে চলে এলেন ড. দেবনাথ। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, গালে আঙুল বোলালেন বেশ কয়েকবার।

লোকটা কী করে ল্যাবে ঢুকল? কারণ, রাত দশটার পর বাড়িতে ঢোকার ইলেকট্রনিক আইডেন্টিফিকেশান সিস্টেমটা অফ করা থাকে। তার বদলে কম্পিউটারাইজড্ অটোলক অন করে

দেওয়া হয়।

তা হলে কি লোকটা বিজ্ঞানে এতই দক্ষ যে, ড. দেবনাথের সুরক্ষা পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিতে পেরেছে!

দোতলার ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়লেন প্রকাশ দেবনাথ। অন্ধকারেই তাকিয়ে রইলেন খোলা জানলার দিকে। অবিনাশ-২০০২-এর কথা ভাবতে লাগলেন।

এই ভাইরাসটা আবিষ্কার করে তিনি মনে-মনে চেয়েছিলেন দেশের কাজে লাগাতে। এই ভাইরাসটার ক্ষমতা পরমাণু বোমার চেয়েও বেশি। এই অবিনাশী ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে যে-কোনও শত্রুরাষ্ট্রকে অনায়াসে দমিয়ে দেওয়া যেত। অবিনাশ-২০০২-এর সর্বনাশের ক্ষমতা জানার পর কোনও শত্রুরাষ্ট্রই ভারতকে আর পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখাত না। অথচ...।

অবিনাশ চাকলাদার কি অবিনাশ-২০০২-কে শত্রুরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেবে? নাকি এই ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে নিজের দেশকেই ব্ল্যাকমেল করবে?

কিন্তু লোকটা কাল সিডিটা নিতে আসবে কোন সাহসে! কেউ তো তাকে দেখে ফেলতে পারে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে।

আজ, এখন, সে ওটা লক খুলিয়ে কপি করে নেওয়ার চেষ্টা করল না কেন? পাছে প্রকাশ দেবনাথ তাকে চিনি ফেলেন তাই? কিন্তু কালও তো কেউ চিনে ফেলতে পারে! নাকি লোকটা নিশ্চিত যে, কাল ও নির্বিঘ্নে ভাইরাসের সিডিটা নিয়ে যেতে পারবে?

না, কক্ষনও না! ড. দেবনাথ কাল নিজে ল্যাবে হাজির থেকে লোকটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাতে প্রাণ যায় যাক!

প্রকাশ দেবনাথের ভীষণ রাগ হচ্ছিল লোকটার ওপরে। জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে-দেখতে লোকটাকে জব্দ করার কথা ভাবছিলেন। কাল সকালেই ওই হুমকি দেওয়া সিডির ভয়েস সিগনালটা অ্যানালিসিস করতে হবে। আর ওঁর ল্যাবের সঙ্গে যে-পাঁচজন গবেষণায় জড়িয়ে আছে তাদের গলা তো টেপ করা আছেই! গতকাল ঝামেলা ওদের ভয়েস রেকর্ড করে নিয়েছে। সেটা প্রসেনজিৎ চৌধুরী ড. দেবনাথকে জানিয়েও দিয়েছে।

নাঃ, আজ রাতের ব্যাপারটা প্রসেনজিৎবাবুকে জানাতেই হবে। ভাবলেন ড. দেবনাথ। ভয় তাঁর নিজের জন্য নয়—দেশের জন্য। দেশদ্রোহীকে কখনও ক্ষমা করা যায় না। কাল প্রসেনজিৎবাবু সকলের সঙ্গে কথা বলার পর দেখা যাক কোনও সূত্র-টুত্র পাওয়া যায় কি না।

চশমা আর জামা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। পাশ ফিরে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রুপোর কুচি তখনও মেঘলা আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে।

ছয়

ঠিক ন'টায় প্রকাশ দেবনাথের ল্যাবে এসে ঢুকল ছোটকা।

এসে দ্যাখে, মিত্যুন আর প্রভাস হাজির। দুটো কম্পিউটারে বসে দুজনে আপনমনে কাজ করছে। আর রোবিদাস একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছে। সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইম্স্' চলছে।

রোবিদাসকে দেখে মোটেই মনে হল না তার মধ্যে এককণাও দুশ্চিন্তা রয়েছে। অবশ্য না থাকারই কথা! রোবট-জীবন মানুষের চেয়ে অনেক সুখী।

রোবিদাসকে জিগ্যেস করতেই ও জানাল, ড. দেবনাথ অ্যান্টিচেম্বারে রয়েছেন। অন্য তিনজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছেন।

'আমি কি ড. দেবনাথকে ডেকে দেব, স্যার?' রোবিদাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল।

ছোটকা বলল, 'না, তার দরকার নেই। তুমি সিনেমা দ্যাখো, আমি অ্যান্টিচেম্বারে যাচ্ছি।'

অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকেই ছোটকা দেখল যা ভেবেছে ঠিক তাই—ড. দেবনাথ যে-তিনজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরা আর কেউ নয়, অশোক মিশ্র, ওয়াসিম খান, আর কল্যাণ সেনবর্মা।

ছোটকাকে দেখেই ড. প্রকাশ দেবনাথ চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। ছোটকাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন অ্যান্টিচেম্বারের বাইরে। চাপা গলায় সংক্ষেপে গতকাল রাতের ঘটনা জানালেন। শেষে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, লোকটার গলা আমি ঠিক চিনতে পারিনি। তবে যা-কিছু করার আপনাকে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই করতে হবে।'

ছোটকা একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না—আমি দেখছি কী করা যায়। আগে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে ভয়েস সিগনালগুলোর অ্যানালিসিস নিয়ে বসব।'

ড. দেবনাথ অ্যান্টিচেম্বারের দিকে ইশারা করে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'কে জানে, হয়তো অবিনাশ চাকলাদার ওই ঘরেই বসে রয়েছে।'

ছোটকা হেসে বলল, 'কেন, ল্যাবেও তো থাকতে পারে!'

'তা অবশ্য পারে।' ইতস্তত করে বললেন প্রকাশ দেবনাথ।

'এখন চলুন, ওঁদের সঙ্গে একটু আলাদাভাবে কথা বলব—সেটা আপনি ওঁদের বলে বুঝিয়ে ম্যানেজ করুন, যাতে ওঁরা অফেন্ডেড না হন।'

'কোনও চিন্তা নেই। কাল তো ওঁদের বলাই ছিল। আসুন—।' বলে ড. দেবনাথ ছোটকাকে নিয়ে অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

তিনজন বিজ্ঞানী বেশ শান্তভাবেই ড. দেবনাথের কথা শুনলেন। তারপর নিজেদের মধ্যে কীসব কথাবার্তা বলে কল্যাণ সেনবর্মা আর ওয়াসিম খান অ্যান্টিচেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ড. দেবনাথ ছোটকাকে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি কাজ শুরু করুন, আমরা ল্যাবে ওয়েট করছি—।'

ওঁরা তিনজন চলে যেতেই অ্যান্টিচেম্বারের ঝকঝকে পালিশ করা টিক উডের টেবিলকে মাঝখানে রেখে ড. অশোক মিশ্রের মুখোমুখি বসল ছোটকা। হেসে বলল, 'এভাবে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি, ড. মিশ্র। কিন্তু সিচুয়েশানটা এমন যে, এ ছাড়া কোনও পথ ছিল না।'

ড. মিশ্র কোনও জবাব দিলেন না। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা বিরক্তির শব্দ বাইরে ছুড়ে দিলেন।

ছোটকা মানুষটাকে জরিপ করছিলেন।

ড. মিশ্রের গায়ে গাঢ় নীল আর সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। চোখে শৌখিন চশমা। মাথার চুল কপালের দু-পাশটায় ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় কপালের ঠিক মাঝখানে চুল ছুঁচোলো হয়ে ওলটানো ত্রিভুজের মতো নেমে এসেছে। ইংরেজিতে একেই 'উইডোজ পিক' বলে।

ড. মিশ্রের হাবভাবে কেমন যেন একটা জঙ্গি ভাব আছে। তবে ভেতরে-ভেতরে মানুষটা সত্যি-সত্যি জঙ্গি কি না সেটাই আসল ব্যাপার।

পানজাতীয় কিছু একটা চিবোচ্ছিলেন ড. মিশ্র। সামান্য জড়ানো গলায় অধৈর্য সুরে ছোটকাকে বললেন, 'নিন, শুরু করুন। কী জানতে চান, বলুন...।'

ছোটকা হেসে বলল, 'সায়েন্টিস্ট হিসেবে আপনার তো বেশ নামডাক আছে। মানে, বিদেশে...।'

'এটা আপনাকে কে বলল?' রুক্ষ গলায় প্রশ্ন ছুটে এল।

'কেউ বলেনি—আমি দেশি-বিদেশি রিসার্চ জার্নাল ঘাঁটাঘাঁটি করি...

তাই জেনেছি। আপনার রিসার্চ পেপার তো বেশ ভালো-ভালো জার্নালেই ছাপা হয়েছে।'

'আমার একার কাজ নয়—সঙ্গে কো-অথররাও রয়েছেন।' বিনয় করে বললেন অশোক মিশ্র। বোঝা গেল ছোটকার প্রশংসায় তিনি কিছুটা হলেও নরম হয়েছেন।

'কম্পিউটার ভাইরাস নিয়ে আপনি কতদিন গবেষণা করছেন?'

'তা প্রায় ন'-দশ সাল হবে।'

'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা সম্পর্কে আপনি কিছুই জানতেন না?'

'অ্যাবসোলিউটলি নাথিং। কাল তো আপনি আমাদের ল্যাবে ছিলেন—সব তো শুনলেন। ড. দেবনাথ আমাকে কিচ্ছু জানাননি।' ড. মিশ্রর গলায় রাগের ছোঁয়া টের পাওয়া গেল।

'আচ্ছা, ড. মিশ্র, সত্যিই কি এমন ভাইরাস তৈরি করা সম্ভব যেটাকে কিছুতেই আর ডেস্ট্রয় করা যায় না—মানে, যেটার কোনও ভ্যাকসিন হয় না?'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন অশোক মিশ্র। তারপর বললেন, 'কোয়াইট পস্‌িল। তবে সেটা ইন্ডিয়ায় দুম করে কেউ আবিষ্কার করে ফেলবে ভাবিনি। অনেক সময় লাক সায়েন্টিস্টদের ফেবার করে—খুদা যব দেতা হ্যায় ছপ্পড় ফাড় কর দেতা হ্যায়।'

'আপনি এখন কী নিয়ে রিসার্চ করছেন?'

'রোবট কমিউনিকেশান...।' সামান্য গম্ভীর হয়ে অশোক মিশ্র বললেন।

'এটাই কি আপনার লাইন?' ছোটকার প্রশ্নটায় একটা চাপা খোঁচা টের পাওয়া গেল।

অশোক মিশ্র একটু উঁচু পরদায় জবাব দিলেন,'আপনিও তো একজন থোড়াবহৎ সায়েন্টিস্ট—আপনি তো ভালো করে জানবেন সায়েন্টিস্টদের কোনটা লাইন কোনটা বেলাইন।'

ছোটকা ড. মিশ্রকে জরিপ করছিল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'এতে রাগ করার কিছু নেই, ড. মিশ্র। আমি শুধু আপনার রিসার্চের মেইন ট্যাকটা জানতে চেয়েছি। যদি আপনি...।'

'আমার রিসার্চের মেইন ট্যাক হল কম্পিউটার সিকিওরিটি। তবে কভি-কভি আমরা সাইড ট্যাকেও যাই।'

ছোটকা চুরুট ধরাতে না পেরে উশখুশ করছিল। ঠোঁটে চাপা একটা 'হুম—' শব্দ করে তারপর আচমকা বলে উঠল, 'অবিনাশ চাকলাদার এই ভাইরাল প্রোগ্রামটা চাইছে কেন? আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

ঠোঁট ওলটালেন অশোক মিশ্র। চোয়াল নাড়তে-নাড়তে অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলেন, 'কী আর করবে! হয় কাউকে সেল করবে, নয়তো থ্রেট করবে। তবে যা-ই করুক না কেন, উসকা নতিজা আচ্ছা নহি হোগা।'

'এখানকার কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?'

একটু ভেবে অশোক মিশ্র মাথা নাড়লেনঃ 'কাকে আর সন্দেহ করব?'

ছোটকা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'ধরুন, আপনি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা কায়দা করে হাতিয়ে নিলেন—তা হলে ওটা সেল করার জন্যে কিংবা ওটা দিয়ে কাউকে থ্রেট করতে চাইলে আপনার নেক্সট স্টেপ কী হতো?'

'হাউ ডেয়ার য়ু—' বলে ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. মিশ্র।

'আহা—' হাত তুলে ওঁকে শান্ত করতে চাইল ছোটকাঃ 'রাগ করবেন না, ড. মিশ্র। আমি এমনি কথার কথা বলছিলাম...।'

'আপনি তো বহৎ ফালতু কথা বোলেন।' অশোক মিশ্রের চোখে-মুখে রুক্ষ ছাপ ফুটে উঠলঃ 'যাই হোক, আমার জবাবটা শুনে রাখুন। আপনি ওটা চুরি করার পর যে স্টেপ নিতেন, আমিও

তাই নিতাম। জয় রামজিকি।' শব্দ করে দু-হাতের চেটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জুড়লেন অশোক মিশ্র। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকা মনে-মনে হাসল। ড. মিশ্র খুব রেগে গেছেন। অথচ অবিনাশ চাকলাদার মানুষটা তো ঠান্ডা মাথার লোক! তার সঙ্গে ড. মিশ্রের কোথায়-কোথায় মিল আর কোথায়-কোথায় গরমিল সেটাই ভাবতে লাগল ছোটকা।

একটু পরেই ড. ওয়াসিম খান ঘরে এসে ঢুকলেন।

ফিটফাট পোশাক। সঙ্গে বাড়তি পোশাক হিসেবে হালকা পারফিউম।

হঠাৎ করে ড. খানকে দেখলে প্রথমেই মনে হবে তিনি সিনেমা আর্টিস্ট, বিজ্ঞানী নন।

'বসুন, ড. খান। অবিনাশ-২০০২ নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

হাসলেন ওয়াসিম খান, বললেন, 'অবশ্যই—বলুন, কী জানতে চান।' তারপর দীর্ঘ শরীরটাকে চেয়ারে ভাঁজ করে দিলেন।

'ড. দেবনাথ আমাকে অবিনাশ-২০০২-এর ভয়ঙ্কর সব পসিবিলিটির কথা বলেছেন। বলেছেন, এটা একটা ডেভিল ভাইরাস-এর কোনও ভ্যাকসিন নেই। আপনার কি মনে হয়, ড. দেবনাথ যতটা বলছেন ভাইরাসটা ততটাই মারাত্মক? নাকি ড. দেবনাথ বাড়িয়ে বলছেন?'

ওয়াসিম খান নরম করে হাসলেনঃ 'ড. প্রকাশ দেবনাথ একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট। ওঁর কথার গুরুত্ব মিথ্যে হতে পারে না। দ্য ভাইরাস মাস্ট বি ডেভিল।'

'একজন ক্রিমিনাল এই ভাইরাসটা হাতিয়ে তারপর কী করতে পারে?'

'কী আর করবে! এই ভাইরাসটাকে পার্সোনাল প্রফিটের জন্যে ব্যবহার করবে। হয়তো বিক্রি করতে চাইবে।'

'কী ধরনের লোক এর বায়ার হতে পারে?'

'লোক কেন?' ধীরে-ধীরে বেশ শান্তভাবেই উচ্চারণ করলেন ড. ওয়াসিম খান, 'কোনও অর্গানাইজেশান এটা কিনতে পারে। বিশেষ করে ডিফেন্স অর্গানাইজেশান—সে আমাদের দেশেরই হোক বা বাইরের দেশেরই হোক।'

'কেনার পর তারা কী করবে? কী লাভ হবে তাদের?'

'এটুকু আপনার বোঝা উচিত, মিস্টার চৌধুরী—য়ু আর অলসো আ সায়েন্টিস্ট অফ সাম সর্ট। এই ভাইরাসটা হাতে থাকলে একটা দেশ অন্যান্য দেশকে কন্ট্রোল করতে পারবে—প্রেসার তৈরি করতে পারবে।'

'এটা বিক্রি করে কীরকম দাম পাওয়া যেতে পারে?'

'আকাশছোঁয়া দাম।' শূন্যে হাত তুলে একটা ভঙ্গি করলেন ড. খানঃ 'অ্যাকচুয়ালি স্কাই ইজ দ্য লিমিট।'

'এই ল্যাবে—আই মিন, আপনাদের মধ্যে সেরকম কেউ কি আছে যে এই রিস্কটা নিতে পেছপাও হবে না?'

'প্রশ্ন করা আপনার কাজ—' ছোট্ট করে হেসে বললেন ওয়াসিম খান, 'তবে আপনার প্রশ্নের পুরো উত্তর আমার জানা নেই। অন্যদের কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়—আমি শুধু আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি একজন বিজ্ঞানী—চোর নই।'

ড. ওয়াসিম খানের চোখে ঠান্ডা ভাব ফুটে উঠেছিল। তবে শুধু ওইটুকুই। ছোটকার মনে হল, তিনি একইসঙ্গে বিজ্ঞানী এবং অভিনেতা নন তো!

'আপনি কিছু মনে করবেন না, ড. খান। আমি...।'

হেসে ছোটকাকে বাধা দিলেন ওয়াসিম খানঃ 'আমি কিছুই মনে করিনি। আপনি আপনার কাজ করছেন, আমি আমার...ইটস অল ইন দ্য গেম।'

ভদ্রলোক আশ্চর্যরকম ঠান্ডা মাথার মানুষ। মনে মনে ভাবল ছোটকা।

এর পর ড. খানের গবেষণা নিয়ে ছোটকা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'ড. সেনবর্মাকে কাইন্ডলি যদি একবার এখানে আসতে বলেন...।'

'ইট উইল বি মাই প্লেসার।' হেসে বললেন ওয়াসিম খান।

ড. খান ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর ছোটকার মনে হল, ভদ্রলোক কখনও হৃদয় দিয়ে চলেন না, মগজ দিয়ে চলেন। এরকম আবেগহীন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের পক্ষে কতটা উপকারী কে জানে!

ড. কল্যাণ সেনবর্মা ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করলেন, 'কী, অবিনাশ চাকলাদারের খোঁজখবর কিছু পেলেন?'

ছোটকা বলল, 'না, এখনও পাইনি...তবে হাল ছাড়িনি।'

'ভয়েস সিগনাল অ্যানালিসিস করে কিছু পাওয়া গেল?'

'না, এখনও ওটা করা হয়নি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলার পর অ্যানালিসিসের কাজে হাত দেব।'

একটু ইতস্তত করে ড. সেনবর্মা বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলব, মিস্টার চৌধুরী?'

'অফ কোর্স—বলুন।'

'আমার একজনকে সন্দেহ হয়...।'

'কাকে?' ছোটকার চোখে-মুখে কৌতূহল।

'ড. প্রকাশ দেবনাথকে—।'

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন? অবিনাশ-২০০২ চুরি করার ভান করে ওঁর কী লাভ?'

'আছে, লাভ আছে—' চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলেন কল্যাণ সেনবর্মাঃ 'উনি কোনও একজনকে শাগরেদ বানিয়ে তাকে অবিনাশ চাকলাদার সাজিয়েছেন। তারপর আপনাকে আর আমাদের সাক্ষী রেখে এইসব নাটক-ফাটক করেছেন। আসলে উনি নিজেই হয়তো ভাইরাসটা লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকায় বিক্রি করতে চান। সরাসরি করতে চাইলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। তা ছাড়া মান-সম্মান নিয়েও টানাটানি পড়বে। বরং একজনকে শিখণ্ডী খাড়া করলে সবদিক দিয়ে সুবিধে। সবাইকে বোকা বানিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ হবে।'

'এরকম সন্দেহ আপনার হল কেন?'

'কেন হল?' হাতের আঙুলে ঢোকানো রঙিন পাথরের আংটিগুলোর দিকে তাকালেন ড. কল্যাণ সেনবর্মা। তারপর মুখ তুলে ছোটকার দিকে সরাসরি চোখ রাখলেনঃ 'ড. দেবনাথের এখন রাহুর দশা চলছে।'

ছোটকার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সেটাকে বেশ কষ্ট করে ধামা চাপা দিল। একদিকে ভদ্রলোক বিজ্ঞান করছেন, আর অন্যদিকে রাহু-কেতু নিয়ে পড়ে আছেন! কিন্তু সেসব বাদ দিলেও সন্দেহের একটুখানি ছায়া থেকেই যাচ্ছে। ওঁর সন্দেহটা কি সত্যি-সত্যি হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

প্রসঙ্গ বদলাতে ছোটকা জিগ্যেস করল, 'আপনারা তো একটা গ্রুপে রিসার্চ করেন। রিসার্চের ব্যাপারে ড. দেবনাথের সঙ্গে কখনও কারও কোনও প্রবলেম হয়েছে?'

কল্যাণ সেনবর্মা বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভাবলেন। তারপর যেন হঠাৎই মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'বছরদেড়েক আগে অশোক মিশ্রের সঙ্গে ভীষণ ঝামেলা হয়েছিল।'

'কী নিয়ে?'

'একটা রিসার্চ পেপারে নাম আগে-পরে দেওয়া নিয়ে। তবে মিশ্র একটু রগচটাগোছের লোক—অল্পেতেই খেপে যায়। তো আমরা সবাই মিলে ব্যাপারটা মিটমাট করিয়ে দিয়েছিলাম।'

এর পর ছোটকা কম্পিউটার ভাইরাস আর ডেটা সিকিওরিটি নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

প্রায় আধঘণ্টামতন কথা বলার পর ড. সেনবর্মা ছুটি পেলেন।

তারপর একে-একে প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলল ছোটকা।

প্রভাস রোবট কমিউনিকেশান নিয়ে গবেষণা করছে। না, ওর গবেষণা নিয়ে কোনওরকম সমস্যা নেই। মিত্যুনের সঙ্গেও ওর সমঝোতা চমৎকার। যেসব রিসার্চ পেপার ড. দেবনাথের ল্যাব থেকে পাবলিশ্‌ড হয় তার সবক'টাতেই সকলের নাম থাকে। তা ছাড়া রিসার্চ গাইড হিসেবে ড. দেবনাথ

যথেষ্ট জ্ঞানী এবং গুণী। না, ওঁর এগেইনস্টে প্রভাসের কোনও কমপ্লেন নেই। শুধু টিফিন খেতে ওকে আর মিত্যুনকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়—তাতে গবেষণার অনেক সময় নষ্ট হয়।

এর পর মিত্যুন এল।

মিত্যুন ভীষণ চাপা স্বভাবের। অবিনাশ-২০০২-এর ঘটনাটা নিয়ে ওকে বেশ ডিসটার্বড মনে হল। ছোটকার প্রশ্নের উত্তরে ও খুব সংক্ষেপে—বলতে গেলে একরকম 'হুঁ-হ্যাঁ' করে—জবাব দিয়ে গেল। আর অন্তত বারতিনেক অনুনয় করে বলল, 'যেভাবে হোক স্যারকে আপনি বাঁচান।'

পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলার পর ছোটকা সবকিছু আবার প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করল। টিভির অ্যাকশান রিপ্লের মতো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলো বারবার ছায়া ফেলে গেল ছোটকার মনের পরদায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রহস্য যেমন জট পাকিয়ে ছিল তেমনই জট পাকিয়ে রইল।

নাঃ, অবিনাশ চাকলাদারকে হাতেনাতে ধরতে না পারলে রক্ষে নেই! শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে এরকম সম্মানিত বিজ্ঞানীদের হ্যারাস করা যায় না। সুতরাং একমাত্র পথ বিকেলের জন্যে অপেক্ষা।

আজও বিকেল পাঁচটার পর অবিনাশ চাকলাদার এই ল্যাবে সিডিটা নিতে আসবে।

সত্যি আসবে তো? নিজেকেই প্রশ্ন করল ছোটকা।

সাত

একটা গাঢ় বাদামি রঙের টাটা সুমোর ভেতরে বসে ছিল ছোটকা, ঝালা-পালা আর ঝামেলা। গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে বছর পঁচিশের এক শক্তপোক্ত যুবক। নাম তিওয়ারি। গাড়িটা ছোটকা আজকের অপারেশনের জন্য ভাড়া করেছে।

ড. দেবনাথের বাড়ি থেকে অন্তত পৌনে এক কিলোমিটার দূরে গাড়িটা রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করে রাখা আছে। রাস্তার পাশে বড়-বড় গাছ আর জংলা ঝোপ। কয়েকটা কাঠবিড়ালী গাছের শাখাপ্রশাখা বেয়ে ছুটোছুটি করছে। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি কখনও পড়ছে, কখনও থামছে—তার টাইমটেবিলের কোনও ঠিক নেই।

ছোটকারা বেলা একটার পর থেকে ড. দেবনাথের বাড়ির ওপরে নজরদারির কাজ শুরু করেছে। ছোটকার মন বলছিল, অবিনাশ চাকলাদার সিডিটা আজ নেবেই। ও বলে গেছে বিকেল পাঁচটার পর, কিন্তু ছোটকার মনে হয়েছে একটু আগে থেকে নজর রাখলে ক্ষতি কী!

অপেক্ষা করতে-করতে এখন প্রায় বিকেল চারটে। কিন্তু ড. দেবনাথ এখনও কোনও সিগনাল দেননি। তিনি বলেছেন, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তিনি ছোটকাকে মোবাইল ফোনে ফোন করে খবর দেবেন।

ঝামেলা হঠাৎই চোখের ওপরে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, ‘আর পারিতেছি না। মম পুঞ্জাক্ষি ব্যা-ব্যা-ব্যা—।’

চন্দ্রকান্ত বলল, ‘এই সেরেছে! আবার ওর কথা আটকে গেছে!’

ছোটকা সামনের সিটে বসে ছিল। পিছন ফিরে তাকাল ঝামেলার দিকেঃ ‘কী হয়েছে? পুঞ্জাক্ষি ব্যথা করছে?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব্যথা করিতেছে।’ ঝামেলা তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

ঝামেলার বলের মতো চোখ দুটো আসলে পুঞ্জাক্ষি—মাছি বা মৌমাছিদের যেমন থাকে। এই চোখ দিয়ে ঝামেলা এক কিলোমিটারের বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। এ ছাড়া ওর শ্রবণক্ষমতাও সাংঘাতিক। আলট্রাসনিক শব্দও ওর কানে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। সেইজন্যই ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ছোটকা এত দূর থেকে প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির ওপরে নজর রাখছে।

‘ঝামেলা, আর-একটু কষ্ট করো—ক্রিমিনাল ধরা পড়লেই তোমার ছুটি।’

এমন সময় চন্দ্র বলল, ‘ছোটকা, আমার টয়লেট পেয়ে গেছে।’

ঝামেলা জিগ্যেস করল, ‘বড়, না ছোট?’

চন্দ্র রেগে গিয়ে বলল, ‘তুমি জেনে কী করবে? তোমার তো আর ওসব প্রবলেম নেই!’

ইন্দ্র বলল, ‘ছোটকা আমারও পেয়ে গেছে—ছোট।’

ঝামেলা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘মনুষ্যদিগের কী যে মারাত্মক প্রবলেম! খালি খাওয়া আর টয়লেট যাওয়া, খাওয়া আর টয়লেট যাওয়া। এই কারণেই রোবটরা মানুষের তুলনায় যার-পর-নাই উন্নত। রোবটদের বাড়িতে রান্নাঘরও থাকে না, বাথরুমও থাকে না। কী অসাধারণ চমৎকার!’

‘ঝামেলা, তুমি থামবে!’ ছোটকা ধমক দিয়ে উঠল। তারপর চন্দ্র আর ইন্দ্রকে বলল, ‘যা, গাড়ি থেকে নেমে ওই ঝোপের মধ্যে সেরে আয়।’

আজ সকালে ড. দেবনাথ ছোটকাকে গতরাতের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিয়েছেন। পরে ছোটকা আর ড. দেবনাথ ভয়েস অ্যানালিসিস নিয়ে বসেছে।

ঘণ্টাখানেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যা জানা গেছে তাতে ছোটকা খুব একটা খুশি হতে পারেনি। কারণ, সিডির কণ্ঠস্বরটা বিশ্লেষণ করে টের পাওয়া গেল তাতে বেশ কয়েকটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির ভয়েস সিগনাল মিশিয়ে দেওয়া রয়েছে। বোধহয় অবিনাশ চাকলাদার নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য এইভাবে ড. দেবনাথকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। দুজন স্কলার ও তিনজন বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সিডির কণ্ঠস্বরটা তুলনা করে নিশ্চিত কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ড. ওয়াসিম খান, ড. অশোক মিশ্র আর প্রভাস দত্তের গলার সঙ্গে সিডির গলার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেক্ট্রামের বেশ খানিকটা মিল পাওয়া গেল।

ছোটকা বলল, 'আমাদের কপালটাই খারাপ। এর ওপরে বেস করে কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না। বিশেষ করে এঁরা যখন খুব রেসপেক্টেবল সায়েন্টিস্ট...।'

ড. দেবনাথও দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ গলায় বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। ওঁদের কাউকেই আমি কাল রাতের হানাদার বলে ভাবতে পারছি না। তবে ডেডলাইন আজ রাত বারোটা—আর বিকেল পাঁচটার পর অবিনাশ চাকলাদারের সিডি নিতে আসার কথা। ওই যে, সিডিটা আমি রেকর্ড করে রেখে দিয়েছি...' কাছেই একটা টেবিলে রাখা সিডিটা আঙুল দিয়ে দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ।

'আপনি অবিনাশ-২০০২-এর কোনও কপি রাখেননি?' ছোটকা জানতে চাইল।

ছোটকার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন ড. দেবনাথ। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'ওই সিডিটা ছাড়া আর একটা কপিই রেখেছি। সেটা সফ্টওয়্যার লক করা আছে...।'

নিজের আবিষ্কার কখনও নিঃশেষে নষ্ট করা যায় না। সন্তান যতই খারাপ হোক, পিতৃস্নেহ তাকে আগলে-আগলে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ছোটকা আর কোনও কথা বলেনি। শুধু ঘুরে-ঘুরে ল্যাব, সফ্টওয়্যার রুম আর অ্যান্টিচেম্বারটা ভালো করে দেখেছে। রোবিদাসকে দু-চারটে প্রশ্নও করেছে। কিন্তু সেরকম কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে বলেছে, 'আপনি আজ সারাটাদিন ল্যাবেই থাকবেন। বিশেষ করে পাঁচটার পর আর ল্যাব ছেড়ে একেবারে বেরোবেন না। সন্দেহজনক কেউ ল্যাবে এলেই আমাকে মোবাইল ফোনে কনট্যাক্ট করবেন। আমি আপনার বাড়ির ওপরে কনস্ট্যান্ট ওয়াচ রাখব।'

এখন টাটা সুমোর সামনের সিটে বসে ছোটকা সেই কাজটাই করছিল। তবে এত দূর থেকে ড. দেবনাথের বাড়িটাকে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। তবুও সেদিকে তাকিয়ে একটার পর একটা সরু চুরুট খেয়ে যাচ্ছিল।

ঝামেলা ওর পুঞ্জাক্ষি দিয়ে নজরদারির কাজটা ঠিকমতোই করছিল। শুধু তার সঙ্গে টপাটপ করে হাই তুলেছিল। ওর মোটেই ঘুম পায় না। ও হাই তোলে হাই তুলতে ওর ভালো লাগে বলে। ছোটকা এ নিয়ে প্রশ্ন করায় ঝামেলা জবাব দিয়েছে, 'কেন, রোবটের কি কোনও হবি থাকতে নেই!'

ছোটকা আর কিছু বলতে ভরসা পায়নি। হাই তোলাটা যে-কোনও রোবটের হবি হতে পারে সেটা ছোটকার জানা ছিল না।

ড. দেবনাথের বাড়িতে কেউ ঢুকলে বা বেরোলে ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে তার বিবরণ শুনিয়ে দিচ্ছে। সেই ধারাবিবরণী শুনে ছোটকা বুঝতে পারছে ঠিক কতজন লোক প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে রয়েছে। বেলা বারোটার পর থেকে বিজ্ঞানী তিনজন বেশ কয়েকবার এলেন, আবার চলে গেলেন। রিসার্চ স্কলার দুজন প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরী সকাল এগোরোটা নাগাদ ল্যাবে এসে ঢুকেছিল। তারপর দুপুর আড়াইটের সময় দুজনে একসঙ্গে টিফিন খেতে বেরিয়েছে। ফিরে এসেছে তিনটে পনেরো নাগাদ। আর তার পর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

সাড়ে ছ'টার সময় মিত্যুন ড. দেবনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওর গবেষণার কাজ আজকের মতো শেষ। ও চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পর প্রভাস বেরিয়ে এল—রওনা হয়ে গেল বাসস্টপের দিকে।

লক্ষ রাখতে-রাখতে ছোটকারা বিরক্ত হয়ে গেল। ঝালা-পালার ঘুম পাচ্ছিল। তাই থেকে-থেকেই প্যাকেটে করে নিয়ে আসা খাবার মুখে দিয়ে ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করছিল।

জল খেতে-খেতে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'এভাবে আর পারা যাচ্ছে না, ছোটকা। তখন থেকে বসে আছি—কিছু একটা না হলে ভালো লাগে! খালি ঘুম পাচ্ছে।'

ঝামেলা বলল, 'মানুষের এই থার্ড প্রবলেম—ঘুম। এইজন্যেই কবি বলেছেন, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

ছেটকা ধমকে উঠলঃ 'ঝামেলা, তুমি থামবে! আমরা একটা সিরিয়াস মিশনে...।'

ঝামেলা ছোটকাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এবারে তুমি থামো—একটা গাড়ি এসে গেছে। গাড়িটা ড. দেবনাথের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি মনুষ্যপুঙ্গব শকট হইতে অবতরণ করিতেছে...'

ঝামেলার কথা শোনামাত্রই সবাই চুপ করে গেল।

ছোটকারা ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। তাই ছোটকা তিওয়ারিকে বলল, রাস্তার ধার ঘেঁষে খুব ধীরে ধীরে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গাড়িটা যখন প্রায় দুশো মিটারের মধ্যে চলে এসেছে তখনই ছোটকার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ছোটকা গাড়িটা থামাতে বলল। তারপর পকেট থেকে ফোন বের করে বোতাম টিপে কানে ধরল।

'হ্যালো, বলুন...।'

'প্রকাশ দেবনাথ বলছি।' ড. দেবনাথের গলা কাঁপছিলঃ 'এইমাত্র একটা গাড়ি আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে...।'

'আপনি চিন্তা করবেন না—আমরা ওয়াচ রাখছি।'

গাড়িটা স্যান্টো বলে চেনা যাচ্ছিল, তবে মানুষটিকে চেনা যাচ্ছিল না। একটা গাছের নীচে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল বলে রাস্তার আলো অনেকটাই আড়াল হয়ে গিয়েছিল। আর গাড়ি থেকে নেমে আসা লোকটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছিল।

ঝামেলা বলল, 'গাড়িতে আর কেহ নাই। আর লোকটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না।'

ফোনে প্রকাশ দেবনাথ জানতে চাইলেন, 'আমি এখন কী করব?'

ছোটকা বলল, 'ফোন অফ করবেন না। আমাকে ইনফরমেশান দিতে থাকুন। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকটাই অবিনাশ চাকলাদার। কিন্তু ওকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না।'

হঠাৎই লোকটা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পকেট থেকে কী একটা বের করে কানে চেপে ধরল।

ঝামেলা বলল, 'ব্যক্তিটির ফোন আসিয়াছে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দেখল, লোকটা ফোন পকেটে রেখে একছুটে ঢুকে গেল প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে।

ছোটকা মোবাইল ফোন কানে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে, যাতে কোনও কথা বা শব্দ কান এড়িয়ে না যায়।

একটু পরেই শুনতে পেলঃ 'আরে আপনি! আসুন, আসুন...।' প্রকাশ দেবনাথের গলা। আগন্তুককে স্বাগত জানাচ্ছেন। নিশ্চয়ই লোকটা ওঁর চেনা। কিন্তু কে সে?

আগন্তুকের আবছা গলা শোনা গেলঃ 'একটা বিশেষ কাজে এসেছি। তবে আমি একা নই—উনিও আছেন...।'

তারপরই ড. দেবনাথ বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! তার মানে?'

উত্তরে আর-একটা গলা শোনা গেলঃ 'তার মানে অবিনাশ-২০০২।'

আর তার পরমুহূর্তেই একটা ভারী আঘাতের শব্দ। সেই সঙ্গে একটা চাপা যন্ত্রণার চিৎকার।

টেলিফোনে ড. দেবনাথের গলা আর শোনা গেল না।

ছোটকা সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বাঁ-হাতে ফোনটা কানে চেপে ধরে আছে। ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে বের করে নিল একটা ব্লাস্টার গান। তারপর একরকম ছুটতে শুরু করল ড. দেবনাথের বাড়ি লক্ষ করে।

কিন্তু ছোটকা পঞ্চাশ-ষাট মিটার পেরোতে-না-পেরোতেই তিনজন লোক বেরিয়ে এল প্রকাশ দেবনাথের বাড়ি থেকে। দুজন পায়ে হেঁটে—আর-একজন কাঁধে চড়ে। কারণ, প্রকাশ দেবনাথের অসাড় দেহটা একজনের কাঁধে নেতিয়ে দু-ভাঁজ হয়ে ঝুলছে।

চোখের পলকে গাড়ির দরজা খুলে ওরা উঠে বসল। আর গাড়িটা চলতে শুরু করল।

ঝামেলা চেঁচিয়ে বলল, 'পশ্চাদ্ধাবনং অবশ্যন্তি! পশ্চাদ্ধাবনং অবশ্যন্তি!'

তিওয়ারি সেই 'দেবভাষা' কী বুঝল কে জানে, তবে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এক হ্যাঁচকায় সেটা ছুটিয়ে নিয়ে গেল ছোটকার কাছে।

ঝালা-পালা উত্তেজনায় চিৎকার করছিল। চন্দ্রকান্ত সিট টপকে চলে এল সামনে-চট করে খুলে ধরল বাঁদিকের দরজা। ছোটকা ছুটন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

'গাড়িটাকে ফলো করো! কুইক!' ইন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠল।

ছোটকা হাঁফাতে-হাঁফাতে ঝামেলাকে জিগ্যেস করল, 'কাউকে চিনতে পারলে?'

ঝামেলা মাথা নেড়ে বলল, 'না পারু, না পারু! তবে ফোল্ড করা বডিটা ড. দেবনাথের।'

'এটা না বললেও চলত।' ইন্দ্রকান্ত মন্তব্য করল।

তিওয়ারি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। বাঘের মতো হিংস্র চোখে ও তাকিয়ে ছিল সামনের রাস্তার দিকে। সুমোর হ্যালোজেন হেডলাইটে কালো রাস্তা আলো হয়ে উঠেছে।

ছোটকা মোবাইল ফোন পকেটে রেখে বলল, 'ড্রাইভারসাব, ওই গাড়িটাকে ধরা চাই।'

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই তিওয়ারি হেসে বলল, 'ইয়ে সান্ত্রোকি বচ্চা যায়গা কঁহা! ব্যস, থোড়া টাইম কি বাত হ্যায়...চুপচাপ ব্যয়ঠকে মেরা কামাল দেখিয়ে।'

দূরে স্যান্টোর ব্যাকলাইট চোখে পড়ছিল। কখনও-কখনও সেটা বাঁক ঘুরে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তিওয়ারি গাড়ির স্টিয়ারিং এমনভাবে ম্যানেজ করছিল যে, মনে হচ্ছিল ওটা ওর হাতেরই একটা বাড়তি অংশ। অত বড় গাড়িটাকে লাউডগা সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে চালিয়ে ও একটার পর একটা গাড়ি ওভারটেক করে যাচ্ছিল। আর স্যান্টোর ব্যাকলাইট ক্রমেই ওদের কাছে আরও বড়, আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে স্যান্টোটা বাইপাসে এসে পড়ল। আর যেই না পড়া অমনই তিওয়ারি দাঁত বের করে হেসে বলল, 'সালা বুদ্ধু হ্যায়। বাইপাসমে কাহে আ গিয়া! অব তো বচনা নামুমকিন হ্যায়।'

অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল তিওয়ারি। ওর মাথাটা আরও সামনে ঝুঁকে পড়ল। টাটা সুমোর ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ শব্দে কানে প্রায় তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছিল ঝড়ের মতো।

সল্টলেক স্টেডিয়াম পেরোনোর পর দুটো গাড়ির দূরত্ব ভীষণ কমে গেল। ঝালা-পালা হাত-পা ছুড়ে 'আরও জোরে, আরও জোরে' বলে চেঁচাতে লাগল। আর ঝামেলা মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বারবার বলতে লাগল, 'বহৎ খুব। বহৎ খুব। শুক্রিয়া। শুক্রিয়া।'

ছোটকা অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব কী উলটোপালটা বলছ! কথাগুলোর মানে জানো?'

ঝামেলা বলল, 'না, জানি না। কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। এর মানে হল, "শাবাশ। শাবাশ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।" মানে না জেনে কাকে এসব বলছ?'

'কাউকে না। তিওয়ারিকাকুর হিন্দি শুনে আমারও কেমন উর্দুর বেগ এসে গেল, তাই।'

তিওয়ারির টাটা সুমো তখন স্যান্টোর পাশাপাশি দৌড়োচ্ছে। আর একইসঙ্গে বাঁদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে তিওয়ারি স্যান্টোটাকে চাপতে শুরু করল।

বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় গাড়ির চাকা গড়িয়ে চলার চড়বড়-চড়বড় শব্দ হচ্ছিল। এবার স্যান্টোটা বাঁ-দিকে সরতে-সরতে ফুটপাথের গায়ে এসে ব্রেক কষতেই বীভৎস আওয়াজ হল—যেন কয়েকটা বুনো ঘোড়া একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু তিওয়ারি তাতেও থামল না। ওর গাড়ির বাঁ-দিকটা ঘষে দিল স্যান্টোর মুখে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘষা লাগার শব্দ হল। তার সঙ্গে মিশে গেল ভিজে রাস্তায় ভালকানাইজ্‌ড রবার ঘষে যাওয়ার আওয়াজ। টাটা সুমোটাকে আরও পাঁচ-ছ'হাত এগিয়ে নিয়ে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড় করাল তিওয়ারি।

ঝালা-পালা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

স্যান্টোর সামনের একটা চাকা উঠে গেল ফুটপাথে। রাস্তায় পথচারী খুব কম ছিল। তা নইলে দু-চারজন আহত হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

তিওয়ারি গাড়ি থেকে নামল। সিটের তলা থেকে একটা লোহার রড বের করে নিল। তারপর নাক উঁচু করে থমকে দাঁড়ানো স্যান্টো গাড়িটাকে লক্ষ করে বলল, 'কেয়া, বাচ্চু, এক চুমা দে দিয়া তো হাওয়া নিকল গই?'

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার উঁচিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। আর ছোটকার দেখাদেখি ঝালা-পালা আর ঝামেলাও সুমোর পিছনের দরজা খুলে নেমে পড়ল রাস্তায়।

আট

স্যান্টো গাড়িটার জানলার কাচগুলো কালো হওয়ায় ওভারটেক করার সময় গাড়ির ভেতরটা কিছু দেখা যায়নি। তাই ড্রাইভারকে দেখার জন্য ছোটকা তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল স্যান্টোর কাছে।

টাটা সুমোর ধাক্কায় স্যান্টোর বডির পাশটা তুবড়ে গিয়েছিল। তাই শত চেষ্টা করেও গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে বেরোতে পারছিল না। মাথাটা ঝুঁকিয়ে থাকায় তাকে ভালো করে চেনাও যাচ্ছিল না।

তিওয়ারি মারমুখী হয়ে স্যান্টোর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। আচমকা গাড়ির ভেতর থেকে গুলি ছুটে এসে তিওয়ারির বাঁ হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

গুলির শব্দ খুব জোরে শোনা না গেলেও গাড়ির শ্যাটারপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি উইন্ডশিল্ডটা নিমেষে মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেল।

তিওয়ারি একপলক থমকে গেল। রক্তে ভিজে ওঠা বাঁ-হাতটা একবার দেখল।

তারপর একটা গালাগাল দিয়ে হাতের রডটা ভীষণ জোরে ছুড়ে দিল ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে। ডান হাত দিয়ে বাঁ-হাতের কাটা জায়গাটা চেপে ধরল। যন্ত্রণার ওর মুখ কুঁচকে গেল।

গাড়ির ড্রাইবার বাঁ-হাত তুলে রডের আঘাতটা রুখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে আবার গুলি চালাল সে। কিন্তু নিশানা ঠিক না থাকায় সেটা ছুটে গেল অন্ধকার আকাশের দিকে।

ছোটকা ততক্ষণে স্যান্টোর একেবারে পাশে চলে এসেছে।

ব্লাস্টারটা উঁচিয়ে ধরে ছোটকা বলল, 'ছিটেফোঁটা নড়াচড়া করলেই গাড়িসমেত সব ধুলো করে দেব।'

ছোটকার ব্লাস্টারের লেজার পয়েন্টারের লাল আলোটা ড্রাইভারের কপালে টিপের মতো জ্বলছে।

ছোটকা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'রিভলভারটা ফেলে দিন। তারপর ওপাশের দরজাটা খুলে ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে আসুন, ড. মিশ্র—নাকি বলব অবিনাশ চাকলাদার?'

ড. অশোক মিশ্র ছোটকার হুকুম অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। রিভলভারটা ফেলে দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। এবার চোখে পড়ল...তিওয়ারির ছুড়ে দেওয়া রডের আঘাতে ওঁর কপালের ওপরদিকটায় কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

দুটো গাড়ি ঘিরে ততক্ষণে লোক জমতে শুরু করেছে। অনেকেরই হাতে ছাতা। কেউ-কেউ আবার বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মাথায় পলিথিন কিংবা কাগজের আড়াল দিয়েছে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলা ভিড় ঠেলে ছোটকার কাছে চলে এল।

ছোটকা পকেট থেকে নিজের আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে উঁচিয়ে ধরল। তারপর অনেকটা হুকুমের সুরে বলল, 'আমরা স্পেশাল ফোর্সের লোক। আপনারা সব দূরে সরে যান—নইলে উন্ডেড হতে পারেন। প্লিজ, আপনারা দূরে সরে যান।'

ছোটকার কথায় খানিকটা কাজ হল।

তখন চন্দ্রকান্ত হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'ড. দেবনাথ কোথায় গেলেন, ছোটকা?'

অশোক মিশ্রর দিকে ব্লাস্টার তাক করে ছোটকা রূঢ় গলায় বলল, 'শিগগির এগিয়ে এসে গাড়ির বনেটের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। ভুলেও পালানোর চেষ্টা করবেন না।'

অশোক মিশ্র কথা শুনতে এতটুকুও দেরি করলেন না। বাধ্য ছেলের মতো স্যান্টোর বনেটের ওপরে শরীরটাকে উপুড় করে দিলেন।

ছোটকা এবার তিওয়ারিকে বলল, 'তিওয়ারি এই শয়তানটার ওপরে নজর রাখো। পালাতে চেষ্টা করলেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ো...।'

তিওয়ারি ড. মিশ্রর খুব কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে জিগ্যেস করল, 'কেয়া, বাচ্চু, ভাগনা হ্যায় কেয়া?' তারপর অশোক মিশ্রর পিঠে ভয়ঙ্কর এক কিল বসিয়ে দিল।

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার তাক করে স্যান্টোর পিছনের দরজা ধরে টান মেরেছে।

দরজা খুলে যেতেই রাস্তার আলোয় ড. প্রকাশ দেবনাথকে দেখা গেল। সিটে কাত হয়ে পড়ে আছেন—দু-চোখ বোজা। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

ছোটকা মাথা নীচু করে গাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখতে চাইল। দ্বিতীয় লোকটা কোথায় গেল?

ছোটকার ব্লাস্টার গানের লেজার পয়েন্টারের আলো সেই লোকটার মুখে গিয়ে পড়তেই সে আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠলঃ 'পি-পি-প্লিজ, ফায়ার করবেন না! ড. দেবনাথ ভালো আছেন...শুধু অ-অ-অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনার প-প-পায়ে প-পড়ি, ফায়ার করবেন না!'

ড. দেবনাথকে গাড়ির সিটে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে রোবিদাস বাইরে বেরিয়ে এল।

ওকে দেখামাত্রই ছোটকার অঙ্কটা মিলতে শুরু করল।

এই যন্ত্রমানুষটাকে ছোটকা কিংবা প্রকাশ দেবনাথ মানুষের মধ্যেই ধরেননি। তাই ওঁদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

অবিনাশ চাকলাদার অবশ্যই অশোক মিশ্র। কিন্তু তাঁকে প্রতিটি ধাপে সাহায্য করে গেছে প্রকাশ দেবনাথের এই 'বুদ্ধিমান' রোবট অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ছোটকা ড. দেবনাথকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল। ঝালা-পালাকে বলল টাটা সুমো থেকে জলের বোতল নিয়ে আসতে। তারপর ফুটপাথের ওপরেই ড. দেবনাথকে শুইয়ে দিল।

বারকয়েক জলের ঝাপটা দিতেই প্রকাশ দেবনাথ চোখ মেললেন। যন্ত্রণার কয়েকটা টুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। কোনওরকমে উঠে বসে তিনি মাথার পিছনটায় হাত বোলাতে লাগলেন।

ছোটকা মোবাইল ফোন বের করে লালবাজারে ডায়াল করে সংক্ষেপে খবর জানাল। অনুরোধ করল যেন একটা ডিটেকটিভ স্কোয়াড আর একটা রেসকিউ ভ্যান এখুনি স্পটে চলে আসে। কারণ, ড. প্রকাশ দেবনাথ একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট।

ছোটকার ফোন করা শেষ হলে ড. দেবনাথ ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছোটকার কাছ থেকে ব্লাস্টার গানটা চাইলেন।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, ‘কেন? ব্লাস্টার দিয়ে কী করবেন?’

‘এই পাগল অ্যানড্রয়েডটাকে উড়িয়ে দেব। ওর এতবড় সাহস যে, আমার গায়ে হাত তোলে!’

ছোটকা মাথা নাড়লঃ ‘উঁহু, ভুলেও ও-কাজটি করবেন না। এই কেসে রোবিদাস আমাদের রাজসাক্ষী। কারণ, রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না।’

ঝামেলা রোবিদাসের কাছে এগিয়ে এসেছিল। ব্লাডহাউন্ডের মতো ও রোবিদাসকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল আর গন্ধ শুঁকতে লাগল।

ঝালা-পালা বলল, ‘কী করছ, ঝামেলা—?’

ঝামেলা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, ‘গন্ধ শুঁকে দেখছি। এই বন্ডেড লেবারটার গায়ে শুঁটকি মাছের মতো দুর্গন্ধ।’

রোবিদাস মুখ ভেংচে বলল, ‘ব্যাটা নেড়া চাকর!’

ঝামেলা তখন চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, ‘বল তো, পাখির পিঠে পাকা পেঁপে!’

রোবিদাস বারকয়েক ‘পা-পা-পা’ বলে পালিয়ে গেল গাড়ির আড়ালে।

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, ‘গাড়ির ভেতরে একটা সিডি আছে—খুঁজে বের কর তো! দেখিস, যেন কাচের টুকরোয় হাত-পা না কাটে। আর রিভলভারটা টাচ করবি না—ওতে ড. মিশ্রর আঙুলের ছাপ আছে।’

ঝালা-পালা সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকশন শুরু করে দিল।

সিডিটা সহজেই পাওয়া গেল। গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিল। সেটা নিয়ে দু-ভাই ছোটকার হাতে এনে জমা দিল।

ছোটকা সবাইকে টাটা সুমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেল। স্যান্টোর আড়ালে দাঁড়ানো রোবিদাসকেও ডাকল। শুধু তিওয়ারিকে বলল স্যান্টোর পিছনের সিটে বসে বিশ্রাম নিতে। পুলিশ যে-কোনও সময় এসে পড়বে। তারপরই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

তিওয়ারি হেসে বলল, ‘কোনও চিন্তা নাহি, স্যার। হামার কুছু হোয়নি।’

ছোটকা বলল, ‘সে জানি। তবে গাড়ির ভেতরে ড. মিশ্রর রিভলভারটা পড়ে আছে। ওটাও তো পাহারা দেওয়া দরকার। তুমি গাড়িতে বসে ওয়েট করো, আমরা কয়েকটা কাজের কথা সেরে নিই। ভয় নেই, ড. মিশ্রর দিকে আমার নজর থাকবে।’

ঝালা-পালা আর ঝামেলা টাটা সুমোর কাছে চলে এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা এখন থেমে গেছে। তবে জোলো বাতাসে গাছপালা নড়ছে। আকাশের পশ্চিম কোণে কালো মেঘের পাহাড়। একটু

পরেই আবার হয়তো বৃষ্টি শুরু হবে।

ব্লাস্টার উঁচিয়ে ড. অশোক মিশ্রকেও বড় গাড়িটার কাছে নিয়ে এল ছোটকা। বলল, অকারণে পালানোর চেষ্টা করে তিনি যেন ছোটকাকে দিয়ে খারাপ কাজ না করান।

ড. মিশ্র মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রকাশ দেবনাথ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ছিঃ, ড. মিশ্র! আপনি এইরকম দেশদ্রোহিতার কাজে নামলেন!’

অশোক মিশ্র কেঁদে ফেললেন। ড. দেবনাথের দু-হাত চেপে ধরলেনঃ ‘আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাজারে আমার লাখ-লাখ টাকা ধার। কীভাবে সেই লোন চুকতা করব সে-কথা ভেবে-ভেবে আমি পাগল কুত্তামাফিক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন রোবিদাসের কাছ থেকে আপনার লাজবাব কম্পিউটার ভাইরাসের কথা জানতে পারি। তখন আমি প্রভাসের হেল্প নিয়ে রোবিদাসের সঙ্গে স্পেশাল কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা করি। তবে প্রভাসকে কিছু বুঝতে দিইনি। ও জানত আমি রিসার্চের জন্যে এসব কাজ করছি। তারপর যা করার সব রোবিদাসের হেল্প নিয়ে করেছি।’

‘অবিনাশ-২০০২ হাতিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি কী করতেন?’ ছোটকা জিগ্যেস করল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. মিশ্রঃ ‘ঠিক জানি না। হয়তো কোনও ইন্টারেস্টেড পার্টিকে বিক্রি করতাম...।’

ছোটকা ড. দেবনাথকে বলল, ‘এবার নিশ্চয়ই পুরো গল্পটা বুঝতে পারছেন! আপনার ল্যাবের ভেতরে থেকে রোবিদাস প্রথম থেকেই অশোক মিশ্রকে হেল্প করে গেছে। কারণ, রোবট কখনও তার লজিক দিয়ে দেশদ্রোহিতার মানে বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারবে না, কোনও জিনিস বিক্রি করার মানে কী। টাকা রোবটের কাছে শুধুই ছাপা কাগজ। আসলে রোবটের মধ্যে লোভ, হিংসা, ভালোবাসা, প্রভুভক্তি এসব কিচ্ছু নেই—থাকা সম্ভব নয়।’

‘তার মানে রোবিদাস কুকুরেরও অধম!’ ঝামেলা মন্তব্য করল।

‘আর তুমি কী?’ চন্দ্রকান্ত চাপা গলায় ঝামেলার কানে-কানে জিগ্যেস করল।

ঝামেলা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভান করে ছোটকার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রকাশ দেবনাথ এবার সব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিলেন।

কে প্রথম অবিনাশ-২০০২-এর কথা জানতে পারে?

কে লিটার বিন থেকে ভাইরাসের নাম লেখা কাগজটা হাতিয়ে নিয়েছিল?

কে মিউজিক সিস্টেমে অন্য সিডি ঢুকিয়ে দিয়েছিল?

অশোক মিশ্রকে সবার অলক্ষে বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা কে করে দিয়েছে?

আর আজ সন্ধেবেলা ল্যাবে রোবিদাস যে তাঁর মাথায় বাঁ-হাত দিয়ে কষে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে সে তো ড. দেবনাথ ভালো করেই জানেন!

প্রকাশ দেবনাথ মাথার পিছনে একবার হাত বোলালেন। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে ছোটকাকে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, ভাইরাসের সিডিটা আমাকে দিন।'

ছোটকা সিডিটা দিতেই প্লাস্টিকের খাপ খুলে চকচকে চাকতিটা বের করে নিলেন প্রকাশ দেবনাথ। বললেন, 'অবিনাশ-২০০২-এর এটাই এখন একমাত্র কপি। কারণ, আজ বিকেল চারটের পর আমি আমার পার্সোনাল কপিটা ডেস্ট্রয় করে দিয়েছি। এটাও আর রাখব না। কারণ, লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস।'

কথাটা শেষ করেই সিডিটা জল-কাদার ওপরে ফেলে দিলেন ড. দেবনাথ। ওটাকে পাগলের মতো জুতোয় পিষতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিসটেক! ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিসটেক!'

ছোটকা অবাক চোখে অদ্ভুত দেশপ্রেমী বিজ্ঞানীটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝামেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অবশেষে সবকিছুর নিষ্পত্তি হইল। আমাকে লইয়াই ভাইরাস প্রবলেমের সূচনা, আবার আমার জন্যেই সমাধান হল।'

ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে! তুমি একাই সবকিছুর ক্রেডিট নিতে চাও?'

'নাও, তুমি সব নাও। আমার সকল কৃতিত্বের ফল আমি তোমাকে দান করিলাম। আমার প্রবল দুঃখ হইতেছে। হিরোশিমা! হায় হিরোশিমা!'

চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত 'ফুজিয়ামা' শুনে অভ্যস্ত। তাই 'হিরোশিমা' শুনে একটু অবাক হল। চন্দ্র ঝামেলাকে জিগ্যেস করল, 'লাস্টে হিরোশিমা বললে কেন?'

ঝামেলা মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'ওটা গভীর দুঃখের এক্সপ্রেশন। আজ থেকে ইউজ করব ঠিক করেছি।'

এমন সময় একটা পুলিশের জিপ আর একটা ভ্যান ছোটকাদের টাটা সুমোর কাছে এসে দাঁড়াল।

সর্বজনপাঠ্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনি

গল্প



চোর ধরল ঝামেলা

কোনও রোবটের পুজোর জামা কেনা যে কীরকম ঝকমারি সেটা এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ছোটকা। তার ওপর যদি সেই রোবট বাচ্চা খোকা হয়, আর তার নাম হয় ঝামেলা, তা হলে তো কথাই নেই।

যমজ দুই ভাইপো, চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে পুজোর জামা-প্যান্ট কিনে দেবে বলে ছোটকা ওদের নিয়ে রওনা হচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে হেলে দুলে হাঁটতে-হাঁটতে সামনে এসে হাজির হল তিনফুট মাপের বাচ্চা রোবট ঝামেলা। রিনরিনে মেয়েলি গলায় বলল, 'টুইন দুই ব্রাদারের সহিত আমিও পূজার জামা কিনিতে যাব...কিনিতে যাব...কিনিতে যাব...।'

ঝামেলার 'কিনিতে যাব...' ব্যাপারটা আর থামছিল না বলে ছোটকা ওর ন্যাড়া ধাতব মাথায় মারল এক চাঁটি। তারপর বলল, 'ওর ভেতরের সার্কিটে বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। পরে দেখে দেব, বুঝলি, ঝালা-পালা—।'

শেষ কথাগুলো ছোটকা বলেছে চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে লক্ষ্য করে। ছোটবেলায় এই যমজ জুটি কান্নাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচি করে বাড়িসুদ্ধ সবার কান ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা ওদের নাম রেখেছিল ঝালা-পালা। তবে এ-নামে আর কেউ ওদের ডাকলে দু-ভাই ভীষণ খেপে যায়।

ঝামেলার ঝকঝকে মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। তবে আঙুলগুলো খুব নিখুঁতভাবে তৈরি। সবসময় ও জামা-প্যান্ট পরে থাকে। ছুটতে পারে না, হেলে দুলে হাঁটতে পারে। ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারে, কিন্তু গলার স্বরটা মিহি মেয়েলি।

সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা কথা-বলা পুতুল।

পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই 'বাচ্চা' রোবটটা ছোটকাই তৈরি করে দু-ভাইকে উপহার দিয়েছে।

ছোটকার চাঁটি খেয়ে ঝামেলা চুপ করে গিয়েছিল—তবে সে মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য।

ঝালা-পালা যখন পুজোর জামা কিনতে যাওয়ার আনন্দে হইহুল্লোড় শুরু করে দিয়েছে তখন ঝামেলা গম্ভীরভাবে বলে উঠেছে, 'এত লম্ফঝম্পপূর্ণ উল্লাসের কী হইয়াছে? সেই কোন আদিম যুগে পড়ে আছ। বিবর্তন হয়ে আমার জায়গায় পৌঁছোলে বুঝতে সভ্যতার আর এক নাম সংযম। আমাকেই অবলোকন করো না। আনন্দ কি আমারও হইতেছে না? কিন্তু আমি কি শাখামৃগের ন্যায় জাম্প দিচ্ছি?'

ঝামেলার এই একটাই গোলমাল। এখনও শুদ্ধ বাংলা বলতে শেখেনি। সাধু-চলিত আর ইংরেজির জগাখিচুড়ি তৈরি করে যা প্রাণ চায় বলে বেড়ায়। যদিও অবশ্য ওর 'প্রাণ' বলতে ঘাড়ের কাছে লুকিয়ে রাখা ব্যাটারি।

ছোটকা বলে, ঝালা-পালার কাছে ঝামেলার এখন ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঝামেলা, স্টপ!'

ওর নির্দেশে ঝামেলা নীরব স্ট্যাচু হয়ে গেল।

ছোটকা হেসে বলল, 'ঝামেলা তোদের পোষা রোবট, না গার্জেন!

ঝালা-পালা কোনও কথা না বলে ছুটল মায়ের কাছে। মাকে খুশির খবরটা বলে ঝটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ছোটকা সেই ফাঁকে ঝামেলার নানান পার্টর্স চেক করে নিতে লাগল।

ঝালা-পালা তৈরি হয়ে আসতেই ওরা চারজন রওনা হয়ে পড়ল।

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'ঝামেলা, স্টার্ট—।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলার কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙের ছোট ছোট বাতিগুলো জ্বলে উঠল। তারপর দপদপ করে জ্বলতে আর নিভতে লাগল। ঝামেলা খুশি হলে বা উত্তেজিত হলে এই বাতিগুলো এইরকম জ্বলে-নেভে।

ঝামেলা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তাই-তাই-তাই, পুজোর জামা চাই।'

ছোটকা একটা ট্যাক্সি ডাকতেই সবাই তাতে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটে চলল ধর্মতলার দিকে।

রাস্তায় অনেক লোকজন, যানবাহন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে শরতের রোদ্দুর। মাথার ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশ।

এপাশ-ওপাশ মাথা ঘুরিয়ে সবকিছু দেখতে-দেখতে ঝামেলা মন্তব্য করল, 'বাতাসে কেমন একটা পূজা-পূজা স্মেল। তোমরা টের পাইতেছ?'

ছোটকা হেসে বলল, 'হ্যাঁ পাইতেছি। কিন্তু তুমি দয়া করে একটু চুপ করবে? নইলে তোমার পুজোর জামা কিনে দেব না—।'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলা চুপ।

কিন্তু ঝামেলাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হল রেডিমেড জামাকাপড়ের বিশাল মাপের দোকানটায় ঢুকতেই।

না, ঝামেলা রোবট বলে নয়। কারণ আজকাল অনেকেই নানা মাপের নানা ঢঙের রোবট সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোয়। বহু কোম্পানি রোবট তৈরি করে, টিভিতে তারা ইনস্টলমেন্টে রোবট বিক্রির বিজ্ঞাপনও দেয়।

দোকানে ঢুকে জামাকাপড় পছন্দ করার সময় ঝামেলা হঠাৎ ছোটকার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'আমি একজন তস্করকে দেখিতে পেয়েছি।'

ছোটকা এবং ঝালা-পালা তিনজনেই অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকাল। কারণ, ঝামেলার দেখা ও শোনার ব্যাপারটা যে মোটেই সাধারণ নয় সেটা ওরা জানে। ঝামেলার টেনিসবল সাইজের কাচের গুলির মতো চোখ দুটো পুঞ্জাক্ষি—অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি। এই চোখ দিয়ে ঝামেলা একমাইল দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়—ঠিক টেলিস্কোপের মতো। আর ওর কানের জায়গায় রয়েছে স্রেফ দুটো ফুটো। কিন্তু তার ভেতরে এমন সব কলকবজা আছে যে, ও আলট্রাসনিক—মানে, শব্দোত্তর তরঙ্গ—পর্যন্ত শুনতে পায়।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী দেখতে পেয়েছ?'

'তস্কর, তস্কর। সাদা বাংলায় থিফ—মানে, চোর।'

কথা বলার সময় ঝামেলার কপালের বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলে উঠতে লাগল। ঝালা-পালা বুঝল ঝামেলা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

ছোটকা ঝামেলার কথা মোটেই উড়িয়ে দিতে পারল না। কারণ, রোবটটা ওর নিজের হাতে তৈরি। তা ছাড়া রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না। অবশ্য কোনও ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করাটা রোবটের পক্ষে অসম্ভব নয়।

ছোটকা দোকানের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানটায় জামাকাপড়ের যেমন স্টক তেমনই খদ্দেরের ভিড়ে একেবারে গিজগিজ করছে। প্রচুর সেল্সম্যান ও সেল্সগার্ল এদিক-ওদিক নানান কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। স্টিরিও স্পিকারে গমগম করে মিউজিক বাজছে। দোকানের বিশাল-বিশাল দেওয়ালে নানা রঙের ইলেকট্রনিক রোলিং ডিসপ্লে। তাতে নামি কোম্পানির জামা-প্যান্টের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে পুজোর স্পেশাল ডিসকাউন্টের ঘোষণা পর্যন্ত রয়েছে। দোকানের দরজার পাশে এক কোণ ঘেঁষে দশ বাই দশ মাপের একটা কাচের ঘর। সেখানে তিনটে কম্পিউটার নিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই ছোটকা ঝামেলাকে একপাশে ডেকে নিল। তারপর চাপা গলায় বলল, ‘ঝামেলা, ঝটপট বলো, কোথায় তুমি চোর দেখলে—।’

ঝামেলা বলল, ‘আমার সঙ্গে ওদিকটায় চলো, মেয়েটাকে দেখাইয়া দিতেছি। আমার পু...পু...’

ছোটকা ঝামেলার মাথায় এক চাঁটি মারতেই ও বলল, ‘পু...পুঞ্জাক্ষিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই সুকঠিন।’

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, ‘তোরা এই কাউন্টারেই থাক—জামা-প্যান্ট পছন্দ কর—আমি এক্ষুনি আসছি...।’

ঝালা-পালাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছোটকা ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভিড় ঠেলে একটা কোণের দিকে পৌঁছেই ঝামেলা ছোটকাকে ইশারায় থামতে বলল। তারপর ফিশফিশে গলায় বলল, ‘তোমার পশ্চাৎদিকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কেয়ারফুলি তাকাও। হলুদ টপ এবং কালো স্কার্ট পরা ফরসা মেয়েটিকে লক্ষ করিতেছ? উনিই হলেন শ্রীমতী তস্কর।’

ঝামেলার কথা মতো ধীরে-ধীরে পিছনে ফিরল ছোটকা। তারপর মোটামুটি তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নজরটা ঘোরাতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল।

মেয়েটির গড়ন সুন্দর ছিপছিপে। বয়েস বড়জোর ষোলো কি সতেরো হবে। ওর হাতে একটা ছোট মাপের সাইডব্যাগ। ব্যাগটার রং নীল আর কালোয় তৈরি দাবার ছক—তবে বেশ মলিন। বিশেষ করে মেয়েটির চেহারা ও পোশাকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

ঝালা-পালা কিন্তু ছোটকার পিছু ছাড়তে চায়নি। বিশেষ করে ঝামেলার ‘তস্কর দর্শন’ রহস্য ওদের কৌতূহলী করে তুলল।

সুতরাং ভিড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে যমজ জুটি সামান্য চেষ্টাতেই পৌঁছে গেল ছোটকার কাছে। দোকানের বেশ কয়েকজন ক্রেতা অবিকল একই চেহারার একই পোশাক পরা দুই ভাইকে বারবার অবাক নজরে দেখেছিল। কিন্তু ঝালা-পালার সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না। ওরা শুধু ঝামেলাকে দেখছিল।

ঝালা-পালাকে দেখে ছোটকা শাসনের সুরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝামেলা ওর শক্ত হাতে ছোটকার পেটে চোরা চিমটি কাটল, আর একইসঙ্গে মিহি গলায় বলল, ‘লুক! লুক! অপহরণ করছে—।’

ছোটকা এবং ঝালা-পালা তিনজনেই স্পষ্ট দেখতে পেল ব্যাপারটা।

প্রমাণ মাপের একটা জিন্সের প্যান্ট কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে ছোট সাইডব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল মেয়েটি। এবং ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্যান্টটা অনায়াসেই ঢুকে

গেল ব্যাগের ভেতরে।

বড়সড়ো ব্যাগ বা ঝোলা নিয়ে দোকানে ঢোকা নিষেধ। তাই দরজার কাছেই রয়েছে ব্যাগ জমা দেওয়ার কাউন্টার। কিন্তু পার্স বা ছোট সাইডব্যাগ জমা রাখার কোনও দরকার নেই। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে সবাই ঢুকতে পারে দোকানের ভেতরে—যেমন এই মেয়েটি ঢুকেছে।

পার্স বা ছোট সাইডব্যাগে জামাকাপড় লুকিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সে-কথা মাথায় রেখেই দোকানের নিরাপত্তাকর্মীরা মেয়েটিকে ওই ছোট ব্যাগসমেত দোকানে ঢুকতে দিয়েছে। কিন্তু ছোটকারা চোখের সামনে যে-ঘটনা দেখল তা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

ছোটকা কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝামেলা বলে উঠল, 'এইরূপ জামাকাপড় প্রচুর লইয়াছে এবং ওই ব্যাগের ভেতরেই সব ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে—।'

ঝালা-পালা প্রায় একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে বলল, 'ছোটকা, ঝামেলার সার্কিটে মনে হয় বেশ বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। তাই ও উলটোপালটা দেখছে আর ভুলভাল বকছে। ওইটুকু ব্যাগে কখনও এত জামাকাপড় ঢোকে!'

ঝামেলা রেগে গিয়ে বলল, 'তোমরা কী করে বুঝিবে! বানর থেকে মানুষ হওয়ার পর সেই কোন আদিমকালে পড়ে রয়েছ! যদি আমাদের মতো রোবট হতে তা হলে বুঝিতে!'

ঝামেলার বিশ্বাস, মানুষ থেকে বহু বিবর্তনের পর এসেছে রোবট। তাই ও মাঝে-মাঝেই ঝালা-পালাকে আদিমযুগের মানুষ বলে খোঁটা দেয়।

হঠাৎই ছোটকা ঠোঁটে আঙুল তুলে ওদের চুপ করতে ইশারা করল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'ওই দ্যাখ মেয়েটা আবার চুরি করছে!'

তারপর ওদের চোখের সামনেই রীতিমতো অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগল।

মেয়েটি বেশ কয়েকটি জামাকাপড় সেল্সম্যান-সেল্সগার্লদের চোখ এড়িয়ে পটাপট ঢুকিয়ে ফেলল ওর ব্যাগে।

ছোটকা আপনমনেই বলল, 'মেয়েটা ক্লেপ্টোম্যানিয়াক নয় তো?'

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ক্লেপ্টোম্যানিয়াক মানে?'

ইন্দ্রকান্তও বলে উঠল, 'সেটা আবার কী?'

ছোটকা বলল, 'ক্লেপ্টোম্যানিয়া মানে হল চুরি করার অসুখ। মেয়েটার সেরকম কোনও অসুখ নেই তো!'

ঝামেলা বলল, 'ব্যাপার বড়ই বিপত্তারিণী।'

ঝালা-পালা ভুরু কুঁচকে ঝামেলার দিকে তাকাতেই ছোটকা বলল, 'ও বোধহয় বলতে চাইছে, ব্যাপার বড়ই বিপজ্জনক।'

আরও দু-এক মিনিট মেয়েটিকে লক্ষ করার পর ছোটকা বলল, 'দাঁড়া, আমি ওর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি। তোরা এখানেই থাক, কোথাও যাস না কিন্তু—।'

ছোটকা ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে চাকরি করে। সুতরাং গোয়েন্দাগিরির অভ্যেস তো ওর আছেই, সেইসঙ্গে নানা অস্ত্রশস্ত্রও নাড়াচাড়া করতে পারে। ওরা দেখল, ছোটকা দিব্যি ভালোমানুষ-ভালোমানুষ মুখ করে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে মেয়েটির ঠিক পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটির ব্যাগের মুখটা খোলাই ছিল। উঁকি মেরে ব্যাগের ভেতরে তাকিয়ে ছোটকার তো চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগের ভেতরটা শূন্য! কোনও জামাকাপড়ই সেখানে নেই!

তা হলে এতক্ষণ ধরে মেয়েটি যে জামাকাপড়গুলো ব্যাগের মধ্যে ঢোকাল সেগুলো গেল কোথায়!

ছোটকা আর থাকতে পারল না। পকেট থেকে অফিসের আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে শক্ত গলায় মেয়েটিকে বলল, 'তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ। আমতা-আমতা করে ও বলল, 'আমি...আমি...মানে...।'

ছোটকা ওর কথায় কান না দিয়ে একজন সেল্সম্যানকে ডেকে জিগ্যেস করল দোকানের মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না।

উত্তরে সেল্সম্যানটি আঙুল তুলে ক্যাশিয়ারদের কাচের ঘরটা দেখিয়ে বলল, 'আমাদের মালিক মিস্টার আস্থানা ওই ঘরে আছেন—।'

ছোটকা তখন মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

মেয়েটি হোঁচট খেয়ে কোনওরকমে জবাব দিল, 'আমার দু-বন্ধু। ওরা এসব কিছু জানে না। ওরা ওইদিকটায় জিন্সের শার্ট দেখছে। প্লিজ, ওদের কিছু বলবেন না।'

ছোটকা দু-চার সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমি ওই কাচের ঘরটায় যাচ্ছি। তুমি বন্ধুদের যা-হোক কিছু একটা বলে ওখানে চলে এসো। ভুলেও পালানোর চেষ্টা কোরো না। আর এই সাইডব্যাগটা আমাকে দিয়ে যাও—।'

মেয়েটি শুকনো মুখে ছোটকার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করল। বন্ধুদের খবর দিয়ে একমিনিটের মধ্যেই ও চলে এল কাচের ঘরের সামনে।

ছোটকা মিস্টার আস্থানার সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ওকে ভেতরে আসতে বলল।

অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ছোটকার কথাবার্তা ঝামেলা সবই শুনতে পাচ্ছিল। আর সেগুলো ও মিহি চাপা গলায় রিলে করে শোনাচ্ছিল যমজ দু-ভাইকে। মেয়েটি কাচের ঘরের

ভেতরে ঢুকে পড়তেই ঝামেলা বলে উঠল, 'এবার গ্লাসঘরের নিকটে চলো। নহিলে কিচ্ছু শুনতে পাইব না। আমার ভেরি কিউরিয়োসিটি হইতেছে, তৎসহ উত্তেজনা। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'

ঝামেলার কপালের রঙিন বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে নিভতে লাগল। অনেক সময় আনন্দে বা উত্তেজনায় ঝামেলা 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা'! বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর আনন্দ বা উত্তেজনার সঙ্গে জাপানের এই আগ্নেয়গিরিটির যে ঠিক কী ধরনের সম্পর্ক সেটা ঝালা-পালা বা ছোটকা এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি।

ওরা তিনজনে কাচের ঘরের খুব কাছটিতে এসে দাঁড়াল। ঝালা-পালা সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। আর ওদের শোনার সমস্যার সমাধান করে দিল আলট্রাসনিক কানের মালিক ঝামেলা।

দোকানের মালিক মিস্টার আস্থানা মোটাসোটা প্রৌঢ় মানুষ। মাথায় টাক। ঘাড়ের কাছে কয়েক গোছা সাদা চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলল ছোটকা।

ব্যাপার-স্যাপার শুনে ভদ্রলোক খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ছোটকা ব্যাগটা খুলে আগেই দেখেছিল, এখন মিস্টার আস্থানাকে দেখাল।

ব্যাগের ভেতরটা কালো, অন্ধকার—জামাকাপড়ের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই!

ছোটকা ব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকাল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ছোটকার হাত ব্যাগের কোনও তল খুঁজে পেল না!

ব্যাগের মুখটায় নিকেল করা ধাতুর পটি লাগানো ছিল। সেটার উষ্ণতা স্বাভাবিক মনে হলেও ছোটকা টের পেল যে, ব্যাগের ভেতরটা ভীষণ ঠান্ডা। ঠিক যেন দার্জিলিং।

মিস্টার আস্থানা হতভম্ব হয়ে ছোটকাকে দেখছিলেন। আর মেয়েটিও মুখ কাঁদো-কাঁদো করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছিল।

মিস্টার আস্থানার টেবিল থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিল ছোটকা। সেটা টুপ করে ফেলে দিল ব্যাগের ভেতরে। পেনটা যথারীতি অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাগের ভেতরে হাতড়ে ওটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ বাইরে থেকে ব্যাগটার গভীরতা সাত-আট ইঞ্চির বেশি মনে হয় না।

ছোটকা একজন ক্যাশিয়ারের টেবিল থেকে একটা মেটাল স্কেল তুলে নিল। স্কেলটার দৈর্ঘ্য একফুট। অথচ সেটা খাড়াভাবে ব্যাগে ঢোকাতেই স্কেলটা বিনা বাধায় তলিয়ে গেল ব্যাগের অতলে।

মিস্টার আস্থানা অবাক হয়ে ছোটকাকে জিগ্যেস করলেন, 'এ তো ভারী পিকিউলিয়ার মিস্টিরিয়াস ব্যাপার! আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন?'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। ব্যাগটার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ও গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। কিছুক্ষণ পর বারকয়েক মাথা নেড়ে ছোটকা জবাব দিল, 'একটু একটু আঁচ করতে

পারছি।'

তারপর ছোটকা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?'

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে উত্তর দিল, 'আমার নাম রূপালি—রূপালি চ্যাটার্জি। সল্টলেকে বিডি মার্কেটের কাছে থাকি।'

'এই ব্যাগটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'সল্টলেকে বাস স্টপেজের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

রূপালির কথা থেকে জানা গেল, ব্যাগটা যখন ও কুড়িয়ে পায় তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। তাই ও ব্যাগটা নিয়ে বাসে উঠে পড়ে। কাঁকুড়গাছির কাছে ওর বন্ধু রীতার বাড়ি। সেখানে ওদের আর-এক বন্ধু রঙ্গনার আসার কথা। তারপর তিন বন্ধুতে মিলে ধর্মতলায় পুজোর ড্রেস কিনতে রওনা হবে এইরকমই ঠিক করা ছিল।

বাস থেকে নেমে রীতার বাড়ি যাওয়ার সময় ও কী ভেবে ওর ছোট্ট পার্স আর রুমালটা এই ব্যাগটায় রাখে। কিন্তু তারপরই দ্যাখে যে ওগুলোর আর কোনও হদিস নেই। তখন ও অবাক হয়ে ঢিল-পাটকেল, গাছের পাতা, চায়ের ভাঁড়, অনেক কিছুই ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং দ্যাখে যে, সেগুলোও বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমটায় ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই ওর মনে হয়, ব্যাপারটা খুব মজার। তাই রীতা আর রঙ্গনাকে ও কিছুই জানায়নি। শুধু বলেছে, বাস থেকে নামার পর ওর পার্সটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তারপর এই দোকানে ঢুকে ও স্রেফ মজা করার জন্যই বেশ কিছু জামাকাপড় ব্যাগটায় ঢুকিয়ে অদৃশ্য করে দেয়। কিন্তু ওগুলো যে কোথায় গেছে ও তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

কথা শেষ করে রূপালি কেঁদে ফেলল। ছোটকাকে বারবার করে অনুরোধ করল ওর বাড়িতে যেন কিছু না জানানো হয়।

ছোটকা মালিকের কাছ থেকে একটা প্যাডের কাগজ নিয়ে খসখস করে একটা রিপোর্ট লিখে সই করে দিল। তারপর তিন জায়গায় ফোন করে মিনিটকয়েক ধরে কথাবার্তা বলল।

কথাবার্তা শেষ হলে ছোটকা রূপালিকে বলল, 'তোমার আর কোনও চিন্তা নেই—তুমি যাও। শুধু জেনে রেখো, আজ তুমি সাংঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। কারণ এই ব্যাগটা আসলে ব্যাগ নয়...একটা টানেল।'

রূপালি কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছতে-মুছতে বন্ধুদের খোঁজে চলে গেল।

মিস্টার আস্থানার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ব্যাগটা নিয়ে ছোটকাও বেরিয়ে এল কাচের ঘর থেকে।

ছোটকা বেরিয়ে আসতেই ঝামেলা জিগ্যেস করল, 'কী হল, সল্ভ হইল?'

ছোটকা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, হইল।' তারপর ঝালা-পালাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এখন চটপট তোদের প্যান্ট-জামা পছন্দ কর তো।'

চন্দ্রকান্ত আবদারের সুরে বলল, 'ব্যাগটার মিস্ট্রিটা আমাদের খুলে বলো, ছোটকা।'

'আগে কেনাকাটা সেরে নে, তারপর যেতে-যেতে বলছি।'

কেনাকাটা সেরে রাস্তায় বেরোনোর সময় একটা লম্বা রোবট ঝামেলাকে লক্ষ করে মন্তব্য করল, 'ন্যাড়া খোকা।'

সেটা শুনে ঝামেলা তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে উঠে তেড়ে গেল লম্বা রোবটটার দিকে। বলল, 'টুডে তোর ওয়ান ডে কি আমার ওয়ান ডে!'

ঝালা-পালা কোনওরকমে ঝামেলাকে টেনে ধরে সামাল দিল।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ও কী বলল একটু ঝুঝিয়ে দে তো!'

চন্দ্র বলল, 'ঝামেলা বলল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।'

ইন্দ্র বলল, 'ওসব বাদ দাও। তুমি আগে ব্যাগের মিস্ট্রিটা বলো দেখি।'

ছোটকা বলল, 'শোন তা হলে বলছি। ব্যাপারটা বিজ্ঞানের খুব জটপাকানো ব্যাপার, তোরা সহজে বুঝবি না—তবুও সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করছি—।

'আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি সেটা হল ত্রিমাত্রিক দুনিয়া বা থ্রি ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ড। সেইজন্যেই আমাদের তিনটে মাপ আছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। এইবার কল্পনা কর যে, একটা দ্বিমাত্রিক দুনিয়া, মানে টু ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ড আছে। সেখানকার প্রাণীদের শুধু দুটো মাপ থাকবে—দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ। অর্থাৎ, প্রাণীগুলো হবে চিঁড়েচ্যাপটা চেহারার, আর ওরা দ্বিমাত্রিক কোনও সমতলে লেপটে চলাফেরা করবে। শুধু কি তাই! ওদের দেখার কাজটাও হবে ওই দ্বিমাত্রিক সমতল বরাবর। ফলে ওদের জগতে—মানে, ওই সমতলে—যদি একটা ফুটো করে দেওয়া যায় তা হলে ওরা সেটাকে একটা অন্ধকার গর্ত হিসেবে দেখবে। কারণ, ওদের দেখার অভ্যেসটা সমতল বরাবর—তাই ওরা ফুটো দিয়ে কিছু দেখতে পাবে না। আর দেখতে না পাওয়া মানেই অন্ধকার। একটা কাগজের পৃষ্ঠা নিয়ে তাতে একটা ফুটো করে ব্যাপারটা ভাবলে অনেক সহজে বোঝা যাবে।'

'তা হলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? ওই ফুটোটা হল দ্বিমাত্রিক জগৎ আর ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে যাতায়াতের একটা পথ—মানে, টানেল। দ্বিমাত্রিক জগৎ থেকে যা কিছু ওই ফুটো দিয়ে ঢুকবে তা সরাসরি চলে যাবে ত্রিমাত্রিক দুনিয়ায়। ফলে দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণীরা দেখবে জিনিসগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কাগজের পৃষ্ঠায় একটা ব্যাগের ছবি এঁকে তার মধ্যে একটা ফুটো করে নিলে ব্যাপারটা আরও সহজে বোঝা যাবে। দ্বিমাত্রিক প্রাণীরা ভাববে ব্যাগটার কোনও শেষ নেই। ঠিক

আমার হাতের ব্যাগটার মতো।' কথাটা বলে রূপালির কাছ থেকে নেওয়া ব্যাগটা ছোটকা ওদের দেখাল। তারপর বলল, 'এইবার ত্রিমাত্রিক আর চতুর্মাত্রিক দুনিয়ার মধ্যে ঠিক একইরকম জিনিস কল্পনা করে দ্যাখ। রূপালির ব্যাগটার

মধ্যে কেউ হয়তো এমন একটা ফুটো করে দিয়েছে যাতে ব্যাগের মুখটা ত্রিমাত্রিক আর চতুর্মাত্রিক দুনিয়ার মধ্যে একটা টানেল তৈরি করে ফেলেছে। ওই ফুটো দিয়ে যা কিছু ঢোকানো হচ্ছে তা সরাসরি চলে যাচ্ছে ফোর ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ডে।'

'কিন্তু ফুটোটা তৈরি হল কীভাবে?' চন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

হাতের ব্যাগটার দিকে একবার তাকিয়ে চিন্তিত মুখে ছোটকা বলল, 'সেটাই তো তখন থেকে ভাবছি। দেখি, অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা জানাই। তারপর আমাদের রিলেটিভিটি ল্যাবরেটরিতে ব্যাগটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে।'

ঝামেলা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'সবই সম্পূর্ণরূপে বুঝিলাম। তবে কিছু সামথিং ঝাপসা রয়ে গেল।'

ঝালা-পালা হেসে জবাব দিল, 'তোমার কাছে ঝাপসা থাকাই ভালো। তুমি বেশি বুঝে গেলে আর এক বিপদ হবে। এখন চুপচাপ বাড়ি চলো, নইলে তোমাকে ওই টানেলে ঢুকিয়ে ফোর ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ডে পাচার করে দেব।'

ঝামেলা মাথা নেড়ে বলল, 'সে যা-ই বলো, আজ আমার জন্যেই তস্করং ধৃতং হস্তনস্ত।'

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'শেষের কথাগুলোর মানে?'

ঝামেলা বলল, 'ওগুলো হল মডার্ন সংস্কৃত—তোমরা বুঝবে না। সেই কোন আদিম যুগে পড়ে আছ! তস্করং ধৃতং মানে চোর ধরা পড়ল।'

'আর হস্তনস্ত মানে?' ইন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।

ছোটকা হেসে জবাব দিল, 'হস্তনস্ত মানে বোধহয় হাতেনাতে। কী রে, ঝামেলা, ঠিক বলিনি?'

ঝামেলা মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' সেই সঙ্গে ওর কপালের লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল।



ঝামেলা ও লম্ফমান ফুটবল

খেলতে-খেলতেই ঘটে গিয়েছিল আশ্চর্য ব্যাপারটা।

কলকাতা শহরে তখন চাঁদি-ফাটা ঝাঁ-ঝাঁ গরম। মাঠে-মাঠে ফুটবল, আর ঘরে-ঘরে টিভি-তে ক্রিকেট। খেলা নিয়ে তুমুল হইচই নানা জায়গায়, সকলের মুখে শুধু খেলার কথা। এমনকী বাচ্চা রোবট ঝামেলাও খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

একদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে বসে ভারত-পাকিস্তানের একটা ওয়ান-ডে ম্যাচ দেখছিল যমজ দু-ভাই চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত—যাদের ডাকনাম ঝালা-পালা। ওদের সবসময়ের সাথি তিনফুট হাইটের পিকিউলিয়ার রোবট ঝামেলা দু-ভাইয়ের গা ঘেঁষে বসে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। শচীন তখন একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলছিল। কোনও বলকে তোয়াক্কা না করে শুধু চৌকো আর ছক্কা লাগাচ্ছিল। ঝালা-পালা বারবার খুশিতে চিৎকার করে উঠে হাততালি দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই ঝামেলা ওর মিহি গলায় মন্তব্য করল, ‘এই সাহসী ছেলেটা তোমাদিগের তুলনায় যারপরনাই উন্নত প্রাণী। বিবর্তনের পথে তিরবেগে ছুটে অস্বাভাবিক অগ্রসর হইয়াছে। আর কিঞ্চিৎ সুযোগ পেলে আমার ন্যায় সুপারম্যানকেও হয়তো বা স্পর্শ করিয়া ফেলিবে।’

ঝামেলার এই এক দোষ। যখন-তখন জ্ঞান দিতে শুরু করে। ওর ধারণা, বানর থেকে এসেছে মানুষ—আর মানুষ থেকে বিবর্তন হয়ে এসেছে রোবট। তাই ও নিজে হল সুপারম্যান। সেইজন্যই ও মাঝে-মাঝে ঝালা-পালাকে শুনিয়ে দেয়, ‘কোন আদ্যিকালে তোমরা পড়ে আছ ভাবিলে বড় সরো হয়। সরো মানে যে দুঃখ সেই তথ্যটি অবগত আছে তো!’

ঝামেলার ভাষা ভারী অদ্ভুত। কথ্য ভাষা, সাধু ভাষা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত মিশিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ভুলভাল যা খুশি বলে যায়। আবার উচ্চারণ কঠিন হলে আটকেও যায়।

ঝামেলার জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য শুনে ইন্দ্রকান্ত বলল, ‘অতই যখন নিজেকে বড় ভাবো, তা হলে শচীনের বদলে ইন্ডিয়া টিমে ঢুকে পড়লেই পারো!’

ঝামেলা এ-কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমি ব্যাট ধরিলে ক্রিকেট হিস্টিরিয়া নূতন করিয়া লিখতে হবে।'

'ও বোধহয় হিস্ট্রি বলতে চাইছে।' ইন্দ্রকান্ত বলল।

ঝামেলা রিনরিনে গলায় হেসে উঠল, তারপর চন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদিগকে লইয়া যে কী করি! এই সহজ ওয়ার্ডটিরও মানে জানো না!'

ইন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঝামেলা স্ট্যাচু!'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলা যেন পাথরের স্ট্যাচু হয়ে গেল।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল, 'এ চিজকে ট্রেনিং দেওয়া কি সহজ কথা!'

ঝামেলাকে জটিল প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করেছে ঝালা-পালার ছোটকা প্রসেনজিৎ চৌধুরী। ইলেকট্রনিক্সবিদ্যায় ছোটকার জুড়ি নেই। ছোটকা চাকরি করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। নানান কাজে ওকে সবসময়েই দেশে-বিদেশে উড়ে বেড়াতে হয়। এখন, কিছুদিন হল, কলকাতার অফিসে আছে।

ঝালা-পালা ছোটবেলায় ভীষণ কান্নাকাটি চেঁচামেচি করত, সকলের কান একেবারে ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা আদর করে ওদের নাম দিয়েছে ঝালা-পালা। আর উপহার দিয়েছে এই বাচ্চা রোবট ঝামেলা। ছোটকা বলেছে, 'তোরা রোবটটাকে ভালো করে ট্রেনিং দে।' কিন্তু ট্রেনিং ওরা দেবে কী, উলটে ঝামেলার কাছেই ওদের ট্রেনিং নেওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েকদিনেই ঝামেলা কী করে যেন খেলা-পাগল হয়ে উঠেছে। ঝালা-পালা যখন বিকেলে মাঠে খেলতে বেরোয় তখন ঝামেলা বরাবরই হেলেদুলে ওদের সঙ্গ নেয়। কিন্তু কোনওদিনও 'খেলব' বলে বায়না ধরেনি। আজ বিকেলে দু-ভাই যখন কেডস জুতো পরে ফুটবল খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখনই ঝামেলার আবদার শুরু হল।

'আমিও ফুটবল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করব। ছোটকাকে বলে আজকেই আমাকে তোমাদিগের ন্যায় কম্বলের জুতা কিনিয়া দাও।'

ঝামেলার ভাষায় 'আজকে' মানে 'এখনই'। আর কম্বলের জুতো মানে যে কেডস জুতো সেটা ঝালা-পালা স্পষ্ট বুঝতে পারল। ওরা ঝামেলাকে অনেক করে বোঝাল যে, ফুটবলের মতো বাজে খেলা আর হয় না। ফুটবল খেলায় বিপদের অনেক ঝুঁকি। যে-কোনও সময় হাত-পা ভাঙতে পারে।

এতসব ভয়ঙ্কর কথা শোনার পরেও ঝামেলার সেই এক গোঁঃ 'পেলে যদি নির্ভয়ে খেলিস্যান্তি তা হলে আমিও পারন্তি।' অর্থাৎ, 'পেলে যখন নির্ভয়ে খেলতে পেরেছে তখন আমিও পারব।'

'ঠিক আছে, ছোটকা অফিস থেকে বাড়ি ফিরুক, তখন একটা ব্যবস্থা করব।' ইন্দ্রকান্ত ঝামেলার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল।

চন্দ্রকান্ত ওকে ক্যাডবেরি খাওয়াবে বলে আশ্বাস দিল।

অনেক 'বাবা-বাছা' করার পর ওরা ঝামেলাকে রাজি করিয়ে রাস্তায় বেরোল। ওদের সঙ্গে হেলেদুলে যেতে যেতে ঝামেলা বারবারই জিগ্যেস করতে লাগল, 'ছোটকাবাবু কব আয়েগা? তাঁহাকে অফিসে টেলিফোন করিয়া দাও।'

যখন ওরা ফুটবল খেলার মাঠের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে তখন ঝামেলা হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে উঠল। ওর কপালের লাল-নীল-হলুদ বাতিগুলো জ্বলতে নিভতে শুরু করল। ও হাততালি দেওয়ার চেষ্টা করে মিহি গলায় উল্লাসের সুরে বলতে লাগল, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা! ব্রায়ান লারা একটি ফোর আঘাত করিয়াছে!'

ঝালা-পালা বুঝতে পারল লারা এইমাত্র একটা বাউন্ডারি মেরেছেন। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান-ডে খেলা। টিভিতে তারই লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। আশেপাশের কোনও বাড়ির টিভির ধারাবিবরণী নিশ্চয়ই ঝামেলার কানে এসে পৌঁছেছে। ওর কান এমনভাবে তৈরি যে, বহুদূরের শব্দ ও স্পষ্ট শুনতে পায়, আর আলট্রাসনিক শব্দও ওর কান এড়িয়ে যেতে পারে না। এ ছাড়া ওর চোখ দুটো পুঞ্জাক্ষি—দেখে মনে হয় কাচের তৈরি টেনিসবল—ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। অনেক জটিল লেন্স জুড়ে তৈরি এই চোখ দিয়ে ও প্রায় একমাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

ঝামেলার এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে দু-ভাই হিংসে করে। একদিন ইন্দ্রকান্ত ছোটকাকে বলেছিল ওদের কান আর চোখ ঝামেলার মতো পাওয়ার ফুল করে দিতে। তাতে ছোটকা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, বলেছিল, 'তা কখনও হয়! তোরা হলি মানুষ, আর ঝামেলা হল মেশিন। তা ছাড়া তোদের ওইরকম কান আর চোখ করে দিলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে।'

মাঠে পৌঁছে ঝালা-পালা দেখল খেলা শুরু হয়ে গেছে। ওদের বন্ধুর দল একটা ফুলবল নিয়ে দিব্যি পেটাপিটি করছে আর নিজেদের মধ্যে হইচই চিৎকার করছে।

মাঠের একপাশে সুন্দর ফুলের গাছ। তার গা ঘেঁষে সরু পিচের রাস্তা। অনেকে সেখানে পায়চারি করছে। কেউ-কেউ বসে আছে ঘাসের ওপরে। বেশ কয়েকজন তাদের পোষা রোবট সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে বলল, 'তুমি অন্য রোবটদের সঙ্গে খেলা করো। দেখো, আবার যেন কোনও ঝামেলা পাকিয়ো না।'

ঝামেলা তৎক্ষণাৎ হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করল। সামনেই একটা লম্বা রোবট ঝুঁকে পড়ে ফুলের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঝামেলা অবাক হয়ে তার মাথার

দিকে তাকিয়ে রইল। কী লম্বা রোবটরে বাবা! মনে-মনে ভাবল ঝামেলা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঝামেলা লম্বা রোবটটাকে প্রশ্ন করল, 'তুই এত লং কেন রে?'

রোবটটা তার ধাতব ঠোঁট চওড়া করে বোধহয় হাসতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'আমার বাড়ি শিলং, তাই—। কিন্তু তুই এরকম ন্যাড়া কেন?'

ঝামেলাকে কেউ ন্যাড়া বললে ও ভীষণ চটে যায়। ও খেপে গিয়ে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই ফুটবল খেলার মাঠের দিক থেকে একটা প্রচণ্ড হইহই শোনা গেল।

ঝামেলার সব ব্যাপারেই কৌতূহল বড় বেশি। সুতরাং ঝগড়া মুলতুবি রেখে ও হেলেদুলে রওনা হল ঝালা-পালার দলবলের দিকে।

মাঠে তখন একটা বিচিত্র কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝালা-পালাদের ফুটবলটা মাঠে একনাগাড়ে ড্রপ খেয়ে চলেছে।

ফুটবল যে শূন্যে উঠলে আবার মাটিতে পড়বে, ড্রপ খেয়ে আবার শূন্যে লাফিয়ে উঠবে, এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই। আর এটাই স্বাভাবিক যে, ফুটবলটার লাফ ক্রমশ কমে আসবে এবং একসময় তার লাফালাফি একেবারে থেমে যাবে।

কিন্তু ঝালা-পালাদের ফুটবলটার বেলায় সেরকম কিছু হচ্ছে না। ফুটবলটা ঠিক যতটা উঁচু থেকে নীচে এসে পড়ছে, ড্রপ খেয়ে আবার ঠিক ততটাই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

ঝামেলা অবাক হয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগল।

লাফানো বলটাকে ঘিরে তখন ভিড় জমে গেছে। খেলতে আসা ছেলের দল তো বটেই, এ ছাড়া রয়েছে নানানবয়েসি লোকজন—সবাই একজোট হয়ে হাঁ করে বলটার কীর্তিকলাপ দেখছে। কয়েকটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে কীসব বলাবলি করছে। বোধহয় বলটাকে নিয়েই আলোচনা করছে।

চারপাশের চিৎকার, গুঞ্জন, হাসাহাসি মিলেমিশে এক জটপাকানো কোলাহল তৈরি হয়েছে বলটাকে ঘিরে।

ওই ডামাডোলের মধ্যে চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত কী করে যে ঝামেলাকে খুঁজে বের করল কে জানে! ওদের ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েই ঝামেলা দ্যাখে দু-ভাই ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে।

ওদের কাছেই পুরো ব্যাপারটা শুনল ঝামেলা।

দিব্যি নাকি ফুটবল খেলা চলছিল। হঠাৎই ওদের এক বন্ধু বুবু জোরে একটা স্কাই শট মারে। তাতে বলটা প্রায় তিনতলার সমান শূন্যে উঠে যায়। বলটা মাটিতে নেমে আসার সময় ওদের আর একজন বন্ধু অপু ছুটে যায় বলটাকে শট মারতে। কিন্তু কীভাবে যেন ওর শট ফসকে যায়। তখন সবাই অবাক হয়ে দ্যাখে যে, বলটা আবার তিনতলার সমান উঁচুতে উঠে গেছে। এই ব্যাপার

দেখে সবাই বেশ ভয় পেয়ে যায়। কে একজন বলে যে, বছর পনেরো আগে একজন ফুটবল খেলোয়াড় মাঠের ধারের একটা বকুলগাছে গলায় দড়ি দিয়েছিল। এ নাকি তারই প্রেতাত্মার কারসাজি। এ-কথা শুনে সবাই সরে যায়, আর বলটা আপনমনে তিনতলার সমান লাফাতে থাকে। এখন কী করা হবে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

সব কথা শোনার পর বুকে হাত ঠুকে ঝামেলা বলল, 'একটি লম্ফমান ফুটবলকে ভয় পাওয়ার যে কী কারণ থাকিতে পারে তাহা কিছু বুঝতে পারছি না। রবিঠাকুর বলে গেছেন, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা। তোমরা কি তাহা জানো না?'

ইন্দ্রকান্ত ঝামেলার 'রণং দেহি' ভাবসাব দেখে বলল, 'তুমি কি জানো, কে যেন বলে গেছেন, হাতি-ঘোড়া গেল তল/মশা বলে কত জল?'

'আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া কোনও প্রফিট হইবে না।' ঝামেলা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল এবং হাঁটা দিল লম্ফমান ফুটবলের দিকে।

হাঁটতে-হাঁটতেই পিছন ফিরে ও চন্দ্র-ইন্দ্রকে বলল, 'দেশের কাজে যাচ্ছি। দয়া করে যেন "ঝামেলা, স্ট্যাচু" বলে আমাকে বাধা দিয়ো না। তোমাদিগকে ভরসা করা বড়ই কঠিন।'

এই কথা বলে এঁচোড়ে পাকা রোবট রওনা দিল বলের দিকে, আর ঝালা-পালা ওকে অনুসরণ করল। এই অদ্ভুত বিপদে কী করবে ওরা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময় ছোটকা থাকলে খুব ভালো হতো! ওরা মনে-মনে ভাবল।

ভিড় ঠেলে চক্রব্যূহের ভেতরে ঢোকার সময় লোকজনের নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল।

'মনে হচ্ছে কোনও ফুটবল প্লেয়ারের প্রেতাত্মা ফুটবলটার ওপরে ভর করেছে।'

'বলটার ভেতরে কোনও স্প্রিং ফিট করা নেই তো!'

'বলটার ভেতরে মনে হয় কোনও বাচ্চা ক্যাঙারু ঢুকে পড়েছে।'

ওরা তিনজনে মাঝের গোল ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। ঝামেলা লক্ষ করল, নানান মানুষজনের ভিড়ে বেশ কয়েকটা রোবটও দাঁড়িয়ে আছে। তারাও হাঁ করে লাফানো বলের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

হঠাৎই ষোলো-সতেরো বছরের একটা মোটাসোটা ছেলে ছুটে গেল বলটার দিকে। বলটা তখন নীচে নেমে আসছিল। বলটা ড্রপ খাওয়ামাত্রই ছেলেটা একটা চিৎকার করে বলটাকে জাপটে ধরল।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল।

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েই বলটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। আগের মতোই তিনতলার সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেল অনায়াসে।

মাঠের কৌতূহলী দর্শকরা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার ছাপিয়ে কে যেন ডেকে বলল, 'পল্টু, ভয় পাস না। বলটাকে চেপে ধরে রাখ।'

পল্টু আকাশ থেকে এই পরামর্শ শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। তবে স্পষ্ট দেখা গেল, ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। আর ও প্রাণপণে বলটাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

এইবার বলটার নেমে আসার পালা।

পল্টুসমেত বলটা নেমে আসতে লাগল।

অত উঁচু থেকে মাটিতে এসে পড়লে পল্টু যে আর আস্ত থাকবে না সেটা সকলেই বুঝতে পারল। এমনকী ঝামেলাও। তাই বাচ্চা রোবটটা কখন যেন এগিয়ে গেছে লাফিয়ে ওঠা বলটার ঠিক নীচে। তারপর বল এবং পল্টু যখন নেমে এল তখন পঞ্চাশ কেজি ওজনের ঝামেলা ওর ইস্পাতের লিকলিকে হাত পেতে ক্যাচ লোফার মতো লুফে নিল পল্টুকে।

চারপাশ থেকে এমন চিৎকারের রোল উঠল যেন শচীন তেন্ডুলকর শোয়েব আখতারের ছ'বলে ছ'টা ছক্কা হাঁকিয়েছে।

ঝামেলা পল্টুকে বাঁচাল বটে কিন্তু বলটাকে ধরে রাখতে পারল না। বল ওর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে আবার উঠে গেছে শূন্যে।

ছ'-সাতজন ছেলে ছুটে গেল পল্টুর কাছে। ও তখন মাটিতে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে—বোধহয় এত ভয় আর টেনশনে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ঝামেলা শূন্যে লাফানো বলটাকে কয়েকপলক দেখল। তারপর হেলেদুলে ফিরে এল ঝালা-পালার কাছে। ন্যাড়ামাথা এপাশ-ওপাশ নেড়ে মিহি গলায় বলল, 'কেস একেবারে নটবর। কিচ্ছু করার নেই। ছোটকাবাবুকে দ্রুত অফিসে ফোন করিয়া দাও। আমি লম্ফমান বলের নিকটে হার মানিলাম।'

ঝালা-পালাও বুঝল গতিক সুবিধের নয়। তাই ওরা ঝামেলাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ছুটল ছোটকাকে ফোন করতে।

একটা পেল্লায় মাপের জিপে চড়ে ছোটকা যখন 'অকুস্থলে' এসে হাজির হল তখন বিকেলের আলো মরে এসেছে। কিন্তু লম্ফমান ফুটবল তার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এতটুকুও ক্ষান্তি দেয়নি।

ছোটকার সঙ্গে নানান যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। কালো রোগা চেহারার ছোটখাটো মানুষ। ছোটকা তাকে 'বর্মন' বলে ডাকছিল।

চন্দ্র আর ইন্দ্র টেলিফোনেই গোটা ব্যাপারটা ছোটকাকে জানিয়েছিল। ছোটকা সব শুনে ওদের সাবধান করে দিয়ে বলেছে, 'তোরা সবাই চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থাক। বলটাকে মোটেই

ডিসটার্ব করবি না। আমি অফিস থেকে লোকজন আর যন্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা খুব পিকিউলিয়ার ফেনোমেনন।'

ছোটকাকে লটবহর নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে ভিড় করে থাকা লোকজন গলা ফাটিয়ে হইহই করে উঠল।

ঝামেলা 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে হেলেদুলে লাফাতে লাগল। ওর কপালের লাল-নীল-হলুদ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল। খুব খুশি হলে অথবা উত্তেজিত হলে ঝামেলা এইরকম করে। জাপানের আগ্নেয়গিরির সঙ্গে ওর উল্লাসের যে কী সম্পর্ক তা ও-ই জানে!

ছোটকার নানান সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চলতে লাগল। সকলে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছোটকার কার্যকলাপ খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল।

ছোটকা একটা যন্ত্র চোখে দিয়ে বলটাকে ভালো করে দেখল। সবুজ রঙের কী একটা রশ্মি ফেলল বলটার গায়ে। তারপর সেটাকে লক্ষ্য করে খুদে-খুদে এক ঝাঁক মিসাইলের মতো কী যেন ছুড়ে দিল।

কিন্তু কোনওটাতেই কোনও ফল হল না। বলটা একরোখাভাবে লাফাতেই লাগল।

ঝামেলা ভেবেছিল ছোটকা বলটাকে থামাতে পারবে। কিন্তু ছোটকাকে ব্যর্থ হতে দেখে সে 'ফোঁসফোঁস' করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসগুলি যথেষ্ট সুদীর্ঘ হইতেছে না।'

ধীরে-ধীরে সন্ধের ছায়া নেমে এল মাঠে।

ছোটকা বর্মনকে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে জিপে উঠতে বলল। তারপর জমায়েত মানুষজনকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনারা যে যার বাড়ি চলে যান। এ-লাফানি সহজে থামবে না। নিজে থেকেই যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, দেখবেন, নিজে থেকেই হঠাৎ থেমে যাবে।'

'তা বলে সারা রাত ধরে বলটা একা-একা অমন লাফাবে?' ইন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

'তাতে তোর কী!' ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ছোটকা।

ওরা যখন দল বেঁধে বেরিয়ে আসছিল তখন মাঠের চারপাশে নানা জায়গায় লাগানো ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

সেই মলিন আলোয় ফুটবলটা দিব্যি একমনে লাফিয়ে চলেছে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছোটকাকে ভীষণ আনমনা দেখাচ্ছিল। বোধহয় বল লাফানোর রহস্যের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ঝামেলা হঠাৎই ছোটকার দিকে মুখ তুলে বলল, 'বল উল্ল—উল্ল—উল্ল—।'

'উল্লম্ফন।' ছোটকা ওকে ধরিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, বল উল্লম্ফনের পশ্চাতে প্রেতাত্মার কোনওরূপ ইয়ে নাই তো?'

এ-প্রশ্নে ছোটকা হাসল না। বরং বেশ সিরিয়াস মুখে বলল, 'এইভাবে লাফানোর একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে...।'

'কী কারণ?' ঝালা-পালা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'কোথাও থেকে এনার্জি এসে ঢুকে পড়ছে বলটার ভেতরে। তোরা তো জানিস, একটা বল লাফাতে শুরু করলে ক্রমশ তার লাফের মাপ কমতে থাকে। এইভাবে লাফানোর উচ্চতা কমে যাওয়ার অনেক কারণ আছেঃ যেমন, ঘর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, বাতাসের বাধা। ফলে, শুরুতে যে-শক্তি নিয়ে বলটা লাফাতে শুরু করে, এইভাবে শক্তি খরচের জন্যে ক্রমেই তার লাফানোর শক্তি কমতে থাকে। যদি বাইরে থেকে কোনওভাবে ক্ষয়ে যাওয়া শক্তিটুকু সাপ্লাই করা যায়, তা হলে বলটার লাফের উচ্চতা আর একটুও বদলাবে না। শুধু ওটার কাইনেটিক এনার্জি পালটে যাবে পোটেনশিয়াল এনার্জিতে, আবার পোটেনশিয়াল এনার্জি পালটে যাবে কাইনেটিক এনার্জিতে। এইভাবে গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তির রূপবদল হয়। তবে লাফানোর সময় যে-কোনও পজিশনে বলটার গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তির যোগফল একই থাকে।'

'বলটাকে ক্ষয়ে যাওয়া এনার্জির জোগান দিচ্ছে কে?' চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।

ছোটকা খানিকটা আনমনাভাবে বলল, 'ফানেল দিয়ে যেমন তেল ঢালে, সেইরকমভাবে বলটার মধ্যেও কেউ এনার্জি ঢেলে দিচ্ছে। যেহেতু ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেহেতু মনে হচ্ছে, ফোর্থ ডায়মেনশনের কোনও একটা বিন্দু থেকে আমাদের থ্রি ডায়মেনশনের দুনিয়ায় একটা এনার্জি টানেল তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের মতো—ব্ল্যাক হোল আর হোয়াইট হোলকে যে-ব্রিজ জুড়ে দেয়। যাক গে, বাদ দে—ওসব বিজ্ঞানের কচকচি তোরা বুঝবি না। শুধু এটুকু বুঝে নে, সেই অদৃশ্য এনার্জি টানেলের একমাথায় আছে একটা উৎস, আর এই মাথায় রয়েছে এই ফুটবলটা। বলটা ফোর্থ ডায়মেনশন থেকে এনার্জি সাপ্লাই পেয়ে চলেছে। তবে টানেলের এ-প্রান্তে বলটা যে কী করে হঠাৎ জুড়ে গেল তা বলতে পারব না। যখন টানেলটা আবার বল থেকে সরে যাবে, তখন এনার্জি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—তা হলেই বলটা স্বাভাবিক নিয়ম মেনে থামবে। তার আগে নয়।'

'ওঃ ব্বাবা! একটা বল লাফানোর পেছনে এত কাণ্ড!' ইন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বলল।

ছোটকা গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'সত্যি-সত্যি এত কাণ্ড আছে কি না জানি না। আমি শুধু সায়েন্সের দিক থেকে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।'

ঠিক তখনই ঝামেলা মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এইমাত্র একটি চারের সাহায্যে ব্রায়ান লারার সেঞ্চুরি পূর্ণ হইল। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'



ঝামেলাকে নিয়ে ঝামেলা

মানতেই হবে এ-অন্যায়টা একটু অন্যরকমের। সাধারণ চুরি, ছিনতাই, কেপমারি বা রাহাজানি যেরকমটা হয়ে থাকে, ঠিক সেরকম নয়। বরং হাই-টেক যুগের সঙ্গে মানানসই এক হাই-টেক ক্রিমিনালের অভিনব কুকীর্তি।

কোটিপতি ব্যবসায়ী গণপতি শাসমল সকাল দশটা নাগাদ কাঁকুড়গাছির একটি 'এনিটাইম মানি ট্রান্সফার' বুথে ঢুকেছিলেন। এ.টি.এম.টি. বুথে ঢুকে কম্পিউটারের বোতাম টিপে কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্যান্য ব্যাঙ্কের নানান অ্যাকাউন্টে ইচ্ছেমতো টাকা ট্রান্সফার করতে পারেন—শুধু সেই অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলো জানলেই হল। কম্পিউটারাইজ্‌ড ব্যাঙ্কিং-এর যুগে এই সুবিধে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এয়ার-কন্ডিশন্ড বুথে ঢুকে গণপতি শাসমল মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন। মনিটরে নিজের অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স দেখছিলেন আর হাতে-ধরা একটি চিরকুটে লেখা হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন পাওনাদারের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করছিলেন।

হঠাৎই তাঁর ঠিক পিঠের কাছ থেকে কেউ স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'আমি একটা অ্যাকাউন্ট নম্বর বলছি। এক্ষুনি এই অ্যাকাউন্টে দু-লাখ টাকা ট্রান্সফার করুন। অ্যাকাউন্ট নম্বর ০১২০৪-০০৩৬৭৯৫। যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, তা হলে এটাই আপনার শেষ এ.টি.এম.টি. ভিজিট। কারণ...'

গণপতি শাসমল চমকে পিছনে ফিরে তাকিয়েছেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। শব্দটা খুব চাপা, অনেকটা রেস্তোরাঁর মিউজিক সিস্টেমের মতো। কিন্তু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা কথাগুলো নিশির ডাকের মতো কিউবিক্‌ল-এর ভেতরে অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'...কারণ, আমার কথামতো কাজ না করে আপনি এই বুথ থেকে বেরোনোমাত্রই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হবে। তাতে এই বুথ এবং আপনি—দুজনেই "নেই" হয়ে যাবেন। আমার কথা যদি

বিশ্বাস না হয় তা হলে বুথের দরজার লকের কাছটা ভালো করে দেখুন...।'

গণপতি শাসমল এসি বুথে দাঁড়িয়ে ঘামতে শুরু করলেন। তাঁর ভয়ার্ত চোখ তখনও খুঁজে চলেছে কথাগুলো কোথা থেকে আসছে। সত্যিই কি তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে দাড়িয়েছেন? এরপরই ফুলস্টপ!

'...লকের কাছটা ভালো করে দেখুন। দরজার পাল্লা আর ফ্রেমের মাঝে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের মোল্ড লাগানো আছে। আপনি বুথ থেকে বেরোনোর জন্যে যেই পাল্লাটা টেনে খুলবেন সঙ্গে-সঙ্গে ফিউজ উড়ে গিয়ে ফু স্ স্ স্...।'

শেষ শব্দটা বিস্ফোরণের শব্দের একটা মিনিয়েচার নকল বলা যেতে পারে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছার চেষ্টা করলেন গণপতি। একইসঙ্গে তাঁর চোখ গেল দরজার লকের দিকে। কী যেন লাগানো রয়েছে জোড়ের কাছটায়! গণপতির শিরদাঁড়া বেয়ে একটা লাউডগা সাপ হাঁটতে শুরু করল।

'অ্যাকাউন্ট নম্বরটা আবার বলছিঃ ০১২০৪-০০৩৬৭৯৫। এবার তাড়াতাড়ি টান্‌জ্যাকশন কমপ্লিট করুন। কুইক।'

গণপতি কি লোকটার কথা শুনবেন, নাকি বেঁচে থাকার তাগিদে আজীবন এই বুথের ভেতরেই বসে থাকবেন?

'পাঁচমিনিটের মধ্যে টান্‌জ্যাকশন কমপ্লিট করুন, নইলে বুথ উড়িয়ে দেব।'

গণপতি আর ভরসা পেলেন না। পটাপট কম্পিউটারের বোতাম টিপতে শুরু করলেন।

একটু পরে আবার সেই নেশা ধরানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'দু-লাখের কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তা হলে আমাকে আরও খারাপ কাজ করতে হবে। আর...কাউকে এই ঘটনার কথা বলবেন না। পুলিশকে তো নয়ই।'

দু-লাখ টাকা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার পর গণপতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ততক্ষণে কম্পিউটারের মনিটরে ব্যাঙ্কের হেড-অফিসের সুদৃশ্য বিল্ডিং-এর রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে লেখা: 'এ.টি.এম.টি. ব্যবহার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের গ্রাহকদের ব্যাঙ্কিং সুরক্ষায় আমরা সবসময় পাশে আছি।'

লেখায় ধন্যবাদের পর কথায় ধন্যবাদ পাওয়া গেল। অচেনা কণ্ঠস্বর আলতো করে বলল, 'ধন্যবাদ। এবার আপনি নিরাপদে বুথ থেকে বেরোতে পারেন। আমি এক্সপ্লোসিভের ফিউজটা ড়িঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি।'

বুথের ঠান্ডা থেকে রাস্তার গরমে বেরিয়ে গণপতি শাসমল দারুণ আরাম পেলেন। বুকভরে শ্বাস টেনে তিনি টের পেলেন যে, এতক্ষণ তাঁর ঠিকমতো শ্বাস নেওয়া হয়নি।

গণপতি শাসমল থেকে ঘটনার শুরু। তারপর, একমাসের মধ্যে, এরকম আরও তিনটি ঘটনা ঘটে গেল। একটি এসপ্লানেডে, একটি ভবানীপুরে, আর একটি সল্টলেকে। তিনটি ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক-গ্রাহকরা ভয় পেয়ে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়ে গেল শহরে। টিভি, ইন্টারনেট আর খবরের কাগজ ব্যাপারটা নিয়ে মস্ত শোরগোল শুরু করে দিল। পুলিশমহলে চলতে লাগল ঘন-ঘন মিটিং। একরাশ আতঙ্ক নিয়ে মানুষ এ.টি.এম.টি. বুথ ব্যবহার করতে লাগল। কারণ, পেপারলেস ব্যাঙ্কিং-এর যুগে এ.টি.এম.টি. ব্যবহার না করে উপায় নেই।

এদিকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা একজোট হয়ে বারবার আলোচনায় বসতে লাগলেন। আজ কলকাতা শহরে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছে—কাল যে মুম্বই, দিল্লি এবং অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়বে না তার গ্যারান্টি কী! শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবসা লাটে না ওঠে!

এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে সারা শহর যখন টগবগ করে ফুটছে তখন কীভাবে যেন পুলিশমহল আর ভারত সরকারের ওপরমহলের যোগাযোগে ঝালা-পালার ছোটকা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল।

দুই যমজ ভাই চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত তখন গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি। ছোটবেলায় ওরা দুজনে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত বলে ছোটকা ওদের নাম রেখেছে ‘ঝালা-পালা’। এ.টি.এম.টি. বুথের রহস্যটা হাতে আসতেই ছোটকা ওদের ডেকে বলল, ‘ঝালা-পালা, শোন। এ.টি.এম.টি. থেকে অদ্ভুত কায়দায় ডাকাতির ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। কিন্তু তোরা তো আজ রাতেই ট্রেন ধরবি। ভীষণ মিস করবি...কিন্তু কিছু তো করার নেই!’

ইন্দ্রকান্ত বেজার মুখে বলল, ‘ছোটকা, দার্জিলিং যেতে আর ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে থাকলে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হতো।’

চন্দ্রকান্ত তখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি কোনটা বেশি অ্যাট্রাক্টিভ—দার্জিলিং না এ.টি.এম.টি. মিস্ট্রি। তাই ও পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন বের করল টস করার জন্য।

ছোটকা ওদের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ‘এখন আর কোনও উপায় নেই রে। দাদা, বউদি রেগে ফায়ারবল হয়ে যাবে। বরং তোরা ফিরে এসে গল্প শুনিস।’

ঝালা-পালার ছোটকা ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে কাজ করে। আর ইলেকট্রনিক্স-এ দুদান্ত এক্সপার্ট। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই নানান অটোমেটিক জিনিস তৈরি করত। বছরদুয়েক আগে পঞ্চাশ কেজি ওজনের একটা বাচ্চা-রোবট তৈরি করে ছোটকা ঝালা-পালাকে প্রেজেন্ট করেছে। বাচ্চা-রোবটটা সবসময় ঝামেলা করে বলে ছোটকাই ওর নাম রেখেছে ঝামেলা।

ছোটকা বলল, ‘ঝামেলা আমার কাছে থাক। আমার কাজে একটু-আধটু হেল্প হতে পারে। তোরা ঝামেলাকে ছেড়ে সাতটা দিন থাকতে পারবি না?’

ঝালা-পালা একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ পারব।'

এমন সময় ওরা ঝামেলার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঠং-ঠং করে পা ফেলে এদিকেই আসছে।

হাফপ্যান্ট পরা তিনফুট হাইটের রোবটটা হেলেদুলো ঘরে এসে ঢুকল। মাথাটা পাঁচনম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড—রুপোর মতো ঝকঝক করছে। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। গায়ে একটা রংচঙে হাফশার্ট। ওর চোখ দুটো দেখতে টেনিসবলের মাপের কাচের গুলি—ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। আসলে ও-দুটো পুঞ্জাক্ষি, যেমনটা মাছির থাকে। অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি এই পুঞ্জাক্ষি দিয়ে ঝামেলা প্রায় একমাইল দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়।

বলের মতো চোখ দুটো ঘুরিয়ে মিহি ধাতব স্বরে ঝামেলা ঝালা-পালাকে বলল, 'স্বার্থপরতা মানবধর্ম। আমাকে ফেলে রেখে দিব্যি দার্জিলিং গয়ং গচ্ছতি। রোবটরা এমন স্বার্থপর নহে। তাহারা ফ্যান্ট্যাসটিক উদার।'

ছোটকা হেসে বলল, 'ঝামেলা দেখছি ডায়ালগে হেভি উন্নতি করেছে! বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি পাঞ্চ করে কথা বলছে! ঝালা-পালা, তোরা তো দারুণ ট্রেনিং দিয়েছিস রোবটটাকে!'

ঝামেলার শিক্ষানবিশি এখনও চলছে। কথা বলার সময় ও সবকিছু কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। কোনও-কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। তার সঙ্গে আছে গুরুচণ্ডালীর সমস্যা।

ইন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে বলল, 'দার্জিলিং যেতে পারছ না বটে, তবে তার বদলে একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে ছোটকার সঙ্গে থাকতে পারছ। তুমি ভীষণ লাকি।'

ঝামেলা পিছনে হাত রেখে গম্ভীর সুরে বলল, 'ঠিক আছে। যাচ্ছ যাও—তবে ওখানে গিয়ে বেশি হুটোপাটি করিয়ো না। তোমরা যা দুরন্ত প্রকৃতির বালক! তোমাদিগকে নিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তা হয়!'

ছোটকা ঝামেলার মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'রোবটটাতো বড় এঁচোড়ে পাকা হয়ে গেছে দেখছি!'

ঝামেলা হঠাৎই ছোটকাকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল। ওর কপালে বসানো ছোট-ছোট লাল-নীল বাতিগুলো এলোমেলোভাবে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

ঝামেলার কখন যে কী মতিগতি হয় সে ও-ই জানে!

ছোটকা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না এ.টি.এম.টি.-র মাধ্যমে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করিয়ে ওই ইলেকট্রনিক ডাকাতটা শেষ পর্যন্ত টাকাটা হাতে পাচ্ছে কেমন করে।

এ-ব্যাপারে তদন্তে নেমে পুলিশের কাছ থেকে ভারী অদ্ভুত রিপোর্ট পেল ছোটকা। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বসে স্পেশাল মিটিং-এ আলোচনার সময় অফিসার-ইন-চার্জ যোগিন্দার শুক্লা বললেন, 'আমরা ব্যাঙ্কের কম্পিউটার ডেটাবেস ঘেঁটে যে চারটে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা

হয়েছে তার নম্বরগুলো পেয়েছি। শুনলে আপনারা অবাক হবেন, চারটে অ্যাকাউন্ট নাম্বার চাররকম। এবং তার মালিকরা জানেন না এই টাকা কেন হঠাৎ তার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

'তা হলে ক্রিমিনালটার লাভ কী?' ছোটকা জানতে চাইল।

এবার উত্তর দিলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার রিমিন গুপ্তঃ 'মিস্টার চৌধুরী, লাভটা গতকালই জানা গেছে। আমরা শহরের সবক'টা এ.টি.এম.টি. বুথে ওয়াচ রাখছিলাম। তা ছাড়া ওই চারটে অ্যাকাউন্টের টাকা লেনদেনের ওপরেও নজর রাখছিলাম। ওই হাইটেক ক্রিমিনালটা কী করেছে জানেন?' হাসলেন রিমিন। মেটাল ফ্রেমের চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে বললেন, 'ওই চারটে অ্যাকাউন্ট থেকে আবার নতুন চারটে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছে। তারপর তারই একটা অ্যাকাউন্টকে টার্গেট করে সেই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে দিয়ে ক্যাশ উইথড্র করিয়েছে।'

'মাই গুডনেস!' ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'সেই ভদ্রলোক কি ব্যাপারটা আপনাদের কাছে রিপোর্ট করেছেন?'

'হ্যাঁ। ওঁর নাম সঞ্জীব মিত্র—মিলেনিয়াম হাই সুকলের টিচার। ওঁকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছি। বাইরের ঘরে উনি অপেক্ষা করছেন। এ ছাড়া আরও চারজন রয়েছেন—ওঁরা সবাই বোমার ভয়ে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছেন। আমরা অলরেডি কথা বলেছি। আপনি ইচ্ছে করলে ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

ছোটকা মনে-মনে হিসেব করছিল। ক্রিমিনালটা মোট ন'জনকে এ.টি.এম.টি. বুথে অদ্ভুত কায়দায় পাকড়াও করেছে। তারপর নানান অ্যাকাউন্টে টাকা চালাচালি করে শেষ পর্যন্ত ক্যাশ টাকা হাতিয়েছে। এটা তো সে প্রথমেই করতে পারত। করেনি তার কারণ পুলিশকে সে ঘোল খাওয়াতে চেয়েছে।

এই কেসের ফাইলটা ছোটকা এতবার পড়েছে যে, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। তা ছাড়া কেসের ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্টগুলো ছোটকা ঝামেলাকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিয়েছে। যখন খুশি ওকে নির্দেশ দিলেই ও গড়গড় করে হুবহু সব উগরে দিতে পারবে।

মিটিং রুমের এক কোণে ঝামেলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ছোটকা ওর চলাফেরা আর কথা বলার সার্কিট দুটো অফ করে রেখেছিল। শুধু চোখ আর কান অ্যাক্টিভ ছিল। ঝামেলার কান বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু নেই—তার জায়গায় আছে দুটো ফুটো। কিন্তু ওর শ্রবণক্ষমতা পশুপাখিকেও হার মানায়। সূক্ষ্ম আলট্রাসনিক শব্দও ওর ওই 'কানে' ধরা পড়ে।

ছোটকা চলাফেরা আর কথা বলার সার্কিট দুটো অন করে দিতেই ঝামেলা বলল, 'বাব্বাঃ, এতক্ষণ নিশ্চুপ করিয়া থাকার কী যে কেষ্ট তাহা বোনে-বোনে বুঝিতে পারলাম।'

ছোটকা অনুমান করতে পারল ‘কেষ্ট’-টা ‘কষ্ট’ হবে। কিন্তু ‘বোনে-বোনে’ মানেটা কী! ঝামেলার তো কোনও বোন নেই!

‘বোনে-বোনে মানেটা কী বলো তো? ঠিক বুঝতে পারলাম না।’

ঝামেলা হাত-পা নেড়ে মাথা ঘুরিয়ে বলল, ‘বোনে-বোনে মানে হাড়ে-হাড়ে। কী যে তব বুদ্ধি!’

ছোটকা এ-নিয়ে আর কথা বাড়াল না। সত্যি, ঝামেলাটা বড্ড জ্যাঠা হয়ে উঠেছে।

বাইরের ঘরের দিকে যেতে-যেতে ছোটকা চাপা গলায় বলল, ‘শোনো, এখন আমি কয়েকজন লোকের সঙ্গে এই কেসের ব্যাপারে কথা বলব। তুমি চুপচাপ সব রেকর্ড করে নেবে।’

‘তথাস্তু।’ ঝামেলা বলল।

কাচের দরজা ঠেলে ওরা বাইরের ঘরটায় এল।

বিশাল ঘর। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তিনদিকে কাচের দেওয়াল। ফ্লুওরেসেন্ট বাতির নরম সাদা আলো সারা ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। একটা ডোমেস্টিক-রোবট ট্রে-তে করে সবাইকে চা-কফি সার্ভ করছে। ঘরের তিনটে দরজার কাছে তিনটে সিকিওরিটি রোবট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দরজা দিয়ে যারাই আসা-যাওয়া করছে ওরা তাদের আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার জেনে রেকর্ড করে নিচ্ছে। রোবটগুলোর চেহারা বেশ দশাসই আর লম্বা।

রিমিন গুপ্ত ছোটকা আর ঝামেলার পিছন-পিছন হেঁটে আসছিলেন। ঘরে ঢোকার সময় সিকিওরিটি রোবট ওঁদের আই.ডি. নম্বর জানতে চাইল। ওঁরা নম্বর বলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ঝামেলা হেলেদুলে সিকিওরিটি রোবটটাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় ওটা চাপা ব্যাঙের গলায় বলে উঠল, ‘আমি লম্বা, তুই বেঁটে।’

ঝামেলা ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘আমি স্বাধীন, তুই চাকর।’ তারপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছোটকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল—পাছে লম্বা রোবটটা তেড়ে আসে।

একটা বৃত্তাকার সোফায় সঞ্জীব মিত্র ও অন্যান্যরা বসেছিলেন। রিমিন ওঁদের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আপনাদের সঙ্গে আমরা আর-একবার কথা বলব। সঞ্জীববাবু, আপনি প্রথমে আসুন...।’

একটা প্রকাণ্ড কাচের টেবিলের কাছে ছোটকা আর ঝামেলাকে নিয়ে গেলেন
রিমিন: ‘মিস্টার চৌধুরী, এখানে বসেই আপনি ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিন। কী, কোনও অসুবিধে হবে না তো?’

‘না, না, বরং সুবিধেই হবে।’

ছোটকা আর রিমিন গুপ্ত টেবিলের একদিকে বসে পড়লেন। ঝামেলা বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেয়ারগুলো কাচের তৈরি বলে কী ভেবে আর বসল না—চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সঞ্জীব মিত্র ছোটকাদের মুখোমুখি বসলেন।

তারপর শোনালেন ওঁর কাহিনি।

সঞ্জীব মিত্রের কাহিনিটা গণপতি শাসমলের মতোই। শুধু অন্য কোনও অ্যাকাউন্ট নম্বরে টাকা ট্রান্সফার করার বদলে ওঁকে মেশিন থেকে ক্যাশ উইথড্র করতে বলা হয়েছে।

সঞ্জীব মিত্র মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে লালচে আভা। বাঁ চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ভদ্রলোক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

'...দেখুন, ওই দু-লাখ টাকা আমার নয়। কে আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে জানি না। তাই ওরকম ভূতুড়ে আদেশ পাওয়ামাত্রই আমি ভয় পেয়ে দু-লাখ টাকা ক্যাশ উইথড্র করে নিই...।'

'উইথড্র করে টাকাটা কী করলেন?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

'লোকটা যেমন অর্ডার দিল তাই করলাম। টাকাটা মেশিন থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই ওটা গোছা ধরে মেশিনের পাশ ঘেঁষে এক কোণে গুঁজে রাখলাম। তারপর বুথ থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিয়েছি—আর পেছন ফিরে তাকাইনি।'

রিমিন বললেন, 'আপনি চলে যাওয়ার পরই ওই ক্রিমিনালটা নিশ্চয়ই ওই বুথে গিয়ে ঢুকেছে। এবং টাকাটা তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।'

ছোটকা বলল, 'সেটাই ওবভিয়াস'।

সঞ্জীব ইতস্তত করে বললেন, 'দেখুন...আমার হয়তো অতটা ভয় পাওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ শুনে আর ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি। অবশ্য লোকটা ধাপ্পা দিয়েও থাকতে পারে।'

রিমিন মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, 'না, ধাপ্পা নয়। আমরা এ.টি.এম.টি. বুথগুলোর ফোরেনসিক অ্যানালিসিস করেছি। তাতে আমরা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ট্রেস পেয়েছি। আর সামান্য লেড অ্যাজাইডও পাওয়া গেছে। লেড অ্যাজাইড এক্সপ্লোসিভের প্রাইমার মেটিরিয়াল।'

সঞ্জীব মিত্রকে ছেড়ে দিয়ে ছোটকা রিমিনকে বলল, 'আরও তিনজনের কাছ থেকে ক্যাশ টাকা হাতানো বাকি রয়েছে। এ.টি.এম.টি. বুথগুলোর ওপরে আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে।'

রিমিন বললেন, 'আমরা তো কনস্ট্যান্ট ওয়াচ রেখেছি—।'

'না, ঠিক ওরকম নয়—আমার এই স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাচ্চা-রোবটটা স্পেশাল ওয়াচ রাখবে।'

রিমিন ঝামেলার দিকে তাকালেন, বোধহয় ওর স্পেশালিটি খুঁজতে চাইলেন।

ঝামেলা মাথা ঝুঁকিয়ে রিমিনকে কুর্নিশ করল।

সঞ্জীব মিত্রের পর বাকি চারজনের সঙ্গেও কথা বলল ছোটকা।

মোটাসোটা গণপতি শাসমল ঘন-ঘন শ্বাস নিয়ে ওঁর গল্পটা বললেন, তারপর অবাক হয়ে বললেন, 'ক্রিমিনালটা বুথের ভেতরে কেমন করে কথা বলছিল বলুন তো!'

ছোটকা হেসে বলল, 'সিম্‌প্‌ল। একটা কর্ডলেস মাইক্রোস্পিকার লোকটা বুথের ভেতরে ফিট করে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে বোধহয় একটা মিনিয়েচার ভিডিয়ো ক্যামেরাও লাগিয়েছিল...সেটা দিয়ে এ.টি.এম.টি. মেশিনের মনিটর আর আপনাকে লক্ষ রাখছিল।'

'তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলে ওগুলো আবার খুলে নিয়ে গেছে।' রিমিন ছোটকার কথার পিঠে যোগ করলেন।

গণপতির পর ছোটকা কথা বলল মেঘা দাশগুপ্তের সঙ্গে।

মেয়েটি রোগা, ফরসা। চোখে ছোট-ছোট কাচের বিদেশি চশমা। ঠোঁটে ক্যাডবেরি লিপস্টিক। ইকো, জিও, ম্যাথ নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। হাবভাবে একটা বিশ্রী বড়লোক-বড়লোক গন্ধ ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ছোটকার প্রশ্নের উত্তরে মেঘা বলল, 'লুক, আমার পাঁচ-ছ'টা এ.টি.এম.টি কার্ড আছে। আই ডোন্ট রিমেমবার হুইচ ওয়ান আই ওয়জ ইউজিং দ্যাট ডে। পসিবলি আমেরিকান এক্সপ্রেস। এনিওয়ে...সাডেন্‌লি কে যেন খুব কাছ থেকে কথা বলে উঠল। আমি তো চমকে উঠেছি। তারপর...।'

সেই এক গল্প। নতুন কোনও সূত্র পেল না ছোটকা।

মেঘা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেই চলল,...'ক্যালকাটা পুলিশের তো ভীষণ নামডাক শুনি...অবশ্য মিডিয়াগুলো আজকাল তেমন রিলায়েবল নয়। নইলে ক্যালকাটা পুলিশ এই হরিব্‌ল ক্রিমিনালটাকে অ্যারেস্ট করে ফাঁসিতে লটকাতে পারছে না! বলে কি না বুথ এক্সপ্লোড করে উড়িয়ে দেবে! ক্যান য়ু ইম্যাজিন দ্য লেভেল অফ অডাসিটি! মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা! পুলিশ কিছু করতে পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আজকাল হাই আই. কিউ.-র ক্যান্ডিডেটেরা মোটেই পুলিশে চাকরি করতে আসছে না। আর ওল্ড ব্রেন যেসব পুলিশে আছে সেগুলোয় সব রাস্ট পড়ে গেছে।'

ছোটকা মুচকি হেসে মন্তব্য করল, 'ম্যাডাম, উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেঘা। পোশাকটা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'আমি ড্যাডিকে ব্যাপারটা একটু দেখতে বলব। বলব, য়ু ক্যানট ডিপেন্ড আপন দ্য হোপলেস কপ্স।'

মেঘার উত্তেজনা আর বিরক্তি দেখে ছোটকা বেশ মজাই পাচ্ছিল। আড়চোখে রিমিন গুপ্তের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। সন্দেহ নেই মেঘা বড়লোকের আদরে আর পয়সায় বখে যাওয়া মেয়ে।

‘আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ব্লাডি টু ল্যাক্স। কারণ, টাকাটা বড় কথা নয়—সেফটিটাই আসল...।’ মেঘা একটানা বকেই যাচ্ছিল।

রিমিন ওর জঙ্গি কথার স্রোতকে বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, ‘আপনার ড্যাডি কী করেন? পুলিশে চাকরি করেন?’

‘চাকরি! হোয়াট ডু য়ু মিন? আমার ড্যাডির নাম অরিন্দম দাশগুপ্ত—দ্য ফেমাস বিজনেস টাইকুন...।’

রিমিন হেসে বললেন, ‘হি মাস্ট বি আ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান। আপনি এবার আসতে পারেন।’

মেঘা ব্যঙ্গের খোঁচাটা বুঝতে পারল। কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তারপর গটগট করে হাঁটা দিল।

মেঘার পর সর্বেশ্বর সরকার।

ছোট ব্যবসায়ী। বয়েস হয়েছে। তাই বোধহয় একটু বেশিই ভীতু।

সর্বেশ্বর মাথার চুলে বেশ কয়েকবার হাত বোলালেন। চোখে বসানো মেটাল ফ্রেমের চশমা বারকয়েক খুললেন, পরলেন। তারপর বললেন, ‘আর বলবেন না, মশাই! ওটা এ.টি.এম.টি. বুথ, না ডেথ চেম্বার? আমি তো ঠিক করেছি নেকস্ট থ্রি মান্থস্ ওইসব বুথ-ফুথে ঢুকব না।’

‘কেন? তিনমাস কেন?’ রিমিন জিগ্যেস করলেন।

‘তিনমাসের মধ্যে আপনারা ক্রিমিনালটাকে পাকড়াও করতে পরবেন না? সেইজন্যেই তিনমাস বলেছি। না, মশাই—গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনাদের ফেস-টেস দেখে মনে হচ্ছে, আরও টাইম লাগবে।’ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন সর্বেশ্বর। তারপর বললেন, ‘তা হলে স্ট্রেটকাট বলি। যদ্দিন না আপনারা ওই শয়তানটাকে ধরতে পারছেন তদ্দিন আমি ওই ডেথ চেম্বারগুলোর দিকে এগোচ্ছি না। বলে কি না বুথ উড়িয়ে দেবে! ভাবা যায়, দীনবন্ধু...।’

ছোটকা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, ‘দীনবন্ধু মানে?’

হাসলেন সর্বেশ্বরঃ ‘দীনবন্ধু বলে ভগবানকে ডাকাডাকি করলাম। রাখলে উনিই রাখবেন...।’

‘আর মারলে উনিই মারবেন।’ হেসে যোগ করল ছোটকা।

রিমিন বললেন, ‘আপনার কোনও চিন্তা নেই, মিস্টার সরকার। তিনমাস অনেক সময়—তার আগেই আমরা ক্রিমিনালটাকে অ্যারেস্ট করে ফেলব।’

‘দীনবন্ধু ভরসা।’ বলে বিদায় নিলেন সর্বেশ্বর।

সবশেষে জুবিন প্রধান। বছর তিরিশ-বত্রিশের স্বাস্থ্যবান তরুণ। সে সরাসরি বলেই বসল, এই ক্রিমিনালকে পাকড়াও করা পুলিশের কর্ম নয়। কারণ টেকনোলজিতে কলকাতা পুলিশ এই

লোকটার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

ছোটকা জুবিনের গল্পটা শুনল। মোটামুটি একই গল্প। তবে জুবিন একটা বাড়তি তথ্য দিল, বলল, 'আমার মনে হয়, ক্রিমিনাল একজন ওল্ড ম্যান।'

'কেন?'

'কারণ, আমি বুথ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর একজন ফিটফাট বৃদ্ধ মানুষকে সেটায় ঢুকতে দেখেছি।'

এই তথ্য পেয়ে ছোটকা এবং রিমিন গুপ্ত নড়েচড়ে বসলেন। ছোটকা আরও অনেক প্রশ্ন করল জুবিনকে। কিন্তু বাড়তি আর কোনও খবর পাওয়া গেল না। জুবিন বলল, ও ভয় পেয়ে যাওয়াতে বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ায়নি।

বৃদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে জুবিন জানাল, সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথায় সাদা চুল, চোখে বোধহয় চশমা ছিল। পুলিশের ইন্টারোগেশানের সময় জুবিনের খেয়াল না থাকায় এই তথ্য জানাতে পারেনি।

রিমিন গুপ্ত বললেন, 'আপনি কেন ওই বৃদ্ধকে সন্দেহ করছেন, মিস্টার প্রধান? উনি তো একজন অর্ডিনারি এ.টি.এম.টি. কাস্টমারও হতে পারেন?'

'হতে পারে...তবে...' কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল জুবিন। তারপরঃ 'তবে ওই বৃদ্ধের গতিবিধি খুব পিকিউলিয়ার ছিল—সন্দেহ করার মতো।'

'যেমন?' জানতে চাইল ছোটকা।

'লোকটার হাতে একটা বাক্সমতন কী যেন ছিল। তা ছাড়া বারবার চোরাচাউনিতে এদিক-ওদিক দেখছিল।'

ছোটকা টেবিলে আঙুলের ডগা ঠুকল। ছোট্ট করে বারদুয়েক 'হুঁ' বলল, জুবিন যা বলছে তার মধ্যে সারবস্তু কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু একজন বৃদ্ধ কি তা হলে শখে এইরকম হাই-টেক ডাকাতি করছেন?

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল।

রিমিনের সঙ্গে কথা শেষ করে ছোটকা ঝামেলাকে নিয়ে রওনা হল।

হেড কোয়ার্টারের বাইরে এসে একটা সরু চুরুট ধরাল ছোটকা। বলল, 'এসি অফিসে বসে এতক্ষণ চুরুট না খেয়ে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি।'

উত্তরে ঝামেলা কোনও কথা বলল না। শুধু পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল।

পরদিন থেকে ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ছোটকার এ.টি.এম.টি. বুথে নজরদারি শুরু হল।

ব্যাঙ্কের বড়কর্তাদের কাছ থেকে একটা এ.টি.এম.টি. মাস্টারকার্ড নিয়েছে ছোটকা। এই কার্ড দিয়ে যে-কোনও এ.টি.এম.টি. বুথে ঢোকা যায়। ছোটকা একটা বুথে ঢুকে টাকা লেনদেনের ভান করে। আর প্রায় আট-নশো মিটার দূর থেকে ঝামেলা সেই বুথটার ওপরে নজর রাখে। তারপর ছোটকা চলে যায় আর-একটা বুথে। তারপর আর-একটায়।

এইভাবে একটানা বাইশদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঘটনাটা আচমকাই ঘটে গেল।

ছোটকা তখন শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা এ.টি.এম.টি. বুথে ঢুকেছে। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল ঘোষণাঃ 'আমি একটা অ্যাকাউন্ট নম্বর বলছি। এক্ষুনি এই অ্যাকাউন্টে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ঝামেলার কোড নম্বর ডায়াল করল ছোটকা। এই কোড ডায়াল করলেই ঝামেলার শরীরে বসানো ইনবিল্ট টেলিফোন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে।

ছোটকা ফোনে কথা বলল, 'ঝামেলা, ক্রিমিনালের গলা শুনতে পেয়েছি! তোমার অ্যাকশান শুরু করে দাও!'

ঝামেলা বহুদূরে দাঁড়িয়ে একটা পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎই ওর কানে সিগনাল বেজে উঠল। তারপর ছোটকার কথা।

ছোটকার কথা শোনামাত্রই ও চোখের নিমেষে চনমনে হয়ে উঠল। বলল, 'ওকে বস।' তারপর ওর পুঙ্খাক্ষি এক বৃদ্ধের খোঁজ করে চলল।

ছোটকা বুথের কাচ ভেদ করে বাইরে নজর চালাচ্ছিল। গাড়ি-ঘোড়া আর লোকজনের ভিড়ে আলাদা করে কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে। ছোটকার পক্ষে এ.টি.এম.টি-র বোতাম টিপে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়। তা হলে দেরি দেখে ক্রিমিনালটা হয়তো রেগে গিয়ে বুথটাকেই উড়িয়ে দেবে!

ঠিক তখনই ঝামেলার গলা শোনা গেল স্পিকারেঃ 'বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখতে পাইয়াছি। চক্ষে টেলিস্কোপ। হস্তে একটি কালো বাক্স। মস্তকে সাদা চুল। বক্ষে লাল ফুল।'

'জলদি লোকটাকে ঠেকাও—নইলে এই বুথ উড়িয়ে দেবে! কুইক!'

ঝামেলা মোটেই ছুটতে পারে না। চেষ্টা করলে বড়জোর তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে। ও সেভাবেই এগিয়ে চলল বৃদ্ধ লোকটির দিকে।

জুবিন প্রধান ঠিকই বলেছিল। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথায় সাদা চুল, চোখে চশমা, আর বাড়তির মধ্যে জামার বুকপকেটে একটা লাল রঙের ফুল আঁকা রয়েছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা মিনি টেলিস্কোপ তাক করে বুড়ো লোকটা বোধহয় ছোটকার ওপরে নজর রাখছিল।

লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে ঝামেলা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল।

লোকটার কানের নীচে চোয়ালের কাছটায় কেমন সরু কালো দাগ। অনেকটা কথা-বলা পুতুলের জোড়া দেওয়া চোয়ালের মতো।

লোকটা মাইক্রোফোনে ছোটকাকে হুমকি দিচ্ছিলঃ '...এই বুথ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলেই সাংঘাতিক এক বিস্ফোরণ হবে। জলদি টাকাটা ট্রান্সফার করুন...।'

ছোটকা তখন মরিয়া হয়ে ঝামেলাকে বলছে, 'ঝামেলা, অ্যাকশান! কুইক! আর সময় নেই!'

ঝামেলা বলল, 'অপরাধীর চোয়ালের নিকটে—অর্থাৎ, মস্তকের গ্রাউন্ড ফ্লোরে—একটি জোড়ার দাগ দেখিতে পাইতেছি। বড় আশ্চর্য!'

ঝামেলাকে নিয়ে এই হল এক ঝামেলা। বাচ্চা-রোবট বলে ওর কৌতূহল বড় বেশি। আসল কাজ ছেড়ে...।

ছোটকা আর ভরসা পেল না।

পকেট থেকে ডায়মন্ড কাটার বের করে এ.টি.এম.টি. বুথের কাচের দেওয়াল কাটতে শুরু করল। কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই বুথের একপাশের দেওয়ালের কাচ কেটে ছোটকা বাইরে বেরিয়ে এল।

কাচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন শব্দে। আর ছোটকা তিরবেগে ছুটতে শুরু করল।

ঠিক তখনই বুড়ো লোকটা হাতে-ধরা কালো বাক্সটার কী একটা বোতাম চাপ দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল এক বিস্ফোরণ। এ.টি.এম.টি. বুথটা চৌচির হয়ে ছিটকে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। তার সঙ্গে আগুন আর কালো ধোঁয়া।

রাস্তার লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগল। ছুটন্ত গাড়ি কর্কশ শব্দে ব্রেক কষল। সব মিলিয়ে এক প্রকাণ্ড ডামাডোল শুরু হয়ে গেল।

বৃদ্ধ লোকটির পিছনে দাঁড়িয়ে ঝামেলা বলে উঠল 'চোয়ালে জোড়াতালি দেওয়া বৃদ্ধ! ছোটকাকে তুমি অ্যাটাক করলে! তোমার আস্পর্ধা তো স্মল নয়!'

বুড়ো লোকটা যুবকের ক্ষিপ্রতায় ঝামেলার দিকে ঘুরে তাকাল। কোথা থেকে সে যেন একটা লেজার গান বের করে ফেলেছে।

ঝামেলা হাসল। হাসিটা অনেকটা পেন্ডুলামের জলতরঙ্গ বাজনার মতো শোনাল। ও আঙুল তুলে বৃদ্ধের পায়ের কাছে কী একটা দেখিয়ে বলল, 'জবকল্পহরিনামপটহস্ত...।'

ঝামেলা অনেক সময় এরকম অর্থহীন শব্দ বলে বাংলা উচ্চারণ প্র্যাকটিস করে।

ওর অদ্ভুত কথায় 'জোড়াতালি দেওয়া' বৃদ্ধ মাথা নীচু করে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। এবং চোখের পলকে ঝামেলার ধাতব ডানহাত বৃদ্ধের ব্রহ্মতালুতে আছড়ে পড়ল। টুঁ শব্দটি না করে বৃদ্ধ ক্রিমিনাল তৎক্ষণাৎ খসে পড়ল মাটিতে।

ঝামেলা তখন উত্তেজনায় 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচাচ্ছে। আর ওর কপালের বাল্‌বগুলো জ্বলছে-নিভছে।

উত্তেজিত হলে বা খুশি হলে বাচ্চা-রোবটটা কেন যে 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচায় তা ঝালা-পালা বা ছোটকা কেউই জানে না।

ছোটকা ছুটতে-ছুটতে যখন অজ্ঞান-বৃদ্ধের কাছে এসে হাজির হল তখন ঝামেলা ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধের টিকোলো নাক ধরে টানছে।

ছোটকা হাঁফাতে-হাঁফাতে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বৃদ্ধের নাকটা লম্বা হয়ে ছিটকে চলে এসেছে ঝামেলার হাতে। সেই সঙ্গে মুখের আদলের একটা পলিমারের মুখোশ।

ওরা দুজনেই চমকে উঠল।

বৃদ্ধের মুখটা আসলে মুখোশ!

মুখোশের আড়ালে যে-মুখটা দেখা গেল সেটা ছোটকার চেনা।

ওদের পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে জুবিন প্রধান।

ছোটকা মোবাইল ফোনে রিমিন গুপ্তকে খবর দিল। দশমিনিটের মধ্যেই ওঁরা দলবল নিয়ে হাজির। তখন ছোটকা ঝামেলাকে বলল, 'আজকের মতো ঢের হয়েছে! এবার বাড়ি চলো।'

বাড়ি যাওয়ার পথে ছোটকা বলল, 'জুবিন প্রধানের একটা কথায় খটকা লেগেছিল। ও বলেছে, ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল—অথচ বৃদ্ধ লোকটিকে দেখার জন্যে ও সেখানে অপেক্ষা করছিল। আসলে ও পুলিশকে মিসগাইড করতে চেয়েছিল। তাই হাই-টেক ডাকাতের ভিকটিম সেজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। অবশ্য তুই তো রোবট, এতসব কী আর বুঝতে পারবি!'

ঝামেলা ঠং-ঠং শব্দে লাফাতে-লাফাতে বলল, 'তোমার কী নিদারুণ বুদ্ধি! আমি বুঝিতে পারি আর না পারি মাথা নাড়িতে দোষ কী! ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'



শব্দের নাম বিষ

অফিসে বেরোবার আগে খবর শোনাটা সীতানাথের বরাবরের অভ্যেস। তাই আজও টিভি চালিয়ে তারপর খাওয়ার টেবিলে বসেছেন। এক চামচ ভিটামিন 'এ', দু-চামচ ভিটামিন 'সি' ও চার চামচ প্রোটিন সাধারণত তিনি খেয়ে থাকেন। ঊর্মিলা জানে তাঁর অভ্যেস। তাই প্লেটে করে সেইটুকু গুঁড়ো খাবারই সাজিয়ে দিয়েছে। টাইয়ের নটটা ঠিক করে নিয়ে প্রথম চামচ ভিটামিন মুখে তুলতেই টিভিতে খবর শুরু হল। প্রথম খবরটা একটা দুর্ঘটনার, একটা জেট প্লেন কোনও এক অজানা কারণে এক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয় খবরটা শুরু হওয়ার মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল সুমন—সীতানাথের একমাত্র ছেলে। বছর বারো বয়েস। প্রথমে বাবার দিকে দেখল সুমন, তারপর তাকাল টিভির দিকে। গম্ভীর মুখে বলল, 'বাবা, টিভির ভলিয়ুমটা একটু আস্তে করে দিচ্ছি। তুমি বড্ড জোরে চালিয়েছ। কম করে নব্বই ডেসিবেল তো হবেই—' তারপর একটু থেমে বলল, 'এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে—।'

সীতানাথের ভিটামিন 'সি' সমেত চামচ মাঝপথেই থেমে গেল। মুখ পর্যন্ত পৌঁছোল না। কোনও উত্তর তিনি ভেবে পেলেন না। দেখলেন, সুমন পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে টিভির ভলিয়ুমটা কমিয়ে দিল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে বলে গেল, 'আর ভয় নেই। এখন ষাট ডেসিবেলের নীচেই আছে—।'

সীতানাথ নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। সত্যি, সুমনটা ভারি অদ্ভুত হয়ে উঠছে দিনকে দিন। মাস কয়েক হল এই 'শব্দ' ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকেছে। দোষটা অবশ্য সীতানাথেরই। তিনিই প্রথম ওকে 'শব্দকল্প' নামে একটা বই কিনে দেন, সুমনের জন্মদিনের উপহার। সে-বইতে শব্দের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকের কথা লেখা ছিল। বইটা সুমনের প্রচণ্ড মনে ধরে যায়। তখন থেকেই ও ইস্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দিনরাত্তির শব্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। ওর কাছেই

সীতানাথ প্রথম শিখেছেন, জিনিসপত্র যেমন ওজন করে মাপেঃ এক কেজি, দু-কেজি, তেমনি শব্দ মাপে 'ডেসিবেল' দিয়েঃ পাঁচ ডেসিবেল, দশ ডেসিবেল...। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, একদিন অফিসে বেরোবার ঠিক আগে সুমন এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'বাবা, তোমার অফিসে যাওয়ার পথে রাস্তায় ভীষণ হই-হট্টগোল হয়, না?'

ব্যাপারটা সীতানাথ আগে কখনও চিন্তা করে দেখেননি। সাধারণত পাতাল রেলে করেই তিনি অফিসে যান খুব বেশি দেরি হয়ে গেলে তবেই হেলিকপ্টার ট্যাক্সি। সুতরাং, অফিস যাওয়ার পথে বিরক্তিকর শব্দ যে বেশ কিছু শুনতে হয় তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য অফিসে পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। তুখোড় হিসাবশাস্ত্রবিদ সীতানাথ সেন এইটথ্ জেনারেশন কম্পিউটার নিয়ে বসে যান কোম্পানির লাভ-ক্ষতির খতিয়ান কষতে। সেখানে সবকিছু শান্ত, চুপচাপ—কোনও গোলমাল নেই।

সুতরাং বারো বছরের ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, গোলমাল-হট্টগোল একটু হয়। টিউব রেলের শব্দ, হেলিকপ্টারের শব্দ, জেট প্লেনের শব্দ...।'

'তুমি তা হলে এক কাজ করবে,' উৎসাহ ভরা চোখে সুমন বলেছে, 'খুব জোরে কোনও শব্দ হলেই কানে হাত চাপা দেবে। বিজ্ঞানীরা বলেন এর চেয়ে ভালো ওষুধ নাকি নেই—' কী ভেবে সুমন আবার বলেছে, 'ঠিক আছে, দাঁড়াও, তোমার জন্যে আমি একটা 'ইয়ার প্রোটেক্টর' বানিয়ে দেব। তাহলে যতই শব্দ হোক, তোমার কানে কিচ্ছু হবে না।'

সীতানাথ আর পারেননি, হেসে উঠেছেন। বলেছেন, 'ঠিক আছে, দিয়ো। এখন যাও, পড়তে বোসো গিয়ে।'

তখন ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দেননি সীতানাথ। সুমনের ছেলেমানুষি ভেবেছেন। কিন্তু ক্রমে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে লাগল। ওর শোওয়ার ঘরটাকে এক অদ্ভুত ঘরে পরিণত করল সুমন। স্টিরিয়ো, স্টিরিয়ো রেডিয়ো, অ্যাম্পলিফায়ার, অসিলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ঘরটাকে ভরিয়ে ফেলল। এ-সবই নাকি শব্দ তৈরির যন্ত্র। বিভিন্ন ধরনের শব্দ নিয়ে এসব যন্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়। মাথায় হেডফোন লাগিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সুমন ওই ঘরে পড়ে থাকতে লাগল। পড়াশোনা উঠল শিকেয়।

প্রথম-প্রথম ঊর্মিলা অনুযোগ করত, সুমন একটুও লেখাপড়া করছে না। কিন্তু সীতানাথকে নির্বিকার দেখে সে-ও চুপ করে গেছে। তবে ঘটনা কিছুই সীতানাথের নজর এড়ায়নি। তাই একদিন অফিস থেকে ফিরে হাইড্রোজেন পারক্সাইড সল্যুশন দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় সুমনকে তিনি ডাকলেন। সুমন এল। সীতানাথ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মা বলছিল, তুমি নাকি একটুও পড়াশোনা করো না?'

‘করি তো—’ মাথা নীচু করে জবাব দিল সুমন।

‘শব্দ নিয়ে আজকাল তুমি এসব কী শুরু করেছ?’ রুক্ষ স্বরে জানতে চাইলেন সীতানাথ।

‘শব্দ’ কথাটা শুনে সুমনের মুখ-চোখ ঝকমক করে উঠল। বলল, ‘বাবা, তুমি যে শব্দের বইটা জন্মদিনে কিনে দিয়েছ, ওটা দারুণ চমৎকার। জানো, সব থেকে কম যে শব্দ আমরা কানে শুনতে পাই—মানে জিরো ডেসিবেল—তাতে আমাদের কানের পরদা কতটুকু কাঁপে? এক সেন্টিমিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। দুটো ঘাসের শিষ ডগায়-ডগায় ঠেকালেও ওইরকম শব্দ পাওয়া যায়।’

‘আমি তোমার কাছ থেকে এসব শুনতে চাইনি।’ গম্ভীর হয়ে বললেন সীতানাথ, ‘এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করার বয়েস—তাই করো। তোমার ঘরের ওই সব ছাইপাঁশ আমি সমস্ত ধরে মেটাল ইভাপোরেটর-এ ফেলে দেব!’

‘বাবা, এই যে তুমি এখন রেগে যাচ্ছ, তার কারণ কী জানো? সারাদিন ধরে তুমি এত বিরক্তিকর শব্দ শোনো—একশো, একশো কুড়ি ডেসিবেলের শব্দ তো হবেই আর, সেইজন্যে অল্পতেই সবার ওপরে বিরক্ত হয়ে ওঠো। জানো, একশো পঞ্চাশ ডেসিবেলের শব্দ শুনলে মানুষ কালা পর্যন্ত হয়ে যায়?’

আর সহ্য করতে পারেননি সীতানাথ। সজোরে এক চড় কষিয়ে দিলেন ছেলের গালে। চিৎকার করে উঠলেন একই সঙ্গে, ‘অসভ্য, ইতর ছেলে কোথাকার! ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত বলতে শেখোনি? তোমাকে এই শেষবারের মতো—।’

সীতানাথের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঊর্মিলা বেরিয়ে এসেছে পাশের ঘর থেকে।

‘কী হল, তুমি আবার হঠাৎ রেগে উঠলেকেন? সুমন, যা শিগগির তোর ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বোস!’

সুমন চলে গেলে নীচু গলায় ঊর্মিলা বলল, ‘তুমি অল্পতে এত রাগ কোরো না। সুমন কাল বলছিল, বেশি বাজে শব্দ কানে গেলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, হার্ট খারাপ হয়। তোমার তো আবার দুটোরই দোষ আছে।’

সীতানাথ নিশ্চুপ হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর সটান গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অসহ্য। ভাবলেন তিনি।

ঊর্মিলা ঘরে ঢুকতেই চমক ভাঙল সীতানাথের। ভিটামিন ‘সি’র চামচ এখনও তাঁর মুখের সামনে ধরা। সুমনটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। নইলে দিনের পর দিন যেভাবে বেয়াড়া হয়ে উঠছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো হাতের বাইরে চলে যাবে। সীতানাথের দুশ্চিন্তা ঘন হয়ে ওঠে।

'সে কী, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? অফিসের যে দেরি হয়ে যাবে।' কথাগুলো বলে সীতানাথকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে ঊর্মিলা। শেষে ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পারল। বলল, 'সুমনের ওপর আজকাল তুমি কথায়-কথায় রাগ করো। এমনকী আমাকেও রেহাই দাও না। তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

স্ত্রীর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন সীতানাথ। সুইচ ঘুরিয়ে টিভি সেট অফ করে দিলেন। অফিসে বেরোবার সময়তেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলেন তিনি।

'সুমন আজকাল আমাদের 'লাকি'কে নিয়ে কীসব পরীক্ষা করছে।' নরম গলায় বলল ঊর্মিলা। প্লেট-চামচ সব গোছাতে শুরু করল অভ্যস্ত হাতে।

লাকি সীতানাথের পোষা অ্যালসেশিয়ান। অত্যন্ত প্রিয়। জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে ভুরু কুঁচকে তাকালেন সীতানাথ। প্রশ্ন করলেন, 'কী পরীক্ষা?'

ঊর্মিলা বিরক্তিভরে বলল, 'ওর ঘরের সব যন্ত্রপাতির একটা সুইচ বসিয়েছে ঘরের বাইরে। ওই লাকিকে ঘরে বন্দি করে বাইরে থেকে ওই সুইচটা টিপে দেয়। তারপর মিনিট পাঁচেক বাদে কুকুরটাকে বের করে আনে। আমি বারণ করতে গেলে শোনে না। বলে, "এক্সপেরিমেন্ট করছি। শব্দের হাত থেকে এই পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। জানো, মা, প্রতি বছরে বিরক্তিকর শব্দের জোর এখানে এক ডেসিবেল করে বাড়ছে! তাহলে ভাবো তো, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, দু-হাজার একাত্তর সালে, কী অবস্থাটাই না হবে! কেউ আর কানে শুনতে পাবে না!" ' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে ঊর্মিলা বলল, 'আমি বাবা বিজ্ঞানের অত মারপ্যাঁচ বুঝি না তবে ক'দিন ধরে দেখছি লাকি তেমন করে খাওয়া-দাওয়া করে না, সবসময়েই বসে-বসে ঝিমোয়।'

সীতানাথ কোনও উত্তর দিলেন না। অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে পা দিতেই বাড়ি-ফাটানো এক বিরক্তিকর শব্দ সীতানাথের কানে আছড়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদে তিনি আজ হেলিকপ্টার ট্যাক্সিতে ফিরেছেন। সুতরাং হেলিকপ্টারের একঘেয়ে গোঁ-গোঁ শব্দের পর এই গোলমাল তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করল। চেঁচিয়ে ঊর্মিলাকে ডাকলেন তিনি। ঊর্মিলা আসতেই ফেটে পড়লেন সীতানাথ, 'কী হচ্ছে এসব? সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়িতে ফিরেও কি এতটুকু স্বস্তি পাওয়া যাবে না?'

এতক্ষণ রান্নাঘরে আধুনিক রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত ছিল ঊর্মিলা। সে-ও উঁচু গলায় জবাব দিল, 'তা আমি কী করব? তোমার আদরের ছেলে, তুমিই বলো। আমার কথা শুনলে তো হতোই!'

এমন সময় হট্টগোল থামল। তার একটু পরেই ঘরে ঢুকল সুমন। পিছন-পিছন লাকি। কুকুরটা কেমন নির্জীবভাবে টলতে-টলতে হাঁটছে—যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে কাত হয়ে।

হঠাৎই প্রচণ্ড চিৎকার করে সীতানাথ বলে উঠলেন, 'লাকিকে নিয়ে কী শুরু করেছ তুমি?'

'এক্সপেরিমেন্ট।' শান্ত স্বরে উত্তর দিল সুমন।

আরও রেগে গেলেন সীতানাথ। বললেন, 'তোমাকে কতদিন বারণ করেছি যে—।'

বাবাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল সুমন, 'তুমি যে সামান্য কারণে রেগে উঠছ, তার কারণ তোমার সারাদিন শোনা গোলমালের শব্দ। এই যে তুমি আমাকে বুঝতে চাও না, আমি তোমাকে বুঝতে পারি না—এরও কারণ ওই একই। আর তুমি যে আজকাল মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করো, তাও একই কারণে—বিজ্ঞানীরা তাই বলেন।'

যেন ভিসুভিয়াস ফেটে পড়ল ঘরের মধ্যে। ছেলেকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি হাত-পা চালাতে লাগলেন সীতানাথ। সুমনের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে চললেন ওর ঘরে। কিল-চড় মারতে-মারতে বললেন, 'লাকিকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা! চলো, আমিও তোমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করব। মুখে যা আসে তুমি তাই বলবে! এতদূর সাহস!'

সুমনকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিলেন সীতানাথ। তারপর দরজার পাশে বসানো যন্ত্রপাতির সুইচটা 'অন' করে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরে শুরু হল শব্দের তাণ্ডব। সুমনের চিৎকার ও ঊর্মিলার চিৎকারে সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেল সীতানাথের। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সংবিত ফিরতেই দেখলেন, সুইচ 'অফ' করে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে ঊর্মিলা। 'সুমন! সুমন!' বলে ডাকছে। হাজার হলেও মায়ের মন তো!

আচ্ছন্ন পায়ে টলতে-টলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সুমন। দু-চোখে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। হঠাৎই ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, তারপর হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। আর সামনে দাঁড়ানো সীতানাথ ও ঊর্মিলাকে বারবার করে বলতে লাগল, 'তোমরা কে? আমার মাকে আর বাবাকে একটু ডেকে দেবে? দাও না ডেকে! ওরা জানে না, গোলমালের শব্দ থেকে পৃথিবীর কী ক্ষতি হতে চলেছে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। যে করে হোক...।' আবার হাসতে শুরু করল সুমন।

ঊর্মিলা ডুকরে কেঁদে উঠল। সীতানাথ অনড়-অচল। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা ফিরে পেলেন তিনি। ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সুমনকে। রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন, 'সুমন! সুমন রে! এ আমি কী করলাম? তোর কথাই ঠিক। শব্দের মধ্যে বিষ লুকিয়ে আছে। এ-বিষ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে, সবাইকে বাঁচাতে হবে।'

সীতানাথ হতবুদ্ধি ছেলেকে আকুলভাবে আদর করছিলেন। যে করেই হোক সুমনকে তিনি সুস্থ করে তুলবেন। হিসাবশাস্ত্রবিদ সীতানাথ সেনের সমস্ত হিসেব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।



ভাঁজ

চরণ প্রসাদের কাছে আমি এগিয়ে গেলাম। ওঁর দু-কাঁধে হাত রেখে আগুন চোখে তাকালাম। এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রসাদের শরীরের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললাম, ‘বলুন, অমিতেশ কোথায়? কোথায় উধাও করলেন ওকে?’

চরণ প্রসাদ এতটুকু বিচলিত হলেন না। স্মিত হেসে আলতো করে আমার হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, ‘আপনার বন্ধু অমিতেশ সান্যাল হাইপারস্পেস-এ মিলিয়ে গেছে।’

হাইপারস্পেস! অতি-দেশ! আমি মনে-মনে ভাবলাম। আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরে যে-দেশ তারই নাম হাইপারস্পেস। যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না, স্পর্শ করতে পারে না, এমনকী কল্পনাও করতে পারে না—সেই রহস্যময় হাইপারস্পেস।

আমি চরণ প্রসাদের শীর্ণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর ভেদী ধুরন্ধর চোখ দুটো যেন এক চাপা আনন্দে ঝকঝক করছে। আমার উদ্ভ্রান্ত অবস্থার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে প্রসাদ বললেন, ‘ডক্টর বোস, এবার আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে? শোনা এক কথা, আর চোখে দেখে বিশ্বাস করা এক কথা।’ চাপা হাসি হাসলেন তিনি।

হ্যাঁ, ভুলটা আমরাই করেছি। আমি আর অমিতেশ। আমরা দুজনেই ভারত সরকারের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করি। সাম্প্রতিক গ্রহান্তরে যাত্রার বিষয়ে প্রতিভাবান অমিতেশের বেশ কিছু মৌলিক গবেষণাও রয়েছে। আর ছেলেটা ভীষণ অনুসন্ধানী—বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে। ফলে এই অদ্ভুত চেহারার অপবিজ্ঞানী চরণ প্রসাদের হাতে আমাদের এই দুরবস্থা।

খবরটা প্রথম যোগাড় করেছিল অমিতেশ। একদিন ও আমাকে এসে বলল, ‘উৎপল, একটা দারুণ খবর পেয়েছি।’

'কী খবর?' আমি সাগ্রহে জানতে চাইলাম।

'চরণ প্রসাদ নামে একজন বিজ্ঞানীর সন্ধান পেয়েছি। লোকটার খুব উঁচু কোনও ডিগ্রি নেই, তবে হাতে-কলমে কাজ করে আর নিজে-নিজে পড়াশোনা করে বেশ কিছু গোপন আবিষ্কার করেছে। সরকার-বিরোধী গবেষণার জন্যে একবার ওর জেলও হয়। তারপর থেকেই লোকটা ভীষণ লুকিয়ে তলে-তলে সব উদ্ভট গবেষণা করে।' একটু থেমে অমিতেশ খুব স্পষ্ট করে বলল, 'উৎপল, সম্প্রতি লোকটা একটা অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করেছে!'

'কী যন্ত্র? পলকে নেপচুন-এ পৌঁছে দেওয়ার যন্ত্র?' খানিকটা ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়েই আমি বললাম।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে অমিতেশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। ওঁর যন্ত্রটা অনেকটা টাইম মেশিনের মতো। তবে কিছুটা জটিল। চরণ প্রসাদ যন্ত্রটার নাম দিয়েছেন স্পেস অ্যান্ড টাইম ফোল্ডিং মেশিন—অর্থাৎ, দেশ ও কালে ভাঁজ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। এই যে সময় ও শূন্য—তাতে এই যন্ত্র দিয়ে যে-কোনও মাপের ভাঁজ সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনেকটা কাগজ দু-ভাঁজ করার মতো...।'

আরও অনেক কথা বলছিল অমিতেশ, তবে আমি সবটা পরিষ্কার বুঝিনি। এইচ. জি. ওয়েলস-এর টাইম মেশিন ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কার্ভেচার অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম—অর্থাৎ, দেশ ও কালের বক্রতা—ইত্যাদি থিয়োরিকে কাজে লাগিয়ে নানান কাণ্ড করে এই অপবিজ্ঞানী চরণ প্রসাদ তাঁর যন্ত্রটি তৈরি করেছেন—অমিতেশের কথায় মোটামুটি এটুকু বুঝতে পেরেছি।

তারপর ওরই পীড়াপীড়িতে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা দুজনে রওনা হয়েছি চরণ প্রসাদের গবেষণাগার লক্ষ্য করে। পথে যেতে-যেতে অমিতেশ বলেছে, 'এই যন্ত্রটা পেলে কত সুবিধে হবে জানো? বিভিন্ন গ্রহে আমরা পৌঁছে যাব চোখের নিমেষে।'

এই কথায় আমার হতবুদ্ধি ভাবটা অমিতেশের নজর এড়ায়নি। ও বলল, 'উৎপল, একটা সাদা কাগজের দু-প্রান্তে তুমি দুটো কালির ফুটকি দাও। ফুটকি দুটোর দূরত্ব ধরো একফুট। এবারে যদি কাগজটা তুমি মাঝামাঝি ভাঁজ করে ফ্যালো, তা হলে ফুটকি দুটো গায়ে-গায়ে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ, এই ভাঁজের ফলে ওদের মধ্যেকার দূরত্ব একফুট থেকে সোজাসুজি শূন্য হয়ে যাবে।'

আমি ওর কথার তাৎপর্য এবারে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বললাম, 'অমিতেশ, তুমি কাগজ ভাঁজ করার মতো শূন্যকে ভাঁজ করতে চাও? অর্থাৎ, পৃথিবী ও নেপচুন হল কাগজের ওপরে দুটো কালির ফুটকি—ভাঁজ করলেই খুব কাছে এসে পড়বে। ফলে যে-কোনও গ্রহে আমরা নিমেষে পৌঁছে যাব?'

‘ঠিক তাই।’ অমিতেশ আমাকে সমর্থন জানাল। তারপর সাবধানে পা ফেলে পথ চলতে লাগল।

একটু আগেই ক’পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথে কাদা-জল মাখামাখি। তার ওপর ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ঝিঁঝির ডাক। অমিতেশ টর্চের আলো ফেলে পথ দেখিয়ে চলেছে। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। ঠিক তক্ষুনি অন্ধকার জঙ্গলের বুক চিরে হলদে আলোর রেশ আমাদের চোখে পড়ল।

‘চরণ প্রসাদের গবেষণাগার!’ চাপা স্বরে উত্তেজিতভাবে বলল অমিতেশ।

গবেষণাগারের দরজায় পৌঁছে সাংকেতিক নিয়মে নক্ করতেই এলোমেলো পোশাক পরা একটি লোক দরজা খুলে দিল। অমিতেশের কথা শুনে বুঝলাম ইনিই চরণ প্রসাদ। আপ্যায়িত হয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল গবেষণাগারে তিনি সম্পূর্ণ একলা মানুষ।

নিয়মমাফিক পরিচয় পর্ব ও আতিথেয়তার পাট শেষ হলে চরণ প্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘চলুন, যন্ত্রটা দেখবেন চলুন।’

আধো-আঁধারি অলিন্দ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। আমাদের সামনে বিচিত্র ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে চলেছেন শীর্ণকায় অপবিজ্ঞানী চরণ প্রসাদ। আর ওঁর পিছনে আমরা দুজনে। চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছি অমিতেশের আগ্রহ আমার চেয়ে শতগুণ বেশি।

যেতে-যেতে অদ্ভুত খসখসে গলায় চরণ প্রসাদ বলে চললেন, ‘এই যন্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ও আইনস্টাইনের কাছ থেকে ধার করা। আমি শুধু যন্ত্রটা তৈরি করেছি মাত্র। ওয়েল্‌সাহেবের টাইম-ট্রাভেলার পৃথিবীর যেখানে-সেখানে, অতীতে বা ভবিষ্যতে, যেতে পারত। আমি ভেবে দেখেছি, একমাত্র সময় ও শূন্যকে ভাঁজ করা ছাড়া এই ভ্রমণ সম্ভব নয়। ধরুন, আপনি ৫০০০ খ্রিস্টাব্দের আমেরিকায় যেতে চান। তা হলে আপনাকে দুটো জিনিস ভাঁজ করতে হবেঃ এই ১৯৮২ থেকে ৫০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের যে দূরত্ব, সেটাকে আর, এখান থেকে আকাশপথে আমেরিকার যে দূরত্ব, সেই শূন্যকে ভাঁজ করতে হবে একমাত্র তখনই আপনার পক্ষে ৫০০০ সালের আমেরিকায় যাওয়া সম্ভব। যদি শুধু সময় ভাঁজ করেন, তাহলে ৫০০০ সালে পৌঁছোবেন ঠিক, তবে এই ভারতবর্ষেই আপনাকে বসে থাকতে হবে। আর যদি শুধু শূন্যকে ভাঁজ করেন, তাহলে আমেরিকায় অবশ্যই পৌঁছোবেন, কিন্তু সালটা হবে ১৯৮২—পাঁচ হাজার নয়।’

আমার মনে পড়ল অমিতেশের উদাহরণের কথা। কাগজের ওপরে কালির ফুটকি। এখানে সেইরকম দু-জোড়া ফুটকি। একজোড়া ফুটকি সময়ের, আর-একজোড়া দূরত্বের ফুটকি। সে কথা চরণ প্রসাদকে বললাম।

মিথ্যে বলব না, এই অপবিজ্ঞানীটির প্রতি আমার মনে কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম আসল ঘরে। ঘরের আকার বিশাল। ছাদটা প্রায় পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু। আর ঘরের মেঝেটা যেন ফুটবল খেলার মাঠ। গোটা ঘরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং অজস্র উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। অবাক হয়ে ভাবলাম, এই বনে-বাদাড়ে চরণ প্রসাদ বিদ্যুৎ পেলেন কোথা থেকে? চরণ প্রসাদ হয়তো এই প্রশ্নটাই আশা করছিলেন, তাই প্রশ্ন না করতেই উত্তর দিলেন, 'আমার নিজস্ব পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। ওই যে।' উনি আঙুল তুলে ঘরের একপ্রান্তের দিকে দেখালেন। বাইরে থেকে শুধু সীসেয় মোড়া একটা প্রকাণ্ড ঘর চোখে পড়ল। আর শোনা যাচ্ছে গম্ভীর গুঞ্জনের শব্দ।

এতসব দেখে আমি অমিতেশের কানে-কানে বললাম, 'নিশ্চয়ই এর পিছনে শত্রু-রাষ্ট্রের টাকা আছে!'

অমিতেশ কিছু বলল না। শুধু হাসল। তারপর মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ঘরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বসানো কুড়ি ফুট উঁচু যন্ত্রটার দিকে। বুঝলাম, এটাই সেই স্পেস অ্যান্ড টাইম ফোল্ডিং মেশিন!

যন্ত্রটার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ কয়েক হাজার যন্ত্রাংশ অত্যন্ত জটিলভাবে জুড়ে যদি অসংখ্য ইলেকট্রিকের তার যন্ত্রের সর্বাঙ্গে ঘিরে দেওয়া হয়, তা হলে হয়তো চরণ প্রসাদের যন্ত্রের কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। বিচিত্র তার আকৃতি। প্রকৃতি হয়তো আরও বিচিত্র।

চরণ প্রসাদ একটা সুইচ টিপে দিয়ে যন্ত্রটা চালু করলেন। বললেন, 'অ্যাটমিক পাওয়ার।' যন্ত্রের গায়ে হাজার-হাজার রঙিন আলো জ্বলতে-নিবতে লাগল। অমিতেশ নেশাগ্রস্তের মতো যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে গেল। তক্ষুনি চরণ প্রসাদ চিৎকার করে উঠলেন, 'সাবধান, ডক্টর সান্যাল। হাত দেবেন না। যদি ভুল করে সময়ে বা দূরত্বে ভাঁজ পড়ে যায় তাহলে আপনার হাত হাইপারস্পেস-এ মিলিয়ে যাবে!'

অমিতেশ চমকে হাত টেনে নিল। চরণ প্রসাদ এগিয়ে এসে যন্ত্রটার কার্যকলাপ ওকে বুঝিয়ে দিলেন। সবশেষে বললেন, 'ডক্টর সান্যাল, কাগজ ভাঁজ করার উদাহরণটা দিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। ব্যাপারটা বোঝার খুব সুবিধে। তবে তার একটা ছোট্ট তফাত রয়েছে এই যন্ত্রের কাজের সঙ্গে।' একটু থেমে আমার দিকে এক পলক দেখে নিলেন চরণ প্রসাদ। তারপর বললেন, 'কাগজটা আপনি ভাঁজ করছেন আমাদের খুব চেনা দুনিয়ায়—অর্থাৎ, থ্রি ডাইমেনশন্যাল স্পেস বা ত্রিমাত্রিক শূন্যে। কারণ দ্বিমাত্রিক তলে এই ভাঁজ সম্ভব নয়। তেমনি, আমার এই যন্ত্রও সময় এবং শূন্যকে ভাঁজ করে হাইপার স্পেস বা চতুর্মাত্রিক শূন্যে। কারণ, ভাঁজ করার জন্যে আমাদের অতিরিক্ত একটা জায়গা দরকার হয়—যা থ্রি ডাইমেনশন্যাল স্পেস-এ সম্ভব নয়...।'

অমিতেশ হঠাৎই বলে উঠল, 'আমি আপনার যন্ত্রে চড়ে হাতেনাতে সব পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

ব্যস! চরণ প্রসাদ সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। অমিতেশকে যন্ত্রে বসিয়ে উনি কীসব কলকবজা টিপলেন। কিছু শব্দ হল। কয়েক হাজার আলো জ্বলল, নিবল। তারপর যন্ত্রটা ছেড়ে অমিতেশ একা উধাও হয়ে গেল।

আমার ঠোঁট চিরে একটা আতঙ্কের চিৎকার বেরিয়ে এল। বুঝতে পারছি, অভিব্যক্তিও হয়ে উঠেছে বিকৃত। সেটা লক্ষ করে চরণ প্রসাদ বললেন, 'ভয় পাবেন না, ডক্টর বোস, অমিতেশবাবুকে আমি দশ মিনিট আর একশো ফুট দূরত্বে পাঠিয়েছি। দশ মিনিট পরেই ওঁকে একশো ফুট দূরে ঘরের ওই কোণে দেখতে পাবেন।'

সুতরাং, উৎকণ্ঠায় থমথমে মুখ নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। ক্রমে দশ মিনিট থেকে বিশ মিনিট পার হয়ে গেল, কিন্তু অমিতেশের দেখা নেই। ভয় পেলাম। কী চায় এই অপবিজ্ঞানী? আমাদের ব্ল্যাকমেল করে মহাকাশ গবেষণার কোনও গোপন খবর আদায় করতে চায় না তো? অবশেষে যখন আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তখন আমি চরণ প্রসাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। তার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, বললাম, 'অমিতেশ কোথায়...?'

ধীরে-ধীরে আবার বর্তমানে ফিরে এলাম। হ্যাঁ, চরণ প্রসাদের যন্ত্রের ক্ষমতা আমি চোখে দেখে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু কী করব এখন? আমাদের আজকের এই গোপন অভিযানের কথা কেউই জানে না। অমিতেশ সবকিছু গোপন রেখেছে। এখন যদি আমি একা ফিরে যাই, তা হলে সবার কাছে কী জবাবদিহি করব? ভাবতে-ভাবতে মাথাটা আমার আগুন হয়ে উঠল। সময়ের ভাঁজে বা শূন্যের ভাঁজে এক ফুটকি থেকে আর-এক ফুটকিতে যাওয়ার সময় অমিতেশ কি অতি-শূন্যে হারিয়ে গেছে? কী করে এখন ফেরত পাব ওকে? ও কি দেখতে পাচ্ছে আমাদের? নিশ্চয়ই না।

হঠাৎই ভদ্রতা সভ্যতা ভুলে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম চরণ প্রসাদের ওপর। ওঁকে সহজেই ধরাশায়ী করে টুঁটি টিপে ধরলাম। গর্জন করে উঠলাম, 'চরণ প্রসাদ, যে করে হোক অমিতেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন! নইলে আপনার নিস্তার নেই! আমি আপনাকে শেষ করে দেব!' ওঁর গলার ওপর হাতের চাপ ক্রমশ বাড়াতে লাগলাম।

চরণ প্রসাদ এবার ভয় পেল। গভীর ভয়। কাঁপা গলায় বলল, 'করছেন কী? ছাড়ুন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

ওঁকে ছেড়ে দিলাম। হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠে জামা-কাপড় ঝেড়ে নিলেন চরণ প্রসাদ। আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'মাঝে-মাঝে মেশিনটার যে কী গণ্ডগোল হয়...!'

এবার উনি নিজেই উঠে বসলেন যন্ত্রে। আবার নানারকম কলকবজা টিপলেন। তারপর চেঁচিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ডক্টর বোস, আপনাকে আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া, অমিতেশবাবুকে ফেরত আনতে গেলে মেশিনটাকেও হাইপার স্পেস-এ নিয়ে যেতে হবে। মেশিনটা যে আপনার জিম্মায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে না তাতে আমি বেশ ভরসা পাচ্ছি।' চরণ প্রসাদ হাসলেন।

আমি উত্তরে গম্ভীরভাবে বললাম, 'অমিতেশকে আমি এই মুহূর্তে ফিরে পেতে চাই! এক্ষুনি!'

চরণ প্রসাদ শেষ বোতামটা টিপলেন এবং ওই প্রকাণ্ড মেশিন সমেত উধাও হয়ে গেলেন আমার চোখের সামনে থেকে।

এক মিনিট...দু-মিনিট...ওই তো অমিতেশ! ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে একটা নিওন লাইটের কাছে অমিতেশ আবির্ভূত হয়েছে। আচমকা ওর শরীরের আবির্ভাবের চাপে নিওন লাইটটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আর এক মুহূর্ত শূন্যে ভেসে থেকে পরক্ষণেই মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল অমিতেশ। আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে তুলে ধরলাম। ও ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ, ওর ভ্রমণের খুঁটিনাটি, উধাও হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, কিছুই ও টের পায়নি। ও জিগ্যেস করল, 'চরণ প্রসাদ কোথায়? ওঁর মেশিনটাই বা কোথায়?'

সংক্ষেপে অমিতেশকে সব খুলে বললাম। অবাক হয়ে দেখলাম, অমিতেশকে উদ্ধার করে কোনওরকমে ফেরত পাঠাতে পারলেও চরণ প্রসাদ নিজে এখনও হাইপার স্পেস-এর গোলকধাঁধায় ঘুরছেন। আর কোনও কথা না বলে অমিতেশকে হাত ধরে টান দিলাম। বললাম, 'শিগগির! এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে!' দুজনে ছুটতে শুরু করলাম দরজা লক্ষ করে। গবেষণাগারের বাইরে পা রাখার মুহূর্তে এক প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ আমাদের ছিটকে ফেলে দিল। চারপাশের দেওয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। চারিদিকে অসংখ্য আলোর ঝলসানি। কোনওরকমে উঠে আমরা প্রাণটুকু হাতে করে পৌঁছে গেলাম অন্ধকার জঙ্গলে। অমিতেশের টর্চ কোথায় হারিয়ে গেছে। ফলে জল-কাদা ঠেলে মরিয়া হয়ে ছুটে চললাম।

পিছনে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে। রাতের আকাশটা যেন আতসবাজির আলোয় বারবার ধাঁধিয়ে উঠছে। বুঝলাম, চরণ প্রসাদের গবেষণাগার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর ক্লান্ত স্বরে অমিতেশকে প্রশ্ন করলাম, 'এসব বিস্ফোরণ কী করে হল বলো তো?'

ও একটু ভেবে বলল, 'চরণ প্রসাদ আমাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন ঘরের মেঝের বদলে নিওন লাইটের ওপর—দেওয়ালের গায়ে। মানে ভুল জায়গায়। হয়তো মেশিনের কোনও গোলমালের ফলেই দূরত্বের ভাঁজটা ভুল জায়গায় হয়েছিল। আর উনি নিজে যখন মেশিন সমেত হাইপার স্পেস থেকে ফিরে আসেন, তখন হয়তো ভুল করে ওই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে

মেশিনসুদ্ধু গিয়ে হাজির হয়েছেন। ফলে এই বিধ্বংসী বিস্ফোরণ...' একটু থেমে অমিতেশ দুঃখের স্বরে বলল, 'একটা দরকারি যন্ত্রও একইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। কবে আবার মানুষ এই যন্ত্র তৈরি করতে পারবে কে জানে!'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।



নীলবর্ণ বিড়াল

রাকেশ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নীলবর্ণ শৃগালের স্বপ্ন দেখছিল।

কাল রাতে সদ্য-সদ্য গল্পটা পড়েছে ও। আচমকা নীলের গামলায় পড়ে গিয়ে নীল রঙের চেহারা হয়ে গিয়েছিল বেচারা শেয়ালটির। তারপর যখন সে জঙ্গলে ফিরে গেল তখন সমস্ত পশু-পাখি তাকে জঙ্গলের রাজা বলে মেনে নিল। কারণ, নীল রঙের শেয়াল তো তারা জীবনে কখনও দেখেনি! অতএব সেই অদ্ভুত রঙের প্রাণীটিকেই তারা সকলে মেনে নিয়েছিল বনের রাজা বলে।

রাকেশ দেখছিল, একটা নীল রঙের শেয়াল ওকে এসে ডাকছে, 'রাকেশবাবু, আমি কিন্তু গল্পের শেয়াল নই। সত্যিকারের নীল রঙের শেয়াল।'

রাকেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করল, 'সত্যি?'

শেয়ালটা বলল, 'সত্যি।'

আর তারপরই রাকেশকে হতভম্ব করে দিয়ে 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডেকে উঠল।

শেয়াল 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডাকছে! রাকেশ চমকে উঠল। আর তক্ষুনি ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙতেই দেখল বিছানায় ওর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা নীল রঙের বিড়াল। 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডাকছে। কাচের গুলির মতো নীল চোখজোড়া জুলজুল করে রাকেশেরই দিকে তাকিয়ে। সরু ঝাঁটার কাঠির মতো নীল রঙের গোঁফ। গায়ের রং গাঢ় নীল। শুধু লেজের ডগায় খানিকটা কালো ছোপ।

রাকেশ ভাবল, ওর স্বপ্নের ঘোর বোধহয় এখনও কাটেনি। ভাবল, চিমটি কেটে একবার দেখি তো! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কিন্তু চিমটি কাটতে গিয়েই আবার অবাক। এ কী! ওর ধবধবে ফরসা গায়ের রং এরকম নীল হয়ে গেল কেমন করে! তারপরই বাকি দুর্ঘটনাগুলো একে-একে রাকেশের চোখে পড়ল।

ঘরের দেওয়াল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল-চেয়ার, ফ্যান, ঘরের মেঝে—সর্বত্র শুধু নীল আর নীল। কোনওটার রং উজ্জ্বল নীল, কোনওটা ঘোলাটে নীল, কোনওটার রং কালচে নীল, আবার কোনওটা স্রেফ কুচকুচে কালো।

বিছানার বেড়ালটা তখনও 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডেকে চলেছে।

রাকেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। পাশে মা নেই। অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। এখন নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। রাকেশের কান্না পেয়ে গেল। কোনওরকমে চিৎকার করে ও ডেকে উঠল, 'মা, মা!'

মা ছুটে এলেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

মা-কে দেখে রাকেশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল—কালচে নীল গায়ের রং। চোখের তারাটুকু শুধু কালো, বাকি অংশটা উজ্জ্বল নীল। ঝকঝকে দাঁতেরও একই দশা। অবশ্য মাথার চুলগুলো কুচকুচে কালো—যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

বিছানা থেকে নেমে একছুটে গিয়ে মা-কে জাপটে ধরল রাকেশ। শাড়ির ভাঁজে মুখ লুকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'এসব কী কাণ্ড, মা? আমি কি ভুল দেখছি?'

মা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না রে, তোর চোখের ভুল নয়, আমরা সববাই ওই নীল রঙেরই সবকিছু দেখছি। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি এই দশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। একটু আগেই রেডিয়োতে আর টিভিতে বলেছে, সারা পৃথিবী জুড়েই নাকি একইরকম কাণ্ড হয়েছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মায়ের কথায় রাকেশ বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। ও বিছানায় বসা বেড়ালটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওই দ্যাখো—।'

মা হাসলেন, বললেন, 'ওটা তো তোর মিনু। রং পালটানোর ধাক্কায় ওর রঙও ওরকম নীল হয়ে গেছে। নে, এবার হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বোস দেখি—।'

মা-কে রোজকার মতো সহজ স্বাভাবিক দেখে রাকেশের বিস্ময় আর আতঙ্ক ধীরে-ধীরে কাটতে লাগল। মা ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে যেতেই ও টুথব্রাশে খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে নিল। টুথব্রাশের রং এমনিতেই নীল ছিল। অতএব ওটার রঙের তেমন রদবদল হয়নি। কিন্তু সাদা টুথপেস্ট একেবারে গাঢ় নীল রঙের হয়ে গেছে।

মুখ ধুতে বেসিনের কাছে গিয়ে রাকেশ যথারীতি আবিষ্কার করল সাদা ওয়াশ বেসিন ঘন নীল। এতক্ষণে ওর ভয়টা কেটে গিয়ে বেশ একটা মজা টগবগ করে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে ও এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল।

মা রান্না ছেড়ে টানা বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে পাশের বাড়ির টুকির মায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। হাসাহাসিও করছিলেন দুজনে।

রাকেশ শুনল, পাশের বাড়ির মাসিমা বলছেন, 'দিদি, ভাতের আজ যা চেহারা হয়েছে, টুকির বাবা ভাত খেয়ে অফিস গেলে হয়!'

সত্যিই তো, নীল রঙের ভাত কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার! রাকেশ ভাবল।

মা তখন বলছেন, 'আমারও তো একই অবস্থা, ভাই। ভাত, ডাল, হলুদ, লঙ্কা সব যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছে।'

টুকির মা-কে বেশ চিন্তিত মনে হল। উনি বললেন, 'রাতারাতি এ কেমন ভোজবাজি হল বলুন তো, দিদি! আমার তো ব্যাপার-স্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।'

মা বললেন, 'একটু আগেই রেডিয়োতে বলেছে, বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। শিগগিরই এর সমাধান করে দিলেন বলে—।'

রাকেশ আর দাঁড়াল না। ছুট-পায়ে চলে এল রাস্তার দিকের ঝুলবারান্দায়।

ওমা! এ কী! আকাশে যে-সূর্যটা উঠেছে সেটার রংও যে ঘন নীল! আকাশের নীল রঙের সঙ্গে ওটা প্রায় মিশে গেছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নীল রোদ্দুর। যে-ক'টা গাছপালা দেখা গেল সবই কালচে নীল। শুধু কালো রঙের কাকগুলো নীলরঙা টিভি-অ্যানটেনার ওপরে বসে একইরকমভাবে 'কা-কা' করে ডাকছে।

রাকেশ মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখতে লাগল।

একটু পরেই মা বারান্দায় এসে হাজির। হাতে একগ্লাস দুধ। ওকে ডেকে বললেন, 'নে রাকা, চটপট খেয়ে নে দেখি। উনুন জ্বলে যাছে।'

রাকেশ ব্যাজার মুখে দুধের গ্লাস হাতে নিল। নীল রঙের দুধ! মায়ের দিকে মুখ তুলে আবদারের গলায় বলল, 'তুমিই বলো না, এরকম দুধ কেউ খেতে পারে?'

মা ব্যস্তভাবে বললেন, 'পারে পারে, খুব পারে। যদি সবকিছুর রং এরকমটাই থেকে যায়, আর আগের মতো ফিরে না আসে, তা হলে অবস্থাটা কী হবে শুনি! নীল রঙের দুধ, ভাত, সবই তো খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, তাই না? মানুষ তো আর না খেয়ে থাকতে পারবে না। নে, তুই চটপট খেয়ে গ্লাসটা বেসিনের কাছে রেখে দিস, আমি যাই—।'

মা ব্যস্ত পায়ে চলে যাচ্ছিলেন, রাকেশ জিগ্যেস করল, 'বাবা এখনও আসেনি?'

মা বললেন, 'উঁহু। প্রায় একঘণ্টা তো হয়ে গেল বাজারে গেছে। মনে হয়, বাজারে আজ হইচই পড়ে গেছে। নে, দুধটা জলদি খেয়ে নে।'

মা হুউশ্ করে চলে গেলেন।

রাকেশ অতি সাবধানে দুধের গ্লাসে একটা চুমুক দিল। মাগো! কীরকম গা গুলোচ্ছে। কিন্তু দুধের স্বাদটা একইরকম আছে। শুধু রং পালটে গেলেই খাওয়ার ইচ্ছেটা পালটে যায় কেন কে জানে! নইলে রাকেশ তো দুধ খেতে ভালোই বাসে।

মিনু কখন যেন বিছানা ছেড়ে নেমে এসে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল আর ডাকছিল 'মিঁউ-মিঁউ' করে। বোধহয় দুধের গন্ধ পেয়েছে। ওকে খানিকটা দুধ দিয়েই দেখা যাক তো, খায় কি না। গ্লাস থেকে কিছুটা দুধ মেঝেতে ঢেলে দিল রাকেশ। ঠিক মিনুর সামনে। কিন্তু দেখল, বেড়ালটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

বাবার কাছেই রাকেশ শুনেছে কুকুর, বেড়াল, গরু, মানুষের মতো বর্ণালির সাত রং দেখতে পায় না। এমনকী লাল কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে স্পেনে যে ষাঁড়ের লড়াই হয়, সেখানে ষাঁড় মোটেই লাল কাপড় দেখে খেপে ওঠে না। সে বেচারা কাপড়টাকে দেখে গাঢ় ছাই রঙের। আসলে কাপড়ের টুকরোটার দ্রুত নড়াচড়াতেই সে খেপে উঠে ওটাকে তাড়া করে।

সুতরাং হিসেবমতো মিনুও নিশ্চয়ই দুধটাকে এখন কালো রঙের দেখছে। কারণ, ওর পক্ষে তো আর নীল রং দেখা সম্ভব নয়। হয়তো সেইজন্যেই ও দুধটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

অবশেষে ঘ্রাণশক্তিরই জিত হল। গন্ধে-গন্ধে জিভ বাড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা দুধের স্বাদ নিল মিনু। তারপর 'চক-চক' শব্দে গোটা দুধটাই চেটেপুটে সাফ।

মিনুর দেখাদেখি চোখ বুজে অতিকষ্টে গ্লাসের দুধ শেষ করল রাকেশ। তারপর একটু জল খেয়ে গ্লাস মায়ের কাছে রেখে এসে পড়ার বই নিয়ে বসল।

ইতিহাস বই খুলেই রাকেশ বুঝল, পড়াশোনা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ বইয়ের গাঢ় নীল রঙের পৃষ্ঠায় খুদে-খুদে কালো অক্ষরগুলো ভালো করে দেখতে পাওয়াই মুশকিল।

রাকেশ মনমরা হয়ে প্রত্যেকটা বই আর খাতার পৃষ্ঠা উলটে-উলটে দেখতে লাগল। দূর ছাই, স্কুলে গিয়ে তা হলে আর কী হবে! বই ছেড়ে উঠে বাবার টেবিল থেকে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা নিয়ে এল ও। সুইচ অন্ করে নব ঘুরিয়ে কান পাতল। সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল বিশেষ ঘোষণাঃ '...সেই কারণেই সবকিছু বিবেচনা করে রঙের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে দ্রুত গবেষণা করছেন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্যে সরকার অনুরোধ জানিয়েছেন...।'

সুইচ টিপে রেডিয়ো অফ করে দিল রাকেশ। রঙের সামান্য রকমফেরের জন্যে এ কী কাণ্ড হল!

এমনসময় 'ফোঁস' করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। রাকেশকে বললেন, 'রাকা, তোমার ইস্কুল ছুটি।'

রাকেশ দেখল, বাবার পরনে নীল আদ্দির কাপড়ের পাঞ্জাবি, নীল ধুতি। গায়ের রং কালচে-নীল।

পাঞ্জাবি খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখতে-রাখতে বাবা আবার বললেন, 'বাজারে তো একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড। অদ্ভুত-অদ্ভুত রঙের সব জিনিস বিক্রি হচ্ছেঃ নীল ফুলকপি, নীল রজনীগন্ধা, আর মাছের বাজারে কালো-কালো পোনা মাছের টুকরো।'

'কেন, কালো রঙের কেন?' রাকেশ জানতে চাইল।

বাবা হেসে বললেন, 'হবে না! রক্তের রঙই যে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে! এ ছাড়া বাজারে শুনলাম, গাড়ি-ঘোড়া, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সব নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ থাকবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এইমাত্র রেডিয়োতে বলেছে।'

'কই, দেখি, রেডিয়োটা দে তো—।'

রাকেশ রেডিয়োটা বাবাকে দিল। তারপর বইপত্র গুছিয়ে রেখে আবার ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

উলটোদিকের বাড়ির ছাদে তিনটে গাঢ় নীল রঙের পায়রা বসেছিল। ও-বাড়ির তপনদা পায়রা পোষে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাকেশ ভাবছিলঃ সত্যি, কী অদ্ভুত ব্যাপার! সূর্যের সাত রঙের ছ'-ছ'টা রং উধাও হয়ে যাওয়ার জন্যে কী বিপত্তি! সারা পৃথিবীর জীবনযাত্রা একেবারে অচল। রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। চারদিকে শুধু নীল রং অথবা কালো রং। আর তা নইলে তাদের কমবেশি মিশেল দিয়ে তৈরি কোনও নীলচে রং। এই ধরনের পরিবেশে গাড়ি চালাতে গিয়ে অভ্যেস না থাকায় ড্রাইভাররা হয়তো অ্যাকসিডেন্টই করে বসবে। সেইজন্যেই রেডিয়োতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।

সিনেমা হলগুলোও বন্ধ থাকবে নিশ্চয়ই। নীল ছাড়া বাকি সব রং উধাও হয়ে গেলে রঙিন ছবির আর বাকি থাকল কী! আবার সাদা-কালো সিনেমাতেও একই বিপদ! সাদা রং বলে কিছু থাকবে না। তার বদলে শুধু নীল আর নীল! ঠিক টিভির মতোই দশা!

যতদিন রংগুলো ছিল ততদিন বোঝা যায়নি সেগুলো কত জরুরি। বোঝা যায়নি, সেগুলো না থাকলে লাগাতার বন্ধ শুরু হয়ে যাবে মানুষের জীবনে। এখন দিনগুলো কাটবে কেমন করে সেই নিয়েই রাকেশের চিন্তা।

বিকেলবেলায় বাবার কাছে শুনল, কলকাতার সমস্ত রং কোম্পানি নতুন কোনও ব্যবসা খোলার কথা ভাবছে। নানান দোকানে তাদের যত রং ছিল সব ভোল পালটে নীল অথবা কালো হয়ে

গেছে। এদিকে বুড়ো মানুষদের চুলদাড়ি সব নীল হয়ে গিয়ে তাদের ভারি চমৎকার লাগছে। সেই দেখে কালো চুল যাতে তাড়াতাড়ি পেকে গিয়ে নীল হয়ে যায় তার জন্য মানুষ কৃত্রিম উপায়ে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সেলুনে কালো চুল নীল করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

রাকেশ অবাক হয়ে বাবার কথা শুনছিল। এমনসময় রেডিয়োতে বলল, এ-পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিমালয়ের বরফে ঢাকা চুড়ো আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মোট সাতাশটি এরোপ্লেন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় আছড়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা এই রং বদলের ঘটনায় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

এরকম চমকে দেওয়া আরও কতসব দুর্ঘটনা!

রাকেশের খুব মন খারাপ লাগছিল। ও পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সন্ধে ঘন হয়ে আঁধার নেমে এসেছে। কিন্তু আকাশে চাঁদ-তারা কই? গাঢ় পিচ রং আকাশে ঘোর নীল রঙের চাঁদ। ভালো করে ঠাহর করা যায় না। আর তারা? চোখে প্রায় পড়ে না বললেই চলে। ইস, এরকমভাবেই কাটবে প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত!

রাকেশ ঘরে ফিরে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। টিউব লাইট আর বাল্‌ব। দুটোর অবস্থাই একরকম। বাবা-মা চুপচাপ বসে। মায়ের মুখে সকালের ঠাট্টার লেশমাত্র নেই এখন। বাবাও যেন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মুখ গম্ভীর। রেডিয়ো সামনে নিয়ে বসে আছেন। রেডিয়ো ছাড়া আর উপায় কী! গল্পের বই পড়া বন্ধ। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ। টিভি দেখা বন্ধ। ঘরে বসে-বসে সকলেই বোধহয় এইরকম হাঁফিয়ে উঠেছে।

রেডিয়োতে গানের অনুষ্ঠান শুনছিলেন বাবা। হঠাৎই রাকেশের দিকে ফিরে বললেন, ‘রাকা, খেয়াল করছিস, যারা খবর পড়ে শোনাচ্ছে তাদের মাঝেমধ্যে কীরকম আটকে যাচ্ছে! নীল কাগজে কালো লেখা পড়তে গিয়ে খবর-পড়ুয়ারা একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।’

রাকেশ সামান্য হাসল।

মা বললেন, ‘তবু রেডিয়ো ছাড়া আর উপায় কী বলো—।’

রাকেশ জিগ্যেস করল, ‘খবরে কিছু বলেছে, বাবা?’

‘হ্যাঁ, বলেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, সূর্যের মধ্যে কোনও একটা গোলমালের জন্যেই এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।’

মিনু রাকেশের পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। রাকেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর একটা কালো বল নিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না।

এমনি করেই একসময় রাত দশটা বাজল। কোনওরকমে খাওয়াদাওয়া সেরে রাকেশ মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল। মিনুও শুয়ে পড়ল ওর কোল ঘেঁষে। বাবা পাশের ঘরে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'রাকা, মন খারাপ করিস না। কাল সকালে উঠেই দেখবি স-ব ঠিক হয়ে গেছে।'

বাবার কথাটা যে এরকম হাতেনাতে ফলে যাবে সেটা রাকেশ কল্পনাও করতে পারেনি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ও অবাক। ধবধবে সাদা মিনু 'মিঁউ-মিঁউ' করছে কালকের মতোই। চোখের ভুল নয়তো! রাকেশ শুয়ে-শুয়েই দেখল চারপাশ। ঘরের দেওয়াল আবার সাদা হয়ে গেছে, ফরসা হয়ে গেছে ওর গায়ের রং, জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে সোনা রঙের ঝকঝকে রোদ। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা নেই। আগেই উঠে পড়েছেন।

রাকেশ লাফিয়ে উঠে বসল। মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল ওর। যাক, সবকিছু আবার তা হলে আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেছে! কিন্তু হল কেমন করে?

রাকেশ বিছানা ছেড়ে ছুটল রান্নাঘরের দিকে—মায়ের সন্ধানে।

সেখানে পৌঁছে দ্যাখে বাবা হাত-পা নেড়ে মাকে কীসব যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। একহাতে বাজারের দুটো থলে। থলে দুটো উঁচু করে বাবা মাকে বলছেন, 'এই দ্যাখো, ধরো এটা হল সূর্য। সূর্য থেকেই তো সাদা আলো আসছে আমাদের পৃথিবীতে—।'

মা বাধা দিলেন, 'সাদা আলো কোথায়! ও তো হলদে আলো।'

বাবা একটা অদ্ভুত শব্দ করে ধৈর্য হারালেন। তারপর বললেন, 'দূর ছাই! তোমাকে বলে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং রাকাকে বলি।'

রাকেশ খুশি-খুশি মেজাজে বলে উঠল, 'সব রং আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে, বাবা। কিন্তু ওরকম ওলটপালট হয়েছিল কেমন করে? রেডিয়োতে কিছু বলেছে?'

'আরে সেটাই তো তোর মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। রেডিয়োতে সংক্ষেপে যা বলল, তা হল এইঃ গত পরশু রাতে—অর্থাৎ, ধরে নে, তিরিশ ঘণ্টা আগে, সূর্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তা এখনও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বলেছেন, সেই বিস্ফোরণের ফলে সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিচিত্র এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। সেই বিকিরণ সূর্যের সাদা আলো থেকে ছ'-ছ'টা রং একেবারে শুষে নিয়েছিল। তারা শুধু গেট-পাস দিয়েছিল নীল রংটাকে। ফলে সব জিনিসকেই নীল রঙের দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া, ওই বিকিরণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের কাছের তিনটে গ্রহে—বুধ, শুক্র আর পৃথিবীতে। সেইজন্যে আমাদের এখানকার কৃত্রিম আলোগুলোও—মানে, টিউব লাইট, বাল্‌ব সব—নীল রঙের আলো ছড়াচ্ছিল...।'

'কিন্তু কালো রংটা?' ভাতের হাঁড়িতে হাতা নাড়তে-নাড়তে মা প্রশ্ন করলেন।

তার জবাব দিল রাকেশ, 'কালোটা কোনও রং নয়, মা। বরং কোনও রং না থাকলে সেই জিনিসটাকে আমরা কালো দেখি।'

মায়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল রাকেশের ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হয়নি।

সেটা অনুমান করে বাবা বললেন, 'যাই হোক, ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ সূর্যকে ঘিরে-থাকা ওই বিচিত্র বিকিরণ মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ফলে বর্ণালির বাকি ছ'টা রং আজ সকাল থেকেই আবার ফিরে পাওয়া গেছে। আর পৃথিবীর ওপর থেকেও কেটে গেছে ওই বিকিরণের প্রভাব। সুতরাং রাতের আলোতেও আর কোনও গোলমাল থাকবে না। সিনেমা টিভিও দেখা যাবে আগের মতোই।'

বাবা বাজারের থলে দুটো বগলদাবা করে রাকেশকে লক্ষ্য করে গলা নামিয়ে বললেন, 'রাকা, এবারে রঙের ব্যাপারটা ছোট্ট করে তোর মাকে বুঝিয়ে দিই, কী বলিস?'

রাকেশ মজা পেয়ে ঘাড় কাত করল। মা রান্নায় মগ্ন হলেও এদিকে যে কান পেতে আছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

গলাখাঁকারি দিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, 'শোনো, সূর্যের যে সাদা আলো—মানে, তোমার মতে হলদে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ওটাই সাদা আলো—ওই সাদা আলো ভাঙলে দেখা যাবে ওর ভেতরে সাতটা রং মিশে আছে। আকাশে রামধনু উঠলে বর্ণালির সেই সাতটা রং আমরা আলাদা করে দেখতে পাই। দিনেরবেলা সব জিনিসের ওপরেই সাদা আলো পড়ে, কিন্তু তবুও বিভিন্ন জিনিসকে আমরা বিভিন্ন রঙের দেখি। এরকমটা কেন হয়? ধরো, এই যে তুমি লাল রঙের শাড়ি পরে আছ, এই শাড়িটাকে লাল দেখানোর কারণ এটা বর্ণালির লাল রং ছাড়া আর সবক'টা রংই শুষে নিয়েছে। শুধু গেট-পাস দিয়েছে লাল রংটাকে। যেমন ওই বিকিরণ নীল রংটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। যে-জিনিস সব রং শুষে নেয় তাকে আমরা কালো দেখি। আর যে-জিনিস বর্ণালির সবক'টা রংকেই ফিরিয়ে দেয়—মানে, ছেড়ে দেয়—তাকে আমরা দেখি সাদা রঙের। যেমন আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবি, হাঁড়ির ওই ভাত। এবার তো বুঝলে?'

মা হাতা নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'ঢের বুঝেছি। এখন চটপট বাজারটা করে আনো দেখি। কাল তো নীল ভাত খেতেই পারোনি, আজ ভালো করে দুটো সাদা ভাত খেয়ে অফিসে যেয়ো।'

বাবা চলে গেলেন। যেতে-যেতে বললেন, 'কাল খবরের কাগজ পড়তে পারিনি। আজ দেখি কোনও টেলিগ্রাম বেরোল কি না—।'

মা রাকেশকে বললেন, 'কী হল, রাকা, যাও, পড়তে বোসো গিয়ে—।'

রাকেশ পড়ার টেবিলে ফিরে এল। মিনু টেবিলের নীচে চুপটি করে বসে।

জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখতে রাকেশের খুব ভালো লাগছিল। ও উঠে গিয়ে গরাদে মুখ ঠেকিয়ে চোখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। আজ সূর্যটাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে! কই, এতদিন তো এরকম মনে হয়নি! বরং সূর্যটা যেন সকলের কাছে বেশ পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। অথচ আজ একেবারে ঝকঝকে নতুন!



সবুজের কান্না

অশোক পত্রনবিশ আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে বলল, 'স্যার, একটা কথা বলার আছে।'

অশোক এমনিতে খুব হাসিখুশি যুবক, তা ছাড়া বুদ্ধিমানও বটে। বেশিরভাগ সময়েই সে নিজের অদ্ভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তার এখনকার হাবভাব যে একটু বেমানান তাতে সন্দেহ নেই।

'বলো, কী বলতে চাও।' কৌতূহলী চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'স্যার...একটা গাছকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা চিৎকার করছে, ছটফট করছে। আমার যন্ত্রে সব ধরা পড়েছে।' অশোক পত্রনবীশের কণ্ঠস্বর আবেগে থমথম করছে।

আমি অর্ধেক অবিশ্বাস ও অর্ধেক সংশয় নিয়ে চুপ করে রইলাম। বিপদগ্রস্ত গাছকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে আমাদের সরকারি সংগঠন—'সবুজ সংরক্ষণ সংস্থা'। আমি এই সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর।

সবুজ নিয়ে সংকট প্রথম দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। কলকারখানা, যানবাহন, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ইত্যাদির প্রকোপে সজীব গাছপালা ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে। তার ওপরে ছিল আমাদের এই সভ্যতার দুরন্ত গতিবিস্তার। ফলে লক্ষ-লক্ষ অক্সিজেনদায়ী গাছ ধরাশায়ী করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। যখন মানুষ বুঝতে পারল গাছ তাদের একান্ত বন্ধু, যাকে ছাড়া তাদের সভ্যতা শেষও হয়ে যেতে পারে, তখন তারা উঠে-পড়ে উদ্যোগী হল সবুজ সংরক্ষণে। সরকারের তরফ থেকে জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হতে লাগল, তারা যেন সুযোগ পেলেই 'বৃক্ষরোপণে উৎসাহী' হয়। সে-যুগের একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, একটা গাছ সারা জীবনে মানব সভ্যতার যে-উপকার করে, তার দাম বেশ কয়েক লাখ টাকা। এরকম নানান প্রচেষ্টায়

জনসাধারণের কিছু অংশকে সচেতন করা গেলেও বিপদের বড় অংশটা থেকে গেল। মানুষ খুশিমতো গাছ কাটছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফুল ছিঁড়ছে। এর ওপর সমস্যা পরিবেশ দূষণের। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হল 'সবুজ সংরক্ষণ সংস্থা'। শহর ও শহরতলির প্রতিটি এলাকায় এর অফিস রয়েছে। আর সঙ্গে রয়েছে নতুন মহাকাশ-যুগের নতুন-নতুন সব যন্ত্রপাতি। ফলে কেউ সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোনও গাছের ক্ষতি করছে, এ-খবর পেলেই আমরা সরাসরি সেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। নতুন সবুজ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিজের বাগানের গাছেরও কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং আমরা যথাসম্ভব নিজেদের কর্তব্য করে যাচ্ছিলাম। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস—প্রতিদিন অন্তত বারচারেক অতি সূক্ষ্মভাবে মেপে, বা বাতাসের গতিবিধির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আমরা আঁচ করার চেষ্টা করি, সবুজের ক্ষতি করে সরকারি আইন কেউ লঙ্ঘন করছে কি না। এরই মধ্যে এক নতুন অফিসার যোগ দিয়েছে আমাদের সংস্থায়। নাম তার অশোক পত্রনবিশ। সে নাকি গাছপালার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে একাই গবেষণা করে। গাছের কথা শোনার জন্যে, গাছের অভিব্যক্তি ও আচরণ বোঝার জন্য সে নানান পদ্ধতিতে চেষ্টা করছে। কখনও ইলেকট্রনিক পদ্ধতি, কখনও বা টেলিপ্যাথি। এই মুহূর্তে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাইছে, একটা গাছের আর্তনাদ তার যন্ত্রে ধরা পড়েছে। তবু ভালো যে টেলিপ্যাথিতে ধরা পড়েনি, কারণ টেলিপ্যাথি জিনিসটাই আমার মতে ডাহা বুজরুকি—তার ওপর আবার গাছের সঙ্গে!

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমি অশোককে প্রশ্ন করলাম, 'গাছটা কোন জায়গায় আছে বুঝতে পেরেছ?'

আমার প্রশ্নে অশোক উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'উত্তর-পূর্ব দিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে, স্যার। আমার টেলিপলিগ্রাফ যন্ত্রে যেটুকু ধরা পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে গাছটা ব্যথা পাচ্ছে, তার কষ্ট হচ্ছে। গ্রাফে সংকেতের কাঁপা-কাঁপা ছবি দেখে যা বুঝেছি, তাতে গতকাল ভোর থেকে কেউ সেটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে—দিনে প্রায় সাত-আটবার করে।'

এ আবার কেমন লোক যে গাছকে ইচ্ছে করে যন্ত্রণা দেয়, যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পায়! অশোক পত্রনবিশ কি পারবে এই অত্যাচারীকে খুঁজে বের করতে?

একটু চিন্তিতভাবেই বললাম, 'তা তুমি এখন কী করবে ঠিক করেছ?'

অশোক বলল, 'একটা মানিপ্ল্যান্ট আর আমার টেলিপলিগ্রাফ নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ব—।'

'মানিপ্ল্যান্ট! মানিপ্ল্যান্ট দিয়ে কী হবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

অশোক ছোট্ট করে হাসল, বলল, ‘স্যার, মানিপ্ল্যান্ট জাতীয় বড়-বড় পাতাওয়ালা কোনও লতানো গাছ আমার টেলিপলিগ্রাফের অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করতে পারে। আহত গাছটার যন্ত্রণা-তরঙ্গ প্রথমে ধরা পড়ে মানিপ্ল্যান্টের ভেতর। তখন ওই লতানে গাছটা নিজেই ছড়িয়ে দেয় এক সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া তরঙ্গ। সেটা আমার টেলিপলিগ্রাফ তার রেকর্ডারের চার্টে এঁকে ফেলে।’

আমি ক্রমশ যে অবাক হচ্ছিলাম সেটা বোধহয় অশোকের চোখে ধরা পড়ল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘অন্য কোনও মানুষের যন্ত্রণার চিৎকার শুনলে আমাদের মনে যেমন সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, এটাও অনেকটা সেই ধরনের, স্যার।...যাই হোক, যতই আমরা গাড়ি নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোব, টেলিপলিগ্রাফের সিগন্যাল ততই জোরদার হয়ে উঠবে।’

গাছের অনুভূতি আছে। এটা গত শতাব্দীর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করে গেছেন। সেই কারণেই কি অশোক গাছকে অনুভূতিশীল প্রাণী বলে সম্মান করে? গাড়িতে তার সঙ্গী থাকবে মানিপ্ল্যান্ট। সেইজন্যই কি সে বলল, ‘...যতই আমরা গাড়ি নিয়ে এগোব...।’

টেবিলে বারকয়েক টোকা মেরে আমি বললাম, ‘ঠিক আছে, তুমি তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাও। কাল তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলব।’

অশোক সামান্য হতাশ হয়ে চলে গেল। আমি বসে-বসে ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়। পত্রনবিশের কাজে আমি খুব একটা বাধা দিই না, কারণ ছেলেটির প্রতিভা আছে। কিন্তু এইমাত্র যা শুনলাম সেটা যে বিশ্বাস করা শক্ত। সে সরাসরি কারও দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলবে, ‘নমস্কার, আপনি কি কোনও গাছের ওপর অত্যাচার করছেন?’ এটা ভাবতেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে। কারণ, অপরাধ প্রমাণ করতে না পারলে সেই লোক আমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারে।

ভাবনাচিন্তায় কতক্ষণ সময় কেটেছে জানি না, হঠাৎই ভিডিয়োফোনে স্থানীয় নিরাপত্তা বিভাগের ক্যাপ্টেনের ছবি ফুটে উঠল। তিনি জানালেন, এক ভদ্রমহিলা সিকিওরিটি বিভাগে এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছেন। তাঁর প্রতিবেশীর বাগান থেকে নাকি গাছের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গাছটা যন্ত্রণায় কাঁদছে, প্রাণপণ আর্তনাদ করছে। মহিলার পক্ষে ঘরে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, চিৎকারটা দেবদারু গাছের কান্না। স্বভাবতই নিরাপত্তা বিভাগ তদন্তে রাজি হয়নি। তারা এই কেস তুলে দিচ্ছে সবুজ সংরক্ষণ সংস্থার হাতে—অর্থাৎ, আমাদের হাতে।

খবরটা পেয়ে মনে-মনে হাসিই পেল আমার। এই মামলাটা হাতে পেলে অশোক নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। একটু আগে সে তো এই ধরনেরই একটা অভিযোগ এনেছিল আমার কাছে। মনে হল, ওই ভদ্রমহিলার মেজাজের সঙ্গে অশোক পত্রনবিশের মেজাজ বেশ খাপ খাবে। সুতরাং তক্ষুনি তাকে ডেকে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। সে মোবাইল ইউনিট নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

অফিস বন্ধ হওয়ার সময়, সন্ধে সাতটা নাগাদ, অশোক পত্রনবিশ ফিরে এল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার মুখ লালচে দেখাচ্ছে। টেলিপলিগ্রাফের সাদা চার্টটা সে আমার চোখের সামনে মেলে ধরল। তাতে শুধু একটা আঁকাবাঁকা রেখা, মাঝে-মাঝে ওপরে নীচে লম্বা-লম্বা খোঁচা রয়েছে। গাছের যন্ত্রণার তরঙ্গ।

চার্টটা দেখিয়েই পত্রনবিশ একেবারে ফেটে পড়ল, 'স্যার, লোকটার নাম হরিচরণ চক্রবর্তী। একটা আস্ত দাগি শয়তান! দেখেছেন চার্টটা, গাছটাকে নিয়ে কী অত্যাচার সে করছে! যে করে হোক লোকটাকে জেলে পুরতেই হবে!'

আমি একটু ক্লান্তভাবেই বলতে গেলাম যে, এখন থাক, আগামীকাল বিস্তারিত কথা হবে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা বা অভিব্যক্তিকে একটুও আমল না দিয়ে অশোক এক নিশ্বাসে বলে চলল, 'এখন মনে পড়ছে, এই লোকটা কয়েক সপ্তাহ আগে আমার ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছিল। তখন আমাকে পনেরো মিনিট ধরে নানান প্রশ্ন করেছিল। বিশেষ করে জানতে চেয়েছিল, কী করে গাছের প্রতিক্রিয়ার সাইকো-সিগন্যাল মাপা যায়। এখন সেইসব তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সে নিজের বিকৃত উল্লাস মেটাচ্ছে। আর বেচারা দেবদারু গাছটার কী করুণ অবস্থা!'

দেবদারু গাছের করুণ অবস্থা! বেশ বুঝতে পারছি গাছের সঙ্গে অশোকের একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে।

হাতের চার্টটা আবার তুলে ধরল অশোক। বলল, 'এই রেকর্ডিং চার্টটা আমি তৈরি করেছি ওই ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে। এই যে লম্বা-লম্বা খোঁচাগুলো দেখছেন, এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে হরিচরণ কখন-কখন গাছটার ওপরে অত্যাচার করেছে। ঘণ্টাদুয়েক আমি সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে সে একবার গাছের ছাল তুলেছে ছুরি দিয়ে। গাছের পাতা অ্যাসিডে ডুবিয়ে পুড়িয়েছে। আর সবশেষে —এই যে, সবচেয়ে লম্বা যে-খোঁচাটা, এটা রেকর্ড করেছি যখন হরিচরণ গরম লোহার শিক চেপে ধরেছে গাছের গুঁড়িতে। লোকটা নির্ঘাত এক ভয়ঙ্কর পাগল!'

নানান তথ্যে দিশেহারা হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু অশোক, ভদ্রমহিলা তো রিপোর্ট করেছিলেন যে, তিনি গাছের কান্না শুনেছেন!'

'এসব ওই শয়তান হরিচরণের কীর্তি।' অশোক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'গাছের পাতার সঙ্গে ইলেকট্রনিক পিক-আপ লাগিয়ে আমি যেমন টেলিপলিগ্রাফ যন্ত্রে সিগন্যাল রেকর্ড করি, সেও অনেকটা তাই করেছে। শুধু টেলিপলিগ্রাফের বদলে একটা অ্যাম্পলিফায়ার আর স্পিকার লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর হরেক কারিকুরি করে এমন করেছে যাতে আহত হলেও গাছের অনুভূতি মানুষের কান্নার মতো শব্দের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।'

‘কিন্তু কী করে হরিচরণকে শায়েস্তা করা যায়? যদি আমরা তার বাড়িতে হানা দিই তা হলে সে তো সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে ফেলবে—।’

আমার কথায় অশোক কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, ‘আমি একটা পথ ভেবেছি, স্যার। আজ রাতটা অফিসের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে পারলে ভালো হয়। কাল সকালে হরিচরণ চক্রবর্তীর ব্যবস্থা করছি।’

আমি হেসে বললাম, ‘স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো। আমার কোনও আপত্তি নেই। আশা করি, তুমি হরিচরণকে এমন শায়েস্তা করবে যাতে সারাজীবন সে গাছের গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত ভয় পায়।’

এ-কথা বলে আমি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন বিকেলে অশোক পত্রনবিশ আমার কাছে এল। চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে। খুশি আমিও। কারণ, একটু আগেই নিরাপত্তা বিভাগ থেকে খবর পেয়েছি। সুতরাং অশোক কিছু বলে ওঠার আগে আমিই তাকে সুখবরটা শোনালাম। বললাম, ‘অশোক, এইমাত্র খবর পেলাম আমাদের হরিচরণ চক্রবর্তী সটান নিরাপত্তা বিভাগে গিয়ে হাজির হয়েছে। কাঁদতে-কাঁদতে তাদের জানিয়েছে সে গাছের ভয়ে পালাচ্ছে। একটা দেবদারু গাছ নাকি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তাকে তাড়া করেছে। সে নিরাপত্তা বিভাগে আশ্রয় চায়। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড কী জানো! হরিচরণ বলেছে, গাছটা তাকে মানুষের ভাষায় কথা বলে শাসিয়েছে। এখন তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্যে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। ওঃ, আমাদের ঝামেলা তা হলে মিটল।’

আমি থামতেই অশোক হেসে বলল, ‘স্যার, আমার পরীক্ষা বেশ ভালোই কাজ দিয়েছে। আসলে, ঠিক যে-কম্পাঙ্কে হরিচরণ গাছের কান্না শুনছিল সেই কম্পাঙ্কটা আমি পরীক্ষা করে বের করি। তারপর একটা ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ওই দেবদারু গাছের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। আজ সকালে হরিচরণ যেই একরাশ উইপোকা গাছটার গুঁড়ির ওপর ছেড়ে দিয়েছে, অমনই আমি ট্রান্সমিটারে কথা বলি। গাছের চিৎকারের স্বরের সঙ্গে মিল রেখে ওকে ভয় দেখাই। বলেছি, মাথায় ভেঙে পড়ে ওকে শেষ করে দেব। গাছের রস থেকে তার ক্যান্সার হতে পারে। তা ছাড়া, প্রতি মুহূর্তে আমি ওকে তাড়া করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। প্রথমত, দেবদারু গাছের কাছ থেকে মানুষের ভাষায় কথা শুনেই হরিচরণ দারুণ ভয় পেয়ে যায়। তার ওপর যখন ওইসব ভয় দেখিয়েছি তখন আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সোজা গিয়ে সারেন্ডার করেছে।’

অশোকের কথা শেষ হতে আমি বললাম, ‘হরিচরণ চক্রবর্তী লোকটা শয়তান হলেও তার প্রতিভা ছিল। আচ্ছা, অশোক, সত্যিই কি কোনও গাছ মানুষের ওপরে প্রতিশোধ নিতে পারে?’

অশোক উত্তর দিল, ‘না, স্যার। আমাদের ব্রেনের মতো গাছের কোনও সোল কোল সিস্টেম নেই। ওদের একটা কোষ থেকে আর একটা কোষে খবর আদানপ্রদান হয় ঠিকই, কিন্তু ওরা চিন্তা

করতে পারে না, বা ডালপালা ইচ্ছেমতো নাড়াতে পারে না।'

অশোক পত্রনবিশের বুদ্ধি ও প্রতিভা আমাকে সবসময়েই অবাক করে, এখনও করল। কিন্তু একটা প্রশ্ন বরাবর আমার মনে খোঁচা দিয়ে চলেছে যার উত্তর আমি এখনও পাইনি। সুতরাং সুযোগ পেয়ে সেই প্রশ্নটা করলাম অশোককে, 'অশোক, একটা কথার জবাব দাও তো। নিরাপত্তা বিভাগের খবর আসার আগেই তুমি কেমন করে ওই দেবদারু গাছের কান্নার খবর পেলে?'

অশোক নরম সুরে বলল, 'স্যার, আগেই তো বলেছি, গাছেরা পরস্পরের মধ্যে অনুভূতি আদানপ্রদান করতে পারে। তবে আহত গাছের খুব কাছাকাছি যেসব গাছ থাকে তারাই সহানুভূতিবশত প্রতিক্রিয়া দেখায় বেশি। বড়-বড় পাতাওয়ালা লতানে গাছ এসব ক্ষেত্রে খুব ভালো অ্যান্টেনার কাজ করতে পারে। আপনি তো জানেন, স্যার, আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট বাগান আছে। সেখানে লতানে লাউ গাছের পাতাই আমাকে দেবদারু গাছের বিপদের কথা প্রথম জানিয়ে দেয়।'

অশোক বিদায় নিয়ে চলে গেল। এই প্রথম আমি ওর নামটা ভালো করে খতিয়ে দেখলামঃ অশোক পত্রনবিশ। শব্দ দুটো যেন গাছের সঙ্গে তার ঘন আত্মীয়তার ইঙ্গিত দেয়।



সংঘর্ষ যদি হয়

'কার জন্যে এসব লিখে যাচ্ছি জানি না। জানি না, আমার হাতে আর কত দিন, কত ঘণ্টা, কতটুকু সময় আছে। কে জানে কবে শেষদিন! এই শহরের অলিগলিতে, আনাচেকানাচে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। তাকে দেখতে হুবহু আমারই মতো। তবে মিল শুধু বাইরের চেহারাতেই। ভেতরের চেহারাটা আমার ঠিক উলটো। সেই লোকটার নামও জানি আমি। শরেন। আমার নাম "নরেশ"-কে উলটে নিয়ে এই নাম রেখেছে প্রভাস। শরেনকে নিয়ে ওর অহঙ্কার কম নয়! ও বলে, শরেনের কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী নাকি চমকে যাবে...।'

হাতের লেখাটা চিনে ফেলতে শোন্তার কোনও অসুবিধে হল না। বাবার লেখা। কিন্তু এইসব অদ্ভুত কথা বাবা লিখেছেন কেন? বইয়ের তাকে বাবার কয়েকটা দরকারি বইয়ের ফাঁকে গুঁজে রাখা ছিল কাগজগুলো। অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' বইটা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎই কাগজগুলো বেরিয়ে পড়েছে। কাল রাতে শোওয়ার সময়ে বইটা পড়ছিল শোন্তা। পড়তে-পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে! ব্যস, তারপর আজ সকালে ঘুম ভেঙেই দেখে বই উধাও। মা বইটাকে যথারীতি লুকিয়ে ফেলেছেন। মায়ের ধারণা, একটু-আধটু গল্পের বই পড়লে নাকি পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। সবসময় খালি বলেন, 'এই গল্পের বই পড়ে-পড়েই ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে—।' ক্লাস টেস্টে কুড়িতে পনেরো পেলেও মা বলেন, রেজাল্ট খারাপ। তারপর কেমন একটা সুর করে বলেন, 'দ্যাখো তো, অর্পিতা কেমন কুড়িতে আঠেরো পেয়েছে।'

অর্পিতা তিনটে সেকশান মিলিয়ে ফার্স্ট হয়। কিন্তু মা তো আর জানেন না, অর্পিতাও গল্পের বই পড়ে। 'বুড়ো আংলা' বইটা ওর কাছ থেকেই শোন্তা নিয়ে এসেছে।

সেই বইটা খুঁজতে গিয়েই কাগজগুলো দেখতে পেয়েছে শোন্তা। তারপর বিছানায় বসে পড়তে শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার। ওর স্কুল ছুটি। কিন্তু বাবা অফিসে গেছেন। আর মা রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। দেওয়ালে টাঙানো কোয়ার্টজ ঘড়ির দিকে তাকাল ও। প্রায় পৌনে বারোটা বাজে। শোন্তা জানে, রান্না শেষ করে মা স্নান করতে ঢুকবেন। তারপর স্নান করে বেরোতে-বেরোতে সাড়ে বারোটা। ততক্ষণ ও একা। ওর সঙ্গী বলতে সামনের ঝুলবারান্দার এক চিলতে মেঘলা রোদ, আর বারান্দার রেলিঙে ছড়ানো কয়েকটা জামাকাপড়। নিস্তব্ধ দুপুরে একটা কাক কোথাও ক্লান্তভাবে ডাকছে। যেন বলতে চাইছে, আমার আর কেউ
নেই।

বাবাকেও ক'দিন ধরে ওর কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়েছে। আর কেমন যেন হয়ে গেছেন ধীরে-ধীরে। সবে ক্লাস সেভেনে উঠলে কী হবে, শোন্তা বুঝতে পারে অনেক কিছু। বরং ও যে বুঝতে পারে, সেটা বাবা-মা-ই বুঝতে পারেন না সবসময়।

যেমন, গত কয়েক মাসে বাবাকে বেশ পালটে যেতে দেখেছে শোন্তা। এমনিতে বাবার মেজাজ ছিল বেশ খিটখিটে, সবসময় দুশ্চিন্তা করতেন, অফিসের কাজের চাপে কাহিল হয়ে পড়তেন, বাড়িতেও কথাবার্তা কম বলতেন, কেমন একটা রাশভারী মুখ করে বসে থাকতেন। ফলে মায়ের মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। আর শোন্তারও ভীষণ খারাপ লাগত। মনে হতো, বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যায়। অর্পিতার বাবা-মাকেও স্কুলে পেরেন্টস ডে-তে দেখেছে। ওঁরা সবসময় কেমন হাসছিলেন। ওদের দেখে অর্পিতাকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয়েছিল। অথচ বেশি নম্বর পাওয়া নিয়ে শোন্তা কখনও অর্পিতাকে হিংসে করেনি।

হঠাৎই একদিন বাবা বদলে গেলেন। কোথায় গেল সেই দুশ্চিন্তামাখা রাশভারী মানুষটা! খিটখিটে মেজাজটাও কোথায় উধাও হয়ে গেল। আর ক্লান্তি? ক্লান্তি শব্দটাই যেন কেউ মুছে দিল বাবার জীবনের ডিকশনারি থেকে। সারাটা দিন বাবা তাজা শক্তি আর স্ফূর্তিতে টগবগ করতে লাগলেন। যেন টাইম মেশিনে চাপিয়ে কেউ ঝট করে অন্তত পনেরোটা বছর কমিয়ে দিয়েছে বাবার জীবন থেকে।

তারপর থেকে তিনটে মাস কী যে আনন্দে কেটেছে!

অফিস থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়েই বাবা শোন্তার সঙ্গে খেলতে বসে যেতেন। প্রথম দিন শোন্তা তো ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ও ভুল দেখছে না তো! যে-বাবা খেলার কথা বললেই সবসময় বলেন, 'এখন যাও তো, শুধু-শুধু বিরক্ত কোরো না—', সেই বাবা ওকে হাসিমুখে আদর করে ডেকে নিয়ে বলছেন, 'কীরে, খেলবি নাকি—আয়। তোর ওই মুরগি-খেলনাটা নিয়ে আয় তো—যেটা বোতাম টিপলেই কঁক-কঁক করে ডিম পাড়ে।'

অবাক ভাবটা কেটে যেতেই শোন্তা মুরগি-খেলনাটা বের করে নিয়ে সোজা বাবার কাছে গিয়ে হাজির। মা রান্নাঘরে চায়ের জোগাড় করছিলেন। শোন্তা লক্ষ করেছে, মায়ের চোখেমুখে আনন্দ, অবাক হয়ে বাবাকে দেখছেন।

সেইদিন থেকেই অবাক হওয়ার শুরু। খেলা, হই-হুল্লোড়, গাড়ি চালিয়ে বেড়াতে যাওয়া, আর দরকার মতো বই নিয়ে শোন্তাকে ক্লাসের পড়া বুঝিয়ে দেওয়া—কী না করেছেন বাবা!

দেখতে-দেখতে কেটে গেছে তিনটে মাস। কিন্তু তারপর...শোন্তার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন ও বারান্দায় বসানো টবের ফুলগাছগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল, বাবা হঠাৎই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে দুশ্চিন্তা, ভয়। আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছেন। শোন্তা 'বাবা' বলে ডাকতেই একটা অচেনা মানুষ ওর দিকে তাকিয়েছিল।

'দ্যাখো, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে এই গাছটায়!' শোন্তা বাবার মন ভালো করার চেষ্টা করছিল।

'ফুল...' চিন্তার ঘোর কাটিয়ে অস্পষ্টভাবে কী যেন বললেন বাবা। তারপর কথার শেষটুকু আবার শোনা গেল, 'যদি একটা ফুল জানত অনেকদিন সে ফুটে থাকবে...অথচ একদিন পরেই তাকে টুপ করে ঝরে পড়তে হতো, তা হলে ফুলটার খুব কষ্ট হতো...না রে?'

শোন্তা কী বলবে বুঝতে পারছিল না! আর ঠিক তখনই মা চায়ের কাপ নিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়।

সেইদিন থেকে ধীরে-ধীরে পালটাতে শুরু করেছিলেন বাবা।

শোন্তা লেখাটা আবার পড়তে শুরু করল।

'...ও বলে, শরেনের কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী নাকি চমকে যাবে। বলা যায় না, হয়তো নোবেল প্রাইজ-টাইজও জুটে যেতে পারে ওর কপালে।

'মাস চারেক আগে প্রভাসের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল অফিসপাড়ায়, পার্ক স্ট্রিটে। অফিসের লাঞ্চের সময় বাইরে বেরিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাতে সিগারেট ছিল। কিন্তু সিগারেটের কথাটা আমার বোধহয় খেয়াল ছিল না। কীসব উলটো-পালটা ভাবছিলাম। মাথার ভেতরে ভীষণ টেনশান ছিল। হঠাৎ আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে উঠে সিগারেটটা ফেলে দিলাম, আর তখনই কে যেন আমাকে চেনা গলায় নাম ধরে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, প্রভাস। সেই কোনকালে আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। কসবায় থাকত, বেশ ডানপিটে আর বেপরোয়া ছিল। খেলাধুলো, আড্ডা, সিনেমা—কোনওটাই বাদ দিত না। কিন্তু কী করে যে ভালো রেজাল্ট করত কে জানে। সেই প্রভাস, বাইশ বছর পর, আমার সামনে।

'চিনতে পারামাত্রই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম আমি। কোথায় হারিয়ে গেল একটু আগের টেনশান আর ক্লান্তি। তারপর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই শুরু হয়ে গেল আমাদের গল্প। কত পুরোনো

কথা, কত ভুলে যাওয়া ঘটনা, কত হারিয়ে যাওয়া সুখের স্মৃতি। কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম আমি। প্রভাস আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ধরে রীতিমতো টানাটানি শুরু করে দিল। ও এমন যে, ওকে কখনও "না" বলা যায় না। অগত্যা অফিস থেকে ছুটি করিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। অফিসের পার্কিং স্পেসে আমার পুরোনো আমলের ফিয়াট গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল। ওটা আমি নিজেই চালাই। মাঝে-মাঝে নমিতা আর শোন্তাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়ায় বা আউটরাম ঘাটে বেড়াতে যাই। সেটা প্রভাসকে বলতেই ও ওর ড্রাইভারকে বলে দিল ওর মারুতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্যে। আমি একটু হেসে ওকে বললাম, "আমার ছ্যাকরাগাড়ি চড়তে তোর কষ্ট হবে না তো?" উত্তরে ও যেটা বলল সেটা আর লেখা যাবে না।

'সল্টলেকে প্রভাসের বাড়ি দেখে যেমন তাজ্জব হয়ে গেলাম, তেমনই অবাক হয়ে গেলাম ওর ল্যাবরেটরি দেখে। বড়লোক ওরা বরাবরই, তবে প্রভাস যে-মাপের ল্যাবরেটরি করেছে তার জন্যে লক্ষ-লক্ষ টাকা দরকার। আমাকে ল্যাব দেখাতে-দেখাতে নানা কথা বলছিল প্রভাস। ও সাতটা কোম্পানির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার। গবেষণার জন্যে সরকারি টাকাও পায়, আর সংসার করেনি গবেষণা করবে বলে। কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝেই দরাজ গলায় হেসে উঠছিল ও। একটা সুখী মানুষের প্রাণখোলা হাসি। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওর তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

'রাতের খাওয়াদাওয়া প্রভাসের বাড়িতেই করতে হল। তখন আমি নিজের কথা বলছিলাম। শোন্তার কথা, নমিতার কথাও বলেছি। শেষে বলেছি আমার দুশ্চিন্তা, টেনশান আর ক্লান্তির কথা। আমি জানি, অফিসে আড়ালে অনেকেই আমাকে বদমেজাজি, খিটখিটে বলে। না, কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি তো সাধ করে ওরকম হইনি। আমার মাথার ভেতরটা সবসময় যেন কেমন করে।

'পরে বুঝেছি, প্রভাসকে ওই কথাগুলো বলেই আমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছি। প্রভাস সিগারেট ধরিয়েছিল। ফুরফুর করে ধোঁয়া ছেড়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, "নরেশ, তোর এই প্রবলেম আমি এক্ষুনি সল্ভ করে দিতে পারি—।'

'আমি অবাক হয়ে বলেছি, "সত্যি!" '

তখন প্রভাস আমাকে বলতে শুরু করল।

"যখন আমাদের দুশ্চিন্তা, টেনশান, বদমেজাজ এসব হয়, তখন আমাদের শরীরের ভেতরে কারেন্ট বইতে থাকে। আসলে বায়োকারেন্ট থাকে সবসময়েই, কিন্তু সেটা এত কম যে, হিসেবের মধ্যেই আসে না। দুশ্চিন্তা, টেনশান এসব হলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, হার্ট বিট বেড়ে যায়, পাল্স রেটও যায় বেড়ে। এসবের মূলে হচ্ছে অটোনোমিক নার্ভস আর অটোনোমিক অরগ্যানিক স্টেট।

তো এই অবস্থায় এক অদ্ভুত ধরনের বায়োরেডিয়েশান লক্ষ করেছি আমি। সেই রেডিয়েশান আর বায়োকারেন্ট—এই দুটোকে ব্যবহার করে তোর সব প্রবলেম সল্ভ করে দেওয়া যায়।"

'প্রভাস ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়েছিল। পরে আরও বহু ডিগ্রি কুড়িয়ে খ্যাতি পেয়েছে। ওর কাছেই শুনেছি, গত পাঁচ-সাত বছর ধরে ওর গবেষণা বায়ো-পার্টিকল্স-এর স্ট্রাকচার, ফিল্ড আর রেডিয়েশান নিয়ে। ও আমাকে আরও কীসব বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। বোঝার কথাও নয়। কোনওরকমে পাস কোর্সে বিএসসি পাশ করার পর আমি কস্ট অ্যাকাউনট্যান্সি পড়েছি। এখন বলতে গেলে শুধু জমা-খরচের হিসেব নিয়েই নাড়াচাড়া করি। সুতরাং প্রভাস খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে অনেক কিছু বললেও তার বেশিরভাগটাই বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো হচ্ছিল।

'প্রভাস তখন বলছে, "শোন, তোর একটা অ্যান্টি-বায়ো-মডেল তৈরি করে দেব আমি। তার মধ্যে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা থাকবে। অ্যান্টি-বায়োকারেন্ট, অ্যান্টি-বায়োরেডিয়েশান—এইসব। ফলে যখনই তোর কোনও টেনশান বা দুশ্চিন্তা হবে, তখন ওই অ্যান্টি-বায়ো-মডেল তোর সমস্ত যিকশন শান্ত করে দেবে। এক মুহূর্তের জন্যেও তুই অশান্ত হবি না, তোর মেজাজ খারাপ হবে না কখনও। আর বালিশে মাথা ঠেকলেই গভীর ঘুম। তুই বোধহয় আর কখনও স্বপ্নও দেখবি না।"

'প্রভাস এমনভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাত নেড়ে সব বোঝাচ্ছিল যেন ব্যাপারটা জলের মতোই সহজ। আমি শুনতে-শুনতে একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। বুকের ভেতর থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে যাচ্ছিল ক্রমশ। আর ঠিক তখনই প্রভাস বলল, "নরেশ, বুঝতেই পারছিস, এতসব সুবিধে তো একেবারে বিনি পয়সায় পাওয়া যায় না...।"

'টাকার কথা বলতে চাইছে নাকি প্রভাস? টাকা যে আমার একেবারে নেই তা নয়, তবে যদি ও খুব বেশি কিছু চেয়ে বসে...। সুতরাং ওকে সরাসরি জিগ্যেস করলাম, "ঠিক করে বল তো, কত টাকা লাগবে?"

'প্রভাস হেসে বলল, "দূর, টাকার কথা কে বলছে! আমি বলতে চাইছি...মানে...তুই এতসব সুবিধে পাবি ঠিকই, তবে তার জন্যে তোকে ছোট্ট একটু ঝামেলাও ঘাড়ে নিতে হবে।"

'আমার গলাটা হঠাৎ কেমন শুকিয়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, "কী ঝামেলা?"

"বলছি—" বলে প্রভাস হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নতুন আর একটা ধরাল। বলল, "মানে...তোকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। নইলে বিপদ হতে পারে।"

'বিপদ! প্রভাস বলে কী!'

ঠিক এমনসময় মায়ের হাতের চুড়ির শব্দ শুনতে পেল শোন্তা। মায়ের স্নান শেষ। মা গুনগুন করে গান করছেন। পায়ে-পায়ে এদিকেই আসছেন বোধহয়। একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল

ও। কাগজগুলো আবার আগের মতো ভাঁজ করে রেখে দিল বাবার দরকারি বইয়ের ফাঁকে। তারপর ভূগোল বইটা খুলে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে।

মা ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিগ্যেস করলেন ‘কীরে, কী পড়ছিস?’

‘ভূগোল—’ শোন্তা বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই জবাব দিল। ওর মাথায় তখন বিপদের কথা ঘুরছিল। কীসের বিপদ হতে পারে বাবার?

প্রায় তিনটে দিন ছটফট করে কেটেছে শোন্তার। ও কিছুতেই বাবার লেখা কাগজগুলো আর পড়তে পারেনি। বাবাকে কিছু বলতেও পারেনি। শুধু চুপচাপ মানুষটাকে লক্ষ করেছে।

অবশেষে সুযোগ এল রবিবার বিকেলে। বাবা বললেন, আজ বেড়াতে বেরোবেন না। গাড়িটা কোনও মিস্ত্রিভাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে ভেতরটা প্লাস্টিক দিয়ে নাকি মুড়ে নেবেন। মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, ‘এ আবার কী খেয়াল?’

বাবা অস্পষ্টভাবে কী একটা বলে বেরিয়ে গেলেন।

আর তার একটু পরেই সুযোগ পেল শোন্তা। সুকলের পড়া তৈরি করতে একগাদা বইখাতা নিয়ে ছড়িয়ে বসল ও। তারপর বাবার লেখা কাগজগুলো খুলে আবার লুকিয়ে পড়তে শুরু করল। মাকে নিয়ে এখন আর ভাবনা নেই। মা টিভির সামনে সিনেমা দেখতে বসে গেছেন।

‘...বিপদ! প্রভাস বলে কী!’

‘আমি সাহস দেখিয়ে বললাম, “কীসের বিপদ? খুলে বল তো শুনি—” ’

‘প্রভাস আমার কথার জবাব না দিয়ে জোরে হেসে উঠল। ওর বিশাল বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে সে-হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল যেন। একটু পরে হাসি থামলে প্রভাস বলল, “নরেশ আমি দেড়বছর ধরে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্যে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এর অঙ্ক-টঙ্ক সব আমার আগেই কষা হয়ে গেছে। এখন শুধু হাতেনাতে পরখ করে দেখা বাকি। এমনই কপাল দ্যাখ, হঠাৎই আজ তোকে পেয়ে গেলাম। চল, ল্যাবে চল—।” ’

‘প্রভাস উঠে দাঁড়াল। আমাকে একরকম হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ল্যাবের দিকে। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওকে অনুসরণ করলাম। দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের লোভ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আমার ব্যবহারে শোন্তা কিংবা নমিতা এরপর আর কখনও ব্যথা পাবে না। তবুও প্রভাসের বিশাল ল্যাবরেটরিতে পা রাখার সময় কোনওরকমে বললাম, “একটু দাঁড়া। তুই যে কী একটা বিপদের কথা বলছিলি...।” ’

‘প্রভাস আমার কথায় আমল না দিয়ে বলল, “ও কিছু নয়। একটু সামলে থাকলেই হবে। আগে চল তো, কাজ শেষ করি—তারপর তোকে সব বুঝিয়ে দেব। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, একদম

সিম্‌প্‌ল।” ’

‘ল্যাবের একটা জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল প্রভাস। নানারকম বোতাম-টোতাম টিপে বেশ কয়েকটা রঙিন আলো জ্বেলে দিল। হঠাৎই দেখি আমাকে ঘিরে মেঝে ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেল চকচকে চারটে দেওয়াল। দেওয়ালের বাইরে থেকে প্রভাস চেঁচিয়ে বলল, “দেওয়ালগুলো নন্‌ম্যাগনেটিক—অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি।” তারপর ও কয়েকটা পাওয়ার সুইচ অন করে দিল। ফলে হাই পাওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড চালু হয়ে গেল, আরও কী-কী যেন হল। ক্রিকেট খেলার কমেরি মতো চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সব বলে যাচ্ছিল প্রভাস। ধীরে-ধীরে ওর গলার স্বর যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। তারপর একসময় আমার আর কিছু মনে নেই।

‘যখন আবার সব টের পেলাম, তখন প্রভাসের বসবার ঘরে সোফায় বসে আছি। আর প্রভাস আমার পিঠ চাপড়ে বলছে, “...সেরকমভাবেই চলবি। তোর আর কোনও চিন্তা নেই, নরেশ। এবার সত্যিই তুই নরেশ—মানে, রাজা। এই দুনিয়ায় তুই-ই সবচেয়ে সুখী। তবে ছোট্ট একটা ব্যাপারে তুই একটু খেয়াল রাখিস...।” প্রভাসের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। একটু থেমে-থেমে ও বলল, “তুই নিশ্চয়ই এটুকু বুঝতে পারছিস যে, তোর অ্যান্টি-বায়ো-মডেলটা অ্যান্টিম্যাটার দিয়ে তৈরি। ম্যাটারে যেমন ইলেকট্রন কণা থাকে, অ্যান্টিম্যাটারে তেমনই থাকে পজিটন। আর সাধারণ পদার্থের প্রোটনের জায়গায় অ্যান্টিম্যাটারে থাকে অ্যান্টিপ্রোটন। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরকে স্পর্শ করলেই সর্বনাশ। সাংঘাতিক বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে বিকিরিত হবে অ্যানিহিলেশন রেডিয়েশান। আর তৎক্ষণাৎ ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার—দুটোরই অস্তিত্ব শেষ। মানে তোর আর তোর মডেলের সংঘর্ষ যদি হয় তা হলে তোরা দুজনেই শেষ। তুইও থাকবি না, আর শরেনও থাকবে না—।”

‘আশ্চর্য! প্রভাসের কথা শুনে আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা হল না। বরং ওর শেষ কথাটায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, “শরেন মানে?” ’

‘ও হো-হো করে হাসল। তারপর বলল, “বুঝলি না? তোর অ্যান্টি-বায়ো-মডেলের আমি নাম রেখেছি শরেন—নরেশের ঠিক উলটো। শরেনকে দেখতে হুবহু তোর মতো—শুধু ওর দেহটা খানিকটা স্বচ্ছ...মানে অনেকটা ঘষা কাচের মতো। তবে ওর ভেতরটা তোর একেবারে উলটো—ম্যাটার, অ্যান্টিম্যাটার।” আবার হেসে উঠল প্রভাস। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ওর চোখেমুখে অহঙ্কার টগবগ করে ফুটে বেরোচ্ছে। ওর ঘরের দেওয়ালে নানা বিজ্ঞানীর ফটোগ্রাফ বাঁধানো। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাকের ফটোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল প্রভাস। আবেগভরা গলায় বলল, “অ্যান্টিপার্টিক্লের ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন পল ডিরাক ১৯৩০ সালে। তখন তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু দু-বছর পরেই মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল ডেভিড অ্যান্ডারসন পজিটন আবিষ্কার

করেন। তারপর ১৯৩৩-এ ডিরাক নোবেল পুরস্কার পান।” আমার দিকে ফিরে তাকাল প্রভাসঃ “আমার পরীক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হল শরেন। ওর কথা সবাই যখন জানবে তখন তাজ্জব হয়ে যাবে—কী বলিস? কে বলতে পারে, হয়তো নোবেল প্রাইজও জুটে যেতে পারে আমার কপালে।” ’

‘হঠাৎ করেই আমার মনে হল প্রভাসের বোধহয় মাথার ঠিক নেই। ঝোঁকের মাথায় এ-কোন ফাঁদে পা দিলাম আমি! এখন কি আর ফেরার পথ আছে? কিন্তু প্রভাসের পরীক্ষায় কোনও ভুল হয়নি। ওর মুখে এরকম বিপদের কথা শুনেও কেমন শান্ত, স্থির রয়েছি আমি। সত্যিই দুশ্চিন্তা আর টেনশান একেবারে নেই। ভীষণ হালকা লাগছে। শুধু মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। প্রভাসকে সেটা বলতেই ও বলেছে, ওটা হাই-ইনটেনসিটি ফিল্ডের জন্যে। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ওকে জিগ্যেস করলাম, “শরেন, মানে, ওই মডেলটা এখন কোথায়? সেই বুঝে আমাকে তো চলাফেরা করতে হবে।”

‘প্রভাস বলল, ‘নরেশ, সত্যি বলছি, শরেন কোথায় আছে আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, যে-মুহূর্তে আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে শরেনের জন্ম হয়েছে। আমার থিয়োরি বলছে, এই অ্যান্টি-বায়োমডেলটা তোর ঠিক দুশো কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থাকবে। আর তোর বায়োফিল্ডের টানে ওটা তোর কাছে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। অন্য কোনও মানুষ বা অন্য কোনও জিনিসের দিকে শরেনের কোনও টান থাকবে না। এক্সপেরিমেন্টের পর ঠিক কোন কো-অর্ডিনেটে শরেন অ্যাপিয়ার করবে, এটা আমার জানা নেই। থিয়োরির ওই জায়গাটা একটু ঝাপসা রয়ে গেছে। সবই স্পেস-টাইম আর ফিল্ড-রেডিয়েশানের ব্যাপার। সে যাকগে, দুশো কিলোমিটার দূরত্ব মানে প্রায় একত্রিশ হাজার চারশো বর্গকিলোমিটার এলাকা শরেনকে খুঁজতে হবে। ফলে ও চট করে তোকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তোর রেডিয়েশানের সিগন্যাল ওর অ্যানটেনায় সবসময় ধরা পড়বে।”

‘শোন্তার কথা মনে পড়ল আমার। নমিতার কথা মনে পড়ল। কেমন একটা ব্যথা টের পেলাম বুকের ভেতরে। শরেন যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পায়! ওকে ঠেকানোর কি কোনও উপায় নেই? সে-কথা প্রভাসকে জিগ্যেস করতেই ও কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে তারপর বলল, “একটা জিনিস দিয়ে শরেনকে হয়তো আটকানো যায়—তবে আমি কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি।”

“কী জিনিস?” অনেক আশা নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

“আয়োনাইজ্‌ড পলিমার—মানে, আয়োনাইজ্‌ড প্লাস্টিকও হতে পারে। কিন্তু বললাম যে, ওতে কতটা কাজ হবে ঠিক জানি না।”

'আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেমন একটা নেশার মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা সময় কেটে গেছে আমার। কোথা থেকে কী হয়ে গেল! দুশ্চিন্তা, টেনশান, ক্লান্তি, খিটখিটে রুক্ষ স্বভাব হয়তো আমার আর থাকবে না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মনের মধ্যে এক অসহায় ভয় বাসা বেঁধেছে। আর বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত কষ্ট। নমিতা যদি এসব জানত! আমার ক্লাস সেভেনে পড়া ছোট্ট মেয়েটা যদি এসব জানত! তা হলে ওরা বোধহয় আগের খিটখিটে মানুষটাকেই মেনে নিত।

'প্রভাসের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ও বলল, "তোর দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন সুখের হোক।" '

'আমি কোনও জবাব দিলাম না, পেছন ফিরেও তাকালাম না। গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম বাড়ির দিকে।'

'ফেরার পথে একটা মানুষকে আমার চোখ খুঁজে বেড়াল। শরেন, তুই কোথায়?'

পড়তে-পড়তে শোন্তা থামল। বাবার লেখা ও সবটা যে বুঝতে পারছে তা নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের জায়গাগুলো বেশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলেও বাবার কষ্ট বুঝতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এখন ও বুঝতে পারছে, কেন বাবা গাড়িটাকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়তে চাইছেন। ওই প্লাস্টিকটা নিশ্চয়ই আয়োনাইজ্‌ড প্লাস্টিক।

এর পরের লেখাগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া। স্কুলের পড়া ভুলে সেই লেখাগুলো পড়তে লাগল শোন্তা।

...'শরেনকে আমি দেখতে পেয়েছি! গত পরশু সন্ধেবেলা রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে একটা বস্তিতে ঢোকার মুখে হঠাৎই শরেনকে দেখতে পেলাম। একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্বিকার হবে না কেন? ওর যে শুধু একটাই কাজ—আমাকে খুঁজে বের করা।

'বাথরুমের কলটা সারানোর জন্যে কলের মিস্ত্রিকে খবর দিতেই ওই বস্তিটায় ঢুকেছিলাম আমি। আর প্রভাসের এক্সপেরিমেন্ট, শরেন, অ্যান্টি-বায়ো-মডেল—এসবের কথা ভাবছিলাম। এমন সময় ওকে দেখতে পেলাম।

'প্রভাস ঠিকই বলেছিল, ওকে হুবহু আমারই মতো দেখতে। গায়ে কালো জামা আর কালো প্যান্ট। আধো-অন্ধকারে অন্তত তাই মনে হল। আর সবচেয়ে ভয় পাইয়ে দেয় ওর মুখ। সে-মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। যেন পাথর কেটে তৈরি এক মরা মানুষের মুখ। বরফের মতো ঠান্ডা।

'আমাকে দেখতে পেয়েই শরেনের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল বলে মনে হল। ও পা বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল আমার দিকে। লাইটপোস্টের আলোয় ওর হাসিটা ব্যঙ্গের অথবা তাচ্ছিল্যের হাসি বলে চিনতে পারলাম। আর তারপরই আমি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম।

ছুটতে-ছুটতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি শরেনও এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওর মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন হয়নি! এখনও পাথর আর বরফ। আমি ভাবছি...।'

'...শরেনকে আবার দেখলাম। রবিবার, সন্ধের মুখে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছে। নমিতা আর শোন্তাকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ছুটে যাওয়া গাড়িঘোড়ার মধ্যে দিয়েই রাস্তা পার হয়ে শরেন আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। সামান্য যেটুকু সময় ওর দিকে তাকিয়েছি তাতেই লক্ষ করেছি, প্রভাস মিথ্যে বলেনি। শরেনের শরীর খানিকটা স্বচ্ছ। কারণ, ওর ঠিক পিছনে দাঁড়ানো একটা লোককে আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি চট করে নমিতা আর শোন্তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইলাম। ওরা অবাক হয়ে আমাকে অনেক কথা জিগ্যেস করছিল, কিন্তু আমি কোনও জবাব না দিয়ে সংক্ষেপে শুধু বলেছি, পরে বলব। তারপর তাড়াতাড়ি সরে পড়েছি সেখান থেকে। আমার বুকের ভেতরে হাপর টানার শব্দ হচ্ছিল।'

শোন্তার স্পষ্ট মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র দু-সপ্তাহ আগে, রবিবারেই হয়েছিল এই ব্যাপারটা। কেনাকাটা শেষ না করে আচমকা চলে আসার জন্য মা কম ঝগড়া করেননি বাবার সঙ্গে। আর শোন্তাও রাগ করে পুরো একটা দিন বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। সোমবার রাতে বিছানায় শুয়ে বাবা বড় একটা শ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'একদিন তোরা সব বুঝতে পারবি।'—আজ সেই কারণটা জানতে পেরে শোন্তার কষ্ট হল। আর রাগ হল বাবার বন্ধুর ওপর।

ও খাপছাড়া লেখাগুলো আবার পড়তে শুরু করল।

'...প্রভাসের কাছে আমি অনেকবার ছুটে গেছি মুক্তির আশায়, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ও শুধু বলেছে, "একবার যদি তুই শরেনের চোখে ধুলো দিতে পারিস, তা হলে ওর পুরোনো স্মৃতি সব মুছে যাবে। ও আবার নতুন করে একতিরিশ হাজার চারশো বর্গকিলোমিটার এলাকায় তোকে খুঁজতে শুরু করবে। তবে চিন্তা করিস না। আমি অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করছি। ওটা সাকসেসফুল হলে বোধহয় তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারব—" আমার কেমন মনে হচ্ছিল, প্রভাস আমার কাছে সব সত্যি কথা খুলে বলছে না।'

'তারপর থেকে আর মিথ্যে আশা নিয়ে প্রভাসের কাছে ছুটে যাইনি।'

শরেনের দেখা পেলেই ওর চোখে ধুলো দিয়ে শুধু নিজের আয়ু বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এভাবে আর কতদিন! প্রভাস বলেছিল আয়োনাইজ্‌ড প্লাস্টিকের কথা। সেটা জোগাড় করার জন্যেও কম চেষ্টা করিনি, কিন্তু কোনও খোঁজ পাইনি।

'শোন্তাকে, শোন্তার মাকে, আমি এত ভালোবাসি যে, ওদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে...।'

শোন্তাকে ছোটবেলায় বাবা প্রায়ই জিগ্যেস করতেন, 'আমাকে তুই কতটা ভালোবাসিস রে?'

উত্তরে শোন্তা ওর ছোট-ছোট দুটো হাত দুপাশে টান-টান করে বলত, 'এই এত্তখানি।'এখন, এই মুহূর্তে ওর মনে হল, ওর হাত দুটো খুব ছোট। বাবাকে ও এত ভালোবাসে যে, ওই দুটো হাত টান-টান লম্বা করেও সেই ভালোবাসার এতটুকুও বোঝানো সম্ভব নয়। ওর হাত দুটো যদি ভগবানের হাতের মতো লম্বা হতো!

'অনেক কষ্টে আয়োনাইজ্‌ড প্লাস্টিকের সন্ধান পেয়েছি। একজন মেকানিককে ধরেছি, সে প্লাস্টিক দিয়ে গাড়ির ভেতরটা মুড়ে দেবে। তারপর কোনও টেলারিং-এর দোকান থেকে ওই প্লাস্টিকের একটা জামা-প্যান্ট তৈরি করে নেব।

'দেখি, পারলে কালই গাড়িটা নিয়ে যাব মেকানিকের কাছে...।'

বাবার লেখা এখানেই শেষ। মানুষটার কষ্ট, মানুষটার বারবার পালটে যাওয়া—সবকিছু এখন বুঝতে পারছিল শোন্তা। কিন্তু কী করবে ও এখন? বলবে মাকে? নাকি...।

ক্রি রি রিং, ক্রি রি রিং...।

টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের ভেতরে।

শোন্তা চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। মা ও-ঘরে টিভি দেখছেন। নিশ্চয়ই ফোনের বাজনা শুনতে পাননি।

'হ্যালো—।'

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর নেই।

তারপর ও-প্রান্ত থেকে ভাঙা-ভাঙা গলায় কেউ জিগ্যেস করল, 'এটা নরেশ দত্তর বাড়ি?'

শোন্তা চটপট জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বলুন—।'

'নরেশবাবু বাড়ি আছেন?'

'না, উনি একটু বেরিয়েছেন। আপনি কে কথা বলছেন?' বাবা বাড়িতে থাকলে শোন্তা কখনও এ-প্রশ্ন করে না। সেটা নাকি অভদ্রতা।

'তুমি কে বলছ?' ও-প্রান্তের আড়ষ্ট গলা পালটা প্রশ্ন করল।

শোন্তার খুব রাগ হল। কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি ওনার মেয়ে। আপনি কে বলছেন?'

আবার পালটা প্রশ্নঃ 'তোমার বাবা কখন বাড়ি ফিরবেন?'

শোন্তা কোনওরকমে বিরক্তি চেপে বলল, 'ঘণ্টাখানেক পরে ফিরতে পারেন।'

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর যেন আপনমনেই বিড়বিড় করল, 'তা হলে তো অনেক সময়...।'

'উনি ফিরলে কি কিছু বলতে হবে?' শোন্তা জিগ্যেস করল।

'নাঃ, তার দরকার নেই, আমি দেখা করে নেব।'

'কিন্তু আপনার নাম বললে ভালো হতো। বাবা ফিরলেই খবরটা দিতাম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর বলল, 'শুধু বোলো, শরেন দত্ত ফোন করেছিল। এটা বললেই তোমার বাবা সব বুঝতে পারবেন।'

ফোনের লাইন কেটে গেল।

শোন্তার হাত কাঁপতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল। লোকটা বলেছে, "...আমি দেখা করে নেব।"

রিসিভার রেখে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগল।

মা ছুটে এলেন টিভি ছেড়ে। শোন্তা মাকে নিয়ে দৌড়ে গেল বারান্দায়। তাকাল রাস্তার মোড়ের দিকে। ওই পথ ধরেই গাড়ি নিয়ে ফিরবেন বাবা। ফিরবেন তো?

কয়েক মিনিট পরেই বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দটা ওরা বারান্দা থেকেই শুনতে পেল। আগুন আর কালো ধোঁয়ার মেঘও দেখা গেল। ঝুলবারান্দা কেঁপে উঠল থরথর করে।

আয়োনাইজ্ড প্লাস্টিক শরেনকে আটকাতে পারেনি।



মোনালিসার নতুন বন্ধু

আজ একজন নতুন বন্ধু মোনালিসার বাড়িতে এসেছে। এই নতুন বন্ধুটা খুব ভালো। কখ্খনও ঝগড়া করে না, আড়ি করে না। এরকম একটা ভালোমানুষ নতুন বন্ধুই তো চেয়েছিল মোনালিসা। এরকম বন্ধু আর কারও নেই। শানু, তোতা, রুবি, বাবাই কারও নেই।

ছাদের কোণে বসে মোনালিসা ওর নতুন বন্ধুর সঙ্গে রান্নাবাটি খেলছিল আর নানান গল্প করছিল। তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। ছাদের পাশেই উঁকি মারছে তিনটে তালগাছ। মোনালিসার রান্নাবাটি খেলা দেখছে। গাছের পাতার জাফরির ফাঁক দিয়ে সূর্যের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। তাই সূয্যিমামাও খেলাধুলোর পাট সেরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তারপরই বইখাতা নিয়ে পড়তে বসবে হয়তো।

মোনালিসার নতুন বন্ধুর নাম রবি। কী ফুটফুটে দেখতে! কী ভালো-ভালো কথা বলে! আবার কান পেতে মনোযোগ দিয়ে মোনালিসার সব কথা শোনে। রবি খুব ভালো। কখ্খনও ঝগড়া করে না। তাই ওকে নিয়েই পড়াশোনা করতে বসে মোনালিসা। মাকে বলেছে, ‘রবির সঙ্গেই আমাকে খেতে দেবে। আর ও আমার কাছেই ঘুমোবে।’

সত্যি, রবি আসার পর মা আর বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নইলে রোজই তো শুনতে হয় মেয়ের নালিশঃ ‘বাপি, তোতা ওর বলটা আমাকে খেলতে দিচ্ছে না। ওকে বকে দাও না।’ অথবা কখনও এসে বলে, ‘মা, মা, জানো বাবাইটা কী খারাপ ছেলে! আমি একটা কী চমৎকার রাখি ওকে দিয়েছি, আর বলে কিনা পচা রাখি! আমি ওর সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি।’

মা আর কী বলবেন! বাবা আড়ালে মুখ টিপে হাসেন। সাত বছরের এইটুকু মেয়ের এত ঝগড়া এত নালিশ! মায়ের আর ভালো লাগে না। বাবাকে বলেন, ‘কী করবে করো। দেখবে, তোমার মেয়ে বড় হয়ে ভীষণ ঝগড়ুটে হবে।’

বাবা তাতে আরও হাসেন। হাসতে-হাসতে চোখের চশমা খুলে যেতে চায়।

মা যখন পুঁচকে মেয়েটাকে বকুনি দিয়ে বলেন, 'কী রে, তুই সবার সঙ্গে রোজ-রোজ ঝগড়া করিস কেন রে!'

মোনালিসা হাত-পা নেড়ে চোখ পাকিয়ে বলে, 'বা রে, আমি ঝগড়া করি নাকি! শানু, তোতা, ওরাই তো ঝগড়া করে। বারবার আড়ি করে, ঝগড়া করে।'

মা গালফোলা মেয়েটাকে দেখেন। চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন অভিমানী মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন মা। চুমু দেন মাথায়। বলেন, 'তুই রোজ বিকেলে খেলতেও বেরোবি, আবার এসে নালিশও করবি। কী যে করি!'

তখন মোনালিসা বলেছে, 'আমি আর খেলতে বেরোব না, বাড়িতে বসে একা-একা খেলব।'

সত্যি তাই করল মেয়েটা। পরপর দুটো দিন একদম বেরোল না বাড়ি ছেড়ে। তাই দেখে মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বাবাকে বললেন, 'কিছু একটা করো। মেয়েটা যে ঘরকুনো হয়ে গেল। বাড়িতে বসে একা-একা কখনও খেলতে পারে!'

'এই ব্যাপার?' বাবা আবার হেসেছেন। তারপর বলেছেন, 'তা হলে দ্যাখো এবার কী করি!'

ব্যস। পরদিন বাবা কোথা থেকে যেন কিনে এনেছেন রবিকে। বাচ্চাদের খেলার সাথি বাচ্চা রোবট। যন্ত্রের খেলনা, কিন্তু দেখতে অবিকল মানুষের মতন। মাথায় চকচকে কালো চুল। টকটক করে কথা বলে। বড়-বড় চোখে এদিকে-ওদিকে তাকায়। কী সুন্দর করে হাসে! নাম রবি।

এইভাবেই ওদের বাড়িতে এসেছে রবি। তারপর এক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেছে মোনালিসার নতুন বন্ধু।

নতুন বন্ধুর সঙ্গে মোনালিসার কোনও ঝগড়া নেই, কোনও আড়ি নেই। কারণ রবি কখ্খনও মোনালিসার সঙ্গে তর্ক করে না, ওর কাছ থেকে কোনও খেলনা কেড়ে নেয় না, ওর নামে নালিশও করে না। ওরা দুজনে ঘরে, কিংবা বারান্দায়, অথবা ছাদে খেলা করে। ছুটোছুটি করে, লুকোচুরি খেলে, এক্কা-দোক্কা বা ইকড়িমিকড়ি খেলে।

ওদের মিল দেখে বাবা-মা খুব খুশি। বাবা মাকে বলেন, 'দেখলে তো, কেমন ম্যাজিক দেখিয়ে দিলাম!'

মা হেসে উত্তর দেন, 'সত্যি, এরকম মিল! না দেখলে বিশ্বাসই হতো না কখনও।'

এইভাবেই দিন যাচ্ছিল বেশ। হঠাৎ একদিন বাবা দেখলেন, মোনালিসা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আর রবি একটু দূরে বসে লুডোর ছক পেতে বন্ধুকে ডাকছে, 'কী হল মোনালিসা, খেলবে এসো।'

বাবা চলে এলেন মেয়ের কাছে। জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, কী হয়েছে?'

মোনালিসা বাবার দিকে না তাকিয়েই বলল, ‘রবির সঙ্গে আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না, বাপি।’

‘কেন রে? রবি ঝগড়া করেছে?’

‘না। ও কখ্খনও ঝগড়া করে না।’ মোনালিসা গম্ভীরভাবে বলল।

‘ও, তা হলে বুঝি আড়ি করে দিয়েছে তোর সঙ্গে?’

‘না, ও কখ্খনও আড়ি করে না।’

বাবা এবারে হেসে ফেললেন, বললেন, ‘তা হলে ভালোই তো। মন খারাপের কী হল?’

মোনালিসা বাবার দিকে তাকাল। বলল, ‘আমি শানু, বাবাই, তোতা ওদের সঙ্গে খেলব, বাপি। রবির সঙ্গে খেলতে আমার বিচ্ছিরি লাগে—।’

এমন সময় মা এসে পড়েছিলেন বারান্দায়। শুনতে পেয়েছেন মেয়ের শেষ কথাটা। আর ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন। রবির সঙ্গে খেলতে ভালো লাগছে না!

মা আর বাবা অবাক হয়ে মেয়েকে দেখছিলেন। গায়ে ফুটফুটে লাল ফ্রক, মাথার চুলে জোড়া বিনুনি, তাতে লাল ফিতের ফুল। শুধু ফরসা মুখটা হাসিখুশি হলেই বেশ মানাত।

সন্ধে এখনও নামেনি। নীচের গলিতে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে কুমিরডাঙা খেলছে। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল। আর তার সঙ্গে আরও নানান রং। কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। সবই ভালো, শুধু মোনালিসার মুখে হাসি নেই।

মা এবার বললেন, ‘রবি তো কখনও তোর সঙ্গে ঝগড়া করে না, আড়ি করে না! তা হলে ওর সঙ্গে খেলতে তোর বিচ্ছিরি লাগছে কেন!’

মোনালিসা আর থাকতে পারল না। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে দিল। চাপা গলায় বলল, ‘রবি ঝগড়া করে না, আড়ি করে না। তাই কখনও ভাবও করে না আমার সঙ্গে। তুমিই বলো মা, আড়ি না হলে ভাব হবে কেমন করে? আর ঝগড়া না হলে আড়ি হবে কেমন করে? আমি শানু, বাবাইদের সঙ্গে খেলব কাল থেকে।’

মা হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের মাথায়। তারপর তাকালেন বাবার দিকে। বাবা হেসে বললেন, ‘ও ঠিকই বলেছে, বুঝলে। আড়ি না হলে কি কেউ বুঝতে পারে ভাব করতে কী দারুণ ভালো লাগে!’

মা বললেন, ‘তুমি রবিকে কালই দোকানে ফেরত দিয়ে এসো। ভাব করতে জানে না এমন বন্ধু আমাদের দরকার নেই।’

সত্যিই তো, যে-বন্ধু ভাব করতে জানে না সে আবার বন্ধু কীসের!



শিলাবৃষ্টির শরবত

ভর দুপুর। বাইরের গনগনে রোদ্দুর থেকে ঘরে ঢুকেই বিশ্বকাকু হাঁক ছাড়লঃ ‘বাবান-মৌ, শিগগির এক গেলাস শরবত নিয়ে আয়!’ বলেই বসবার ঘরের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ল।

ইস্কুলের পরীক্ষা শেষ, গরমের ছুটি পড়ে গেছে। তাই বাবান-মৌ দুজনেরই পুরোপুরি ছুটি এখন। বাবান দিনরাত ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে শ্যাডো-প্র্যাকটিস করছে, আর মৌ গল্পের বইয়ে মুখ গুঁজে চব্বিশ ঘণ্টা। শুধু টিভি-তে ভালো কিছু থাকলে দুজনে সেই ইলেকট্রনিক বাক্সের সামনে স্ট্যাচু।

মা পাশের ঘরে শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। সেখান থেকেই বলল, ‘এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে কোথায় বেরিয়েছিলে, ঠাকুরপো?’

বিশ্বকাকু লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘কী করব, বউদি, আমার কি আর ছুটি আছে! বেরিয়েছিলাম গরম মাপতে—।’

মা অবাক হয়ে বলল, ‘গরম মাপতে! সে আবার কেমন করে মাপে?’

এমন সময় বাবান-মৌ দুজনেই ঘরে এসে ঢুকল। মৌ-এর হাতে আধখোলা গল্পের বই, আর বাবানের হাতে একগ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ। ঠান্ডা গ্লাসের গায়ে বাষ্প জমে রয়েছে।

‘কাকু, তুমি গরম মাপার কথা কী বলছিলে?’ বাবানের কানে এড়ায়নি কথাটা। এবারে ও ক্লাস সেভেনে উঠেছে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির হাতেখড়ি হবে নতুন ক্লাসে, গরমের ছুটির পরে! আর মৌ উঠল সবে ফাইভে। কিন্তু এর মধ্যেই এনিড ব্লাইটন আর অ্যালফ্রেড হিচককের বইয়ের পোকা। বিশ্বকাকুর কথাটা দুজনকেই কৌতূহলী করেছে। ওরা দেখল, সামনের ঘরে মা-ও উঠে বসেছে বিছানায়, হাত ঘুরিয়ে এলোখোঁপা বেঁধে নিচ্ছে। খবরের কাগজ রেখে দিয়ে এখন এদিকেই তাকিয়ে।

বিশ্বকাকু যখন-তখন হুটহাট করে এসে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব গল্প শোনায় বাবান-মৌকে। সেগুলো সত্যি কি মিথ্যে কে জানে! কখনও বলে 'সাইলেন্ট ভ্যালি থেকে ঘুরে এলাম।' আবার কখনও শোনায় 'কালাহারির রিসার্চ ক্যাম্প থেকে আমাকে কল করেছে গরম মাপার জন্যে।'

মৌ জিগ্যেস করল, 'কাকু, গরম মাপে কেমন করে?'

বিশ্বকাকু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'গরম মাপে শিলাবৃষ্টির শিল দিয়ে।'

বাবান অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! কেমন করে?'

বিশ্বকাকু হাতের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল, 'শিলগুলোকে খুব সাবধানে ভ্যাকুয়াম প্যাক করে প্রথমে প্রিজার্ভ করতে হয়, বুঝলি? তারপর গরম মাপার সময়ে সেগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে, প্যাকেট ছিঁড়ে, প্লেটে করে রেখে দিতে হয় ছায়াতে। সরাসরি রোদ্দুর লাগলে কিন্তু মাপে ভুল হয়ে যাবে। বরফের শিলগুলো গলে জল হতে যে সময় লাগে, সেটাই হল গরমের মাপকাঠি।'

মা অবাক হয়ে বলল, 'এরকম তো কখনও শুনিনি?'

বিশ্বকাকু হেসে বলল, 'দুনিয়ার সব জিনিস সবাইকে সবসময় শুনতেই হবে এমন কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, বউদি! তুমি কি ক্যাঙটার্কটিকা নামে অ্যান্টার্কটিকার একরকম ক্যাঙারুর নাম শুনেছ? জানো, প্রজাপতিরা সাবসনিক শিস দিতে পারে? উপনিষদে বংশনির্বংশ নামে একরকম পারমাণবিক বোমার উল্লেখ আছে, তা আগে কখনও শুনেছ?'

এসব কথায় মা কীরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বাবান-মৌ একবার বিশ্বকাকু আর একবার মা-কে দেখছিল।

স্কোয়াশের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বিশ্বকাকু আবার বলতে শুরু করল, 'এখন কলকাতায় গরম মাত্র চার মিনিট। অবশ্য শিলগুলো ভালো করে প্রিজার্ভ করার টেকনিক এখানকার সায়েনটিস্টরা এখনও রপ্ত করতে পারেনি।'

মৌ বলল, 'কাকু ক'দিন আগে দেখেছ, কাগজে দিয়েছিল চায়নায় সাঙ্ঘাতিক শিলাবৃষ্টি হয়েছে! এক-একটা শিলের ওজন প্রায় পাঁচ কেজি! বেশ কয়েকজন লোকও মারা গিয়েছে শিলের ঘায়ে।'

বিশ্বকাকু গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখেছি। তবে যারা মারা গেছে তাদের ডেথ ততটা পেইনফুল হয়নি। চোখের নিমেষে মর্ত্য থেকে স্বর্গে চলে গেছে। শিলের ঠ্যালায় আমার যা একবার অবস্থা হয়েছিল! জানিস, এইরকম এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেতে গিয়েই একেবারে যমরাজকে কল করে বসেছিলাম। সোজা সাহারার বুকে সমাধি হয়ে যেত। আমাকে কি আজকে আর দেখতে পেতিস!'

মায়ের চোখ কপালে। বাবান-মৌয়েরও তাই। সাহারার বুকে সমাধি? কাকু বলে কী! শিল, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, পেইনফুল ডেথ—ওদের সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

একটু চেপে ধরতেই বিশ্বকাকু রহস্য খোলসা করে বলতে শুরু করল। মাঝে-মাঝে চলতে লাগল শরবতে চুমুক।

'সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ারের ঠিক পরের বছরের ঘটনা। একটা স্পেশালিস্ট টিম নিয়ে সাহারায় গরম মাপতে গেছি। উদ্দেশ্য, গোটা সাহারার গরমের একটা ম্যাপ তৈরি করা। তারপর সেখানে কৃত্রিম আবহাওয়া-পরিবেশ তৈরি করে চাষবাসের সম্ভাবনা চেক করে দেখা। আমাদের সঙ্গে ছিল কয়েক শো ভ্যাকুয়াম প্যাকেট ভরতি শিল—নুন আর বরফের মিক্সচারে ঠেসে প্যাক করে রেখেছিলাম। নুন আর বরফ মেশালে মিক্সচারের মেলটিং পয়েন্ট মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায় জানিস তো! যাই হোক, দলবল মালপত্র নিয়ে আমরা আলজিরিয়া দিয়ে সাহারায় ঢুকে পড়লাম।

'কিছুদিন আগেই আলজিরিয়াতে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। একমাস দারুণ গুমোট চলার পর হঠাৎই একদিন বজ্রবিদ্যুৎ এবং শিলাবৃষ্টি। মাত্র পাঁচ মিনিট সেই বৃষ্টি চলেছিল—তারপরেই ঝপ করে শেষ। আকাশ থেকে যে-শিলগুলো পড়েছিল সেগুলো চিন দেশের মতো অত প্রকাণ্ড তো নয়ই, বরং সাধারণ মাপের চেয়েও ছোট। ঠিক মটরদানার সাইজ। আলজিরিয়ায় ওই সময়ে যে শিলাবৃষ্টি হবে, সে-প্রেডিকশান আগে থেকেই ছিল। সুতরাং আমরা তৈরি ছিলাম। বৃষ্টি শুরু হতেই আমাদের শিল কালেকশান স্টার্ট হয়ে গেল। আর তার সঙ্গে বিদ্যুৎগতির ভ্যাকুয়াম প্যাকিং। দশ মিনিটেই কাজ শেষ। তারপর সাতদিন রেস্ট এবং প্রিপারেশান নিয়ে অভিযান শুরু। চলো সাহারা—।

'সাহারায় গরম মাপার কাজ নির্বিঘ্নে চলতে লাগল—।'

বাবান বাধা দিয়ে বলল, 'গরম মাপতে তো ছায়া লাগে বললে। সাহারা মরুভূমিতে ছায়া পেলে কোথায়, কাকু?'

বিশ্বকাকু আদর করে ওর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, 'তুই একেবারে চাইলডিশ প্রশ্ন করলি। মহেন্দ্র দত্তের ছাতার নাম শুনিসনি!'

'দাদাটা কিচ্ছু জানে না।' মৌ মন্তব্য করল।

মা আগ্রহ ভরা সুরে বলল, 'তারপর কী হল, ঠাকুরপো?'

'তা আমি তো গরম মেপে চলেছি। টিমের চিফ যেমন যেমন বলছেন অক্ষরে-অক্ষরে তাঁর কথা পালন করে যাচ্ছি। এসব এক্সপিডিশানে ডিসিপ্লিনই হচ্ছে আসল, বুঝলি? কিন্তু শেষপর্যন্ত চিফের কথা অমান্য করেই আমার হল বিপদ—।'

‘কীসের বিপদ কাকু?’ বাবান-মৌ একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

‘শরবত খাওয়ার বিপদ!’ বলে বিশ্বকাকু শরবতের গ্লাসটা এক লম্বা চুমুকে খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল। তারপর আবার শুরু করলঃ ‘একদিন কাজের সময় প্রচণ্ড তেষ্টা পেল, বুঝলি। কোমরের ওয়াটার বটল-এ ঝাঁকুনি মেরে দেখি জল অল্প রয়েছে। আমাদের সঙ্গে ভিটামিন মেশানো অরেঞ্জ স্কোয়াশ ট্যাবলেট থাকত। এক গেলাস জলে একটা ট্যাবলেট দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করলেই শরবত তৈরি। সেইরকম একটা ট্যাবলেট হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে ওয়াটার বটল-এর জলে ফেলে দিলাম। জল তখন ভীষণ গরম। কারণ সাহারায় সে সময়ে আট সেকেন্ড গরম চলছে। শরবত তৈরি হওয়ার পর মাথায় কী দুর্বুদ্ধি চাপল, ফ্রিজিং মিক্সচার থেকে দু-প্যাকেট শিল খুলে নিয়ে চুপি-চুপি ঢেলে দিলাম জলের বোতলে।

‘আমাদের টিমের চিফ খুব কড়া। তাঁর স্ট্রিক্ট অর্ডার ছিল শিল কিংবা শিল গলা জল কেউ যেন কখনও না খায়। কারণ সমস্ত এক্সপেরিমেন্টের জিনিস। তবে কারও প্রাণসংশয় হলে অন্য কথা।’

‘কিন্তু কাকু, গরম মাপার পর প্লেটে যে-জল পড়ে থাকে সেটা তো তুমি খেতে পারতে—।’ মৌ বলল কথাটা।

বিশ্বকাকু হাসলঃ ‘গরম তো মাপিসনি কখনও, কী করে জানবি? গরম মাপার সময়ে প্লেটের শিল একটুখানি গলে জল হওয়ামাত্রই আমরা সেই জলটুকু ফেলে দিতাম বালিতে। তা না হলে জল আর বরফ মিশে গিয়ে শেষ দিকে কারেক্ট টাইম মাপায় গোলমাল হয়ে যাবে যে! সে যাই হোক, জলের বোতলে বারকয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে চিফকে লুকিয়ে সেই শরবত ঢেলে দিলাম মুখে। আর প্রাণ জুড়োবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ ফুরোবার জোগাড়!’

‘কেন? কেন?’ বাবান তড়িঘড়ি প্রশ্ন করল।

বিশ্বকাকু করুণ মুখ করে বলল, ‘শরবতের সঙ্গে কয়েকটা বরফের কুচিও যেন মুখে টের পেয়েছিলাম। আনন্দে যেই না তাতে কামড় বসিয়েছি অমনি ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কিরমির করে উঠেছে। দুটো দাঁত পড়ে গেছে তৎক্ষণাৎ। আর যন্ত্রণায় সাহারায় সর্ষে ফুল দেখে একেবারে সেন্সলেস হয়ে গেলাম। সে যে কী পেইনফুল, কী বলব! তার তুলনায় চিনের শিলাবৃষ্টি তো সুইট ডেথ।

‘জ্ঞান ফিরতেই দেখি দলের তিন-চার জন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওদেরই কেউ হয়তো আমার মুখে চোখে জল দিয়েছে। হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে আর একজন। চিফ বললেন, “বিশ্ব, কী ব্যাপার?” আমি কোনওরকমে উঠে বসলাম। আমার মুখে তখনও কয়েকটা বরফের কুচি খোঁচা মারছে। কোনও জবাব না দিয়ে মুখ থেকে তিনটে কুচি বের করলাম। সর্ষের মতো ছোট্ট তিনটে দানা আমার হাতের তালুর ওপরে হিরের মতো ঝকঝক করতে লাগল।

'আমাদের দলে একজন মণিরত্ন বিশেষজ্ঞ ছিল। তার কেমন সন্দেহ হতেই আতসকাচ নিয়ে চট করে ঝুঁকে পড়ল আমার হাতের ওপর। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সে চিৎকার করে উঠল, "ও মাই গুডনেস! ডায়মন্ড! রিয়েল ডায়মন্ড!" চিফসমেত দলের বাকি সবাই তো হতভম্ব। আর আমি স্রেফ হাঁ হয়ে বসে আছি। হিরে! শিলের মধ্যে হিরে এল কোত্থেকে?

'চিফ প্রশ্ন করতেই কিচ্ছু না লুকিয়ে সমস্ত খুলে বললাম। বললাম শিলাবৃষ্টির শরবতের কথা। তখন তিনি গম্ভীরভাবে নিজের মাথায় কয়েকটা টোকা মারলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "শিলের মধ্যে ডায়মন্ড পারক্ল্...আলজিরিয়া...পলিউশান...কার্বন পারক্ল্...বজ্র-বিদ্যুৎ...হাই টেম্পারেচার...তারপর হঠাৎ ঠান্ডা...হুঁ, বুঝেছি।"

'আপনমনে কথা বলা শেষ করে চিফ আমার হাত থেকে হিরের টুকরোগুলো নিয়ে একটা খামে সিল করলেন। তারপর বললেন, "প্যাক আপ। আমরা আলজিরিয়ায় ফিরে যাব। এরকম একটা যুগান্তকারী ঘটনা নিয়ে সেখানে এখুনি সরকারি মিটিংয়ে বসতে হবে। আর শিলের প্যাকেটগুলো খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। একটিও যেন না হারায়। কপাল যদি ভালো হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে এখন লক্ষ-লক্ষ টাকার হিরে রয়েছে।"

'ব্যস। আমরা এক্সপিডিশান ছেড়ে ফিরে এলাম।' বিশ্বকাকু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছি সে-যাত্রায়।'

বিশ্বকাকুকে চুপ করে যেতে দেখে বাবান আর থাকতে পারল না। বলল, 'কী করে হিরের দানাগুলো তৈরি হয়েছিল, কাকু?'

মা জিগ্যেস করল, 'আলজিরিয়ায় এসে শিলগুলো ভেঙে আর হিরে পেয়েছিলে তোমরা?'

বিশ্বকাকু হাত নেড়ে বলল, 'বলছি, সব বলছি।...না বউদি, আর একটি কণাও হিরে পাইনি আমরা। তবে ওই তিনটে হিরের কুচি আলজিরিয়ার মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল আমার ফটো—ছিল কেন, আজও আছে।' এবার বাবানের দিকে ফিরল বিশ্বকাকুঃ 'ওই হিরেগুলো তৈরি হয়েছিল কেমন করে জানিস? ময়সাঁ মেথডে—।'

'ময়সাঁ মেথড?' বাবান অবাক হয়ে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, ফরাসি রসায়নবিদ ফার্দিনান্দ ফ্রেদরিক অ'রি ময়সাঁ। ময়সাঁ বুঝতে পেরেছিলেন কাঠকয়লা বা কয়লার কণাকে খুব হাই টেম্পারেচারে গরম করে প্রচণ্ড চাপ দিলে হিরে পাওয়া সম্ভব। তাঁর চেষ্টার বাষট্টি বছর পরে আমেরিকার পদার্থবিজ্ঞানী পার্সি উইলিয়ামস ব্রিজম্যান নকল হিরে তৈরি করার ব্যাপারে সাকসেসফুল হন। ব্রিজম্যান নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। তা আলজিরিয়ায় কী হয়েছিল শোন। ওখানে তখন নতুন কিছু ফ্যাক্টরি বসেছিল। সেখান থেকে খুব কালো ধোঁয়া বেরোত। এয়ার পলিউশান আর কী! জানিস তো, কালো ধোঁয়ার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম কার্বন পার্টিক্ল্

থাকে। সেগুলো ভেসে-ভেসে উড়ে গিয়েছিল আলজিরিয়ার আকাশে। সেখানে বজ্র-বিদ্যুতের পাল্লায় পড়ে সেগুলো পৌঁছে গিয়েছিল হাই টেম্পারেচারে। তারপর জলদ মেঘে ঢুকে পড়ে। সেখানে হঠাৎ চাপ কমে গিয়ে পরিবেশ খুব ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন ওই হাই টেম্পারেচার থেকে কার্বন পার্টিক্‌ল্‌গুলো হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে পড়ায় ওদের শরীরে সঙ্কোচনের জন্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে তৈরি হয়ে যায় হিরের দানা। আর তাদের ঘিরে মেঘের জলকণা হঠাৎ জমে গিয়ে সোজা বরফের শিল। যেমন করে শিলাবৃষ্টি হয় আর কী! তারপর...যাকগে, অতশত টেকনিক্যাল ব্যাপার তোরা বুঝবি না।'

গল্প শেষ করে বিশ্বকাকু হাঁফ ছাড়ল। তারপর বলল, 'মৌ, ঝটপট আর এক গেলাস স্কোয়াশ। গরমে ছাতি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। চিফের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। নতুন একটা এক্সপিডিশান সামনের মাসে শুরু হবে, আমাকেও নিতে চায়। চিফ এখন নামজাদা লোক। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ডাক পাওয়াটাই রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার।'

মৌ উঠল শরবত নিয়ে আসতে। বাবান গালে হাত দিয়ে বসে। মা জিগ্যেস করল, 'ঠাকুরপো, তোমার ওই নামজাদা চিফের নাম জানতে পারি?'

বিশ্বকাকু গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি নন-টেকনিক্যাল লোক বউদি, নাম শুনলে কি চিনতে পারবে! চিফের ভালো নাম ঘনশ্যাম দাস, আমি ঘনাদা বলে ডাকি।'



বাবা-মা-তুতু

এই সাদা ধবধবে বিছানাটায় শুয়ে কতদিন কেটে গেল জানি না। ঘরের এক কোণে বিছানা, আর বাকিটা জুড়ে হিজিবিজি যন্ত্র। সেখান থেকে যখন-তখন সরু-সরু তার টেনে নিয়ে গুঁজে দেয় আমার মাথায়, গলায়। তারপর কীসব করলেই যন্ত্রের কাঁটাগুলো নড়ে ওঠে। সাদা পোশাক পরা লোকজন তখন যন্ত্রগুলো দেখে, কী সব টুকে নেয় নোটবইতে। দিন-রাত ওরা ঘরে যাওয়া-আসা করে। মাঝে-মাঝে আমাকে নানা কথা জিগ্যেস করে, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারি না। জটপাকানো জড়ানো সব কথা।

ঘরে একটা জানলা আছে। তা দিয়ে আকাশ দেখা যায়, পাখি দেখা যায়, আর দূরের বাগানের গাছ দেখা যায়। কাল বিকেলে আমাকে চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে জানলার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তখন ফুল দেখেছি, আর বাগানে ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। তবে জানলাটা কাচে ঢাকা। একফোঁটা হাওয়া ঢুকতে পারে না। আর যতই রোদের তেজ বাড়ে জানলার কাচের রংটা ততই কালচে হয়ে যায়। একজন নার্স বলছিল, এটা নাকি পোলারয়েড কাচ। প্রথমে কথাটা আমি বুঝতে পারিনি। তখন সে লিখে আমাকে দেখাল। সেটাও অনেক কষ্ট করে আমাকে বুঝতে হল। কারণ এদের সবারই লেখার ধরন একেবারে উলটো।

শুধু কি লেখার ধরন! কথাবার্তাও তাই। বাবা আর মা যেদিন প্রথম আমাকে দেখতে এল সেদিন ওদের একটা কথাও আমি বুঝতে পারিনি। আর আমার কথাও যে ওরা একটুও বুঝতে পারছিল না সেটা ওদের মুখের চেহারা দেখেই টের পেয়েছি। শেষে মা যখন কান্নাকাটি শুরু করল তখন পাকা-চুল এক ডাক্তারবাবু পাশে দাঁড়ানো নার্সের কানে-কানে কী একটা বুদ্ধি দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কোথা থেকে একটা টেপরেকর্ডার আর একটা কম্পিউটার নিয়ে এল। একটা মাইক্রোফোন আমার মুখে ধরে অনেকগুলো প্লাগ জুড়ে কীসব সুইচ অন করে দিল। তারপর আবার আমাকে কথা বলতে বলল। আমি বললাম। ওরা সব টেপ করে নিল। তার একটু পরেই

আবার টেপ চালিয়ে দিল। আর কী অবাক কাণ্ড! আমার সমস্ত কথাগুলো কেমন হিজিবিজি শোনাচ্ছিল আমার কাছে। অথচ দেখলাম বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর কম্পিউটারের টিভি পরদায় কথাগুলো সব ফুটে উঠল পরপর। লেখাগুলো আমার বুঝতে কষ্ট হলেও দেখলাম আর সবাই দিব্যি সেগুলো পড়তে পারছে।

বাবা ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করল, তুতুর কথাবার্তা এরকম ওলট-পালট হয়ে জট পাকিয়ে গেছে কেন? ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, এ-এক আশ্চর্য ঘটনা, মিস্টার রক্ষিত। এ আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আপনার ছেলের ক্রেনিয়াল নার্ভের কিছু-কিছু জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ট্রিজেমিনাল, অ্যাকাউস্টিক আর হাইপোগ্লসাল অঞ্চলে।

আমি ওদের কথা বুঝতে পারছিলাম। হয়তো চালু টেপরেকর্ডার আর কম্পিউটার মিলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দেখলাম, ডাক্তারবাবুর কথায় বাবা কেমন হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছে। তখন ডাক্তারবাবু আবার বললেন, ওসব শক্ত কথা বাদ দিন। আসলে আপনার ছেলে এখন কথা বলছে উলটোভাবে, লিখছেও উলটোভাবে, আর শুনছেও উলটোভাবে। অর্থাৎ যেসব শব্দ পরপর জুড়ে একটা কথা তৈরি হয়, যার একটা অর্থ আছে—আপনার ছেলে সেই শব্দের টুকরোগুলো পরপর জুড়ছে ঠিক উলটোভাবে। আমাদের কাছে সেই কথার কোনও অর্থ নেই, কিন্তু ওর কাছে আছে—অন্তত এই অ্যাক্সিডেন্টটার পর। লেখার বেলাতেও ঠিক তাই। অক্ষর, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির সিকোয়েন্স গেছে উলটে। ফলে সেইরকম উলটোভাবে কোনও কথা না বললে এখন তুতু আর বুঝতে পারবে না। যার জন্যে এই টেপরেকর্ডার আর কম্পিউটার জুড়ে কথার শব্দগুলো ওলটানোর ব্যবস্থা করেছি।

দেখলাম, মায়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাবাও চুপ। ওদের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। অ্যাক্সিডেন্টটার কথা আমার বেশ মনে আছে। মাত্র সাতদিন আগের ঘটনা। আমার বাবা গভর্নমেন্টের অর্ডন্যান্স ডিভিশনে কাজ করে। তাই আমাদের বেশ সতর্ক থাকতে হয়। বাড়ির যে-ঘরটা বাবা অফিসের কাজের জন্যে ব্যবহার করে তার চারদিকে একটা ফোর্স ফিল্ড চালু করা থাকে। ভীষণ দরকারি আর গোপন নথিপত্রের নিরাপত্তার জন্যেই ওই ব্যবস্থা। সেদিন রাত্রিবেলা ফোর্স ফিল্ড চালু করার সময়ে তার বৈদ্যুতিক মেরু দুটো উলটে গিয়েছিল। আর আমি ফোর্স ফিল্ড এলাকা থেকে সরে আসার আগেই কী করে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যস। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন এই নার্সিংহোমে শুয়ে।

আমি ডাক্তারবাবুর কথাগুলো ভাবছিলাম। কী অদ্ভুত! একই শব্দের টুকরো একভাবে পরপর জোড়া দিয়ে গেলে অর্থ পাওয়া যায়, অথচ সেগুলো উলটো করে পরপর জোড়া দিলে কোনও মানে নেই! তার মানে সাজানোটাই আসল। আমাদের মস্তিষ্ক সেই সাজানো সারি থেকেই অর্থ খুঁজে

বের করতে অভ্যস্ত। তাহলে ওই ফোর্স ফিল্ড কি আমার মস্তিষ্কের অভ্যেসকে পালটে দিয়েছে? ওই টিজেমিনাল, অ্যাকাউস্টিক আর হাইপোগ্লসাল নার্ভগুলোর কাজের ধারাকে দিয়েছে উলটে? মনে আছে, মুখ গম্ভীর করে মা আর বাবা চলে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। চোখে জলের ফোঁটা। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না। মিস্টার রক্ষিত, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।'

এখন বেলা পড়ে এসেছে। জানলার পোলারয়েড কাচের রং ফিকে। আকাশের গায়ে সূর্যের লালচে রং দেখা যাচ্ছে। এমন সময়ে ঘরে এল সবাই। ডাক্তারবাবু, নার্স, আর তাদের পিছনে বাবা। সকলেরই মুখ থমথমে, গম্ভীর।

ডাক্তারবাবুর ইশারায় নার্স টেপরেকর্ডার ও কম্পিউটারের পুরোনো ব্যবস্থাটা চালু করে দিল। তারপর ডাক্তারবাবু আমাকে মামুলি কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিলাম। ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বারকয়েক মাথা নাড়লেন। তারপর বাবাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমাদের সামনে আর একটা পথই খোলা আছে...।' বাবা জিগ্যেস করল, 'কী সেটা?' ডাক্তারবাবু চোখ নামিয়ে বললেন, 'ওকে ওই ফোর্স ফিল্ডে রেখে সুইচ অন করে দিয়ে দেখা—যদি ক্রেনিয়াল নার্ভগুলোর কাজের ধারা আবার আগের মতো হয়ে যায়। আমাদের একটা চান্স নিতে হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

বাবার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। অথচ আমার কাছে ডাক্তারবাবুর প্রস্তাব বেশ কাজের বলেই মনে হচ্ছিল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, একটা ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে এত ক্ষমতা! কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবা বলল, 'কিন্তু ডক্টর, ফোর্স ফিল্ড যে কীরকম বিপজ্জনক তা তো আপনি জানেন। তুতুর বয়েসের একটা ছেলে ওই ফিল্ডের মধ্যে পড়লে শুধু পাগল কেন একেবারে শেষও হয়ে যেতে পারে, শেষ! বাবাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'মিস্টার রক্ষিত, বিজ্ঞানের স্বার্থে আমার প্রস্তাবে আপনার রাজি হওয়া উচিত। আপনার ছেলের চেয়ে বিজ্ঞান অনেক বড়। বিজ্ঞানের কাছে এটুকু ঝুঁকি কিছুই নয়। এ ছাড়া এই উলটোপুরাণ ছেলেটাকে নিয়ে আপনি করবেন কী? ও আপনার কোনও কাজেই আসবে না।'

এ-কথা শুনে বাবা এক অদ্ভুত চিৎকার করে উঠল।

তখন ডাক্তারবাবু হঠাৎই খেয়াল করলেন যে, আমি ওঁদের সব কথা শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। উনি নার্সকে ইশারা করলেন। নার্স কম্পিউটার ও টেপরেকর্ডারের কানেকশান খুলে দিল। বাবা ও ডাক্তারবাবুর কথাবার্তা আমার কাছে আবার জট-পাকানো হিজিবিজি। শুধু দেখলাম, বাবা হাত-পা ছুড়ছে, দেওয়াল চাপড়াচ্ছে, আর ডাক্তারবাবু দু-হাত নেড়ে তাকে কীসব বোঝাতে চেষ্টা

করছেন। লক্ষ করলাম বাবার চোখে জল। এমনসময় ডাক্তারবাবু ঘরের দরজার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে কী যেন বললেন। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো জোয়ান লোক ঘরে এসে ঢুকল। ওদের গায়ে সাদা পোশাক। ওরা এসে বাবার হাত চেপে ধরল। বাবা জোর করে আমার কাছে এগিয়ে এসে ডুকরে উঠল, 'তুতু!' আমি বললাম, 'বাবা!'

ডাক্তারবাবু আর নার্স আমাদের কথায় একটু চমকে গেল। কারণ টেপরেকর্ডার আর কম্পিউটারের ব্যবস্থা ছাড়াই আমরা একে অন্যের কথা বুঝতে পেরেছি। চোখে জল নিয়েও বাবা হাসল। আমিও। আমাদের চোখে-চোখে কথা হল। টের পেলাম, বাবা, মা, তুতু, এই শব্দের টুকরোগুলো উলটোভাবে সাজালেও তাদের অর্থ একই থাকে। আমার শরীরে যেন কাঁটা দিল। পৃথিবীতে এমন কতকগুলো ডাক আছে যেগুলোকে হাজার শক্তিশালী কোনও ফোর্স ফিল্ডও ওলটাতে পারে না। হিজিবিজি করে দিতে পারে না। বাবা—মা—তুতু। তুতু—মা—বাবা। বাবা কি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে, মরতে আমি আর একটুও ভয় পাই না! একটুও না!



জলের তলায়

জিটি রোডের ধারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ চোখে পড়তেই সুশীল মাঝি বললেন, ‘ওই গাছতলায় গাড়ি থামান।’ আমি তাঁর কথামতো কাজ করলাম। টার্বো-প্রপ জিপটাকে ম্যাগনেটিক ব্রেক কষে চোখের পলকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তারপর জিপ থেকে নেমে সাইরেন অফ করে দিলাম। ড্যাশবোর্ডের মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে কোড নম্বর বলে কম্পিউটার-লক করে দিলাম গাড়িটাকে।

সুশীল মাঝিও নামলেন গাড়ি থেকে। পরনের ধুতিটা সামলে নিয়ে বললেন, ‘আসুন, রত্নেশ্বরবাবু, ওই বাঁশবনটা পেরোলেই সেই পুকুর।’

আমি পকেট থেকে কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের একটা পৃষ্ঠা বের করলাম। এই রিপোর্টটাই গতকাল এসেছে আমার কাছে। বড় রহস্যময় ঘটনা। জলের তলায় কী এমন ঘটনা ঘটল যাতে...।

সুশীলবাবু আচমকা বললেন, ‘রত্নেশ্বরবাবু, এই সেই মরণ-পুকুর, প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো।’

বড় রাস্তা ছেড়ে ঘাসে-ছাওয়া উঁচু-নীচু ঢিবি পেরিয়ে আমরা বেশ কিছুটা পথ এসেছি। চারদিকে নানান গাছপালা—বাঁশবন, আগাছার ঝোপ, আর কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে। তারই ফাঁক দিয়ে ছোট-ছোট পায়ে চলা পথ। সেরকমই দুটো পথ মাটির ঢাল বেয়ে নেমে গেছে বহু প্রাচীন ভাঙাচোরা ঘাটের দিকে।

পুকুরটা খুব বেশি বড় নয়। বড়জোর বিঘেখানেক হবে। চেহারাটা না-গোল, না-চৌকো। এই গরমের সময় জল যতটা শুকিয়ে যাওয়ার কথা ততটা শুকোয়নি। জলের রং সবুজ। আর চারদিকেই আগাছার ঝাড় নেমে গেছে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত। এককথায় নোংরা ডোবাও বলা চলে।

পুকুরের একটাই মাত্র ঘাট। ঘাট বলতে কতকগুলো কাত হয়ে পড়া ইটের চাঙড়। সেখানে একজন মহিলা বসে কাপড় কাচছেন। আর একজন পুরুষ ঘাটে বসে মগ দিয়ে জল তুলে স্নান করছেন।

ঘাট যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে ঢালের মুখে বাঁ-দিকে একটা প্রকাণ্ড কাকতাড়ুয়া। তার বুকে একটুকরো জং-ধরা টিনের পাতের ওপরে কাঁচা হাতে লেখাঃ বিপদ।

আমাদের দেখে পুরুষমানুষটি স্নান থামিয়ে নমস্কার করলেন সুশীলবাবুকে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ সুশীল মাঝি এখানকার অঞ্চল-প্রধান। আর মহিলাটি তাড়াহুড়ো করে কাচাকাচি সেরে উঠে চলে গেলেন।

প্রথম মানুষটি গামছা দিয়ে গা মুছতে-মুছতে ওপরে উঠে এলেন। আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। সুশীলবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি একটা আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বের করে আগন্তুককে দেখালাম। বললাম, ‘আমার নাম রত্নেশ্বর রায়। গভর্নমেন্টের প্যারানরমাল ফেনোমেনা অ্যানালিসিস উইং থেকে আসছি। গতকালের ঘটনা নিশ্চয়ই জানেন? তার রিপোর্ট পৌঁছেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। আমি সেটাই তলিয়ে দেখতে এসেছি।’

ভদ্রলোক আমার কথা শেষপর্যন্ত শুনলেন না। সুশীলবাবুর দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন, ‘ওসব তদন্তে-ফদন্তে কিস্যু হবে না, সুশীলদা। এ-পুকুরের জলের তলায় অপদেবতা আছে, অভিশাপ আছে।’

সুশীলবাবু তাঁকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, ‘আহা, নৃপেন, তুমি থামো। ওঁকে ঠিকমতো কাজ করতে দাও।’

নৃপেনবাবু একবার আমার দিকে দেখলেন, তারপর আবার তাকালেন সুশীল মাঝির দিকে। তারপর চাপা গলায় বললেন, ‘এই পুকুর আমার বাপকে খেয়েছিল। সে-ঘটনা যারা স্বচক্ষে দেখেছিল তারা বলেছে জলের তলা থেকে কোনও দানো বাপের গা ধরে টেনে নিয়েছিল। কালকের ব্যাপারটাও তাই।’

এ-কথা বলে নৃপেনবাবু কীসব বিড়বিড় করতে-করতে চলে গেলেন। তাঁকে আমি কী করে বোঝাব, এই একবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনার কোনও স্থান নেই। আর জনসাধারণের মন থেকে মিথ্যে ভয় ও কুসংস্কার তাড়ানোর জন্যেই সরকার তৈরি করেছে ‘প্যারানরমাল ফেনোমেনা অ্যানালিসিস উইং’। কোনওরকম ‘অলৌকিক’ ঘটনার হদিস পেলেই আমাদের দফতর সেখানে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে দেয়। তারপর তন্ন-তন্ন করে তদন্ত করে বের করে সেই ঘটনার ‘অলৌকিকত্বের’ কারণ। এ-বিষয়ে আবার নানান বিভাগ আছে। যেমন, জল, যানবাহন, বাড়ি, মাঠ, আকাশ—এই

সব। অর্থাৎ, 'অলৌকিক' ঘটনা কোথায় ঘটছে সেই বুঝে উপযুক্ত বিভাগের লোক পাঠানো হয়। আমি জল বিভাগের লোক। এবং বিশেষজ্ঞ।

রিপোর্টটা আমার হাতেই ছিল। সেটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। নৃপেনবাবুর বাবা যখন মারা যান, তখন কোনও শোরগোল হয়নি। আমাদের ডিপার্টমেন্টেও কোনও খবর পৌঁছোয়নি। কিন্তু গতকালের ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। গতকাল এই পুকুরে ডুবে মারা গেছেন বিখ্যাত সাঁতারু চিরদীপ দাস। গত ২০০৪ সালের ওলিম্পিকে সাঁতারে যিনি দু-দুটো সোনা জিতেছেন—একটা ১০০ মিটারে, আর-একটা ২০০ মিটারে। সাঁতারে ভারতের একমাত্র সোনা-বিজয়ী।

রিপোর্ট ছাড়া বাকি গল্পটুকু আমি জিপে আসতে-আসতে সুশীলবাবুর মুখেই শুনেছি। এই গাঁয়ে চিরদীপ দাসের আদি বাড়ি। গত বিশ বছর ধরে এখানে ওঁরা কেউই থাকতেন না। তবে মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ গাঁয়ের বাতাস গায়ে মাখতে আসতেন। যেমন, গত পরশু চিরদীপ একা এসেছিলেন। কোন ছোটবেলায় গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই তাঁর প্রথম আসা। এবং এই শেষ।

বেশ বুঝতে পারছি ঘটনাটা কী ঘটেছিল। গাঁয়ে এসে এই পুকুরের অভিশাপের গল্প নিশ্চয়ই চিরদীপের কানে গিয়েছিল। তখন অলিম্পিক সাঁতারু চিরদীপ সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অভিশাপের ব্যাপারটা যে ভিত্তিহীন, উদ্ভট কল্পনা, সেটা প্রমাণ করতে চিরদীপ এই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটা দেখার জন্যে প্রচুর লোক পুকুরপাড়ে জড়ো হয়েছিল। আর তাদের চোখের সামনেই খাবি খেতে-খেতে তলিয়ে গেছেন ওলিম্পিকে সোনা-বিজয়ী সাঁতারু চিরদীপ দাস। সুশীলবাবুও নিজের চোখেই দেখেছেন চিরদীপের মৃত্যু।

আমি বুঝতে পারলাম, সুশীলবাবু আমাকে লক্ষ করছেন। বোধহয় উনি আঁচ করেছেন আমি কী ভাবছি। একটু পরেই ওঁর কথায় তার প্রমাণ পেলাম।

আমাদের গায়ে চড়া রোদ লাগছিল। সুশীলবাবু আমাকে আলতো করে একটা গাছের ছায়ায় টেনে নিলেন। হাত বুলিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'চিরদীপকে নিয়ে এ-পর্যন্ত মোট পাঁচজন হল। মানে আমার জীবনে। তার আগে আরও কত গেছে কে জানে! সকলকে সাবধান করার জন্যে এই বিপদের নোটিস আজ প্রায় বারো বছর ধরে লাগানো আছে। আমরা কি এ-পুকুরে স্নান করি না? করি। তবে ওই ঘাটে বসে মগ, বালতি, কি বাটি দিয়ে। ওই নৃপেনকে যেমন দেখলেন।'

আমি পুকুরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সুশীল মাঝিকে দেখলাম। বললাম, 'চিরদীপবাবুকে তো আপনি মরতে দেখেছেন। আপনার কি মনে হয়েছিল যে, তাঁকে কেউ জলের তলা থেকে টেনে নিচ্ছে?'

সুশীলবাবু মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত চালালেন। বারদুয়েক গাল চুলকে বললেন, 'হতে পারে। ভালো করে বুঝতে পারিনি। তবে চিরদীপ ভীষণ আঁকুপাঁকু করে হাত-পা ছুড়ছিল। চিৎকারও করছিল "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে। কিন্তু কে বাঁচাবে বলুন!'

সুশীলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'দেখুন, আপনি যদি এর একটা সমাধান করতে পারেন। অতগুলো লোকের চোখের সামনে জোয়ান ছেলেটা মারা গেল, অথচ আমরা কিছু করতে পারলাম না—।'

পুকুরের পাড় ঘেঁষে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে বেশ কয়েকটা হাঁস ঘুরঘুর করছিল। লক্ষ করলাম, ওরা মোটেই জলে নামছে না। বরং ডাঙা থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে জলের কিনারা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এ-পুকুরে হাঁস নামে না?'

সুশীল মাঝি বললেন, 'নাঃ। ওরা তো আর আমাদের মতো নয়। ওরা বিপদের গন্ধ পায়।'

আমি অবাক হয়ে পুকুরের সবুজ জল দেখতে লাগলাম। রোদের ছোঁয়া লেগে জল ঝিকমিক করছে। এলোমেলো বাতাসে জলে ছোট-ছোট ঢেউয়ের শিরা ফুটে উঠছে। দেখে কে বলবে, এই পুকুর অন্তত পাঁচজনের প্রাণ নিয়েছে!

রিপোর্টটা পকেটে রেখে আমি একটা বড়সড়ো মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিলাম। কিছু না ভেবেই ছুড়ে মারলাম পুকুরের শান্ত জলে। ঝুপ করে একটা শব্দ হল। তারপর ঢেউ উঠল। গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

আমি পকেট থেকে দুটো স্টেরিলাইজড পলিথিন ব্যাগ বের করলাম। জলের নমুনা নিতে হবে এতে। তারপর নিয়মমাফিক বিশ্লেষণ করতে হবে ল্যাবরেটরিতে। কিছু পাওয়া যাক আর না যাক, এটাই তদন্তের প্রাথমিক নিয়ম।

ভাঙা ঘাটে নেমে ঝুঁকে পড়ে জল সংগ্রহ করতে লাগলাম। সুশীলবাবুও আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। উনি যে রীতিমতো কৌতূহল নিয়ে আমার কাজকর্ম লক্ষ করছেন তা বেশ বুঝতে পারছি। জল নেওয়া হয়ে গেলে ব্যাগ দুটো এক বিশেষ ধরনের আঠা 'ইনস্ট্যাফিক্স' দিয়ে সিল করলাম। এই আঠা সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ে দেয়। জোড়ায় কোনও ফাঁক থাকে না। সুশীলবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'আগের চারজনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তো?'

সুশীলবাবু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় চার-পাঁচ দিন পরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল।'

চার-পাঁচ দিন! একটু অবাক হলাম। সময়টা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কেন? জলের তলার অপদেবতা কি লাশ আগলে বসে থাকে? হাসি পেল আমার। তবে সেটা বাইরে

প্রকাশ না করে আবার প্রশ্ন করলাম, 'লাশ পরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি?'

'না। শুধু কয়েকটা ঘা-এর মতো দেখা গিয়েছিল। নৃপেনের বাবার লাশ তো পুলিশ-মর্গে নিয়ে কাটাছেঁড়াও করেছিল, কিন্তু রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায়নি বলেই শুনেছি।'

আমি মনে-মনে একটা হিসেব কষছিলাম। দেড়শো বছরের পুরোনো পুকুর। জলজ আগাছায় ভরতি। হাঁস এই পুকুরে নামে না। লাশ ভেসে ওঠে অনেক দেরিতে। তা হলে কি...?

'আচ্ছা, সুশীলবাবু, এ-পুকুরে মাছ-টাছ নেই?' সুশীল মাঝিকে প্রশ্নটা করে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। আমার হিসেব যদি এককণাও সত্যি হয়, তাহলে উত্তরটা বোধহয় আমি জানি।

সুশীলবাবু বললেন, 'আছে খুব সামান্যই। তবে বেশিরভাগ কই, মাগুর, শোল, এইসব মাছ।'

বুঝলাম, উনি ঠিকই বলেছেন। এইসব মাছের দুটো শ্বাস-অঙ্গ আছে। বেঁচে থাকার জন্যে বাতাস থেকেও এরা অক্সিজেন নেয়। শুধু জলের ওপরে নির্ভর করে এইসব মাছ বাঁচতে পারে না।

আমি ঘড়ি দেখলাম। ডিপার্টমেন্টাল টিমের আসার সময় হয়ে গেছে। আমার বুক-পকেটে রাখা খুদে ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের বিপার বেজে উঠল। ওটা বের করে নিয়ে কথা বললাম। ওরা আর বিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। ওরা এসে পড়লেই এখানে তুলকালাম শুরু হবে। জলে জাল ফেলবে। চিরদীপ দাসের লাশ উদ্ধার করবে। তখন কি একইসঙ্গে পাওয়া যাবে কোনও আশ্চর্য জলচর প্রাণী? মনে হয় না। ওরা হয়তো জলে ডুবুরি নামাবে। তারপর রকমারি যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোখের পরীক্ষা শুরু করবে।

কিন্তু ওরা এসে পুকুর তোলপাড় করার আগে একটা ঝুঁকি কি আমি নিতে পারি না? সেটাই হবে আমার চরম পরীক্ষা। আর তার ফলাফল হবে চরম প্রমাণ। কেমন একটা জেদ চেপে বসল মাথায়। পলিথিন ব্যাগ দুটো নিয়ে জিপের দিকে রওনা হলাম। সুশীলবাবুকে বললাম, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

জলের নমুনা রেখে আমি যখন ফিরে এলাম সুশীলবাবু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার রত্নেশ্বরবাবু?'

ওঁর অবাক হওয়ারই কথা। কারণ এখন আমার পরনে সাঁতারের পোশাক। চোখে ডুবুরি-চশমা। কোমরে ইস্পাতের আংটার সঙ্গে লাগানো নাইলন দড়ি। আর তার পাশেই ফিতেয় বাঁধা খাটো ছুরি।

নাইলন দড়ির খোলা দিকটা সুশীলবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, 'শক্ত করে ধরে রাখুন। আমি পুকুরে নামছি। যদি কোনও বিপদ হয় চিৎকার করে উঠব। আর সঙ্গে-সঙ্গে আপনি দড়ি টেনে আমাকে ঘাটে তুলবেন। কী, পারবেন তো?'

সুশীলবাবুর বয়স্ক মুখে একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, 'পারব মানে, আমাকে পারতেই হবে!'

আমরা দুজনে ঘাটের কাছে নেমে গেলাম। সুশীলবাবু দড়িটা হাতে কয়েক পাক পেঁচিয়ে একটা ইটের চাঙড়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। আর আমি 'কোনও ভয় নেই' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মরণ-পুকুরের সবুজ জলে।

ওলিম্পিকে সোনা পাইনি বটে, তবে সাঁতারে আমি ছেলেমানুষ নই। কিন্তু জলে পড়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে আমি চমকে গেলাম। কিছুতেই শরীরটাকে আমি ভাসিয়ে রাখতে পারছি না। শুধু হাত-পা ছোড়াছুড়িই সার। আমাকে ঘিরে মরণ-পুকুরের জল ছিটকে উঠছে চারদিকে। ভালো করে ঠাহর করে দেখলাম। না, আমার পা ধরে কেউ টানছে না। তবুও আমি তলিয়ে যাচ্ছি।

সুশীলবাবু চিৎকার করে উঠলেন। দূরে টার্বো-প্রপ জিপের শব্দ শোনা গেল। দলবল এসে গেছে। কিন্তু আমি চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বের করতে পারছি না। শুধু প্রাণপণে বাতাস টানতে চাইছি। সুশীলবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন। টের পেলাম নাইলন দড়িটা উনি প্রাণপণে টানছেন। আমার চোখের সামনে অসংখ্য জলের কুচি রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠছে। ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে কেউ যেন হাপর চালাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি অনেকগুলো মুখ আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। সুশীলবাবু ছাড়া অন্যান্য মুখগুলোকে চিনতে পারলাম। ওরা আমার ডিপার্টমেন্টের লোক। আমি উঠে বসলাম। সুশীলবাবু বললেন, 'কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?'

আমি কষ্ট করে হেসে তাঁকে বললাম, 'না, ঠিক আছি।'

তারপর আমাদের দলের ফার্স্ট অফিসার শর্মাকে লক্ষ করে নির্দেশ দিলাম, 'রুটিন ইনভেস্টিগেশান আর অ্যানালিসিসগুলো করে ফেলুন। তবে মনে হয় ব্যাপারটা আমি ধরতে পেরেছি। আপনি ইন্সট্রুমেন্ট বক্স থেকে ডিজিটাল ডেন্‌সিমিটারটা শুধু আমাকে দিন।'

শর্মা সকলকে কাজে লেগে পড়তে বলল। তারপর চটপট উঠে গেল জিপ থেকে যন্ত্রটা নিয়ে আসতে।

আমি সুশীলবাবুকে ধন্যবাদ জানালাম। উনি দড়ি টেনে ঘাটে না তুললে আমার অবস্থাও হতো চিরদীপ দাসের মতো। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগোলাম। যেতে-যেতে বললাম, 'সুশীলবাবু দেড়শো বছরের পুরোনো এই পুকুরের তলায় কোনও প্রাণীও নেই, কোনও অপদেবতাও নেই। আর অভিশাপের ব্যাপারটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।'

উনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে?'

শর্মা মিনিয়েচার ডেন্‌সিমিটারটা আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি ওকে বললাম, ‘পনেরো মিনিট পর-পর আমাকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেবেন, হেডকোয়ার্টার্সে ট্রান্সমিট করব। আমি গাড়িতেই আছি।’

পুকুর নিয়ে আমার আর কৌতূহল নেই। কারণ উত্তরটা আমার নিশ্চিতভাবে জানা হয়ে গেছে। ডেন্‌সিমিটারের পরীক্ষাটা শুধু অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার জন্যে।

জিপের কাছে গিয়ে একটা পলিথিন ব্যাগ খুলে খানিকটা জল ডিজিটাল ডেন্‌সিমিটারের ভলিয়্যুম চেম্বারে ঢেলে দিলাম। তারপর সুইচ অন করতেই ডিসপ্লে প্যানেলে একটা সংখ্যা ফুটে উঠলঃ ০৮০।

অকাট্য প্রমাণ। আমি হেসে উঠলাম। সুশীলবাবু ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি মিটারের সুইচ অফ করে তাঁকে বললাম, ‘সুশীলবাবু, এই পুকুরের জলের ঘনত্ব স্বাভাবিক জলের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। তাই...।’

আমাকে বাধা দিয়ে সুশীল মাঝি বললেন, ‘ঘনত্ব মানে?’

আমি এক সেকেন্ড ভেবে বললাম, ‘মানে বলতে পারেন, স্বাভাবিক জলের চেয়ে এই পুকুরের জল পাতলা। যেমন ধরুন, অনেকটা কেরোসিন তেলের মতো। তাই এই জলে সাঁতার কেটে ভেসে থাকা অসম্ভব। এমনকী, হাঁসেরাও পারে না। সেইজন্যেই ওরা এই পুকুরের জলে নামে না। আর মানুষের মৃতদেহও ভেসে ওঠে অনেক দেরিতে—অনেক বেশি ফুলে-ফেঁপে ওঠার পর। চিরদীপ দাস একই কারণে এই পুকুরে তলিয়ে গেছে। যেমন আমিও তলিয়ে যাচ্ছিলাম।’

কতগুলো রহস্যময় দুর্ঘটনার কী সহজ এবং নিষ্ঠুর উত্তর! ঘনত্বের শতকরা কুড়ি ভাগ তফাত কী অদ্ভুতভাবেই না বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে!

সুশীল মাঝি জিগ্যেস করলেন, ‘কিন্তু জলটা পাতলা হল কেমন করে, রত্নেশ্বরবাবু?’

আমি চুপ করে রইলাম। সেটা তো আমারও প্রশ্ন। জিওল মাছ ছাড়া অন্য কোনও মাছ এ-পুকুরে বিশেষ নেই। হয়তো দেড়শো বছরের এই জলের সঙ্গে মিশে গেছে এমন কোনও জৈব রাসায়নিক তরল যার ঘনত্ব জলের চেয়ে অনেক কম। বলা যায় না, এই পুকুরের জলে হয়তো রয়েছে এমন সব জলজ উদ্ভিদ, যা পচে গলে তৈরি হয়েছে কোনও হাইড্রোকার্বন যৌগ। তারপর তা থেকে এসেছে কোনও জৈব রাসায়নিক—ক্রমাগত জলে মিশে গিয়ে সেই রাসায়নিকই হয়তো কমিয়ে দিয়েছে এই পুকুরের জলের ঘনত্ব। আর একইসঙ্গে জিওল মাছ ছাড়া অন্যান্য মাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এত সব সম্ভাবনার কথা না বলে সুশীলবাবুকে জবাব দিলাম, ‘পুকুরের জলের নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করলেই সেই কারণটি হয়তো জানা যাবে।’

এমনসময় পুকুরের দিক থেকে একটা হইচই কানে এল। বোধহয় চিরদীপ দাসের মৃতদেহটা ওরা খুঁজে পেয়েছে।



মশক, মূষিক ও মার্জার

বিশ্বকাকু প্লেটের শেষতম রসগোল্লাটা মুখে পুরে দিয়ে চোখ দুটো সামান্য বড় করে চোয়াল নাড়িয়ে মিষ্টিটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছিল, হঠাৎই তার চোখ পড়ল বাবান টিভির নীচে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে একটা বই পড়ছে, আর মৌ পাশেই সোফায় বসে ওয়ার্ক এডুকেশানের একটা হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। বিশ্বকাকু টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল শেষ করে প্রথম কথা বলতে পারল, 'আঃ, এতক্ষণে বডিটা একটু জুত হল। জানিস তো, যারা নামকরা বডি বিল্ডার তারা রসগোল্লা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে। অবশ্য মিষ্টি সবাই সহ্য করতে পারে না, তাই তার বদলে দুধ আর ছানা খায়।'

বাবান-মৌ বিশ্বকাকুর কথায় কান দিয়েছে বলে মনে হল না। বিশ্বকাকু যখন-তখন ওদের বাড়িতে আসে যায়, খাবারদাবার খায়, তাদের সঙ্গে মজা করে, আর সত্যি ঘটনা বলে নানান উদ্ভট গল্প শোনায়।

বিশ্বকাকু সোফায় বসে বসেই হাঁক পাড়ল, 'বউদি, বউদি—। চায়ের কথাটা আবার ভুলে যেয়ো না যেন।'

রান্নাঘর থেকে বাবান-মৌয়ের মা, অর্থাৎ বিশ্বকাকুর বউদি চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'ভুলিনি, ভুলিনি।'

বিশ্বকাকু এবারে সোফায় পা তুলে বসে হাত দুটোকে ব্যায়াম করার ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করে গম্ভীরভাবে বলল, 'বাবান, তোদের টিভির তলায় সাদা বলের মতো ওটা কী পড়ে আছে রে?'

বাবান বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'ফেলিস ক্যাটাস—গৌতম।'

বিশ্বকাকু হাঁ করে বাবানের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ছোঁ মেরে ওর বইটা কেড়ে নিল।

বাবানের উত্তর শুনে মৌ হেসে ফেলেছিল। এবারে হাতের কাজ রেখে ঘুরে বসল কাকুর দিকে।

বিশ্বকাকু বাবানের বইটা টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, 'ছিঃ, ছিঃ! তুই গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস?'

বাবান হেসে বলল, 'সে কী, কাকু, তুমি ফেলিস ক্যাটাস মানে জানো না! বেড়াল, বেড়াল—মার্জার!'

বিশ্বকাকু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'সে আর জানি না, জুওলজির বিজ্ঞানীরা গৃহপালিত বেড়ালকে ফেলিস ক্যাটাস বলে! তা গৌতম না কী একটা বললি যেন—।'

মৌ এবারে বলল, 'দাদা বেড়ালটার নাম দিয়েছে গৌতম। দাদার ইস্কুলের এক বন্ধু আছে, নাম গৌতম। খুব ভালো ক্যারাম খেলে বলে খুব অহঙ্কার। দাদাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ক্যারামে। বলেছিল, "যদি আমাকে গেম দিতে পারিস তাহলে আমার নামে বেড়াল পুষিস।" দাদা ওকে হারিয়ে একেবারে ভূত করে দিয়েছে। তারপর কোত্থেকে একটা বেড়ালছানা জুটিয়ে নাম রেখেছে গৌতম।'

বাবান বলল, 'কাকু, এবারে বইটা দাও। গল্পটা দারুণ ইন্টারেস্টিং—।'

বিশ্বকাকু আপনমনেই বিড়বিড় করতে লাগল, 'বেড়াল...ফেলিস ক্যাটাস...বেড়াল...ফেলিস ক্যাটাস...বেড়াল...।'

তারপর হঠাৎই চিৎকার করে উঠল, 'মনে পড়েছে! মশক, মূষিক ও মার্জার।'

বাবান-মৌ ফ্যালফ্যাল করে বিশ্বকাকুর দিকে তাকাতেই ওদের মা চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে পড়ল, বলল, 'ছোড়দা, তুমি কি সংস্কৃত আওড়াচ্ছিলে?'

বিশ্বকাকু চায়ের কাপে তেজি চুমুক দিয়ে বলল, 'সে অনেক ব্যাপার, বউদি। আফ্রিকার একটা ঘটনা। দারুণ ইন্টারেস্টিং।'

'তোমার গল্প তুমি ওদের শোনাও। আমার রান্না পুড়ছে।' বলে মা চলে যেতেই বাবান-মৌ দুজনেই চেপে ধরল বিশ্বকাকুকে। বলল, 'কুইক, স্টার্ট, ওয়ান, টু-থ্রি...

বিশ্বকাকু চোখ বুজে চায়ের কাপে পরপর তিনবার আমেজ করে চুমুক দিল। তারপর বলল, 'ঘটনাটা আফ্রিকার কঙ্গোর। আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। কঙ্গো না বলে অবশ্য জায়ার বলাই ভালো, কারণ ১৯৭১ সাল থেকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর নাম পালটে জায়ার রাখা হয়েছে।

কঙ্গো নদীর নাম শুনেছিস তো? জায়ার হচ্ছে কঙ্গো নদীর খুব পুরোনো নাম। সেই থেকেই চলে এল দেশের নাম। তা এই দেশটার ওপর দিয়ে বিষুবরেখা চলে গেছে—একেবারে কঙ্গো নদীর ওপর দিয়ে, দু-জায়গায় নদীটাকে ভেদ করে। আর এইখানেই যত সব ভয়ঙ্কর ঘন জঙ্গল। চিরহরিৎ অরণ্য। বছরে বৃষ্টিপাত প্রায় একশো ইঞ্চি।'

বিশ্বকাকু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। মৌ বলল, 'কঙ্গোর সঙ্গে বেড়াল আসছে কোত্থেকে?'

বিশ্বকাকু বলল, 'একটু ধৈর্য ধর, বাবা, এক্ষুনি বুঝতে পারবি।'

টিভির নীচ থেকে গৌতম মিয়াঁও-মিয়াঁও করে ডেকে উঠল। তারপর আড়মোড়া ভেঙে লেজটা পতাকার মতো সোজা ঊর্ধ্বমুখী করে পায়ে-পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিশ্বকাকু আবার বলতে শুরু করল, 'এই রকমই একটা বেড়ালের বাজিমাতের ব্যাপার! জানিস তো, জায়ার হিরের জন্যে খুব বিখ্যাত। আমরা জায়ারের জঙ্গলে গিয়েছিলাম হিরেরই খোঁজে। বান্টুদের একটা গ্রাম থেকে খবরটা প্রথম ছড়াতে শুরু করেছিল। ওই গ্রামের কোনও একটা আদিবাসী নাকি কঙ্গো নদীর বিষুব অঞ্চলের কাছাকাছি একটা বড় হিরে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ব্যস, ওই গুজবের ভিত্তিতে পশ্চিমের এক বড়লোক কোম্পানি বহু টাকা খরচ করে আমাদের চারজনের একটা অভিযাত্রী দলকে পাঠিয়ে দিল হিরের সন্ধানে। আমরা তো লোকলশকর নিয়ে রওনা হলাম। কখনও হেঁটে, কখনও টেনে চড়ে, কখনও নৌকো ভাসিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ক্রমে-ক্রমে আমরা পৌঁছে গেলাম লোমেলা নদীর কাছে। সেখানে গ্রামে আমরা বিশ্রাম নিলাম কয়েকদিন। এরপর থেকেই শুরু হবে আমাদের আসল অভিযান।

'বাঁশের বাঁখারির তৈরি দেওয়াল আর বড়-বড় পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে আমাদের রাত কাটাতে দেওয়া হল। আর খাবার বলতে পেলাম আগুনে সেঁকা শুয়োরের মাংস। সেখানেই আবার এক বন্ধু জুটে গেল। যাকে তোরা বলিস ফেলিস ক্যাটাস, অনেকটা তাই। এর নাম হল ফেলিস ক্যাপেন্‌সিস বা সহজে সার্ভাল। লম্বা-লম্বা পা, খাটো লেজ, মাথার ঠিক ওপরে মুকুটের মতো এক জোড়া কান। চেহারায় দারুণ—ঝকঝকে হলদে রঙের ওপরে কালো-কালো ছোপ, আর প্রায় সাড়ে তিনফুট লম্বা হবে। বেড়ালটা কারও পোষা নয়। বনবেড়াল। খেয়ালখুশি মতো গাঁয়ে আসে, নয়তো জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়—খরগোশ, ইঁদুর, হরিণছানা ধরে মেরে খায়। আর বেড়ালটা দেখলাম লাফাতে পারে দারুণ, এমনকী গাছেও চড়তে পারে। আমি বেড়ালটার নাম দিলাম ক্যাঙ্গো—মানে ক্যাট অফ কঙ্গোর শর্টকাট।

'তোরা তো জানিস, পশুপাখিরা আমাকে দেখলে কেমন বশ হয়ে যায়। তা এই বেড়ালটাও কী করে যেন আমার বন্ধু হয়ে গেল। আমার থেকে মাংস-টাংস খেতে লাগল, আর কেমন ওয়াঁও-ওয়াঁও করে ডাকতে লাগল। সে যাই হোক, রাতে তো একফোঁটা ঘুমোতে পারলাম নাঃ কারণ মশা। কঙ্গোর মশা যে কী জিনিস—যে কামড় না খেয়েছে সে কিছুতেই বুঝবে না—পারলে চাটাই থেকে আমাদের লাশগুলো তুলে নিয়ে যায় জঙ্গলে। কোনওরকমে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন সকালেই ঠিক করলাম, আগে এর একটা বিহিত করতে হবে। হিরের খোঁজ হবে পরে।

'দিনের বেলা রোদ উঠল চড়া। দেখি, দূরে একটা বিশাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্যাঙ্গো একটা মেঠো ইঁদুরের ঘাড় মটকে খাচ্ছে। আর এদিকে বান্টুরাও তাদের রান্নার আয়োজন শুরু করে দিয়েছে। ওদের তো রান্না বলতে হয় সেদ্ধ, না হয় পোড়া। সুতরাং সেরকমই গন্ধ ভাসছে বাতাসে। আমি খোলা জমিতে দাঁড়িয়ে এক্সাইজ করছিলাম—।'

মৌ ফিক করে হেসে বলল, 'কাকু, এক্সাইজ নয়—এক্সারসাইজ।'

বিশ্বকাকু হাত নেড়ে মৌয়ের কথা একরকম উড়িয়ে দিয়েই বলল, 'এক্সাইজ কথাটাও এমন মারাত্মক কিছু ভুল নয়, বহু লোকে বলে। যাকগে, তারপর কী হল বলি। আমি তো ব্যায়াম করছি, হঠাৎ দেখি একটা বেঁটে আদিবাসী চারটে মেঠো ইঁদুর লেজ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একেবারে জ্যান্ত ইঁদুর! তক্ষুনি আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। জলদি আমাদের ইন্টাপিটার, মানে দোভাষীকে ডাকলাম...।'

বাবান গম্ভীরভাবে বলল, 'ইন্টাপিটার নয়, ইন্টারপ্রিটার—।'

'আবার তুই গুরুজনের ভুল ধরছিস?' বিশ্বকাকু চোখ বড় করে তাকাল।

বাবান কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'কী করব, কাকু, গুরুজনে বললেই কি ভুলটা ঠিক হয়ে যাবে? এই হয়েছে ছোটদের বিপদ!'

বিশ্বকাকু বলল, 'তোর ওসব পাকা-পাকা কথা বাদ দে তো। এখন কাজের কথা শোন। আমার মাথায় তক্ষুনি যে-আইডিয়াটা এল তা একেবারে নোবেলজয়ী আইডিয়া। দোভাষী ছুটতে-ছুটতে এল আমার কাছে। তখন তাকে আমি বললাম যে, ওইরকম জ্যান্ত মেঠো ইঁদুর আমার অন্তত একডজন চাই। দোভাষী বলল, এ আর বেশি কথা কী! ওদের কেউ-কেউ ইঁদুরের রোস্ট পছন্দ করে, তাই ইঁদুর প্রায়ই ওদের ধরতে হয়। সে যাই হোক, লোকটা সব ব্যবস্থা করে দিতেই আমার কাজ শুরু হল, ভিমরুল সাইজের মশাগুলো যথারীতি ভনভন আওয়াজ তুলে ঘুরছে আর কটাস-কটাস করে কামড়াচ্ছে। আমি মনে-মনে বললাম, জায়ারের মশা যদি নির্বংশ করতে না পারি তো আমারও নাম নেই। কলকাতার বাঙালির সঙ্গে টক্কর দেবে আফ্রিকার জংলি মচ্ছর!

'আমার দলের লোকজন সব তো অবাক হয়ে গেল। ভাবল, লোকটা ঘরের ভেতরে উনুন তৈরি করে দিনরাত্তির করছে কী? এমনকী ক্যাঙ্গোও আমার পরীক্ষাগারের বাইরে লাগাতার ঘুরঘুর করতে লাগল আর কালোয়াতি ডাক ছাড়তে লাগল। কিন্তু আমি নট নড়নচড়ন—একেবারে স্টেডি রিসার্চ। ছোটবেলা থেকে যত কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম সব লড়িয়ে দিলাম মশক নিধন সাধনায়। অ্যারোম্যাটিক কম্পাউন্ডের নাম শুনেছিস? সেইসব বিদ্যেও খুব কাজে লেগে গেল। এইভাবে সাতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফল পাওয়া গেল। সাকসেসফুল হলাম। দলের অভিযাত্রীদের বললাম, "ভায়া, হিরে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কিন্তু হিরে তোলার আগেই মশা যদি আমাদের পটল

তুলতে বাধ্য করে তাহলে আর অভিযানে এগিয়ে লাভ কী? কঙ্গো নদী পেরোনোর বদলে সোজা বৈতরণী পেরিয়ে গুডবাই করে দিতে হবে সবাইকে। এই দ্যাখো, আমার এই রিসার্চ পৃথিবী থেকে মশা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তখন একটা বাচ্চা ছেলেও আফ্রিকা-অভিযানে নির্ভয়ে এগোতে পারবে। সুতরাং, আগে মসকুইটো, পিছে ডায়মন্ড।"

'অভিনব রিসার্চের যুগান্তকারী ফল প্রয়োগ করলাম আটদিনের মাথায়। ব্যস, অ্যাপ্লিকেশন করা মাত্রই অ্যাকশন হাতেনাতে। এই দ্যাখ—।'

বলে বিশ্বকাকু জামার আস্তিন গুটিয়ে কয়েকটা পুরোনো কাটা দাগ দেখাল। এই দাগগুলো বাবান-মৌ আগেও দেখেছে। কখনও ছুরিধারী গুণ্ডার আক্রমণে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, কখনও এর কারণ ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমার স্প্লিন্টার, আর কখনও বা ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখ দিয়ে দড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে এই কাটাছেঁড়ার দাগ তৈরি হয়েছে।

বাবান বলল, 'মশা তাড়ানোর রিসার্চের সঙ্গে তোমার হাত কাটার কী সম্পর্ক?'

বিশ্বকাকু বিজ্ঞের মতো হাত নেড়ে বলল, 'আছে, আছে। ওখানে শুধু আমার নয়, সকলেরই কমবেশি চোট লেগেছিল। আর ওই হুলস্থুল কাণ্ডকারখানার জন্যেই তো শেষ পর্যন্ত হিরে উঠল মাথায়, আর চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে আমরাও নৌকো বেয়ে পগারপার।'

মৌ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কিন্তু এই যে বললে রিসার্চ! সাকসেসফুল হয়েছিল—।'

বিশ্বকাকু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছিল রে, বড্ড বেশি সাকসেসফুল হয়ে গিয়েছিল আমার রিসার্চ। যাকগে, শোন। আটদিনের মাথায় আমার যুগান্তকারী ওষুধ স্প্রে করে প্রয়োগ করলাম ওই গাঁয়ে। তারপরই সবাই লক্ষ করল, কোথা থেকে যেন তিরের বেগে ছুটে এল ক্যাঙ্গো। আর এসেই ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ভিমরুল সাইজের মশাগুলোর ওপরে, আর কপাকপ ধরে গিলতে লাগল। তারপর দেখতে-দেখতে ওখানে এসে হাজির হয়ে গেল অন্তত আট-ন'টা ক্যাঙ্গোর মতো সার্ভাল। আর ওরা সবাই মিলে যাবতীয় মশা কপাকপ গিলে ফেলতে লাগল। সব মিলিয়ে সে এক হইহই দৃশ্য।'

'তখন গাঁয়ের সবাই তো মহাখুশি। মশার কামড়ে আর কাউকে কষ্ট পেতে হবে না। এমন সময় আমাদের দলের এক ইয়াং তেলুগু ছোকরা আমাকে এসে একেবারে ধরে পড়ল। বলল, "দাদা, এই মন্ত্রগুপ্তি আমাকে বাতলে দিতেই হবে। এই ওষুধে আমাদের রাজ্যে একেবারে তোলপাড় হয়ে যাবে।" বেচারার কষ্ট দেখে নিমরাজি হলাম। হয়ে ওকে ফর্মুলা বাতলে দিলাম।'

বাবান একেবারে মুখিয়ে ছিল, বলল, 'কী সেই ফর্মুলা, কাকু?'

বিশ্বকাকু হেসে বলল, 'মূষিক তৈল, বুঝলি! ওই যে একডজন মেঠো ইঁদুর আমাকে দিয়েছিল, ওগুলোর বডি থেকে ইঁদুরের গন্ধের একটা তেল তৈরি করেছিলাম আমি। কার্বন আর

হাইড্রোজেনের তৈরি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা অ্যারোম্যাটিক কম্পাউন্ড। অর্থাৎ, সোজা কথায় একটা স্পেশাল সেন্ট—আমি তার নাম দিয়েছিলাম মূষিকসুবাস। তার ফর্মুলাটা বড় জটিল—তোরা কি বুঝতে পারবি? কার্বন আর হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একেবারে কিলবিল করছে। তো, সেই ইঁদুরের সেন্টে একেবারে লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল। ওই এলাকার মশা একেবারে বেড়ালের পেটে সাবাড়। কিন্তু শেষমেষ বিপদও হল একটা।'

'কী বিপদ?' মৌ জিগ্যেস করল।

'ওই সেই গন্ধের বিপদ। ক্যাঙ্গো যে কেন আমার পরীক্ষাগারের বাইরে সবসময় ঘুরঘুর করত এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। তা ক্যাঙ্গো আর তার দলবল তো মশার বংশ নির্বংশ করে দিল, কিন্তু তারপরই ওরা আমাদের আক্রমণ করল। ওই যে আমরা মশা মারার মূষিক তেল চারদিকে স্প্রে করেছিলাম সেটাই আমাদের কাল হল। সেন্টটা ছিল মারাত্মক রকমের পাওয়ারফুল।

'তার একটা অণু কোনও ফ্লাইং মশার বডিতে কোনওরকমে ল্যান্ড করলেই হল। ওই মশার গা থেকে টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা মেঠো ইঁদুরের ফ্লেভার বেরোবে। তখন ক্যাঙ্গো বা তার কোনও জাতভাই মশাটাকে একেবারে চিকেন বিরিয়ানির মতো সাবড়ে দেবে। তো হয়েছিল কি, স্প্রে করার সময় ওই সেন্টের বেশ কিছু অণু আমাদের গায়েও লেপটে গিয়েছিল। মশার দল খতম হয়ে যেতেই বেড়ালগুলো আমাদের গা থেকে ওই একই সেন্টের গন্ধ টের পেতে লাগল। প্রথম-প্রথম আমাদের অ্যাটাক করতে ভয় পেলেও শেষের দিকে ওরা গন্ধে পাগল হয়ে উঠল। নিজেদের আর কোল রাখতে পারল না। ইঁদুরের মনমাতানো গন্ধের টানে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আমাদের ওপরে। আঁচড়ে কামড়ে একেবারে প্রাণান্ত করে তুলল। তখন আমরা কোনওরকমে জান বাঁচিয়ে দিলাম পিঠটান।'

বিশ্বকাকু দম ছেড়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। বলল, 'এখনও শুঁকলে আমার গায়ে বোধহয় মূষিক সেন্টের গন্ধ পাবি। দেখলি না, তোদের গৌতম কেমন বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল।'

বাবান বলল, 'কাকু, ওই সেন্টের ফর্মুলাটা বলো না, আমি লিখে নেব।'

বিশ্বকাকু বলল, 'সে আমার ডায়েরিতে বোধহয় টোকা আছে। শুধু এটুকু মনে আছে, ওই সেন্টের এক-একটা অণুতে ছত্রিশটা করে কার্বন পরমাণু ছিল। আর কী পাওয়ারফুল! বারো বছরেও গন্ধ পুরোপুরি যায়নি।'

এ-কথা বলতে না বলতেই গৌতম কোত্থেকে ছুটে এসে এক লাফে বিশ্বকাকুর কোলে উঠে বসল। আর বিশ্বকাকু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'দেখলি, দেখলি, যা বললাম হাতে-নাতে প্রমাণ হল কি না!'



রহস্যময় পাখিরা

তৈরি হয়ে অফিসে বেরোচ্ছিলাম, রাকেশ ডাকল, 'বাবা, দশ মিনিট সময় দিতে হবে।' আমি ঘুরে তাকালাম। আমার বাঁ-কাঁধের পেশির নীচে ঘড়ি-ক্যাপসুল বসানো আছে। তার কোনও শব্দ নেই। বাইরে থেকে দেখাও যায় না। কিন্তু মগজের ভেতরে প্রতিটি মুহূর্তে সঠিক সময়টা পৌঁছে দেয়। চোখ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময় জানার বিরক্তিকর পদ্ধতি সেকেলে হয়ে গেছে। সুতরাং স্পষ্ট টের পেলাম, এখন সময় আটটা তিপ্পান্ন। ন'টায় অফিস। অফিস কমপ্লেক্স এই বাড়িরই সাতচল্লিশ তলা নীচে। সেখানে পৌঁছে দিতে সুপার-এলিভেটর দেড় মিনিট সময় নেয়। সুতরাং হিসেব কষে রাকেশকে বললাম, 'দশ মিনিট হবে না, সাড়ে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি। কী বলবে চটপট বলো।'

রাকেশ জানে, এখন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার যুগ। তাই একটুও মন খারাপ না করে হাসিমুখে বলল, 'বাবা, তুমি না সেদিন বলছিলে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে—'

আমি বললাম, 'উঁহু, তা বলিনি। বলেছি, বেশিরভাগ সমস্যার। কিন্তু তাতে হয়েছে কী?'

রাকেশ চোখ বড়-বড় করে বলল, 'কাল টিভিতে পৃথিবীর নানান রহস্য নিয়ে একটা পুরোনো প্রোগ্রাম দেখাচ্ছিল। তাতে বলল, বারমুডা ত্রিভুজ, পিরামিড রহস্য, ঈস্টার দ্বীপ, এরকম সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেলেও জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। প্রায় দেড়শো বছর ধরে চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। কেন, বাবা?'

আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওর প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারছি। আজ সকালেই ওকে নতুন একটা খেলনা দিয়েছি, ইলেকট্রনিক পাখি। পাখিটা একটানা দশ সেকেন্ড উড়তে পারে, সুরেলা শিস দিয়ে ডাকতেও পারে। সারা সকাল রাকেশ ওটা নিয়ে খেলা করছিল। আর বিজ্ঞানী হিসেবে আমার

পরিচয়টা যে নেহাত ছোটখাটো নয় সেটাও ও জানে। তাই বিজ্ঞানী এবং পাখি, দুটো মিলিয়েই হয়তো গতকালের টিভি প্রোগ্রামটার কথা ওর এই মুহূর্তে মনে পড়েছে।

রাকেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছিল। কোনও উত্তর আশা করছিল অবশ্যই। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যের কথা ভাবছিলাম।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ছোট্ট এক চিলতে পাহাড়ি গ্রাম জাটিঙ্গা। সেখানে ঘন কুয়াশার রাতে, বাতাস থাকলে আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি হলে, আলোর টানে উড়ে আসে পাখিরা। ঠিক শ্যামাপোকার মতো। জাটিঙ্গায় খাসিয়া উপজাতির বাস। আবহাওয়া ঠিকমতো শর্ত পূরণ করলে তারা হ্যাজাক লণ্ঠন কিংবা সার্চলাইট জ্বেলে বসে থাকে পাহাড়ের ঢালে, রাস্তায়, বাড়ির উঠোনে। তাদের হাতে থাকে লিকলিকে বাঁশের লাঠি। আলোর টানে ছুটে-আসা পাখিদের আঘাত করে তারা পেড়ে ফেলে মাটিতে। কোনও কোনও পাখি আবার নিজে থেকেই ধরা দেয়, যেন আচ্ছন্ন, সম্মোহিত।

রাতের গাঢ় অন্ধকারে দিশেহারা অন্ধ পাখিরা কেন যে আলোর টানে উড়ে আসে তা কেউই জানে না। আরও আশ্চর্য, জাটিঙ্গা গ্রাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি দেখা যায়নি। গত দেড়শো বছর ধরে মাথা ঘামিয়েও বিজ্ঞানীরা এর কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে।

একটু হেসে রাকেশের মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বললাম, ‘পাখিদের এই রহস্যের উত্তর বোধহয় খুব সহজ নয়।’

রাকেশ এতক্ষণ পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই ইলেকট্রনিক পাখিসমেত একটা হাত সামনে নিয়ে এল। বোতাম টিপে দিতেই পাখিটা ডানা নাড়তে লাগল। শিস দিতে লাগল সুর করে।

রাকেশ পাখিটার পা-জোড়া ধরে রেখেছিল হাতে। ওটার নড়াচড়া দেখতে-দেখতে বলল, ‘মানুষের কাছে যে-প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন, পাখিদের কাছে সেটা হয়তো খুবই সহজ!’

ওর কথায় চমকে উঠলাম। সত্যিই তো! মানুষের মস্তিষ্ক প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, তাই কোনও কিছু সহজভাবে আমরা ভাবতে পারি না।

রাকেশের বুদ্ধি খুব বেশি নয়। ওর আই কিউ মাত্র পঁচানব্বই।

এখনকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়স হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। তারপর আই কিউ’র ফল অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও পেশা ঠিক করে দেওয়া হয় সরকার থেকে। রাকেশের বেশি পড়াশোনা করার অধিকার নেই। ট্রাফিক কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে ওকে সহজ-সাদামাটা কাজ নিতে হবে। ওকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়।

ছোটবেলায় ছেলেটা মা'কে হারিয়েছে, ফলে মাতৃস্নেহ পায়নি। কে জানে, সেইজন্যেই হয়তো ওর বুদ্ধির বিকাশ কিছুটা বাধা পেয়েছে। এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা করছে।

রাকেশের জন্যে আমার দুশ্চিন্তা যেমন, তেমনি দুঃখও কম নয়। এই মুহূর্তে ওকে ভীষণ ভালো লাগল। কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে একটু চুমু খেলাম। বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ। বুদ্ধি বেশি হলে সহজভাবে কিছু ভাবা যায় না। তাই মাঝে-মাঝে তোমাকে আমার হিংসে হয়।'

ন'টা বাজতে আর পনেরো সেকেন্ড বাকি। সুতরাং ওকে বললাম, 'সময় হয়ে গেছে, এখন যাই —।'

রাকেশের হাতে পাখিটা থেমে গিয়েছিল। ও আবার বোতাম টিপে দিল। আমার পিছনে ফ্ল্যাটের অটোমেটিক ইলেকট্রনিক দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, পাখিটার শিসের শব্দ। তারই মধ্যে রাকেশের শেষ কথাটা আমার কানে এসে বিঁধল, 'পাখিদের কাছে তোমরা হেরে গেলে, বাবা!'

সুপার-এলিভেটর পুরোপুরি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটি খাঁচা! তার চেহারা অনেকটা দু-মুখ কাটা পেনসিলের মতো। চৌম্বকক্ষেত্রের কারিকুরিতে ওটা কোনওরকম অবলম্বন স্পর্শ না করেই দ্রুত ওঠানামা করতে পারে, অনেকটা পুরোনো দিনের ম্যাগলেভ টেনের মতো।

একশো পঁচিশ তলা বাড়ির গা বেয়ে সুপার-এলিভেটর চলাচল করে। ফলে এখন বাইরের দুনিয়া দেখা যাচ্ছিল। আকাশ কালচে, ঘোলাটে। সেখানে কোনও পাখি নেই। যেদিকে চোখ যায়, শুধু আকাশছোঁয়া লিকলিকে বাড়ি। কোনওটা একশো, কোনওটা দুশো, কোনওটা বা তিনশো তলা উঁচু। জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বসবাস-সমস্যা মেটানোর জন্যেই এই আধুনিক ব্যবস্থা। তা ছাড়া সময়ের অপচয় বাঁচাতে প্রতিটি মানুষের অফিস ও বাড়ি একই বিল্ডিংয়ে। এর ওপরে বাধ্যতামূলক ঘড়ি-ক্যাপসুল তো আছেই। আঠারো বছর বয়সের পর সকলকেই ঘড়ি-ক্যাপসুল লাগিয়ে নিতে হয়।

অফিসে ঢুকলাম। আমি 'রোবোটিক্স ইনকরপোরেটেড' কোম্পানির টেকনিক্যাল ম্যানেজার। ইলেকট্রনিক খেলনা থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, সবকিছুই তৈরি করি আমরা। সারা পৃথিবী জুড়েই আমাদের কোম্পানির খুব নাম-ডাক।

আমার ঘরে ঢুকেই দেখি, একজন অতিথি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। জাপানের 'সুমিটোমো ইলেকট্রিক' কোম্পানির চিফ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার টাকাহাসি। কতকগুলো নতুন প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা বলতে টাকাহাসি এসেছে জাপান থেকে। ওর সঙ্গে গত তিনদিন ধরেই আমাদের মিটিং চলছে। মিটিংয়ের ফলাফল বেশ ভালো।

সুমিটোমো ইলেকট্রিক বেশ বিখ্যাত কোম্পানি। প্রায় দুশো বছর ধরে ওরা পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। সেই কোন ১৯০৮-তেই ওরা ইলেকট্রনিক রোবট তৈরি করেছিল, যার চেহারা ছিল অনেকটা মানুষের মতো। রোবটটা অরগান বাজাতে পারত, পা দিয়ে অরগানের ফুটপেডাল ব্যবহার করতে পারত। মেমোরি কোল থেকে বা নোটেশান শিট দেখে সুরেলা বাজনা বাজাত রোবটটা। তার শরীরে পঞ্চাশটা জয়েন্ট ছিল। সতেরোটা সিক্সটিন বিট মাইক্রোপ্রসেসর তাকে কোল করত। ওই সময়ে এরকম উন্নত একটা যন্ত্রের কথা ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়। আমরাও অনেক এগিয়েছি, তবে সুমিটোমো এখনও সবার সেরা।

রাকেশের কথাটা আমার মাথায় ঘুরছিল। পাখিদের কাছে আমরা হেরে গেলাম? আচ্ছা, পাখি দিয়েই রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করলে কেমন হয়? তাই টাকাহাসির মুখোমুখি বসেই ওকে প্রস্তাবটা দিলাম। বললাম, 'তোমাদের সব প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে চেষ্টা করব, কিন্তু তার বদলে তোমাকে একটা উপকার করতে হবে।'

টাকাহাসির মুখে সর্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব। ও বলল, 'বলো, কী করতে হবে?'

আমি বললাম, 'আমার একটা খেলনা-পাখি চাই। যে-পাখি চেহারায় আর গঠনে হবে হুবহু আসল পাখির মতো। তার পালক থাকবে, অন্য পাখিদের সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে থাকলে নকল বলে যেন বোঝা না যায়!'

টাকাহাসি বলল, 'ইজি, ভেরি ইজি।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'শুধু ওতেই হবে না, আরও আছে, পাখিটার টানা একমাস ওড়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। সে চোখ দিয়ে যা দেখবে, কান দিয়ে যা শুনবে তার ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্তত একমাসের মতো। আর ওই মিনিয়েচার ভিডিও ক্যাসেটটা এমন একটা ক্যাপসুলের মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কোনও দুর্যোগেই সেটা নষ্ট না হয়। আর সেটাকে সহজে খুঁজে পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা যেন থাকে, মানে—।'

এবারে টাকাহাসি আমাকে বাধা দিল, বলল, 'বুঝেছি, হারকিউলিস ক্যাপসুল। কিন্তু বললে না তো, পাখিটা দিনের পাখি না রাতের পাখি?'

আমি বললাম, 'দিনের পাখি।'

'আচ্ছা, ওটার চোখ আর কানের স্ট্রাকচার কীরকম হবে? কোন পাখির মতো?'

আমি বললাম, 'শুধু চোখ আর কান নয়, তার সবটাই হবে থ্রি টোড কিংফিশারের মতো।'

টাকাহাসিকে এই বিশেষ পাখিটার কথা বললাম, কারণ জাটিঙ্গায় কুয়াশার রাতে আলোর টানে থ্রি টোড কিংফিশার বা তিন আঙুলে মাছরাঙা প্রচুর আসে। শহরে এ-পাখি জোগাড় করা যাবে না। শুধু এ-পাখি কেন? শহরে এখন কোনও বাড়তি গাছপালা নেই, পশু নেই, পাখি নেই,

পোকামাকড়ও নেই। সবই রাখা আছে দেশের বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট জায়গায়, তাদের নিজস্ব পালনকেন্দ্রে। সেখান থেকেই একটা জ্যান্ত পাখি আনিয়ে টাকাহাসিকে দিয়ে দেব।

ভেতরে-ভেতরে টাকাহাসির বোধহয় কৌতূহল হচ্ছিল। ভাবছিল, এরকম গুণধর একটা খেলনা-পাখি আমার কেন দরকার। ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'এত সব কাজ খুব একটা তাড়াতাড়ি সারা যাবে না। আমাকে অন্তত তিরিশ দিন সময় দেবে তো?'

আমি বললাম, 'তা না হয় দিলাম। কিন্তু খরচ কীরকম পড়বে?'

টাকাহাসি হাসল, বলল, 'আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে পাখিটা তোমাকে আমরা উপহার দেব। পাখিটার শুধু একটাই গলদ থাকবে, ওর শরীরে কোনও হজমের ব্যবস্থা থাকবে না। থ্রি টোড কিংফিশাররা যেমন খায়, সেরকম ওটাও খাবে ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পরে-পরে সেই খাওয়াগুলোই ওর শরীর থেকে আবার বেরিয়ে যাবে। আর তোমার জন্যে উপহার বলেই তার মধ্যে অন্তত পাঁচশো জয়েন্ট আর একশোটা ব্রেন ফাংশান রাখার চেষ্টা করব। তা ছাড়া সুমিটোমোর সুনামটাও তো রাখতে হবে! এখন তুমি আমাকে একটা আসল পাখি জোগাড় করে দাও দেখি।'

আমি টেবিলে রাখা ট্রান্সিভারে কয়েকটা কথা বললাম। তারপর টাকাহাসিকে বললাম, 'পরশু তুমি দেশে রওনা হচ্ছ, তার আগেই পাখি তোমার হাতে পৌঁছে যাবে।'

টাকাহাসি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা করমর্দন করলাম। ওকে সব কথা খুলে বলতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছিল। কিন্তু উপায় কী! যাই হোক, জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যের এতদিনে হয়তো একটা সমাধান হবে।

কাজের শেষে সুপার-এলিভেটরে করে ঘরে ফেরার সময়ে একই কথা মাথায়
ঘুরছিলঃ রাকেশ, টাকাহাসির পাখি, জাটিঙ্গার রহস্য।

দেশের সমস্ত অঞ্চল এখন এমন হিসেব করে ভাগ করা হয়ে গেছে যে, নির্দিষ্ট জিনিস নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া পাওয়া যায় না। সবই বৈজ্ঞানিক চাহিদা অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরোনো দিনের স্মৃতি হিসেবে যে-কয়েকটা জায়গা আগের মতোই রেখে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে জাটিঙ্গা উল্লেখযোগ্য। পাখি-রহস্যের গবেষণার সুবিধের জন্যেই সেখানকার পরিবেশকে আধুনিক করে তোলা হয়নি। গাছপালা, পশু-পাখি, মানুষজন, সব দেড়শো বছর আগে যেমন ছিল তেমনই আছে।

ঠিক করলাম, টাকাহাসির পাঠানো পাখিটা পেলেই বিজ্ঞানীদের একটা ছোট দল নিয়ে চলে যাব জাটিঙ্গায়। কুয়াশার রাতে সেখানে ছেড়ে দেব পাখিটাকে। তারপর তার শরীরে ভিডিও ক্যাসেটটা প্লে-ব্যাক করে দেখার অপেক্ষা। কিন্তু টাকাহাসি পাখিটা ঠিকমতো তৈরি করতে পারবে তো?

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পৌঁছোতেই ইলেকট্রনিক চোখ আমার মুখের ছবি পরীক্ষা করে মিলিয়ে দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

রাকেশ ভিডিয়ো ক্যাসেট চালিয়ে নানারকম পাখির ছবি দেখছিল। আধুনিক শহুরে জীবনে পাখি চোখেই পড়ে না। সুতরাং আমাদের মনের বা চোখের চাহিদা মেটাতে ভিডিয়ো ক্যাসেটই সম্বল। এ-ধরনের বহু ভিডিয়ো ক্যাসেট সরকার থেকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। যেখানে যেটা দুষ্প্রাপ্য সেখানে সেই জিনিস দেখতে ইচ্ছে করলে সরকারি ক্যাসেটই একমাত্র মুশকিল আসান। রাকেশের সংগ্রহে প্রকৃতি আর বন্যপ্রাণীর বিষয়েই বেশি ক্যাসেট রয়েছে। তা ছাড়া, আর একটা ক্যাসেট ওর খুব প্রিয়, তাতে রয়েছে ওর মায়ের ছবি, আমিই একসময় তুলেছিলাম। মাঝে-মাঝেই ওর মা'কে ও ছবিতে দেখে, তখন আমিও দেখি। কষ্ট হয়। অথচ গোপন রাখতে হয়। কষ্ট প্রকাশ করা এক ধরনের দুর্বলতা।

রাকেশকে বললাম টাকাহাসির পাখির কথা। শুনে ও খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠল। বলল, 'জাটিঙ্গায় আমাকে নিয়ে যাবে, বাবা?'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'দেখি।'

এমনিতেই আমি অফিসে গেলে ছেলেটা প্রায় সারাদিন একা-একা থাকে। হয় কম্পিউটার টিচারের সামনে বসে পড়াশোনা করে, না হয় খেলা করে, নয়তো টিভি বা ভিডিয়ো দেখে। আমি চার-পাঁচদিনের জন্যে ওকে ছেড়ে গেলে ও কি একা-একা থাকতে পারবে? ঠিক করলাম, টাকাহাসির পাখিটা আগে হাতে পাই, তারপর রাকেশকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে বিশেষ অনুমতি চাইব। উনি নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। কারণ, আমার এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয় তাহলে 'রোবোটিক্স ইনকরপোরেটেড'-এর নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য সুমিটোমো ইলেকট্রিকও সেই সুনামের ভাগ পাবে। তখন টাকাহাসি একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

আমি ভীষণ অধীর হয়ে পড়ছিলাম। রাকেশের ইলেকট্রনিক পাখিটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপে দিলাম। ওটা ডানা নেড়ে শিস দিয়ে উঠল। আমার চোখের সামনে একটা কুয়াশার রাত ভেসে উঠছিল। সেখানে হ্যাজাকের আলোর চারপাশে একটা ছোট্ট মাছরাঙা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। আর কতকগুলো লিকলিকে বাঁশের লাঠি শাঁই-শাঁই শব্দে ওটাকে আঘাত করার চেষ্টা করছিল।

টাকাহাসির পাখি চল্লিশ দিন পরে হাতে পেলাম। চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছোট্ট পাখি। লাল ঠোঁট। গায়ে বেগুনি, নীল, লাল, কালো, অনেকরকম রং। পায়ে তিনটে করে আঙুল। ও পাখিটার নাম দিয়েছে 'অরনিথো মার্ক ওয়ান' বা সংক্ষেপে ও. এম. ওয়ান। আমি যেমন চেয়েছিলাম তারচেয়েও অন্তত দশগুণ উন্নত পাখি তৈরি করে পাঠিয়েছে টাকাহাসি। আসল-নকলে তফাত বোঝার কোনও

উপায় নেই। আমার কথামতো হারকিউলিস ক্যাপসুলও বসিয়ে দিয়েছে ও। সেই ক্যাপসুল থেকে প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে একটা বিশেষ বেতার-তরঙ্গ। ক্যাপসুলটা যেখানেই হারিয়ে যাক না কেন, ওই বেতার-তরঙ্গের সূত্র ধরে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে টাকাহাসিকে একটা ভিডিও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। এবং পরদিনই সুপার-ক্র্যাফটে চড়ে আমরা চারজন বিজ্ঞানী রওনা হয়ে গেলাম জাটিঙ্গার উদ্দেশে। বিশেষ অনুমতি পেয়ে যাওয়ায় রাকেশকেও সঙ্গে নিতে কোনও অসুবিধে হল না।

জাটিঙ্গায় পৌঁছে একটা বার্ড ওয়াচিং টাওয়ারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। যন্ত্রপাতি গোছগাছের পর ওএম ওয়ানকে আমরা ছেড়ে দিলাম। পাখিটা দিব্যি উড়ে গিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল। রাকেশ মুগ্ধ হয়ে জঙ্গল-পাহাড়-গাছপালা দেখছিল। বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। হঠাৎই বলল, 'বাবা, জায়গাটা কী সুন্দর! আমাদের ঘরবাড়ি যদি এখানে হতো!'

অন্য বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে রাকেশের দিকে তাকাল। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কিছু মনে করবেন না, ওর বুদ্ধি কম, তাই এরকম উদ্ভট কথা বলে।'

তারপর রাকেশকে কাছে টেনে নিয়ে ওর পিঠে হাত রাখলাম। দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। ও মুগ্ধ হয়ে সেদিকে দেখছে। ধীরে-ধীরে ভেসে আসছে ভিজে কুয়াশা, ক্রমশ ঢেকে ফেলছে জাটিঙ্গা গ্রামকে। আজ রাতে আলোর টানে হয়তো পাখিরা আসবে।

কিন্তু না। ঘটনা ঘটল চারদিন পর। আবহাওয়ার শর্ত ঠিক-ঠিক পূরণ হল সেদিন। ফলে রাত বারোটা নাগাদ সত্যিই পাখিরা এল। অন্ধকার কুয়াশায় তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়তে লাগল। এর মধ্যে ওএম ওয়ান আছে কি না কে জানে!

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সুপার-ক্র্যাফটে চড়ে আমরা আকাশে ভেসে পড়লাম। আধুনিক এই যন্ত্রযান একেবারে নিঃশব্দে উড়ে চলে। ফলে নির্বিঘ্নে পরিদর্শনের কাজ সেরে ফেলা গেল। তবে মাঝে-মাঝে আমাদের অবলোহিত রশ্মি ও উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করতে হল।

আমি আগে অনেকবার জাটিঙ্গায় এসেছি। আর রাকেশ এসেছে এই প্রথম। তাই অবাক চোখে ও নীচের গ্রামটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ছোট্ট পাহাড়ি টিবির ওপরে বহু জায়গাতেই হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে পাখিরা উড়ছে। লাঠি চালানোর শব্দ হচ্ছে বাতাসে।

যখন আমরা পর্যবেক্ষণ শেষ করে নেমে আসছি ঠিক তখনই আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়ল, ওএম ওয়ানকে কেউ আঘাত করেছে! তাহলে নিশ্চয়ই টাকাহাসির পাখিটা হ্যাজাকের আলোর টানে গ্রামে গিয়ে পড়েছে! সুতরাং তড়িঘড়ি সুপার-ক্র্যাফট ল্যান্ড করানোর নির্দেশ দিলাম।

তাড়াহুড়ো করে সুপার-ক্র্যাফট থেকে আমরা নেমে এলাম। তারপর রাকেশকে টাওয়ারে অপেক্ষা করতে বলে আমরা চারজনই সাজসরঞ্জাম নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। যে করে

হোক, হারকিউলিস ক্যাপসুল আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কিন্তু সে-রাতে সমস্ত খোঁজাখুঁজিই ব্যর্থ হল।

ক্যাপসুলটা খুঁজে পেলাম পরদিন সকালে। পাহাড়ি ঢালের ওপরে একটা ঝোপের পাশে পড়ে ছিল টাকাহাসির পাখির ধ্বংসাবশেষ। রঙিন পালকগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে চারপাশে। শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতি ছত্রখান। পাশেই দুটো খাটো পাথরের মাঝে পোড়া কাঠকুটো, ছাই, আর অন্য কয়েকটা পাখির পালক চোখে পড়ছে।

একটু খুঁজতেই কালো ক্যাপসুলটা পাওয়া গেল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আমরা টাওয়ারে ফিরে চললাম। উত্তেজনায় বুক টিপটিপ করছে। এই ছোট্ট ক্যাপসুলটার মধ্যেই হয়তো রয়েছে দেড়শো বছরের পুরোনো প্রশ্নের উত্তর। এক্ষুনি হেডফিসে ফিরতে হবে আমাদের। তারপর...।

কোম্পানির অন্ধকার প্রোজেকশান রুমে বসে আছি আমরা ছ'জন মানুষ। আমাদের একাগ্র চোখ সামনের ছোট পরদায়। হারকিউলিস ক্যাপসুলের ভেতর থেকে পাওয়া ভিডিয়ো ক্যাসেটের শব্দ ও ছবি ফুটে উঠছে সেখানে। এক দুর্লভ চলচ্চিত্র হাতে পেয়েছি আমরা। পাখির চোখ দিয়ে দেখা রহস্যের ছবি, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে গোপন চাবিকাঠি।

ঘরে আমরা চারজন ছাড়া আর যে-দুজন রয়েছেন, তাঁরা হলেন রোবোটিক্স ইনকরপোরেটেড কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ন্যাশন্যাল টেকনিক্যাল কমিটির ডিরেক্টর। জাটিঙ্গার পাখি-রহস্য নিয়ে ওঁদের আগ্রহও নিতান্ত কম নয়।

প্রথমে প্রকৃতির নানা ছবি ভেসে উঠল পরদায়। গাছপালা, আকাশ, পাহাড়, সবকিছুই আমাদের চোখে চেনা, তবে তাদের রংগুলো যেন অন্যরকম। কিছু রং চেনা, কিছু রং অচেনা। আবার একাধিক রঙের বিচিত্র মিশ্রণও চোখে পড়ল। আমাদের দলের কালার টেকনোলজিস্ট ভদ্রলোক বললেন, আমরা যে-সাতটা রং দেখি, পাখিরা কেউ-কেউ তার কম দেখে, কেউ বা তার বেশি দেখে। থ্রি টোড কিংফিশারের ব্যাপারটা আমাদের ঠিক জানা নেই, তবে মনে হচ্ছে ওই কারণেই রঙের চেহারাগুলো অন্যরকম লাগছে।

এরপর পরদা অন্ধকার হয়ে গেল। রাত নেমেছে নিশ্চয়ই। আর তার অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল এক আশ্চর্য ছবি।

জ্যামিতির গঠনের অসংখ্য ত্রিমাত্রিক ফুলের ছবি ফুটে উঠল পরদায়। ঠিক ক্যালিডোস্কোপের নকশার মতো। অদ্ভুত তাদের বর্ণ, অদ্ভুত তাদের সুষম আকার। ছোট-বড় নানান আলোর ফুল ভেসে বেড়াচ্ছে পরদায়। এরকম রং আমরা কখনও দেখিনি, এরকম ফুলও নয়। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

চেয়ারম্যান জিগ্যেস করলেন, 'এ কী! এরকম আশ্চর্য ফুল এল কোথা থেকে?'

অন্ধকারে আমার পিছন থেকে কে যেন জবাব দিল, 'জানি না। তবে হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো কুয়াশার কণার মধ্যে দিয়ে পাখিদের চোখে যখন আসে তখনই হয়তো এরকম বিচিত্র ফুলের বর্ণালি তৈরি হয়। জাটিঙ্গার কুয়াশায় হয়তো এমন কিছু আছে যাতে...।'

আমি বললাম, 'ওখানকার চৌম্বকক্ষেত্রের খাপছাড়া ধরনটা আগেই বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছিল। তা ছাড়া ওই অঞ্চলে অনেকবার ভূমিকম্প হয়েছে, অল্প তেজস্ক্রিয়তারও সন্ধান পাওয়া গেছে। তার ওপরে মহাজাগতিক কণার অস্বাভাবিক স্রোত ধরা পড়েছে ওখানকার আবহাওয়ায়। এইসব মিলেমিশে যদি জাটিঙ্গার কুয়াশা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

আমাদের চোখের সামনে তখনও অসংখ্য বিচিত্র ফুলের ফুলঝুরি ফুটছিল। এই অদ্ভুত জিনিস দেখেই তাহলে অন্ধকার ভেদ করে আলোর কাছে ছুটে যায় রহস্যময় পাখিরা? এত সহজ, এত সরল ওদের আকর্ষণ!

সুন্দরের প্রতি আমাদের টান দিন-দিন কত কমে গেছে। কিন্তু পাখিরা? গত দেড়শো বছর ধরেও ওদের সেই টান এতটুকু কমেনি। আজও সুন্দরের টানে ছুটে গিয়ে প্রাণ দিতে ওরা ভয় পায় না।

অন্ধকার ঘরে বসে পরদার বিচিত্র রঙের ত্রিমাত্রিক ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা ছ'জন বুদ্ধিমান মানুষ হয়তো একই কথা ভাবছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে রাকেশের কথাটা ভেসে এল আমার কানেঃ 'পাখিদের কাছে তোমরা হেরে গেলে, বাবা?'



হারিয়ে যাওয়া

প্রথমে গিয়েছিল বিক্রম শর্মা আর রণবীর সেন।

তার দু-মাস পরে সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। কিন্তু ওরা কেউই ফিরে আসেনি ওই রহস্যে-ঢাকা প্রাচীন জঙ্গল ফরেস্ট-এক্স থেকে! গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্যপ্রকৃতির বুকে খুশিমতো বেড়ে উঠে ঘন হয়েছে ওই রহস্যময় জঙ্গল।

গবেষণার প্রয়োজনে ওটাকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল, প্রতি একশো বছর অন্তর-অন্তর অভিযান চালানো হবে ওই জঙ্গলের অভ্যন্তরে। খতিয়ে দেখা হবে তার গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর বিবর্তনের নানা লক্ষণ। পর্যবেক্ষণ করা হবে তাদের আচার-আচরণ-প্রকৃতি।

আর সেইমতোই শুরু হয়েছিল প্রথম অভিযান।

তারপর...।

'সোল কোল'-এর চিফ ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী টেবিলে রাখা কম্পিউটার টার্মিনালের বোতাম টিপলেন। ভিডিয়ো পরদায় ফুটে ওঠা সবুজ লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ ছোট হল।

আমি টেবিলের এ-প্রান্তে বসে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। কাজ ছাড়া আমার মন বসে না। অলস থাকলে আমার অ্যালার্জি হয়। অবশ্য শুধু আমার নয়। অপারেশান ডিভিশনের সকলেরই এই একই অভ্যেস। মনোবিজ্ঞানের নানান পরীক্ষার মাধ্যমে অপারেশান ডিভিশনের লোক বাছাই করা হয়। তার মধ্যে দুটি প্রধান শর্ত হলঃ প্রার্থীকে কাজ-পাগল হতে হবে এবং তার মধ্যে কল্পনার ছিটে-ফোঁটাও থাকবে না। ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী কম্পিউটার ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'দাস, আপনাকে সংক্ষেপে ওদের হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। তবে কম্পিউটারের

মেমোরিতে এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য রয়েছে। আপনাকে তার একটা কপি করে দিচ্ছি। সময়মতো দেখে নেবেন।'

ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। একটা লুকোনো সুইচ টিপতেই টেবিল ফুঁড়ে দু-গ্লাস শরবত উঠে এল। ব্রিগেডিয়ার ইশারা করতেই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটা গ্লাস তুলে নিলাম। এই শরবতই আমাদের সোল কোল অফিসের একমাত্র সুষম পানীয়। এর সমস্ত উপাদান বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক করেছেন। এই শরবত কর্মঠ লোকেদের কাজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ব্রিগেডিয়ার ধীরে-ধীরে কথা বলছিলেন, 'দাস, আপনি হয়তো জানেন, প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে গত আড়াইশো বছর ধরে আমরা বিচ্ছিন্ন। সারা পৃথিবীতে এমন সিনথেটিক ঘেরাটোপে ঢাকা চল্লিশ হাজার দুশো শহর রয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচার জন্যে এই ঘেরাটোপের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া, ঘেরাটোপের মধ্যে আমরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—খুশিমতো। ঘেরাটোপের এই কৃত্রিম অথচ আরামের পরিবেশে স্বস্তির মধ্যে বেড়ে উঠেছি আমরা। ফলে বাইরের প্রকৃতিতে পা রাখিনি। আমাদের মধ্যে যারা বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চায় তাদের এই অভ্যেস করানো হয় ছোটবেলা থেকেই।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'জানি, স্যার।'

কারণ আমাকেও এই অভ্যেস করানো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। এখানকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়েস হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। এ-ছাড়া, তাদের নিয়ে অন্যান্য দৈহিক এবং মানসিক পরীক্ষাও চালানো হয়। এইসব পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সরকার থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও পেশা। এইসব পরীক্ষার রেজাল্ট দেখেই আমাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল সোল কোলের জন্যে। তারপর আট বছর পরে আবার একদফা পরীক্ষা নিয়ে তবেই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সোল কোলের অপারেশান ডিভিশনে।

সোল কোলে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে বাইরের পরিবেশে রপ্ত করানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে সোশ্যাল লাইসেন্স। এরকম লাইসেন্স ওদেরও ছিল। ওই হারিয়ে যাওয়া চারজনেরঃ বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। সুতরাং বাইরের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তা-ছাড়া, ওদের সঙ্গে ছিল অভিযানের উপযুক্ত আত্মরক্ষার আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র, আর প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও...।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী শরবতের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চিন্তাজড়ানো গলায় বললেন, 'দাস, বাইরের পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তবে ফরেস্ট-এক্স, আমাদের সংরক্ষিত ওই জঙ্গল, ওদের কাছে নতুন। শর্মা আর সেন যখন রওনা হয় তখন আমরা ঠিক করেছিলাম, অভিযান শেষ করতে হবে দশদিনের মধ্যে। কিন্তু দু-মাস পরেও যখন ওরা ফিরল না, তখন পাঠালাম সিং আর মহান্তিকে। বুঝতেই পারছেন, ওরা পুরোপুরি আর্মড ছিল। ওদের সঙ্গে যে-ব্লাস্টার ছিল তা দিয়ে ফরেস্ট-এক্সকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যে-কোনও হিংস্র জন্তু ওই ব্লাস্টারের আক্রমণে স্রেফ ধুলো হয়ে যাবে। অথচ তা সত্ত্বেও ওই চারজনের কেউই ফিরে এল না। ব্যস, অভিযান মাথায় থাক, এখন দুশ্চিন্তায় গোটা সোল কোল ভেঙে পড়েছে। গভর্নমেন্ট নানা সন্দেহ করছে। যেখানে গত দুশো বছরে সারা পৃথিবীতে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র দশ হাজার মানুষ, সেখানে তিন মাসের মধ্যে চার-চারজন স্পেশ্যালিস্ট নিরুদ্দেশ! আনথিংকেবল, দাস। সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি।'

আমার শরবত শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার আবার লুকোনো বোতামটি টিপলেন। খালি গ্লাস দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল টেবিলের গহ্বরে। টেবিল আবার যথারীতি মসৃণ। জানি, আমাদের চোখের আড়ালে ওই গ্লাস দুটো পরিষ্কার ও স্টেরিলাইজড হয়ে অপেক্ষা করবে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহারের জন্যে।

ব্রিগেডিয়ারের আঙুল আবার চলে গেল কম্পিউটারের কি-বোর্ডে। দ্রুত নড়াচড়া করল বোতামের ওপরে। ভিডিয়ো পরদায় জটিল রঙিন ছবি ফুটে উঠল। ব্রিগেডিয়ার আপনমনেই বললেন, 'ফরেস্ট-এক্স-এর টোপোলজিক্যাল ম্যাপ।' বলে একটি বোতাম টিপে ম্যাপের একটা ছাপা কপি বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর পরদায় ফুটিয়ে তুললেন হারিয়ে-যাওয়া বিজ্ঞানীদের রুট-ম্যাপ। বের করে নিলেন সেটারও হার্ড কপি। আর সবশেষে অনেক পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিয়ে আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'এতে অভিযান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দিলাম। এ-ছাড়া পাবেন ফরেস্ট-এক্স-এর বিষয়ে সমস্ত খবর—সেখানে আবহাওয়া কীরকম, কোন-কোন ধরনের প্রাণী ওখানে আছে বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে। অবশ্য এসবই একশো বছরের পুরোনো। তবু যদি আপনার কোনও কাজে লাগে।'

কম্পিউটার টার্মিনাল ছেড়ে ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারের বায়ুচাপ সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারটা ইঞ্চি-চারেক উঁচু হল। তখন তিনি কম্পিউটারের প্রিন্ট আউটের পুরো গোছাটা পলিথিন কভারে মুড়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতে দিলেন। তারপর চেয়ারটাকে আবার ঠিক করে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। শেষে বললেন, 'মনে করুন ফরেস্ট-এক্স-এ গিয়ে আপনি দেখলেন...।'

ব্রিগেডিয়ার বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না। ভাবছিলাম, প্রায় চার বছর পরে আমি আবার 'বাইরে' যাব। আর এবারের যাওয়াটা অন্যান্য বারের মতো নয়। অন্যান্য বারে আমি বাইরে থেকেছি বড় জোর বারো ঘণ্টার জন্যে। সে নতুন কাউকে বাইরের আবহাওয়ায় অভ্যেসের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে, নয়তো কোনও অটো-টানেল পরীক্ষা করার জন্যে, অথবা কোনও মহাকাশযান রওনা হওয়াকালীন নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু এবারের অপারেশান অন্যরকম।

'...হঠাৎ করে যদি এইরকম কোনও ঘটনা হয়, তখন আপনি কী করবেন, দাস?'

আমার খেয়াল হল, ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে দেখছেন। আমার জবাবের অপেক্ষা করছেন। তিনি আবার বললেন, 'বলুন দাস, তখন আপনি কী করবেন?'

আমি হাসলাম। বুকের কাছে লুকোনো আধুনিক জেনারেটর গানটা একবার অনুভব করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার কথা আমি কিছুই শুনিনি, স্যার...।'

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর মুখ লালচে হতে লাগল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, 'শুনিনি, কারণ ধরি, মনে করি, যদি, হয়তো, সম্ভবত, এইসব শব্দ দিয়ে কোনও কথা শুরু হলে আমি বাকিটা আর শুনি না। কল্পনার ওপরে আমার কোনও আস্থা নেই, স্যার।'

ব্রিগেডিয়ার যে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি ওঁকে অপমান করতে চাইনি। কারণ, এটাই আমার বরাবরের অভ্যেস। শুধু আমার কেন, আমাদের অপারেশান ডিভিশনের প্রত্যেকেরই। আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী আমার সম্পর্কে পুরো খোঁজখবর না নিয়ে আমাকে ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারে ডেকেছেন, তা আমি মনে করি না। উনি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্রতিটি মানুষের পার্সোনাল কম্পিউটার কোড জানেন এবং টার্মিনালের বোতামে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে যে-কোনও সময়ে পড়ে ফেলতে পারেন আমাদের আগাপাশতলা ইতিহাস। তাহলে এই মুহূর্তের অপমানিত ভাবটুকু কি ব্রিগেডিয়ারের অভিনয়?

ঠিক সেই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের ডানদিকে রাখা একটা ছোট্ট টিভির পরদায় একটা সবুজ সঙ্কেত ফুটে উঠল। দু-বার বিপ-বিপ শব্দ শোনা গেল। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার পরদার দিকে তাকালেন। ততক্ষণে সেখানে একজন লোকের রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে এবং সেই অতিথি ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

টিভির সামনে রাখা মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী একটা কোড নম্বর বললেন। পরক্ষণেই পালটা একটা নম্বর শোনা গেল স্পিকারে। ব্রিগেডিয়ার হাসলেন। বললেন, 'প্লিজ কাম ইন।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু সুরেশ চোপরা। আট বছর ধরে মিশিগানে ছিল। মহাকাশযানের কঠিন জ্বালানি নিয়ে গবেষণা করছিল।

এখন চলে আসছে জাপানে। সেই ফাঁকে একমাস ভারতে থাকবে। আজ আমাদের সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারটা...।'

আমি নির্লিপ্তভাবে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর কথাগুলো শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, সুরেশ চোপরার জীবনী জেনে আমার লাভ কী। আর ফরেস্ট-এক্স-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কী?

ইতিমধ্যে সুরেশ চোপরা ঘরে ঢুকে পড়েছেন এবং ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে করমর্দনের পর একটা বাতাস-চেয়ারে বসেও পড়েছেন। আমি ভাবছিলাম, এবারে বিদায় নিলে হয়, কিন্তু চিফ না নির্দেশ দিলে সেটা ভালো দেখায় না। সুতরাং চুপচাপ বসে রইলাম।

সুরেশ চোপরা ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছিলেন—পুরোনো, নতুন, নানা কথা। আর ওঁরা দুজনেই খুব হাসছিলেন। কথায়-কথায় সময় কাটতে লাগল। একসময় একগ্লাস শরবত টেবিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সুরেশ চোপরার জন্যে। তিনি তখন মিশিগানের নানা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। কথা থামিয়ে শরবতে চুমুক দিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

একহাতে শরবতের গ্লাস ছিল। অন্য হাতে ব্লাস্টারটা বের করে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাক করে ধরলেন সুরেশ চোপরা। তাঁর মুখের হাসি, শরবতের গ্লাস ধরে রাখার ভঙ্গি, এমনকী, ব্লাস্টার বের করে আনার কাজটিও এত স্বাভাবিক যে, চট করে তা নজর কাড়ে না।

কিন্তু আমার নজর কাড়ল।

স্লো মোশনে আমি সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম। ব্রিগেডিয়ারের মুখে একটা ফ্যাকাসে পরদা ছড়িয়ে গেল চকিতে। প্রযুক্তি এখন লক্ষ গুণে উন্নত হয়ে উঠলেও মানুষের কয়েকটি মৌলিক প্রতিক্রিয়া এখনও বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেইজন্যেই সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফও ভয় পেলেন—মৃত্যুভয়। আর তখন সুরেশ চোপরার একটু আগের হাসিখুশি ভাবটা খুব ধীরে পালটাচ্ছিল।

আমার কাছে এই সুরেশ চোপরা লোকটা একজন অচেনা আগন্তুক ছাড়া কিছু নয়। সে হঠাৎ করে চিফের ঘরে ঢুকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ব্লাস্টার তুলে ধরেছে। চুলোয় যাক মিশিগানের গবেষণার গল্প, আর চিফের সঙ্গে লোকটার পুরোনো বন্ধুত্বের কাহিনি। এসব নির্ভেজাল সত্যি কি না তার কোনও প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।

সুতরাং কয়েকশো মিলিসেকেন্ড ভাবনাচিন্তার পর আমি মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আধ পাক গড়িয়ে চোপরার বাতাস-চেয়ারে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। এবং জেনারেটর গান তাক করে লো-লেভেল ফায়ার করলাম।

লাথির চোটে চোপরা টাল খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। তার ওপর লো-লেভেল ফায়ারে পলকে অসাড় হয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন।

টিগারে চাপ দিলে জেনারেটর গান থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। এই আহিত কণার তীব্রতা তিন রকমের হয়ঃ লো-লেভেল, হাই-লেভেল, আর আলট্রা-হাই-লেভেল। লো-লেভেল ফায়ারে কোনও মানুষ ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে শুধু অসাড় হয়ে থাকে। হাই-লেভেলে তার চেতনা ফিরবে সাত দিন চিকিৎসার পরে। কেউ-কেউ আবার ওপরেও চলে যায়। আর আলট্রা-হাই ফায়ারিংয়ে সরাসরি নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। যেহেতু চিফের কথা সত্যি কিংবা মিথ্যে দুই-ই হতে পারে তাই চোপরাকে লো-লেভেল ট্রিটমেন্ট করেছি। সত্যি-সত্যি চিফ কোনও পুরোনো বন্ধু হারান তা আমি চাই না।

মেঝে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি ব্রিগেডিয়ার আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তাঁকে খানিকটা উদ্বিগ্নও মনে হল। সেটার কারণ আঁচ করতে পেরে আমি বললাম, ‘লো-লেভেল ডোজ দিয়েছি, স্যার। কিন্তু সত্যিই কি উনি আপনার বন্ধু?’

চিফ হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, ওকে আমি আসতে বলেছিলাম। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে। আর আমি চোপরা সম্পর্কে আপনাকে আগে থাকতেই সাজেশন দিয়েছিলাম যাতে আপনি ওকে নিরাপদ মনে করেন। সেই অবস্থায় দেখতে চাইছিলাম আপনি কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে পারেন।’

আমি সামান্য হেসে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, ‘পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?’

চিফ বললেন, ‘বসুন, দাস।’

আমি বসলাম।

‘এই পরীক্ষা আমি করেছি আপনার কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যে নয়। শুধু এটা দেখতে যে, ফরেস্ট-এক্স থেকে আপনার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কি না।’ ব্রিগেডিয়ারের গলার স্বর কিছুটা ভারী হলঃ ‘আমার ধারণা ওই গভীর জঙ্গলে এমন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে যাকে আমাদের আধুনিক কোনও অস্ত্র ঘায়েল করতে পারে না। আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি হয়তো প্রাণ দিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর আক্রমণে। আমাদের অজানা-অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। কিন্তু আমি চাই, আপনি ফিরে আসুন। ওদের জীবিত অথবা মৃত সঙ্গে নিয়ে—অথবা না নিয়ে। আপনাকে আমি ফেরত চাই, দাস। কারণ ফরেস্ট-এক্স-এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।’

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী। গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন বোধহয়। তারপর মুখ তুলে বললেন, ‘আপনি কাল ছ’টার সময়ে রওনা হয়ে পড়ুন। সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি রিপোর্ট ব্যাক না করেন তা হলে ব্যাপারটা রীতিমতো মারাত্মক হয়ে

উঠবে। তখন হয়তো ওই বায়োরিজার্ভটাকে—মানে, ফরেস্ট-এক্সকে ডেস্ট্রয় করে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। এনিওয়ে, আই ওয়ান্ট য়ু ব্যাক, দাস—অ্যাট এনি কস্ট।'

'আমি তা হলে কাল ছ'টার সময় রওনা হচ্ছি, স্যার।'

'হ্যাঁ। উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।' ব্রিগেডিয়ার শুভেচ্ছা জানালেন আমাকে। তারপর আমি যেই উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি উনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'এ-ঘরের কথাবার্তা কারও সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে চোপরার ব্যাপারটা। আর অপারেশান ডিভিশনের চিফকে যেটুকু বলার আমি বলে দিছি।'

'ওকে, স্যার।' বলে সুরেশ চোপরার দিকে একবার দেখলাম। পাথর হয়ে শুয়ে আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবে মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে। দেড় ঘণ্টা হতে এখনও এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট দেরি!

অটো টানেলের স্বচ্ছ দেওয়াল ঘণ্টায় পাঁচশো কিলোমিটার বেগে পিছনে ছুটে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে গাড়িতে বসে আছি। কারণ অটো টানেলে যেসব গাড়ি চলে সবই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত।

ঘেরাটোপে ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে অটো স্টেশনে এসে আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নিজস্ব গাড়ি বেছে নিয়েছি। এই বেছে নেওয়ার কাজটা কম্পিউটার পরিচালিত। আইডেন্টিফিকেশান ও ভয়েস চেক পজিটিভ হলেই অটো টানেলের লক খুলবে। তারপর গাড়িতে উঠে ভ্রমণের সম্পূর্ণ মানচিত্র গাড়ির কম্পিউটারের বোতাম টিপে জানাতে হবে। তা হলেই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমান' গাড়ি যাত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। গাড়িগুলোতে দুজনের বসার জায়গা আছে। তবে আমি চলেছি একা।

আমাদের কাছাকাছি শহরগুলো সবই অটো টানেল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। আর দূরের যাত্রাপথে আমরা স্পেস-প্লেন ব্যবহার করি। এই প্লেন আবহাওয়ামণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে যায় মহাশূন্যে। তারপর মোট উড়ানের সিংহভাগটাই সম্পন্ন করে মহাশূন্যে। অবশেষে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে আবহাওয়ামণ্ডল কেটে নেমে আসে নির্দিষ্ট প্লেন-পোর্টে।

ফরেস্ট-এক্স-এ যাওয়ার জন্যে স্পেস-প্লেন আমি পছন্দ করিনি। কারণ তাতে জেট ল্যাগের জন্য শরীর ভারী হয়ে থাকে। আমার কাজ শুরু করতে অসুবিধে হবে। তাই অপেক্ষাকৃত আরামের অটো টানেল ভ্রমণই বেছে নিয়েছি। অটো টানেলের গাড়ির কোনও চাকা নেই। ম্যাগনেটিক লেভিটেশানে টানেলের অটোলাইন থেকে কয়েক মিলিমিটার ওপর দিয়ে ভেসে চলে। সুতরাং ঝাঁকুনির কোনও ব্যাপার নেই। আর ইচ্ছে করলে গাড়ির গতিবেগ আমি ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত তুলতে পারি। কিন্তু আমার কোনও তাড়া নেই। বরং ধীরেসুস্থে সম্পূর্ণ তাজা

অবস্থায় আমি ফরেস্ট-এক্স-এর সীমানায় পৌঁছোতে চাই। যে করে হোক—হারানো চারজনকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। যে করে হোক।

আমি চোখ খুললাম। সাপের মতো টানেল ধরে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। পাশের সিটে রাখা ব্রিগেডিয়ারের দেওয়া কম্পিউটার প্রিন্ট আউটগুলো তুলে নিলাম। এর আগে তিনবার এগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি ওই চারজনের মধ্যে কোথায়-কোথায় মিল রয়েছে, আর কোথায়ই বা অমিল। এ-ছাড়া, ফরেস্ট-এক্স-এর প্রাণীর তালিকাটাও দেখেছি বারবার। তাদের বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে ছবি। ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি কোন ভয়ঙ্কর জন্তু ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি। তবু আর একবার ওগুলো পড়তে শুরু করলামঃ প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ...। তারপর নিজের মনেই বললাম, বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি,...তোমরা হারিয়ে গেলে কেন?

এমনসময় চোখ গেল কম্পিউটার ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে। ফরেস্ট-এক্স স্টেশনে পৌঁছোতে আর আধঘণ্টা বাকি। এই সময়টুকু দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

অটো টানেল স্টেশনের পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। মাথার ওপর থেকে গাড়ির স্বচ্ছ ছাদ সরে গেল। দরকারি একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে। ছাদ আবার জায়গামতো বসে গেল। পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে রিকগ্‌নিশান লক করে দিলাম। আমি ছাড়া এই গাড়ি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ির কম্পিউটার-চোখ শুধুমাত্র আমাকে চিনতে পারলেই দরজা খুলবে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঘেরাটোপে ঢাকা স্টেশনের এক নির্জন কোণে কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হারিয়ে যাওয়া ওই চারজনকে নিয়ে যখন আমি ফিরে আসব তখন আমার জন্যে বাড়তি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে এই কম্পিউটার টার্মিনাল। এই স্টেশনটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অধীনে। সুতরাং এখন এখানে মানুষ বলতে একমাত্র আমি।

কম্পিউটার চালু করে টার্মিনালের বোতাম টিপে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ঠিকমতো স্টেশনে পৌঁছেছি এবং এক্ষুনি কাজে নামছি। তারপর প্যাকেট খুলে জারকোনিয়াম অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়া বিশেষ ধরনের সিনথেটিক পোশাক বের করে পরে নিলাম। এই পোশাক আগুন, তাপ, জল ও জীবাণুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। জেনারেটর গান, লেসার ব্লাস্টার, বিপার ইত্যাদি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরীক্ষা করে পোশাকের নানা জায়গায় ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর ট্রান্সমিটার ও ঘন খাবারের টিন কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরোলে সবসময়েই দেখেছি শরীর ও মনের ওপরে একটা ধাক্কা লাগে। অথচ বাইরে আমি সব মিলিয়ে প্রায় দুশো ঘণ্টারও বেশি সময় থেকেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে বাইরের জগৎটাকে সবসময় নতুন বলে মনে হয় কে জানে!

মাঝ-বেলার সূর্যের কিরণ পিঠের ওপরে আছড়ে পড়ছে। বাতাস বইলেও সেটা পোশাকের জন্যে টের পাচ্ছি না। তবে দেখতে পাচ্ছি, লম্বা-লম্বা ঘাসের ঝোপ এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সামনে দূরে ছোট-বড় পাথুরে টিলা। আর অসমান জমিতে আগাছার জঙ্গল। বাইরের নির্জন বিশালতা আমাকে যেন একটু ভয় পাইয়ে দিল।

কিছুটা দূরেই চোখে পড়ছে ফরেস্ট-এক্স। ঘাসের ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল সেদিক পানে যতই এগিয়েছে ততই যেন ঘন হয়েছে, আর উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। তারপর শুরু হয়েছে সবুজ পাতায় ঢাকা মহীরুহের জটলা।

পকেট থেকে গ্রাফিক্স রুট-ম্যাপটা বের করে নিলাম। তারপর রওনা হলাম।

জঙ্গলের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। জঙ্গল আমি আগে যা দেখেছি সবই ছবিতে—কম্পিউটার সিমুলেশনে। কিন্তু সত্যিকারের একটা প্রাচীন জঙ্গলের মধ্যে কেমন এক বিচিত্র গন্ধও মিশে আছে। আর সেইসঙ্গে রয়েছে নানা শব্দ। তার কয়েকটি পাখির ডাক বলে আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু অন্য শব্দগুলো কীসের?

স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে পা ফেলতে বা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎই পায়ের কাছে সাপের মতো কী একটা নড়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ব্লাস্টার তাক করে ফায়ার করলাম। সাদা আর বাদামি ডোরাকাটা সরীসৃপটার মাথায় ছোট-ছোট দুটো শিংয়ের মতো কী রয়েছে। আর তার মাঝে একথোকা কালো চুল! ওটার শরীর মাঝখান থেকে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাণীটার কথা ব্রিগেডিয়ারের কম্পিউটার প্রিন্টআউটে পাইনি। এই রহস্যময় জঙ্গল হয়তো এরকম বহু অজানা-অচেনা প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে। আর তাদেরই কেউ হয়তো ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি।

তখনই চোখ পড়ল আরও দুটো অদ্ভুত প্রাণীর দিকে। চেহারায় ভোঁদড়ের মতো, তবে লম্বায় প্রায় দেড়গুণ। আর সামনের পায়ে ধারালো বিশাল নখ, গায়ের রং সবুজ, তার ওপরে কালচে ছোপ। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আগাছার ঝোপ চিরে সরীসৃপটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সামনের নখে দুটো টুকরো দুজনে বিঁধিয়ে ছিটকে চলে গেল ঝোপের আড়ালে।

আমি এক পা পিছিয়ে এসে ব্লাস্টার তাক করেছিলাম, কিন্তু ফায়ার করিনি। মনে হয়েছিল, আমার এই পোশাক ভেদ করে চট করে কোনও ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

প্রাণী দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি সামনে পা বাড়ালাম। এগুলোর ছবি কম্পিউটার প্রিন্টআউটে দেখেছি। মার্কোনক্স। একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংসাশী। এরা খায় না এমন জিনিস

নেই। তবে মৃত প্রাণীদের শরীরে দাঁত-নখ বসাতে এরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

ক্রমেই সূর্যের আলো গাছের অসংখ্য পাতায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা বড়-বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে নানারকমের পরজীবী লতা। তাদের কোনও কোনওটায় ফুটে রয়েছে বিচিত্র আকার এবং রঙের বাহারি ফুল। আর তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে রংবেরঙের একঝাঁক প্রজাপতি। এইসব প্রজাপতি ও ফুলের নিখুঁত ছবি আমি দেখেছি। তবে আসল জিনিসটা চোখের সামনে দেখে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। কী যে হল, জীবাণুর ভয় না করেই হাতের দস্তানা খুলে একটা গোলাপি ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। গোলাপি ফুলটার পাপড়িগুলো সুষম ছন্দে কাঁপতে লাগল, আর তার রং পালটাতে লাগল ধীরে-ধীরে। গোলাপি-লাল-বেগুনি-নীল-হলদে-গোলাপি...

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই ফুলটা হলদে রঙে তৃতীয়বার পৌঁছে তার রং-বদলের খেলা শেষ করল। রামধনু ফুল ফরেস্ট-এক্স-এর অলঙ্কার। আমি মুগ্ধ চোখে তখনও ফুলটাকে দেখছিলাম।

সেই কারণেই পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণকারীকে দেখতে পাইনি। সুতরাং প্রথম আঘাতের ধাক্কা আমাকে ছিটকে ফেলে দিল বুনো ঘাসে ছাওয়া ভেজা মাটিতে। মাথা ঠুকে গেল কোনও বিশাল গাছের শক্ত শেকড়ে। আর তখনই আক্রমণকারীকে চোখে পড়ল। বুলবোয়া! দু-পেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী। হাত বলে কিছু নেই, তবে দেহে অসম্ভব শক্তি। গায়ে একটুও লোম নেই। বড়-বড় লাল চোখ। লম্বা ধারালো দাঁত। পিছনে কুমিরের মতো কাঁটাওয়ালা মোটা লেজ।

অদ্ভুত গর্জন করে বুলবোয়াটা আমার ওপরে দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই আমি বাঁ-হাতে ব্লাস্টারের টিগার টিপলাম। বুলবোয়ার বিশাল মাথাটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটার গর্দান থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ভারী বাতাসে। জমি কাঁপিয়ে শব্দ করে আছড়ে পড়ল জন্তুটার বিশাল দেহ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাজ্জব করে দেওয়া ক্ষিপ্রতায় প্রায় একডজন মার্কোনক্স কোথা থেকে হাজির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতদেহটার ওপরে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক করে নিলাম। দস্তানাটা হাতে পরে নিয়ে আরও জোরে পা চালালাম। একটা জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল। মার্কোনক্সরা কেমন করে মৃতদেহের খোঁজ পায়? ওরা যেভাবে কোনও সদ্য-মৃত প্রাণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে মনে হয়, ওই নিখোঁজ চারজন যদি এই জঙ্গলে মারাও গিয়ে থাকে তবু তাদের কোনও চিহ্নই আমি পাব না। কিন্তু কোনও-না-কোনও সূত্র যে আমাকে পেতেই হবে! বেশ চিন্তিতভাবে আমি পথ চলতে শুরু করলাম আবার। মাথার পিছনটা অল্প-অল্প ব্যথা করছিল।

জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। বেলা পড়ে আসার ঢের আগেই চারদিক আঁধার হয়ে আসছে। রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুতরাং পুরোনো নিয়ম মেনে একটা জুতসই গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। কয়েকটা বড়-বড় ডালের জোড়ের কাছে গুছিয়ে বসলাম। তারপর পকেট থেকে টেপ-রেকর্ডার বের করে এখন পর্যন্ত যা যা হয়েছে সব বিবরণ বলে গেলাম। টেপ বন্ধ করে বিপারটা অন করে দিলাম। এই বিপারের সঙ্কেত সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের মেইনফ্রেম কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। তা থেকে ওরা জানতে পারবে আমি এখন জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় আছি।

সামান্য খাবার খেয়ে নিয়ে আমি শোওয়ার আয়োজন করলাম। আলো সরে গিয়ে আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কানে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ। তার মধ্যে কয়েকটা সুর বেশ মিষ্টি। রাতের কোনও পাখি জেগে উঠল নাকি?

একটু পরে যখন ঘুমে চোখ বুজে এল তখন রামধনু ফুলটার রং-বদলানো পাপড়ির কথা আমার মনে পড়ছিল।

সে-রাতে অনেক বছর পর আমি স্বপ্ন দেখলাম। আমাকে ঘিরে অসংখ্য রামধনু ফুলের দল পাগলের মতো তাদের পাপড়ির রং পালটে চলেছে।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির গানে। রেকর্ড করা এই গান আগে অনেক শুনেছি। আমাদের যে-কোনও শহরে বহু কৃত্রিম বাগিচা আছে যেখানে নকল ফুল ফোটে, যন্ত্রের পাখিরা উড়ে বেড়ায়, গান গায়। কিন্তু ঝকঝকে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে, অসংখ্য রঙিন ফুল ছুঁয়ে যে-গান এখন ভেসে আসছে তার আকর্ষণ ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। পাতার ফিশফিশ শব্দ আর পাখির সুর যেন একে অপরের যুগলবন্দি।

গাছ থেকে নেমে তৈরি হয়ে আবার শুরু করলাম পথ চলা। চলতে-চলতে টের পেলাম একটা খসখস শব্দ। না, একটা নয়, অনেক। আমাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে কারা যেন চলেছে আমার পাশাপাশি। আমি পথ চলা থামালে সেই শব্দগুলোও থেমে যাচ্ছে। কারা এভাবে লঘু পায়ে অনুসরণ করছে আমাকে?

উত্তরটা জানা দরকার। তাই পকেট থেকে খুদে অস্ত্রসম্ভারের প্যাকেটটা বের করলাম, তা থেকে বেছে নিলাম একটা সাউন্ড ট্যাকার। তার ছুঁচোলো মুখে ঘুমের ওষুধ মাখানো একটা ছুঁচ লাগিয়ে আন্দাজে ভর করে ফায়ার করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ কানে এল। আমি ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আগাছার ঝোপ আর লতাপাতার ঝাড় সরিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই চোখে পড়ল আমার অনুসরণকারীদের একজনকে। শব্দভেদী সাউন্ড ট্র্যাকার নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। একটা মার্কোনক্স।

বুঝলাম, মার্কোনক্সের দল আড়ালে থেকে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওরা বোধহয় আন্দাজ করেছে, আমার সঙ্গে পথ চললেই ওরা মৃতদেহ পাবে, ওদের খিদে মিটবে। তা সে-মৃতদেহ আমারই হোক বা অন্য কোনও প্রাণীর।

ঘুমন্ত মার্কোনক্সটার শরীর থেকে সাউন্ড ট্যাকারটা তুলে নিয়ে সরে আসা মাত্রই প্রায় হাফ ডজন মার্কোনক্স ওটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল ওদের নির্মম কাটাছেঁড়া। ওরা বোধহয় সাউন্ড ট্র্যাকারটা তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিচিত্র চেহারার সাউন্ড ট্র্যাকার একটা প্রাণীর শরীরে বিঁধে থাকা অবস্থায় ওরা ঠিক এগোতে সাহস পাচ্ছিল না।

আবার চলতে শুরু করলাম জঙ্গলের পথ ধরে। এবং টের পেলাম একই সঙ্গে মার্কোনক্সদের গোপন অনুসরণও শুরু হয়েছে। হোক। ওদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এভাবে কতদিন খোঁজ করব আমি? ফরেস্ট-এক্স-এর ঘন জঙ্গলে, অন্ধকারে, শত্রুসঙ্কুল পরিবেশে এরকম এলোমেলো খোঁজ করে কোনও ফল পাওয়া যাবে কি?

এইসব ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা ভারী কিছু আমার পিঠের ওপর পড়ে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্লাস্টার রেডি। কাঁটাওয়ালা একটা বিশাল সাপ। সারা গায়ে লাল আর রুপোলি ডোরা, আর তারই মাঝে শিরদাঁড়া বরাবর ধারালো সরু কাঁটা। চোখ দুটো নীল। আলো-আঁধারির মাঝে জ্বলছে দপদপ করে। না, এটার কথা রিপোর্টে নেই। কিন্তু প্রাণীটার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিবশ করে দিল। সাপটা বাতাস কেটে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ছোবল ছুড়ে দিল আমার পা লক্ষ্য করে, আর একইসঙ্গে লেজের কাঁটাওয়ালা দিকটা আছড়ে দিতে চাইল আমার গায়ে। ক্ষিপ্রতায় কোনও প্রাণীকে পরাস্ত করাটাই অপারেশান ডিভিশনের অপারেটারদের পেশা। সুতরাং ব্লাস্টার চালালাম। সাপটার শরীরের খানিকটা অংশ মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওটা আমার পায়ে ছোবল মেরেছিল, কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের পাতে মোড়া বিশেষ ধরনের জুতো সেই ছোবল ভোঁতা করে দিয়েছে।

যথারীতি মার্কোনক্সের দঙ্গল হামলে পড়ল সাপটার দেহের ওপরে। আমি সেদিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই একটা সন্দেহজনক শব্দ আমার কানে এল—কারও পায়ের শব্দ। আমার পাশাপাশি চলেছে।

জঙ্গলের লতাপাতায় আমার হাত-পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছি। তখনই একটা গাছে আমার হাত লাগতেই খুব অস্পষ্টভাবে জলতরঙ্গের সুর বেজে উঠল। অদ্ভুত ঢিমে তালে বাজতে লাগল সেই বাজনা। আমার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। এ কোন ঘুমপাড়ানি গাছ! এর কথা তো রিপোর্টে নেই! বাজনার সুরটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। আমি ঘোর-লাগা মানুষের

মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের জন্যে পুরোপুরি ভুলে গেলাম নতুন পায়ের শব্দটার কথা। চেহারায় সাধারণ এই গাছ কোথা থেকে পেল স্বর্গীয় এই জলতরঙ্গের সুর?

সংবিৎ ফিরতেই চলা শুরু করলাম এবং নতুন পায়ের শব্দটা আবার শোনা গেল। এবার ফরেস্ট-এক্স-এর মোহময় নেশা কাটাতেই আমি রীতিমতো হিংস্রভাবে জেনারেটর গান বের করে নিলাম। তারপর শব্দ আন্দাজ করে একসঙ্গে পুরো এক মিনিট লো-লেভেল ফায়ার করলাম। আর্তনাদ অথবা গোঙানির মতো একটা শব্দ হল। দূরের একটা ঝোপে কেউ যেন নড়াচড়া করল। আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজে বের করলাম শিকারকে। লতাপাতার জালে জড়িয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ!

মানুষটার চেহারা ও পোশাক বড় অদ্ভুত।

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। কোমরে একটা নোংরা কাপড় জড়ানো। আর ডান হাতের কাছেই পড়ে রয়েছে কাঠের ছুঁচোলো ফলা লাগানো একটা বল্লম। এটা দিয়ে কি আমাকেই আক্রমণ করতে চাইছিল এই জংলিটা?

ফরেস্ট-এক্স-এ কোনও মানুষ আছে বলে জানতাম না। তাই একটু অবাক হলাম। অসাড় লোকটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তখনও ঝোপের আড়াল থেকে অল্পস্বল্প শব্দ পাচ্ছিলাম। বোধহয় মার্কোনক্সদের দল উশখুশ করছে। সুতরাং ঠিক করলাম, লোকটাকে সঙ্গে নেব। এর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখব কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।

ঝুঁকে পড়ে দেহটা তুলে নেওয়ামাত্রই বৃষ্টি শুরু হল। মুখ তুলে ওপর দিকে দেখলাম। এক টুকরো আকাশও চোখে পড়ছে না। শুধু ঘন পাতায় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। লক্ষ করলাম, গাছের ডাল বেয়ে সরসর করে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েক রকমের ছোট-বড় চিত্র-বিচিত্র সাপ। বৃষ্টির জল ওদের চঞ্চল করে তুলেছে।

আমি জংলি মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর পর লোকটাকে মাটিতে নামিয়ে দম নিচ্ছিলাম। হঠাৎই একসময়ে খেয়াল হল, জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। বৃষ্টি তখনও ধরেনি।

এরপর খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। আর একই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ কানে আসছিল। গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়ে মাঝারি মাপের একটা পাহাড়ের অংশ চোখে পড়ল। তার একটু পরেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন যেন একটা ধাক্কা খেল।

অসাড় দেহটাকে ভিজে মাটির ওপরে নামিয়ে রেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম সামনের দৃশ্য।

বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তবে ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি। ফলে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে অসুবিধে হল না। আমার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে একটা বিশাল হ্রদ। তার নীল জল চিকচিক করছে। হ্রদের কোল ঘেঁষে একটা পাহাড়। একটু আগে এই পাহাড়টাকেই আমি জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় আর একপাশে অনেক গাছ চোখে পড়ছে। তাদের মাথায় মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের নানা রঙের আলো। আর পাহাড়ের মাথায় লুকোনো কোনও স্রোতস্বিনী থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে নীচের হ্রদে। তারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা হ্রদের জলতলে পড়ে যেন খই ফুটছে। আর তারই গা থেকে ঠিকরে পড়ছে শেষ বিকেলের আলো। ঝরনার জলের ধারা থেকে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল শত-শত জলকণার রেণু। তাদের গায়ে ফুটে উঠেছে রামধনুর বর্ণালি। এতক্ষণ বাতাসের জোর বোঝা যায়নি। এখন তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

পায়ের কাছে একটা অচেতন দেহ ফেলে রেখে আমি সার্কাসের সঙের মতো মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টি আমি আগে দেখেছি। পাহাড়ও আমি দেখেছি। দেখেছি হ্রদ, ঝরনা, পড়ন্ত বিকেল, জঙ্গলের গাছপালা আর রঙিন ফুল। আমি জানি, এগুলোর নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এইসব জিনিস একসঙ্গে একই জায়গায় আমি কখনও দেখিনি। ফলে এখন টের পেলাম, প্রকৃতির এইসব টুকরো-টুকরো ছবি জোড়া লেগে গোটা ছবিটা তৈরি হলে পর তার আকর্ষণের কোনও তুলনা নেই।

এরই মধ্যে বৃষ্টি থামল। মেঘ সরে পরিষ্কার হল আকাশ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডুবে যাওয়া লাল সূর্যকে কিছুটা দেখা গেল। পিছনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল পাখির ডাক আর অচেনা কোনও প্রাণীর চিৎকার। প্রকৃতির মধ্যে ওরাও আছে, আমরাও আছি।

এমনসময় পায়ের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মানুষটা এক ঝটকায় উঠে বসে আমার পা ধরে এক টান মারল। আমি ঘোর লাগা অবস্থাতেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম ঘাস-জমিতে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ব্লাস্টার বের করে ফায়ার করার জন্যে উঁচিয়ে ধরলাম।

আমাকে ঠিক না চিনতে পারলেও জংলিটা বোধহয় লেসার ব্লাস্টার চিনতে পারল। তাই দু-হাত মাথার ওপরে তুলে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, 'প্লিজ, ডোন্ট শুট! ডোন্ট শুট!...'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু-হাত মাথার ওপরে রেখে লোকটাও উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে। ওর সভ্য কথাবার্তা আমাকে চমকে দিয়েছিল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে রেখেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

লোকটা বলল, 'সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফ জুওলজিস্ট সত্যদেব সিং।'

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখতে লাগলাম। ফরসা শরীর রোদে-জলে কালচে, মুখে চুল-দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, পরনে বনবাসীর কৌপিন। আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের কী প্রাগৈতিহাসিক দশা! কিন্তু কেন? আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, রঘুনাথ মহান্তিই বা কোথায়? সে-কথাই জিগ্যেস করলাম সত্যদেব সিংকে। সেইসঙ্গে নিজের পরিচয়ও দিলাম! বললাম, কেন আমি এসেছি।

সত্যদেব বলল, 'চলুন, যেতে-যেতে সব কথা বলছি।'

সূর্য ডুবে গেলেও শেষ বিকেলের আলো রয়ে গেছে। ঝরনার রিমঝিম শব্দ অনেক জোরালো মনে হচ্ছে এখন। আমরা দুজন এগোলাম পাহাড়ের দিকে। কারণ সত্যদেব বলল, পাহাড়ের ও-পিঠেই নাকি সবকিছুর উত্তর রয়েছে।

একটু থেমে সত্যদেব আবার বলল, 'আজ আমাকে দেখে আপনি যেমন আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তেমনই বিক্রম শর্মাকে এখানে প্রথম যখন খুঁজে পাই তখন আমি আর রঘুনাথ মহান্তিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি, একজন আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী এরকম পালটে যেতে পারে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম শর্মা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম পাগল বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক নয়, শর্মা হয়ে গেছে প্রকৃতি-পাগল। ও আমাকে বলেছিল, সিং, একসঙ্গে এত সুন্দর জিনিস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এই ঝরনা, পাহাড়, হ্রদ, ফুল, পাখি, এসব দেখে আমিও বুঝেছিলাম, ওর কথা কী মর্মান্তিক সত্যি। শহরের ঘেরাটোপে বসে কম্পিউটারে আঁকা প্রকৃতির ছবি দেখে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় না।'

ফাঁকা জমি পেরিয়ে যখন আমরা এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করছি তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সত্যদেব বলল, 'এখনও অনেকটা পথ বাকি। রাতটা এখানেই কোথাও পার করে দিলে ভালো হয়।' সুতরাং তাই করলাম।

একটা বড় মাপের টিলার ওপরে চড়ে বসলাম দুজনে। একটা ছোট গাছে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আমি আকাশ দেখতে লাগলাম। সত্যদেব বলতে শুরু করল আবার 'বিক্রম শর্মা আমাদের নিয়ে গেল রণবীর সেনের কাছে। কথা বলে বুঝলাম তারও ওই একই অবস্থা। কৃত্রিম শহরগুলোয় সে আর ফিরে যেতে চায় না। ওখানে নাকি একটাও আসল জিনিস নেই। সবই মানুষের তৈরি, নকল। তারপর...।'

সত্যদেব সিং বলে যাচ্ছিল একটানা। আর আমার নেশা ধরে যাচ্ছিল—হারিয়ে যাওয়ার নেশা। আমি রং বদলানো রামধনু ফুলের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছি তরুলতার জলতরঙ্গ আর পাখির ডাক, আমার চোখের সামনে হ্রদের নীল জলে বৃষ্টির খই ফুটছে, গুঁড়ি-গুঁড়ি জলকণায়

রামধনুর ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের কোলে অস্ত যাওয়া সূর্যের চোখ-জুড়োনো রং, আর আকাশে মেঘের দলে কোলাকুলি।

আমি ভুলে যাচ্ছিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, টেপ-রেকর্ডার, ব্লাস্টার, জেনারেটর গান আর কম্পিউটারের কথা। কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোলর আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী।

এমনসময় সর্বনাশের মতো মাথার ওপরে কালো আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল।

ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। ঝরনার জলের রিমঝিম বাজনা এখন আরও মাতাল। তারই মধ্যে সত্যদেব কথা শেষ করে গুনগুন করে একটা গান ধরল। গানের কথা একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল যেন গানটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শেষবারের মতো দেখলাম, সত্যদেব মাটিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে গান গেয়ে চলেছে!

জঙ্গলের ভেতরে ভোর হয়েছিল একরকম ভাবে। আর এইখানে খোলা আকাশের নীচে সকাল হল একেবারে অন্যরকম।

পিছনে জঙ্গল থাকার জন্যে আমরা এখনও ছায়ায় ঢাকা। কিন্তু সকালের রোদ গিয়ে পড়েছে দূরের একটা পাহাড়ে, হ্রদের জলের মাঝামাঝি, আর বহতা স্রোতস্বিনীর ওপরে। নীচের ফাঁকা জমিটাকে এখান থেকে কিছুটা ছোট দেখাচ্ছে। বেশ কিছু নাম-না-জানা বড়সড়ো পাখি এসে ভিড় করেছে হ্রদের কিনারে। সেখানে কয়েকটা মার্কোনস্ককেও চোখে পড়ল। পাখির কিচিরমিচির শব্দ হয়তো নেহাতই কোলাহল—কিন্তু আমার বেশ লাগছিল।

সত্যদেব চিতপাত হয়ে ঘুমিয়েছিল। ওকে ঠেলা মেরে ডাকলাম। ও উঠে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, ‘চলুন, এবারে আমরা এগোব। আট-দশ ঘণ্টার পথ।’

হাঁটতে-হাঁটতে দুপুরবেলা নাগাদ আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হ্রদের ওপরে কিছুটা জায়গা ছেড়ে আবার শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। সত্যদেব বলল, ‘আপনাকে এতক্ষণ বলিনি। রণবীরের ভীষণ জ্বর হয়েছে। মনে হয় কোনও ইনফেকশান। আপনার সঙ্গে কোনও ওষুধপত্র আছে?’

আমি বললাম, ‘আছে।’

বাকি পথটুকু ঢালু হওয়ায় আমরা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে এলাম। জায়গাটায় গাছগাছালি রয়েছে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। তারই মধ্যে দিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটিতে পা ফেলে আমরা এগোলাম।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম ওদের আস্তানায়। এবং আমার অবাক হওয়ার তখনও বোধহয় কিছুটা বাকি ছিল।

বিকেলের নরম আলোয় আমার চোখে পড়ল লতাপাতায় ছাওয়া এক মনোরম কুটির। তার চালে অসংখ্য রঙিন ফুল ফুটে আছে। আর সামনে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তার কিছুটা দূরে একটা ছোট পুকুর—তাতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। সূর্যের ছায়া পড়েছে সেখানে। আর কুটিরের গা ঘেঁষে বিশাল বাগান। তবে মানুষের হাতে তৈরি বাগান নয়, প্রকৃতির খামখেয়ালি বাগান। আশ্চর্য অমিত্রাক্ষর। এত সব রংবাহারি ফুল, তোরা কোথায় লুকিয়ে ছিলি?

সত্যদেব আমাকে কুটিরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। মেঝেতে শুকনো পাতার ওপরে রণবীর সেন শুয়ে রয়েছে। দু-চোখ বোজা। গায়ে কয়েকটা পাতার প্রলেপ। আর ওর মাথার পাশে বসে রয়েছে রঘুনাথ মহান্তি। সত্যদেব আমাকে বসতে বলল। পরিচয় করিয়ে দিল। মহান্তির সঙ্গে। রণবীর সেন কথাবার্তার শব্দ পেয়ে দুর্বল স্বরে কী যেন বলল, চোখ মেলে তাকাল।

রঘুনাথ বলল, ‘বিক্রম শর্মা শিকারে গেছে।’

সত্যদেব ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে-গড়া একটা কলসি থেকে জল গড়িয়ে রণবীরকে দু-একঢোক খাওয়াল।

লক্ষ করলাম, ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। শুধু ছোট-বড় কয়েক টুকরো কাঠ আর শুকনো ঘাসপাতা।

রণবীরের কপালে হাত রাখলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পোশাকের পকেট হাতড়ে ওষুধের প্যাকেট বের করলাম। একটা ট্যাবলেট বেছে নিয়ে ওর মুখে দিলাম। রণবীর ম্লান হাসল, অস্পষ্টভাবে বলল, ‘আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন?’

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। চার-চারজন সেরা বিজ্ঞানীর কী পরিণতি! ওদের ফেরানো আমার পক্ষে আর কি সম্ভব?

সত্যদেব বলল, ‘দাস, আপনি রণবীরকে কোনওরকমে নিয়ে যান। এখানে থাকলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না।’

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রিগেডিয়ারের কথা মনে পড়ছিল। উনি বলছিলেন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা। আমাদের অজানা অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। যে বুলবোয়ার চাইতেও শক্তিশালী, হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর। মোহিনী প্রকৃতি! এই চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে এই একটা জায়গাতেই দারুণ মিলঃ প্রকৃতি ওদের টানে।

আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। এই প্রথম ‘যদি, মনে করি, ধরা যাক’ এইসব শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া একরাশ কাল্পনিক কথা আমার মাথার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি সেন্ট্রাল

কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনের কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী, সুশোভন দাস, কল্পনায় বারবার টলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

সত্যদেব আমাকে বাইরে নিয়ে এল। বাগানের কাছে গিয়ে আমরা বসলাম।

হঠাৎই সত্যদেব জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দাস, বলুন তো, ফুল আমাদের কী কাজে লাগে?'

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখলাম, মরা বিকেলের রোদ ওর মাথায়, দাড়িতে এসে পড়েছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার যুক্তি কার্যকারণ ইত্যাদি ক্রমশ তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সত্যদেব বলল, 'অনেক প্রশ্ন নিয়ে কখনও আমরা ভাবিনি। অবশ্য ওই কৃত্রিম শহরের ঘেরাটোপে বসে তা ভাবা সম্ভবও নয়। যেমন, প্রজাপতি আমাদের কী কাজে লাগে। কিংবা চাঁদ-তারা না দেখলে কি কোনও ক্ষতি হয়?'

আমার চোখের সামনে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর দূরে গাছের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আমার মনে হল, অস্ত-যাওয়া সূর্য না দেখতে পেলে কি কোনও ক্ষতি হয়?

আমি চুপচাপ বসে সত্যদেবকে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে দেখি কুটির থেকে রঘুনাথ ও রণবীর বেরিয়ে আসছে। রঘুনাথ দু-হাতে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসছে ওকে।

সত্যদেব তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওদের কাছে। রঘুনাথ বলল, 'কী করব, শুনছে না। বলছে, বাগানে নিয়ে যেতে।'

ওরা দুজনে রণবীরকে এনে বাগানের নরম ঘাস-জমিতে শুইয়ে দিল। রণবীর সেন, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নামজাদা এনটোমোলজিস্ট—পতঙ্গবিজ্ঞানী, তখন বিহ্বল চোখ মেলে ধূসর আকাশ, রঙিন ফুল, অস্তায়মান সূর্য আর প্রজাপতি দেখছে।

রঘুনাথ একটু উঁচু গলায় বলল, 'সেন, তুমি দাসের সঙ্গে শহরে ফিরে যাও। সেখানে তুমি সেরে উঠবে।'

রণবীর সেন প্রকৃতির দিক থেকে চোখ সরাল না। শুধু হাসল, বলল, 'মহান্তি, তোমার কি মনে হয় না শহরের একশোটা জীবনের চেয়ে এইখানে এইভাবে মারা যাওয়াটা অনেক বেশি দামি?'

সত্যদেবের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও আমার হাত চেপে ধরল।

এমনসময় দেখা গেল, বিক্রম শর্মা জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাতে ঝুলছে ছোটখাটো কোনও প্রাণীর মৃতদেহ।

কাছাকাছি এসেই মৃতদেহটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল বিক্রম। দৌড়ে এল আমাদের পাশে। একপলক আমাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ল রণবীরের ওপরে। রঘুনাথ রণবীরের কপালে হাত রাখল। সত্যদেব ধরল ওর কবজি। সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে। সিসের আস্তর দেওয়া অন্ধকার নামছে জঙ্গলে। প্রজাপতিরা বেশির ভাগই চলে গেছে, শুধু কয়েকটা আশ্চর্য নিশাচর প্রজাপতি

বাগানে উড়ছে। ওদের ডানার রঙ আধো-আঁধারিতে প্রতিপ্রভ হয়ে জ্বলছে। ঠিক একইভাবে জ্বল-জ্বল করছে কয়েকটা রঙিন ফুলও।

রণবীর সেদিকে একবার দেখল। তারপর অস্ফুটস্বরে কী একটা বলে চোখ বুজল। আচমকাই ওর ঘাড়টা কাত হয়ে গেল একপাশে।

বাকি তিনজন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হল, কান্নার কি কোনও দাম আছে! কিন্তু টের পেলাম, আমার চোখ জ্বালা করছে।

সত্যদেব চোখ ঢেকে বসে ছিল। অন্ধকার থিতিয়ে বসছে। আগুনের কুণ্ডের লালচে আলো আমাদের মুখে-গায়ে। জঙ্গল থেকে পাখি ডাকছিল। আর শোনা যাচ্ছিল হিংস্র গর্জন। ঝরনার জলের কুলকুল শব্দ এখন আরও স্পষ্টভাবে কানে আসছে।

ঠিক সেই সময়ে আকাশের সন্ধ্যাতারা আমার চোখে পড়ল। আকাশের প্রথম চোখ। আমাদের দেখছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে এক অসহ্য জ্বালাপোড়া। ছটফট করতে-করতে সমস্ত পোশাক-আশাক-জুতো সব খুলে ফেললাম। ছুড়ে ফেলে দিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, ব্লাস্টার, জেনারেটর গান—সব। ওরা তিনজন এবারে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল।

আর আমি দেখছিলাম, অন্ধকার বাগানে ফুটে থাকা উজ্জ্বল রঙিন ফুল, নিশাচর রঙিন প্রজাপতি, সন্ধ্যাতারা। শুনছিলাম, ঝরনার শব্দ, রাতপাখির ডাক, পাতার ফিশফিশ।

জঙ্গলের দুরন্ত বাতাস আমার বুক-পিঠ, মুখ-চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রতি একশো বছর অন্তর বেশ কিছু মানুষ ফরেস্ট-এক্স-এর আকর্ষণে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

কোনও বাধাই সেই হারিয়ে যাওয়া রুখতে পারবে না।



চিকুর স্বপ্ন

ভোরবেলা বুড়ো লোকটাকে দেখতে পেল চিকু।

গোলাপ বাগানের ভেতরে জবুথবু হয়ে বসেছিল সে। পরনে একটা পুরোনো আলখাল্লা। তাতে লাল, নীল, হলদে, সবুজ হরেক রঙের তালি মারা। আর হাতে সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা লাঠি।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চিকু বাগানে বেড়াতে আসে। মা-বাবা তখন ঘুমিয়ে থাকেন। বাড়ির লাগোয়া বিরাট এলাকা জুড়ে বাগান। বাগানে নানা ফুলের গাছ, নানা ফলের গাছ। ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় মৌমাছি। গাছের ডালে-ডালে পাখি খেলা করে। সুরেলা শিস দেয়। চিকু দ্যাখে। চিকুর খুব ভালো লাগে। ও বাগানে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করেই হঠাৎ বুড়ো মানুষটার মুখোমুখি হয়ে পড়ল চিকু। গোলাপ বাগানের লাল, হলদে, বেগুনি, নানারকম গোলাপের মাঝে আলখাল্লার লাল, নীল, হলদে রং যেন মিশে গিয়েছিল। তাই হঠাৎ সামনা-সামনি পড়ে গিয়ে চিকু চমকে উঠেছিল। মাথায় ধবধবে সাদা চুলের জঙ্গল। একইরকম গোঁফ-দাড়িতে মুখের অনেকটাই ঢেকে গেছে। চোখ কুঁচকে ছোট। তার চারিদিকে বলিরেখার আঁকিবুকি। গোটা মুখে একইরকম অসংখ্য দাগ। আলখাল্লার বাইরে বেরিয়ে থাকা হাত দুটোরও একই দশা। লাঠি আঁকড়ে ধরা ডানহাতটা অল্প-অল্প কাঁপছিল।

চিকু অবাক হয়ে গেল। এরকম বুড়োমানুষ সে কখনও দেখেনি। আর লোকটা বাগানে এলই বা কোথা থেকে!

কাছে এগিয়ে গেল চিকু। জিগ্যেস করল, 'তুমি কে?'

বুড়ো লোকটা চমকে উঠল। চোখ আরও ছোট করে চিকুকে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। আলখাল্লা মোড়া শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

চিকু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। কেন ভয় পাচ্ছে মানুষটা! ও আরও কাছে এগিয়ে গেল। একটা হাত রাখল বুড়ো লোকটার হাতের ওপর। চামড়া কোঁচকানো। পার্চমেন্ট কাগজের মতো খসখসে। চিকু আবার বলল, 'বলো না, তুমি কে?'

বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে চিকুকে দেখল। ভয় কেটে গিয়ে ভরসা ফিরে এল মুখে। সামান্য হাসতে চেষ্টা করল। তারপর পালটা প্রশ্ন করল ঘড়ঘড়ে গলায়, 'তুমি কে, খোকাবাবু?'

'আমি চিকু। ওই বাড়িতে থাকি।' চিকু আঙুল তুলে ওদের বাড়িটা দেখাল। তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করল, 'তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

বুড়ো মানুষটা কী একটা বলতে গিয়ে কাশতে শুরু করল। দম ফেটে যাওয়ার মতো কাশি। হিজিবিজি দাগকাটা ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। কাশি থামলে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলল, 'আমি এখানে লুকিয়ে আছি প্রাণের ভয়ে, খোকাবাবু। এই ক'দিন হল এসেছি। তুমি কাউকে আমার কথা বোলো না যেন—।'

চিকুর অদ্ভুত লাগল। প্রাণভয়ে এই বুড়ো মানুষটা লুকিয়ে রয়েছে কেন! কে ভয় দেখাচ্ছে ওকে!

বাগানে নানা পাখি মিষ্টি সুরে ডাকছিল। মাঝে-মাঝেই অমন ডাক শোনা যায়। শোনা যায় সুরেলা শিসের শব্দ। চিকুর ভালো লাগছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষটা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আক্ষেপের গলায় বলল, 'নকল! সব নকল গো, খোকাবাবু! চেহারা আছে, নড়ন-চড়ন আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।'

চিকু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ও অবাক চোখে বুড়ো লোকটার রংবেরঙের আলখাল্লা দেখছিল। দেখছিল আঁকাবাঁকা লাঠি, আর ধবধবে সাদা চুল-দাড়ি।

বুড়ো চিকুকে ডেকে তার পাশে বসাল। কাঁপা গলায় বলল, 'চিরটাকাল এমন ছিল না, খোকাবাবু। আমাদের সময়ে সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খেত সত্যিকারের মৌমাছি।'

একটা মৌমাছি একটা হলদে গোলাপের আশেপাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। গুনগুন শব্দ উঠছিল বাতাসে। চিকু সেদিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই তো মৌমাছি!'

'নকল মৌমাছি।' হতাশ সুরে বলল বুড়ো, 'এই যে বাগানের গাছপালা, ফুল, ফল, পাখি, কীটপতঙ্গ, স-ব নকল। সবই মানুষের তৈরি, ভগবানের নয়। ভগবানকে মানুষ ছুটি দিয়েছে। একটু আগে ওই যে পাখির শিস শোনা গেল, রোজ সকালে একই সময়ে হুবহু ওই একই সুরে শিস দেবে নকল পাখিটা। এই যে মৌমাছি ফুলকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে, রোজ একই ভঙ্গিতে ওই ফুলটাকে ঘিরেই সে উড়ে বেড়াবে।'

'কেন?'—চিকু বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটার কথাগুলো। কই, চিকুর মা কিংবা বাবা তো কোনওদিনও এ-সব কথা ওকে বলেননি!

লোকটা আবার কাশল। পাতলা ধোঁয়াশা বেড়াচ্ছে চারদিকে। রোজই এইরকম থাকে। কেমন মেঘলা ঘোলাটে পরিবেশ।

'খোকাবাবু, এই পাখি, মৌমাছি, সবই তোমাদের বিজ্ঞানীদের তৈরি। ওদের শরীরের কলকবজায় ঠিক যেরকম-যেরকম নির্দেশ দেওয়া আছে, ঠিক সেরকমভাবেই ওরা গুনগুন করে, শিস দেয়, উড়ে বেড়ায়। এই যে সব ফুল—এগুলো বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো ফোটে আর ঝরে পড়ে। ফুলের গন্ধও তৈরি হয়েছে তোমাদের ল্যাবরেটরিতে। তারপর সেই নকল সুগন্ধি ভরে দেওয়া হয়েছে ফুলের ভেতরে। ওই যে গাছের ফল, ওগুলো তোমরা কি কখনও খেয়ে দেখেছ? দেখোনি নিশ্চয়ই!'

'না, মা-বাবা বারণ করেছেন। আমরা তো শুধু ভিটামিন খাই চামচে করে, আর কার্বোহাইড্রেট-প্রোটিন মেশানো ফুড ট্যাবলেট।'

হাসল বুড়ো। মাথা নাড়ল হতাশায়। লাঠিটা নামিয়ে রাখল পাশে। তারপর চিকুর পিঠে হাত রেখে বলল, খোকাবাবু, 'ওই ফল শুধু দেখবার জন্যে। আর নকল পাখিগুলো বিজ্ঞানীদের তৈরি করে দেওয়া রুটিনমাফিক ওই ফলগুলো মাঝে-মাঝে ঠোকরায়। এমনকী খাওয়ার ভানও করে। হায় রে! কী দিনকালই না এল!'

বুড়ো আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মুখ তুলে ওপরে আকাশের দিকে তাকাল। ভুরুর ওপরে হাত রেখে নজর করে দেখতে চেষ্টা করল আকাশটা। ঘোলাটে মেঘলা আকাশে অনেক আলো জ্বলছে। শক্তিশালী আকাশ-প্রদীপের মতো সাদা উজ্জ্বল আলোক-পিণ্ডগুলো আকাশে ভাসছে। আলো ছড়াতে চেষ্টা করছে আবছায়া পৃথিবীর বুকে।

চিকুর দিকে তাকিয়ে বুড়ো প্রশ্ন করল, 'তুমি কোনওদিন সূর্য দেখেছ, খোকাবাবু? সূয্যিমামা?'

'না।' মাথা নাড়ল চিকু। তবে সূর্যের কথা ও শুনেছে মা-বাবার কাছে। বছর কুড়ি আগেও নাকি সূর্য দেখা যেত পৃথিবীর আকাশে। পুবে উঠত, পশ্চিমে অস্ত যেত। দিন ছিল উজ্জ্বল আলোময়, রাত ছিল ঘন অন্ধকার। এখন দিন আর রাতের তফাত বেশ কমে এসেছে। পরিবেশ গাঢ় হয়ে, ঘন হয়ে, সূর্য ঢেকে গেছে। বুদ্ধিমান মানুষ এখন নতুন ধরনের আলোর উৎস তৈরি করেছে। হাউইয়ের মতো আলোক-পিণ্ড ছুড়ে দিয়েছে আকাশে। সেগুলো ভারী বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে। আলো ছড়ায়। মাসখানেক পরে সেগুলোর জ্যোতি কমে আসে। নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন নতুন-নতুন আলোক পিণ্ড ছুড়ে দেয় মানুষ। আবার আলো হয়।

বিশাল আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা কাপড়ের ঝোলা বের করল বুড়ো। ঝোলাতেও আলখাল্লার মতো রংবেরঙের অজস্র তালি। হাতড়ে-হাতড়ে তার ভেতর থেকে একটা বিবর্ণ প্যাকেট বের করল। হলদেটে কাগজে মোড়া। কাগজ বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। চিকু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। কাঁপা হাতে প্যাকেট থেকে কয়েকটা রঙিন ফটো বের করল সে। বহুদিনের হাওয়ায় ফটোগুলোর রঙের জৌলুস অনেক ফিকে হয়ে গেছে। চিকুর বেশ কৌতূহল হল। এরকম ফটোগ্রাফের ব্যবহার আজকাল প্রায় নেই বললেই চলে। এখন শুধু মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রো-ভিডিয়ো, মাইক্রো-টিভি ক্যামেরা—এসবের যুগ।

প্রথম ছবিটা চিকুকে দেখাল বুড়ো। সূর্য উঠছে পূর্ব দিক থেকে। লাল। গোল বলের মতো। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। মেঘের কিনারে লাল রেখা। একপাশে কিছু সবুজ গাছপালা। তার পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। খালি গা। হাতে লিকলিকে খাটো বেত।

'রাখাল ভোরবেলায় যাচ্ছে গরু চরাতে।' বুড়ো বিড়বিড় করে বলল। চিকু ছবিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। গরু শুধু ও মিউজিয়ামের ছবিতেই দেখেছে। গরু দেখতে সুন্দর নয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাই তাঁরা নকল গরু তৈরি করে নকল তৃণভূমিতে নিশ্চয়ই রাখেননি। তা ছাড়া বইতেও পড়েছে, একসময়ে মানুষ গরুর দুধ খেত। গরু ছিল গৃহপালিত পশু। কিন্তু এখন তো ওসব খাদ্য বা পানীয় দূষিত। চিকু কখনও দুধ দেখেনি।

ছবিটা দেখতে-দেখতে ওর নাকে ধুলো উড়ে আসছিল। কী সুন্দর!

তারপর দ্বিতীয় ছবিটা দেখাল বুড়ো। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। নদীর বুকে কালো ছায়ার মতো নৌকো ভেসে যাচ্ছে। ওপারে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য। আকাশে নানা রঙের মেঘ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাসছে। অপূর্ব!

'নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।' আবার বিড়বিড় করল বুড়ো। তারপর বাকি ছবিগুলোও একে-একে দেখাল সে। ছেলেমেয়েরা পার্কে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাগানে রংবেরঙের ফুলের উৎসব! দীপাবলির আলোকসজ্জা। কত চিত্র-বিচিত্র পাখি...।

ছবিগুলো দেখানো শেষ হলে সেগুলো আবার প্যাকেটে ভরে রাখতে লাগল বুড়ো। বলল, 'এখন সূর্যও নেই, আর এসব কিছুও নেই, খোকাবাবু। আরও অনেক ফটো ছিল আমার কাছে...নষ্ট হয়ে গেছে। এই বুড়ো শরীরে পালিয়ে বেড়ানো কি কম ধকলের কাজ!' খকখক করে কাশতে শুরু করল সে। কিছুক্ষণ পর কাশি থামলে জড়ানো গলায় বলল, 'এই নোংরা বাতাসে আমি শ্বাস নিতে পারি না। চারদিকে সব কেমন ধোঁয়াটে মেঘলা। অক্সিজেন কত কমে গেছে। চারদিকে শুধু বিষ-বাতাস।' কথা আটকে গিয়ে বুড়ো আবার কাশতে লাগল।

শ্বাস নিতে চিকুর কোনওরকম কষ্ট হচ্ছিল না। ও জানে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এখন অক্সিজেন শতকরা আট ভাগ। বাকি অংশে নাইট্রোজেন ছাড়াও রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড। গত পঞ্চাশ বছরে ক্ষতিকর গ্যাসগুলো পরিমাণে অনেক বেড়ে গেছে। কলকারখানা-যানবাহনের ধোঁয়া বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়াই গেছে পালটে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশ-বাতাস মেঘলা, ঘোলাটে। সেইজন্যেই কি আসল পশু-পাখিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? মরে গেছে আসল ফুল, ফল, গাছ? তাই যদি হয়, তা হলে মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে রইল কেমন করে! সবকিছুই কেমন দুর্বোধ্য আর রহস্যময় ঠেকছিল চিকুর কাছে। ওর কোনও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না, অথচ এই বুড়ো মানুষটার কাশতে-কাশতে প্রাণ বেরুবার জোগাড়।

সেই কথাই ও জিগ্যেস করল লোকটাকে।

লোকটা কাশি থামিয়ে আলখাল্লার হাতায় মুখ মুছছিল। বারদুয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমি পুরোনো দিনের মানুষ, খোকাবাবু। জানি না, আমার মতো আর ক'জন এখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রাণে বেঁচে আছে। আর তোমরা হলে গিয়ে নতুন বিজ্ঞানের যুগের নতুন জাতের মানুষ। তোমাদের কাছে এই নোংরা বিষ-বাতাসই প্রিয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো। তারপর ঝোলার ভেতরে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। আপনমনেই নীচু গলায় বলল, 'বাতাস পরিষ্কার করতে আমরা বহু চেষ্টা করেছিলাম গো, খোকাবাবু। পরিষ্কারও হয়েছিল। ফলে মানুষের আয়ু গিয়েছিল বেড়ে।'

চিকুর দিকে তাকাল সেঃ 'এই আমাকেই দ্যাখো না। কত বুড়োটি হয়েও বেঁচে আছি। যাই হোক...তারপর যুদ্ধ বাধল। ভয়ানক যুদ্ধ। বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিনের পর দিন। মানুষ বিষে মরতে লাগল। বাতাস পরিষ্কার করার চেষ্টাও গেল থেমে। কলকারখানা, গাড়িঘোড়ার ধোঁয়া আকাশে-বাতাসে জমতে লাগল। ওঃ, সে কি আজকের কথা! আমরা কিছু মানুষ গোপন জায়গায় অক্সিজেন সঞ্চয় করে বেঁচে রইলাম। দূষিত বাতাস পরিষ্কার করার জন্যে লড়াই করে চললাম গোপনে। কিন্তু পারলাম না। বাতাস আরও বিষিয়ে যেতে লাগল, আমরাও বুড়ো হয়ে গেলাম ধীরে-ধীরে, আর অক্সিজেনও এল ফুরিয়ে। তখন নিরুপায় হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাঠে-ঘাটে-পথে—দূষিত পরিবেশে। একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলাম বাঁচার লড়াই—।'

বুড়ো আবার কাশতে শুরু করল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় লাঠিটা আঁকড়ে ধরতে গেল। চিকুর কেমন ভয়-ভয় করছিল। কী করবে, কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এমনসময় দূর থেকে ওর নাম ধরে কেউ ডাকল, 'চিকু—উ!'

ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বুড়োকে বলল, 'যাচ্ছি। মা ডাকছেন।'

'আমার কথা কাউকে বোলো না, খোকাবাবু। তুমি বরং কাল আবার এসো। তোমাকে পুরোনো দিনের অনেক গল্প শোনাব, কেমন! কী করে ফুল ফুটত, পাখি ডাকত, মৌমাছি মধু খেত—সব।'

'আচ্ছা, আসব।' বলে গোলাপ বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ি লক্ষ করে ছুটে চলল চিকু। ওর নাকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। শুনতে পাচ্ছিল গাছের ডালে বসে পাখি ডাকছে সুরেলা গলায়। চিকু ছুটতে-ছুটতেই মনে-মনে বলল, 'নকল গন্ধ। নকল পাখি। বিচ্ছিরি।'

বুড়োর দেখানো বিবর্ণ ফটোগ্রাফের ছবিগুলো ওর মনে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছিল বারবার।

কম্পিউটার-শিক্ষকের সামনে বসে লেখাপড়া করছিল চিকু। কিন্তু বারেবারেই ও আনমনা হয়ে পড়ছিল আর কম্পিউটার-শিক্ষকের ধমক টেলিভিশন পরদায় ফুটে উঠছিল, 'তুমি অমনোযোগী হয়ে পড়ছ। তোমার নম্বর কাটা যাচ্ছে।'

প্রতিদিন লেখাপড়ার জন্যে আলাদা নম্বর আছে। সারাদিন পড়াশোনার শেষে বাবা কিংবা মা কম্পিউটারের বোতাম টিপলেই নম্বর ফুটে ওঠে পরদায়, তাতে অন্যমনস্কতার জন্য কত নম্বর কাটা গেছে তাও লেখা থাকে। সেটা দেখলেই মা-বাবা বকাবকি করবেন।

চিকুর একটুও ভালো লাগছিল না। তবুও কোনওরকমে পড়া শেষ করে মা-র কাছে গেল। বলল, 'মা, মা, জানো, আমাদের বাগানের পাখিগুলো সব নকল—বিজ্ঞানীদের তৈরি।'

মা মাইক্রো-টিভি হাতে নিয়ে খবর শুনছিলেন, হাত থেকে টিভি পড়ে গেল। অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকালেন।

চিকু এক নিশ্বাসে বলে গেল পুরোনো দিনের কথা। আসল ফুলের কথা, আসল পাখির কথা, আসল মৌমাছির কথা। একদিন সূর্য ছিল আকাশে। দিনে থাকত উজ্জ্বল আলো, আর রাতে গাঢ় অন্ধকার।

মা কাছে এগিয়ে এলেন। হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন ছেলের সামনে। ওর দু-কাঁধে হাত রাখলেন, 'তুই এসব কার কাছে শুনেছিস?'

চিকু হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল। মনে পড়ল, বুড়ো লোকটা ওকে বারবার করে বারণ করেছিল, তার কথা কাউকে না বলতে। বললে সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে।

সুতরাং মা-র কথার জবাব না দিয়ে চিকু বলল, 'বলো না মা, এসব সত্যি?'

মা-র কপালে ভাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর বললেন, 'সব সত্যি। কিন্তু কে তোকে এসব কথা বলল! তোর বাবা জানতে পারলে...।'

বাবা ঘরে ছিলেন না। অফিসে গেছেন। অফিস বলতে বাড়ির লাগোয়া একটা ছোট ঘর। সেখানে নানারকম সব কম্পিউটার বসানো আছে। আর আছে চার-চারটে রঙিন টিভি। বাবা রোজ সেই ঘরে যান। সারাদিন বসে-বসে শুধু ছোট-বড় বোতাম টেপেন। টিভির পরদা খুঁটিয়ে লক্ষ করেন।

কম্পিউটার থেকে যেসব ছাপা কাগজ বেরিয়ে আসে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন। বাবা বলেন, সারা দেশ জুড়েই নাকি এরকম শক্তিশালী কম্পিউটার যোগাযোগ রয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণের গোপন খবরাখবর আদানপ্রদান হয় হাজার-হাজার কম্পিউটারের মাধ্যমে।

'তোর বাবা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবেন। এসব কথা তোর বাবাকে বলিস না যেন।' মা অবাক চোখে ছেলেকে দেখছিলেন। চিকু যেন কোনও স্বপ্নের দেশে মগ্ন হয়ে গেছে। ওকে বুকে টেনে নিয়ে মা বললেন, 'তুই খুব সাবধানে থাকিস। তোর জন্যে আমার ভয় করছে।'

চিকু মা'র ভয়ের কারণ বুঝতে পারল না। ও শুধু বিস্ময়ে ভাবছিল, সমস্ত নকল জিনিসের মধ্যে থেকেও মা-বাবা কেমন নিশ্চিন্ত হাসিখুশি রয়েছেন। অথচ এই ভয়ঙ্কর রহস্যটা ফাঁস হয়ে যেতেই চিকুর বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছে।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে চিকু শুনতে পেল বাবা-মা চাপা গলায় কথা বলছেন। কী কথা তা স্পষ্ট না বুঝতে পারলেও চিকুর আন্দাজে মনে হল আলোচনাটা ওকে নিয়েই।

কিছুক্ষণ পরে বাবার একটা কথা কানে এল ওর, 'ঠিক আছে। কাল ওকে আমার সঙ্গে অফিসে নিয়ে যাব। সব বুঝিয়ে বলব। ও এখন বড় হয়েছে। সব ওর জানা দরকার।'

তারপরই চিকু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সত্যিকারের ফুল, পাখি, লতাপাতা, মেঘ, সূর্য, স-ব এসে ভিড় করল ওর চোখের সামনে। ও দেখল, সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাচ্ছে সত্যিকারের মৌমাছি।

পরদিন আরও ভোরে উঠে পড়ল চিকু। পা টিপেটিপে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল বাগানে।

চারদিক মেঘলা, ধোঁয়াটে। আবছা আলোয় বাগানের গাছপালা চোখে পড়ছে। চিকু গোলাপ বাগানের দিকে এগোল। লক্ষ করল, ফোঁটা-ফোঁটা শিশির জমে আছে রঙিন গোলাপের পাপড়ির ওপরে। এই শিশিরের ফোঁটাও কি নকল! ভাবল চিকু। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, গোলাপ বাগানের ভেতরে মাটির ওপরে শুয়ে আছে আলখাল্লা পরা বুড়ো লোকটা। চিকু ঝুঁকে পড়ল নীচু হয়ে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল তার কাছে।

বুড়ো মানুষটার দু-চোখ বোজা। হাঁফাচ্ছে। লাল-নীল তালি মারা আলখাল্লা নিশ্বাসের তালে-তালে ওঠানামা করছে। পুঁটলি আর লাঠি পড়ে রয়েছে পাশেই।

হয়তো কেউ এসেছে টের পেয়েই বুড়ো মানুষটা চোখ খুলল। প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু চিকুকে দেখেই ভয় কেটে গেল। ধবধবে সাদা দাড়ির ফাঁকে মলিন হাসল বুড়ো। ঘড়ঘড়ে স্বরে কোনওরকমে বলল, 'এসেছ, খোকাবাবু?'

সঙ্গে-সঙ্গে কাশির দমক শুরু হল। সাদা মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠল বারবার। চোখ-মুখ লালচে হয়ে গেল।

চিকু বুঝল, মানুষটার খুব কষ্ট হচ্ছে। ও তার বুকে হাত রাখল। কাশি থামলে লোকটা হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। তারপর হাতড়ে পুঁটলিটা টেনে নিল। অতিকষ্টে ভেতর থেকে বের করল একটা পলিথিনের স্বচ্ছ প্যাকেট। তার মধ্যে রয়েছে একটা শুকনো বিবর্ণ ফুল। গোলাপ।

বুড়ো মানুষটা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'সত্যিকারের গোলাপ, খোকাবাবু। কতদিন ধরে আগলে-আগলে রেখেছি, আর পারব না। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।'

চিকুর হাতে তাপ লাগছিল। ও লোকটার চুল সরিয়ে কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

'তুমি আমাদের বাড়িতে চলো। বাবা ওষুধ দিলেই তুমি সেরে উঠবে।'

চিকুর উদ্বেগে বুড়ো যেন মজা পেল। বলল, 'কোনও ওষুধেই আমি আর সেরে উঠব না গো। এ-যুগের ওষুধ আমার সইবে না। তা ছাড়া, তোমার বাবা-মা জানতে পারলে আমাকে...নাঃ, থাক খোকাবাবু, খোলা আকাশের নীচেই আমি থাকব।'

আবার কাশি। চিকুর খুব খারাপ লাগছিল বুড়ো মানুষটার জন্যে। আজ আর কোনও গল্প শোনা হল না ওর। তবে ওই সত্যিকারের গোলাপটা দেখা গেল। মুগ্ধ চোখে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ ফুলটা দেখছিল চিকু। হাজারটা টাটকা নকল ফুলের চেয়ে একটা শুকিয়ে যাওয়া আসল ফুল অনেক বেশি দামি।

এমন সময় বাবার ডাক শোনা গেল, 'চিকু! চিকু!'

বুড়ো মানুষটা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। শুকনো গোলাপটা বুকের ওপরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে বুকটা উঠছে নামছে।

'পরে আবার আসব।' বলে চিকু উঠে এল বুড়োর পাশ থেকে। কিন্তু মানুষটার কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

রঙিন টেলিভিশনের পরদাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল চিকু। বাবা ওকে বাঁ-হাতে আলতো করে জড়িয়ে রেখেছেন, আর ডানহাতে বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নানান বোতাম টিপছেন। একইসঙ্গে কথা বলছিলেন বাবা।

'চিকু, তুমি কি জানো, কেন আমরা নকল গাছপালা, নকল ফুল, নকল পাখি—এসব তৈরি করেছি?'

টেলিভিশন-পরদায় বিভিন্ন জটিল অঙ্ক আর নকশা দেখতে-দেখতে চিকু জবাব দিল, 'জানি বাবা, জানি।'

অসুস্থ বুড়ো মানুষটার ছবি ওর চোখের সামনে ভাসছিল।

বাবা নরম গলায় বললেন, 'অনেক দিন আগে—আমার জন্মেরও আগে—নানান কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছিল। সেই বিষাক্ত বাতাসে একে-একে মরতে শুরু করল

গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল, পশু-পাখি—এমনকী মানুষও। তখন প্রাণে বাঁচার জন্যে বিজ্ঞানীরা মরিয়া হয়ে পথ খুঁজতে লাগলেন। সারা পৃথিবী জুড়েই চলল বেঁচে থাকার লড়াই। মানুষের সামান্য যা ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে ওই ভয়ঙ্কর দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ করার কোনও পথ ছিল না। ফলে বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, মানুষকেই যেমন করে হোক ওই বিষাক্ত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। চলল বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বেশিরভাগই সদ্যোজাত শিশুদের নিয়ে। কারণ বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন, আগামী দিনের মানুষের যেন দূষিত পরিবেশে কোনওরকম অসুবিধে না হয়। শিশুদের ফুসফুসে, শ্বাসনালীতে, নানারকম অস্ত্রোপচার করা হল। দূষিত বাতাসের চেম্বারে রেখে ওদের আচার-আচরণ লক্ষ করা হল। এ ছাড়া আরও কত কী! তারপর একদিন বিজ্ঞানীরা সফল হলেন —।'

বাবা কয়েকটা বোতাম টিপলেন। একটা মাইক্রোফোনে সাঙ্কেতিক কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন। কম্পিউটার থেকে বেরিয়ে আসা একটা ছাপা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'এইভাবে মানুষ টিকে গেল। আমরা দূষিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম। অবশ্য তখন মানুষের গড় আয়ু অনেক কমে গেল। কারণ পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি খাপ খেয়ে গেলেও মানুষের শরীরের কলকবজাগুলো তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে পড়তে লাগল...।'

চিকু বুঝল, কেন ও আগে কখনও বাগানের লোকটার মতো বুড়ো মানুষ দেখেনি। ও ঘুরে বাবার দিকে তাকাল। বাবা কত সহজভাবে শুনিয়ে যাচ্ছেন পুরোনো ইতিহাস। বাগানের বুড়ো লোকটার মতো বাবার চোখে স্বপ্ন নেই, গলা কেঁপে উঠছে না আবেগে। বাবা শুধু বিজ্ঞানের কথা শোনাচ্ছেন, বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কথা শোনাচ্ছেন।

'অবশ্য যতই নতুন-নতুন জেনারেশান আসবে গড় আয়ু ধীরে-ধীরে ততই বাড়বে। কারণ মানুষ ক্রমশ আরও বেশি করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে পরিবেশের সঙ্গে।'

'কিন্তু বাবা, গাছপালা, পাখি, এসব...।'

'ও, হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিলেন বটে, কিন্তু গাছপালা, ফুল-ফল, পাখি, কীটপতঙ্গ, এসব বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। একে-একে সব মরুভূমি হয়ে যেতে লাগল। মুছে যেতে লাগল প্রকৃতির সৌন্দর্য।'

চিকু পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া শুকনো গোলাপটার কথা ভাবছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবে মুছে গেছে কে জানে! শুধু স্মৃতি রয়ে গেছে। ও বলল, 'সেইজন্যেই নকল গাছপালা-পাখি তৈরি করে দিলেন বিজ্ঞানীরা?'

'হ্যাঁ। না তৈরি করলে আমাদের অসুবিধে হচ্ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য না থাকায় মানুষের মন খারাপ হচ্ছিল, মনটা খিটখিটে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল, ফলে মানুষের কাজ করার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছিল। তাই মনোবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিলেন, মানুষের মন ভালো রাখতে, মনে আনন্দ-ফুর্তি বজায় রাখতে, নকল প্রকৃতি তৈরি করা হোক। নইলে দেশের উন্নতির কোনও আশা নেই। তখন হাজার-হাজার বিজ্ঞানী বছরের পর বছর পরিশ্রম করে তৈরি করলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পরিবেশ ক্রমশ গাঢ় ঘোলাটে হয়ে ওঠায় সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল—সূর্যকে তো আর দেখাই যেত না। তখন বিকল্প হিসেবে তৈরি হল ভাসমান আলোকপিণ্ড। তুমি তো সবই দেখেছ।'

বাবাকে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। যেন একটা অচেনা লোক বসে আছে চিকুর সামনে। লোকটা বিষাক্ত বাতাসে দিব্যি শ্বাস নিচ্ছে। প্রকৃতি আসল না নকল তা নিয়ে লোকটার কোনও মাথাব্যথা নেই। শুধু বাইরের চেহারাটা ঠিক থাকলেই সে খুশি। আজ যদি চিকু মানুষ না হয়ে একটা রোবট হতো তা হলে বাবার বোধহয় কোনও অসুবিধে হতো না। শুধু রোবটের চেহারাটা আসল চিকুর মতো হলেই হল!

বাবা এবার ওকে কাছে টেনে নিলেন। আদরের গলায় বললেন, 'চিকু, এখন বলো তো, তোমাকে পুরোনো দিনের সমস্ত কথা কে বলেছে?' তোমার মা বলছিলেন, 'তুমি নাকি কারও কাছে ওসব কথা শুনে এসেছ? কে বলেছে তোমাকে?'

চিকুর শরীরটা কেমন কাঠ হয়ে গেল। এ-কথার উত্তর দিলেই অসুস্থ বুড়ো লোকটা হয়তো বিপদে পড়বে। কিন্তু কেন? ও পালটা প্রশ্ন করল, 'বাবা যখন সবকিছু আসল ছিল তখনকার মানুষেরা কেউ বেঁচে নেই?'

বাবার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাবা ধীরে-ধীরে বললেন, 'বেঁচে থাকা উচিত নয়। এই দূষিত পরিবেশে বেঁচে থাকতে তাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু তবুও যে কেউ-কেউ বেঁচে নেই তা নয়। তাদের খুঁজে পেলে বর্তমান সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। তা নইলে তারা পুরোনো দিনের সব গালগল্প শুনিয়ে এখনকার মানুষের মন অকারণে দুর্বল করে তুলবে। সেইজন্যেই তো তোমাকে বলছি, যার কাছে ওসব আজেবাজে কথা শুনেছ সে কে?'

চিকু কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'গতকাল সামনের রাস্তায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কথাগুলো আমাকে বলেই ছুটে পালিয়ে গেল।'

বাবার সামনে এই প্রথম মিথ্যে বলল চিকু। ওর মনে হল, ভালো কাজের জন্য মিথ্যে বললে কোনও পাপ নেই।

বাবার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। আনমনাভাবে বললেন, 'হুঁ, ওরা বেছে-বেছে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদেরই এসব আজগুবি গল্প শোনাচ্ছে।'

ডানহাত বাড়িয়ে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় বাবা কতকগুলো বোতাম টিপলেন। কী সব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করলেন মাইক্রোফোনে। তারপর ঠান্ডা গলায় ছেলেকে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। কারও আজেবাজে কথায় কান দিয়ো না।'

চিকু থমথমে মুখে অফিস-ঘর ছেড়ে চলে এল। বুড়ো মানুষটা এখন কেমন আছে সে-কথা জানতে ওর মন ছটফট করছিল।

সারাদিনে আর মা-বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাগানে বেরোতে পারেনি চিকু। সুযোগ এল পরদিন ভোরে।

গোলাপ বাগানে এসেই চিকু যেন একটা ধাক্কা খেল। রঙিন আলখাল্লা পরা শরীরটা টান-টান হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে কোনওরকম ওঠানামা নেই। মানুষটার বুকের ওপরে পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া একটা শুকনো গোলাপ আর কয়েকটা মলিন ফটো। দেখামাত্রই জিনিসগুলো চিনতে পারল চিকু। ও ছুটে আরও কাছে এগিয়ে গেল। বুড়ো মানুষটার হাতে হাত রাখল। কপাল ছুঁয়ে দেখল। বরফের মতো ঠান্ডা। চোখ বোজা। তবু যেন এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে মুখে। সাদা দাড়ি-গোঁফে হিমের ফোঁটা। হিমকণা রয়েছে ফটোগুলোর ওপরে, পলিথিন প্যাকেটের ওপরে। আঁকাবাঁকা লাঠি আর তালি মারা রঙিন পুঁটলি পড়ে আছে একপাশে।

চিকুর গলার ভেতরে ব্যথা করতে লাগল। বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত কষ্ট। বাগানে পাখিরা শিস দিচ্ছিল। মৌমাছি ফুলকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছিল। কতশত রঙের গোলাপ ফুটে রয়েছে বাগানে। কিন্তু সবকিছুর চেয়ে সুন্দর যেন ওই শুকনো গোলাপ আর পুরোনো ফটোগুলো। তা ছাড়া, বুড়ো মানুষটার আলখাল্লার রংবেরঙের তালিগুলো যেন এক-একটা তাজা ফুল। সেই ফুলের বিছানায় ফুটে রয়েছে পুরোনো দিনের আসল প্রকৃতির সজীব ছবি। রাখাল ভোরবেলা যাচ্ছে গরু চরাতে। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে নানা রঙের মেঘ। ছেলেমেয়েরা পার্কে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাগানে রংবেরঙের ফুলের উৎসব। চিত্র-বিচিত্র কত পাখি।

চিকু মানুষটার বুকের ওপর থেকে শুকনো ফুল আর ফটোগুলো তুলে নিল। সেগুলো ছেঁড়া কাগজে জড়িয়ে লুকিয়ে নিল পকেটে। এগুলো ও চোখের মণির মতো আগলে রাখবে। বিষ-বাতাসের সঙ্গে ও লড়াই করবে। ওর বয়েসি সব ছেলেমেয়েদের ডেকে শোনাবে সত্যিকারের দিনগুলোর আশ্চর্য নানান ঘটনা। দেখাবে এই মলিন ছবি আর গোলাপ। তারপর চিকুরা দল বেঁধে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে আসল প্রকৃতিকে। তখন আবার সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাবে সত্যিকারের মৌমাছি। পৃথিবী আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে।

এমনসময় বাবা-মা দুজনের ডাক শুনতে পেল চিকু। ওর নাম ধরে দুজনে ডাকছেন। ও শেষবারের মতো তাকাল বুড়ো মানুষটার দিকে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলল অস্ফুট স্বরে, ‘তোমার জিনিসগুলো আমি নিলাম।’

তারপর ছুট লাগাল বাড়ির দিকে। ওর ছোট্ট মনের ভেতরে ধীরে-ধীরে একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাচ্ছে সত্যিকারের মৌমাছি।



সন্দেহের এক কণা

স্পেসপোর্টে 'ফ্যালকন-১' নেমে পড়তেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। ছ'মাস—মানে একশো আশি দিন পর আবার পৃথিবী। জন্মভূমি। আমার ঘর-বাড়ি। কেমন আছে রুনু আর টুনু? কেমন আছে সুমিতা?

মহাকাশযান থেকে নেমে ম্যাগনেটিক অটো ট্র্যাকে সবে পা রেখেছি, সঙ্গে-সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা দশাসই চেহারার দুজন লোক কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে গেল আমার দু-পাশে। ওদের পোশাকে সিকিওরিটি ডিভিশনের প্রতীক-চিহ্ন আঁকা। কোমরের কাছে উঁকি মারছে জেনারেটর গান। চোখে কালো চশমা। মাথায় মেটাল হেলমেট।

আমাদের জুতোর নীচে স্টিলের পাত লাগানো। ফলে চলমান ম্যাগনেটিক ট্র্যাকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। দ্রুতগতির অটো ট্র্যাক আমাদের নিয়ে ছুটতে থাকে।

ওদের একজন জিগ্যেস করল, 'আপনি সান্যাল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, চাঁদের এক সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে কোনওরকমে বেঁচে ফিরে এসেছি।'

দ্বিতীয়জন আমার বাহু চেপে ধরল শক্ত হাতে: 'সেটা অপারেশান ডিভিশন যাচাই করে দেখবে।'

তার মানে? আমি বেঁচে ফিরেছি কি না সেটা যাচাই করে দেখবে অপারেশান ডিভিশন? আমি, ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, গোটা মানুষটা জলজ্যান্ত বেঁচে ফিরে এলাম এটাই কি যথেষ্ট নয়? চাঁদের ওই সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমাদের ল্যাবরেটরি। শুধু ফ্যালকন-১ বেঁচে গিয়েছিল। ওটা আমি রেখেছিলাম ল্যাবরেটরি থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরের একটা খাদের মধ্যে। সেখান থেকে পাথর বেয়ে উঠে হেঁটে পেরিয়েছি পনেরো কিলোমিটার পথ। চাঁদের বুকে এটুকু পথ কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ মতো হওয়ায় চলাফেরায় কষ্ট

অনেক কম, তবে অভ্যেসের দরকার। আমি আগে আরও চারবার বিভিন্ন অভিযানে চাঁদে গিয়েছিলাম। চাঁদ আমার মোটামুটি সয়ে গেছে।

অদ্ভুত দক্ষতায় লোক দুটো অটো ট্র্যাকের পথ পালটাচ্ছিল। ট্র্যাকের অসংখ্য কাটাকুটির মধ্যেও সিকিওরিটি বিল্ডিংয়ের পথ চিনে নিতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হচ্ছিল না ওদের। আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ইতস্তত করে বললাম, 'আগে বাড়িতে একবার দেখা করে গেলে হতো না? আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, ছ'মাস ওদের দেখিনি।'

লক্ষ করলাম, আমার এই কথায় একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে অভদ্রভাবে হাসল, তারপর বলল, 'ওসব পরে হবে, মিস্টার সান্যাল।'

অন্য সময় হলে এই অভদ্র উত্তরের উপযুক্ত জবাব দিতাম। কিন্তু এখন সবকিছুই কেমন অস্বাভাবিক গোলমেলে লাগছে। তবে সিকিওরিটি ডিভিশনে আমার ছোটবেলার বন্ধু রাকেশ ব্যানার্জি রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করলেই মনে হয় সব মিটে যাবে। ওদের বললাম, 'আমি রাকেশ, রাকেশ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

এবারে দ্বিতীয়জনের বিদ্রূপ-মাখানো হাসির পালা। বলল, 'ওঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেরকমই নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে।'

এবারে ভয় পেলাম। তা হলে কি সুমিতা বা রুনু-টুনুর কিছু হয়েছে! যে-ছ'মাস আমি ছিলাম না তার মধ্যে...ওঃ, ভগবান! আমি আর ভাবতে পারছি না!

চারপাশে অটো ট্র্যাকে অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। কোনও শব্দ নেই। সকলেই স্থির হয়ে ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে।

চারপাশের বাতাস বিশুদ্ধ! কারণ অক্সিজেন-নাইট্রোজেন সবই নিখুঁত শতকরা হিসেবে মিশিয়ে এই বাতাসকে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। অটো ট্র্যাকের মানুষগুলো সব ঝাপসা হয়ে আসছে। আর আমার কানে চাঁদের বিস্ফোরণের শব্দ আঘাত করছে বারবার।

তারই মধ্যে টের পেলাম প্রথম লোকটিও আমার হাত চেপে ধরল। ওদের হাতে বন্দি হয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। বন্দি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় একে!

ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। লুকোনো আলোয় আলোকিত। জানি, সাধারণ দৃশ্য-আলো ছাড়াও এ-ঘরে অবলোহিত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে এক্স-রে ছবি তোলার আধুনিক আয়োজন। ঘরে আসবাবপত্র বলতে চারটে এয়ার কুশন, বাতাসে ভাসমান গদিওয়ালা চেয়ার। আর তার পাশে একটা পলিমারের সাতকোণা টেবিলে হোস্ট কম্পিউটারের টার্মিনাল।

'জেনারেটর গানটা বের করে টেবিলে রাখুন, মিস্টার সান্যাল।'

আমার জেনারেটর গানটা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। যে-দুজন গার্ড আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে ওরাও পায়নি। কিন্তু এখন আদেশ শুনে বুঝলাম, অপরেশান ডিভিশনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারিনি। ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

রাকেশ কম্পিউটার টার্মিনালে বসে কি-বোর্ডের বোতাম টেপাটেপি করছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অপরিচিতের চোখে তাকাল। কিছু বলল না।

আমাকে জেনারেটর গান বের করে দেওয়ার নির্দেশ, অথবা আদেশ, যিনি দিয়েছিলেন এবারে তাঁকে দেখলাম। শক্ত চোয়াল, কপালে ভাঁজ, ফ্রেঞ্চকাট কাঁচাপাকা দাড়ি, মুখটা লম্বা ধরনের, রোগাটে দীর্ঘকায় চেহারা, আর শুধু চোখের নজর দিয়েই বোধহয় মানুষ খুন করতে পারেন।

'রাকেশ, আমি ফিরে এসেছি!' আমি জেনারেটর গানটা টেবিলে রেখে রাকেশের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম, 'তোদের ভালোবাসার টানেই বোধহয় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরেছি—।'

রাকেশ এক ঝটকায় কি-বোর্ড ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখের রেখাগুলো বীভৎস হয়ে গেল। ওর হাতে কখন যেন একটা জেনারেটর গান গজিয়ে উঠেছে। ওর কথার প্রতিটি শব্দ যেন ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের মতো শোনাল, 'মিস্টার দাসানি, এই রোবটটাকে জিগ্যেস করুন ইন্দ্রজিৎ সান্যালের ডেডবডিটা ও চাঁদের কোথায় লুকিয়ে এসেছে!'

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এসব কী শুনছি আমি? কোনওরকমে বললাম, 'রাকেশ, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? এই দ্যাখ, আমি, তোর ছোটবেলার বন্ধু—ইন্দ্রজিৎ—।'

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আমার পিঠে টোকা মারলেন। বললেন, 'ব্যানার্জি ভুল বলেছে। রোবট নয়, অ্যান্ড্রয়েড—যাদের চেহারাটা হুবহু মানুষের মতো কিন্তু ব্যাটারি ছাড়া চলতে পারে না।' হাসলেন দাসানিঃ 'যাই হোক, মাথাগরম করে লাভ নেই, ব্যানার্জি। আমি এখনও কাজ শুরু করিনি। আগে শুরু করি, তারপর দেখবেন ওসব শেখানো বুলি কোথায় যায়। তবে আপাতত এই মেশিনটাকে আমরা ইন্দ্রজিৎ সান্যাল বলেই ডাকব। তাতে জেরার সুবিধে হবে। আপনি বসুন, মিস্টার সান্যাল। আমার জেরা বহুক্ষণ ধরে চলে, অ্যান্ড্রয়েডদেরও পা ব্যথা হয়ে যায়।'

দাসানির হাতে একটা খুদে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট ছিল। সেটার কী একটা বোতাম টিপতেই ঘরের একমাত্র দরজায় নেমে এল স্বচ্ছ প্লাস্টিকের দেওয়াল। দরজা বন্ধ। ঘরে শুধু আমরা তিনজন।

রাকেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'সান্যাল, তুমি বোধহয় জানো না, নরেন্দ্র দাসানি কাউন্টার এসপাইয়োনেজ ইউনিটের রোবোসাইকোলজিস্ট। শত্রুপক্ষের রোবটরা আজ পর্যন্ত ওঁকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

আমি চেয়ারে বসে পড়েছিলাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'আজ ছ'মাস পর আমি দেশে ফিরে এলাম...সুমিতা, রুনু-টুনু...কতদিন ওদের দেখিনি।' একটু থেমে রাকেশকে লক্ষ্য করে অনুরোধ করলাম, 'বাড়িতে একটা ফোন করতে দিবি?'

রাকেশ একবার দাসানির দিকে তাকাল। তারপর ঘরের সাদা দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিদ্রূপের হাসি হেসে আমার বাড়ির ভিডিয়োফোন নম্বরটা উচ্চারণ করল। রাকেশ নম্বরটা জানে। ও আমার বাড়িতে গেছে বহুবার। সুমিতাকে বউদি বলে ডাকে, আর রুনু-টুনুর কাছে কাকু।

রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা পকেটে রেখে দিয়ে নরেন্দ্র দাসানি চুপচাপ আমাকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর নজরে সন্দেহ। আর ভাবখানা এই, কতক্ষণ তুমি আমার চোখে ধুলো দেবে, বাছাধন!

রাকেশ নম্বরটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা সাদা দেওয়াল জুড়ে ভেসে উঠল সুমিতার মুখ। রাকেশ বলল, 'বউদি, আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। ইন্দ্রজিতের বদলে এই রোবটটা ফিরে এসেছে চাঁদ থেকে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে—।'

রাকেশ একপাশে সরে গিয়ে ইশারায় আমাকে দেওয়ালের কাছে ডাকল। আমি ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম সুমিতার কাছে। সুমিতা আমাকে দেখছে। ভুরু কুঁচকে গেছে, চোখ সন্দেহে কুটিল। ওর প্রশ্ন ছুটে এল বুলেটের মতো।

'কোন তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল?'

আমার কান্না পেয়ে গেল। রাকেশ আর দাসানি সফল হয়েছে। সুমিতার মনেও সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ওরা। কিন্তু রুনু-টুনু?

সুমিতা কঠিন গলায় প্রশ্নটা আবার করল।

আমি মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম। দেওয়ালের ছবির দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না।

সুমিতা আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমি জবাব দিলাম। রাকেশ ও দাসানি বাজপাখির নজরে খুঁটিয়ে দেখছে আমার প্রত্যেকটা প্রতিক্রিয়া। একবার মাথা তুলে দেখলাম, সুমিতার মুখের ভাব এতটুকু পালটায়নি।

এরপরই দেওয়ালে ফুটে উঠল রুনুর ছবি। আমার দশ বছরের মেয়ে রুনু। ফুটফুটে। সবাই বলে আমার মতো নাকি দেখতে।

'রুনু, কেমন আছিস?'

রুনু হাসিমুখে সবসময় যেমন ঠাট্টা করে ঠিক সেভাবেই বলল, 'বাপি, বলো তো আমার জন্মদিন কবে?'

'রুনু—' যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে শব্দটা আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দু-হাতে মুখ ঢাকলাম আমি। গলার কাছটা ব্যথা করছে।

হঠাৎই শুনতে পেলাম কেউ আমাকে ডাকছে, 'বাপিসোনা!'

আমি দেওয়ালের দিকে তাকালাম। টুনু। আমার পাঁচ বছরের ছেলে। একমাথা কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো সবসময় কথা বলে। ও আমাকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না।

'টুনু—' আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলাম।

'বাপিসোনা, বলো তো, আমার ভালো নাম কী? ওটা ছাড়া আর-একটা কোন নামে তুমি আমাকে ডাকো?'

আমি বসে পড়লাম মেঝেতে। আর পারলাম না। এতক্ষণের চেপে রাখা কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম।

আর তখনই শক্ত কঠিন একটা স্পর্শ টের পেলাম ঘাড়ে। জেনারেটর গানের নল। আর একইসঙ্গে দাসানির আদেশ, 'জবাব দিন, সান্যাল। যদি প্রমাণ করতে চান আপনি সত্যিই ইন্দ্রজিৎ সান্যাল—মানুষ!'

আমি কাঁদতে-কাঁদতেই টুনুর প্রশ্নের জবাব দিলাম।

একটু পরেই শুনতে পেলাম রাকেশের গলা, 'ওরা ট্রেনিংয়ে কোনও ভুল রাখেনি। ইন্দ্রজিৎ সান্যালের যাবতীয় তথ্য গুঁজে দিয়েছে এর পজিট্রনিক ব্রেনে।'

দাসানি এক হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। দেখলাম, দেওয়ালটা আবার আগের মতো ছবিহীন সাদা হয়ে গেছে।

রাকেশ অধৈর্য হয়ে বলল, 'দাসানি, ছুরি দিয়ে ওর হাত-পা চিরে দেখুন রক্ত পড়ে কি না।'

নরেন্দ্র দাসানি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ইশারায় শান্ত হতে বললেন রাকেশকে। তারপর আমাকে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎ, এখানে আসাটা আপনার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। যাই হোক, আপনার মুখে চাঁদের গল্পটা একবার শোনা যাক। যদিও রেডিয়ো মেসেজ আমরা ঠিকমতোই পেয়েছি।'

রাকেশ এগিয়ে এসে জেনারেটর গানটা ঠেকিয়ে ধরল আমার কপালে। এটা থেকে তিনরকম লেভেলে ফায়ার করা যায়, লো-লেভেল, হাই-লেভেল আর আলট্রা-হাই-লেভেল। দেখলাম সিলেক্টর সুইচটা এখন আলট্রা-হাই-লেভেলে।

দাসানি কিছু করে ওঠার আগেই রাকেশ বাঁ-হাতে কোথা থেকে একটা ছুরি বের করে ক্ষিপ্রগতিতে বাতাস কেটে চালিয়ে দিল আমার গালে। পাকা হাত। গাল চিরে গেল শুধু। দাসানি চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্যানার্জি কী হচ্ছে! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?'

আমিও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। ডানগাল বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সত্যিকারের রক্ত। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরলাম গালে। রাকেশ রক্ত দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেল। বোধহয় বুঝল আমি রোবট নই, মানুষ। ওর চোখে আবার আমার ‘বন্ধু’ রাকেশের দৃষ্টি ফিরে আসছিল। কিন্তু দাসানির কথায় আমার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। রাকেশের দৃষ্টিও হয়ে গেল উদভ্রান্ত পাগলের মতো।

নরেন্দ্র দাসানি বললেন, ‘কী তখন থেকে ছেলেমানুষি করছেন, ব্যানার্জি! আপনাকে তো সেই গোড়া থেকেই বলছি, এটা অ্যান্ড্রয়েড—রোবট নয়। অ্যান্ড্রয়েডদের রক্ত-মাংস থাকে—মানুষেরই মতো। শুধু ব্রেন আর হার্ট, ওই দুটোই যন্ত্র—চলে ব্যাটারিতে। কিন্তু এক্স-রে কিংবা মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না। আপনি যান তো, চেয়ারে গিয়ে চুপ করে বসুন।’

কিন্তু রাকেশ চেয়ারে গিয়ে বসল না। ছুরি ফেলে দিয়ে একহাতে আমার জামা খামচে ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর বলতে লাগল, ‘বল, ইন্দ্রজিৎকে তুই খুন করে কোথায় পুঁতে রেখেছিস—বল...।’

দাসানি এবার জোর করেই সরিয়ে দিলেন রাকেশকে। ঠেলে দিলেন একটা চেয়ারের দিকে। রাকেশ বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বড়-বড় শ্বাস নিয়ে হাঁফাতে লাগল।

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। পৃথিবী এখন আর আমার ঘর-বাড়ি নয়, কিচ্ছু নয়। এখানে আমার আপনজন বলতে আর কেউ নেই।

দাসানি আবার ফিরে এলেন আমার কাছে। কাঁধে হাত রেখে বললেন, ‘ইন্দ্রজিৎ, এবারে চাঁদের গল্পটা আপনি বলতে পারেন।’

আমি ধীরে-ধীরে সব বললাম।

তিন বছর আগে আন্তর্জাতিক খনন সংস্থা চাঁদের ‘টেরা’ অঞ্চলে একটা আধুনিক খনন কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নেয়। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এই কেন্দ্র তৈরি করা হয় দু-বছরের চেষ্টায়। এর কাজ হল চাঁদের মাটি ও পাথর থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ নিষ্কাশন করা। লুনার হাইল্যান্ডস-এ অবস্থিত এই কেন্দ্রটি চাঁদের ওপিঠে। অর্থাৎ, চাঁদের যে-দিকটা সবসময় পৃথিবীর কাছ থেকে আড়ালে থাকে, সেই দিকে। নিউক্লীয় শক্তিচালিত এই কেন্দ্রের তদারকির জন্যে পালা করে বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়। কিন্তু সমস্যা বাধে টাইটান উপগ্রহের বিদ্রোহী সভ্যতাকে নিয়ে।

প্রায় চারশো বছর আগে যন্ত্রসভ্যতায় বিশ্বাসী কয়েক হাজার পৃথিবীবাসী শনির টাইটান উপগ্রহে গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তোলে। টাইটানের নাইট্রোজেন আর মিথেন ঘেরা আবহাওয়ায় আশ্চর্য দক্ষতায় তারা তৈরি করে নিরাপদ আবরণে ঢাকা শহর। তারপর বছরের পর বছর ধরে তারা প্রযুক্তিকে উন্নত করেছে। আর একইসঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। শোনা যায়, ওদের বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। চাঁদে আমাদের নতুন পরিকল্পনার কথা যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা বোধহয় খবর পেয়ে যায়। তারপর ওদের গুপ্তচরের অন্তর্ঘাতমূলক

ষড়যন্ত্রে—অন্তত আমার তাই অনুমান—চাঁদের খনন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসি।

এখন বুঝতে পারছি, টাইটানের অ্যান্ড্রয়েড গুপ্তচর সন্দেহ করে সিকিওরিটি ডিভিশনের গার্ড পাঠানো হয় আমাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করার জন্য। আর এখন আমার দেশপ্রেমের ‘পুরস্কার’ দেওয়ার জন্যে অপারেশান ডিভিশন উন্মুখ। একেই বলে অদৃষ্ট!

নরেন্দ্র দাসানি ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। মাঝে-মাঝে ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। ওঁকে আমি আগে কখনও এখানে দেখিনি। একটা বিশাল বাড়িকে দু-ভাগে ভাগ করে তৈরি হয়েছে দুটো ডিভিশনঃ সোল সিকিওরিটি ডিভিশন ও সোল অপারেশান ডিভিশন। দাসানি কোনটায় চাকরি করেন কে জানে!

একটা বাতাস-চেয়ার টেনে নিয়ে দাসানি বসলেন আমার মুখোমুখি। তারপর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

‘স্কটল্যান্ডের ফোর্থ ব্রিজের ওপরে আমাকে একটা সনেট লিখে দিন তো...।’

‘ও আমার দ্বারা হবে না। কবিতা আমি একদম লিখতে পারি না।’

‘৩৪৯৫৭-এর সঙ্গে ৭০৭৬৪ যোগ দিলে কত হয়?’

তিরিশ সেকেন্ড মতো চুপ করে থেকে বললাম, ‘১০৫৬২১।’

‘আপনি দাবা খেলেন?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘ধরুন দাবা খেলায়—।’

রাকেশ জেনারেটর গান টেবিলে রেখে কম্পিউটার কি-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ঝিম মেরে বসে ছিল, হঠাৎই খেপে উঠে চিৎকার করে বলল, ‘দাসানি, আপনারা কি টুরিং টেস্ট নিয়ে খেলা করছেন?’

কোনও যন্ত্র ভাবতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে ‘নকলনবিশি’ নামে একটা খেলার পরিকল্পনা করেছিলেন এক প্রাচীন বিজ্ঞানী। নাম অ্যালান ম্যাথিসন টুরিং—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক। ওঁর সেই খেলাকে পরে অন্য বিজ্ঞানীরা ‘টুরিং টেস্ট’ নাম দেন। এখন, টুরিং মারা যাওয়ার প্রায় ছ’শো বছর পরে, নরেন্দ্র দাসানি আমাকে টুরিং টেস্টের প্রশ্নগুলোই করছিলেন, আর আমিও হুবহু সেই উত্তরগুলো দিচ্ছিলাম। সেইজন্যে যোগ অঙ্কের উত্তরটাও ভুল দিয়েছি।

দাসানি থেমে গেলেন। ভুরু কুঁচকে রাকেশের দিকে তাকালেন। একটু ভেবে বললেন, ‘দেখুন তো, পোস্টমর্টেম টিম চাঁদে রওনা হয়েছে কি না। আমার মনে হচ্ছে ওরা এই অ্যান্ড্রয়েডটার নকল

ব্রেনে আসল ইন্দ্রজিতের সমস্ত স্মৃতির হুবহু ছাপ তুলে দিয়েছে...পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মেমোরি ম্যাপ। টুরিং টেস্ট দিয়ে একে ধরা যাবে না।'

দাসানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। পরনের মেটাল-
ফাইবারের পোশাকের কোনও একটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট চেহারার একটা ডিজিটাল যন্ত্র বের করলেন। বললেন, 'এই স্ক্যানারটা এক্স-রে আর আলট্রাসনিক স্ক্যান দুটোই করতে পারে—।'

রাকেশ কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বোতাম টিপছিল। দাসানির দিকে চোখ তুলে বলল, 'ফ্যালকন-১ তল্লাশির কাজ শেষ করে পোস্টমর্টেম টিম লুনার হাইল্যান্ডস-এ পৌঁছে গেছে। ফ্যালকন-১-এ কিছু পাওয়া যায়নি। ওদের রেডিয়ো মেসেজ আসছে কোল রুমে। আপনি জলদি একে স্ক্যান করে দেখুন, কোনও অস্বাভাবিক মেটাল পার্টসের ছবি পাওয়া যায় কি না।'

দাসানি বোধহয় ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কলার ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাকে। ওঁর শক্তি আমাকে অবাক করে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ধরা তোমাকে দিতেই হবে। শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা। প্রতিদিন আমি হাফডজন অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই—।'

তারপর ডিজিটাল স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যানিংয়ের কাজ শুরু করলেন।

যন্ত্রে কিছুই ধরা পড়ল না। আমি জানতাম পড়বে না। কিন্তু সন্দেহের বিষ ওদের পাগল করে দিয়েছে। সুমিতা, রুনু, টুনু—ওরাও বাদ যায়নি। বিশ্বাসের ভিত এত সহজে টলে যায় জানতাম না।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও দাসানির কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। যন্ত্রটা পকেটে রেখে আপনমনেই বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'যে করে হোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। এর আগে ডেল্টা থ্রি-র দুর্ঘটনার কথা আমরা কেউ ভুলে যাইনি। টাইটান থেকে এক অ্যান্ড্রয়েড স্পাই এসেছিল আমাদের ডেল্টা থ্রি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে। ওর শরীরের ভেতরে লুকোনো ছিল একটা এইচ বোমা। বিশেষ একটা কোড ওয়ার্ড যদি অ্যান্ড্রয়েডটা উচ্চারণ করে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে বোমাটা এক্সপ্লোড করবে। এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম টাইটানের আর এক মানুষ-গুপ্তচরকে সাইকোপ্রোব করে। তারপর অতিকষ্টে আমরা অ্যান্ড্রয়েডটাকে ধ্বংস করেছিলাম। পাওয়ার প্ল্যান্টটা অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল...' হঠাৎই গলার স্বর চড়িয়ে আমাকে লক্ষ করে দাসানি বললেন, 'আপনার কোড ওয়ার্ডটা কী, মিস্টার সান্যাল?'

আমারও ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল। তাই চেঁচিয়ে জবাব দিলাম, 'গণ্ডমূর্খ!'

দাসানি বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন আমার গালে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্তের স্বাদ পেলাম জিভে।

রাকেশ বলল, 'একে ইন্দ্রজিতের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, দেখবেন ধরা পড়ে গেছে। সুমিতা বউদি, রুনু, কিংবা টুনু—কেউ না কেউ ঠিক ধরে ফেলবে একে। তারপর শুরু হবে আমাদের খেলা—।'

থাপ্পড় কষানোর পরমুহূর্ত থেকে দাসানি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন। সম্ভবত প্রতিক্রিয়া দেখছিলেন। রোবট আর মানুষের প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চয়ই তফাত থাকবে। ওঁর গুণী চোখ নিশ্চয়ই সেটা বুঝতেও পারবে। আমি আশা-ভরা চোখ নিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডানগালটা অসহ্য জ্বালা করছিল।

দাসানি রাকেশকে লক্ষ করে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যানার্জি, ইন্দ্রজিতের বাড়িতেই নিয়ে যাই একে—।'

সেই মুহূর্তে দাসানির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করছিল আমার।

নরেন্দ্র দাসানি বিদ্রূপের স্বরে বলতে লাগলেন, 'আসলে এই যন্ত্রটার কোনও দোষ নেই। ইন্দ্রজিতের মেমোরি ম্যাপ করে দেওয়ায় ওর এখন বিশ্বাস যে, ও-ই আসল ইন্দ্রজিৎ সান্যাল। ফলে ওর অভিনয়ে কোনও ফাঁক থাকবে না। ও জানে যে, ও-ই আসল লোক। কিন্তু আমিও এত সহজে ছাড়ছি না।'

দাসানি আমাকে ইশারা করলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। রাকেশকে একপলক দেখলাম। ও তখনও কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত।

দাসানি রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা বের করে বোতাম টিপলেন। প্লাস্টিকের দেওয়াল সরে গেল। আমরা বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সুমিতা, রুনু, টুনুকে সামনাসামনি দেখতে পাব ভেবে ততটা আর মনখারাপ হচ্ছিল না।

অটো টানেল ধরে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়িতে উঠেই দাসানি আমার বাড়ির স্থানাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছেন কম্পিউটারকে। সঙ্গে-সঙ্গে সবচেয়ে সুবিধেজনক পথের ছবি ফুটে উঠেছে কম্পিউটারের পরদায় এবং গাড়িটাও সেই অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছুটতে শুরু করেছে।

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলাম। সূর্য সবে ডুবে গেছে পশ্চিমে। আকাশে এলোমেলো লাল-হলুদ রং। হঠাৎই ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়ি। দাসানি পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে বললেন, 'তোমাকে এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি—' তারপর একটা জেনারেটর গান বের করে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'এখনও বলো, কে তুমি?'

লক্ষ করেছিলাম, ওঁর জেনারেটর গানের সেফটি লক খোলা নেই। সুতরাং চোখের পলকে জোরালো এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম দাসানির মুখে। আবার আর-একটা—এবারে রগের ওপরে। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। দাসানির চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, কাত হয়ে পড়ে গেলেন সিটের

ওপরে। ওঁর হাত থেকে খসে পড়া জেনারেটর গানটা তুলে নিলাম হাতে। দাসানিকে ঠেলে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। তারপর আবার গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

আমার বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। সেখানে বাগান করেছিলাম। ফুলগাছ লাগিয়েছিলাম নিজের হাতে। এখন শীতের শেষে গোধূলিতে ফুলের গন্ধ পেলাম। দেখলাম, বাড়ির চারটে জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে বন্দুক ফেলে দিলাম। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম ফুলগাছগুলোর কাছে। বুকভরে ঘ্রাণ নিলাম। আঃ। ঠোঁটের কোণে জ্বালাটা আবার টের পেলাম। একটা ছোট্ট গোলাপ ছিঁড়ে নিলাম গাছ থেকে। ছোট্ট সুন্দর ফুলটা ওর রূপে আর ঘ্রাণে আমাকে যেন পোষ মানিয়ে নিল। ফুলটা আমাকে সন্দেহ করে না।

ফুলটা পকেটে রেখে বাড়ির দরজার দিকে এগোলাম। ছ'মাস চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে কাটিয়ে এখন যে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে না তা নয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা যান্ত্রিক স্বর আমাকে পাসওয়ার্ড জিগ্যেস করল। একমাত্র বাড়ির বাসিন্দারা ছাড়া পাসওয়ার্ড কেউ জানে না। জানানো হয় না। তবে খুব অন্তরঙ্গ পারিবারিক বন্ধু হলে অন্য কথা। যেমন রাকেশ আমাদের দরজা খোলার পাসওয়ার্ড জানে। আমি, সুমিতা আর রুনু জানি। টুনুকে এখনও শেখানো হয়নি।

আমি পাসওয়ার্ড বলতেই দরজা খুলে গেল এবং ভেতরে কোথাও একটা ঘন্টি বেজে উঠল।

সামনেই আলোয়-ভেসে-যাওয়া বসবার ঘর। আর-একটু দূরে দু-পাশে দাঁড়িয়ে রুনু আর টুনু।

'রুনু-টুনু—।'

রুনু কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। টুনু একটু যেন হাসতে চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎই কেঁদে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে!'

কোথা থেকে যেন আচমকা হাজির হল সুমিতা। ঠিক ওদের দুজনের মাঝে। আমি সুমিতার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। আর ঠিক তখনই সুমিতা ওর হাতে-ধরা জেনারেটর গান থেকে ফায়ার করল। আমি চৌকাঠের ওপর বসে-পড়লাম ঝরা ফুলের মতো।

সুমিতা তখন আতঙ্কে পাগলের মতো চিৎকার করছে। বলছে, 'রাকেশ আমাকে ঠিক সময়েই খবর দিয়েছিল। বলেছিল, "নরেন্দ্র দাসানি রোবটটাকে সঙ্গে করে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এটা দাসানিকে শেষ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে না হাজির হয়। যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে তুমি তৈরি থেকো, বউদি। আমি হাতের কাজ শেষ করেই যাচ্ছি।" রাকেশের কথাই শেষপর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। আমার স্বামীকে শেষ করে তুমি আমাদের সবাইকে শেষ করতে এসেছ!'

সুমিতা কোন লেভেলের ফায়ার করেছে জানি না, কিন্তু ওর কথাগুলো আমি যেন বহুদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। রুনু, টুনু অবাক চোখে আমাকে দেখছিল। সত্যিই তো, আগে কখনও কোনও রোবটকে মরতে দেখেনি ওরা।

ঠিক সেই সময়ে শুনতে পেলাম ভারী বুটের শব্দ। কারা যেন দৌড়ে আসছে অন্ধকার বাগানের পাশ দিয়ে। পায়ের শব্দ কাছে এল। রাকেশ আর দাসানি। সুমিতার হাবভাব আর জেনারেটর গান দেখেই ব্যাপারটা ওরা বোধহয় বুঝতে পারল।

দাসানি ঝুঁকে পড়ে আমার পোশাক তল্লাশ করতে লাগলেন। কিছু কাগজপত্র পেলেন। তারপরেই পেলেন গোলাপটা। লক্ষ করলাম, ওই ছোট্ট তাজা ফুলটা পাথরের মতো মানুষটাকে বদলে দিল। ওঁর চোখ ছোট হল, কপালে ভাঁজ পড়ল। হাঁটু গেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমার মুখের ওপরে। বিড়বিড় করে বললেন, 'অ্যান্ড্রয়েড কখনও নিজের খেয়ালে গাছ থেকে ফুল ছেঁড়ে না—কখনও না। অ্যান্ড্রয়েডদের সব কাজের পিছনেই একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে—কোনও না কোনও কারণ।'

উত্তেজিতভাবে রাকেশের দিকে তাকিয়ে দাসানি বললেন, 'ব্যানার্জি, আমাদের বোধহয় ভুল হয়েছে!'

রাকেশ তখন ছোট্ট একটা ডিজিটাল ট্রান্সিভারে কার সঙ্গে যেন বেতার-যোগাযোগে কথা বলছিল। খট করে যন্ত্রটার সুইচ অফ করল ও। দেখলাম, ওর চোখ চিকচিক করছে। ধরা গলায় থেমে-থেমে ও বলল, 'চাঁদে ওরা টাইটানের অ্যান্ড্রয়েড-স্পাইয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। ওরা যে ইন্দ্রজিৎ সান্যালের নকল করে অ্যান্ড্রয়েড গুপ্তচর পাঠাচ্ছে সেই খবরটা ঠিকই ছিল...কিন্তু মনে হয়, ডিজাইনে কোনওরকম গোলমাল থাকায় ঠিক সময়ের আগেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তারপর...।'

রাকেশ আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে, চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল, 'ইন্দ্র...ইন্দ্র...সত্যিই তুই ফিরে এসেছিলি...!'

আমার মুখে ওর হাতের ছোঁয়া টের পেলাম। ঠিক তখনই সুমিতা-রুনু-টুনু একসঙ্গে কেঁদে উঠল। চোখে জল ওদের সন্দেহ ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

প্রিয়জনেরা যদি চোখের জলে বিদায় জানায় তাহলে মরতে কারও খারাপ লাগে না। আমারও লাগবে না।



খেলতে-খেলতে

মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ডেকেই চলেছিলেন, কিন্তু সুনীতের কোনও খেয়াল নেই। পার্সোনাল কম্পিউটারের ওপর হুমড়ি খেয়ে দু-হাতে বোতাম টিপে যাচ্ছিল ও। আর কম্পিউটারের পরদায় খুদে একটা কালো বেড়াল এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।

'ক্যাট' খেলাটা গতকালই পেয়েছে গৌতমের কাছে। এমনি-এমনি অবশ্য দেয়নি। ক্যাটের বদলে 'ডিগার' গেমটা ওকে দিতে হয়েছে। আগে সুকলের কম্পিউটারে বসে দিব্যি কম্পিউটার গেম্‌স খেলা যেত, কেউ কিছু বলত না। কিন্তু গত মাসে রঞ্জন গেম্‌স খেলার সময়ে কী করে যেন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে ভাইরাস ঢুকিয়ে ফেলেছিল। ব্যস!

ওদের কম্পিউটার-টিচার মিস্টার গোম্‌স। দেখতে এমনিতেই লাল, তার মুখটা আরও লাল হয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে নবাবি ফরমান জারি হয়ে গিয়েছিল, 'নো গেম্‌স।' যদি কাউকে দেখা যায় গেম্‌স খেলছে কম্পিউটারে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে স্কুল থেকে বিদায়। ওদের প্রিন্সিপাল মিস্টার স্টুয়ার্টও খুব কড়া ধাতের মানুষ। উনিও গোম্‌সের কথায় একমত। তা ছাড়া, গোম্‌স স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়ার টিচার।

মা কাছে এসে পিঠে হাত রাখতেই সুনীত বোতাম টেপা থামাল। তখন রঙিন পরদায় বেড়ালটা সবে একটা ডাস্টবিনের টিন থেকে লাফ দিয়ে কাঠের বেড়াটা টপকে কাপড়-ছড়ানো দড়ি ধরে ঝুলছে।

সুনীত বিরক্ত মুখে ফিরে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী যে ডাকাডাকি করো না! কী হয়েছে?'

মা-ও বিরক্তভাবে বললেন, 'কী আবার হবে, খাবার ঠান্ডা হচ্ছে। ক'টা বাজে খেয়াল আছে? তোমাকে কম্পিউটার কিনে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে। বলছি তোমার বাবাকে—।'

সুনীত কি-বোর্ড ছেড়ে উঠে পড়ল। কম্পিউটার অফ করে দিল। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট। এখন খেয়ে না নিলে কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটায় নতুন খেলাটা

চালানো যাবে না। স্পষ্ট মনে আছে, লোকটা বলেছে রাত এগারোটার আগে গেম্‌সটা না খেলতে। তাহলে নাকি আসল মজাটাই পাওয়া যাবে না। নতুন এই খেলাটার কথা এখনও কাউকে বলেনি সুনীত। কারণ, বলতে বারণ করে দিয়েছে বারবার।

খাবার টেবিলে বসে চুপচাপ খেতে-খেতে সকালে দেখা লোকটার কথা মনে পড়ছিল সুনীতের। ও তখন গৌতমের সঙ্গে স্কুলের বন্ধ সদর দরজায় এসে লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঝালমুড়ি কিনছে। প্রথমে খেয়াল করেনি। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'খোকা, কম্পিউটার গেম্‌স নেবে? একেবারে নতুন, ম্যাজিকের মতো।'

চমকে তাকিয়েছিল সুনীত। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে তালিমারা একটা ছাই রঙের ওভারকোট। ময়লা গায়ের রং। ভাঙা তোবড়ানো গাল। কপালে অসংখ্য ভাঁজ। আর চোখ দুটো যেন বরফের টুকরো।

কথা বলতে-বলতে কোটের পকেট থেকে একটা ঝকঝকে ফ্লপি ডিস্ক বের করে এনেছিল লোকটা। বাড়িয়ে ধরেছিল সুনীতের দিকে। আরও কীসব বলছিল, কিন্তু রাস্তা দিয়ে টাম ছুটে যাচ্ছিল। তার ঘড়ঘড় শব্দে কিছু শোনা যায়নি।

ঝালমুড়ি কেনা হয়ে গিয়েছিল। গৌতম লোকটার চেহারা দেখে চাপাগলায় বলেছিল, 'স্টোনম্যান। জলদি চলে আয়।'

কিন্তু সুনীত যে গেম্‌স-পাগল। তা ছাড়া, গৌতমের মতো ভীতুও নয়। সুতরাং সে গৌতমকে থামতে বলে লোকটাকে জিগ্যেস করে বসল, 'কত দাম?'

'দাম?' অদ্ভুতভাবে খ্যা-খ্যা করে হাসল লোকটা। বলল, 'এর কোনও দাম নেই, খোকাবাবু। জানের কি কোনও দাম হয়, হ্যাঁ? এই নাও। তবে ঠিক রাত এগারোটায় গেম্‌সটা চালাবে। তার আগে না।'

গরাদের ফাঁক দিয়েই ফ্লপিটা সুনীতের দিকে এগিয়ে দিল লোকটা। ওর শিরা বের করা হাতে হাত ঠেকে গেল সুনীতের। উঃ, কী ঠান্ডা! বরফ যেন। চমকে হাত টেনে নিল ও। দেখল, লোকটা হাসছে মিটিমিটি। হলদেটে দাঁত বের করে বলল, 'খোকাবাবু, তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর। এইরকমই আমার পছন্দ—কিন্তু মনে থাকে যেন, রাত এগারোটার আগে না...।'

এই কথা বলে অদ্ভুত লোকটা জোরকদমে হাঁটা দিল বড় রাস্তা ধরে। ওর শরীরটা যেন বাতাসে ভর করে ভেসে যাচ্ছিল।

টিফিন শেষের ঘণ্টা বাজতেই ঘোর কাটল সুনীতের। গৌতম ওর জামা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ছুটতে শুরু করেছে ক্লাসরুমের দিকে। সঙ্গে অন্য ছেলেরাও ছুটছে। হইহই, এক জটপাকানো চিৎকার। তারই মধ্যে লোকটার কথা কানে বাজছিল, '...ঠিক রাত এগারোটায়...।'

খাওয়া শেষ হতেই আবার কম্পিউটার-রুমে এসে ঢুকল সুনীত। এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। ওকে আবার এ-ঘরের দিকে আসতে দেখে মা অনুযোগ করছিলেন কিন্তু বাবা থামিয়ে দিয়েছেন মা-কে। বলেছেন, 'কম্পিউটার ছাড়া এখানকার ছেলেমেয়েরা এক-পা চলতে পারে না। ও তুমি বুঝবে না। এ এক অবাক-করা যন্ত্র।'

সুতরাং লোকটার দেওয়া ফ্লপি ডিস্কটা ড্রয়ার থেকে বের করে নিয়ে বসল সুনীত। তাকিয়ে রইল ঘড়ির দিকে। ফ্লপিটা কেমন অদ্ভুত ঠান্ডা। ঠিক লোকটার হাতের মতো?

দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটার ঢং-ঢং আর সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ শুরু।

কম্পিউটার অন করে দিল সুনীত। দু-বার 'এনটার' বোতামটা টিপে ডস্ প্রম্পটে চলে এল। তারপর 'সি' ড্রাইভ থেকে 'এ' ড্রাইভে গিয়ে ফ্লপিটা ঢুকিয়ে দিল 'এ' ড্রাইভের স্লটে। ডাইরেক্টরি দেখলঃ একটাই মাত্র ফাইল রয়েছে ফ্লপিটায়। নাম 'ওয়ান্ডার'। সুতরাং দ্রুতহাতে কি-বোর্ডের বোতাম টিপতে লাগল সুনীত। আর কম্পিউটারের পরদায় নানা রঙে ফুটে উঠল নানা লেখা। লেখাগুলো পড়তে-পড়তে সুনীতের মনে হচ্ছিল ওই হিম-চোখ লোকটা যেন ওকে পড়ে শোনাচ্ছে কথাগুলোঃ

'কম্পিউটারের আশ্চর্য জগৎ নিয়ে ম্যাজিকের মতো এই খেলা "ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড"। এটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দুনিয়ায় মাত্র দুটো জগৎ রয়েছেঃ একটা কম্পিউটারের বাইরের জগৎ, যেখানে বসে তুমি কি-বোর্ডের বোতাম টিপছ। আর-একটা কম্পিউটারের ভেতরের জগৎ—আশ্চর্য জগৎ, যেখানে বসে আমি কথা বলছি...।'

সুনীতের বেশ মজা লাগল। এরকম কম্পিউটার গেম্স ও জীবনে দেখেনি। লেখাগুলো পড়তে-পড়তে ওর গায়ে কাঁটা দিল। কেমন যেন শীত করে উঠল। সে কি ঘরের এয়ার কন্ডিশনের জন্য?

টিভি পরদায় লেখাগুলো তখন পালটে গেছে। ফুটে উঠেছে নতুন লেখাঃ 'এবারে কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে ঢুকে পড়ার জন্যে ফাংশান-কি এফ-ওয়ান বোতামটা টেপো।'

বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে এফ-ওয়ান বোতামটা টিপল সুনীত। সঙ্গে-সঙ্গে রঙিন পরদায় পরপর ফুটে উঠল। ছবির মেলা—ঘর-বাড়ি, বাগান, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল—কত কী! একে-একে সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। আর ছবিগুলো কী আশ্চর্যরকম নিখুঁত! ঠিক যেন রঙিন ফোটোগ্রাফ। কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে এত নাড়াচাড়া করেছে, সুনীত, কিন্তু এরকম নিখুঁত ছবি কখনও দেখেনি।

ছবির মেলা হঠাৎই থেমে গেল। তারপরই লেখা ফুটে উঠল পরদায়ঃ 'এইবার আসল খেলা শুরু। এই খেলায় ভীষণ মনোযোগ দরকার। আর দরকার নিরিবিলি ঘর—যাতে কেউ তোমাকে

দেখতে না পায়। সেইজন্যেই বলেছি, রাত এগারোটার আগে এ-খেলা খেলবে না। তোমার আশেপাশে কেউ নেই তো?' "ওয়াই কিংবা এন" বোতাম টিপে জবাব দাও "হ্যাঁ" অথবা "না"।'

সুনীত জানে, কেউ নেই। বাবা এখন বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছেন, আর মা কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত উলবোনা মেশিনে নতুন-নতুন নকশা তুলছেন। তা সত্ত্বেও ও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল পিছন দিকে। তারপর 'এন' বোতাম টিপে জবাব দিল, 'না, ঘরে আর কেউ নেই।' তখন আবার নতুন নির্দেশ ফুটে উঠল পরদায়ঃ 'এবারে তুমি তোমার ইচ্ছেমতো তৈরি করো আশ্চর্য জগৎ। তোমার খুশিমতো ঘর-বাড়ি, বাগান, সমুদ্র, পাহাড়—সব সাজিয়ে নাও। ঠিক যেমনটি তোমার পছন্দ।'

তারপরই পরদায় ফুটে উঠল কোন-কোন বোতাম টিপতে হবে তার লিস্ট। সুনীত কাজ শুরু করল সঙ্গে-সঙ্গেই।

দ্রুত হাতে বোতাম টিপে ও সাজাতে লাগল ঘর-বাড়ি। নানা রঙের নানারকম বাড়ির নকশা থেকে ও ওর পছন্দসই বাড়িটা বেছে নিল। তারপর তার খুঁটিনাটি রদবদল করে তৈরি করল সুন্দর একটা বাড়ি। কম্পিউটার গ্রাফিক্সে খেয়াল-খুশিমতো যেভাবে ছবি আঁকে, এও ঠিক তেমনই।

বাড়ি তৈরি শেষ হতেই সুনীত তার লাগোয়া একটা ফুলবাগান জুড়ে দিল। তারপর বাড়ির পিছনে এঁকে দিল একটা পাহাড়। তার মাথায় বরফ। বাঃ, বেশ চমৎকার লাগছে বাড়িটা! আপনমনেই ভাবল সুনীত। এবারে একটা সমুদ্র জুড়ে দিলে কেমন হয়?

যা ভাবা তাই কাজ। একটা সমুদ্র জুড়ে দিল টিভির ছবিতে। তাতে মাঝারি মাপের ঢেউ। বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে সমুদ্রের শুরু। মাঝের জায়গাটায় বালি। বালিতে দুটো রঙিন ছাতা এঁকে দিল ও। এবারে দারুণ সুন্দর লাগছে। নোনা হাওয়ায় ছাতার ঝালরগুলো উড়ছে। বেলাভূমিতে শব্দ করে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। বাতাসে উড়ছে জলকণা। আর বাগানের রঙিন ফুলগাছগুলো খুশিতে মাথা নাড়ছে। এই তো আশ্চর্য জগৎ!

ছবি আঁকা শেষ হতেই 'কন্ট্রোল' বোতাম টিপে দিয়ে সুনীত জানাল যে, ওর কাজ শেষ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই রঙিন হরফে ফুটে উঠল নতুন লেখাঃ 'এবারে তাহলে গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক। এসো, ঢুকে পড়ো তোমার বাড়িতে। "অলটারনেট" আর "কন্ট্রোল" বোতাম টিপে রেখে "স্পেসবার"-টা টেপো।'

কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল সুনীতের। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ও ডুবে যাচ্ছিল 'ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড' এ-কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে। টিভি পরদায় ফুটে ওঠা নির্দেশ পালন করতে এতটুকু দেরি করল না ও। অলটারনেট, কোল আর স্পেসবার—ব্যস। সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্রের জোলো হাওয়া এসে লাগল ওর চোখেমুখে।

কী আশ্চর্য! এই তো সেই রঙিন ছাতা দুটো। দিব্যি ছোঁওয়া যাচ্ছে! আর ওই তো নীল সমুদ্র! কী সুন্দর লাগছে ঢেউগুলো! রোদ-ঝকঝকে বালির ওপরে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করল সুনীত। দূরে দাঁড়ানো সুন্দর বাড়িটা দেখল। দেখল তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বরফের সাদা টুপি পরা পাহাড়ের চুড়োটা। সত্যি, অদ্ভুত! কম্পিউটারের ভেতরের জগৎটা তাহলে মিথ্যে নয়—সত্যি!

হঠাৎই ওর মনে পড়ল, কম্পিউটার ওকে বাড়িতে ঢুকে পড়তে নির্দেশ দিয়েছে। সুনীতের বাড়ি। এত সুন্দর বাড়ি ও জীবনে কখনও দেখেনি। কাল স্কুলে গিয়ে গৌতমকে এই গেম্‌সটার কথা বলবে। ও যে সে-কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না, সুনীত সেটা বাজি রেখে বলতে পারে।

এবারে ছুটে বাড়িটার কাছে গেল ও। সদর দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। টিভি পরদার ছবিতে এটা নজরে পড়েনি। সুনীত দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল নতুন বাড়ির দরজায়। ঘরের ভেতরে কয়েকটা মাকড়সার জালও ওর নজরে পড়ল। আর একইসঙ্গে কেমন শীত-শীত করে উঠল। হয়তো পিছনের পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঠান্ডা নেমে আসছে।

ঘরটা মাপে বেশ বড়। তবে আবছা অন্ধকার আর চেহারায় পুরোনো। সিমেন্ট খসে পড়া বড়-বড় থাম। সিলিঙের ফাঁকে-ফোকরে নড়াচড়ার শব্দ। শোনা যাচ্ছে পাখি-টাখির ডানার ঝাপটানি। ডানদিকের দেওয়ালে বসানো কাচের শার্সি দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। সেই আলোর রেখায় উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ধূলিকণা। আর ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে।

শীতটা ধীরে-ধীরে বাড়ছিল। দু-হাত বুকের কাছে জড়ো করে সুনীত এগিয়ে গেল সিঁড়িটার দিকে। কেউ যেন ওকে টানছিল। ধুলোমাখা সিঁড়ির ধাপে পায়ের ছাপ ফেলে ও ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলায় দু-পাশে দুটো বিশাল ঘর। তার মাঝে অন্ধকার একটা অলিন্দ। অলিন্দের শেষে একটা বারান্দা। তার দরজার চৌকো ফ্রেমে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎই বাঁ-দিকের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল অলিন্দে। পিছনে আলো থাকায় লোকটার সিলুয়েট ছবি ধরা পড়ল সুনীতের চোখে। ছায়াটা দ্রুতপায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। যেন হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে গেল ওর কাছে। খুব চেনা সুরে হাসল লোকটা। বলল, 'এসো খোকাবাবু, এসো...।'

লোকটার ওভারকোট থেকে ন্যাপথলিনের গন্ধ নাকে আসছিল সুনীতের। একই সঙ্গে ভীষণ অবাক লাগছিল ওর। কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে এই লোকটা কেমন করে ঢুকে পড়ল?

লোকটা ওর হাত চেপে ধরল। কী ঠান্ডা হাত! সুনীতের হাত যেন অবশ হয়ে গেল। লোকটার সঙ্গে দু-পা হেঁটে যেতেই ডানদিকের ঘরটার ভেতরে চোখ পড়ল ওর। আবছায়া অন্ধকারে কয়েকটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলেমেয়ের মলিন মুখ। সুনীতের নজর লক্ষ করে লোকটা মন্তব্য করল, 'ওরাও তোমার মতো কম্পিউটার গেমস্-পাগল। তাই তোমারই মতো ঢুকে পড়েছে কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে।'

ঠিক তখনই মায়ের মুখটা মনে পড়ল সুনীতের। অমনিই সব ভুলে গেল ও। একটানে লোকটার হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর ছুটে গেল বারান্দার দরজার দিকে।

লোকটা প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়া করল সুনীতকে।

কিন্তু ততক্ষণে সুনীত পৌঁছে গেছে বারান্দায়। বারান্দায় এসেই এক অদ্ভুত দৃশ্য ওর নজরে পড়ল।

ওর চোখের সামনেই একটা ঘর। ঘরটা খুব চেনা। ওর কম্পিউটার-রুম। ঘরের চেয়ার, টেবিল আর কম্পিউটারের কি-বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎই ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন মা। ওর খালি চেয়ারটা দেখে অবাক হয়ে বোধহয় একটা চিৎকার করে উঠলেন। কোনও শব্দই শুনতে পেল না সুনীত। ওর চোখ গেল ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা। পেন্ডুলামটা দুলছে, কিন্তু কোনও শব্দ হচ্ছে না।

'মা! মা!' করে ডেকে উঠে সামনে হাত বাড়াল সুনীত। আর তখনই লেন্সের মতো বাঁকানো কাচের দেওয়ালটা ওর হাতে ঠেকল।

সুনীত চিৎকার করে উঠল পাগলের মতো। দুমদুম করে কিল মারতে লাগল কাচের দেওয়ালে। যে করে হোক, দু-জগতের মাঝের এই দেওয়ালটা ওকে ভাঙতেই হবে। তাই কাঁধের ওপরে সদ্য চেপে বসা ঠান্ডা হাতটাকে ও মোটেই আমল দিচ্ছিল না।



ইনস্পেক্টর রনি

আমি বন্দুক সমেত ডানহাতটা সামনে টান-টান করে বাড়িয়ে ধরলাম।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বললাম, 'কাঁধের কাছটায় লাগছে। তা ছাড়া, লক্ষ করেছেন, হাতটা সামান্য কাঁপছে?'

ডক্টর মজুমদার আমার হাতটা ধরে সামান্য নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'কাঁধের জয়েন্টটা একবার চেক করে দিচ্ছি। আর সফ্‌টওয়্যারটা একটু ঠিকঠাক করে দিলেই কাঁপুনিটা থেমে যাবে।'

শুরু হল ডক্টর মজুমদারের খুঁটিনাটি চিকিৎসা। আমি চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম লেসার বন্দুক-ধরা হাতটা। কেমন অবাক লাগল। আমার শরীরের কোথায় কী একটা মাইক্রোপ্রসেসর রয়েছে, তার প্রোগাম সামান্য রদবদল করে দিলেই বন্দুক-ধরা হাতের কাঁপুনি থেমে যাবে। কী আশ্চর্য! অবশ্য এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর পক্ষে সবই সম্ভব। রোবটশাস্ত্র আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় দুনিয়া-জোড়া নাম। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ শুধু-শুধু এঁকে বিশাল অঙ্কের মাইনে দিয়ে রাখেনি। তা ছাড়া, এই যে আমি এখন বেঁচেবর্তে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি, তা একমাত্র ডক্টর মজুমদারের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। নইলে আমি এখন কোথায়! এক মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টের পর এই মানুষটাই আমাকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এটা আমার দ্বিতীয় জীবন। আগের জীবনটা তেমন করে মনে পড়ে না।

প্রতি মাসে একবার করে আমি অভিজিৎ মজুমদারের কাছে চেক আপের জন্যে আসি। এখনও এসেছি সেইজন্যেই।

আমার কাঁধের কাছে ধাতব ঢাকনাটা খুলে ডক্টর মজুমদার কীসব করছিলেন। এসব কাজের সময় মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন তিনি। ফলে আমি কিছুই টের পাচ্ছিলাম না। বরং

বিশ বাই তিরিশ মাপের বিশাল ঘরের বিচিত্র জিনিসগুলো দেখছিলাম।

ঘরটা অগোছালো। দেওয়ালে টাঙানো নানা ছবি। শরীরের বিভিন্ন হাড়ের গঠন, স্নায়ুবর্তনি, হাত-পায়ের নানারকম জয়েন্ট, আরও কত কী! এ ছাড়া, ঘরে ছড়ানো রয়েছে রাজ্যের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট, সল্‌ডারিং আয়রন, তার, ধাতুর পাত, মাইক্রোপ্রসেসর কিট, আর দুটো কম্পিউটার। এর মধ্যে একটা লালবাজারে আমাদের হেড কোয়ার্টারে হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। ফলে এটাই ওঁর অফিস, এটাই ওঁর বাড়ি।

এখন রাত দশটা। ডক্টর মজুমদার আমাকে সাধারণত রাতেই আসতে বলেন।
কারণ তখন ওঁর ল্যাবের আর সব লোকজন থাকে না। উনি জানেন, আমি নিরিবিলি পছন্দ করি।

হঠাৎই ডানহাতের সাড় ফিরে পেলাম। ডক্টর মজুমদার আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার মাঝখানটায় টাক, চারপাশে সাদা চুলে ঝালর। বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষটি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বয়সের ভারে একটু নুয়ে গেছেন। ফরসা চামড়া তামাটে হয়ে গেছে। চোখের নীচে ভাঁজ পড়েছে। ঘিয়ে রঙের ঢোলা জামা, তার চেয়েও ঢোলা কালো প্যান্ট। কোমরে সেকেলে ঢঙের বেল্ট। এই আমার জীবনদাতা, ঈশ্বর।

'নাও, রনি, এবারে ডানহাতটা নাড়াও দেখি—।'

ওঁর কথামতো কাজ করলাম। না, আর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই জাদু জানেন।

ঘরের শেষপ্রান্তে এককোণে একটা চৌকো বোর্ডে অনেক কালো বৃত্তের ছবি—শুটিং টারগেট। বৃদ্ধ বললেন, 'রেডি—।'

আমি টারগেট বোর্ড লক্ষ্য করে লেসার বন্দুক উঁচিয়ে ধরলাম। এখান থেকে দূরত্ব উনতিরিশ ফুট। আমার ডিসট্যান্স মিটার সেইরকমই সংকেত জানাচ্ছিল আমাকে।

'অন ইয়োর মার্ক—।'

আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক তীক্ষ্ণ চোখ টারগেটের ঠিক মাঝখানের কালো বিন্দুটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিল।

'ফায়ার—!'

তৎক্ষণাৎ ফায়ার করলাম—পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আঠেরোবার।

ডক্টর মজুমদার হেসে বললেন, 'দারুণ!' তারপর রওনা হলেন টারগেট বোর্ডের দিকে। বোধহয় স্বচক্ষে দেখতে চান, সেখানে প্রতিবারের মতো শুধু একটাই ক্ষতচিহ্ন রয়েছে কি না।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ডক্টর মজুমদারকে দেখতে লাগলাম। উনি টারগেটের ছাপা কাগজটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। বুল্‌স আইয়ের ফুটো দিয়ে আমাকে দেখতে-দেখতে মজা করে

বললেন, ‘তোমার টিপ একেবারে যাচ্ছেতাই, রনি। আঠেরোবার ফায়ার করলে, আর টারগেটে একটাই মাত্র ফুটো!’

আমি কষ্ট করে হাসলাম। মুখের পেশিতে টান লাগছিল। ডক্টর মজুমদার মুখের সামনে থেকে কাগজের আড়াল সরিয়ে অবাক হয়ে আমার হাসি দেখলেন। বললেন, ‘বাঃ, তুমি দেখছি রসিকতা বুঝতে পারছ! জানো, একটা সত্যিকারের রোবট কখনও রসিকতা বুঝতে পারে না!’

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ‘আমি যে আসলে কী, তা-ই আমি জানি না, ডক্টর—।’

আমার মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। কতগুলো স্মৃতি হাঁকপাঁক করছিল ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না ওরা।

অভিজিৎ মজুমদার একটা টুলে বসে পড়ে গালে হাত দিলেন। চোখ বুজে কীসব চিন্তা করলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘ওসব কথা থাক, রনি। তুমি আমার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জানি, আমাকে তুমি হতাশ করবে না। একটু সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর পুরোনো কথা যখন যা মনে পড়বে, সব টেপ করে রাখবে—যেন কোনওরকম ভুল না হয়।’

এসব কথা উনি প্রায়ই বলেন। প্রতি মাসেই একবার করে শুনতে হয়। কিন্তু এতে কী লাভ, তা জানি না।

অভিজিৎ মজুমদার হঠাৎই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এসে বললেন, ‘নাও, এবারে শেষ কাজটুকু হয়ে যাক—প্রশ্ন-উত্তরের খেলা।’

প্রত্যেকবারই সব পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে এই প্রশ্ন-উত্তরের পরীক্ষা দিতে হয় আমাকে। যদি আমার উত্তরে কোনও গোলমাল হয়, তা হলে উনি বুঝতে পারেন আমার ব্রেন সার্কিট ঠিকমতো কাজ করছে না। এই পরীক্ষায় পাশ করলেই আমার ছুটি।

‘তুমি কে?’ ডক্টর মজুমদারের প্রথম প্রশ্ন।

আমার ইলেকট্রনিক স্মৃতিকোষে রাখা যাবতীয় তথ্য গড়গড় করে আওড়ে গেলাম।

‘আমার নাম রনি সরকার। লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অপারেশন ডিভিশনের ইনস্পেক্টর।’

‘তোমরা আর কে কে আছ?’

‘কেউ নেই। আমি একা—।’

‘আমি একা’ এই শব্দ দুটো আমার মাথার ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলে ঘোরাফেরা করতে লাগল অনেকক্ষণ।

‘তুমি থাকো কোথায়?’

‘১৬৩ বিবেকানন্দ রোড, ব্লক-জি, ফ্ল্যাট নাম্বার ২৭২।’

‘আমি তোমার কে হই?’

‘আপনি, আপনি আমাকে প্রাণ দিয়েছেন। আপনি না থাকলে আমি...।’

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বললেন, ‘না, আমি তোমার বন্ধু। তোমার ভালো চাই।’

আমি ওঁর কথাগুলো আবৃত্তি করলাম, ‘আপনি আমার বন্ধু, আমার ভালো চান।’

ডক্টর মজুমদার হাসলেন, বললেন, ‘এই তো ভালোছেলের মতো কথা!’

তারপর কিছুক্ষণ আনমনে কী ভেবে বললেন, ‘তোমার গলার আওয়াজে সামান্য একটু মেটালিক নয়েজ রয়ে গেছে। ওটা কী করে বাদ দেওয়া যায় দেখি। পারলে পরের মাসের চেক আপের সময়—।’

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের একটা কম্পিউটার বিপ-বিপ শব্দ তুলে ‘অন’ হয়ে গেল। হেড কোয়ার্টার থেকে কোনও খবর দেওয়ার থাকলেই এই কম্পিউটারটা চালু হয়ে যায়।

ডক্টর মজুমদার ব্যস্তভাবে ওটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁর পায়ে ধাক্কা লেগে বসার টুলটা কাত হয়ে পড়ে গেল। মেঝেতে কিছু কাগজপত্র ছিল—সেগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। ততক্ষণে বৃদ্ধের অভিজ্ঞ হাত কি-বোর্ডের বোতাম টিপতে শুরু করেছে।

আমি ‘আসি, ডক্টর’ বলে বেরিয়ে আসছিলাম, ডক্টর মজুমদার ডাকলেন আমাকে, ‘হেড কোয়ার্টার থেকে তোমাকে চাইছে। ইমার্জেন্সি।’

আমি ভারী-ভারী পা ফেলে কম্পিউটারটার দিকে এগোলাম। লেসার বন্দুকটা উরুর লাগোয়া সিকিওরিটি চেম্বারে রেখে দিলাম। হেড কোয়ার্টার থেকে এত রাতে আবার কী ইমার্জেন্সি কল? আমি যে এখানে রুটিন চেক আপের জন্য আসছি সেটা অপারেশন ডিপার্টমেন্টের ওসি জানেন। কারণ খবর রেখে আসাটাই আমাদের রেওয়াজ।

কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে। কারণ, গোটা-গোটা হরফে ফুটে উঠেছে আমার কোড নম্বর আর নির্দেশঃ এক্ষুনি আমাকে পৌঁছে যেতে হবে সল্টলেক সিটিতে, এ-ই ব্লকের ৬৭ নম্বর বাড়িতে। উলটোডাঙা ভি. আই. পি. রোডের মুখে এ. এস. আই. বর্মন অপেক্ষা করবে। তার কোড নম্বরও ফুটে উঠল পরদায়। আমি যেন বর্মনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাই। যাওয়ার পথে বর্মন আমাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে।

আমি সম্মতি জানিয়ে বোতাম টিপে আমার কোড নম্বর জানালাম এবং বললাম যে, এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। তারপর শেষ বোতামটা টিপতেই কম্পিউটারের সব লেখা মুছে গেল পলকে।

ডক্টর মজুমদার আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ‘উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক।’

আমি বেরিয়ে আসার আগে প্রতিভাবান বৃদ্ধ মানুষটিকে কয়েক মুহূর্ত দেখলাম। এই লোকটি ছাড়া আর কেউই আমাকে ভালোবাসে না। ওঁর চোখে আমি যেরকম স্নেহ-ভালোবাসা-মাখানো দৃষ্টি দেখি, আর কারও চোখে দেখি না। অথচ ভাসা-ভাসা মনে পড়ে, পুরোনো জীবনে আমি কী সুখীই না ছিলাম!

উলটোডাঙা ভি. আই. পি. রোডের মোড়ে গাড়িটা পার্ক করতেই সন্দীপ বর্মন কোথা থেকে এসে গাড়িতে উঠল। আমার গাড়ির মাথায় ঘুরপাক-খাওয়া লাল-নীল বাতি রয়েছে। সুতরাং গাড়িটা চিনে নিতে ওর অসুবিধে হয়নি। ওকে দেখেই সামনের সিটের দরজা খোলার অটোমেটিক বোতাম টিপে দিয়েছিলাম। লক্ষ করলাম, বর্মন একটু ইতস্তত করছে। বোধহয় আমার পাশে বসে পথ চলায় ওর পুরোপুরি সায় নেই। আমি জানি, সহকর্মীরা আমাকে একটু-আধটু এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করতে গেলে আর উপায় কী! প্রথম-প্রথম আমার খারাপ লাগত, কিন্তু এখন মজা পাই।

সুতরাং বর্মনকে ডাকলাম, 'আরে, কী ভাবছেন, উঠে আসুন জলদি—।'

বর্মন উঠে বসল আমার পাশে। গাড়ির দরজা কোনওরকম শব্দ না করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে গেল আবার। ড্যাশ-বোর্ডের সেলুলার ফোন চালু করে হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিলাম যে, বর্মন আমার গাড়িতে উঠে পড়েছে, আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সল্ট লেক সিটির নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাচ্ছি।

বর্মনের চেহারা মোটার দিকে, তবে গায়ে জোর আছে। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে যাওয়ার আগে প্রায় সাত সেকেন্ড টিঁকে ছিল। আগে কথায়-কথায় আমাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, পাঞ্জায় হেরে যাওয়ার পর থেকে আর করে না।

সন্দীপ বর্মনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, থুতনিতে ভাঁজ, রগের চুলে নুন-মরিচ। সিগারেট খাওয়ার ভীষণ নেশা ওর। গাড়ি চলতে শুরু করতেই লাইটার জ্বেলে ফস করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'সরকার, এটা দয়া করে বস্-কে জানাবেন না।'

আমি ধাতব শব্দ করে হাসলাম। বললাম, 'না, বলব না। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? কোনও ইমার্জেন্সি কাজে?'

বর্মন ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'আমরা প্রফেসর রূপেশ কোঠারির বাড়ি যাচ্ছি। ওঁর এগেইনস্টে কিডন্যাপিংয়ের চার্জ আছে।'

আমি চমকে উঠলাম। প্রফেসর রূপেশ কোঠারি! আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছরে নোবেল পুরস্কারের তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল। হয়তো এবারে পেয়ে যাবেন। ওঁর 'ইউনিফায়েড জেনারেল থিয়োরি অব স্পেস-টাইম'-কে বলা হয়

গত সত্তর বছরের সেরা আবিষ্কার। কারণ একাত্তর বছর আগে ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কার করেছিলেন জন ভিনসেন্ট অ্যাটানাসফ ও ক্লিফোর্ড বেরি।

সেই রূপেশ কোঠারির বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ!

আমার মুখে অভিব্যক্তিগুলো ঠিকঠাক ফোটে না। সেটাই হয়তো বর্মন লক্ষ করছিল। দেখেছি, সহকর্মীরা সবসময় আমাকে কৌতূহলের চোখে দেখে।

সন্দীপ বর্মন নির্বিকারভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আমি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বর্মনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রায় দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বললাম, 'ব্যাপারটা খোলাখুলি জানতে পারি?'

উত্তেজিত হলে আমার গলার স্বরে ধাতব ঝংকার বেড়ে যায়। অন্তত ডক্টর মজুমদারের বক্তব্য তাই। এখন গলাটা অনেকটা সেইরকম শোনাল বলেই মনে হল।

বর্মন এবারে মুখ খুলল। ওর কাছ থেকে গোটা গল্প শোনা গেল।

রূপেশ কোঠারি ও বিক্রম সেনগুপ্ত দুই নামজাদা বিজ্ঞানী, আর ছোটবেলাকার বন্ধুও বটে। পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ডক্টর কোঠারির খ্যাতি রীতিমতো ঈর্ষা করার বিষয়। আর পাশাপাশি বিক্রম সেনগুপ্ত ভারতের একজন সম্মানিত বিজ্ঞানী হলেও, আন্তর্জাতিক আসরে কখনও রূপেশ কোঠারির মর্যাদা পাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁরা দুজনে যৌথভাবে গবেষণা করেছেন, দুজনের নামে বিদেশের পত্রপত্রিকায় কয়েকটি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ওঁরা একটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, তবে কে এর প্রধান আবিষ্কারক, তা নিয়ে দুজনের মধ্যে বেধে গিয়েছিল ঠান্ডা লড়াই।

মনে পড়ে গেল, তিনদিন আগেই টিভি, নিউজপেপারে এই বিতর্কের খবর প্রচার করা হয়েছে এবং বিক্রম সেনগুপ্ত আবিষ্কারের সিংহভাগ দাবি করেছেন। তিনি এও বলেছেন, অধ্যাপক কোঠারির বহু গবেষণাপত্রেই তাঁর অবদান রয়েছে। সোজা কথায়, কোঠারি তাঁর গবেষণার ফল আগে একাধিকবার আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু এইবারে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেননি।

'এ-ব্যাপারে রূপেশ কোঠারি কী বলছেন?' আমি জানতে চাইলাম। সন্দীপ বর্মনের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা গাড়ির ডিসপোজাল বক্সে ফেলে দিয়ে বলল, 'কী আবার বলবে, একই কথা। তিনি বলছেন, বহু ক্ষেত্রেই তিনি দয়া করে নিজের গবেষণায় বিক্রমকে ভাগ বসাতে দিয়েছেন। বিক্রম সেনগুপ্ত ব্যর্থ বিজ্ঞানী, অন্তত রূপেশ কোঠারির মতে।'

'এর মধ্যে কিডন্যাপিং এল কোত্থেকে?'

বর্মন হাসল, বলল, 'শুনলে আপনি হাসবেন। আজ রাতে ডক্টর কোঠারির বাড়িতে ডক্টর সেনগুপ্তের নেমন্তন্ন ছিল—সপরিবারে। সেনগুপ্তের স্ত্রী আলসারের রোগী, তাই নেমন্তন্নে যাননি।

তবে সেনগুপ্ত তাঁর মেয়ে নিনিকে নিয়ে গিয়েছিলেন কোঠারির বাড়িতে। নিনির বয়স বছর বারো, ক্লাস সিক্সে পড়ে, লোরেটো—বউবাজারে। খাওয়াদাওয়ার শেষে নিনি নাকি ডক্টর কোঠারির ল্যাবরেটরি দেখতে চায়। বিক্রম সেনগুপ্ত তখন ড্রইংরুমে বসে কী একটা ম্যাগাজিন দেখছিলেন। রূপেশ কোঠারি নিজের বাড়িতেই বিশাল ল্যাবরেটরি করেছেন, সেটা আবার ড্রইংরুমের লাগোয়া। ফলে, বলতে গেলে একরকম সেনগুপ্তের চোখের সামনে দিয়েই নিনি আর কোঠারি ল্যাবে ঢুকেছে, কিন্তু ল্যাব থেকে ওরা কেউ বেরোয়নি। কয়েক মিনিট পরেই সেনগুপ্ত ল্যাবে গিয়ে দেখেন, সেখানে কোঠারি একা দাঁড়িয়ে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটের সামনে ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন। নিনি নেই। ভোজবাজির মতো মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!'

বুঝলাম—তারপরই হইচই, লালবাজারে টেলিফোন ইত্যাদি হয়েছে। রূপেশ কোঠারি প্রকাণ্ড মাপের বিজ্ঞানী, কিন্তু অভিযোগটাও তো নেহাত ছোট মাপের নয়।

বর্মনের কাছেই শুনলাম, ব্যাপারটা হেড কোয়ার্টারে পৌঁছয় সাড়ে আটটা নাগাদ। সঙ্গে-সঙ্গে তদন্তকারী দল হাজির হয়েছে ডক্টর কোঠারির আস্তানায়। সেই দলে বর্মনও ছিল।

ডক্টর সেনগুপ্ত কোঠারির বাড়িতেই ছিলেন। কোঠারি বিয়ে-থা করেননি। সুতরাং বাড়িতে দুজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। পুলিশ যতরকমভাবে সম্ভব জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ওঁদের, তবে যথারীতি কোনও লাভ হয়নি। তারপর তারা হিমশিম খেয়ে গেছে দুই বিজ্ঞানীকে নিয়ে। আমি সমস্যাটার কথা অবাক হয়ে ভাবছিলাম। বললাম, 'কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে কোঠারি কী বলছেন?'

সল্টলেকের ভেতরে ফাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি হুহু করে ছুটছিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বর্মন বলল, 'কোঠারি বলছেন, নিনি একাই ল্যাব ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আর সেনগুপ্ত বলছেন, অসম্ভব। কারণ এক মুহূর্তের জন্যও ল্যাবের দরজা তাঁর চোখের আড়াল হয়নি। ব্যস!'

গাড়ির সেলুলার ফোন বিপ-বিপ করে বেজে উঠল। ফোন তুলে কানে দিলাম।

'রনি সরকার বলছি—।'

ওপাশ থেকে এ. সি. বিকাশ মিত্রের গলা শোনা গেল।

'সরকার, আপনারা স্পটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছেন। বর্মন আপনাকে সব কথা হয়তো বলেছে, তবে সব খবর জানাতে পারলেও একটা ব্যাপার ও বলতে পারবে না। এই কেসে হঠাৎ আপনাকেই বা ডেকে পাঠানো হল কেন? সেটাই এখন আপনাকে জানাচ্ছি—আপনার জানা দরকার।' চিফ একটু থেমে আবার বললেন, 'নিনির উধাও হওয়ার পেছনে কোনও সায়েন্টিফিক মিস্ট্রি রয়েছে বলে আমার ধারণা। কোঠারির ল্যাবের সমস্ত ডিটেইল্‌স আমাদের চাই। আমি জানি,

আপনার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। আর আমার এই ডিপার্টমেন্টে বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ আপনার চেয়ে ভালো কেউই বোঝে না। সুতরাং, বেস্ট অফ লাক।'

লাইন কেটে গেল।

সন্দীপ বর্মন একটা কথাও শুনতে পায়নি। ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে?'

আমি বললাম, 'বসের ফোন।'

আর বারো সেকেন্ডের মধ্যেই ডক্টর রূপেশ কোঠারির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক স্থাপত্যের বিশাল বাড়িটা দেখে মনেই হয় না, এ-বাড়িতে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। নিনিকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে তো?

দোতলার আধুনিক সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ওঁদের দুজনকে পেলাম। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে দুটো সোফায় বসে। একজনের হাতে একটা ম্যাগাজিন। অন্যজন দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির প্রতিকৃতি দেখছেন। দেখেই বোঝা যায়, দুই বিজ্ঞানীর এখনও আড়ি রয়েছে, ভাব হয়নি।

আমাদের ঢুকতে দেখেই দ্বিতীয়জন ছেঁড়া স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে। সন্দীপ বর্মনের কাছে গিয়ে বললেন, 'নিনিকে পাওয়া গেল, ইনস্পেক্টর?'

ভদ্রলোক যেরকম উদ্‌গ্রীব এবং তাঁর মুখচোখ যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত, তাতে সন্দেহ নেই, ইনিই বিক্রম সেনগুপ্ত। পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। কপাল বেশ বড়। মাথার চুল তেলতেলে, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ বড়-বড়, বুদ্ধিদীপ্ত। ভুরু ঘন এবং টানা। মুখে বয়সের সূক্ষ্ম ভাঁজ। কথা বলেন সামান্য টেনে-টেনে।

বর্মন বেশ গম্ভীর মুখে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'ইনস্পেক্টর রনি সরকার। আপনাদের কেসটা এখন ইনিই ইনভেস্টিগেট করবেন—।'

রূপেশ কোঠারি ইতিমধ্যে হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখেছেন টেবিলে। কৌতূহলী চোখে আমাকে লক্ষ করতে-করতে উঠে এসেছেন কাছে। স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হ্যান্ডশেক করার জন্য।

সাধারণত আমি হ্যান্ডশেক ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কিন্তু এখন এড়ানো গেল না। আড়ষ্টভাবে হ্যান্ডশেক করলাম। হাতের চাপ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম একই সঙ্গে। তবুও লক্ষ করলাম, রূপেশ কোঠারির মুখে কিছুটা যন্ত্রণা ও বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

ঘরে বেশ কয়েকটা সোফা ছিল। আলাপের পালা শেষ করে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলাম সোফাগুলোয়। আমি যে-সোফাটায় বসলাম, সেটা মচমচ শব্দ করে উঠল। তবে তার বেশি কিছু হল না।

অধৈর্য বিক্রম সেনগুপ্তকে হাতের ইশারায় শান্ত হয়ে বসতে বললাম আমি। তারপর রূপেশ কোঠারিকে উদ্দেশ করে বললাম, 'প্রফেসর কোঠারি, পুরো ব্যাপারটা আপনার মুখ থেকে আর-একবার শুনব। প্লিজ, বিরক্ত হবেন না।'

কোঠারি শব্দ করে হাসলেন। ওঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। চনমনে চোখ। লম্বাটে মুখ। দাড়ি এমনভাবে কামিয়েছেন যে, এত রাতেও খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরোয়নি। সরু করে ছাঁটা গোঁফ। আর মাথার চুল প্রায় কদমছাঁট। পরনে সবুজ রঙের সরু চেক-কাটা বুশ শার্ট। সাদা টেরিকটের প্যান্টের ভেতরে গুঁজে পরেছেন।

কোঠারির গলার স্বর বেশ চমৎকার। ভদ্রলোক বিজ্ঞান না শিখে গান শিখলেও বোধহয় কেউকেটা হতে পারতেন। প্রায় ধারাবিবরণী দেওয়ার মতো করে নিনির উধাও হওয়ার ব্যাপারটা বলে গেলেন তিনি। ওঁর কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকেই বিক্রম সেনগুপ্ত উত্তেজিত হয়ে বাধা দিয়ে উঠছিলেন, বর্মন কোনওরকমে তাঁকে নিরস্ত করে রাখল।

শুনছিলাম, আর বারো বছরের নিনির কথা ভাবছিলাম। মেয়েটা গেল কোথায়?

রূপেশ কোঠারির গল্পে নতুন আর কিছু পাওয়া গেল না। সুতরাং, বর্মনকে বিক্রম সেনগুপ্তের কাছে বসতে বলে ডক্টর কোঠারিকে নিয়ে এগোলাম ল্যাবরেটরির দিকে। বললাম, 'চলুন প্রফেসর কোঠারি, আপনার ল্যাবরেটরিটা একবার দেখব—।'

প্রফেসর কোঠারি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যার অর্থ হল, 'ল্যাবরেটরি দেখে আপনি কি কিছু বুঝবেন?'

আমি ওঁর তাকানোয় আমল দিলাম না। কোঠারি জানেন না, আমি ঘুরে-ঘুরে ওঁর ল্যাবরেটরি দেখা মানেই ল্যাবরেটরির প্রতিটি ইঞ্চি ধরা পড়ে যাবে আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে এবং রেকর্ড হয়ে যাবে ভিডিয়ো টেপে।

বর্মন আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কিছু একটা বলতে চাইল। আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কিছু বলবেন?'

ও তখনও ইতস্তত করছে দেখে বুঝলাম, দুই বিজ্ঞানী হাজির থাকায় ও ঠিক মুখ খুলতে পারছে না। আমি ঠোঁট টেনে হাসার চেষ্টা করে বললাম, 'জোরে বলার দরকার নেই, শুধু ঠোঁট নাড়লেই আমি বুঝতে পারব—।'

বর্মনের বোধহয় খেয়াল নেই, আমি লিপ রিড করতে পারি। আমার কথায় ওর খেয়াল হল। শুধু ঠোঁট নেড়ে ও বলল, 'আমরা ল্যাবরেটরি তন্নতন্ন করে দেখেছি, ওখানে কিছু নেই। তা ছাড়া, প্রত্যেকটা জানলায় শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো—।'

আমি হাত নেড়ে ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ঠিক আছে—।'

তারপর কোঠারির সঙ্গে ঢুকে গেলাম ল্যাবরেটরিতে।

ল্যাবরেটরি আমি আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডক্টর কোঠারির ল্যাব আমাকে চমকে দিল।

বিশাল মাপের ঘরে প্রচুর যন্ত্রপাতি। তার কোনও কোনওটার চেহারা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনই কিম্ভূত। চেনা যন্ত্রের মধ্যে একটা পার্টিক্‌ল অ্যাকসিলারেটর আর একটা এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন স্পেক্‌ট্রোমিটার চোখে পড়ল।

রূপেশ কোঠারির খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। সুতরাং ওঁকে ল্যাবরেটরি তৈরির টাকা
দেওয়ার সংস্থার অভাব নেই। তা ছাড়া, বহু বিদেশি যন্ত্রপাতি তিনি স্রেফ উপহার হিসেবে পেয়েছেন।

আমি ল্যাবরেটরি দেখছিলাম আর মনে-মনে এ-পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের লজিকগুলো যাচাই করে দেখছিলাম। কোথায় গেল নিনি?

একটা বারো বছরের মেয়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলে চিন্তার ব্যাপার। আর এক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাপারটা হয়েছে রূপেশ কোঠারির বাড়িতে, সেহেতু তাঁর দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত আরও বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় তাঁকে যেন বেশ নিশ্চিন্তই দেখাচ্ছে। হাসিখুশি, খোশমেজাজি। বরং বিক্রম সেনগুপ্তের হাবভাব অনেক স্বাভাবিক। ওইরকম একটা মেয়ে হারিয়ে গেলে যেরকম দুঃখ পাওয়ার কথা, যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার কথা, ওঁকে দেখে ঠিক সেইরকম মনে হয়েছে। মেয়ে হারানোর কষ্ট বড় সাংঘাতিক। আমি জানি। আমারও একটা মেয়ে ছিল। কতই বা বয়স ছিল? সাত? আট? ঠিক মনে পড়ছে না।

রূপেশ কোঠারির কথায় সংবিৎ ফিরল। কোঠারি তখন বলছিলেন, 'মিস্টার সরকার, বলুন, আমার ল্যাবের কী-কী দেখতে চান আপনি?'

একপাশের একটা টেবিলে নানান কাগজপত্রের স্তূপ পড়ে ছিল। আমি সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললাম, 'প্রফেসর কোঠারি, ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে আপনার কী ঝামেলা আছে জানি না, তবে এটা বলতে পারি, একটা ছোট মেয়ে বোধহয় কোনও দোষ করেনি—। বেচারা কৌতূহলের বশে শুধুই আপনার ল্যাব দেখতে চেয়েছিল।'

প্রফেসর কোঠারি বেশ বিরক্তভাবে বললেন, 'ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় অন্যদের তুলনায় বেশি ইনটেলিজেন্ট। এখন দেখছি, আমারই ভুল। কম করে হাজারবার আমি বলেছি যে, নিনির ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না। ল্যাব দেখতে-দেখতে ও হঠাৎই এ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছে। তারপর কোথায় গেছে, সে আমি কী করে বলব!'

আমি টেবিলের কাছে গিয়ে কয়েকটা কাগজ উলটেপালটে দেখলাম। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনার ল্যাবের যন্ত্রগুলোর বিষয়ে আমাকে একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলুন—যদি আপনার কোনওরকম আপত্তি না থাকে।'

'না, না, আপত্তির কী আছে?' রূপেশ কোঠারি দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তবে, সবই কমপ্লিকেটেড অ্যাপারেটাস, কতটা সহজ করে বোঝাতে পারব জানি না—।'

শেষদিকে ওঁর কথার মধ্যে একটা অবজ্ঞার সুর ধরা পড়ল। আমি সেটা গায়ে মাখলাম না। কারণ আমার শরীরে লুকিয়ে রাখা অটো-রেকর্ডার শুরু থেকেই চালু হয়ে গেছে। যাবতীয় শব্দ ধরা পড়েছে সেই নিখুঁত যন্ত্রে। পরে সেই যন্ত্র প্লে-ব্যাক করে শোনা হবে বারবার। তারপর বিশেষজ্ঞরা তার চুলচেরা বিচার করবেন। সুতরাং যন্ত্রগুলোর বিবরণ বা কার্যপ্রণালী আমি না বুঝলেও কোনও ক্ষতি নেই। তবে বোঝার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

ডক্টর কোঠারি বলতে শুরু করলেন। যন্ত্রগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর কথার মধ্যে নানান জটিল শব্দ উঁকি মারতে শুরু করলঃ স্পেস-টাইম কার্ভেচার, ট্যাকিয়ন অ্যাকসিলারেটর, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন, রিলেটিভ রিলেটিভিটি, অ্যান্টিগ্র্যাভিটেশন, ফিফ্‌থ ফোর্স এস্টিমেশন ইত্যাদি।

এইসব কথার ফাঁকে আমি টেবিলের কাগজপত্রগুলোই ঘাঁটছিলাম। যদি কোনও কিছুর হদিশ পাওয়া যায়! এর মধ্যে হঠাৎই বিক্রম সেনগুপ্ত ক্ষিপ্তভাবে ছিটকে এলেন ঘরের মধ্যে। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ইনস্পেক্টর সরকার, এভাবে আপনি ওর কাছ থেকে কোনও কথা বের করতে পারবেন না। ও বড় শক্ত চিজ—।'

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপ বর্মন এসে ঘরে ঢুকল। ও হাই তুলতেই তাকালাম হাতঘড়ির দিকে। রাত হয়েছে। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

বর্মন তাড়াতাড়ি এসে প্রফেসর সেনগুপ্তের হাত ধরল, বলল, 'প্লিজ প্রফেসর, ও-ঘরে চলুন। এরকম করলে ইনভেস্টিগেশনে অসুবিধে হবে—।'

প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দুজনের। তখন আমি বর্মনকে ইশারায় থামতে বললাম। ডক্টর সেনগুপ্তের সাফারি স্যুটে ভাঁজ পড়েছে, মাথার পরিপাটি চুল আর ততটা পরিপাটি নেই।

রূপেশ কোঠারি একটি যন্ত্রের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত নেড়ে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়লেন চেক শার্ট থেকে। লম্বাটে মুখে সামান্য যেন মজার ছোঁয়া।

আমি বিক্রম সেনগুপ্তকে কাছে ডাকলাম। গলা নামিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ড্রইংরুমে বসে আপনি এমন কিছুই শুনতে পাননি, যাতে ব্যাপারটার একটা আঁচ পাওয়া যায়! ভালোভাবে মনে করে দেখুন তো!'

ডক্টর সেনগুপ্ত মাথার চুল ঠিকঠাক করতে-করতে বললেন, 'মনে করে নতুন কী আর বলব! সবই তো বলেছি—' অসহায় চোখে বর্মনের দিকে তাকালেন তিনি।

আমার মাথার ভেতরে বিভিন্ন লজিক কাটাকুটি খেলছিল। রূপেশ কোঠারির চোখেমুখে সামান্য তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপ—এইসব আরও উত্তেজিত করে তুলেছে বিক্রম সেনগুপ্তকে।

আমি ওঁকে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, প্রফেসর কোঠারি নিনির সঙ্গে কী কথা বলছিলেন? আপনি শুনতে পাননি কিছু?'

সেনগুপ্ত বললেন, 'পাব না কেন? পুলিশকে সেসব বলেওছি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নেহাতই মামুলি ছেলেমানুষি কথা।'

আমি বর্মনকে বললাম, 'মিস্টার বর্মন, আপনি প্রফেসর কোঠারিকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমরা একটু নিরিবিলি কথা বলব।'

সন্দীপ বর্মন ঠোঁট উলটে এমন একটা মুখের ভাব করল, যার অর্থঃ হুজুরের যা মর্জি।

ওরা চলে যাওয়ার পর সেনগুপ্তকে বললাম, 'প্রফেসর, আপনার সেই মামুলি ছেলেমানুষি কথাগুলো এবারে আর-একবার বলুন, প্লিজ—।'

একটু সময় নিয়ে বিক্রম সেনগুপ্ত বোধহয় মনে-মনে গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'এই একবার শুনলাম নিনি বলছে, বাব্বাঃ, ঘরটা কত বড়! এতসব যন্ত্র দিয়ে কী হয়? উত্তরে রূপেশ বলল, বিজ্ঞানের নানারকম গবেষণার কাজ হয়। তারপর আরও কী কী বলেছিল, ভালো করে খেয়াল করিনি। আবার একসময় নিনির কথা কানে এলঃ কাকু, একটাও খেলার যন্ত্র নেই? তাতে রূপেশ বলল, আছে, এই তো—লুকোচুরি খেলার যন্ত্র। নিনি বলল, কই, দেখি—। তারপর আর কোনও কথা শুনতে পাইনি।'

আমি বললাম, 'নিনিকে আপনি খুব ভালোবাসতেন?'

অবাক মারমুখী নজরে আমাকে দেখলেন ডক্টর সেনগুপ্ত। প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'ভালোবাসতেন? তার মানে? এখনও ভালোবাসি, ইনস্পেক্টর। ওকে আপনি যে করে হোক খুঁজে এনে দিন—প্লিজ...।'

শেষদিকে ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। গলার স্বর ভেঙে গেল। হাত ঘষলেন চোখে।

আমার কষ্ট হচ্ছিল। শরীরের ভেতরে লজিক সার্কিটগুলো ঠিকঠাক কাজ করছিল। মনে হল, বিক্রম সেনগুপ্ত বড় অসহায়। নিনি অন্তর্ধান রহস্যের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ডক্টর রূপেশ কোঠারির আস্তিনের ভেতরে। কোঠারি পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু পিতৃস্নেহ সম্পর্কে ওঁর জ্ঞান স্রেফ শূন্য।

ডক্টর সেনগুপ্তকে বললাম, 'আপনি ড্রইংরুমে গিয়ে বিশ্রাম নিন—।'

বিক্রম সেনগুপ্ত চলে যেতেই ঘরে আমি একা, আর শুধু কতকগুলো জটিল যন্ত্র। এর মধ্যে সত্যিই কি কোনও লুকোচুরি খেলার যন্ত্র রয়েছে?

যন্ত্রগুলো একে-একে দেখতে-দেখতে আবার ফিরে গেলাম টেবিলের কাছে। কাগজপত্রগুলো দেখতে শুরু করলাম আবার।

খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটা কাগজে নজর আটকে গেল আমার। সাদা কাগজে কালি দিয়ে চৌকোনা ঘর আঁকা রয়েছে একটা। সেই ঘরের ভেতরে কিছুটা দূরত্বে আঁকা রয়েছে দুটো বিন্দু। বিন্দু দুটোর মাঝামাঝি বরাবর একটা ভাঁজের দাগ রয়েছে। তা ছাড়া, ঘরের ছবিটার বাইরে ছোট মাপের কয়েকটা জ্যামিতিক ছবিও আঁকা রয়েছে।

কেন জানি না, ছবিটা দেখামাত্রই একটা বিদ্যুৎরেখা যেন ঝলসে উঠল মাথার ভেতরে। কাগজটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ল্যাবের বাইরে। ড্রইংরুমের দরজায় উঁকি মেরে রূপেশ কোঠারিকে ডেকে নিলাম।

কোঠারি বেশ হাসিখুশি মেজাজে চটপটে পায়ে উঠে এলেন আমার কাছে। গালে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, 'অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ইনস্পেক্টর—।'

আমি ওঁকে নিয়ে ল্যাবের প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'প্রফেসর কোঠারি, আমি আপনার লুকোচুরি খেলার যন্ত্রটা দেখতে চাই—।'

টের পেলাম, কথাগুলো বলার সময় আমার গলায় ধাতব ঝংকার বেশ প্রকট হল।

আমার কথায় রূপেশ কোঠারি যেন খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। মুখের হাসিখুশি ভাবের ওপরে চকিতে একটা মলিন ছায়া নেমে এল। একটু সময় নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'লুকোচুরি খেলার যন্ত্র? তার মানে?'

এইবার আমি ওঁর বাঁ-হাতটা চেপে ধরলাম। ওঁর গায়ের জোরকে সরাসরি উপেক্ষা করে ওঁকে ঠেলে বসিয়ে দিলাম ফোমের গদিওয়ালা একটা সুদৃশ্য টুলের ওপরে। বললাম, 'ডক্টর কোঠারি, আপনার নাম দুনিয়া-জোড়া। সামনের বছরে নোবেল প্রাইজও পেতে পারেন। কিন্তু নিনিকে ফিরিয়ে না দিলে কি কাউকে মুখ দেখাতে পারবেন?'

কথা শেষ করে আমি ওঁকে হাতের ভাঁজ-করা কাগজটা দেখালাম। বললাম, 'আপনার মতো একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপার বলে ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারটা জানাজানি হলে সবাই হয়তো বিক্রম সেনগুপ্তের অভিযোগগুলোই সত্যি বলে ধরে নেবে। ডক্টর সেনগুপ্তের বহু রিসার্চের ফল আপনি স্রেফ হজম করে নিজের নামে ছাপিয়েছেন, জালিয়াতি করে নাম কিনেছেন বিজ্ঞানীদের জগতে।'

রূপেশ কোঠারির মুখ ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছিল। হাসির রেশটুকুও সেখানে আর নেই। এখন শুধু রাগ থমথম করছে। ডানহাত দিয়ে বাঁ-হাতের একটা জায়গা ম্যাসাজ করছিলেন। ওই জায়গাটাই একটু আগে আমি চেপে ধরেছিলাম।

রূপেশ কোঠারি ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন টুল ছেড়ে। হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'না ইনস্পেক্টর, রূপেশ কোঠারি আজ পর্যন্ত কোনওদিনও কারও রিসার্চে ফাঁকি দিয়ে ভাগ বসায়নি! আপনি জানেন, বিক্রমের জন্য আমি কী না করেছি! আর ও কিনা টিভি নিউজে আমার নামে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে!'

কথা বলতে-বলতে কোঠারি চলে গেলেন একটা দেওয়াল আলমারির কাছে। এক হ্যাঁচকায় তার পাল্লা খুলে একটা মোটা ফাইল বের করে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার বায়োডেটা। মাধ্যমিক থেকে সব রেজাল্টই রয়েছে। কখনও সেকেন্ড হইনি। আর রিসার্চ পেপারের লিস্টটাও দেখুন।'

আমি ফাইলটা নিয়ে খুলে দেখলাম। সত্যিই, ভদ্রলোক অদ্বিতীয়। ওঁর সব গবেষণাপত্রই ছাপা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নামী জার্নালগুলোতে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে কোঠারি বললেন, 'বিক্রমের জন্য আমি অনেক করেছি। কিন্তু হিংসেয় ওর এখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই আমার নামে যাচ্ছেতাই কাদা ছেটাচ্ছে—।'

আমি ফাইলটা রেখে দিলাম টুলের ওপরে। বললাম, 'আর তাইতেই আপনার মতো লোকেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

রূপেশ কোঠারি ফাইলটার ওপরেই ধপ করে বসে পড়লেন। মাথা ঝুঁকিয়ে দু-ভুরুর মাঝের অংশটা চেপে ধরলেন বাঁ-হাতে। মাথা নাড়লেন বারকয়েক। একটা চাপা শব্দও বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

যখন মুখ তুললেন, তখন একেবারে ভাঙাচোরা মানুষ। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন 'স্পেস-টাইম কার্ভেচার' যন্ত্রটির দিকে। ভাঙা গলায় বললেন, 'এটাই সেই লুকোচুরি খেলার যন্ত্র। নিনি এই ঘরেই আছে, অথচ আবার নেই। এই ঘরের স্পেসে একটা ভাঁজ তৈরি করে ওকে আমি লুকিয়ে ফেলেছি। রাগের মাথায় হঠাৎ যে কী হয়ে গেল...।'

কী বলতে-বলতে যন্ত্র চালু করে দিলেন তিনি। যন্ত্রের কয়েকটা বাতি জ্বলে উঠল। অসংখ্য ডিজিটাল মিটারে রিডিং পালটাতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি। আমার শরীরের কয়েকটা সেন্সর সার্কিট হঠাৎই যেন একটা ঝটকা খেল। আর তারপরই...।

ল্যাবরেটরির মেঝেতে আবির্ভূত হল নিনি। পরনে কচি কলাপাতা রঙের সুন্দর কুচি-দেওয়া ফ্রক, তাতে সোনালি জরির কাজ। মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে অঘোরে।

আমি আচমকাই ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম, ‘নিনি!’

হঠাৎই মনে পড়ল, আমার মেয়ের নাম ছিল টুসি। নিনির মতোই মিষ্টি নাম। মিষ্টি মেয়ে। নামটা আলতো করে উচ্চারণ করলাম, যাতে রেকর্ড হয়ে যায়। এটা শুনলে অভিজিৎ মজুমদার খুশি হবেন।

বোধহয় আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন বিক্রম সেনগুপ্ত। তিনি প্রায় ছুটেই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। নিনিকে দেখে পাগলের মতো মেয়ের নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল, চারঘণ্টা নয়, চার যুগ পরে বিক্রম সেনগুপ্ত মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন। ওঁদের দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। আমার চোখে হয়তো জল আসত, কিন্তু এল না। কারণ, আমার শরীরে ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডগুলো বসানো হয়নি। অভিজিৎ মজুমদার এখনও বসাতে দেননি। ওগুলো না থাকলে চোখের জল তৈরি হয় না।

নিনির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওর চোখ ফোলা। হয়তো কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠেই ও ‘বাপি’ বলে ডেকে উঠল। জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

ডক্টর সেনগুপ্তের পিছন-পিছন ঘরে ঢুকেছিল সন্দীপ বর্মন। আচমকা নিনিকে দেখে ও কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, ‘ইনস্পেক্টর সরকার, কী ব্যাপার?’

আমি বললাম, ‘পরে বলছি—।’

রূপেশ কোঠারি ইতিমধ্যে বন্ধুর কাছে চলে এসেছেন। নিনির মাথায় আদর করে চুমু খেলেন একটা।

বিক্রম সেনগুপ্ত মেয়েকে কোল থেকে নামাতেই কোঠারি ‘বিক্রম!’ বলে বন্ধুকে একেবারে বুকে জাপটে ধরলেন। বললেন, ‘আমার মাথার মধ্যে একটা অমানুষ ঢুকে পড়েছিল। আমাকে ক্ষমা করে দাও—।’

কোঠারির কণ্ঠস্বরে বেদনা ছিল। চোখ চিকচিক করছে। ওঁর অনুশোচনা মিথ্যে নয়। ডক্টর সেনগুপ্ত কোঠারির ডাকে সাড়া দিলেন। বললেন, ‘নিনিকে ফিরে পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। তোমার ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। শুধু তুমি নও, ভুল আমিও করেছি। তোমার মতো বন্ধুকে হিংসে করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। গবেষণার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই চলে না।’

এবারে আমার আর বর্মনের বিদায়ের পালা।

বিক্রম সেনগুপ্ত তাঁর সমস্ত অভিযোগ ফিরিয়ে নিলেন।

নিনি বলল, ‘বাপি, বাড়ি চলো, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।’

সন্দীপ বর্মন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আমারও ইনস্পেক্টর সরকার। চলুন, এবারে যাওয়া যাক—।'

আমরা বেরিয়ে এলাম রূপেশ কোঠারির বাড়ি ছেড়ে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। টেলিফোন করে হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিলাম, কাজ শেষ। নিনিকে পাওয়া গেছে, আর ডক্টর সেনগুপ্ত সব অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সন্দীপ বর্মন একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'বসকে বলবেন না।' তারপর ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে হাই তুলল একটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল আমাদের। বর্মন বোধহয় বুঝল, আমি নিজে থেকে মুখ খুলব না। তখন বাঁকা সুরে জিগ্যেস করল, 'নিনিকে কী করে পাওয়া গেল, সেটা জানতে পারি কি?'

আমার হাসি পেল। কয়েক ঘণ্টা আগে রূপেশ কোঠারির বাড়ি যাওয়ার পথে বর্মন আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখতে চেয়েছিল। এখন দান উলটে গেছে।

কোঠারির ল্যাব থেকে পাওয়া চৌকোণা ঘর-আঁকা কাগজটা আমার কাছেই ছিল। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটের ওপরে ছেড়ে দিয়ে কাগজটা সমান করে পেতে নিলাম কোলের ওপরে। তারপর ড্যাশ-বোর্ডের খুদে ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে বর্মনকে বললাম, 'এটা ভালো করে দেখুন—।'

সন্দীপ বর্মন ছবিটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

আমি বলতে শুরু করলাম, 'এই চৌকোনা ঘরটা একটা টু ডাইমেনশান ওয়ার্ল্ড—দ্বিমাত্রিক জগৎ। তার মধ্যে এই ফুটকি দুটো হচ্ছে, ধরে নিন, দ্বিমাত্রিক জগতের দুটি প্রাণী। এরা কাগজের গায়ে লেপটে ঘুরে বেড়ায় এই চৌকোনো ঘরে চৌহদ্দির মধ্যে। চৌহদ্দির লাইনগুলোই হচ্ছে ওদের কাছে দেওয়াল। কিন্তু আপনি বা আমি হচ্ছি ত্রিমাত্রিক জগতের জীব। আমরা যে কেউই ইচ্ছেমতো একটা দ্বিমাত্রিক প্রাণীকে তুলে নিয়ে আসতে পারি আমাদের জগতে। তার জন্যে ওদের দেওয়াল টপকানোর দরকার নেই—স্রেফ ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেই হল। সুতরাং দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণীকে কোনও ঘর থেকে দেওয়াল না ভেঙে কিডন্যাপ করতে গেলে ত্রিমাত্রিক জগতের তৃতীয় মাত্রা বা থার্ড ডাইমেনশনের দিক থেকে এগোতে হবে। এ ছাড়া, আর একভাবে ব্যাপারটা হতে পারে...।'

বর্মন সিগারেটে টান দিচ্ছিল ঘন-ঘন। কাগজটা একমনে দেখছিল। আমার কথার খেই ধরে বলে উঠল, 'কাগজটা ভাঁজ করে?'

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। মুখের পেশিতে টান লাগল। বললাম, 'ঠিক তাই। এই দুটো ফুটকির মাঝ-বরাবর কাগজটা ভাঁজ করে দিলে একটা ফুটকি আর একটা ফুটকিকে সরাসরি দেখতে পাবে না। কিন্তু এই ভাঁজটা করতে হবে ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে দিয়ে। কারণ, তখন

কাগজটা আর নিছক দ্বিমাত্রিক সমতল থাকছে না—ভাঁজ হয়ে গেছে। রূপেশ কোঠারি ঠিক একইভাবে ওঁর ল্যাবের স্পেসে একটা ভাঁজ তৈরি করে ফেলেছিলেন—ওই 'স্পেস-টাইম কার্ভেচার' মেশিন দিয়ে। ন্যাচারালি, ভাঁজটা করতে হয়েছে ফোর্থ ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে দিয়ে। আর স্পেস-টাইম নিয়ে ওঁর গবেষণা তো বলতে গেলে ওয়ার্ল্ড ফেমাস—।'

নির্জন অন্ধকার পথ ধরে গাড়ি ছুটছিল। বর্মনের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ও বলল, 'সরকার, নিনি মেয়েটা বেশ লাকি। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, ওই যে ফোর্থ ডাইমেনশনাল স্পেস না কী বললেন, ওখান থেকে দিব্যি বেড়িয়ে এল—।'

আমি নিনির কথা ভাবলাম। তারপরই মনে পড়ল টুসির কথা। টুসি এখন কোথায়! ওর মিষ্টি মুখটা যে এখনও আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।



পাশের বাড়ির বন্ধু

একদিন ভোরবেলা জানলা দিয়ে নজর পড়তেই পাপু অবাক হয়ে গেল। পাশের বাড়িটায় লোকজন এসেছে। এতদিন ধরে বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল। অনেকটা পোড়ো বাড়ির মতো। আর চেহারাটাও ভারী অদ্ভুত। প্রায় পাঁচতলা উঁচু গির্জার মতো। ছুঁচোলো মাথাটা সোজা আকাশমুখো উঠে গেছে।

কিন্তু চেহারায় বড়সড়ো হলে হবে কী, বাড়িটার চারদিক আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে। সারা গায়ের পলেস্তারা খসে গেছে। জানলাগুলোর হালও সেইরকম। রাত্তিরে দেখলে গা-ছমছম করে পাপুর। অন্ধকারে কালো কুচকুচে দেখায় বাড়িটা। একটা তালঢ্যাঙা ভূত যেন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনেরবেলা দেখলে অবশ্য অতটা ভয় করে না। তবে স্কুলে যাওয়ার পথে পাপু রোজই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। চারপাশে মরচে-ধরা লোহার রেলিং। বিশাল লোহার গেট। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাড়িটার ভারী সদর-দরজা-বন্ধ। আর নীচের দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে আগাছায়।

বাড়িটা যে কবে কে তৈরি করেছে তা কেউ জানে না, বাবাও না। পাপু বাবাকে জিগ্যেস করেছিল। তাতে বাবা বলেছেন, ‘এদিকে সবই তো নতুন ফ্যাক্টরি কোয়ার্টার। কী করে একটা পোড়ো বাড়ি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে জানে! হবে হয়তো কোনও সাহেবসুবোর ফেলে-যাওয়া বাড়ি।’

উত্তরটা পাপুর মনে ধরেছিল। কারণ সত্যিই এ-অঞ্চলের প্রায় সব বাড়িই নতুন। বছর দশেক হল কয়েকটা বড়-বড় কলকারখানা চালু হওয়ায় নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। হয়েছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, দোকানপাট সবকিছু, অথচ একইসঙ্গে রয়েছে সবুজ মাঠ, ফুলের বাগান, গাছপালা।

আর তারই মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর ছোট-ছোট নতুন বাড়ি। ব্যতিক্রম শুধু আগাছায় ভরা ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল পোড়ো বাড়িটা।

সেই বাড়িতেই নতুন লোক এসেছে।

পাপু তাড়াতাড়ি বাবাকে ডেকে নিয়ে এল জানলার কাছে। বলল, 'ওই বাড়িটায় নতুন লোক এসেছে, বাবা।'

বাবা ফ্যাক্টরিতে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। পাপুর কথায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'না, দেখতে পাচ্ছি না। যাকগে, পরে নিশ্চয়ই আলাপ হয়ে যাবে।'

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর মাকে ধরে নিয়ে এল পাপু। বলল, 'মা, ওই দেখো! ও-বাড়িটায় লোক এসেছে।'

মা ভালো করে তাকিয়ে রইলেন পোড়ো বাড়িটার ভাঙা জানলার দিকে। কিন্তু না, কোনও মানুষজনই নজরে পড়ল না। তখন মা বললেন, 'ঠিক আছে, এখন রান্না বসাই গিয়ে, পরে আবার দেখব। তুমি পড়তে বোসো। এখন দেরি করলে পরে আবার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

মা চলে গেলেন। পাপু বুঝল, মা কিংবা বাবা, দুজনের কেউই ওর কথাকে বিশেষ আমল দেননি। নেহাতই কথার পিঠে দুটো কথা বলে চলে গেছেন। পাপুর একটু রাগও হল। বড়রা সবসময়েই এইরকম। ছোটদের গ্রাহ্যই করতে চান না। পাপু বই নিয়ে পড়তে বসল বটে, কিন্তু ওর চোখ বারবারই ছুটে যেতে লাগল ওই পোড়ো বাড়ির জানলাগুলোর দিকে। এতদিনের পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়িটা হঠাৎই কারা ভাড়া নিল, নাকি কিনে নিল? পাপুর বেশ অবাক লাগছিল। সুকলে রওনা হওয়ার ঠিক আগেই আশ্চর্য ঘটনাটা ওর চোখে পড়ল।

যে-জানলা দিয়ে পাপু নজর রাখছিল, তার কিছুটা অংশ একটা নিম গাছের ডালপালা-পাতায় ঢাকা। তা ছাড়া, পোড়ো বাড়িটার তেতলার জানলাটা খুব একটা যে কাছে তাও নয়। কিন্তু তবুও পাপুর দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

তেতলার জানলা দিয়ে একটা ছোট বাক্সমতো কী যেন পড়ে গেল নীচের আগাছার জঙ্গলে। আর তার ঠিক পরেই একজন লোক গরাদ-ভাঙা জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল। নীচে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কীসব দেখল। আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর 'স্পাইডারম্যান' কমিকস-এর পিটার পার্কারের মতো পোড়ো বাড়িটার দেওয়াল বেয়ে তরতর করে হেঁটে নেমে এল নীচে। বাক্সটা খুঁজে নিয়ে আবার একইভাবে তেতলায় উঠে জানলা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

বলতে গেলে পাপুর দম আটকে আসছিল। ও একছুটে গিয়ে 'স্পাইডারম্যান' কমিকস-এর পাতা খুলে বসল। পিটার পার্কারের ছবিটা একদৃষ্টে দেখতে লাগল। তা হলে কি পাশের বাড়িতে কোনও মাকড়সা-পরিবার এসে উঠেছে? পার্কারের গল্প তা হলে গল্প নয়! পাপু ভাবল মাকে ডেকে এক্ষুনি এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মাকে বলে লাভ নেই, মা পাপুর কথা একটুও বিশ্বাস করবেন না। বলবেন, 'ও তোমার চোখের ভুল। আর রাজ্যের গল্পের বই পড়ার নেশাটা একটু কমাও তো!'

সুতরাং এই দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার কথা অতিকষ্টে বুকে চেপে পাপু স্কুলে চলে গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আর গোপন রাখতে পারল না। প্রাণের বন্ধু বিজনকে সব খুলে বলল ও। বিজন কাছাকাছিই একটা কোয়ার্টারে থাকে। রোজ বিকেলে আরও সব বন্ধুবান্ধব মিলে ওরা পাপুদের বাড়ির কাছে মাঠে খেলা করে। বিজন বলল, 'চল, বিকেলে খেলার সময় বাড়িটার দিকে নজর রাখব।'

যে কথা, সেই কাজ।

বিকেলে খেলতে বেরিয়ে পাপু, বিজন, আর ওদের অন্য বন্ধুরা বাড়িটার দিকে নজর রাখতে লাগল। চট করে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না বাড়িটায় কেউ আছে। খেলাধুলো ছেড়ে যখন ওরা গোয়েন্দাগিরিতে নামবে বলে মতলব আঁটছে, ঠিক তখনই বাড়ির দরজাটা খুলে গেল।

আর বেরিয়ে এল ওদেরই বয়েসি একটি ছেলে। ফুটফুটে, হাসিখুশি মুখ।

বড় লোহার গেটটা খুলে সে সোজা এগিয়ে এল পাপুদের কাছে। বলল, 'আমার নাম টনি। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব। তোমাদের নাম কী?'

পাপু, বিজন, সবাই যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তোতলানো স্বরে আলাপ সেরে নিল নতুন বন্ধুর সঙ্গে।

কথায়-কথায় জানা গেল, টনিরা আজ খুব ভোরে এসেছে। এ-বাড়িটা ওদেরই ছিল। তবে এদিকে আসা হয়নি। হঠাৎ দরকার পড়ায় বাবা-মা-টনি হঠাৎ করে চলে এসেছে।

তখনও বেশ দিনের আলো ছিল। ওরা দল করে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলতে লাগল।

খেলা শুরু হলেও পাপুর বারবার সকালের ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। দেওয়াল বেয়ে নেমে-আসা ওই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই টনির বাবা। টনিকে জিগ্যেস করবে সে কথা? নাকি...।

পাপু একপাশে বসে স্কোর লিখছিল আর এলোমেলো ভাবছিল। এখন টনি ব্যাট করছে, বিজন বল করছে। অন্য প্রান্তে রয়েছে ওদেরই আর-এক বন্ধু তাতান। কেউ একজন আউট হলেই পাপু নামবে ব্যাট হাতে। কিন্তু হঠাৎই টনি বলটাকে ওপরের দিকে মারল। মারতে গিয়ে খুব যে একটা

জোর খাটিয়েছে, তা মনে হল না। কিন্তু বলটা সেই যে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেল আর নীচে পড়ল না।

টনি মুখে অপরাধী ভাব ফুটিয়ে বলল, 'কিছু মনে কোরো না। মারটা একটু জোরে হয়ে গেছে।'

বিজন অবাক হয়ে একবার আকাশের দিকে, আর একবার টনির দিকে দেখতে লাগল। ঘটনাটা ওদের বন্ধুরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাঝপথে খেলা পণ্ড। সুতরাং ওরা গল্প করতে-করতে যে-যার বাড়ির দিকে চলল। পাপু টনিকে বলল, 'আমি পাশের বাড়িতেই থাকি।'

টনি সেটা শুনে বলল, 'আমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এসো। মা-বাবা তোমাকে দেখলে ভীষণ খুশি হবে। কাল আসবে নাকি?'

পাপু বলল, 'ঠিক আছে। মা যদি বারণ না করে তা হলে আসব।'

ওদের বাড়িটা সম্পর্কে পাপুর ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। কৌতূহল হচ্ছিল টনি আর তার বাবা-মা সম্পর্কেও।

টনি হাত নেড়ে লোহার গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর...পাপু স্পষ্ট দেখল, মরচে-ধরা লোহার গেটটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। অথচ টনি একটিবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। ও তখন সদরদরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকছে।

সদরদরজাটাও একইভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

যদিও তখন সন্ধের আঁধার নেমে আসছে, তবুও পাপুর যে দেখতে এতটুকু ভুল হয়নি তা ও হলফ করে বলতে পারে।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ও আবার দেখল, টনিদের বাড়িটার সবক'টা জানলায় একসঙ্গে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। আলোগুলোর রং কেমন যেন অদ্ভুত। এরকম আলো পাপু আগে কখনও দেখেনি। তা ছাড়া, ওই পোড়ো বাড়িতে এত আলোর ব্যবস্থা ছিল!

পাপু ঠিক করল, বিশ্বাস করুক আর না করুক, আজ ও মা-বাবাকে সব খুলে বলবে। আর কাল বিকেলে ও টনিদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে।

অদ্ভুত সব চিন্তা মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাওয়ার দরুন পড়াশোনায় ঠিকমতো মন বসল না পাপুর। শেষে রাতে খাওয়ার সময় ও মাকে আর বাবাকে টনিদের কথা বলল। কোনও কথাই বাদ দিল না।

ওর কথা শুনে বাবা তো গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। 'এসব তোমার কমিকস পড়ার ফল। ভালো করে রাত্তিরে ঘুমোও, দেখবে কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

পাপু বলল, 'না বাবা, সব সত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস করো।'

তখন মা বললেন, 'ঠিক আছে, কাল বিকেলে তোমাকে নিয়ে আমরা টনিদের বাড়িতে বেড়াতে যাব। তোমার বাবাও যাবে আলাপ করতে। দেখবে, তখন তোমার ভুল ভেঙে যাবে।'

পাপু আর কী করে, চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ওর মনে হল, ওইসব উদ্ভট ব্যাপারগুলো ঠিক-ঠিক ও দেখেছিল তো! নাকি...।

সে-রাতে পাপু স্পাইডারম্যান কমিকস-এর পিটার পার্কারকে স্বপ্ন দেখল।

পরদিন সকালে উঠে শুধু পাপু নয়, মা-বাবাও একেবারে তাজ্জব। ভেলকিবাজি, ভানুমতীর খেল, নাকি ময়দানবের কীর্তি? সবাই দু-চোখ কচলে বারবার দেখতে লাগল আশ্চর্য ঘটনাটা।

টনিদের বাড়িটা সূর্যের আলোয় যেন ঝকঝক করছে। কোনওদিন যে সেটা পোড়ো বাড়ি ছিল সেটা বিশ্বাস করাই এখন মুশকিল।

পাপু মা-বাবার গোল-গোল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, এখন বিশ্বাস হল তো আমার কথা! দেখলে তো টনিরা কীরকম সব আশ্চর্য কাণ্ড করতে পারে!'

মা কোনওরকমে থেমে-থেমে বললেন, 'এ যে একেবারে নতুন বাড়ি!'

বাবা বাড়ির চারপাশের আগাছার জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'শুধু ওই জঙ্গল আর মরচে ধরা লোহার রেলিংগুলো না থাকলে বাড়িটা আর চেনাই যেত না।'

পাপু আগ্রহ-ভরা গলায় বলল, 'টনিকে একবার ডেকে জিগ্যেস করব, বাবা?'

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, 'না, না, তার দরকার নেই! শেষপর্যন্ত কী থেকে কী হবে...।'

বাবা সাবধানী সুরে পাপুকে বললেন, 'তুমি যেন একা-একা ওদের বাড়িতে যেয়ো না।'

পাপু ঘাড় নাড়ল। তারপর হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসল।

বাবা ফ্যাক্টরিতে বেরোনোর পর থেকেই পাপু জানলার কাছে সর্বক্ষণ খাড়া হয়ে রইল। তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে টনিদের বাড়ির ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। টনি, ওর বাবা কিংবা মা, কাউকেই দেখা গেল না। পাপু অবাক হয়ে ভাবছিল, কোন শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় বাড়িটা রাতারাতি ভোল পালটে ফেলল!

উত্তরটা ও পেল সুকলে যাওয়ার সময়।

পাপু একা-একাই স্কুলে যায়-আসে। এদিককার রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া কম। শুধু একটু যা সাইকেলের ভিড় রয়েছে। ও সবে টনিদের বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়েছে, এমন সময় ওর ঠিক সামনে হাজির হল টনি। যেন বাতাস থেকেই ফুটে উঠল ওর নতুন বন্ধুর চেহারা।

'কোথায় যাচ্ছ, স্কুলে?' টনি জিগ্যেস করল।

পাপু নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুটা ভয়ে-ভয়েই বলল, ‘হ্যাঁ।’ তারপর একটু থেমে আবার বলল, ‘তুমি সুকলে ভরতি হবে না?’

টনি হাসল। হেসে বলল, ‘না। আমি তো দেশের বাড়িতে স্কুলে পড়ি। তোমাদের এখানে স্কুল-কলেজে যা শেখায়, সব আমার জানা। আমাদের স্কুলে পড়া খুব কঠিন। তুমি বুঝবে না।’

পাপু কিছুটা অপমানবোধ করল। বলল, ‘তোমার দেশের বাড়ি কোথায়?’

টনি হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘সে অনেক দূর। জায়গার নাম বললে তুমি চিনবে না।’

পাপু কথা বলতে-বলতে এগোচ্ছিল। টনিও ওর পাশে-পাশে হাঁটছিল। স্কুলের কাছাকাছি এসে পাপু বলল, ‘আচ্ছা, তোমাদের বাড়িটা রাতারাতি কে মেরামত করল বলো তো?’

টনি স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘কে আবার! বাবা।’

‘একা?’

‘হ্যাঁ, একা। কেন?’

‘তোমার বাবা দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে পারেন?’

পাপু টনিকে খোঁচা দিয়ে অপমানের শোধ নিতে চাইছিল, কিন্তু ওর কথায় টনি আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল, ‘শুধু বাবা কেন? মা’ও পারে, আমিও পারি। দেখবে?’ বলেই টনি একছুটে সামনের একটা কোয়ার্টারের দেওয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে গেল, তারপর একইভাবে আবার নেমে এল।

পাপু হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে টনি বলল, ‘শুধু আমি কেন, আমাদের দেশের সবাই পারে। তুমি বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসো, তোমাকে আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখাব। খুব মজা পাবে তুমি।’

পাপুর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কী ভেবে ও কোনওরকমে বলল, ‘সন্ধেবেলা যাব। আমার মা-বাবাকে নিয়ে যাব। নইলে একা-একা আমাকে ছাড়বে না।’

টনি হেসে বলল, ‘নিয়ে এসো ওঁদের। আলাপ হলে আমার মা-বাবাও খুব খুশি হবে। আমাদের দেশের বাড়ির দারুণ-দারুণ সব গল্প শোনাব। আচ্ছা, ওই যে তোমার স্কুল এসে গেছে, আমি এখন যাই। সন্ধেবেলা আবার দেখা হবে।’

পাপুর চোখের সামনে টনি আবার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

স্কুলে বিজনকে সব ঘটনা জানাতেই ও বলল, ‘সন্ধেবেলা যাবি যা, তবে সাবধানে থাকিস।’

পাপু গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। ক্লাসের পড়া ওর মাথায় ঢুকছিল না।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আর খেলতে বেরোল না পাপু। শুধু মায়ের কাছে বসে জেদ ধরল টনিদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যেতে হবেই। কারণ টনি কত মজার-মজার খেলা দেখাতে পারে,

পড়াশোনায় কত ভালো, ও পাপুকে নিশ্চয়ই সব শিখিয়ে দেবে। তা ছাড়া, টনির কাছে ওর দেশের গল্প শুনবে পাপু। টনি বলেছে দারুণ-দারুণ সব গল্প শোনাবে।

বাবা অফিস থেকে ফিরেই রাজি হয়ে গেলেন এককথায়। মনে-মনে তাঁরও বোধহয় খুব কৌতূহল হচ্ছিল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনজন তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে।

বিকেল পেরিয়ে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। টনিদের তালঢ্যাঙা বাড়ির ছোট-ছোট জানলায় গতকালের মতোই অদ্ভুত আলো জ্বলছে। মা-বাবার হাত ধরে লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল পাপু। তারপর আগাছা মাড়িয়ে সদর-দরজা। দরজা খুলে ভেতরে।

ভেতরে ঢুকতেই মেঝেটা নিঃশব্দে ওপরে উঠতে লাগল। ঠিক যেন অটোমেটিক লিফট। তারপরই টনি আর ওর মা-বাবার দেখা পাওয়া গেল। বিশাল ঘর। অনেকগুলো টিভির পরদায় নানান রঙিন লেখা। তাদের সামনে অসংখ্য রঙিন বোতাম। কম্পিউটার নাকি? পাপু কম্পিউটারের ছবি বইতে দেখেছে।

টনির বাবা দ্রুত হাতে নানান বোতাম টেপাটেপি করছিলেন, ওদের দেখেই হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। টনির মা সুন্দর-সুন্দর খাবার সাজিয়ে দিলেন প্লেটে। ওরা আনন্দে গল্প করতে লাগল। টনিদের দেশের হরেকরকম অদ্ভুত গল্প পাপুদের অবাক করে দিচ্ছিল। টনির বাবা বারবার করে বললেন, ‘চলুন না, আমাদের দেশে ক’দিন বেড়িয়ে আসবেন। কোনও অসুবিধে হবে না। আজ রওনা হলে ধরুন কাল পৌঁছে যাবেন। আর যদি বলেন তো পরশু আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। চলুন, চলুন। গেলে খুব ভালো লাগবে। তা ছাড়া, আমাদেরও ক’টাদিন বেশ ফুর্তিতে কাটবে।’

পাপু আর টনি ছুটোছুটি করে খেলছিল। পাপু নেমন্তন্নের কথা শুনে বাবাকে আর মাকে রাজি করানোর জন্য বারবার করে আর্জি পেশ করতে লাগল। সকলের অনুরোধে ওঁরা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

তখন টনির বাবা হেসে বললেন, ‘তা হলে আর দেরি নয়, এখনই রওনা হওয়া যাক।’ বলে তিনি কম্পিউটারের কাছে গিয়ে পরপর কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

একটা গুড়গুড় শব্দ শুরু হল। তারপর ভোঁ-ভোঁ। শেষে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে টনিদের গোটা বাড়িটা শূন্যে উঠতে লাগল রকেটের মতো।

পাপুর মা চিৎকার করে উঠলেন।

বাবা বললেন, ‘এসব কী হচ্ছে!’

টনির বাবা হেসে বললেন, ‘কোনও ভয় নেই। আমরা আপনাদের এপসিলন এরিড্যানির সতেরো নম্বর গ্রহে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানেই আমাদের দেশ। পৃথিবী থেকে সাড়ে দশ আলোকবর্ষ দূরে। যেটাকে আপনারা আমাদের বাড়ি ভাবছেন, সেটা আসলে একটা মহাকাশযান। অনেকদিন

আগে পৃথিবীতে এসে বিকল হয়ে পড়েছিল। অন্য একটা মহাকাশযান আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে এই মহাকাশযানটাকে মেরামত করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তাই এখন নিয়ে যাচ্ছি।'

টনির মা বললেন, 'আমরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টাতেই বারবার এই গ্রহে যাতায়াত করি। এবারে আপনাদের পাপুর সঙ্গে আমাদের টনির যা ভাব হয়েছে তাতে আমরা খুব খুশি। তা ছাড়া, আপনাদের সঙ্গেও আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে। মিছিমিছি ভয় পাবেন না। মনে করুন না, ছুটিতে ক'দিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন! মাত্র কয়েকটা তো দিন, তার বেশি তো নয়।'

পাপুর মা-বাবার ভয় আস্তে-আস্তে কেটে যাচ্ছিল। রকেটযান তখন সাংঘাতিক গতিতে ছুটে চলেছে। সামনের টিভি-পরদাগুলোয় অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে।

টনি ঘরের দেওয়ালে ছাদে ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করছিল। খেলা করছিল পাপুর সঙ্গে। পাপু কিন্তু এতটুকু ভয় পায়নি। সেও খেলা করতে-করতে লাফিয়ে-লাফিয়ে টনিকে ছুঁতে চেষ্টা করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে পাপুর বাবা টনির বাবাকে বললেন, 'বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন চলুন, কিন্তু দেওয়ালে হাঁটাহাঁটি করাটা আমাকে অবশ্যই শিখিয়ে দিতে হবে।'

পাপুর মা বললেন টনির মাকে, 'আমাকে নতুন-নতুন কয়েকটা রান্না শিখিয়ে দেবেন, দিদি।'

পাপুর বাবা সে-কথা শুনে বললেন, 'যে আছে যার তালে!'

এ-কথায় চারজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।



আবার মুশকিল হতে পারে

ঘটনাটা কেউ খেয়াল করেনি। আর করবেই বা কেমন করে? ভোর ছ'টার সময়ে ক'জনই বা মানুষজন ছিল রাস্তায়! ফলে প্রফেসর মজুমদার ছাড়া ব্যাপারটার সাক্ষী আর কেউ ছিল না। কিন্তু বেলা বাড়তেই হুলস্থুল। রাস্তায় গাড়িঘোড়া লোকজন যেমন বাড়তে লাগল, হইচইও বাড়তে লাগল সমান তালে। তারপর যানজট, পুলিশ, ক্রেন। সে এক এলাহি কাণ্ড।

শুরু থেকেই তা হলে শুরু করা যাক।

গত কয়েকমাস ধরেই প্রফেসর শান্তনু মজুমদার একটা গোপন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাড়ার সকলেই জানে, ওঁর সব গবেষণাই বেশ গোপন। আর উনি নানাভাবে ভারতের সামরিক বিভাগকে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং এবারের গবেষণাটাও যে সেইরকম তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপরেই প্রফেসর মজুমদারের সুন্দর তিনতলা বাড়ি। সেই বাড়ির একতলাটাই ওঁর গবেষণাগার। মাত্র দুজন সহকারী নিয়ে গত দশ বছর ধরে তিনি দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। লোকে বলে, ওঁর খ্যাতি নাকি দুনিয়া জোড়া। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিটায়ার করার পরেও তিনি বসে থাকতে পারেননি হাত গুটিয়ে। রাত-দিন বিচিত্র সব গবেষণায় ব্যস্ত থেকেছেন। ওঁর যেসব গবেষণা খুব গোপন সেগুলোর জরুরি খুঁটিনাটি সহকারীদেরও বুঝতে দেন না তিনি। আর সেই গবেষণা নিজে চালিয়ে যান রাত জেগে। যদি ঘুম পায়, তার জন্য রয়েছে ঘুমতাড়ানি ট্যাবলেট আর কড়া কফি।

প্রফেসর মজুমদার সাংঘাতিক বিজ্ঞানী হলে কী হবে, ভীষণ হাসিখুশি আর মিশুকে। পাড়ায় সবাই তাঁকে পছন্দ করে। সুন্দর সুঠাম চেহারা, সাহেবদের মতো টকটকে গায়ের রং, মাথার চুলে সবসময় দামি তেল, আর পোশাক-আশাক অষ্টপ্রহর ফিটফাট। শুনলে বিশ্বাস হবে না, কিন্তু তিনি

দু-দিন অন্তর-অন্তর বাজার করেন। বাজারে চেনা লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে বেশ খোলামনেই আলাপ করেন। লোকের বিপদে-আপদে সাহায্যও করেন দরকার মতো।

সুতরাং প্রফেসর মজুমদারের বিপদে পাড়াপড়শিরা যে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে আর আশ্চর্য কী!

সারারাত জেগে কাজ করতে-করতে ভোরের দিকে সামান্য তন্দ্রামতো এসেছিল প্রফেসর মজুমদারের। আর তখনই হঠাৎ হাত ফসকে সংকর ধাতুর বলটা গড়িয়ে পড়ে ল্যাবরেটরির মেঝেতে। না, বলটা সেখানেই থামেনি। স্যার আইজ্যাক নিউটনের সূত্র অনুযায়ী গতিজাড্যের ঠেলায় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে যায় দরজার বাইরে। তারপর সেখান থেকে রাস্তায়, একেবারে ট্রাম লাইনের ওপরে।

বলটা শেষপর্যন্ত থেমেছে বটে, কিন্তু এমনই থামান থেমেছে যে, সেখান থেকে কেউ আর সেটাকে নড়াতে পারছে না।

একটা নতুন ধরনের সংকর ধাতু তৈরির চেষ্টায় গবেষণা করছিলেন শান্তনু মজুমদার। সেটা যখন প্রায় তৈরি হওয়ার মুখে, তখনই এই বিপত্তি।

এলোমেলো চুলে বিভ্রান্ত অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে এলেন প্রফেসর। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, বলটা যতই রাস্তার দিকে গেছে, ততই যেন গভীর হয়েছে তার চলার দাগ। ল্যাবরেটরির বাইরে বেরোনোর পরই সিমেন্ট-বাঁধানো মেঝেতে ফাটল ধরার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। তারপর যতই বলটা রাস্তার দিকে এগিয়েছে ততই ফাটল বেড়েছে। তারপর ট্রাম লাইনের ওপরে পৌঁছে বলটার প্রায় অর্ধেকটাই ডুবে গেছে পিচের রাস্তায়।

এর অর্থ একটাই হতে পরে। বলটার ওজন এখন বেড়ে গেছে অস্বাভাবিকরকম। অথচ একটু আগেই যখন তিনি সদ্য তৈরি করা বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন তখন তো ওটা বেশ হালকাই ছিল! আসলে একটা হালকা সংকর ধাতুই তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন প্রফেসর মজুমদার। কিন্তু হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়েই বলটা কেমন যেন গোলমেলে হয়ে গেল। হালকা বলটা গড়াতে-গড়াতে ওজনে বাড়তে-বাড়তে চলে গেল রাস্তায়।

এপাশ-ওপাশ তাকালেন প্রফেসর। বহুদূরে চাদর মুড়ি-দেওয়া দুজন মানুষকে দেখতে পেলেন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। দৌড়ে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? উঁহু, আসবে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটা ট্রাম আসছে মনে হচ্ছে! নাকের ওপরে দূরদৃষ্টির চশমাটা ঠিক করে বসালেন প্রফেসর। হ্যাঁ, ট্রামই আসছে। কী হবে এখন! প্রফেসর মজুমদার সত্যি-সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ওঁকে ট্রাম লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ট্রাম ড্রাইভার ঘণ্টি বাজাচ্ছে ঘনঘন। ট্রামটা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে। দু-হাত মাথার ওপরে তুলে চিৎকার করতে শুরু করলেন প্রফেসর, ‘থামো! থামো!’

অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এসে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ঘস' করে ব্রেক কষার শব্দ হল। রাস্তা থেকে ধুলো উড়ল খানিকটা। তারপর ফার্স্টক্লাসের কন্ডাক্টর নেমে এল ট্রাম থেকে।

'কী ব্যাপার! ওটা আপনার?'

প্রফেসর মজুমদার কেমন হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমার—মানে, হাত থেকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে...।'

ঠং-ঠং করে আওয়াজ করল ট্রাম ড্রাইভার। চিৎকার করে কী যেন বলল।

কন্ডাক্টরও ব্যস্ত হয়ে বলল, 'জলদি সরিয়ে নিন ফুটবলটা—।'

যদিও বোঝা যাচ্ছিল বৃথা চেষ্টা, তবুও ঝুঁকে পড়ে বলটাকে টানাটানি করলেন প্রফেসর। না, একচুলও নড়ানো গেল না। মসৃণ পাথরের গম্বুজ যেন একটা।

নড়ানো যে যাবে না সেটা বলটার রাস্তা কেটে বসে যাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তবুও দু-হাতে ওটাকে খানিকক্ষণ টানাটানি করে যেন চরম পরীক্ষা করলেন প্রফেসর।

হ্যাঁ, মাপে বলটা এখন ফুটবলেরই মতো। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে যখন ওটা নিয়ে প্রফেসর মজুমদার নাড়াচাড়া করছিলেন তখন আরও বেশ খানিকটা বড় ছিল। খুঁটিয়ে লক্ষ করলে এও নজরে পড়ে, মাপের সঙ্গে-সঙ্গে বলটার রংও পালটেছে। তার মানে, বলটার ঘনত্ব যেমন বেড়েছে, ওটা আরও ভারী হয়েছে, সেইসঙ্গে মাপ বদলেছে, রংটাও আর ঠিক আগের মতো নেই। এ কোন বহুরূপী সংকর ধাতু তৈরি হয়ে গেল ল্যাবরেটরিতে!

রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন প্রফেসর মজুমদার।

তারপর হেরে-যাওয়া গলায় বললেন, 'কী করব ভাই, একচুলও নড়ানো যাচ্ছে না।'

ততক্ষণে ড্রাইভার ও জনাকয়েক যাত্রী নেমে পড়েছে ট্রাম থেকে। দ্বিতীয় কন্ডাক্টর এসে যোগ দিয়েছে প্রথম জনের সঙ্গে। কিন্তু বল অটল। নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু!

এইভাবে শুরু হওয়ার পর বেলা যতই বাড়তে লাগল, গোলমালও ততই বেড়ে চলল। ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে যেতে লাগল লাইনের ওপরে। জনাচারেক ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে এসে যানজট সামাল দিতে লাগল। প্রফেসর মজুমদারের পাড়ার ছেলেরা আর স্থানীয় লোকজন বিচিত্র গোলকটাকে ঘিরে ব্যারিকেড করে দাঁড়াল। দর্শকের ভিড় উপচে পড়তে লাগল। নানাজনের নানা প্রশ্নঃ 'ওটা কী, দাদা? শিবলিঙ্গ?', 'মাটি ফুঁড়ে উঠল, না আকাশ থেকে পড়ল?', 'ভোররাতে উল্কাপাত হল নাকি?', 'দমকলে খবর দিন, ওদের গাড়ির ধাক্কায় ঠেলে তুলে দেবে।', 'পাতাল রেলকে বলুন ক্রেন নিয়ে আসতে'।

প্রফেসর শান্তনু মজুমদার ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনছিলেন। ভাবছিলেন, কী করা যায় এখন। কী করে বলটাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় ল্যাবরেটরির ভেতরে।

হঠাৎই পুলিশের এক হোমরাচোমরা অফিসার হাজির হলেন ঘটনাস্থলে। ভিড়ের লোকজন সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিল। একটি ছেলেকে কী যেন জিগ্যেস করলেন অফিসার। উত্তরে ছেলেটি আঙুল তুলে ইশারা করল প্রফেসর মজুমদারের দিকে। অফিসারটি এগিয়ে এলেন শান্তনু মজুমদারের কাছে। মাটিতে বসে-থাকা বলটার দিকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন, 'ওটা আপনার?'

একটু চুপ করে থেকে প্রফেসর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার—।'

'সাতসকালে এই পিকিউলিয়ার বলটা নিয়ে কী করছিলেন জানতে পারি?'

প্রশ্নের কঠিন সুরটা প্রফেসর মজুমদারের কানে বাজল। একে তো নিজের গবেষণা নিয়ে সমস্যা, তার ওপরে এইরকম খোঁচা-দেওয়া প্রশ্ন। চশমাটা নেড়েচেড়ে বসিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সাতসকালে ওটা নিয়ে ফুটবল খেলছিলাম না। আমার নাম শান্তনু মজুমদার। বিজ্ঞান নিয়ে একটু-আধটু গবেষণা করে থাকি...।'

নামটা শোনামাত্রই পুলিশ অফিসারের চোয়ালের রেখা নরম হল। খবরের কাগজের দৌলতে শান্তনু মজুমদার নামটা তাঁর শোনা। সুতরাং এরপর প্রশ্নের ধাঁচ ও সুর দুই-ই পালটে গেল।

প্রফেসর মজুমদারের কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর অফিসারটি তড়িঘড়ি ক্রেনের ব্যবস্থা করতে ছুটলেন।

শান্তনু মজুমদার ভাবছিলেন। ভাবতে-ভাবতে সকালের মিঠে রোদ চড়া হয়ে গেল মাথার ওপরে। কিন্তু সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। চারপাশে লোকজনের কোলাহল, বাস-গাড়ি-লরির হর্ন। কাছেপিঠে কোথায় যেন মাইকের চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

প্রফেসর মজুমদার বলটাকে লক্ষ করছিলেন। ওটার রং এখন অনেকটা নীলচে-বেগুনি। আর মাপে কি খানিকটা ছোট হয়েছে আরও!

হঠাৎই ভিড় ঠেলে চলে এল দুজন ফটোগ্রাফার। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে বলটার ফটো তুলতে লাগল। রোগা চেহারার একটি ফরসা ছেলে এগিয়ে এল প্রফেসরের কাছে। হাতে নোটবই, ডটপেন। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। সব মিলিয়ে দেখে মনে হল, ভিটামিনের অভাবে ভুগছে। নিশ্চয়ই সাংবাদিক।

অতএব ব্যাপারটা দু-চার কথায় ছেলেটিকে বুঝিয়ে বললেন প্রফেসর। তারপর যখন বাড়ি ফিরে আসবেন বলে ভাবছেন, তখনই দেখতে পেলেন একটা ক্রেন এগিয়ে আসছে অকুস্থলের দিকে।

ক্রেনটাকে দেখেই সকলে একেবারে হইহই করে উঠল। ভিড় সরে গেল পলকে। ক্রেনটা ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল কাছে। তার পাশাপাশি পায়ে হেঁটে হাজির হল পাঁচ-ছ'জন লোক। তার মধ্যে সেই পুলিশ অফিসারটিও আছেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত যা হওয়ার তাই হল। ক্রেন দিয়ে টানাহ্যাঁচড়ার চূড়ান্ত করেও বলটাকে একচুল নড়ানো গেল না। ক্রেন যখন বলটাকে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড টান মারছিল তখন ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষজন চেঁচিয়ে উঠছিল, 'মারো জোয়ান হেঁইও...।' কিন্তু লাভের মধ্যে শেষপর্যন্ত শেকলটাই গেল ছিঁড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে তুমুল হট্টগোল, শব্দ, চিৎকার। আর প্রফেসর মজুমদারের দীর্ঘ শরীরটা যেন ঝুঁকে পড়ল খানিকটা। নিজের অজান্তে এ কী ভয়ংকর বস্তু তৈরি করলেন তিনি!

পুলিশ ভিড় সামলানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু খুব একটা যে পারছিল তা নয়। ক্যামেরা হাতে বেশ কয়েকজন পটাপট ছবি তুলছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, আগামীকালের কাগজে 'বলবান বলের রহস্য' কিংবা 'গোলক নিয়ে গোলমাল'—এ-জাতীয় কোনও হেডিং দিয়ে এই রোমাঞ্চকর বিবরণ ছাপা হবে।

কিন্তু এখন এই প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে কে উদ্ধার করবে!

এমনসময় ভিড় ঠেলে প্রফেসর মজুমদারের দুজন সহকারী অতুল আর বিমান এসে হাজির হল। ততক্ষণে ক্রেনটাকে বিদায় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রোগা চেহারার অল্পবয়েসি ছেলে অতুল জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, স্যার?'

প্রফেসর মজুমদার হাত-পা নেড়ে ব্যাপারটা বললেন অতুলকে। বিমানও শুনল। কিন্তু দুজনের একই অবস্থা। প্রফেসরের এই গোপন গবেষণায় ওদের কোনও হাত ছিল না। ওরা চুপচাপ মাথা চুলকোতে লাগল।

বেলা বাড়তে-বাড়তে যখন দুপুর, খিদেয় অনেকেরই পেট চোঁ-চোঁ করছে, ঠিক এমনসময় এক অদ্ভুত চ্যাঁচামেচি শোনা গেল।

ট্রাম লাইন থেকে বেশ খানিকটা দূরে পুবদিকের ফুটপাথ ঘেঁষে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ আছে। তার নীচে সিমেন্ট-বাঁধানো চাতালে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা আড্ডা মারে। গোলমালটা ভেসে এল সেদিক থেকেই।

অনেকেই গলা উঁচু করে তাকাল সেদিকে। কীসের গোলমাল? শান্তনু মজুমদারও একটু হকচকিয়ে গেলেন। অতুল আর বিমানকে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী বলো তো হে—?'

ওরা ব্যাপারটা ঠাহর করার জন্য সেদিকে এগোতে যাবে, ঠিক তখনই জনাকয়েক লোক 'ফুঁয়াবাবা! ফুঁয়াবাবা!' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আর তার একমিনিটের মধ্যেই ভিড় ঠেলে চার-পাঁচজন লোক হাজির হল প্রফেসরের সামনে। তারা যাকে টেনে হিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে এল, সে এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী।

শুধু গেরুয়া নয়, সন্ন্যাসীদের সাধারণত যেমনটি থাকে, তার গালে মুখে সেরকম কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। নাক-মুখ ফোলা ফোলা। মোটা ভুরু। বড়-বড় চোখ। বেশ নাদুসনুদুস

চেহারা।

সন্ন্যাসী পাবলিকের হাতের বাঁধন ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর বলছে, 'না, না, এ আমার দ্বারা হবে না। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। নরকেও তোমাদের ঠাঁই হবে না, পাপিষ্ঠ!'

সঙ্গের লোকগুলো একেবারে নাছোড়বান্দা। তারা সবাই মিলে বলতে লাগল, 'না, বাবা, আপনাকে এটুকু উপকার করতেই হবে। মানবজাতিকে লিয়ে। ম্যানকাইন্ডের জন্যে।'

সাধুবাবার আপত্তি ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল। সে তার ভারী শরীর নিয়ে মাঝে-মাঝেই লাফ মারার চেষ্টা করছিল। আর মুখে 'না, না—মুঝে ছোড় দো' বলে চিৎকার করে উঠছিল।

এই হই-হট্টগোল চেঁচামেচি শুনে পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে চেঁচামেচি থামল। সকলে এবার বলটার দিক থেকে নজর সরিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখছে।

অফিসারের জেরার উত্তরে জানা গেল, আজ প্রায় দিন-দশেক হল এই সাধুবাবা এসে ওই অশ্বত্থ গাছের নীচে আস্তানা গেড়েছে। আর তারপর থেকে নামমাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে স্রেফ ফুঁ দিয়ে গরিব-দুঃখীদের অসুখ-বিসুখ সারিয়ে দিচ্ছে।

দু-চারদিন পর থেকেই ওই গাছতলায় ভিড় বাড়তে থাকে। নানা জায়গা থেকে লোকজন এসে হাজির হতে থাকে নানা প্রার্থনা নিয়ে।

এরকম অলৌকিক 'বাবা'দের ওপরে প্রফেসর মজুমদারের কোনওকালেই কোনও আগ্রহ ছিল না। তাই অশ্বত্থতলার ব্যাপারটা তিনি বিশদভাবে জানতেন না। এখন সাধুটিকে সামনাসামনি দেখে তাঁর কিন্তু কৌতূহল হচ্ছিল।

পুলিশ অফিসার জিগ্যেস করলেন, 'ওকে এভাবে ধরে এনেছেন কেন?'

একটি ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, 'বলটাকে সরানোর জন্যে—।'

সাধুবাবার হাত ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। সে অফিসারটির দিকে হাতজোড় করে অনুনয় করে বলল, 'আমাকে মাপ করুন, স্যার। এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, 'না, না, ওঁর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ফুঁ দিয়ে আমার ছেলের জন্ডিস সারিয়ে দিয়েছেন।'

সাধুবাবা তো হাত-পা নেড়ে অস্থির। কাতর গলায় সে পুলিশ অফিসারকে বলল, 'স্যার, আমার আসল নাম পঞ্চানন দাস। আমার কোনওরকম অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা নেই, স্যার। আগে আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ম্যাজিক দেখাতাম। এখন শরীরে আর বয় না। তাই এই গেরুয়া পরে গাছতলায় বসে ঝাড়ফুঁকের কাজ করি। অলৌকিক ক্ষমতার নাম করে দু-একটা ম্যাজিক ট্যাজিক দেখিয়ে দিই। বিশ্বাস করুন, তার বেশি কিছু নয়, স্যার—।'

বেচারা পঞ্চানন অফিসারের হাত চেপে ধরল মুঠো করে, 'আপনি আমায় বাঁচান, স্যার।'

প্রফেসর মজুমদার বলতে যাচ্ছিলেন, লোকটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে জনতা নতুন মজা পেয়ে গেছে। তারা তখন সবাই মিলে হইহই করে বলল, 'সাধুবাবাকে একবার চেষ্টা করতেই হবে! আমরা কোনও কথা শুনব না!'

সুতরাং অবস্থার চাপে পড়ে পুলিশ অফিসারটিও কিছু বলতে পারলেন না। এত সময় নষ্ট হয়েছে এই বলের পিছনে, না হয় আরও পাঁচ মিনিট বাড়তি নষ্ট হবে। প্রফেসর মজুমদার কপালে ভাঁজ ফেলে ব্যাপার স্যাপার লক্ষ করতে লাগলেন। আর জনতার তুমুল চিৎকারের মধ্যে সাধুবাবা এগিয়ে যেতে লাগল বলটার দিকে। বেচারার মুখের চেহারা দেখলে মনে হবে যেন ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বলের কাছে পৌঁছে সাধুবাবা থমকে দাঁড়াল। আর তার পিছনে দাঁড়ানো লোকজন চিৎকারে ফেটে পড়ল, 'ফুঁয়াবাবা কী জয়!'

কেউ বলল, 'এইবারে বল নড়বে—।'

আর-একজন বলল, 'জলদি ফুঁ দিন, বাবা, জলদি ফুঁ দিন—।'

ফুঁয়াবাবা, ওরফে পঞ্চানন দাস, উপায়ান্তর না দেখে ঝুঁকে পড়ল মাটিতে গেঁথে-থাকা বলের ওপরে। তারপর দু-চোখ বুজে গাল ফুলিয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিল বলটাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে বলটা নড়ে উঠল। ভেসে উঠল শূন্যে। মাটি থেকে হাত-তিনেক উঁচুতে স্থির হয়ে ভেসে রইল।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় গোল হলে যে-চিৎকার শোনা যায় তার অন্তত দশগুণ চিৎকার শোনা গেল। বলটা শূন্যে ভেসে ওঠায় উল্লাসে একেবারে ফেটে পড়ল জনতা।

ফুঁ দেওয়ার পরেও চোখ বুজেই ছিল পঞ্চানন। হয়তো ভাবছিল, ঠিক কখন ওর পিঠে পাবলিকের প্রথম আঘাতটা পড়বে। কিন্তু আনন্দের হইচই শুনে অবাক হয়ে চোখ খুলল সে। দেখল মাটির দিকে। শুধু গর্তটা দেখা যাচ্ছে, বলটা নেই। তার পরক্ষণেই বলটাকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখল পঞ্চানন। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে রইল বলটার দিকে।

জনতা প্রবল চিৎকার করে উঠল, 'জয় ফুঁয়াবাবার জয়!'

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো খসে পড়ল সাধুবাবা। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা তিন-চারজন লোক ধরে ফেলল তাকে। কেউ বলল, 'জল নিয়ে এসো।' কেউ বা বলল, 'জোরে-জোরে বাতাস করো—'। আর তক্ষুনি অচৈতন্য সাধুবাবার জন্য শুরু হয়ে গেল ছুটোছুটি।

প্রফেসর মজুমদার লক্ষ করলেন, বলটা মাপে যেন কিছুটা বড় হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে রংও আবার পালটে গেছে। এখন খানিকটা বাদামি রঙের দেখাচ্ছে।

বলটা শূন্যে ভেসে থাকা অবস্থাতেই সামান্য এপাশ-ওপাশ নড়ছিল। অতুল আর বিমান তাজ্জব হয়ে দেখছিল বলটাকে। প্রফেসর মজুমদার আর দেরি করলেন না। চেঁচিয়ে ওদের বললেন, 'বলটা শিগগিরই ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাও। এরপরে আবার মুশকিল হতে পারে—।'

অতুল আর বিমান চমকের ঘোর কাটিয়ে দৌড়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরল বলটা। ফটোগ্রাফাররা ঘনঘন ছবি তুলছিল। দু-চারজন লোক অতুল আর বিমানকে কী যেন জিগ্যেস করছিল। কিন্তু ওরা কোনওদিকে কান না দিয়ে পাখির পালকের মতো হালকা বলটাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে সোজা রওনা দিল প্রফেসর মজুমদারের ল্যাবরেটরির দিকে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন শান্তনু মজুমদার। বেলা তিনটে পার হয়ে গেছে। ক্লান্ত পায়ে তিনি এগোলেন অতুল আর বিমানের পিছু-পিছু।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবেন, দেখেন চার-পাঁচজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে সেই সাংবাদিক ছেলেটি আর পুলিশ অফিসারটিও রয়েছে। একজন ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশগান ঝলসে উঠল। প্রফেসর মজুমদার সামান্য বিরক্তভাবে বললেন, 'প্লিজ, এখন এসব নয়। আমি ভীষণ টায়ার্ড।'

সাংবাদিক ছেলেটি চশমা ঠিক করতে-করতে বলল, 'স্যার, গোটা ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। আমরা এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। যদি আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন—।'

শান্তনু মজুমদার নিজেও মনে-মনে হাতড়াচ্ছিলেন। কী করে হল এমন আজব ব্যাপার? দেখলেন, অতুল আর বিমান বলটাকে ল্যাবরেটরির মেঝেতে সাবধানে নামিয়ে রেখে তার চারপাশ নানান জিনিস দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে—যাতে বলটা আর না গড়ায়।

একটু আমতা-আমতা করে পুলিশ অফিসার বললেন, 'প্রফেসর মজুমদার, এই বলের ব্যাপারটা নিয়ে একটা—ইয়ে, মানে, রিপোর্ট দিতে হবে আমাকে। তাই...আপনি যদি...।'

শান্তনু মজুমদার তখন ভাবছিলেন। কতরকম পদার্থ আছে এই দুনিয়ায়। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে অণু, পরমাণু। পরমাণুর ভেতরে আবার আছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। অণুই হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা পদার্থের নিজস্ব ধর্ম বজায় রাখে, আর স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। অণুর গঠনের জন্যই তো সোনার রং সোনালি, আর ঘনত্ব এত বেশি। আবার ওই অণুর গঠনের জন্যই তুলোর রং সাদা, আর তুলো এত হালকা যে, ফুঁ দিলেই উড়ে যায়। তা হলে নতুন এই পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ করে এমন কোনও পদার্থ তৈরি

হয়ে যায়নি তো যার অণুর গঠন অস্থায়ী, নিজে থেকেই ঘনঘন পালটে যাচ্ছিল! কখনও তার ঘনত্ব বাড়ছিল, আবার কখনও ঘনত্ব কমে গিয়ে হয়ে যাচ্ছিল পালকের মতো হালকা। এই একই কারণে হয়তো বলটার রংও বদলে যাচ্ছিল থেকে-থেকেই। মাঝখান থেকে শুধু-শুধু ওই গোবেচারা পঞ্চানন দাস অজ্ঞান হয়ে গেল।

নাঃ, ব্যাখ্যাটা যে শান্তনু মজুমদারের পুরোপুরি মনের মতো হচ্ছিল তা নয়। কিন্তু এতগুলো কৌতূহলী মানুষকে তো নিরাশ করা যায় না। সুতরাং আপাতত এই অণুর গঠনের ব্যাপারটাই ওদের বলা যাক। এই ভেবে প্রফেসর মজুমদার বলতে শুরু করলেন। আর একই সঙ্গে ভাবছিলেন, আশ্চর্য এই বলটা নিয়ে আরও জটিল, আরও জোরালো গবেষণা তাঁকে করতে হবে। একেবারে গোপন গবেষণা—যার বিন্দুবিসর্গ অতুল আর বিমানকেও তিনি জানাবেন না।

বাইরের রাস্তায় তখন লোকজনের ভিড় কমতে শুরু করেছে।



বুদ্ধি যদি বৃদ্ধি পায়

সোমা! সোমা! শিগগির একটু বরফ নিয়ে এসো—' গলা ফাটিয়ে হাঁক ছেড়েছেন পুরন্দর, আর ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে একবার যাচাই করে নিয়েছেন ওটা ঠিকঠাক ফুল স্পিডে ঘুরছে কি না। পুরন্দরের মাথার ভেতরটা কীরকম অস্থির-অস্থির করছিল। মনে হচ্ছিল, দুজন ধুনুরি তাঁর মাথার ভেতরে বসে তোশক তৈরির কম্পিটিশান লাগিয়ে দিয়েছে।

বিকুন বেশ ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাবার দিকে। বরফ দিয়ে কী করবেন বাবা? মুখ লালচে, থমথমে। বিকুনকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আজ বোধহয় তাঁর অফিসটাই কামাই হয়ে যাবে!

এর মধ্যে মা-ও এসে হাজির হয়ে গেছেন। আটপৌরে শাড়ি পরে রান্না করছিলেন। হাতে হলুদের রং, মুখে বিনবিন ঘাম। বোঝা যায়, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও জরুরি হাঁক শুনে ছুটে এসেছেন।

সোমা বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে! ও-মা ও-মা করে ডাকছিস কেন? এখন আমার মরবার সময় নেই—।'

ও, রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দের জন্য মা তা হলে বরফ আনার ব্যাপারটা শুনতে পাননি! বিকুন ভাবল। আর বাবার 'সোমা' ডাককে বিকুনের 'ও-মা' বলে ভুল করেছেন।

পুরন্দর রাগ-থমথমে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'ও ডাকেনি, আমি ডেকেছি। জলদি ফ্রিজ থেকে একটু বরফ দাও—একটা রুমালে জড়িয়ে দিয়ো।'

'বরফ! বরফ দিয়ে এখন কী করবে? তুমি চান করতে যাবে না? এরপর অফিসে দেরি হয়ে গেলে আবার আমাকে—।'

পুরন্দর এবার ফেটে পড়লেন, 'বলছি তো জলদি বরফ নিয়ে এসো, আমার মাথায় দেব। ওকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আমার মাথাটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।'

সোমার ভুরু কুঁচকে গেল। বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, আবার কী ভুল করলি?'

বিকুন ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় গর্জন করে উঠলেন পুরন্দর, 'ভুল আবার কী! ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না। তোমার ছেলের মাথায় কিস্যু নেই। ও...ও একটা শম্বুক নাড়ুগোপাল!'

বিকুন তো একেবারে থ। শম্বুক মানে যে শামুক সেটা ও জানে। কিন্তু শামুক আর নাড়ুগোপালের মধ্যে কোথায় যে মিল তা ওর মাথায় ঢুকছে না। তা ছাড়া, ওই দুটি বস্তুর সঙ্গে বিকুনেরই বা মিল কোথায়!

সোমা জানেন, ভীষণ রেগে গেলে পুরন্দর বিকুনকে 'তোমার ছেলে' বলে অভিযোগ করেন।

তিনি কোনওরকমে ঠান্ডা করতে চেষ্টা করলেন উত্তেজিত পুরন্দরকে, 'আহা, কী হয়েছে বলবে তো—।'

পুরন্দরের কথা থেকে ব্যাপারটা জানা গেল। তিনি সাধারণ একটা আয়-ব্যয়ের অঙ্ক বোঝাতে বসেছিলেন বিকুনকে। তাতে রয়েছে, রামবাবু মাসে ২০০০ টাকা আয় করেন, আর প্রতি মাসে তাঁর ১৬০০ টাকা করে খরচ হয়। তা হলে বছরের শেষে তাঁর সঞ্চয় কত? তা অঙ্ক কষা তো দূরের কথা, বিকুনের বক্তব্য, প্রতি মাসে সমান টাকা খরচ হতে পারে না—বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই! বাবাকে সে স্পষ্ট জানিয়েছে, 'তুমিই তো সবসময় এ-কথা বলো—।'

ব্যস, অঙ্ক উঠেছে মাথায়। বাবা-ছেলেতে লেগেছে তর্ক। পুরন্দর যতই বোঝান, 'এটা অঙ্ক।' বিকুন ততই বলে, 'না, অঙ্কে ভুল আছে।'

বিকুন যে মাথা নীচু করে এবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে সেটা খেয়াল করেছেন সোমা। তাই পুরন্দরকে বলেছেন, 'তুমি যাও তো, তাড়াতাড়ি চান করে তৈরি হও। ও-অঙ্ক আমি বুঝিয়ে দেব—।'

ফোঁস করে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরন্দর উঠে পড়লেন। তিনি যে পড়াশোনায় বরাবরই তুখোড় ছিলেন এটা আর কাউকে বলা যাবে না। সবই নিয়তি।

বিকুনকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা কম নয়। কী করে ছেলেটা এমন বোকা-সোকা হল! কেন ওর মাথায় একফোঁটা বুদ্ধি নেই? অথচ ওর দিদি ঝুনু লেখাপড়ায় কী দারুণ! মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পাঁচটা বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছিল, তা ছাড়া স্টার তো বটেই। সামনের বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সারাদিন শুধু মন দিয়ে পড়ে। মা-বাবা তো ভালো করেই জানেন, ঝুনু সবাইকে খুশি করার মতো রেজাল্ট করবে। আর তারই ছোটভাইয়ের কিনা এই দুরবস্থা!

পড়াশোনা করতে বিকুনের যে খুব একটা খারাপ লাগে তা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগে গাছপালা, পাখি আর প্রজাপতি দেখতে। সেগুলো দেখে ও যেসব রঙিন ছবি আঁকে তা দেখে বড়দের তাক লেগে যায়। তা ছাড়া, কবিতা আবৃত্তি করতেও বেশ লাগে ওর। পাড়ার দু-একটা ফাংশানে ও কয়েকবার আবৃত্তি করে বেশ প্রশংসাও পেয়েছে। তখন তো বাবা-মা দুজনেই ওকে আদর-টাদর করেছিলেন! অথচ অঙ্ক আর বিজ্ঞানের মাথা না খুললে সেই দুজন মানুষই কেমন যেন হয়ে যান। আচ্ছা, সবাই কি সব পারে! কেন যে সবসময় দিদির কথা বলে বিকুনকে সবাই খোঁচা দেয় কে জানে! দিদি মোটেই ছবি আঁকতে পারে না। আর আবৃত্তির ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।

কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, বিকুনকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই বাবা-মা বেশ মুশকিলে পড়ে যান। এমনকী অপ্রস্তুতের একশেষও হয়েছেন এক-একবার।

এই তো গত সপ্তাহে সোনামাসিরা বেড়াতে এসেছিলেন বিকুনদের বাড়িতে। সোনামাসি ভীষণ ভালোবাসেন বিকুনকে। সবসময় ওর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। সেদিন সন্ধেবেলা মাসি-মেসো, ওঁদের দুই ছেলেমেয়ে—নিশানদাদা আর রীতাদিদি, মা-বাবা, ঝুনু-বিকুন—সবাই মিলে খুব হই হুল্লোড়, গল্পগুজব হচ্ছিল। তারই মধ্যে বিকুন ফস্ করে হঠাৎ বলে বসেছে, ‘সোনামাসি, জানো তো, স্কুলে বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধুমাস্টার বলে ডাকে।’

সোনামাসি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছেন, ‘সে আবার কী নাম!’

বিকুন বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছে, ‘বুঝলে না, যাদের মাথায় খুব বুদ্ধি— মানে, অনেক বুদ্ধিমানের মোট বুদ্ধির চেয়েও বেশি বুদ্ধি—তাদেরকেই বুদ্ধুমাস্টার বলে...বন্ধুরা বলেছে।’

হাসিঠাট্টার তাল কেটে গেল। সবাই চুপ। তারপর হাসিতে ফেটে পড়েছে নিশান, রীতা আর ঝুনু। বাবা আর সোনামেসো ওদের ধমক দিয়েছেন। বিকুন লক্ষ করেছে, মা-বাবার মুখ কেমন লালচে হয়ে গেছে। একটু পরেই মা ওকে নিয়ে চলে এসেছেন পাশের ঘরে। প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলেছেন, ‘তোর কি কোনওদিন এতটুকু বুদ্ধি হবে না মাথায়!’

হয়তো সেই কারণেই পরদিন সকালে ঝুনু রবীন্দ্রনাথের ‘মাকাল’ কবিতাটি বিকুনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছে, ‘তুই এবার থেকে শুধু এই কবিতাটাই আবৃত্তি করবি, বুঝলি?’ বলে ঝুনু বেরিয়ে গেছে কোচিং ক্লাসে।

বিকুন যখন সত্যি-সত্যিই সেটা মুখস্থ করে আবৃত্তির চেষ্টা করছিল তখন মা কোথা থেকে এসে ওকে থামিয়েছেন।

প্রায়ই এইরকম সব ব্যাপার হয় বলে বিকুন সবসময় ভাবে, ইস, আমার যদি সত্যি-সত্যি অনেক-অনেক বুদ্ধি হতো! মাঝে-মাঝে ও স্বপ্ন দেখে, চোখের পলকে কঠিন-কঠিন সব অঙ্ক কষে

ফেলছে, আর বাবা-মা চোখ ছানাবড়া করে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন।

ক'দিন পর ঠিক এইরকম অবস্থাই হল পুরন্দরের। সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আয়েশ করে খবরের কাগজ পড়াটা তাঁর রোজকার অভ্যেস। সেদিন কাগজের তিন নম্বর পৃষ্ঠার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর চোখ ছানাবড়া, মুখ হাঁ। তিনি ভুল দেখছেন না তো! সাতবার পড়ার পরেও যখন বিজ্ঞাপনটা এতটুকু পালটে গেল না, তখন তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। পাশের টেবিলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে যেতে লাগল, কিন্তু পুরন্দরের চোখ বিজ্ঞাপনের দিকে একেবারে গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা।

বিজ্ঞাপনটা এইরকমঃ

বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র
পরিচালকঃ ড. বিকাশ বর্ধন (বিদেশ প্রত্যাগত)
এই চিকিৎসা কেন্দ্রে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের
আই. কিউ./বুদ্ধি বাড়ানো হয়। আধঘণ্টায়
নিশ্চিত ফল। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তার নীচে সেই বিদেশ প্রত্যাগত ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে।

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সোমার নাম ধরে হাঁক পাড়লেন পুরন্দর। বিকুনের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার এরকম অপূর্ব সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে!

সোমা এসে হাজির হতেই পুরন্দর বিজ্ঞাপনটা ওঁকে দেখালেন। তারপর বললেন, 'আজ আর অফিস যাব না। ঝুনু কলেজে বেরিয়ে গেলে বিকুনকে নিয়ে চলো, আমরা এই সেন্টার থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখি না কী হয়!'

সোমা ইতস্তত করে বললেন, 'কত টাকা নেবে কে জানে! তা ছাড়া...ইয়ে...মানে, ঠকাবে না তো?'

'টাকার চিন্তা তুমি কোরো না—।' হাত নেড়ে জবাব দিলেন পুরন্দর, 'আর ঠকালেই হল! বিজ্ঞাপনে তো লিখেছে আধঘণ্টায় নিশ্চিত ফল। ফল না পেলে টাকা দেব কেন।'

সুতরাং বিকুনকে সঙ্গে নিয়ে সোমা এবং পুরন্দর কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক দশটার সময় বেরিয়ে পড়লেন বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধি অভিযানে। ট্যাক্সি ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র'র ঠিকানায়।

কেন্দ্রের চেহারাটা বেশ আহামরি। কাচের দরজা। তার ওপরে ডক্টর বিকাশ বর্ধনের নাম লেখা। নামের শেষে ডিগ্রি জানাতে ইংরেজি বর্ণমালার প্রায় ছাব্বিশটা হরফই ফুটকি দিয়ে বসানো। আর

তার পাশে 'বিদেশ প্রত্যাগত' ব্যাপারটাও জানানো আছে।

চেম্বারে ঢুকে একজন রিসেপশনিস্টের কাছে নাম-ধাম ইত্যাদি বিবরণ লিখে দিলেন পুরন্দর। তারপর সোমা আর বিকুনকে নিয়ে একটা লম্বা সোফায় বসলেন। ঘরে আরও কয়েকজন বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই কেমন একটা আশঙ্কার ভাব।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি একটা পার্সোনাল কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে ছিল, আর তার কি-বোর্ডের বোতাম টেপার ফাঁকে-ফাঁকে পাশে রাখা একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে কীসব কথা বলছিল। হঠাৎই ফোন নামিয়ে রেখে সে ডেকে উঠল, 'মিস্টার নকুল সামন্ত।'

ঘরের এককোণে বসে থাকা এক রোগামতন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি—।'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভেতরের দিকে যাওয়ার একটা কাচের দরজা দেখিয়ে বলল, 'যান, ভেতরে যান ছেলেকে নিয়ে।'

নকুল সামন্ত তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বিকুন এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। তিনটে কী সুন্দর-সুন্দর ক্যালেন্ডার! একটাতে পাহাড়ের ছবি, একটায় জঙ্গলের মাঝে হাতির পাল, আর একটাতে হাতে আঁকা নদী আর গাছপালা। এ ছাড়া, আরও একটা বিশাল রঙিন ছবি টাঙানো রয়েছে ঘরেঃ মানুষের মগজের ছবি। ছবিতে অনেকগুলো লাল-নীল তিরচিহ্ন আঁকা। তাদের পাশে-পাশে ইংরেজিতে অনেক কথা লেখা।

হঠাৎই ভেতরের দরজা ঠেলে তিনজন বেরিয়ে এল বাইরে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা, আর একটি বছর আটেকের মেয়ে। মেয়েটির চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বাইরের দরজার দিকে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই মেয়েটি হঠাৎ বিরক্তভাবে বলল, 'বাপি, আমার চশমার ডানদিকের লেন্সের ফোকাল লেংথটা ঠিক নেই—দু-মিলিমিটারের মতো গোলমাল রয়েছে।'

পুরন্দর লক্ষ করলেন, বাবা-মা বেশ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে-করতে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিকুনের ডাক পড়ল।

ভেতরের ঘরে ঢুকে তো সোমা আর পুরন্দরের একেবারে তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়। বিকুনও বেশ অবাক হয়ে গেল। ও হাঁ করে সবকিছু দেখতে লাগল।

বেশ বড় ঘর। ঘরটা সিনেমা হলের মতো ঠান্ডা। তার একপাশে বিশাল টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন বেঁটেখাটো একজন টাক-মাথা মানুষ। পোশাকে বেশ চেকনাই রয়েছে। গলায় স্টেথো,

ঠোটের ফাঁকে চুরুট। চুরুটটা নিভে গেলেও ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পাননি, কারণ মাঝে-মাঝেই ওটাকে নেড়েচেড়ে টান মারছেন। আর তাঁর মুখে সবসময়েই একটা হাসি লেগে রয়েছে।

ঘরের দেওয়ালে নানারকম রঙিন চার্ট আর ছবি টাঙানো। একপাশে নানা যন্ত্রপাতি আর একটা অদ্ভুত ধরনের গদিওয়ালা চেয়ার।

পুরন্দরদের দেখে ভদ্রলোক চুরুটটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর একগাল হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আসুন-বসুন। আমারই নাম ডক্টর বিকাশ বর্ধন। তবে ওটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম হরিপদ তলাপাত্র। বুঝতেই পারছেন, নামটাই এমন যে, ও-নাম শুনে রুগিটুগি বিশেষ আসত না। তাই নাম পালটে বিকাশ বর্ধন নাম নিয়েছি। নামটা এমনিতে বেশ ভালো—তার ওপর বুদ্ধি বাড়ানোর কাজ নিয়ে যখন আছি তখন "বিকাশ", "বর্ধন"—এইসব ক্যাচি ওয়ার্ডগুলো পেশেন্টদের মা-বাবাদের কাছে খুব এফেক্টিভ হবে।'

পুরন্দর আর সোমা হতবাক হয়ে ডাক্তারবাবুটিকে দেখছিলেন। ছদ্মনামধারী ডাক্তার! এঁর কাছে এসে ওঁরা ভুল করেননি তো! প্রায় ধপাস করেই ওঁরা দুজনে বিকাশ বর্ধনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লেন। সোমা হাত ধরে টেনে বিকুনকে বসিয়ে দিলেন নিজের পাশের চেয়ারটিতে।

'ডাক্তার জেঠু, আপনি ফরেনে গিয়েছিলেন?' ফস্ করে প্রশ্ন করে বসল বিকুন।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। বললেন, 'হ্যাঁ, জেঠু, ফরেন... ইয়ে...মানে নেপাল আর ভুটানে আমি অনেক বছর ছিলাম। ওখানেও এই বুদ্ধিতে শান দেওয়ার কাজ করতাম।'

'ডাক্তারবাবু, আমাদের এই ছেলেটার মাথায় ভীষণ বুদ্ধি কম। যদি আপনি ওর একটা ব্যবস্থা করেন...।' সোমা রীতিমতো কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন।

'নো প্রবেলম।' বলে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলেন বিকুনের কাছে। তারপর সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুদ্ধি বেশি হলে আমার কাছে কেউ আসে না।'

এইবার বিকুনকে লক্ষ্য করে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'বলো তো জেঠু, ইফ যদি ইজ হয়, বাট যদি কিন্তু হয়, হোয়াট মানে কী?'

বিকুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

ডক্টর বর্ধন হাতে হাত ঘষে আবার হাসলেন। বিকুনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'পারলে না তো! ওই সেনটেন্সটার মধ্যে, ইফ, ইজ, বাট আর হোয়াট শব্দগুলোর বাংলা মানে কায়দা করে বলা আছে।'

সোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ডাক্তারবাবুর ওপরে ওঁর ভরসা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

এইবার টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কী যেন পড়লেন ডক্টর বর্ধন। তারপর বিকুনের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ভালো নাম শুভঙ্কর মিত্র?'

বিকুন ঘাড় নাড়ল।

'বাঃ, চমৎকার নাম! এইবার এসো তো, শুভঙ্করবাবু, এদিকটায় এসে বসো তো এই চেয়ারটায়—।' বিকুনকে ডেকে বিশেষ ধরনের গদিওয়ালা চেয়ারটায় বসতে বললেন বিকাশ বর্ধন। তারপর সোমা আর পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আই. কিউ. মিটার দিয়ে ওর আই. কিউ.-টা প্রথমে একবার টেস্ট করে নেব।'

বিকুন ভয়ে-ভয়ে গদিওয়ালা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। ডক্টর বর্ধন কাপের মতো ছোট-ছোট চারটে টার্মিনাল লাগিয়ে দিলেন ওর মাথার চারপাশে। তারপর দূরে একটা বোর্ডের কাছে সুইচ অন করে একটা ডিজিটাল মিটারে কীসব দেখলেন। পরক্ষণেই সুইচ অফ করে আক্ষেপের 'চুকচুক' শব্দ করলেন, মাথা নাড়লেন ধীরে-ধীরে। বললেন, 'খুবই স্যাড ব্যাপার। শুভঙ্করকে নিয়ে আপনাদের তো প্রবলেম হবেই। ওর আই. কিউ. মাত্র ৮৮। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক বলা হয়, তাদের আই. কিউ. হয় ১০০। আর যাঁরা খুব নামকরা বিজ্ঞানী, তাঁদের আই. কিউ. জেনারেলি খুব বেশি হয়। যেমন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আই. কিউ. ছিল ১৪৬।'

পুরন্দর আমতা-আমতা করে বললেন, 'বিকুনের—মানে, শুভঙ্করের আই. কিউ.-টা ওইরকম বাড়িয়ে দেওয়া যায় না?'

ঘাড় নাড়লেন ডক্টর বর্ধন। হেসে বললেন, 'যায়, যায়, নিশ্চয়ই যায়। তবে বুঝেশুনে ধাপে-ধাপে বাড়াতে হবে—যাতে ও বুদ্ধিবৃদ্ধির চাপটা সইতে পারে। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওটা আমার ব্যাপার। আজ আমি কয়েকটা স্পেশাল ডোজ দিয়ে ওর বুদ্ধি বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওর ব্রেনের, মানে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্যারিটাল লোব আর ফ্রন্টাল লোবে একটু এক্সাইটিং সিগনাল দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। নানারকম সেন্স আর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি প্যারিটাল লোব থেকেই জন্ম নেয়। আর ফ্রন্টাল লোবের কাজ হল যুক্তিপ্রয়োগ আর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সাহায্য করা। এই দুটো লোবকে একটু চাঙ্গা করে দিলেই শুভঙ্করের বুদ্ধি বেড়ে যাবে। তবে এই বাড়তি বুদ্ধির এফেক্ট মাত্র তিনদিন—মানে ৭২ ঘণ্টা থাকবে। যদি ব্যাপারটা ঠিকমতো শুভঙ্করের সুট করে যায় তা হলে আর কোনও প্রবলেম নেই—তিনদিন পর ওকে নিয়ে আসবেন, ওই বর্ধিত বুদ্ধিটা একেবারে পারমানেন্ট করে দেব। মানে, কংক্রিট ঢালাই যাকে বলে—।'

কথা বলতে-বলতে শুভঙ্করের চেয়ারের মুখোমুখি রাখা কয়েকটা লোহার স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেছেন ডক্টর বর্ধন। তারপর একটা বড় বাক্স থেকে চারটে বড়-বড় চাকতি বের করে পাশাপাশি দাঁড় করানো স্ট্যান্ডগুলোয় ফিট করে দিয়েছেন। চক্রগুলোয় দাবার ছকের মতো কালো-সাদা ছক কাটা রয়েছে। সেই ছকগুলো চক্রের কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে মাপে ক্রমশ বড় হতে-হতে এগিয়ে এসেছে চক্রের কিনারায়।

বিকাশ বর্ধন কোথায় কী একটা বোতাম টিপে দিতেই চক্রগুলো ধীরে-ধীরে ঘুরতে শুরু করল।

এইবার সুইচ টিপে ঘরের সবক'টা আলো নিভিয়ে দিলেন তিনি। তারপর হঠাৎই দেখা গেল চারটে জোরালো আলোর ছটা এসে পড়েছে চারটে চক্রের ওপরে। বিকুনের মাথায় লাগানো টার্মিনালগুলো পালটে দিয়ে আরও কীসব সুইচ খটাখট করে বিকাশ বর্ধন গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিকুনবাবু, তুমি পালা করে পরপর ওই চারটে চক্রের দিকে একমনে তাকিয়ে যাও। লক্ষ্মী ছেলে! দেখবে, একটু পরেই তোমার বুদ্ধি বেড়ে যাবে। আর তোমার লেখাপড়ার খিদে এমন বেড়ে যাবে যে, সবাই একেবারে চমকে যাবে।'

হালকা আলোর আভায় বিকাশ বর্ধনের মুখ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর চোখেমুখে উৎসাহ আর আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

বিকুন কেমন যেন ঝিমুনির ঘোরের মধ্যে বলে উঠল, 'ডাক্তার জেঠু, শুধু চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই তোমার বুদ্ধি একেবারে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।'

'আমার মাথার ভেতরটা কেমন চুলকোচ্ছে—' বিকুন একটু ভয়ার্ত গলায় বলল, 'যেন অনেকগুলো শুঁয়োপোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে...।'

'ইউরেকা! শুঁয়োপোকা! ব্রেনোটিকা!' উৎফুল্ল হয়ে হাতে হাত ঘষলেন বিকাশ বর্ধনঃ 'সাকসেসফুল, মিস্টার মিত্র, সাকসেসফুল! ওই শুঁয়োপোকার ব্যাপারটাই হল আসল—মানে, ওটাই হল মগজের ভেতরে বুদ্ধির কামড়। আর কোনও চিন্তা নেই আপনাদের। আজ বুধবার। আপনারা শনিবার এরকম সময়ে শুভঙ্করকে আমার এখানে নিয়ে আসুন—তখন একেবারে ফাইনাল ঢালাই করে দেব।'

মাত্র ৫০০ টাকা নিলেন বিকাশ বর্ধন। পুরন্দর যা ভেবেছিলেন তার তুলনায় বলতে গেলে একেবারে জলের দর।

'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র' থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে সোমা চাপা গলায় পুরন্দরকে জিগ্যেস করলেন, 'কী গো, ডাক্তারবাবু তো বললেন ওর বুদ্ধি বেড়ে গেছে, কিন্তু আমরা বুঝব কেমন করে!'

বিকুন মা-বাবার একটু আগে-আগে হাঁটছিল। হঠাৎই পিছনে তাকিয়ে সোমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'মা, তুমি একটু সাবধানে হাঁটো। এ-জায়গাটার মেঝের সঙ্গে তোমার জুতোর হিলের কোইফিশেন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন ভীষণ কম। সাবধানে না হাঁটলে তুমি পা পিছলে পড়ে যাবে —।'

সোমা বিকুনের কথা শুনতে-শুনতে সত্যিই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন, পুরন্দর ওঁকে সময়মতো ধরে ফেলে পদভঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তারপর অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ফ্রিকশন বললি?'

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বিকুন বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, 'স্ট্যাটিক কোইফিশেন্ট অফ ফ্রিকশন—স্থিতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। মেঝের সঙ্গে মায়ের জুতোর হিলের যে ঘষা লাগছে তা থেকে এটা হিসেব কষে বের করা যায়। সে ভীষণ জটিল ব্যাপার...।'

পুরন্দর ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু খুশিও হলেন ভেতরে-ভেতরে। ঘণ্টা দেড়েক আগে শোনা আট বছরের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। চশমার লেন্সের ফোকাল লেংথের গোলমাল নিয়ে কী যেন বলছিল মেয়েটা। এইটুকু এইটুকু বাচ্চা ছেলেমেয়ে এরকম সব দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলছে! বিকাশ বর্ধনের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে কি এইরকমই হয়?

বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকবার পুরন্দর আর সোমাকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হল। কারণ ফ্রিকশনের কীসব দিয়ে শুরু করেছিল বিকুন, পথে গতিবেগ, ত্বরণ, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের শতকরা হিসেবের গরমিল, বুলবুলি পাখি কেন সাধারণত জোড়ায়-জোড়ায় থাকে, পিঁপড়ে কেন লাইন ধরে চলে—এসব বিষয় নিয়ে পুরন্দর আর সোমাকে প্রায় কাহিল করে দিল।

দুপুরে বাড়ি ফিরে পুরন্দর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র'র গোটা ব্যাপারটা তাঁর কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

একটু দম নিয়ে পুরন্দর যখন স্নান করতে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন, বিকুন স্নানটান সেরে ডাইনিং টেবিলে বসে অঙ্ক বই নিয়ে একমনে পাতা ওলটাচ্ছে। পুরন্দর খুশি হলেন। যাক, ছেলেটার তাহলে অঙ্কে আগ্রহ বেড়েছে!

তিনজনে যখন খাওয়া শুরু করলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পুরন্দর গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, 'অঙ্ক বই নিয়ে কী করছিলি?'

একগ্রাস ভাত মুখে পুরে দিয়ে বিকুন নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্কগুলো একবার করে কষে নিলাম।'

পুরন্দরের খাওয়া থেমে গেল।

সোমার হাতে ধরা ডালের হাতা থেকে ডাল চলকে পড়ে গেল।

মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলেছে বিকুন!

পুরন্দর তাকালেন সোমার দিকে। সোমার কপালে ভাঁজ পড়েছে। ওঁরা দুজনে হাঁ করে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

এরপর প্রায় দেড় দিন বিকুন শুধু বইপত্র নিয়ে কাটাল।

নিজের যত বইখাতা তার সমস্ত লেখা গোগ্রাসে গিলল। তারপর শুরু করল তিনরকম ডিক্‌শনারি আর দিদির বই। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে পাড়ার লাইব্রেরিতে হানা দিল। এ ছাড়া, আরও কোথায়-কোথায় যে ও ঘুরে বেড়াল কে জানে!

যতক্ষণ ছেলেটা বাড়িতে থাকে ততক্ষণই নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ওর যত অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা।

একদিন সন্ধেবেলা ঝুনু মাকে বলছিল, পাশেই ওর বন্ধু অরুণাদের বাড়িতে যাবে ভিডিয়োতে সিনেমা দেখতে। বিকুন ইংরেজি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। ফস্‌ করে জিগ্যেস করল, 'দিদি, বলতো, ভিডিয়ো কথাটার মানে কী?'

ঝুনু ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল মায়ের দিকে। ওর মুখ বেজার। এ আবার কী বিপদ!

বিকুন বলল, 'ভিডিয়ো মানে হচ্ছে, আমি দেখি। তেমনই অডিয়ো মানে হচ্ছে, আমি শুনি। এ দুটোই ল্যাটিন শব্দ।'

ঝুনু বেশ ভয়ের চোখে ভাইকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিন রাতেও সেই একই ব্যাপার।

রেডিয়োতে গান শোনা পুরন্দরের বরাবরের অভ্যাস। নিজে এককালে সংগীতচর্চা করতেন, হয়তো সেইজন্যই। ট্রানজিস্টর রেডিয়ো হাতে নিয়ে মেজাজে আধুনিক গান শুনতে-শুনতে এঘর-ওঘর আর বারান্দা করছিলেন তিনি। বিকুন হঠাৎই বলে উঠল, 'বাবা, বড্ড ডপ্‌লার এফেক্ট হচ্ছে।'

'ডপ্‌লার এফেক্ট!' পায়চারি থামিয়ে চোখ কপালে তুললেন পুরন্দর।

'জানো না, চলতে-চলতে শব্দ করলে সেই শব্দ যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শোনে, তার মনে হয় শব্দের কম্পাঙ্ক পালটে গেছে!'

পুরন্দরের বিষয় ছিল ইকনমিক্স। ডপ্‌লার কী-না-কী—এই ব্যাপারটা বোধহয় বিজ্ঞানের। কিন্তু তিনি ধৈর্য না হারিয়ে বিকুনের খুব কাছে এসে মোলায়েম গলায় জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা আর-একটু খোলসা করে বল তো—ঠিক বুঝলাম না।'

বিকুন নড়েচড়ে বসল। বলল, 'শোনো। তুমি ধরো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ। আর দূর থেকে হুইসল বাজিয়ে ট্রেন আসছে। তখন তোমার কানে হুইসলের শব্দটা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ শোনাবে। মানে হুইসলের শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে বলে মনে হবে। আবার এর উলটোটাও হতে পারে। ট্রেন যখন হুইসল বাজিয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে তখন সেই শব্দের তীক্ষ্ণতা অনেক কম মনে হবে। এই ব্যাপারটা প্রথম ব্যাখ্যা করেন অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী সি. জে. ডপ্‌লার।'

পুরন্দর ছেলের কথা শুনতে-শুনতে রেডিয়োর সুইচ অফ করে দিয়েছিলেন। এবার হাঁ করে নিজের ছেলেকে দেখতে লাগলেন।

বিকুন এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, ‘এরকম করে তাকিয়ে থেকো না, বাবা, তোমার রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। রেটিনায় যেসব রড আর কোন রয়েছে...।’

পুরন্দর ছেলেকে বাধা দিলেন, ‘থাক, থাক, আর তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—।’

তখন বিকুন বলল, ‘বড্ড গরম লাগছে। পাখার আর. পি. এম.-টা একটু বাড়িয়ে দেবে, বাবা?’

‘আর. পি. এম.!’

‘রিভোলিউশান্‌স পার মিনিট—সংক্ষেপে আর. পি. এম.। তোমরা যাকে চলতি কথায় স্পিড বলো আর কী!’

পাখার স্পিড বাড়িয়ে ফুলস্পিড করে দিলেন পুরন্দর। তারপর মানে-মানে সরে পড়লেন ছেলের কাছ থেকে।

রাতে এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে একটু আলোচনা করতে চাইলেন পুরন্দর।

সোমা প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় নিজের হেনস্থার কথা জানালেন স্বামীকে। বললেন, ‘আর বোলো না! আজ সকালে বিকুন রান্নাঘরে ঢুকে আমাকে খাবার-দাবারের ক্যালরি, মেটাবলিজ্‌ম, গ্যাসের দহন, পরিবেশ দূষণ এসব নিয়ে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। তারপর বলে কী, নুনের মধ্যে আছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন। নুন নোনতা। আর চিনির মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। চিনি মিষ্টি। এরকম তফাত হল কেন? তারপর টাই্‌অ্যালিন নামে কী একটা জিনিসের নাম করে বলল, ওটা নাকি একটা এনজাইম, আমাদের থুতুর মধ্যে আছে। আবার সেটার বানান নাকি ‘পি’ অক্ষর দিয়ে শুরু। আমি তখন তরকারিতে হলুদগুঁড়ো দিচ্ছিলাম, বলে কি হলুদের মধ্যে কী-কী রাসায়নিক উপাদান আছে বলো তো মা।’সোমা কাতর গলায় অনুযোগ করে বললেন, ‘তুমি বলো, এসব আমি কখনও বলতে পারি?’

পুরন্দর সিগারেট খাচ্ছিলেন। তাতে হিংস্রভাবে এক লম্বা টান মেরে বললেন, ‘বিকাশ বর্ধন বলেছিলেন, ঠিক তিনদিন এর এফেক্ট থাকবে। তিনদিন শেষ হতে আর কত ঘণ্টা বাকি আছে বলো তো?’

সোমা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, ‘প্রায় সাঁইতিরিশ ঘণ্টা!’

সাঁইতিরিশ ঘণ্টা! সাঁইতিরিশ ঘণ্টা বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধির এফেক্ট ঠিকমতো সহ্য করতে পারলে হয়! ভাবলেন পুরন্দর।

ব্যাপারটা যে ঝুনুর পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা পরদিন ওর অসহায় অবস্থা দেখেই বোঝা গেল। ও মাকে এসে অভিযোগ জানাল, বিকুনের সঙ্গে এক ঘরে বসে ও আর পড়বে না। বিকুন প্রায় মিনিটে-মিনিটে ওকে থামিয়ে দিয়ে কীসব উলটোপালটা বোঝাচ্ছে।

সোমা ঝুনুকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঝুনুর তখন শান্ত হওয়ার মতো মনের অবস্থা আর নেই। ও প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'সব তো মনে নেই...তবুও ওর যে ক'টা প্রশ্ন মনে আছে শোনো। ওডোমিটার কাকে বলে? ইংল্যান্ডের কোন রাজা ইংরেজি বলতে পারতেন না? জেরান্টোলজিস্টরা কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন? মোটরগাড়ির চাকায় খাঁজ কাটা থাকে কেন? বাংলাভাষায় কোন তিনটে অক্ষরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি? ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে বিজ্ঞানী স্টিফেন কী যেন...।'

সোমা সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'এ কী বিপদে পড়লাম বল তো! এ কী সর্বনাশ হল আমাদের!'

ঝুনু হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আর সর্বনাশ! অপর্ণাদি বলেছেন বিকুন সামনে বসে থাকলে উনি আমাকে আর পড়াবেন না।'

অপর্ণাদি ঝুনুর প্রাইভেট টিউটর। সোল ক্যালকাটা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। প্রায় তিনবছর ধরে ঝুনুকে পড়িয়ে আসছেন।

সোমা কান্না থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে জিগ্যেস করলেন, 'সে কী! অপর্ণাদিকে বিকুন আবার কী করেছে?'

'কী আবার, ওই আই. কিউ.-র ওভারডোজ!' বিরক্তভাবে বলল ঝুনু।

সোমা দুশ্চিন্তায় চোখ বুজে ফেললেন। বোধহয় ভগবানের নাম-টাম নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সত্যি, শেষ পর্যন্ত কী যে হবে কে জানে! ছেলেটা এ দু-দিনে একটাও ছবি আঁকতে বসেনি, এক লাইনও কবিতা আওড়ায়নি। বারান্দায় একটিবারও যায়নি গাছপালা বা পাখি দেখতে। তা ছাড়া, বিকেলে আজ আর খেলতে বেরোয়নি। কাল সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর গলায় মাকে বলেছে, 'আমি আর টিটো, তাতন, চুনির সঙ্গে খেলব না। ওরা আমার সঙ্গে খেলতে চাইছে না।'

সোমা ব্যাপারটা খানিক যেন আঁচ করতে পারলেন। তবু জানতে চাইলেন, 'সে কী রে, কেন?'

বিকুন গজগজ করতে-করতে উত্তর দিল, 'কে জানে কেন! আমি কাল বল খেলার সময় ওদের বারনুলির থিয়োরেম আর ম্যাগনাস এফেক্টের কথা জিগ্যেস করেছিলাম। তাতে ওরা কেমন ভয় পেয়ে গিয়ে আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল।'

সোমা অবাক হলেন না। কারণ আজ প্রায় একই কারণে বিকুনের স্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই ফোন করেছিলেন পুরন্দরের অফিসে। ফোন করে তিনি বলেছিলেন, 'আপনার ছেলের মাথায়

বোধহয় সামান্য কিছু প্রবলেম হয়েছে। সেটা সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওকে সুকলে পাঠাবেন না। মাস্টারমশাইরা কেন জানি না খুব ভয় পেয়ে গেছেন।'

সোমা বেচারা ঝুনুকে একবার দেখলেন, তারপর আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ডক্টর বর্ধনের হিসেবমতো এখনও প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা বাকি।

চোদ্দো ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা বিকুন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সেটুকু সময়ই যা নিশ্চিন্ত! বাকি সময়টা পুরন্দর-সোমা বেশ ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছেন। ছেলেকে আশেপাশে দেখতে পেলেই পুরন্দর হয় বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছেন নয়তো সটকে পড়েছেন রাস্তায়। আর সোমা কাজের ছুতো করে সারাক্ষণ এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। ঝুনু বিজ্ঞ ভাইয়ের কবল থেকে বাঁচতে বইপত্র নিয়ে চলে গেছে অরুণাদের বাড়ি।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিকুনকে ঘিরে জড়ো হল সবাই। ও তখন একমনে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে। তখনকার মতো ওরা সরে গেলেও ঘুরে-ফিরে নজর রাখতে লাগল বিকুনের ওপরে। একটু পরেই দেখা গেল বিকুন ইংরেজি কাগজের ক্রসওয়ার্ডটা চটপট সল্‌ভ করছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই বিকুন মুখ তুলে বাবা-মা-দিদিকে একবার সামান্য অবাক চোখে দেখল, তারপর আবার মন দিল শব্দছকের দিকে।

পুরন্দর আজ অফিস কামাই করেছেন। ঝুনুও কলেজে যায়নি। বিকাশ বর্ধনের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আজ বারোটা নাগাদ তাঁর অভিনব চিকিৎসার এফেক্ট শেষ হওয়ার কথা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে পুরন্দর বিকুনের কাছে হাজির থাকতে চেয়েছেন। কে জানে, নতুন করে আবার কোনও বিপত্তি হবে কি না! ঝুনুও একই আগ্রহে ক্লাস ডুব মেরেছে। আর সোমা বারবার তাকাচ্ছেন দেওয়াল ঘড়ির দিকে। সময়টা ঠিক কখন?

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘটনাটা ঘটল। শব্দছকের শেষ শব্দটা খুঁজতে গিয়ে আটকে গেল বিকুন। ওর দুচোখে কেমন এক শূন্যদৃষ্টি। একটা হাত এলোমেলোভাবে মাথায় বোলাচ্ছে। ওর মুখ থেকে 'উঃ', 'আঃ', 'ইস' ইত্যাদি টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছে থেকে-থেকে।

পুরন্দর অতি উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কীরে, লাস্ট শব্দটা পারছিস না?'

বিকুন কেমন বিমূঢ় গলায় জবাব দিল, 'না। দেখো না, শব্দটা একেবারে মাথায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু ফস্ করে কী যে একটা ওলটপালট হয়ে গেল...।'

পুরন্দর খুশির এক চিৎকার করে সোমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একছুট্টে ওর অঙ্ক বইটা নিয়ে আসি। ওটা দিয়েই ফাইনাল টেস্ট করব...।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুরন্দর ঘর থেকে উধাও। আর সোমা বিকুনের কাছটিতে এসে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ঝুনু তখনও অবাক চোখে ভাইকে দেখছে।

বলতে গেলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই পুরন্দর সেই অঙ্ক বই নিয়ে বিকুনের সামনে এসে হাজির, এবং চোখের পলকে আয়-ব্যয়ের সেই সহজ অঙ্কটি মেলে ধরেছেন ছেলের সামনে।

'বল তো! এই সহজ অঙ্কটা মুখে-মুখে বুঝিয়ে দে তো আমায়।'

বিকুন গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে অঙ্কটা রিডিং পড়ল। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মন্তব্য করল, 'অঙ্কটায় ভুল আছে, বাবা। প্রতি মাসে কখনও সমান টাকা খরচ হতে পারে না। বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই!'

আর যায় কোথায়! পুরন্দর হাত-পা শূন্যে ছুড়ে পাক্কা দু-হাত লাফিয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'হিপ হিপ হুররে! সোমা, দ্যাখো, দ্যাখো, বিকুন আবার অঙ্কে কাঁচা হয়ে গেছে। ওঃ, বাঁচা গেল!'

সোমা ছেলেকে একেবারে জাপটে ধরলেন। ওঁর চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, 'বুঝলে, আমার বোকাসোকা সুন্দর ছেলেটাই অনেক ভালো। ওর মুখটা কী মিষ্টি! কী সুন্দর আঁকতে পারে ও! আর আবৃত্তিতে তো একেবারে চ্যাম্পিয়ান! আমার আর বুদ্ধিমান ছেলের দরকার নেই গো!'

ঝুনু বিকুনের ছোট্ট মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নরম গলায় বলল, 'মা, যা স্বাভাবিক তাকে কখনও চাপ দিয়ে বোধহয় পালটাতে নেই। পালটালে তার ফল ভালো হয় না—।'

পুরন্দর হেসে বললেন, 'এইজন্যেই কথায় বলে, খোদার ওপর খোদকারি করতে নেই। আমি যাই, যতই বেলা হোক, এককেজি মুরগির মাংস নিয়ে আসি। বিকুনের অনারে আজকের স্পেশাল মেনু কষা মাংস আর পরোটা উইথ জলপাইয়ের চাটনি। ঝুনু, আজ তুই মায়ের সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাবি।'

বাজারের থলে হাতে বেরোনোর সময় সোমার কানের কাছে মুখ এনে পুরন্দর চাপাগলায় বললেন, 'ভাগ্যিস হরিপদ তলাপাত্রের কথায় বিকুনের বুদ্ধিটা ফাইনাল ঢালাই করিনি! তা হলে এক্ষুনি হয়তো ছেলেটা আমাকে মুরগির মাংসের কেমিক্যাল কম্পোজিশন জিগ্যেস করে বসত।'

স্বামীর কথায় সোমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

দুপুরের রোদ তখন জানলায় খেলা করছে।



ভোলাকে ভোলা যাবে না কিছুতেই

না, ভোলাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যাবে না। তার মানে এমন নয় যে, আমি ওকে ভুলতে চেষ্টা করেছি। বরং এটাই আমি সাদা-কালোয় জানাতে চাই, ওকে ভুলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও এমন সব কাণ্ড করেছিল যে, এই তিরিশ-বত্রিশ বছরেও ওর ছবিটা এতটুকু মলিন হয়ে যায়নি।

অনেকে ভাবতে পারেন, এ আর এমনকী! অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকেই তো আমরা চিরদিন মনে রাখি! তা হলে ভোলাকে ভুলতে না পারার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে!

আছে এই কারণেই যে, ভোলা মানুষ নয়—রোবট।

এইবার বলুন, আজকের এই কলকবজার যুগে একটা যন্ত্রের কথা এতবছর ধরে কেউ মনে রাখতে পারে—যদি না সেই যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত কিছু থাকে!

আজ সেই ভোলার কথাই বলব।

খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গিয়েছিল। আমার বাবা যখন আমাকে নিয়ে বেজায় হিমশিম খাচ্ছে, তখনই 'এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি' থেকে ভোলাকে নিয়ে আসে। ভোলা ছিল ভি. এক্স.-থ্রি মডেলের 'ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট', অর্থাৎ, গৃহস্থের উপযুক্ত সঙ্গী রোবট।

এসব কথা আমি বড় হয়ে বাবার কাছে শুনেছি।

ছোটবেলা থেকেই ভোলাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়াটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। একবারের জন্যেও মনে হয়নি ও যন্ত্রদাস কিংবা রোবট।

ভোলার চেহারায় চোখে পড়ার মতো আলাদা কিছু ছিল না। ও যে আসলে কী, সেটা ওকে দেখে একটুও বোঝা যেত না। তবে চলাফেরা কথাবার্তায় ব্যাপারটা আঁচ করা যেত।

ভোলার মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখটা গোল ধরনের। চোখজোড়া সবসময়েই ছানাবড়া—যেন কোনও কিছু দেখে অবাক হয়ে গেছে। গায়ে রংচঙে হাফশার্ট, পায়ে ডোরাকাটা পাজামা। হাত-পাগুলো সরু-সরু হলেও তেমন বেমানান নয়। আর উচ্চতা ছিল চার ফুট।

ভোলার সঙ্গে খেলাধুলো করে আমার দিব্যি সময় কাটত। খেলতে-খেলতে আমি একসময় হাঁফিয়ে পড়তাম, ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ধপাস করে বসে পড়তাম মেঝেতে।

ভোলা কিন্তু মোটেই ক্লান্ত হতো না, হাঁফাত না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছানাবড়া চোখে আমাকে দেখত। তারপর জিগ্যেস করত, 'কী হল, ভাইটি, আর খেলবে না?'

আমি বলতাম, 'না, ভোলা, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তোমার লাগছে না?'

'না, গো—আমার টায়ার্ড হওয়ার জো নেই।'

আমি অবাক হয়ে ভোলাকে দেখতাম। ভাবতাম, মানুষের চেয়ে যন্ত্রই ভালো—ইচ্ছেমতন যতক্ষণ খুশি খেলতে পারে।

প্রথম-প্রথম ভোলাকে আমি 'ভোলাদা' বলতাম। কিন্তু বাবা একদিন শুনতে পেয়ে আমাকে বারণ করলঃ 'কী বলছ, সন্তু! রোবট আবার দাদা কীসের! ওকে তুমি নাম ধরেই ডাকবে—যেমন আমি ডাকি।'

ভোলা কিন্তু বরাবর আমাকে 'ভাইটি' বলেই ডাকত।

আমরা দুজনে সমসময় একসঙ্গে থাকতাম। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে ভোলার কাছে আমাকে নিশ্চিন্তে রেখে যেত।

আমার স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই ভোলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। বড় রাস্তা পার করে বাস ধরে আমাকে পৌঁছে দিত স্কুলে। তারপর সারাক্ষণ স্কুলের বাইরে একটা গাড়িবারান্দার নীচে বসে অপেক্ষা করত।

স্কুল ছুটি হলে আবার আমাকে আগলে নিয়ে আসত বাড়িতে।

ওকে নিয়ে সবচেয়ে ঝামেলা হতো পরীক্ষার সময়। সবসময় কানের কাছে বলত, 'ভালো করে পড়ো, ভাইটি, ভালো করে পড়ো।' বাবা যত না বলত তার চেয়ে অনেক বেশি বলত ভোলা। পড়তে-পড়তে যখন আমি ঘুমে ঢুলে পড়তাম তখন ভোলা আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকতঃ 'ভাইটি, লক্ষ্মী আমার, ঘুমিয়ো না। কাল যে পরীক্ষা!'

আমি চোখ ডলে ঘুম তাড়িয়ে আবার পড়তে শুরু করতাম। কিন্তু খুব রাগ হতো ভোলার ওপর। বলতাম, 'তোমার কি কখনও ঘুম পায় না!'

ভোলা হাসত। হাসলে ওর ঠোঁটটা সামান্য চওড়া হতো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'ঘুম পেলে আমাদের চলে না, ভাইটি।'

অনেকসময় এমন হয়েছে যে, ইতিহাস পড়তে-পড়তে ভীষণ বিরক্ত হয়ে 'চটাস' শব্দে বই বন্ধ করে ফেলেছিঃ 'দুর, কিচ্ছু মুখস্থ হতে চাইছে না! বারবার ভুলে যাচ্ছি।'

ভোলা তখন বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়েছেঃ 'কই, আমায় বইটা দাও দেখি! কোন জায়গাটা বলো তো...।'

ওকে পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, 'শুধু সাল-তারিখ আর গুচ্ছের রাজা-বাদশার নাম! এসব কখনও সহজে মুখস্থ হয়!'

ভোলা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে দু-পলক তাকাল, তারপর বইটা বন্ধ করে বলল, 'নাও, তুমি এবার চোখ বুজে শুনে যাও। একমনে শুনবে কিন্তু...।'

ব্যস! ভোলা গড়গড় করে পৃষ্ঠাগুলো মুখস্থ বলে যেত আমার কানের কাছে। আর আমি ওর তাকলাগানো ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ওর মুখে শুনতে-শুনতে ইতিহাসের পড়া দিব্যি মুখস্থ হয়ে যেত।

আমি ভোলাকে বলতাম, 'আমার বদলে তুমি পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট অনেক ভালো হতো।'

ভোলা প্রতিবাদ করে বলত, 'না, ভাইটি, আমি ফেল করতাম। কোথা থেকে কোন পর্যন্ত লিখতে হবে সেটাই তো আমি বুঝতে পারি না!'

'তা হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি পরীক্ষা দেব।'

আমার এই অদ্ভুত বায়না শুনে ভোলা হেসে বলত, 'ভাইটি, এভাবে পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই।'

আমি ওর কথাটা মন দিয়ে ভাবতাম। এতসব ও বোঝে কেমন করে!

আমার সঙ্গী হয়ে সময় কাটানো ছাড়াও কিছু-কিছু বাড়তি কাজ ভোলাকে করতে হতো। যেমন, বাবার ফাইফরমাশ খাটা, দোকানে যাওয়া, টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিকের বিল জমা দিয়ে আসা—এইসব। কিন্তু এত কাজ করেও ভোলাকে কখনও বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। ওকে যদি জিগ্যেস করতাম, 'এত কাজ করতে-করতে কখনও তোমার বিরক্ত লাগে না?' তা হলে ও হয়তো হেসে বলত, 'বিরক্ত হলে আমাদের চলে না, ভাইটি।'

আমার দেখাদেখি ভোলা বাবাকে 'বাবা' বলেই ডাকত। বাবার অফিসের ব্যাগটা হাতে তুলে দিত, জুতো পালিশ করে দিত, বাবা কখন অফিস থেকে ফিরবে জিগ্যেস করত, সাবধানে যাতায়াত করার জন্যে পরামর্শ দিত।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বাবা মাঝে-মাঝে আমাকে বলত, 'একটা ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবটের কাছ থেকে এত সার্ভিস পাব ভাবিনি।'

আমি কোনও জবাব দিতাম না। তবে ভোলার সঙ্গে 'রোবট', 'সার্ভিস', এই শব্দগুলো জুড়ে কথা বলাটা আমার ভালো লাগত না।

একদিন আমরা তিনজনে ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—আমি, বাবা, আর ভোলা। ছবিটার নাম 'দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক'। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আর নাচ-গান নিয়ে দারুণ জমাটি ছবি। হল থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎই শুনলাম ভোলা গুনগুন করে গান গাইছেঃ 'ডো আ ডিয়ার, আ ফিমেল ডিয়ার/রে আ রে অফ গোল্ডেন সান/ মি আ নেম আই কল মাইসেল্‌ফ...।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ভোলা, ছবি কেমন লাগল?'

ভোলা বলল, 'দারুণ! যদিও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।'

বাবা হেসে বলল, 'যাক, ভোলা অন্তত সত্যি কথাটা বলেছে!'

আমি বললাম, 'রোবটরা মিথ্যে কথা বলে না, বাবা।'

ফেরার পথে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখনও আমরা একটা খালি ট্যাক্সি জোগাড় করতে পারিনি। ছাতা সঙ্গে না থাকায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করছি।

হঠাৎই একটা বিশাল অফিসবাড়ির আড়ালের এক অন্ধকার কোণ থেকে তিনটে ছায়া এগিয়ে এল আমাদের দিকে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পরনে টি-শার্ট আর চোঙা প্যান্ট।

খুব কাছাকাছি এসে একটা ছেলে বাবাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদা, ফুলকি হবে, ফুলকি?'

বাবা থতোমতো খেয়ে বলল, 'ফু-ফুলকি...মানে?'

তখন পাশ থেকে তার এক সঙ্গী কড়া মেজাজে মন্তব্য করল, 'আরে ফুলকি মানে আগুন—সালা ন্যাকাষষ্ঠী!' একটা সিগারেট কোথা থেকে বের করে ঠোঁটে রাখল সে।

এইবার বাকি দুজন বাবার দু-পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'মালকড়ি যা আছে ঝটপট দিয়ে দে।'

তিননম্বর ছেলেটা একটা ক্ষুর বের করে বাবার গলার পাশটায় চেপে ধরল।

আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া, কাছাকাছি এমন কাউকে চোখেও পড়ল না যে আমাদের বিপদে এগিয়ে আসবে।

হঠাৎই ভোলা দিব্যি স্বাভাবিক গলায় আমায় বলল, 'ভয় পেয়ো না, ভাইটি। দেখছি কী করা যায়।' তারপর ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করে ঠান্ডা এবং শান্ত গলায় বলল, 'বাবাকে ছেড়ে দাও। তা হলে তোমাদেরও আমি ছেড়ে দেব।'

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছেলে তিনটে খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল।

একজন পেটে হাত চেপে হাসতে-হাসতে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল। তারপর কোনওরকমে হাসির দমক কমিয়ে বলল, 'লে, চারফুটিয়া কী বলছে শোন।' তারপর বাচ্চাদের আধো-আধো উচ্চারণে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'ওলে বাবা! বিলাট মাছতান এচে গ্যাচে! পালা, পালা, ছিগ্‌গিল পালা!'

কথা বলতে-বলতে ছেলেটা ভোলাকে লক্ষ্য করে লাথি চালিয়েছে। ভোলা কিন্তু নড়ল না—চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোহার সঙ্গে মানুষের পায়ের সংঘর্ষ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে বিকট চিৎকার করে ছেলেটা বসে পড়ল রাস্তায়। ডান পা-টা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, আর কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

ক্ষুর হাতে ছেলেটা ভোলার মুখ লক্ষ করে অস্ত্রটা চালাল। ভোলা বাঁ-হাতে ওর ডানহাতটা খপ্ করে ধরে ফেলল। এবং ডানহাতে একটা মামুলি থাপ্পড় বসিয়ে দিল ছেলেটার গালে।

থাপ্পড়ের শব্দ কিংবা ফলাফল কোনওটাই মামুলি হল না।

ছেলেটার মুণ্ডুটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। চোয়ালের হাড়ও সরে গেল বোধহয়। ও ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

তিন নম্বর ছেলেটা ভীষণ বুদ্ধিমান। তাই ও চোখের পলকে বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ঘটনা আমাকে আর বাবাকে একরকম

হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আমরা যেন আবার সিনেমা দেখছিলাম—যার নায়ক চারফুট উচ্চতার একটি নিরীহ গেরস্থালি রোবট।

আমাদের মাথা কাজ করছিল না। বুঝতে পারছিলাম না, থানায় যাব, নাকি অকুস্থল থেকে সরে পড়ব।

সমস্যাটার সমাধান করে দিল ভোলা।

একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে চট করে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। রাস্তায় পড়ে থাকা ছেলে দুটোকে দেখিয়ে বলল, 'এইমাত্র চারটে গুন্ডা এই ছেলে দুটোকে মারধোর করে পালিয়ে গেল। এক্ষুনি হয়তো গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। আমাদের একটু হেল্প করুন—শিগগির এখান থেকে নিয়ে চলুন, ভালো বকশিশ দেব।'

বাড়িতে ফিরে ধাতস্থ হতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লাগল। তারপর বাবা ভোলাকে বলল, 'অতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার ঠিক হয়নি। যদি এরপর পুলিশের ঝামেলা হয়?'

আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকালাম। ভোলা মারাত্মক বিপদে আমাদের বাঁচাল, আর বাবা বলছে 'বাড়াবাড়ি'!

ভোলা গায়ের জামাটা ঠিকঠাক করতে-করতে বলল, 'ঝামেলা কিছু হবে না, বাবা। দেখবে, ওই ছেলেগুলোর নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় নাম আছে।'

বাবা যা-ই বলুক, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল, ভোলার কাছে আমাদের ঋণ থেকে গেল। বাবাকে এসব কথা কিছু বলিনি। কারণ, বললেই বাবা হয়তো বলে বসবে, 'রোবটের কাছে আবার ঋণ কীসের! যতসব আজগুবি ভাবনা!'

এর কয়েকমাস পর বাবা বাড়িতে একটা কম্পিউটার কিনে নিয়ে এল। তারপর থেকেই বাবা ওই যন্ত্রটা নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। সময় পেলেই শুধু কম্পিউটারের কি-বোর্ড নিয়ে মেতে ওঠে। আর আমাকেও একটু-আধটু শিখিয়ে দেয়।

তখন থেকে বাবা প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে, 'ভোলাটার যদি ঘটে আর-একটু বুদ্ধি থাকত তা হলে ওকে কম্পিউটারে বসিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম।'

বাবা কিন্তু ভোলাকে দিয়ে কম্পিউটার চালানোর চেষ্টা করতে ছাড়েনি। তবে হলে হবে কী, ভোলা মেশিন ছেড়ে উঠে চম্পট দিতে পারলেই বাঁচে! ও আমাকে আড়ালে বলত, 'ভাইটি, সবাইকে দিয়ে কি সব কাজ হয়!'

আমি ওর কথা শুনে হাসতাম।

একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে এ-কথা সে-কথা বলতে-বলতে বাবা হঠাৎই ভোলার প্রসঙ্গ তুলল।

ভোলার নানান কাজ নিয়ে, কাজের খুঁত নিয়ে কয়েকটা মন্তব্য করল বাবা। তারপর ও কম্পিউটার চালাতে পারে না, আধুনিক যুগের কাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, এইসব বলে বেশ বিরক্তি দেখাল।

ভাগ্যিস ভোলা তখন সামনে ছিল না। থাকলে আমার ভীষণ বাজে লাগত। তা ছাড়া, বাবার মুখে-মুখে আমি ঠিক কথা বলতে পারি না। তাই বাবার কথায় আমার খারাপ লাগলেও কিছু বলতে পারিনি।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, রান্নাঘরের দিক থেকে ভোলা একগ্লাস জল নিয়ে আসছে। আমিই ওকে জল আনতে বলেছিলাম।

বাবা খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, 'শোনো, সন্তু। "এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি" একটা এক্সচেঞ্জ অফার অ্যানাউন্স করেছে।

ভি. এক্স.-থ্রি মডেলের রোবট আর তিরিশ হাজার টাকা দিলে ওরা ওদের লেটেস্ট কম্পিউটার কম্প্যাট্রিল ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট দেবে। মডেলটার নাম ভি. এক্স. আই. কিউ—ওয়ান। এই রোবটটা কম্পিউটার চালাতে তো জানেই, তা ছাড়া আরও বহু আধুনিক কাজ জানে...।'

আমি বুঝতে পারছিলাম বাবা কী বলতে চলেছে। তাই মুখের মধ্যে ভাত নিয়ে শক্ত করে চোয়াল বন্ধ করে বসেছিলাম। কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল আমার।

ভোলা অনেকটা কাছে চলে এসেছিল। বাবার কথা ও ঠিক কতটা শুনতে পেয়েছে বুঝতে পারলাম না। ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভাইটি, এই নাও তোমার জল।' গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ভোলা।

বাবা মাথা ঘুরিয়ে একবার বিরক্তভাবে ভোলাকে দেখল। তারপর বলল, 'নাঃ, আর কোনও উপায় নেই! ভোলাকে পালটে ওই নতুন মডেলের রোবটটা নিয়ে আসতেই হবে। কাজের ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে...।'

'বাবা।' ভোলা এক অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। ওর হাত থেকে জল ভরতি গ্লাসটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

আমি যেন স্লো-মোশানে কোনও সিনেমা দেখছিলাম।

জল ভরতি গ্লাসটা বাতাস কেটে পড়ছে-তো-পড়ছেই। তার মধ্যে বন্দি জল চলকে উঠে ঢেউ তুলছে। তারপর গ্লাসটা ধাক্কা খেল মেঝেতে। কাচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হল, জল ছিটকে পড়ল চারিদিকে। জলের ফোঁটাগুলো শূন্যে লাফিয়ে উঠে হিরের কুচির মতো দেখাল। তারপর মেঝের অনেকটা ভিজে গেল। জলে মাখামাখি কাচের টুকরোগুলো এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে পড়ে রইল।

আমার বারবার মনে হচ্ছিল, মেঝেতে জল নয়—রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাচ ভাঙার এককণা শব্দও আমার কানে ঢোকেনি। কারণ, ভোলার বুক ভাঙা 'বাবা!' ডাকটা বারবার আমার কানে বাজছিল।

বাবা মেঝের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটার হাল দেখে বলল, 'হোপলেস।'

ভোলা পায়ে-পায়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কদমছাঁট চুল, ছানাবড়া চোখ, চারফুট হাইট, অথচ ওকে দেখে এখন মোটেই হাসি পাচ্ছিল না।

'বাবা, আমার মডেলটা পুরোনো বলে, তুমি আমাকে বদলে ফেলতে চাইছ!'

বাবা কোনও জবাব দিল না।

ভোলা উত্তরের জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমি যে এত বছর তোমাদের কাছে রইলাম, তোমাকে, ভাইটিকে এত যত্ন করলাম, তার কোনও দাম নেই! তুমি বলছ, বাজারে এখন অনেক ভালো মডেলের রোবট পাওয়া যাচ্ছে—তাই আমাকে

বদলে ফেলতে চাও। তা হলে একটা পালটা উদাহরণ তোমাকে দিই—শুনতে হয়তো তোমার খারাপ লাগবে।' ভোলা একবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। তারপরঃ 'ভাইটির বয়েসি অনেক ছেলেকে আমি দেখি যারা ভাইটির চেয়ে দেখতে ভালো, লেখাপড়ায় ভালো, অনেক গুণ আছে—মানে, অনেক ভালো মডেলের ছেলে। তা হলে তুমি কি চাইবে, ভাইটিকে বদলে আর একটা ভালো মডেলের ছেলে নিয়ে আসতে? সম্পর্কের কোনও দাম নেই তোমার কাছে?'

বাবা রাগে কাঁপতে শুরু করেছিল। ভোলার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এসব কী উলটোপালটা বকছ! তোমার আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।'

'আজ আমাকে বলতেই হবে, বাবা!' জেদি গলায় বলল ভোলা, 'তুমি বলছ আমি অনেক কাজ পারি না। ঠিক কথা। কিন্তু অন্য অনেক কাজ তো পারি! তুমিও তো অনেক কাজ পারো না, বাবা! এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম : কেউই সব কাজ পারে না। তাতে তো লজ্জার কিছু নেই! এত বছর ধরে তোমাদের জন্যে যা-যা কাজ আমি করেছি সবই তো নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছি। কখ্খনও তো বিরক্ত হইনি। তা হলে বলো, আমার দোষটা কোথায়! আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না, বাবা।'

বাবা ভোলার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়লঃ 'নাঃ, একে বোঝানো যাবে না। মনে হয়, ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলো সব ঘেঁটে গেছে।'

ভোলা আবার যখন কথা বলল ওর গলাটা কেমন ভাঙা কান্নার মতো শোনালঃ 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না, বাবা। তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

বাবা এবার অন্য পথ ধরল। হাত নেড়ে বেশ শান্ত গলায় ভোলাকে বোঝাতে চাইল।

'শোনো, ভোলা, তুমি আসলে একটা রোবট—চাকর রোবট। তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকো বটে, কিন্তু আমি তোমার বাবা নই, তুমিও আমার ছেলে নও। আমার মনে হয়, তোমার ভেতরের প্রোগ্রামগুলো সব গোলমাল হয়ে গেছে। তুমি একটু স্থির হয়ে...।'

'কী বলছ, বাবা! তুমি আমার বাবা নও! আমিও তোমার ছেলে নই!'

ভোলার কথাগুলো আমাকে বিরাট ধাক্কা দিল। এই শক্ত কথাগুলো বাবা ওকে না বললেও পারত। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'প্লিজ, ভোলা, ভুল বুঝো না। তুমি ছেলে না হলে কী হয়েছে—ছেলের মতো তো বটেই! আমিও তোমার ভাইয়ের মতো...।'

ভোলা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ছিটকে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। ওর অভিব্যক্তিহীন যান্ত্রিক চোখজোড়া যেন পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল। সে-চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আমি ওর চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলাম না—চোখ সরিয়ে নিলাম।

ভোলা খুব ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে বলল, ‘ভাই...এর...মতো! ছেলে...র...মতো!’

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, আমাকে আর বাবাকে বারবার দেখতে লাগল।

অবশেষে খুব আলতো গলায় বলল, ‘সম্পর্কের তা হলে কোনও দাম নেই, ভাইটি? বুঝেছি...তোমরা আসলে মানুষ নও....মানুষের মতো...।’

শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করতে-করতে ঘরের দরজার দিকে এগোল ভোলা। ওর চোখের নজর বোধহয় ঠিকমতো কাজ করছিল না—কারণ, ও একটা চেয়ারে ধাক্কা খেল, তারপর দেওয়ালের কোণে ওর মাথা ঠুকে গেল।

কোনওরকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজার পাশটিতে উবু হয়ে বসে পড়েছিল ভোলা। মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল ভাঁজ করা দুটো হাতের ফাঁকে।

পরদিন বিকেলে ‘এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি’র গাড়ি এসে ওকে তুলে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ও একইভাবে বসে ছিল।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি বেশ কয়েকবার ওকে ডেকেছিলাম। কিন্তু ও কোনও সাড়া দেয়নি। হয়তো আমাদের কথায় ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলো তছনছ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওর ভেতরটা শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছিল। কে জানে!

সেই থেকে ভোলাকে আমি কখনও ভুলতে পারিনি—ভুলতে পারবও না।

ও আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয়, আমি মানুষের চেয়ে একটুখানি কম। সেইজন্যেই আমি সারাটা জীবন ধরে পুরোপুরি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।



আমরা সবাই সমান

বাপি অফিসে বেরিয়ে গেলে রূপান নিজেকে একজন কেউকেটা বলে মনে করে। কারণ, তখন বাড়িতে সে-ই একমাত্র পুরুষ সিংহ—অতএব হেড অফ দ্য ফ্যামিলি।

সদর দরজার কলিংবেলটা যখন বাজল তখন মা রান্নাঘরে—গরম কড়াইয়ে ছ্যাঁকোর-ছোঁকর শব্দ তুলতে ব্যস্ত। আর রূপান অঙ্কের হোমটাস্ক নিয়ে মশগুল ছিল।

কিন্তু কলিংবেল বেজে উঠতেই রূপানের মনে হল, দরজা খোলার দায়িত্বটা হেড অফ দ্য ফ্যামিলিরই নেওয়া উচিত। তাই দৌড়োনো আর হাঁটার মাঝামাঝি ঢঙে ও পৌঁছে গেল দরজার কাছে।

কে এল এই অসময়ে? এখন তো কারও আসার কথা নয়!

'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রেখে চকচকে একটা কিছু চোখে পড়ল। ঠিক যেন স্টিলের বাসন-টাসন।

কিন্তু দরজা খুলতেই অবাক হয়ে দেখল স্টিলের বাসন নয়, একটা রোবট দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়।

পথে-ঘাটে এখন যে-হারে রোবট ঘুরে বেড়ায় তাতে একটা মেটাল বডির রোবট দেখে ক্লাস সেভেনে পড়া রূপানের মোটেই অবাক হওয়ার কথা নয়। ও অবাক হয়েছে ওদের বাড়ির দরজায় একটা রোবটকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

রোবটটা লিকলিকে। চোখগুলো মানুষের মতো। বেশ টানা টানা। মাথায় চকচকে নাইলনের চুল—অ্যালবার্ট কেটে আঁচড়ানো। পরনে রঙিন হাফশার্ট আর প্যান্ট। তবে মুখ আর দু-হাতে কোনও ঢাকাঢুকি নেই। রোদ পরে চকচক করছে।

'কাকে খুঁজছেন?' রূপান গলাটা একটু ভারী করে জানতে চাইল।

‘আমি ম্যাথামেটিকা গ্রহ থেকে আসছি, স্যার,—’ রূপানকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে মিহি গলায় বলল রোবটটা, ‘আমার নাম লেবেস্‌গিউ। আমি প্রফেসর শান্তারাম মিত্রের বাড়িটা খুঁজছি। আমাদের কাছে যা ডেটাবেস রয়েছে তাতে ওঁর বাড়িটা এই এলাকাতেই হওয়ার কথা, স্যার...।’

রোবটটা ওকে ‘স্যার’ বলে দুবার ডাকায় রূপানের মনে হল, ও আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই—দু-চার ফুট শূন্যে উঠে পড়েছে। একইসঙ্গে ও লেবেস্‌গিউর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালঃ রোবটটার ভেতরের কলকবজা কিংবা সফ্‌টওয়্যার বিগড়ে যায়নি তো! যার জন্য ও ভুল করে ভাবছে যে, ও অন্য গ্রহ থেকে এসেছে!

না, প্রফেসর শান্তারাম মিত্র নামে এই এলাকায় কেউ থাকেন না। কিন্তু রোবটটা ওঁকে খুঁজছে কেন? ভীষণ জানতে ইচ্ছে করল রূপানের।

‘এই নামে এ পাড়ায় কেউ থাকে বলে মনে হয় না।’ গম্ভীর গলায় বলল, রূপান, ‘কিন্তু ওঁকে খুঁজছেন কেন জানতে পারি?’

‘হ্যাঁ, স্যার, বলছি—’ হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লেবেস্‌গিউর নাক দিয়ে, তারপর বলল, ‘সমান চিহ্ন নিয়ে ওঁর কাছে আমাদের একটা কমপ্লেন আছে। আপনাদের এই পৃথিবীতে ওটা ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করা হয় না।’

‘মানে?’ তাজ্জব হয়ে গেল রূপান। এ-রোবটটা বলছে কী! ও নিজে সমান চিহ্ন ব্যবহার করে কত যে অঙ্ক করেছে তার হিসেব নেই।

‘হ্যাঁ, স্যার। আপনি তো জানেন, অঙ্কে এই “ইকোয়াল্‌স টু” চিহ্নটা সবসময় ব্যবহার করা হয়। কারণ অঙ্ক মানেই তো “ইকোয়েশান”—বাঁ-দিকের সঙ্গে ডানদিক সমান। এই সমান চিহ্নটা ছাড়া অঙ্ক অচল। অন্তত আমাদের গ্রহে তো তাই, স্যার...।’

রূপান তখনও বুঝতে পারছিল না, লেবেস্‌গিউ কী বলতে চায়। তাই ও চুপ করে রইল।

‘যেমন ধরুন স্যার...’ রোবটটা বলে চলল, ‘ছয় যোগ চার সমান দশ। এই অঙ্কটা লিখে ফেললে দেখবেন, সমান চিহ্নের বাঁ-দিকে ছয় যোগ চার, আর ডানদিকে দশ। “৬৪” লেখাটার সঙ্গে “১০” লেখাটার চেহারার কোনও মিল নেই—কিন্তু চেহারার মিল না থাকা সত্ত্বেও ওরা সমান...।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠিক বলেছেন...’ রূপান সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা ভেবে একটু অবাকও হল।

‘তারপর, মনে করুন, এই পৃথিবীর সমস্ত অঙ্ক থেকে যদি সমান চিহ্নটা উধাও করে দেন তা হলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে! সবকিছু একেবারে ঘেঁটে যাবে। তার মানে, যে-কোনও অঙ্কে সমান চিহ্ন থাকাটা সবচেয়ে জরুরি...।’

রূপান আবার সায় দিল।

'আমাদের গ্রহে দুজন মানুষের মধ্যে চেহারা কিংবা অন্য কিছুর মিল না থাকলেও তাদের মধ্যে সমান চিহ্ন বসানো হয়। অর্থাৎ, ওরা সমান। দেখতে আলাদা হলেও ওদের মধ্যে আসলে কোনও তফাত নেই। তাই আমাদের গ্রহে সবাই সমান। কিন্তু পৃথিবী গ্রহে "ইকোয়াল্স টু" চিহ্নটার ব্যবহার শুধু অঙ্কের মধ্যেই আটকে গেছে—মানুষের মধ্যে আসতে পারেনি। সেটা জানানোর জন্যেই ম্যাথামেটিকা গ্রহের মানুষরা আমাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছে। বলেছে, ম্যাথামেটিশিয়ান প্রফেসর মিত্রকে আমাদের অভিযোগ জানাতে। উনি যদি বিষয়টা সবাইকে বোঝাতে পারেন...। ঠিক আছে, চলি, স্যার—প্রফেসর মিত্রের বাড়িটা খুঁজতে হবে...।'

রূপানের মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'রূপান, কে এসেছে?'

রূপান বলল, 'কেউ না, মা—'

লেবেস্‌গিউ লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে রূপানের খুব ভালো লাগছিল। আজ ওকে রোবটটা অভিনব এক অঙ্ক শিখিয়ে গেলঃ সমান চিহ্নের ঠিকঠাক ব্যবহার।

আসলে আমরা সবাই সমান।

প্রাপ্তমনস্ক কল্পবিজ্ঞান কাহিনি

উপন্যাস



ঘাসের শিষ নেই

এক

আদিত্য দাঁড়িয়ে ছিল বড় রাস্তার ধারে।

রাস্তা পার হওয়ার জন্য যতবারই এগোতে যাচ্ছে, ততবারই পাঁচ-সাতটা অটো রিকশো ছুটে আসছে ফুলঝুরির মতো। সাঁ-সাঁ করে বিপজ্জনক বাঁক নিয়ে বিকট শব্দের সারেগামা শুনিয়ে অত্যন্ত জটিল পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ছোট মাপের গাড়িগুলো ঠিক ইঁদুরের মতো। এদের গতিপথের জ্যামিতিক চেহারা এতই আঁকাবাঁকা যে, স্বয়ং ইউক্লিডও হয়তো 'এলিমেন্টস্' লেখা বন্ধ করে এই নতুন জ্যামিতির রহস্য সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াতেন।

বাজারের থলেটা শক্ত হাতে ধরে আবার পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু ক্যাবারে নর্তকীর মতো সাবলীল বাঁক নিয়ে পথ জুড়ে এসে দাঁড়ানো মিনিবাসটাকে একরকম খেয়ালই করেনি আদিত্য। সুতরাং আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বিরক্ত হয়ে। আচ্ছা, কলকাতা শহরে এখন গাড়ির সংখ্যা কত? এক লাখ, দু-লাখ, পাঁচ লাখ, না এক কোটি? অটো, স্কুটার, মিনি, ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট কার, ট্রাক, লরি—ওঃ! ভাবা যায় না। মানুষের বেড়ে ওঠার হার দিব্যি রুখে দিতে পেরেছে সরকার, কিন্তু গাড়ির বেলায় অষ্টরম্ভা।

ঠিক তখনই মিনিবাসের একজস্ট পাইপ দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আদিত্যর চোখেমুখে। হঠাৎ যেন দম আটকে এল ওর। শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। চট করে পিছিয়ে এল নর্দমার ধারে। শব্দ করে থুতু ফেলল দুবার। গলার ভেতরটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছে।

আদিত্য আর দেরি করল না। নানারকম গাড়ির যানজট ও হর্নের প্যাঁ-পোঁর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ঠিক যেন গোলকধাঁধায় পথ চলা। ছুটির দিনেও এই রাস্তাটার এরকম বেহাল অবস্থা। হরি শা'র হাটের দিন এ-অবস্থা হবেই। সপ্তাহে দুটো দিনঃ বুধবার, আর রোববার। তখন অরবিন্দ

সেতুর যে-অবস্থা হয়, ইচ্ছে করে শ্রী রবিন্দকে ডেকে এনে দেখাতে। যাঁর উপাসনা গৃহের মূল মন্ত্র নিস্তব্ধতা ও নীরব প্রার্থনা, তাঁর নাম যুক্ত করা হল কিনা সবচেয়ে উপদ্রুত রাস্তায়!

বড় রাস্তা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল আদিত্য। এখনই প্রায় সওয়া আটটা। বউদি বোধহয় বাজারের জন্য হাঁ করে বসে আছে। ঠিক দশটায় দাদার এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা। ওঁর অফিসের কোন এক বড়সাহেব আসবেন। তাঁকে আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে কোম্পানির গড়িয়াহাটের গেস্টহাউসে। তারপর বাকি দিনটা চলতে হবে তাঁর মরজিমাফিক।

চলতে-চলতে একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল আদিত্য। মেঘে-মেঘে প্রায় ছেয়ে গেছে। অথচ বৃষ্টির কোনও নামগন্ধ নেই। ক'দিন ধরেই কেমন এক অসহ্য গুমোট।

মুখ নামাতেই চমকে গেল আদিত্য। চোখাচোখি হয়ে গেল বৃদ্ধ মানুষটার সঙ্গে।

নাম শঙ্করানন্দ চক্রবর্তী। ওদের বাড়ি থেকে তিনটে বাড়ি পরেই ভদ্রলোকের ছাপোষা একতলা বাড়ি। বয়েস প্রায় সত্তর। শুধু স্বামী-স্ত্রী দুটিতে জুটি বেঁধে ব্যাট করছেন। একটি মাত্র ছেলে। বছরদশেক আগে সেই যে বাড়ি ছেড়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে আর ফেরার নাম নেই। সেখানেই নাকি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। বাড়ি-টাড়িও কিনেছে বোধহয়। বছরে দু-বছরে এক-আধটা চিঠি বাপ-মাকে দেয়। সেই চিঠিটা ভদ্রলোক পাড়ার পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ান। আদিত্যকেও অনেকবার দেখিয়েছেন। প্রথম-প্রথম আদিত্য বিরক্ত হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ছেলে যে আমেরিকায় বিরাট বড়লোক সেটাই পাড়ার লোককে জানানোর একটা ছুতো বোধহয়। কিন্তু পরে আর তা মনে হয়নি।

শঙ্করবাবুর হাতে দুটো ঠোঙা। পাটের সুতলি বাঁধা। সামনেই পাড়ার জমাটি মুদি-দোকান মনোহর ভাণ্ডার। হয়তো সেখানেই কিছু কিনতে এসেছিলেন। আদিত্যর খুব কাছে এসে একটু জোরালো গলাতেই বললেন, 'দিতু, কোনও খবর আছে?'

আদিত্যর বুকের মধ্যে পলকে অপরাধবোধ তৈরি হয়ে গেল। ইস, একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে। কী বিচ্ছিরি লাগছে এখন!

বৃদ্ধের পরনে সাদা শার্ট আর ধুতি। গায়ের রং টকটকে ফরসা। গাল ভাঙা। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। মাথার চুল সাদা। ছোট্ট টুথব্রাশ গোঁফও তাই। নাকটা সামান্য মোটা। তার ওপরে একটা ছোট আঁচিল। চোখ দুটো ঠিক কটা নয়, তবে ঘোলাটে। কানে কম শোনেন বলে চেঁচিয়ে কথা বলেন অকারণে।

আদিত্য কিছুক্ষণ দেখল ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে। একটু আগে দেখা আকাশের কথা মনে পড়ল ওর।

শঙ্করবাবু বোধহয় ভাবলেন আদিত্য তাঁর অনুরোধটা একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে। তাই প্রত্যাশা-ভরা ঘোলাটে চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে ঘষা গলায় বললেন, 'তোমায় দুটো টিউশনি জোগাড় করে দিতে বলেছিলাম—মানে, আগের দুটো টিউশানি তো ফাইনাল পরীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। বোঝোই তো, বাড়ির ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, আর আমরা দুটি প্রাণী! যে করে হোক চালাতে তো হবে। তা ছাড়া মাঝে-মাঝে ঘর-দোর মেরামতের ঝামেলা রয়েছে।' বৃদ্ধ একটু কাশলেন। শব্দে বোঝা গেল গলায় কফ উঠল। কিন্তু তিনি ওই অবস্থাতেই বললেন, 'তুমি তো এ-লাইনে রয়েছ, তাই তোমাকে বলে রেখেছিলুম—।'

আদিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা মিথ্যে অজুহাত ভেতরে-ভেতরে তৈরি করছিল। ও যে দুটো টিউশানি করে তা ঠিক। যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢোকার সময় থেকেই দু-একটা টিউশানি করত ও। পাড়ার মধ্যে, নয়তো তার আশেপাশে। হাতখরচের টাকাটা উঠে যেত তাতে। তারপর পাশটাশ করে চাকরি করছে প্রায় বছরদশেক, কিন্তু টিউশানির অভ্যেসটা আর ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

আদিত্যর গলায় ভেতরটা খুশখুশ করে উঠল। দেরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ি ফিরতে। কী বলা যায় ভদ্রলোককে?

'মেসোমশাই, আমি ভুলিনি। দু-চারজনকে বলেছি। কোনও খবর থাকলে সামনের সপ্তাহে আপনাকে জানিয়ে দেব। শুধু ইংরেজি তো?' গলার স্বর বেশ খানিকটা চড়িয়ে শেষ প্রশ্নটা ছুড়ে দিল আদিত্য। জানা কথাই, শুধু ইংরেজি। তবুও কেন যে ন্যাকার মতো এই প্রশ্নটা করে বসল কে জানে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ইংরেজি,' বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখের তারা একটু উজ্জ্বল হল। তারপরই গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন, সঙ্গে আর কিছু পড়াতে বলছে নাকি? বাংলা, ভূগোল আর ইতিহাস হলে ম্যানেজ করে নেব। তবে টাকাটা একটু বাড়িয়ে দিলে...।'

'ঠিক আছে, কথাবার্তা ফাইনাল হলে আপনাকে খবর দেব'খন।'

'তুমি একটু খেয়াল রেখো, বাবা,' বলে ছোট-ছোট পা ফেলে শঙ্করবাবু চলে গেলেন।

এই এক আশ্চর্য লোক! বাড়িতে ভাড়াটে বসাবেন না কিছুতেই। খালি বলবেন, 'মহাদেব এসে তা হলে থাকবে কোথায়?'

মহাদেব—মহাদেবদা, ওঁর সেই আমেরিকাবাসী ছেলে। তার ফিরে আসার কথা ভেবে শঙ্করবাবু যক হয়ে গেছেন। যে-ভাবেই হোক বসতবাড়িটা ওঁকে ঠিকঠাক রাখতে হবে। নইলে এই বয়েসে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে কে আর হেঁটে-হেঁটে ছাত্র পড়াতে যায়! ছাত্ররা ওঁর কাছে যজমান। আর উনি

যেন পুরুতমশাই। একটু আগেই কাঁধের পাশ দিয়ে পইতেটা উঁকি মারছিল। ভদ্রলোক খুব সাত্ত্বিক। রোজ গায়ত্রী জপ করেন। গীতা পড়েন।

আদিত্যর কষ্ট হল। কতরকম কারণেই না মানুষকে বেঁচে থাকার কসরত করতে হয়। নাঃ, অন্তত একটা টিউশানি ওকে জোগাড় করতেই হবে। সুনয়নাকে একবার বলে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটা যা ইয়ারবাজ! আদিত্যকে তো মাস্টারমশাই বলে পাত্তাই দেয় না। চোখ মটকে বলে, 'ভূতের ওঝার মতো চেহারা, তাকে আবার মাস্টারমশাই বলতে হবে। অ্যাই দিতুদা, সত্যি করে বলুন না, ছোটবেলায় আপনি ভূত তাড়াতেন?'

আদিত্যর হাসি পেল। আর প্রায় একইসঙ্গে মনোহর ভাণ্ডারের দেওয়াল ঘড়িটায় চোখ গেলঃ আটটা চল্লিশ! সর্বনাশ! বাড়ির দিকে একরকম প্রায় ছুটই লাগাল আদিত্য। আজ কপালে দুঃখ আছে।

দশ-বারো পা যেতে না যেতেই পিছন থেকে কে ডাকলঃ 'দিতু!'

ভুরু কুঁচকে মাথা ঘোরাল আদিত্য। শুভেন। পাড়ার বন্ধু। কবিতা-টবিতা লেখে। লম্বা-লম্বা চুল। চোখ টানা-টানা। গায়ের রং কালো। পরনে ডোরাকাটা শার্ট আর পাজামা। খুব সামান্য দাড়ি আছে। আর অসম্ভব রোগা।

'কী বলছিস?' আদিত্য বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল।

'কাল তোর অফিস থেকে একটা প্যাড এনে দিবি? আগেরটা ফুরিয়ে গেছে।'

আদিত্য বরাবরই ওর কবিতা লেখার কাগজ সাপ্লাই দেয়—সুতরাং ঘাড় নাড়ল। বলল, 'একটু পরে বটতলায় আয়, আমি থাকব।' তারপরই চোখে ঠুলি লাগানো ঘোড়ার মতো একরকম দৌড়ই লাগাল বাড়ির দিকে।

আজ ছুটির দিনটা একেবারে যাচ্ছেতাই কাটছে ওর। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতেই বারদুয়েক কাশল। ওদের সরু গলির মুখে পৌঁছেই দেখল পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেগুলো এরই মধ্যে রবারের বল নামিয়ে পেটাপেটি শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎই ওর পায়ের কাছে বলটা গড়িয়ে আসতেই বাঁ-পায়ে বলটা চেপে ধরল ও। তারপর এক জায়গায় দাঁড়িয়েই শরীরটাকে ডানদিকে সামান্য হেলিয়ে বাঁ-পায়ে চোস্ত এক শট মারল। খোকন, দিপু আর তোতা একেবারে হইহই করে উঠলঃ 'ওয়েল প্লেড, দিতুদা! ওয়েল প্লেড!'

আদিত্য একসময়ে চার-দশে খেলত। কখনও মাঠের কমপিটিশান, কখনও গলিতে, কখনও ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে, কখনও বা হরি শা' হাটের বাড়ির দোতলার প্রকাণ্ড বারান্দায়। ওরা সেটা জানে। আর আদিত্যও মাঝে-মাঝে খেলা নিয়ে ওদের টুকটাক পরামর্শ দেয়।

স্যাঁতসেঁতে গলিটায় কয়েক পা ঢুকেই বাড়ির দোতলার বারান্দায় চোখ গেল আদিত্যর। ঠিক যা ভেবেছে তাই। বারান্দায় গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজনঃ মা, বউদি আ মুন্নি। দূর থেকে মুন্নির লাল-হলুদ ছাপা স্কার্টটা বেশ চেনা যাচ্ছে। গতবার পুজোর সময় আদিত্য এনে দিয়েছিল—দিল্লি থেকে। মুন্নি আর সেই ছোট বোনটি নেই—অনেক বড় হয়ে গেছে। সামনের বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেবে—আর্টস-এ।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই ওপর থেকে বউদির তিরস্কার শুরু হয়ে গেলঃ ‘সত্যি ছোড়দা, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। জানো, তোমার দাদাকে ঠিক দশটায় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে, আর তুমি ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে বাজার হাতে বল খেলতে লেগে গেলে—।’

আদিত্য ওপরে তাকায়নি। বউদি আরও কী বলছিল, কিন্তু ওর কানে তার কিছুই ঢুকল না। ও ততক্ষণে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

বাড়িতে ঢুকেই নানকুর চিৎকার কানে এল। চিৎকার করে নার্সারি রাইম আওড়াচ্ছে বাচ্চাটাঃ ‘জ্যাক অ্যান্ড জিল, ওয়েন্ট আপ দ্য হিল। জ্যাক অ্যান্ড জিল...।’ শুধু প্রথম দুটো লইন বারবার পড়ে যাচ্ছে। ওর মায়ের কাছে থেকে মার খেল বলে। একে বাজারের দেরি হয়েছে বলে বউদি রেগে টং, তার ওপরে ছেলের এই মন্ত্র আওড়ানো।

দোতলার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে রান্নাঘরের কাছে বাজার বয়ে নিয়ে যেতে-যেতেই শুনতে পেল নানকুর পিঠে কিল পড়ার গুমগুম শব্দ। আর তারপরই ভ্যাঁ।

সঙ্গে-সঙ্গে বারান্দার কাছ থেকে মায়ের চিৎকার শুরু হয়ে গেলঃ ‘কী হচ্ছে, লতা! বাচ্চাটা কী করেছে! ওকে অকারণে মারছ কেন?’

আদিত্য বাজারের থলে দুটো রেখে দাদার ঘরে উঁকি মারল। মারপিটের ব্যাপারটা ওখানেই হচ্ছে। দাদা ঘরে নেই। বোধহয় চান করতে গেছে। তবে ঘরে থাকলেও হয়তো ছেলেকে বাঁচাতে পারত না।

আদিত্য ডেকে বলল, ‘বউদি, পরজীবে করো দয়া আমি অতি মন্দ। আজকের মতো নানকুকে তুমি ফরগিভ করে দাও। আর কোনওদিন ওর কাকুমণি দেরি করে বাজার আনবে না।’

নানকু কান্না থামিয়ে আদিত্যকে দেখল। তারপর কান্না জড়ানো গলায় ‘কাকুমণি! কাকুমণি!’ বলে ছুটে এল ওর কাছে।

লতা দাদার একপ্রস্ত জামা-প্যান্ট আলনা থেকে নিয়ে বিছানায় গুছিয়ে রাখল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আদিত্যকে। বলল, ‘সত্যি, ছোড়দা, তুমি একেবারে হোপলেস। ভালো ট্রেনিং দিচ্ছ ভাইপোকে—।’

আদিত্য নানকুর মাথার বড়-বড় চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'যাই বলো, বউদি, তোমার কিল মারার স্টাইলে ব্রুস লি-র মতো একটা আভিজাত্য আছে। অ্যাই নে, শিগগির একটা মাদ্রাজি নমস্কার কর তোর মাকে—' শেষের কথাটা নানকুকে লক্ষ করে।

নানকু একবার আদিত্যর মুখের দিকে তাকাল, তারপর মায়ের দিকে দু-তিন পা এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। বারবার মাথা ঠুকতে লাগল মায়ের দু-পায়ে। আর বিড়বিড় করে 'জ্যাক অ্যান্ড জিল'-এর প্রথম দুটো লাইন আওড়াতে থাকল।

লতা রাগের মধ্যেও হেসে ফেলল। ছেলেটাকে টেনে তুলল মেঝে থেকে। নানকু মায়ের হাত ছাড়িয়ে চলে এল আদিত্যর কাছে। আদিত্য বলল, 'কেমন ট্রেনিং দিয়েছি বলো! যাকগে বউদি, তুম জলদি রান্না করো। আমি নানকুকে ও-ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। সকাল থেকে এখনও চা খাইনি। গলাটা শুকিয়ে গেল—।'

আদিত্য ছেলেটার হাত ধরে নিয়ে চলল বারান্দার দিকে। মা তখনও আপনমনে কীসব বকে চলেছে। আর মুন্নি দূর থেকে গলা বাড়িয়ে দাদার ঘরের দিকে উঁকি মেরে দেখছে।

পাশের বাড়ি থেকে উনুনের ধোঁয়া ভেসে আসছে। তার বেশ খানিকটা ঢুকে পড়ছে আদিত্যদের বাড়িতে। চোখ জ্বালা করছে। গলার কাছটাও খুশখুশ করছে আবার। কাশি পেয়ে গেল আদিত্যর। একইসঙ্গে টের পেল, পরনের পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে লেপটে আছে ওর গায়ে।

বারান্দার লাগোয়া ঘরটাই দোতলা বাড়িটার সবচেয়ে বড় ঘর। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটির টাকা দিয়ে তৈরি বাড়ি। জমিটা ছিল ঠাকুরদার কেনা। তখন, খুব বাচ্চা বয়েসে, আদিত্যরা উলটোডাঙ্গার মুরারিপুকুরে ভাড়া থাকত। বাবা রিটায়ার করার ঠিক পরেই বাড়ি করেছিল। আর বাড়ির কাজে শেষ-ছোঁওয়া দেওয়ার আগেই বাবাকে চলে যেতে হয়। যাওয়ার আগে অবশ্য একমাস ধরে লড়াই করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। হয়তো পারত, কিন্তু ডাক্তাররা অসুখটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

বাবা চলে গেছে প্রায় তেরো বছর। কিন্তু মনে হয়, এই তো সেদিন।

বাড়ির কোনও-কোনও পিলারে পলেস্তারা পড়েনি। কোথাও হয়তো দু-চারখানা ঢালাইয়ের রড বেরিয়ে রয়েছে। এইরকম টুকিটাকি শেষ-না-হওয়া কাজ। এগুলোর দিকে চোখ পড়লেই আদিত্যর মনে পড়ে যায় বাবার কথা। মনে হয়, বাবা যেন বলছে, 'দিতু, তুই আর পলাশ এসব কাজ নিয়ে মাথা ঘামাসনি। তোদের পড়ার ক্ষতি হবে। দাঁড়া, একটু ফুরসত পাই, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এসব বাকি কাজ করিয়ে নেব।'

বাবা বাড়ির নাম রেখেছে 'সুরেন্দ্র নিলয়'—ঠাকুরদার নামে। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে একটা ফলকে সেটা খোদাই করা আছে। কিন্তু দেওয়ালটায় নোনা ধরে গেছে। এই এলাকার প্রায় সব

বাড়িতেই ড্যাম্প, নোনা।

নানকু হাত ধরে টান মারতেই আদিত্যর খেয়াল হল মা ওকে কী যেন বলছে। আবার বলতেই কথাটা কানে ঢুকল আদিত্যরঃ 'লতার হাত বড্ড বেড়েছে! কারণে-অকারণে ছেলেটাকে মারবে!'

আদিত্য নানকুকে দেখল। চোখের কোলে জল শুকিয়ে আছে, কিন্তু মুখে হাসি। মা জড়সড়ো হয়ে দেওয়ালের লাগোয়া বিছানায় বসেছিল। পাশেই ছোট ট্রানজিস্টর রেডিয়ো বাজছে। ওটা সব সময়েই বেজে চলে। গান-বাজনা-খবর-খেয়াল—ও থেকে যা হোক কিছু একটা আওয়াজ বেরোলেই হল।

আদিত্য বলল, 'নানকুর সামনে বোলো না, আশকারা পেয়ে যাবে—।'

নানকু সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যর হাত ধরে একরকম ঝুলেই পড়ল, বায়নার সুরে বলল, 'কাকুমণি, আশকারা খাব, আশকারা কিনে দাও আমাকে—।'

মুন্নি বারান্দায় পোষা টিয়াপাখিটাকে ছোলা খেতে দিচ্ছিল, নানকুর আবদার শুনতে পেয়ে ডাকলঃ 'এদিকে আয়, আশকারা নিয়ে যা, চা দিয়ে খাবি।'

বাচ্চাটা আদিত্যর হাত ছেড়ে বারান্দায় দৌড় লাগাল।

মা নীচু গলায় বলল, 'চা খাবি তো?'

আদিত্য বিছানার পাশে দাঁড় করানো স্টিলের আলমারির আয়নায় নিজের চেহারা দেখছিল, বলল, 'হ্যাঁ, দাও—।'

আলমারির পাশেই একটা ছোট টেবিলে বাবার ফটো। তাতে চন্দনের টিপ দেওয়া। সামনে রাখা ছোট্ট পিতলের থালায় তিন-চারটে সাদা ফুল। নয়নতারা। ওদের বাড়িতে ঠিক ছাদ নেই, তবে খাটো পাঁচিল ঘেরা ছাদের মতোই একটা ছোট জায়গা আছে। তার চার কোণের পিলার থেকে চারটে করে মরচে ধরা লোহার রড বেরিয়ে আছে। সেই ছাদের চাতালে গোটাপাঁচেক টবে কয়েকটা ফুলগাছ। মা আর মুন্নিই গাছগুলোর আদর-যত্ন করে। মা প্রতিদিনই খুব ভোরে ওঠে। ছাদে যায়। ফুল তুলে নিয়ে আসে বাবার ফটোতে দেওয়ার জন্য। চন্দন বেটে টিপ পরায়। এ যেন এক দেবপূজা। সেই পুজোর সময় ছবির মধ্যে থেকে সুপুরুষ অকালপ্রয়াত মানুষটা তার বিধবা বউকে দেখে। বয়েসকালে মা কম সুন্দরী ছিল না। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর তেরো বছরে মায়ের বয়েস ছাব্বিশ বছর বেড়ে গেছে। তার ওপর সাদা শাড়ি। সাদা জমিওয়ালা শাড়ি বরাবরই মায়ের দু-চক্ষের বিষ ছিল। এখনই সেই বিষ চব্বিশ ঘণ্টা গিলতে হচ্ছে।

মা ধীরে-ধীরে হেঁটে গেল চায়ের টেবিলের দিকে। ফ্লাস্কে চা ছিল। মা ভোরবেলা তৈরি করে ফ্লাস্কে ঢেলে রাখে। বাবার ছবির সামনে এক কাপ দেয়। বাবা চা ভালোবাসত। তারপর নিজে এক

কাপ নেয়। রেডিয়ো শোনে, চায়ে চুমুক দেয়। এ-ঘরে টিভি আছে একটা। কিন্তু সেটা মা চালায় সন্ধেবেলা।

মায়ের ডাকে পিছন ফিরল আদিত্য। চা নিয়ে এসেছে মা। ধোঁয়া উঠছে এখনও। খুব কাছে মায়ের মুখ। চোখের চারপাশের ভাঁজগুলো চোখে পড়ল। শোকের কাটাকুটি খেলা। আদিত্য চা নিতেই নীচু গলায় মা জিগ্যেস করল, 'তোর এত দেরি হল?'

চায়ে চুমুক দিল আদিত্য। বলল, 'কী করব! হাটের দিনে রাস্তাটার কী অবস্থা হয় জানো তো? তার ওপর মহাদেবদার বাবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। টিউশানি খুঁজছিল—।'

মা আবার চলে গেল বিছানার কাছে। বসল বিছানায়। বিড়বিড় করে বলল, 'ভদ্রলোকের কী আর উপায়! দেখার কেউ নেই। একটা ঘর ভাড়া দিলেও কিছু টাকার জোগাড় হতো। কিন্তু দেবে না। তা হলে নাকি বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে। মহাদেব আর এসে থাকতে পারবে না।'

আদিত্য কোনও জবাব দিল না। বিছানার প্রান্তে খবরের কাগজটা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় গেল।

বারান্দার ডানদিকের রেলিঙে পাখির খাঁচাটা রাখা ছিল। খাঁচার সামনে নানকুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুন্নি। মাঝে-মাঝেই 'ভক্তদাস, ভক্তদাস' করে ডাকছে, আর পাখিটাও একই কথা শুনিয়ে দিচ্ছে উত্তরে। নানকু বারবার পাখিটার লাল ঠোঁটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিচ্ছে। মুন্নি কোনওরকমে ওর হাতটা আটকাতে চেষ্টা করছে। বলছে, 'কী হচ্ছে, নানকু, মার খাবি এবার!'

নানকু মুখ ঘুরিয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, মার খাব না, আশকারা খাব।'

আদিত্য বলল, 'ওকে নামিয়ে দে, মুন্নি। ওর বোধহয় সত্যি-সত্যি খিদে পেয়েছে।'

মুন্নি কোল থেকে নামিয়ে দিয়েই বাচ্চাটা 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' বলতে-বলতে ছুট লাগাল। মা বিছানা থেকে দুবার ওকে নাম ধরে ডাকল, কিন্তু ছেলেটা ভ্রূক্ষেপই করল না।

মুন্নি বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আর পাখিটা তখনও নিজের নাম বলে যাচ্ছে বারবার।

পাখিটা বাবা-ই কিনেছিল প্রায় চোদ্দো বছর আগে। এক পাখিওয়ালা এ-গলিতে পাখি ফিরি করতে এসেছিল। সে-ই মোটামুটি ঠকিয়ে ভালো দাম নিয়ে গছিয়ে দিয়ে যায় এই সাদামাটা টিয়াপাখিটা।

বাবা পাখিটাকে ভীষণ ভালোবাসত। নিয়ম করে খাওয়াত, যত রাজ্যের গল্প করত ওর সঙ্গে। আর পাখিটাও 'কর-কর-কঁ-কঁ' ইত্যাদি নানা আওয়াজ করে এদিক-ওদিক ঘাড় কাত করে সে-গল্প বোঝার চেষ্টা করত। বাবা পাখিটাকে বাইরে ছেড়ে রাখত। পাখিটা তখন ঘুরে বেড়াত বাবার পায়ে-পায়ে। বোধহয় ওর ডানা ভারী হয়ে গিয়েছিল, তাই উড়তে পারত না। বেড়ালের গন্ধ পেলেই চিল-চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করত। ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ত বাবার কোলে।

বাবা-ই পাখিটার নাম রেখেছিল ‘ভক্তদাস’। কার ভক্ত, কারই বা দাস, কে জানে! আদিত্যর নামটাও বাবার রাখা। আর ছোটবেলায় নিজের নামটা বলতে গিয়ে ও নাকি ‘দিতু’ বলত। সেই থেকেই এই অদ্ভুত ডাক নামঃ ‘দিতু’। তবে প্রথম-প্রথম অদ্ভুত লাগলেও এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। সাধারণত এই সময়ে গ্রীষ্মের রোদ বারান্দায় পৌঁছে যায়, কিন্তু বারান্দার বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা মাধবীলতা গাছ থাকায় খানিকটা আড়াল পাওয়া যায়। এখন অবশ্য আড়ালের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ সূর্য মেঘে ঢাকা।

আদিত্য আড়চোখে মুন্নিকে দেখছিল। সকালবেলাতেই পরিপাটি করে সেজেছে। দিনরাত্তির বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। শুধু রোববার সকালটা ছাড়া। কারণ সপ্তাহে ওই একটা দিন মোহিতবাবুর ছেলে রজত ওদের বাড়ির বারান্দায় আর জানলার কাছে ঘোরাঘুরি করে। যেমন এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, অথবা পড়ার ভান করছে। আর মাঝে-মাঝেই নজর দিচ্ছে আদিত্যদের বাড়ির বারান্দার দিকে। মুন্নির দিকে।

রজত দুর্গাপুরে হোস্টেলে থেকে রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনো করে। আদিত্যর মতোই ইলেকট্রিক্যাল।

শনিবার বিকেলে বা রাতে বাড়িতে আসে রজত, আর সোমবার খুব ভোরে চলে যায়। ওদের বাড়িটা আদিত্যদের উলটোদিকে দ্বিতীয় সারিতে, একটু ডানদিক ঘেঁষে। চারতলা বাড়ি, সদ্য রং করা হয়েছে। রজত থাকে তেতলায়।

রজত ছেলে হিসেবে খারাপ নয়। ফরসা, চোখ-মুখ বেশ ধারালো, মাথার চুলগুলো কখনওই বশে থাকে না। কথা বলার সময় মাঝে-মাঝে নাকটানার অভ্যেস আছে।

আদিত্যর সঙ্গে আলাপ আছে রজতের। ওকে ‘দিতুদা’ বলে। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মুন্নির কাছাকাছি আসার ছুতোয় দু-একবার পড়া বুঝতেও এসেছে আদিত্যর কাছে।

কী করে ওদের দুজনের পরিচয় হল আদিত্য জানে না। পরিচয় কি সত্যিই হয়েছে? নাকি চোখের দেখা, এ-ওর দিকে তাকানো, ওইটুকু পর্যন্তই? মুন্নিকে ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সেটা...।

মুন্নি যদিও ভক্তদাসকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করছিল, ওর চোখ বারবার ছুটে যাচ্ছিল রজতের দিকেই। মুন্নিটার বিয়ে হয়ে গেলে বেশ হতো। পলাশ আর আদিত্য দুজনেই হালকা হতে পারত। আবার এ-ও ঠিক, এই সুন্দর ছোটবোনটা চলে গেলে বাড়িটা কেমন ফাঁকা হয়ে যাবে। আদিত্য কল্পনায় সেই ফাঁকা বাড়িটা দেখতে পেল। ডাকল, ‘অ্যাই মুন্নি, শোন—।’

মুন্নি মুখ ফেরাল। ছোড়দাকে দেখল, বলল, 'কী?'

আদিত্য চায়ের কাপে পরপর তিনটে চুমুক দিয়ে বলল, 'একটা টিউশানি জোগাড় করে দিবি?'

মুন্নি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কেন, দুটো টিউশানিতে তোর হচ্ছে না?'

'না, তা না—।'

'কী পড়াবি? ছাত্র, না ছাত্রী?'

মুন্নির সঙ্গে আদিত্যর বয়েসের তফাত প্রায় পনেরো-ষোলো বছর। কিন্তু কী করে যেন ওদের সম্পর্কটা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো হয়ে গেছে।

আদিত্য ছোটবোনকে দেখছিল। কী সুন্দর দেখতে! মায়ের ছোটবেলার ফটো দেখেছে। সেই মুখটা যেন কেটে বসানো! ডান গালে একটা তিল। ঘন ভুরুর ওপরে নেমে আসা চুলের ঝালর, চঞ্চল চোখের পালক, কপালের টিপ, সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো। এই ছোটবোনটা কখনও যেন দুঃখ না পায়। যেন কোনও কষ্ট না আসে ওর জীবনে।

আদিত্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মুন্নি আঙুল চালিয়ে কপাল থেকে চুলের ঝালর সরাতে চাইল। বলল, 'কী দেখছিস হাঁ করে? বল, ছাত্র না ছাত্রী?'

আদিত্য হেসে বলল, 'যে-কোনও একটা হলেই চলবে। আসলে আমার জন্যে নয়, মহাদেবদার বাবার জন্যে—।'

'ও—' ঠোঁট কামড়াল মুন্নি। বলল, তাহলে তো ইংরেজি—ঠিক আছে, জিগ্যেস করে দেখব। যদি খোঁজ পাই তোকে বলব।'

আদিত্য কয়েক চুমুকে বাকি চা-টুকু শেষ করে ফেলল। কাগজের হেডলাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে চলে গেল খেলার পাতায়। ফুটবল খেলোয়াড়দের দলবদলের বৃত্তান্ত পড়তে লাগল। হঠাৎই কোথা থেকে একঝলক ফুরফুরে বাতাস এল। আদিত্যর দু-হাতে মেলে ধরা খবরের কাগজ বেসামাল হয়ে গেল। সুনয়নার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওই মেয়েটাও যেন ওই রকম—দমকা হাওয়ার মতো। আজ সন্ধেবেলায় ওকে পড়াতে যাওয়ার কথা আছে।

সুনয়নাদের বাড়িটা খুব দূরে নয়। আদিত্যদের সরু গলি থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে কিছুটা গেলে ফুটপাথের ওপরে একটা করপোরেশনের কল আছে। তার ঠিক সামনেই।

রোববার আর বুধবার সন্ধেবেলা ওকে পড়াতে যায় আদিত্য। ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়ে। সামনের বছরে পার্ট টু দেবে। কিন্তু কী করে পাশ করবে ঈশ্বর জানেন। পার্ট ওয়ানে অতি জঘন্য রেজাল্ট করেছে। পড়াশুনো ছাড়া আর সব বিষয়ে সুনয়নার আগ্রহের অন্ত নেই। যেমন, ওদের বাড়ির কাছে পায়রা বেশি কেন। প্রজাপতি দেখলে পরে দিন ভালো যায় কি না। আবহাওয়ার

পূর্বাভাষ কেমন করে জানানো হয়। টিভির অ্যানটেনায় সবসময় বিজোড় সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে কেন। সত্যি, সুনয়নার জিজ্ঞাসার শেষ নেই।

মুন্নি হঠাৎই চলে গেল বারান্দা থেকে। আদিত্য দেখল, রজতকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

সামনেই নরেনবাবুর বাড়ি। দোতলা, তবে অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে। বাড়িটা বেশ পুরোনো। তারই ভাঙা কারনিসে কয়েকটা কাক বসে আছে। ডাকছে এলোমেলো। একে গুমোট আবহাওয়া, তার ওপর কাকের ডাক। বৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে নাকি?

মা বারান্দায় এল। বলল, 'তুই খেতে যা। লতা ডাকছে।'

আদিত্য জিগ্যেস করল, 'দাদা বেরিয়ে গেছে?'

এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দেখল ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে পলাশ বাড়ি থেকে বেরোল। হাতে ফোলিও ব্যাগ, হাঁটছে হনহন করে। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে ওর নির্ঘাত দেরি হয়ে যাবে।

মা বোধহয় আদিত্যর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু আদিত্য সেটা খেয়াল করেনি। যখন খেয়াল করল তখন মা বলছে, 'দিতু, আমার কাশিটা আবার বেড়েছে মনে হচ্ছে। বুকে খুব কষ্ট হচ্ছে। লতা বলছিল গরম জলে নুন ফেলে কুলকুচো করলেই ঠিক হয়ে যাবে—।'

আদিত্য খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ফেলল। বলল, 'টোটকা যা করতে চাও করো, তবে কাল তোমাকে ডাক্তারবাবুর কাছে দেখাতে নিয়ে যাব। তখন যেন না বোলো না।'

মায়ের কাশি বারো মাসের। তার ওপরে হাঁপানির টান। রোগা শরীর। খুব ধীরে-ধীরে হাঁটাচলা করে।

আদিত্য মাকে দেখছিল। মানুষটার জীবনের আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে! অঙ্কের হিসেবে একষট্টি বছর বয়েসটা হয়তো তেমন বেশি নয়, কিন্তু গত তেরো বছরে নানারকম অসুখ মাকে অসহায় করে দিয়েছে।

মাথার সামনেটা রুপোলি চুলে ঢাকা। গাল সামান্য ভাঙা। কয়েক বছর আগেও মা হাসলে এই গালে টোল পড়ত। এখনও হয়তো পড়ে, কিন্তু বোঝা যায় না। জরা কাউকে ক্ষমা করে না।

মায়ের চোখের চশমায় আলো চকচক করছিল। কীসব বিড়বিড় করল নিজের মনে।

আদিত্য বলল, 'রান্না করবে না?'

মা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'করব। একা মানুষের নিরামিষ রান্না আর কতক্ষণ লাগে!'

রান্না করা মায়ের নেশা ছিল। নিত্যনতুন রান্না খাইয়ে চমকে দিত বাবাকে। এখন চমকে দেওয়ার কেউ নেই।

আদিত্য মায়ের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। অজান্তেই ওর চোখ চলে গেল মায়ের হাতের দিকে। শাঁখাহীন কঙ্কালসার হাতে দু-গাছা সরু চুড়ি। তাতে দুটো সেফটিপিন ঝুলছে। মা সবসময়

বলে, 'এই চুড়ি দুটো তোর বউকে দিয়ে যাব। আর গলার হারটা মুন্নিকে। আমার তো নিজের বলতে আর কিছু নেই—।'

আদিত্যর হাসি পেল। চুড়ির সঙ্গে সবসময় সেফটিপিন থাকে। যেখানে-সেখানে বিঁধে যেতে চায়। মা জানে না।

সকালবেলার ঘোলাটে আলোয় মা নিথর মূর্তির মতো বারান্দার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে চুপিচুপি কে যেন একটা কারুকাজ করা চন্দন কাঠের ফ্রেম মায়ের মুখের সামনে ধরল। আদিত্যর নাকে ধূপের গন্ধ ভেসে এল। ওর গলার কাছটা খুশখুশ করে উঠল আবার। গলায়, বুকে, একটা কষ্ট হল।

দুই

বিকেলবেলা ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে গেল আদিত্য।

এরকম বিকেল আগে কখনও ও দেখেনি।

বটতলা থেকে আড্ডা মেরে ফিরে স্নান করে খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কখন ঘুম এসে গেছে টের পায়নি। ঘুম ভাঙতেই গলির দিকের জানলায় নজর গেছে ওর। একইসঙ্গে ঘড়িও দেখেছে। সাড়ে চারটে। কিন্তু এই সময় তো জানলায় একফালি বিকেলের রোদ এসে পড়ার কথা!

খানিকটা অবাক হয়েই বিছানা ছেড়ে শ্লথ পায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ও। তারপর রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে।

এক অদ্ভুত ধোঁয়াশায় চারদিক ছেয়ে গেছে। হালকা বাদামি রঙের ধোঁয়া। কোথাও গাঢ়, কোথাও বা সামান্য পাতলা। তারই মধ্যে খুব ধীরে খেলা করছে ধোঁয়াশার স্রোত। চোখ যেন খুব সামান্য জ্বালা-জ্বালা করছে মনে হল। কিন্তু উনুনের ধোঁয়ার মতো অত সাংঘাতিক নয়।

দোতলা থেকে ভক্তদাসের চিৎকার শুনতে পেল আদিত্য। বেড়াল দেখতে পেলে বা তার গায়ের গন্ধ পেলে যেরকম চেঁচায়, অনেকটা সেইরকম।

তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নিল আদিত্য। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় হাতমুখ ধুয়ে নিল। হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে উঠে এল দোতলায়। ডানদিকে দাদার ঘরের দরজা। সেদিকে একপলক তাকিয়ে ও মায়ের ঘরে গেল। এ-ঘরে মা আর মুন্নি শোয়। আর কখনও-কখনও নানকু।

মুন্নি ঘরের আলো জ্বেলে খাটের ওপরে বসে দুলে-দুলে কী পড়ছিল। মা টিভিটা অন করে নব ঘোরাচ্ছিল। সেট থেকে শুধুই হিজিবিজি শব্দ হচ্ছিল, আর পরদায় একইরকম ছবি।

আদিত্য বিরক্তভাবে বলল, 'কী করছ? এখন কোনও প্রোগ্রাম আছে নাকি?'

মা টিভির সুইচটা অফ করে দিয়ে বলল, 'না, হঠাৎই শীতের মতো কুয়াশা হল, তাই দেখছি খবরে কিছু বলে কি না—।'

আদিত্য বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে মুন্নিকে জিগ্যেস করল, 'মুন্নি, তোর চোখ জ্বালা করছে?'

মুন্নি পড়া থামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অল্প-অল্প। তোর?'

আদিত্য বলল, 'হ্যাঁ, আমারও।'

ভক্তদাসের খাঁচাটা সকাল-বিকেল বারান্দার রেলিঙে এনে রাখা হয়। আদিত্য দেখল, পাখিটা অস্বাভাবিক ছটফট করছে। আর ডেকে উঠছে থেকে-থেকেই।

মা চা তৈরি করে রেখেছিল। আদিত্যকে জিগ্যেস করল, 'চা খাবি?'

আদিত্য বলল, 'না, একটু বেরোব। নয়নাদের বাড়ি পড়াতে যাব। তা ছাড়া ব্যাপারটা কী সেটা একটু খোঁজখবর করে দেখি।'

মা পরপর কয়েকবার কাশল। ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেল। মুন্নি তখন আবার পড়ায় মন দিয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে আদিত্য জিগ্যেস করল, 'দাদা ফিরেছে?'

মুন্নি বলল, 'না—।'

আদিত্য আর দাঁড়াল না। চটির ফটাফট শব্দ তুলে সিঁড়ি নামতে শুরু করল।

গলিতে বেরিয়ে মনে হল ধোঁয়াশাটা যেন একটু ফিকে হয়েছে। সাধারণত এই সময়ে খোকন, তোতা ওদের বল পেটাপিটি শুরু হয়ে যায়, কিন্তু এখন ওদের দেখতে পেল না আদিত্য। আর বলের শব্দও শুনতে পেল না।

ধোঁয়াশার ভেতর দিয়ে ছ'-সাত ফুট পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছিল। তাতেই আদিত্য অস্পষ্টভাবে দেখল, আশপাশের বাড়িগুলোর দরজায়, ছাদে, বারান্দায় বেশ ভিড়ই বলতে হবে। কথাবার্তার শব্দও কানে আসছে। মেঘে ঢাকা সূর্যের কুয়াশা-ভেদ-করা ঘষা আলো চারপাশের বাস্তব জগতটাকে কেমন যেন অবাস্তব করে দিয়েছে।

আদিত্য গলির মোড়ের দিকে পা চালাল। মাথা উঁচু করে থাকা ইট বা পাথরে বারদুয়েক হোঁচট খেল।

গলির মোড়ে বাঁ-দিকে ঘুরলেই একটা ছোট চায়ের দোকান। সেখানে বিকেলবেলা এমনিতেই একটা জটলা থাকে—আজ সেটা আরও বেশি।

ক'দিন আগেই খবরের কাগজে কম্পিউটারে ভোট দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিল। ব্যালট বাক্স বলে কোনও বস্তু আর থাকছে না। পাঁচবছর আগেই দেশের প্রত্যেক

নাগরিককে একটি করে গোপন নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাকে বলা হয় সিটিজেন কোড নম্বর বা সংক্ষেপে সি সি এন। এই নম্বর আর ফটোগ্রাফ নিয়ে তৈরি হয়েছে আইডেন্টিফিকেশান কার্ড। এখন ভোটকেন্দ্র বলতে স্রেফ কম্পিউটার টার্মিনাল। যে-কোনও ভোটার সেখানে গিয়ে কিবোর্ডে নিজের গোপন কোড নম্বরটা পাঞ্চ করবে। নম্বরটা পাসওয়ার্ডের মতো। টাইপ করলেও কম্পিউটারের টিভি পরদায় দেখা যাবে না, তবে কাজ হবে। তখন কম্পিউটার ভোটারের নাম জানতে চাইবে। নাম ও কোডনম্বর যদি ঠিক-ঠিক খাপ খায় তা হলেই কিবোর্ডের নির্দিষ্ট বোতাম টিপে ভোটার ভোট দিতে পারবে। তা না হলে হাজার বোতাম টিপলেও কম্পিউটার তাকে ভোট দিতে দেবে না। আর ভোট চলবে তিনদিন ধরে। সুতরাং তাড়াহুড়োর কোনও ব্যাপার নেই। তা ছাড়া রিগিং ইত্যাদিও অকেজো হয়ে যাবে।

আর মাত্র দশদিন পরেই ভোট। সুতরাং হঠাৎই এই কম্পিউটার-নির্ভর ভোটের ঘোষণা অনেককেই চমকে দিয়েছিল। আর তাই নিয়ে এই চায়ের দোকানে কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। যাতায়াতের পথে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা আদিত্যর কানে গেছে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, আজকের এই মুহূর্তের বিষয় ধোঁয়াশা।

জটলার মধ্যে শঙ্করবাবুকেও দেখতে পেল আদিত্য। গায়ে সাদা শার্ট আর হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। দু-হাত পিছনে রেখে গম্ভীরভাবে সকলের মতামত শুনছেন। আদিত্যকে দেখতে পেলেন। এগিয়ে এসে কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিলেন নিজেকে। শুধু ঘোলাটে দু-চোখে কাতর অনুনয় ফুটে উঠল।

আদিত্য দূর থেকেই সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, মনে আছে ওর। ভোলেনি।

বয়স্ক মানুষের দল এই কুয়াশা বা ধোঁয়াশা নিয়ে যতই মাথা ঘামাক আদিত্যর মনে হল, ব্যাপারটা মোটেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ধোঁয়া ধুলোয় এরকম তো হতেই পারে! গলা খুসখুস করে উঠল, কিন্তু ও সেটাকে আমল না দিয়ে সুনয়নাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ওদের বাড়ির কাছে যে-করপোরেশনের কলটা আছে সেখানে দুজন লোককে দেখল আদিত্য। চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সত্যি, মানুষের আতঙ্ক যে কতরকমের হতে পারে! এই তো, বছর-পঁচিশ আগে, ১৯৮০ সালে, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হল! প্রচারের ফলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, সেদিন রাস্তাঘাট ফাঁকা ধুধু করছে। আদিত্য তখন স্কুলে পড়ে, ক্লাস থ্রিতে। কিন্তু ওর মনে আছে। বাবা সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য একজোড়া কালো কাচ জোগাড় করেছিল। রাস্তায় বেরিয়ে দেখেছিল পূর্ণগ্রাস। আদিত্য আর পলাশকেও দেখিয়েছিল। অথচ প্রচারের দাপটে বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা হয়েছিল, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা মানেই পরলোকের পাসপোর্ট হাতে নেওয়া।

হাসি পেয়ে গেল আদিত্যর। আপনমনে হাসতে-হাসতেই সুনয়নাদের বাড়ির কলিংবেলের বোতাম টিপল ও।

রাস্তা দিয়ে কয়েকটা গাড়ি চলে গেল। হেডলাইট জ্বলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গতি অত্যন্ত ধীর। ফুটপাথের ধারে ডক্টর মণ্ডলের চেম্বারের সামনে একদল ছেলে আড্ডা মারছে। অবয়বগুলো বোঝা গেলেও এখান থেকে চেনা যাচ্ছে না।

চোখ ফেরাতেই চমকে উঠল। সুনয়না। সবুজ-সাদা-কালোয় ছাপা ম্যাক্সির মতন কী একটা পোশাক পরে আছে। কোমরে একজোড়া বেল্ট। চকচকে আংটা লাগানো।

'দেখছিলাম, কতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকতে পারেন।' নয়না হাসল, বলল, 'ভেতরে আসুন—' একটু থেমে আবার, 'নাকি কুয়াশার জন্যে পড়া থেকে ছুটি?'

আদিত্য ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'এখন পড়াতে আসিনি। সবে তো সওয়া পাঁচটা বাজে!'

নয়না দরজা বন্ধ করছিল আবার। হেসে মন্তব্য করল, 'আজ না হয় এক-দেড়ঘণ্টা বেশিই পড়ালেন। বাবাকে বললেই মাইনে বাড়িয়ে দেবে—।'

আদিত্য সুনয়নাকে দেখল। কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তারপর ঘরের কোণে চটিজোড়া ছাড়তে-ছাড়তে নীচু গলায় বলল, 'তোমার ইকনমিক্স নিয়ে পড়া উচিত ছিল।'

সুনয়না ভুরু কপালে তুলে বলে উঠল, 'ও মা! কী সর্বনেশে কথা, দিতুদা! তখন তা হলে আমাকে পড়াত কে?' তারপর একটু যেন চিন্তা করে বলল, 'অবশ্য আপনার কোনও অসুবিধে হতো না। কমলি তো ফিজিক্স নিয়ে পড়ে—ওকে পড়াতেন। বেচারা সবসময় আপনার কথা বলে—।'

আদিত্য গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'কী হচ্ছে, নয়না!'

নয়না হাসল। সুন্দর ছোট-ছোট দাঁত দেখা গেল ওর। বলল, 'এখনও বোঝেননি কী হচ্ছে! বাংলায় এর নাম ফাজলামি। বানান করে দেব?'

আদিত্য দম ছেড়ে মাথা নাড়ল হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে।

ঠিক তখনই নয়নার মা ঘরে এলেন। গোলগাল গিন্নিবান্নি চেহারা। বড় মাপের সিঁদুরের টিপ কপালে। ফরসা গালে সবে দু-একটা ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। রগের কাছে কয়েকটা রুপোলি চুল।

ভদ্রমহিলা মিষ্টি গলায় আদিত্যকে বসতে বললেন।

ঘরের এক কোণে একটা টেবিল। তার দু'পাশে দুটো চেয়ার। নয়না এখানে বসেই আদিত্যর কাছে পড়ে।

টেবিলের কাছ থেকে খানিকটা দূরে একটা লম্বা সোফা। বাদামি ভেলভেটের ঢাকনা দেওয়া। তার ওপরে দুটো-তিনটে ম্যাগাজিন আর একটা টিনটিনের বই।

আদিত্য মোজেইক করা মেঝেতে পা ফেলে দেওয়াল ঘেঁষা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। তারপর মা ও মেয়েকে দেখল। কত আলাদা!

সুনয়নার বয়কাট চুল। গলা লম্বা। থুতনি সামান্য উঁচিয়ে দাঁড়ানো অভ্যেস। ফলে একটা উদ্ধত ভাব ফুটে উঠেছে। চোখ ছোট হলেও গভীর। কপালে বাঁদিকে একটা তিল রয়েছে। চোয়াল চওড়া, শক্ত। ঠোঁট পাতলা অথচ সবসময়েই যেন অভিমানে ফুলে আছে।

সুনয়না আদিত্যর উলটোদিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ডিসটেম্পার করা গোলাপি দেওয়ালের পটভূমিতে ওকে পোস্টারের মতন দেখাচ্ছে। আর ওর শ্যাম্পু করা চুলের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে গাঢ় বাদামি রঙের দুটো ল্যাম্পশেড।

নয়নার মা সুইচ টিপে ঘরের টিউব লাইটটা জ্বেলে দিলেন। এবার স্পষ্ট বোঝা গেল, কুয়াশার খানিকটা ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে।

সুনয়না হঠাৎই ভেতরে চলে গেল। আদিত্য ওর চলে যাওয়া দেখল। তারপর আলতো গলায় বলল, 'মাসিমা, আপনার চোখ জ্বালা করছে? কাশি পাচ্ছে?'

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েই ছিলেন। বললেন, 'না তো, তেমন কিছু না।' তারপর টেনে ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করলেন যেন।

টেবিলে নয়নার কয়েকটা বইখাতা অগোছালোভাবে পড়ে ছিল। উনি সেগুলো ঠিক করে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ। জানলায় সুন্দর-সুন্দর পরদা। দেওয়ালে তিনটে বাঁধানো ছবি ঝুলছে। একটি বালক শ্রীকৃষ্ণ, আর দুটো প্রকৃতির ছবি—সবুজ আর নীলে মাখামাখি। শেষ ছবি দুটোর মধ্যে ইংরেজিতে ক্যাপশন লেখা রয়েছে। প্রথমটায় লেখা, 'টুডে ইজ দ্য ডে'। আজই সেই দিন। আর দ্বিতীয়টায় লেখা, 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড নেচার'। ঈশ্বর প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন।

ঘরের মধ্যে মানানসই বুক কেস রয়েছে একটা। দেওয়ালে বসানো। তার নীচের তাকে ছোট রঙিন টিভি। লেসের কাজ করা সুন্দর কাপড়ে ঢাকা। আদিত্যের মনে হল, ঘরের সাজসজ্জায় আর্থিক সচ্ছলতা লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা নেই।

সুনয়নার বাবা সুখেন্দু দত্ত এ-পাড়ার বহু বছরের বাসিন্দা। ইলেকট্রনিক জিনিসপত্তরের ব্যাবসা করেন। চাঁদনি চকে বেশ বড় দোকান। প্রায়ই সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান যাতায়াত করেন ব্যবসার কাজে। সুনয়না ওঁদের একমাত্র মেয়ে। ওর জন্য আপাতত যা করেছেন তাই অনেক। এই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। দুটো গাড়িঃ একটা মারুতি ২০০০, আর অন্যটা মারুতি জিপসি। নিজের বাড়িতেই

বড় গ্যারেজ, এ ছাড়া সল্টলেকেও চারকাঠা জমি কেনা আছে। আর আদি সপ্তগ্রামে প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি।

সুনয়নাই এসব খবর দিয়েছে আদিত্যকে। ওকে আদিত্য পড়াচ্ছে আজ প্রায় দেড় বছর। কিন্তু কখনও ওর মধ্যে বাড়তি অহংকার লক্ষ করেনি। ওর বাবার সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয় আদিত্যর। আর দেখা যদিও বা হয়, কথা তেমন হয় না। বেশিরভাগ সময়ে সুখেন্দুবাবু শুধু একটা কথাই বলেন, 'কী, নয়না ঠিকমতো পড়ছে তো?' আর আদিত্যও ঘাড় নেড়ে বলে, 'হুঁ—'। এখানেই যাবতীয় আলাপের শেষ।

সুখেন্দুবাবুর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। চুল বেশ কাঁচাপাকা। চোখে শৌখিন ফ্রেমের চশমা। দেখলে রাশভারী বলে মনে হয়। তবে আদিত্যর সঙ্গে যখনই হিসেবের বাইরে কথা বলেছেন তখনই 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন। এটা আদিত্যর অদ্ভুত লেগেছে। তবে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এই পদ্ধতিটা বেশ কাজের। যদিও সুনয়নার মা এই দূরত্ব বজায় রাখেননি।

নয়নাকে পড়িয়ে আদিত্য যা মাইনে পায় সেটা ও কাউকে সহজে বলে না। কারণ, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। সপ্তাহে দু-দিন পড়িয়ে একহাজার টাকা, এটা বিশ্বাস না করারই মতো।

সুনয়নার মা বইপত্র গোছগাছ করে সবে সুস্থির হয়েছেন, এমনসময় মেয়ে যেন হাওয়ায় ভেসে ঘরে ঢুকল।

পোশাক পালটে ফেলেছে এরই মধ্যে। দিনের মধ্যে কতবার যে ও পোশাক বদলায় তার কোনও হিসেব নেই। সেইসঙ্গে মুখেও বোধহয় পাউডার-ক্রিম কিছু একটা ঘষে থাকবে—অন্তত আদিত্যর তাই মনে হল।

ওর এখনকার পোশাকটা কাটছাঁটে আগেরটার মতোই। তবে রং অনেক ফিকে। হালকা নীল। তার ওপরে ছোট-ছোট হলদে ফুলের নকশা।

'মা-মণি, টিভিতে নাকি স্পেশাল নিউজ হচ্ছে।' বলেই টিভির সুইচটা অন করে দিল সুনয়না। ভলিয়ুম কন্ট্রোলের নবটা ডানদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'আমি দোতলায় ড্রেস চেঞ্জ করছিলাম, সোনালি ও-বাড়ির বারান্দা থেকে ডেকে বলল।'

সোনালি হয়তো পাশের বাড়ির বন্ধু-টন্ধু কেউ হবে। নয়নার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

নয়নার মায়ের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। তিনি সোফার দিকে সরে গেলেন। কিছুটা দূরত্ব থেকে টিভির ছবি দেখবেন। আর নয়না এসে আদিত্যর সামনের চেয়ারটায় বসল, বসে বলল, 'দিতুদা, আপনার গার্ড হচ্ছে না তো?'

আদিত্য মাথা নেড়ে জানাল, না। ততক্ষণে টিভি সরব হয়ে গেছে।

'...তবে আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা জানিয়েছেন, এই ধোঁয়াশায় ভয়ের কিছু নেই। তাঁরা ল্যাবরেটরিতে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছেন, আগামীকালই সেসব পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে-কালো বৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে এই ধোঁয়াশার কোনও সম্পর্ক নেই। হয়তো কোথাও মাটি খোঁড়ার কাজ চলেছিল। তারপর ঝোড়ো বাতাসে ধুলোর ঝড় উঠে এই অবস্থা হয়েছে। বিষয়টা তদন্ত করে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের আবেদন জানানো হয়েছে।

'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণকে শান্ত থাকতে অনুরোধ করেছেন। কোনওরকম গুজবে তাঁরা যেন কান না দেন। তিনি আরও বলেছেন, গুজব রটনাকারীদের সন্ধান পেলে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

'এ-পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে এই ধোঁয়াশা কলকাতার সীমাবদ্ধ এলাকাতেই শুধু লক্ষ করা গেছে। দক্ষিণে যাদবপুর, উত্তরে বরানগর, পশ্চিমে গঙ্গা, আর পুবে সি. আই. টি. রোড ও ইস্টার্ন বাইপাস—এই হল মোটামুটি এর সীমানা। তবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই ধোঁয়াশা মানুষের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা লন্ডন ও লস এঞ্জেলেসের ধোঁয়াশার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৫ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত লন্ডনে এক ধোঁয়াশা দেখা দেয়। তারও আটবছর আগে আমেরিকার লস এঞ্জেলেসের প্রায় একইরকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু কলকাতার এই হালকা ধোঁয়াশা তার তুলনায় নিতান্তই নিরীহ। বিজ্ঞানীরা এ-কথায় জোর দিয়ে বলেছেন, আবহমণ্ডলের টোপোস্ফিয়ার অঞ্চলের কয়েকটি স্তরে বায়ুচাপের সামান্য তারতম্য ঘটায় এই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস, কাল সকাল ছ'টার মধ্যেই আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

'কলকাতা দূরদর্শন থেকে প্রচারিত বিশেষ সংবাদ বুলেটিন এখানেই শেষ হল। প্রয়োজন হলে পরবর্তী বিশেষ সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হবে...নমস্কার...।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে টিভির সুইচটা অফ করে দিল সুনয়না। হেসে বলে উঠল, 'কী থ্রিলিং, না দিতুদা?' তারপর আবার চেয়ারে এসে বসে পড়ল।

আদিত্য কোনও জবাব দিল না।

সুনয়নার মা খবর শুনতে-শুনতে কখন যেন সোফায় বসে পড়েছিলেন। একটু কেশে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই, কী বলো আদিত্য?'

আদিত্যর মনে হল, ভদ্রমহিলা ওর কাছে যেন ভরসা চাইছেন। ও নীচু গলায় বলল, 'না-না, দেখবেন কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভদ্রমহিলা আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করলেন। তারপর থেমে-থেমে বললেন, 'নয়নার বাবা গতকাল টোকিও রওনা হয়েছে। প্রায় সাত-আট দিন বাদে ফিরবে। এ সময় যদি হুট করে কিছু হয়...তার ওপর সামনে ভোট...।'

আদিত্য বুঝল, ভদ্রমহিলা কোনও একটা উত্তর আশা করছেন, কিন্তু ও কোনও জবাব দিল না। লক্ষ করল, সুনয়না ওর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। সেই মুখে অস্পষ্টভাবে কয়েকটা ঘামের ফোঁটা দেখা গেল যেন। উনি শ্রীকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কপালে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছে নেওয়ার ভান করলেন। সুনয়না হেসে বলল, 'মা-মণি, "শোলে" ছবিতে গববর সিং কী বলেছে মনে আছে? জো ডর গয়া, সমঝো কে মর গয়া।' শেষের কথাটা ও হিন্দি ছবির সংলাপ বলার মতো নাটকীয় ঢঙে উচ্চারণ করল।

আদিত্য বলে উঠল, 'কী হচ্ছে, নয়না!' তারপর ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলেন, এসব হচ্ছে গাদাগুচ্ছের ভিডিয়ো ক্যাসেট দেখার ফল—।'

ভদ্রমহিলা হেসে ফেলেছিলেন। ছোট্ট করে 'ফাজিল' বলে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

আর তখনই ট্রে-তে দু-কাপ চা ও কয়েকটা নোনতা বিস্কুট নিয়ে একজন পরিচারক ঘরে এল। ট্রে-টা নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর, চলে যাওয়ার আগে, বলে গেল, 'দিদিমণি, আপনার ফোন এসেছে—'

'দিতুদা, আপনি চা খান, আমি এক্ষুনি আসছি। নিশ্চয়ই মোনালিসার ফোন, অপটিক্স-এর ক্লাসনোটগুলো চাইবে—।'

নয়না চলে যেতেই চায়ের কাপ তুলে নিল আদিত্য। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তখনই ওর খেয়াল হল, ধোঁয়াশা প্রায় কেটে গেছে। ওর ইচ্ছে হল, জানলা খুলে বাইরের অবস্থাটা একবার দ্যাখে, কিন্তু কেমন যেন ক্লান্তি টের পেল শরীরে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম পাচ্ছে নাকি?

আদিত্য সাততাড়াতাড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বুঝল জিভের ডগা পুড়ে গেছে।

সুনয়না এসে ঢুকল দমকা বাতাসের মতো। বলল, 'যা বলেছি তাই, মোনালিসার ফোন। ও ভীষণ সিরিয়াস।' তারপর প্লেট থেকে দুটো বিস্কুট তুলে নিয়ে কামড় দিল। চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল তাতে।

আদিত্য আড়চোখে তাকাল হাতঘড়ির দিকে। প্রায় পৌনে ছ'টা। ওর ইচ্ছে হল, একবার ছাদে যায়। আকাশটা কেমন লাগছে এখন?

প্রস্তাবটা নয়নাকে দিতেই ও এককথায় রাজি। সুতরাং চায়ের কাপ হাতে সোজা ছাদের দিকে।

ছাদে গিয়ে আকাশ-বাতাসের অবস্থা দেখে বিচলিত হল আদিত্য। অথচ খবরে বলা হয়েছে ব্যাপার তেমন গুরুতর নয়। অবশ্য আদিত্য নিজেও তা মনে করেনি। কিন্তু এখন, এই তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে এবং পশ্চিমের আকাশ-রেখার দিকে তাকিয়ে, ও যেন একটা আলতো ধাক্কা খেল।

বাদামি ধূসর ধোঁয়াশার এক বিশাল ওড়না যেন কোনও অদৃশ্য হাত বিছিয়ে দিয়েছে গোটা শহরের শরীরে। অকালসন্ধ্যায় ঝাপসা পাখিরা ডানায় ভেসে উড়ে যাচ্ছে আস্তানার দিকে। এক ম্লান কনে-দেখা আলো ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। আর পশ্চিমের লাল সূর্যের ছবি যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা, রহস্যময়।

সুনয়না বলল, 'আকাশটা কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'

আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিল। দেখল নয়নাকে। ও অনেকটা দূরে। ঝাপসা দেখাচ্ছে ওকে। নয়নাদের ছাদ মাপে বেশ বড়। ছাদের পুবদিকের পাঁচিলে লম্বালম্বিভাবে মাটি ফেলে গাছ লাগানোর আয়োজন করা হয়েছে। তাতে নানারকম ফুলগাছ। আদিত্য গাছগুলোর কাছে গেল। সবুজ পাতাগুলো কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে জল পায়নি।

নয়না কখন যেন আদিত্যর খুব কাছে এগিয়ে এসেছিল। আদিত্যর থমথমে মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বলল, 'দিতুদা, কী হল?'

আদিত্য মাথা তুলে আকাশের দিকে দেখল। আকাশের একটা দিক কালচে দেখাচ্ছে। বৃষ্টি হবে নাকি? টিভির খবরের কথাগুলো মনে পড়ছিল আদিত্যরঃ '...এই ধোঁয়াশায় ভয়ের কিছু নেই...এই ধোঁয়াশা মানুষের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়...।'

সুনয়না আবার বলল, 'কী হল, দিতুদা?'

আদিত্য আকাশ থেকে ছাদে নেমে এল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই...।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল আদিত্যর গায়ে। আদিত্য অবাক হয়ে দেখল, ওর সাদা পাঞ্জাবিতে ফোঁটাগুলো চিতাবাঘের গায়ের মতো কালো চাকা-চাকা দাগ তৈরি করেছে।

সুনয়না অবাক হয়ে এই অদ্ভুত কালো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো দেখছিল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওর হাত ধরে আদিত্য এক হ্যাঁচকা টান মারল। বলল, 'নয়না, জলদি—!'

তারপর ওরা দুজনে ছুটতে শুরু করলে ছাদের সিঁড়ির দিকে।

তখনই চায়ের কাপ দুটো ছিটকে পড়ল ছাদে। ভেঙে গেল ঝনঝন শব্দে।

নিরাপদ আশ্রয়ে এসে আদিত্য টের পেল, ওর গালেও বৃষ্টির দু-একটা ফোঁটা পড়েছে।

ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে আদিত্য পড়াতে বসল নয়নাকে। কিন্তু দুজনের কেউই মন বসাতে পারছিল না। ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও বাইরের বৃষ্টির শব্দ ওরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে। কালো বৃষ্টি। এই প্রথম।

তিন

আদিত্যর সারা মাথা, গা, ধীরে-ধীরে ঢেকে যাচ্ছিল কালো রঙে। কালো চটচটে এক আঠালো তরল, সাপের শরীরের মতো পিছল। ওর মুখ-হাত-পা জ্বালা করছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল একটু-একটু করে।

ও আকাশের দিকে তাকাল। ধোঁয়াটে আকাশে কালো রঙের সূর্য। কী অদ্ভুত! সূর্যটা ধীরে-ধীরে গলে গিয়ে তরল ফোঁটা টপটপ করে ঝরে পড়ছে আদিত্যর গায়ে।

আদিত্য চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই দূরে মুন্নিকে দেখতে পেল ও। মেয়েটা অবাক চোখে আদিত্যর বিচিত্র চেহারা দেখছে। দেখতে-দেখতে কিশোরীর দু-চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। আদিত্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। শুয়ে পড়েছিল মেঝেতে। দৌড়ে ওর কাছটিতে এসে মুন্নি ওর ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়ে বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখতে লাগল। ডুকরে উঠে কয়েকবার ডাকল, ‘ছোড়দা! ছোড়দা!’ তারপর মুখে হাত গুঁজে রক্ত হিম করা চিৎকার করে উঠল। একবার। দুবার। বারবার।

মুন্নির ভয়ঙ্কর চিৎকারে আদিত্যর কানের পরদা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল।

আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল আদিত্যর।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল কোনও মেয়ের গলায় তীব্র চিৎকার। সে চিৎকারে শোক দুঃখ, আশঙ্কা এবং উলঙ্গ আতঙ্ক মিশে রয়েছে। চিৎকারটা একটানা বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে হওয়ার পর থামল। তারপর আবার শুরু হল। থামল। আবার...।

আদিত্য স্পষ্ট বুঝতে পারল চিৎকারটা আসছে দোতলা থেকে। কিন্তু গলার স্বর কেমন বিকৃত হয়ে পড়ায় চিৎকারের মালিককে ও শনাক্ত করে উঠতে পারছিল না।

গতকালের কথা মনে পড়ল ওর। আর সেইসঙ্গে এইমাত্র দেখা ভোরবেলার স্বপ্নটার কথা।

কাল বৃষ্টি চলেছিল প্রায় একঘণ্টা ধরে। বৃষ্টির শেষে জানলা খুলে রাস্তায় উঁকি মেরেছিল আদিত্য। ধোঁয়াশা কেটে গিয়ে পরিবেশ তখন পরিষ্কার। কিন্তু রাস্তাটা কালো চকচকে হয়ে গেছে, ময়াল সাপের মতো। রাস্তায় লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। আদিত্য তার একবর্ণও বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হল, এ-আলোচনা সামনে হাজির হওয়া ভোট নিয়ে নয়।

নয়না টিভি চালিয়েছিল। তাতে অনেকক্ষণ ধরে প্রচারিত হল বিশেষ সংবাদ বুলেটিন। বক্তব্যের রকমফের কিছু হয়নি। তবে জনগণকে সাবধান ও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। একজন আবহবিজ্ঞানী ও একজন পরিবেশবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল। সেই সাক্ষাৎকারের শেষে আদিত্যর মনে হল, প্রথম সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হওয়ার সময় যতটা জোর দিয়ে সবাইকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলা হয়েছিল, এখন তার অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে।

সাক্ষাৎকারে প্রথমে আলোচনা করা হল ধোঁয়াশা নিয়ে। তাঁরা বললেন, পরীক্ষা করে আপাতত যা জানা গেছে তাতে কলকাতার এই ধোঁয়াশা 'ফটোকেমিক্যাল স্মগ' বা আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা। যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় যে-নাইট্রিক অক্সাইড আর হাইড্রোকার্বন থাকে, সূর্যের আলোর ক্রিয়ায় তা থেকে তৈরি হয় এক জটিল মিশ্রণ। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হল 'প্যান' বা পারক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট। এ ছাড়া রয়েছে ওজোন। ওজোন গ্যাস গাছের পাতায় ঢুকে পড়ে প্যালিসেড কোষকে আক্রমণ করে। ফলে ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়, সালোকসংশ্লেষের হার কমে আসে। অবশেষে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের ছোপ পড়ে, অথবা পাতার নানা জায়গা বিবর্ণ হয়ে যায়।

আলোচনার শেষ অংশে এল কালো বৃষ্টির কথা। এই বৃষ্টির জল যে ধর্মে আম্লিক, তা প্রাথমিক পরীক্ষাতেই ধরা পড়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এই 'খুনি' বৃষ্টি ঠিক কতটা ক্ষতি করেছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বহু হ্রদ ও বনাঞ্চলের ক্ষতি করেছে এই বৃষ্টি। সুইডেনের পনেরো হাজার হ্রদের জল এই বৃষ্টিতে আম্লিক হয়ে গেছে। নরওয়েরও প্রায় একই দশা। আমেরিকা আর কানাডাতেও একই ঘটনা লক্ষ করা গেছে।

আদিত্য ও সুনয়না গভীর মনোযোগে শুনছিল ভয়ঙ্কর অম্লবৃষ্টির কথা।

কোনও তরল কী পরিমাণ আম্লিক সেটা নির্ভর করে তার পি-এইচ মানের ওপরে। যেমন বিশুদ্ধ জলের পি-এইচ মান ৭, আর বৃষ্টির জলের পি-এইচ মান ৫.৬ এর নীচে হলেই তাকে অম্লবৃষ্টি বলা হয়। আমেরিকার পূর্ব অঞ্চলে ৪.৬ পি-এইচ মানের অম্লবৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪-এ বম্বের টম্বে ও চেম্বুরে ৪.৫ ও ৪.৮ পি-এইচ মানের বৃষ্টি হয়েছে। এমনকী দিল্লি, নাগপুর ও পুনেতেও একই ধরনের বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে।

এখন ভারতে কয়লার উৎপাদন প্রায় তিরিশ কোটি টন। এই কয়লার দহনের ফলেই তৈরি হচ্ছে ক্ষতিকর সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এ থেকেই তৈরি হয়ে গেছে নানা অ্যাসিড। এই অ্যাসিড-বৃষ্টি মাটি শুষে নিলে রসায়ন ও জীববিদ্যাগত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বহু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

শুনতে-শুনতে আদিত্যর মাথা টিপটিপ করছিল। আর নয়নার ফরসা মুখ বেশ খানিকটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। আদিত্য চলে আসার সময় ও বলেছিল, 'দিতুদা, কী হবে বলুন তো শেষ পর্যন্ত?'

আদিত্য একটু আগেই ছাদে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'ভয়ের কিছু নেই—' এখানে সেই কথাটাই আবার বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে গেল। কেমন একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

ভেজা রাস্তায় পা ফেলে বাড়ি ফেরার সময় সুনয়নার প্রশ্নের উত্তরটাই খুঁজছিল আদিত্য। রাতে শোওয়ার সময়েও প্রশ্নটা ওর মাথা থেকে যায়নি। হয়তো সেইজন্যেই ভোরবেলার দুঃস্বপ্নটা দেখতে হয়েছে ওকে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, যে-চিৎকারটা ও দোতলা থেকে শুনতে পাচ্ছে সেটা তো আর দুঃস্বপ্ন নয়। বাস্তব।

একটা চরিত্রহীন ভয় ঘিরে ধরল আদিত্যকে। ওর বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল। এক ঝটকায় বিছানা ছেড়ে উঠে ও হুড়মুড় করে দৌড়ল সিঁড়ির দিকে। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে যখন ও দোতলায় পৌঁছল ততক্ষণে চিৎকারটা বুক ভাঙা কান্নার চেহারা নিয়েছে।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই পলাশের সঙ্গে দেখা হল আদিত্যর। সবে স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। পলাশ রোজই সকাল-সকাল স্নান সেরে নেয়।

আদিত্য জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, দাদা?'

পলাশের হাতে গামছা। মাথা ঘষছিল সেটা দিয়ে। আদিত্যর প্রশ্নে ঠোঁট ওলটাল।

পলাশকে ডিঙিয়ে আদিত্য ছুটে গেল বড় ঘরের দিকে। সেখানে পৌঁছেই শোকের ঘটনাটা ও দেখতে পেল।

ভক্তদাসের তারের খাঁচাটা দু-হাতে জাপটে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে মা। এই কান্নার সঙ্গে তেরো বছর আগের ভয়ংকর কান্নার কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। আদিত্যর মনে হল, মায়ের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটা অশরীরী অবয়ব। সে বলছে, 'নিভা, কাঁদছ কেন? এই তো আমি—।' কিন্তু মায়ের কান্না থামছে না। মায়ের বিছানায় রাখা রেডিয়োতে তখন গানের সুর বাজছে।

মুন্নি, বউদি আর নানকু মা-কে ঘিরে জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল। আদিত্য কাছে যেতেই লতা চাপা গলায় বলল, 'ভক্তদাস হঠাৎ মরে গেছে—।'

এমনসময় পলাশ পিছনে এসে দাঁড়াতেই নানকুর হাত ধরে লতা ওর কাছে চলে গেল। নীচু গলায় কীসব বলতে লাগল।

মুন্নি মা-কে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। আদিত্য হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল খাঁচার কাছে। ভালো করে দেখল ভেতরটা। সবুজ পাখিটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে তারজালির মেঝেতে। চোখ আধবোজা। যেন ঘুমিয়ে আছে। আর মুখের সামনে খানিকটা রক্ত পড়ে আছে।

কাঁদতে-কাঁদতে মায়ের শীর্ণ শরীরটা হাঁপাচ্ছিল। মুন্নি কিছুতেই মা-কে খাঁচার কাছ থেকে সরাতে পারছিল না। মা ভাঙা গলায় ইনিয়েবিনিয়ে কত কথাই না বলছিল।

আদিত্য এই শোকের কিছুটা বুঝতে পারছিল হয়তো। পাখিটার গায়ে বাবার আদরের ছোঁওয়া লেগে ছিল। ওর অস্তিত্বের মধ্যে পৃথিবী-ছেড়ে-চলে-যাওয়া একটা মানুষের অস্তিত্বের তীব্র স্মৃতি

রয়ে গিয়েছিল। মায়ের মন কিছুতেই সেটা হারাতে চাইছিল না। কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসার টান সুতোর মতো। নিষ্ঠুর হাতে সুতোটা ছিঁড়ে দিলেই হল।

অনেক চেষ্টার পর মা-কে বিছানায় নিয়ে যেতে পারল মুন্নি। লতা এক গেলাস জল এনে ধরল মায়ের মুখের কাছে। মায়ের শরীরটা হেঁচকি তুলে কেঁপে উঠছিল বারবার। কোনওরকমে দু-চার চুমুক জল খেল।

পলাশ নীচু গলায় আদিত্যকে ডাকল। আদিত্য তাকাল দাদার দিকে। ইশারায় বোঝাল, 'তুমি যেতে পারো, আমি দেখছি—।'

পলাশ নানকুকে নিয়ে চলে গেল। বাচ্চাটা হঠাৎই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে।

মা-কে স্বাভাবিক হওয়ার সময় দিচ্ছিল আদিত্য। সেই ফাঁকে ও তাকাল টেবিলঘড়ির দিকে। সওয়া সাতটা বাজে। অথচ রোদের দেখা নেই।

বারান্দার খোলা দরজার দিকে দেখল ও। গতকাল বৃষ্টির পর আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার ধোঁয়াশার মেঘ ঘষা কাচের কাজ করছে। তারই মাঝে ভেসে যাচ্ছে গাঢ়তর কুয়াশার রেখা।

খাঁচা ছেড়ে উঠে মায়ের কাছে গেল আদিত্য। মা আর মুন্নির কাছ থেকে টুকরো-টুকরোভাবে যেটুকু জানতে পারল তা হল, সকালবেলা চায়ের পাট সেরে ভক্তদাসকে বারান্দার রেলিঙে রাখতে গেছে মা। আর তখন সতেজ পাখিটা হঠাৎই বারকয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে পড়ে যায় দাঁড়ের ওপর থেকে। ওর মুখ থেকে খানিকটা কাঁচা রক্ত বেরিয়ে আসে। মা বারবার ডাকলেও সাড়া দেয়নি আর। চোদ্দো বছরের জীবনে দাঁড়ি পড়ে গেছে।

বিছানার পাশেই একটা ছোট তাকে মায়ের নানা ওষুধ। সেখান থেকে মাকে একটা ট্যাবলেট এনে দিল মুন্নি। মা কোনওরকমে সেটা গিলে ফেলল।

গলি থেকে রামুদার গলার আওয়াজ ভেসে এলঃ '—কালো, জগতের আলো। কলকাতায় কালো বৃষ্টি। কী সৌভাগ্য আমাদের! আকাশ থেকে বিনি পয়সায় আলকাতরা—।'

রামুদা এ-গলির বেশিরভাগ বাড়িতেই খবরের কাগজ দেয়। আর বরাবরই সাইকেল ছুটিয়ে যেতে-যেতে কাগজের হেডলাইনগুলো নিজের মতো করে শুনিয়ে দেয় সবাইকে।

লতা জিগ্যেস করল, 'চা দেব, ছোড়দা?'

আদিত্য বলল, 'না, মুখ ধুইনি—।'

বারান্দায় ধপ করে একটা শব্দ হল। খবরের কাগজটা বারান্দায় ছুড়ে দিয়েছে রামুদা। আদিত্য ভক্তদাসের খাঁচার দিকে একবার দেখল, তারপর দ্রুতপায়ে বারান্দায় গিয়ে কাগজটা তুলে নিল।

কাগজের প্রথম পাতায় প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে শুধু ধোঁয়াশা আর কালো বৃষ্টির কথা। আর বাকি অংশে ভোট ও রাজনৈতিক আলোচনা। আদিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল।

এই ধোঁয়াশা শুধু কলকাতাকে ঘিরেই। তার বাইরে নাকি খুব দ্রুত ফিকে হয়ে গেছে। আর কালো বৃষ্টির ধরনটাও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের থেকে আলাদা। বিজ্ঞানীরা এখনও এই অদ্ভুত ঘটনার সঠিক কার্যকারণ খুঁজে পাননি। তবে তাঁরা এটুকু জানিয়েছেন, এই পরিবেশ দূষণ মানুষের পক্ষে মারাত্মক নয়। অন্তত এখনও। তবে এই পরিবেশ যদি বজায় থাকে, তা হলে রাজ্যে ভোটগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ-বিষয়ে উদ্বিগ্ন। নাগরিক নিরাপত্তা পরিষদ এরই মধ্যে মহাকরণ অভিযানের হুমকি দিয়েছে।

এরপরই কয়েকটা দুর্ঘটনার খবরের দিকে নজর গেল আদিত্যর। কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় একটি যাত্রীবাহী বিমান সামান্য জখম হয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে আজ থেকে বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় বাস, মিনিবাস, স্কুটার ইত্যাদি জড়িয়ে চারটি দুর্ঘটনা হয়েছে।

আদিত্য আকাশের দিকে দেখল। অবস্থা ধীরে-ধীরে কাল বিকেলের মতোই হয়ে উঠেছে। এই ধোঁয়াশা যদি আরও গাঢ় হয়ে ওঠে তা হলে রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া আর চলতে পারবে না। সে-অবস্থায় মাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে বেরোনোটা বোধহয় ঠিক হবে না।

এরকম এলোমেলো নজর চালাতে-চালাতেই ওর চোখ গেল মাধবীলতা গাছটার দিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই যেন একটা ধাক্কা খেল আদিত্য।

গতকাল সকালেও যে গাছটা সজীব সতেজ ছিল, আজ কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। গাছটার সারা শরীরে বিবর্ণ ছোপ। এই গ্রীষ্মেই যেন হেমন্ত এসে গেছে।

আদিত্য ভয় পেল। খবরের কাগজ হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল ও।

লতা নেই। মুন্নি তখনও মায়ের কাছে বসে। মা চুপচাপ বসে রয়েছে জানলার দিকে তাকিয়ে। চশমায় আলো পড়েছে। চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে শোকের হিজিবিজি যেন এরই মধ্যে আরও নিষ্ঠুর আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মুন্নির দিকে খবরের কাগজটা বাড়িয়ে ধরতেই ও উঠে এল কাছে। আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'মাধবীলতা গাছটার অবস্থা দেখেছিস?'

মুন্নি অবাক হল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভক্তদাসকে ওই গাছটার গোড়ায় কবর দিয়ে দিস...মা বলছিল...।'

আদিত্য কাগজটা ওর হাতে দিয়ে ঘাড় নাড়ল। ওই গাছটা তেরো বছরের পুরোনো। বাবার অস্থিভস্ম ও নাভি ওই মাটিতে পুঁতে দিয়ে গাছের চারাটা বসানো হয়েছিল। আদিত্যর মনে হল,

কী আশ্চর্যভাবেই না তেরো বছরের ব্যবধানে একটা সবুজ টিয়াপাখির সঙ্গে বাবার একটা স্থায়ী নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠল।

আদিত্য গলায় টক স্বাদ টের পেল। সকালে উঠে মুখ ধোওয়া হয়নি, হয়তো সেইজন্যেই। এখনও অনেক কাজ বাকিঃ মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, বাজার, তারপর অফিস। একদিনের বাজার আগাম করা থাকে বলেই রক্ষে। বউদি হয়তো এতক্ষণে রান্না অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। দাদাকেও তো অফিসে বেরোতে হবে।

ঘর ছেড়ে কলতলায় যাওয়ার আগে বাবার ফটোর কাছে এক মুহূর্ত দাঁড়াল আদিত্য। পেতলের থালায় রাখা আজকের নয়নতারা ফুলগুলো শুকনো শীর্ণ।

অথচ ভোরবেলা আহরণের পর এরই মধ্যে ফুলগুলো এরকম শুকিয়ে যাওয়ার কথা নয়।

আদিত্য ভাবল, অফিসে বেরোনোর আগে ছাদে গিয়ে টবের গাছগুলোর অবস্থা একবার দেখবে। ওর মাধবীলতা গাছটার কথা মনে পড়ছিল।

চার

আর দুটো দিন পেরোতে-না-পেরোতেই ছবিটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল।

চটচটে কালো বৃষ্টি হল চারবার। ধোঁয়াশা তার খেয়াল-খুশি মতো কলকাতাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

আদিত্য ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতঘড়ি দেখে বলা যায় এখন সূর্যাস্তের সময়। ধোঁয়াশার জন্য সূর্যকে দেখার কোনও উপায় নেই। শুধু পশ্চিমের আকাশের সামান্য লালচে আভাটুকু আশ্বাস। এই সময় পাখিরা শান্ত আকাশে ছায়াছবি হয়ে ঘরে ফেরে। দু-দিন আগেও এ-দৃশ্য দেখেছে আদিত্য। কিন্তু জানে, আজ আর দেখা যাবে না। কলকাতার পাখিরা বোধহয় আর কখনও ঘরে ফিরবে না। এখানে আর কোনও পাখপাখালি নেই, পোকামাকড়ও বোধহয় আর নেই।

আদিত্য টবের ফুলগাছগুলোর দিকে তাকাল। সব শুকিয়ে মরে গেছে। এখন শুধু অস্থিসার শুকনো কাণ্ডগুলো প্রেতের মতো হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজও অফিসে বেরিয়েছিল আদিত্য। বেরোনোর আগে ছাদে এসেছিল একবার। ক'দিন ধরে রোজই আসছে। তখনই মরা দুটো চড়ুই পাখি দেখতে পেয়েছিল নয়নতারার টবের পাশে। ঠিক ভক্তদাসের মতোই মৃত। এবং অসহায়।

আদিত্য দুঃখ পায়নি। অবাকও হয়নি। কারণ, গতকাল সন্ধেবেলা নয়নাকে পড়ানোর সময় পরপর দুবার কালো বৃষ্টি হয়েছিল। রাতে বাড়ি ফেরার সময় পথের নানা জায়গায় কয়েকটা বেড়াল কুকুর মরে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তখন ধোঁয়াশাটা আবার ঘন হতে শুরু করেছিল।

তারপর আজ সকাল থেকেই পথে বহু কাক, চড়ুই, শালিখ, মুরগি আর পায়রা নজরে পড়েছে ওর। সেই সঙ্গে কয়েকটা বাতাসি পাখি আর চামচিকেও। এ ছাড়া কদাচিৎ দু-একটা বাদুড়, প্যাঁচা, বুলবুলি। নিশ্চল। নিথর। কয়েকটা পাখি রাস্তার মাঝখানেও পড়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো। চারপাশে কেমন একটা চাপা দুর্গন্ধ।

তিনতলার এই খাটো ছাদে দাঁড়ালেও বেশ কয়েকটা ঝুপসি গাছের মাথা দেখা যায়। এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে তার প্রায় সব পাতাই ঝলসে শুকিয়ে খসে গেছে।

গত দু-দিনের বাজারের চেহারাটা মনে পড়ল আদিত্যর। তরিতরকারির নামে যা বিক্রি হচ্ছে সেসব যেন তরিতরকারির কঙ্কাল। আর সেগুলোই বিক্রি হচ্ছে আগুন দামে। শুধুই মাছ-মাংস খেয়ে ক'দিন বেঁচে থাকা যায়! এ ছাড়া চাল, ডাল, চিনির জোগান এই দু-দিনেই অবিশ্বাস্যরকম কমে গেছে।

মনোহর ভাণ্ডারে এই নিয়েই সকাল-বিকেল ঝগড়াঝাঁটি হইচই। এই বেসামাল পরিস্থিতিতে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোট মুলতুবি রাখতে বাধ্য হয়েছে। আর রোজই রেডিয়ো-টিভি আর খবরের কাগজে পরিবেশের অদ্ভুত বিপন্ন অবস্থা নিয়ে নানা তত্ত্ব এবং তথ্য প্রচারিত হচ্ছে।

আদিত্য মনে-মনে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কাকের ডাকে ঘুম ভাঙে না এমন সকাল কলকাতায় ভাবা যায় না। অথচ তাই হচ্ছে। যে-কর্কশ ডাক নিত্য শুনে-শুনে বিরক্ত লাগত, এখন সেই ডাক শোনার জন্যই আদিত্যর মন কান পেতে আছে। মনে হচ্ছে, একসঙ্গে এক দঙ্গল কাক 'কা-কা' করে ডেকে উঠলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনকী কাকের বদলে চড়ুই পাখির কিচিরমিচির হলেও মোটামুটি চলত।

আদিত্য আশপাশে তাকাল। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। সবুজ নেই। পাখিরাও আর নেই। ও ধীরে-ধীরে নেমে এল ছাদ থেকে।

দোতলায় নামতেই নানকুর গলা পেল। পড়ছে। বউদি পড়াচ্ছে। দাদা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। চাকরি ছাড়াও পলাশ টুকটাক অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করে। বিভিন্ন কোম্পানিতে অফিস স্টেশনারি—প্যাড, পেন, পেনসিল এইসব—সাপ্লাই করে। হয়তো সেইজন্যই দেরি হচ্ছে ফিরতে। আজ রাস্তাঘাটের যা অবস্থা তাতে দেরি হওয়াটা তেমন অস্বাভাবিক নয়।

মায়ের ঘরে গেল আদিত্য। ঘরে টিউব লাইট জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ঘোলাটে ভাব রয়ে গেছে। মা বিছানায় বসে চোখ বুজে রয়েছে। ঠাকুরের নাম করছে, অথবা বাবার স্মৃতি রোমন্থন করছে। আদিত্য মা-কে ভালো করে দেখল। বাদামি-কালো-হলুদ ছাপের বেডকভারের ওপরে শাড়ি পরা মায়ের শরীর বেশ স্পষ্ট। থুতনিটা সামান্য তুলে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে। অনেকটা ক্ষুদিরামের মূর্তির মতো। গলার শিরা ফুলে রয়েছে।

বাবার ফটোর সামনে ধূপ জ্বলছে। সামনের পেতলের থালা খালি।

সকালেও খালি ছিল। টবে ফুল ফোটেনি। পুষ্পহীন এই আরাধনা কতদিন চলবে কে জানে!

মা হঠাৎই কাশল। বেশ কয়েকবার। চোখ খুলে তাকাল। আদিত্য সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ছোট টেবিলে রাখা ভাঁজ করা খবরের কাগজটা তুলে নিল হাতে। এমনসময় মা বলল, 'দিতু, আমার খুব ভালো ঠেকছে না—।'

আদিত্য তাকাল মায়ের দিকেঃ 'কী?'

'এইসব—বৃষ্টি—ধোঁয়া—' মা বারান্দার খোলা দরজার দিকে ইশারা করল।

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। বলল, 'দেখি কী হয়। সবাই তো বলছে ঠিক হয়ে যাবে—।'

খবরের কাগজে নানা জন এই ঘটনার নানা কারণ খুঁজে বেড়িয়েছে। কেউ বলেছে, পনেরো বছর আগের উপসাগরীয় যুদ্ধ এর জন্য দায়ী। কেউ বা রাশিয়া-আমেরিকার সাম্প্রতিক পারমাণবিক যুদ্ধকে এর জন্য দায়ী করেছে। মরিয়া হয়ে এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে। শুরু হয়ে গেছে কাদা ছোড়াছুড়ি।

মুন্নিকে ঘরে দেখতে পায়নি আদিত্য। হয়তো কোথাও গেছে। অন্য সময় হলে এই না-থাকাটা তেমন অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আদিত্য জিগ্যেস না করে পারল না, 'মুন্নি কোথায় গেছে?'

মা জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। বলল, 'অতসীদের বাড়ি গেছে।'

অতসীরা কাছাকাছি থাকে। মুন্নির সঙ্গে পড়ে। মুন্নি খুব একটা বেরোয় না রাস্তায়। কখনও গেলে অতসীদের বাড়ি যায়। ওখান থেকে রজতদের বাড়িটা অনেক কাছে দেখা যায়।

মা বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দার দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। আদিত্য কিছু বলল না। ওর তেতো হাসি পেল। দরজা বন্ধ করে বাতাসের বিষকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মানুষের ফুসফুসে পৌঁছেই বিষের বিশ্রাম—তার আগে নয়।

টিভির সুইচটা অন করে দিল মা।

সরকারি চ্যানেলে সেই একই ব্যাপার। ধোঁয়াশা ও বৃষ্টি মারফত দূষণের মাত্রা
কতখানি হতে পারে তার হিসেবনিকেশের চেষ্টা এখনও চলেছে। আর সেইসঙ্গে আগমার্কা অভয়বাণীঃ মানুষের ভয়ের কিছু নেই।

সেটা শুনতে-শুনতে মৃতদেহের দুর্গন্ধ নাকে এল আদিত্যর। ওদের বাড়ির ভেতরের দিকের কার্নিশে দুটো পায়রা জোড় বেঁধেছিল। ডিমও পেড়েছিল দুটো। কিন্তু গতকাল আদিত্য দেখেছে মা-পায়রাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। আর অন্য পায়রাটা নেই। হয়তো খাবারের সন্ধানে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। অজাত পায়রা-শিশু দুটো থেকে গেল ডিমের আবরণের মধ্যেই।

আদিত্য খবরের কাগজটা রেখে দিল টেবিলে। উঠে গিয়ে টিভির পরদার চ্যানেল সিলেক্টর জেনে আঙুল ছোঁয়াল। সঙ্গে-সঙ্গে চ্যানেল নম্বর ফুটে উঠল পরদার মাথায় ডানদিকের কোণে। পাঁচ নম্বর ফুটে উঠতেই আঙুল সরিয়ে নিল আদিত্য। এটা প্রাইভেট চ্যানেল। সবসময় সরকারি খবরের ওপরে আস্থা রাখা যায় না। তিন-তিনটে প্রাইভেট চ্যানেল চালু হওয়ার পর সরকারি খবরগুলো বাধ্য হয়ে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হয়েছে। তবে প্রাইভেট চ্যানেলের খবরের ঢং এখনও অনেক আকর্ষণীয়।

চেয়ারে ফিরে এসে বসল আদিত্য। দেখতে লাগল।

পরদায় গড়িয়াহাট অঞ্চল দেখানো হচ্ছিল। আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ঢাকা। সেখান থেকে ক্যামেরা নেমে এল রাস্তায়। দেখা গেল তুমুল হইচই হট্টগোল। তারই মধ্যে ইনসেট হয়ে ফুটে উঠল সংবাদ-পাঠিকার মুখ। তাঁর কথায় ও ছবিতে জানা গেল, দক্ষিণ কলকাতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পেট্রলের দাম ছাব্বিশ টাকা লিটার থেকে চল্লিশ টাকায় পৌঁছে গেছে। আর ডিজেলের দাম সাড়ে আট থেকে পনেরোয়। অনেক মানুষই শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। এই টালমাটাল অবস্থায় একটু আগেই এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা পেটল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে একটা প্রাইভেট বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্যাঙ্কারটিতে আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। বাইশজন এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়। এছাড়া আরও—।

হঠাৎই বউদির চিৎকার শুনতে পেল আদিত্যঃ ‘ছোড়দা। ছোড়দা! শিগগিরই এসো।’

আদিত্য চেয়ার ছেড়ে ছুটল। তখনই টের পেল ওর চোখ জ্বালা করছে।

মা পিছন থেকে ডেকে উঠল, ‘কী হল, লতা? কী হল?’

সিঁড়ির কাছে এসেই পলাশকে দেখতে পেল আদিত্য। ফিকে গোলাপি আর লালে ছাপা বুশ-শার্ট। একটু খেয়াল করতেই বুঝল, লালটা রং নয়—রক্ত।

পলাশের বাঁ-গালটা ফুলে রয়েছে। ডানভুরুর ওপরটা ফেটে গেছে। নাকের কাছটায় রক্তে মাখামাখি। সেখান থেকেই হয়তো রক্ত গড়িয়ে পড়েছে জামার বুকে।

আধবোজা চোখে পলাশ টলছিল। আদিত্য ওকে ধরে ফেলল। পলাশ যন্ত্রণায় ডুকরে উঠল।

বউদি এবার কাঁদতে শুরু করে দিল। নানকু কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছিল ওর মায়ের পিছনে। মাকে কাঁদতে দেখে বাচ্চাটাও কান্না জুড়ে দিল।

‘পলাশ! এ কী অবস্থা হয়েছে তোর!’

মায়ের গলা চিনতে পারল আদিত্য।

পলাশকে জাপটে ধরে ঘরে নিয়ে গেল ও। লতাকে বলল, ‘বউদি, একটা গামছা জলে ভিজিয়ে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি—।’

আদিত্য পলাশকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'আঃ—' বলে চোখ বুজল পলাশ।

আদিত্য দাদাকে দেখছিল। ছোটবেলা থেকেই খুব নিরীহ। কখনও মারপিট করেনি। কারও সঙ্গে ঝগড়াও যখন করেছে তাও তেমন উগ্র হয়নি কখনও। একটু অন্যমনস্ক, আত্মভোলা। বউদি আর মা-কে খুব মানে। এই ভালোছেলেটাকে কে মারল? কারা মারল?

কখন যেন নানকু এসে আদিত্যর পাজামা খামচে ধরেছে।

'কাকুমণি, বাপির কী হয়েছে?' জিগ্যেস করল ছেলেটা। বাবাকে খুব ভালোবাসে। বাবার কোলেপিঠে চড়ে সবসময় বেড়াতে যায়।

আদিত্য পলাশের নাকের কাছে হাত রাখল। নিশ্বাস পড়ছে ধীরে।

লতা আর মা একইসঙ্গে ঘরে এল। দ্রুতহাতে শুরু করল পলাশের যত্ন। আদিত্য ওদের দেখছিল, তবে মনোযোগ ছিল না। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। ফুটবল নিয়ে হাত ধরাধরি করে দেশবন্ধু পার্কে খেলতে যাওয়ার কথা। শীতের দুপুরে সল্টলেকের মাঠে টেনিস বলে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বৃষ্টির মধ্যে পেটে বইখাতা গুঁজে ভিজতে-ভিজতে বাড়ি ফেরা। বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়ে খাটিয়ায় আগে-পিছে কাঁধ দেওয়া। তারপর 'বলো হরি, হরিবোল...।'

আদিত্যর যখন খেয়াল হল, তখন পলাশ বিড়বিড় করে কথা বলছে। কথা বলছে একটানা। কিন্তু আদিত্যর কানে কিছুই ঢুকছিল না। ও বলল, 'বউদি, আমি ডক্টর মণ্ডলকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

একটা অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে নিয়ে পলাশের কাটা জায়গাগুলোয় স্প্রে করছিল লতা। আদিত্যর দিকে ফিরে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। নানকু তখন খাটের ওপর মাথা তুলে পলাশকে দেখতে চেষ্টা করছে, আর একনাগাড়ে 'বাপি, বাপি—' করে চলেছে।

আদিত্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ওর চোখে সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ি থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই লোডশেডিং। ভীষণ অবাক হয়ে গেল আদিত্য। কারণ, গত পাঁচবছরে বিদ্যুতের জোগান সবসময়েই চাহিদার প্রায় দ্বিগুণ থেকেছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক ফল্ট থেকে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কচ্চিৎ কখনও বন্ধ হয়নি তা নয়। এটাও হয়তো সেইরকমই কিছু। কিন্তু আদিত্যর মন যেন সায় দিচ্ছিল না কিছুতেই। গত ক'দিনের আবহাওয়া ওকে খারাপটাই ক্রমশ ভাবতে শেখাচ্ছিল।

রাস্তার চেহারাটা ভারী অদ্ভুত। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেছে পাড়াটা। কিন্তু এক অলৌকিক ঘষা আলো ছড়িয়ে রয়েছে। বোঝা যায়, আকাশে কোথাও একটা চাঁদ রয়েছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল আদিত্য। বীভৎস দুর্গন্ধ। রাস্তায় পড়ে থেকে-থেকে পশুপাখির মৃতদেহগুলো পচতে শুরু করেছে। পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হোঁচট খাচ্ছিল বারবার। ধাক্কাও লাগল কয়েকটা কালো ছায়ার সঙ্গে। কিন্তু কষ্ট করে মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই চায়ের দোকানের মোমবাতির আলো আদিত্যকে খানিকটা স্বস্তি দিল। শ্যামাপোকার মতো সেই আলোর দিকে এগিয়ে গেল ও। ভেসে বেড়ানো ধোঁয়াশার মধ্যে অনেকগুলো অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেল। সেইসঙ্গে শুনতে পেল কলরব আর রেডিয়োর সংবাদ বুলেটিনের টুকরো।

জটলার মধ্যে মহাদেবদার বাবাকে দেখতে পেল আদিত্য। একটা বেঞ্চে বসে টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন।

আদিত্য অস্বস্তি পাচ্ছিল। সুনয়নাকে টিউশানির কথা বলতে ভুলে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধই হাসিমুখে ডাকলেন ওকে, 'দিতু, তোমাকে যে ওই টিউশানির কথাটা বলেছিলাম—এখন আর কিছু ঠিক কোরো না। দেখছ তো এই গোলমাল। সব মিটে যাক, তারপর দেখা যাবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভাগ্যিস মহাদেবরা আমেরিকায় রয়েছে। নইলে এ অবস্থায় কলকাতায় কী করে থাকত ওরা! আর বাচ্চাটারই বা কী অবস্থা হতো!'

বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে এক ধরনের স্বস্তির আভা। ছেলের দেশে দূষণ নেই। সেখানে কালো বৃষ্টি নেই। অথচ আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার শুরু আমেরিকাতেই।

খবরে নানা দুর্ঘটনার কথা বলছিল। শঙ্করবাবু জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোথায় চললে এই অন্ধকারে?'

'ডক্টর মণ্ডলের চেম্বারে—।'

পিছন থেকে বয়স্ক কেউ বলে উঠলেন, 'ডাক্তার কাল তল্পিতল্পা নিয়ে তার দেশ মেমারিতে পালিয়েছে। বলেছে, এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না।'

আর একজন কে যেন বলল, 'এখন তো সবে কুকুর-বেড়াল-গরু-ছাগল মরছে। এর পরে কী হবে কে জানে!'

'এদিকে সরকার স্রেফ অভয়বাণী দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে।'

আদিত্যর কেমন মাথা ঝিমঝিম করছিল। কে কোন কথা বলছে সেটা ওর মগজে ঢুকছিল না। শুধু টুকরো-টুকরো কথাগুলো কানে আসছে।

'কেন, সরকার কী করবে? তালপাতার পাখা দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে দেবে? দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই? একে তো ইলেকশান গেল ভেস্তে!'

'ইলেকশান কেন, সবই ভেস্তে যাবে। আর দু-দিন যেতে দাও, দ্যাখো না কী হাল দাঁড়ায়!'

'আমি আর একটা দিন দেখব—।'

আদিত্য 'আসি' বলে মোমের আলোর বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এল। শেষ শোনা কথাটা ক্রমাগতই ওর মাথার ভেতরে বাজছিল। ও একরকম ধোঁয়াশা হাতড়েই ফিরে এল বাড়িতে।

চেনা সিঁড়ি বেয়ে অনুমানে ভর করে দোতলায় উঠতে খুব একটা অসুবিধে হল না ওর। দাদার ঘর থেকে রিচার্জেবল ইমারজেন্সি ল্যাম্পের মলিন আলো বারান্দায় এসে পড়েছে।

মুন্নির গলা শুনতে পেল। অতসীদের বাড়ি থেকে এর মধ্যেই ফিরে এসেছে।

আদিত্য দাদার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পলাশ খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ বোজা, হাতে হরলিক্সের গেলাস। ধীরে-ধীরে চুমুক দিচ্ছে। ডানভুরু আর নাকের কাছে সাদা প্লাস্টিকের মতো কী লাগানো। বউদি বোধহয় ইনস্ট্যাহিলার স্প্রে করে দিয়েছে। ইমারজেন্সি ল্যাম্পের সাদা আলোয় পলাশের ফরসা মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

আদিত্য ঘরে ঢুকতেই তিনজোড়া চোখ তাকাল ওর দিকে। মা, লতা আর মুন্নি। আদিত্য মাথা নাড়ল। বলল, 'ডাক্তারবাবু নেই—কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে।'

আদিত্যর কথায় পলাশ চোখ খুলে তাকাল। বলল, 'বুকের ভেতরটায় খুব কষ্ট হচ্ছে—।'

পলাশের দুর্বল মিনমিনে স্বর ওদের আলোছায়াময় মুখে ভয়ের রেখা ফুটিয়ে তুলল।

আদিত্য চাপা গলায় লতাকে জিগ্যেস করল, 'কী করে এমন হল, বউদি?'

'ও যে-বাসে করে ফিরছিল সেটা ধোঁয়ায় দিশেহারা হয়ে একটা মিনিবাসকে প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা মেরেছে। দুজন স্পটেই মারা গেছে। ও বোধহয় কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরতে হাতড়ে-হাতড়ে কিছুটা এগিয়ে একটা গাড়ি থামাতে পেরেছে। ওর অবস্থা দেখে সেই গাড়ির মালিক দয়া করে এ-গলির মোড়ে পৌঁছে দিয়েছে—।'

লতার চেহারা ভারীর দিকে। মুখও গোলগাল। ফলে অভিব্যক্তি ভালো ফোটে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বউদির মুখে নগ্ন আতঙ্কের অরাজকতা লক্ষ করল আদিত্য। কথা শেষ হতে-না-হতেই সবার মনের প্রশ্নটা উচ্চারণ করল মা, 'দিতু, এখন তা হলে ডাক্তারের কী হবে?'

আদিত্য হালকা গলায় কথা বলে আশ্বস্ত করতে চাইল সবাইকেঃ 'মা, তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ। আমি এক্ষুনি বেরোচ্ছি। খালের ওপার থেকে শ্যামল ডাক্তারকে নিয়ে আসতে পারি কি না দেখছি। তোমরা যদি দেরি দেখে চিন্তা করো, তাই খবরটা দিয়ে গেলাম।'

পলাশ হরলিক্স খাওয়া শেষ করেছিল। নানকু ওর পাশে গা ঘেঁষে বসে আছে। হাঁ করে কৌতূহলী চোখে বাবার মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখছে। পলাশ বিড়বিড় করে বলল, 'আসলে বুকের কাছটায় কীসের যেন ধাক্কা লেগেছিল...খুব জোরে...।'

আদিত্য পলাশের কাছে এগিয়ে গেল। ওর বুকে হাত বোলাল।

পলাশ যন্ত্রণায় চাপা চিৎকার করে উঠল, 'উঃ! লাগছে।'

আদিত্য হাত সরিয়ে নিল। কতদিন...কত বছর পরে দাদার বুকে হাত রাখল ও!

নানকু ওর জামা ধরে টান মেরে বলল, 'ও কাকুমণি, বাপিকে জলদি সারিয়ে দাও না।'

আদিত্য বাচ্চাটার গোলগাল মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল। তারপর মজা করে বলল, 'অ্যাই, তোর চোখগুলো অমন গোলগোল কেন রে?'

নানকু সহজ গলায় জবাব দিল, 'আমি তো প্যাঁচা। মা বলেছে আমাকে প্যাঁচার মতো দেখতে।'

আদিত্য ওর মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মেরে বিছানা থেকে টর্চটা তুলে নিল, দরজার দিকে পা বাড়াল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলল, 'তোমরা ভেব না, আমি ঝট করে ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

মা একটা মোমবাতি জ্বেলে নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছিল। মোমের আলোয় আদিত্য দেখতে পেল মায়ের ঠোঁট নড়ছে। হয়তো ঈশ্বরের কাছে ছেলের আরোগ্য কামনা করছে।

হঠাৎই বাবার কথা মনে পড়ে গেল আদিত্যর।

পাঁচ

রাস্তায় পা দিয়েই আদিত্য কেমন ভয় পেয়ে গেল।

লোডশেডিং-এর অন্ধকার আর চোখ-জ্বালা-করা গাঢ় ধোঁয়াশা মিলেমিশে এক বিচিত্র শত্রু হয়ে উঠেছে।

আদিত্যর চোখ খুব একটা কাজ করছিল না। ও হাতের টর্চটা জ্বেলে এপাশ-ওপাশ ঘোরালো। যেসব বস্তু চোখে পড়ল তাতে পরিস্থিতির ছবিটা আরও কুৎসিত মনে হল।

গলির একপাশে জঞ্জালের স্তূপ। সেখানে দুটো বেড়াল আর একটা কুকুর চোখে পড়ল আদিত্যর। এর মধ্যেই ফুলে উঠেছে, তার ওপর এখানে সেখানে ঠোকরানো।

আদিত্যর গা গুলিয়ে উঠল। পাক দেওয়া দুর্গন্ধের সঙ্গে একটা তীব্র ঝাঁঝ মেশানো বলে মনে হল। চোখ ভীষণ জ্বালা করছিলঃ জ্বালা কমাতে বারবার চোখের পাতা ফেলছিল।

অন্ধকারে ভূতের মতো খানিকক্ষণ পথ চলার পর আদিত্য আর পারল না। এতক্ষণ ধরে বুকে জমাট বেঁধে থাকা ভয়টা ওর পা দুটো অসাড় করে দিতে চাইল। এই অবস্থায় ও মুচিবাজারে গিয়ে শ্যামল ডাক্তারকে ঠিকমতো ডেকে নিয়ে আসতে পারবে তো!

এইরকম একটা দ্বিধা আর সংশয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে হঠাৎ করেই যেন নয়নার কথা মনে পড়ে গেল। ওই মেয়েটার যা সাহস আছে আদিত্যর বোধহয় তা নেই। এখন আদিত্য ওকে ডাকতে গেলে ও হয়তো ঠাট্টা করবে। গব্বর সি-এর ডায়ালগটা আবার শুনিয়ে দেবেঃ জো ডর গয়া, সমঝো কে মর গয়া।

কিন্তু কোনও উপায় নেই। নয়না ঠাট্টা করে করুক। নয়নার ঠাট্টা আদিত্য সহ্য করতে পারবে। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে ওই ছটফটে ফাজিল মেয়েটা পাশে থাকলে আদিত্য সত্যি অনেকটা ভরসা পাবে।

সুতরাং কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুনয়নাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল আদিত্য। কলিংবেলের বোতামে হাত রাখার পর খেয়াল হল লোডশেডিং। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে কলিংবেল টুংটাং শব্দে বেজে উঠল। তখনই আদিত্যর মনে পড়ল, সুনয়নাদের বাড়িতে মিনি জেনারেটার আছে।

দরজা খুলল নয়না নিজেই। বসবার ঘরে টিমটিম করে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। আলোটা পিছনদিকে থাকায় ওকে ছায়াছবির মতো দেখাল। আদিত্য পরপর কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল। চোখ জ্বালা করছিল। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে ও নয়নাকে দেখতে চাইল। খেয়াল ছিল না, হাতের টর্চটা তখনও জ্বলছে।

'এ কী! দিতুদা!'

মেয়েটার বিস্ময় মেশানো স্বরে কোথায় যেন সামান্য ভালো লাগা জড়িয়ে ছিল।

আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল, 'নয়না, আমার সঙ্গে একটু মুচিবাজার যাবে? খুব ঝামেলায় পড়ে গেছি। ডাক্তার ডাকতে হবে। দাদা...দাদার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

মেয়েটা সত্যিই আশ্চর্য। একটি কথাও জিগ্যেস করল না। শুধু ছোট্ট করে বলল, 'একসেকেন্ড দাঁড়াও—মা-কে বলে আসি।'

এক সেকেন্ড নয়, ফিরে আসতে দশসেকেন্ড মতো সময় নিল সুনয়না। সদর দরজাটা টেনে লক করে দিয়ে আদিত্যর পাশাপাশি রাস্তায় নেমে এল। ওর চলার সঙ্গে দিব্যি তাল মিলিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, দিতুদা? বড়দার কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?'

আদিত্য টর্চের আলোর দিকে চোখ রেখে বলল, 'দাদা বাড়িতে শুয়ে আছে। ডক্টর মণ্ডল শুনলাম কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দেশের বাড়িতে পালিয়েছে। তাই মুচিবাজারের কাছ থেকে শ্যামল ডাক্তার—মানে ডক্টর দাসকে ডেকে আনতে যাচ্ছি।'

পথ চলতে-চলতে পলাশের ব্যাপারটা খুলে বলল আদিত্য। তারপর খানিকটা অনিশ্চিত গলায় বলল, 'এই ধোঁয়াশার জন্যে খালের ওপারে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। তাই ভাবলাম, তোমাকে...মানে...মাসিমা তোমাকে কিছু বললেন?'

নয়না এইবার হেসে ফেললঃ 'আপনাকে এখন থেকে দিতুদা নয়, ভিতুদা বলে ডাকব।'

আদিত্য বিব্রত হল।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে অরবিন্দ সেতুর ওপরে উঠে পড়েছে। এখানে লোডশেডিং হয়নি। ব্রিজের দুপাশের ফুটপাথে লাইটপোস্টে সোডিয়াম ল্যাম্প জ্বলছে। তবে ধোঁয়াশা তাদের যাবতীয় ছটা শুষে

নিয়েছে। রাস্তা থেকে যেটুকু চোখে পড়ে তা বাতির কঙ্কাল। গাঢ় মেঘলা আকাশের আড়ালে সূর্যকে যেমন দেখায়।

আদিত্য নয়নার হাত ধরে আলতো করে টেনে বলল, 'রাস্তা দিয়ে এসো। ফুটপাথে অনেক গর্ত আছে—কখন হোঁচট খাবে।'

ওরা ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কয়েকটা গাড়ি ধীরে-ধীরে ওদের পার হয়ে গেল। গাড়ির হর্নের শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু গাড়ির ড্রাইভারদের আর দোষ কী! চোখে ঠিকমতো দেখতে না পেলে হর্নই ভরসা।

'আমি ভীষণ ভিতু হয়ে গেছি, নয়না।'

আদিত্যর স্বর কেমন মিনমিনে শোনাল। ওর কপাল ঘামছিল।

'কেন? চারপাশে এইরকম অবস্থা বলে?' নয়না চিবুক তুলে আদিত্যর ঝাপসা মুখের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ। দেখছ না, একে-একে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছ না কুকুর, বেড়াল, শালিখ, চড়ুইয়ের পর কাদের পালা?'

চারপাশের ঘোলাটে আঁধারের দিকে তাকিয়ে আচমকা নানকুর কথাটা মনে পড়ে গেল আদিত্যরঃ আমি তো প্যাঁচা। এই আঁধারে স্পষ্ট দেখতে হলে এখন শুধু নানকু কেন, সবাইকেই প্যাঁচা হয়ে যেতে হবে।

নয়না আদিত্যকে কয়েকপলক দেখল। তারপর আদিত্যর আঙুলের ওপরে ওর মুঠো আরও শক্ত হল।

আদিত্য বলল, 'কখন আমাদের পালা আসবে কে জানে!...মৃত্যু ভারী অদ্ভুত, নয়না। মৃত্যুর দরজা হাট করে খোলা থাকলেও সেই দরজা দিয়ে যেতে আমাদের কষ্ট হয়...আমারও হবে।'

'দিতুদা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সংঘর্ষের শব্দ কানে এল।

দুর্ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটল কে জানে। তবে শব্দ শুনে মনে হল, ওদের সামনে বেশ খানিকটা দূরে ধোঁয়াশার আড়ালে একটা ছোটমাপের দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দু-চারজন লোকের চিৎকার শোনা গেল। আদিত্যরা যতই এগোচ্ছিল শব্দগুলো ততই জোরালো হচ্ছিল। গালিগালাজ কানে আসছিল। দু-একটা গাড়ি অধৈর্যভাবে হর্ন দিচ্ছিল।

আরও কাছে যেতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। একটা অটোরিকশা একটা স্কুটারকে ধাক্কা মেরেছে। কালো-কালো ছায়ার মতো মানুষজন জড়ো হয়েছে সেখানে। তুমুল চেঁচামেচি চলছে।

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে গেল। নয়না একবার হোঁচট খেয়ে 'উঃ!' করে উঠল। আদিত্য ওকে সামলে নিল।

অরবিন্দ সেতুর ঢাল বেয়ে নামতে-নামতে ওরা কয়েকটা ফ্লুওরেসেন্ট আলো দেখতে পেল। আদিত্য জানে, ব্রিজের মুখেই একটা বড়সড় মিষ্টির দোকান আছেঃ পরেশ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ওগুলো সেই দোকানেরই আলো। দোকানটার পাশ ঘেঁষে পাঁচমিনিট এগোলেই শ্যামল দাসের চেম্বার।

মিষ্টির দোকানের কাছে পৌঁছনোমাত্রই মাইকের বক্তৃতা ওদের কানে এসে ধাক্কা মারল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকায় বক্তৃতার রেশ ওরা খেয়াল করেনি।

'...আজ আমাদের সকলের সামনে একটাই প্রশ্ন—বাঁচার প্রশ্ন। বন্ধুগণ, আপনারা কি জানেন গত দশবছরে কলকাতা শহর আর তার আশেপাশে গাড়ির সংখ্যা কী হারে বেড়েছে? দশবছরে, সবরকমের গাড়ি মিলিয়ে, মোট বৃদ্ধির হার প্রায় চোদ্দো গুণ। তার ওপরে রয়েছে বেপরোয়া শিল্পায়ন। সরকার এসব ঘটনার সমর্থনে বলেছেন, বেকার সমস্যার চটজলদি সমাধানে এই শিল্পায়ন জরুরি ছিল। এ ছাড়া গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি মানেও তো আরও মানুষের আরও চাকরির সুযোগ। সুতরাং, বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধান হচ্ছেই। মাননীয় নেতাগণ, শুধু আমরা—মানে, ছাপোষা সাধারণ মানুষরা—যারা আপনাদের মতো নেতাদের ভোট দিয়ে মসনদে পাঠিয়েছি, আমরা বুঝতে পারিনি যে, আপনারা বেকার সমস্যার সঙ্গে-সঙ্গে জনসংখ্যার সমস্যাটাও চটজলদি সমাধান করার চেষ্টা করছেন। আজ পথেঘাটে কুকুর-বেড়াল মরছে, কাল আমরাও কুকুর-বেড়ালের মতো মরব। দেশে আর একটিও বেকার থাকবে না—সব খতম হয়ে যাবে, আর একইসঙ্গে মহামান্য সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

'বন্ধুগণ, এইরকম পরিস্থিতিতে কীসের নির্বাচন! আগে ভোটাররা বাঁচুক, তারপর তো ভোট...।'

মিটিং ঘিরে বেশ ভালোরকমই ভিড় জমেছে। জ্বালাময়ী ভাষণ শুনতে-শুনতে আদিত্য জটলা পেরিয়ে গেল।

সুনয়না বলল, 'দেখবেন, ইলেকশান হবে না।'

আদিত্য একটু আনমনা ছিল। নয়নার কথার কোনও জবাব দিল না। ও কল্পনায় একটা থার্মোমিটার দেখতে পাচ্ছিল। তার পারা ক্রমাগত চড়ছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে!

মুচিবাজারের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি ঢুকে গেছে ভিতরে। গলিটা অন্ধকার। এদিকটায় বোধহয় লোডশেডিং হয়েছে। আদিত্য টর্চ জ্বালল। নয়নার হাতটা ধরল মুঠো করে।

'ডক্টর দাসের চেম্বারটা কত দূরে?' নয়না জিগ্যেস করল।

আদিত্য অন্ধকারে সতর্কভাবে পা ফেলতে-ফেলতে বলল, 'এই তো, এসে গেছি।'

আর মিনিটখানেক হাঁটতেই ওরা ডক্টর দাসের চেম্বারে পৌঁছে গেল।

অন্ধকারে বাড়িটার আদল ঠিক বোঝা যায় না। তার ডান দিকে একটা ফাঁকা জায়গা—অনেকটা মাঠ মতন। তার একপাশে একটা পুকুর। গোটা জায়গাটার ওপরে কেমন এক ভূতুড়ে ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে রয়েছে।

ডক্টর দাসের চেম্বারে ইমারজেন্সি ল্যাম্প জ্বলছে। সেখানে চেয়ারে-বেঞ্চিতে বসে আবছায়ার মতো অনেক মানুষ। বাইরের ফাটল ধরা উঁচু রোয়াকে ইমার্জেন্সি ল্যাম্পের সাদা আলো ছিটকে এসেছে।

নয়নাকে রোয়াকের কাছটায় দাঁড়াতে বলল আদিত্য। তারপর দু-ধাপ সিঁড়ি উঠে ঢুকে গেল চেম্বারের ভেতরে।

সুনয়না এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে অন্ধকার দেখল। ওর চোখ জ্বালা করছিল, আর মাথার ভেতরে একটু আগে শোনা বক্তৃতার লাইনগুলো ঘুরছিল।

আদিত্য বেরিয়ে এল মিনিটপাঁচেক পরেই। টর্চ জ্বেলে নয়নার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'চলো।'

'ডাক্তারবাবু কী বললেন?'

'বললেন, যত রাতই হোক যাবেন। আমাদের পাড়ার দিকে উনি কলে যান। আমাদের বাড়ির গলিটা চেনেন। আমি বাড়ির নম্বর দিয়ে দিয়েছি। আর সুদীপ্তদাকে চেনো তো? আমাদের পাড়ায় ব্রিজের বাঁ-দিকটায় থাকেন, ক্রিকেটের কোচ। ডক্টর দাসের ছেলে ওঁর কাছে ক্রিকেট খেলা শেখে। সুদীপ্তদার নাম বলার পরই উনি বললেন, আমার থাকার দরকার নেই, উনি ঠিক চলে যাবেন—।'

কথা বলতে-বলতে ওরা গলি ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল।

বাজারের কাছে মিটিং এখনও চলছে। কোনও একজন বিশেষজ্ঞ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছেন।

'...এখন আমাদের স্ট্যাক স্যাম্পলিং করে দেখতে হবে, অ্যামবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি টেস্ট করে দেখতে হবে, মাপতে হবে নানা মিটিওরোলজিক্যাল প্যারামিটার। সোজা কথায়, যে-দূষিত বাতাস আমরা ফুসফুসে টেনে নিচ্ছি দেখতে হবে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা কতটা মারাত্মক। এ ছাড়া, বাতাসের দূষণ জলে পৌঁছতে খুব একটা সময় লাগে না। যে-জল এখন আমরা রোজ খাচ্ছি তা কতটা বিশুদ্ধ কে জানে! বেপরোয়া শিল্পায়নের জন্যে এখন হয়তো জলের মধ্যে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সায়ানাইড, লেড, ফ্লুওরাইড এসবের মাত্রা সাংঘাতিকরকম বেড়ে গেছে। খবরের কাগজে এত লেখালিখি হচ্ছে, কিন্তু তবুও সুরাহা কিছু হচ্ছে না। আমরা কলকাতার কয়েকটি এলাকার জল আর বাতাস অ্যানালিসিস করে দেখেছি। তার একটা রিপোর্ট আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি...।'

মিটিং-এর এলাকাটা পার হয়ে যেতেই সুনয়না বলল, 'দিতুদা, চলুন, আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাই—।'

আদিত্য মুখ ফিরিয়ে সাহসী মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। ওর দু-কানের লতিতে দুটো মুক্তোর দুল। পাথর দুটো চকচক করছে। আর ওর চোখ দুটোও।

আদিত্য ছোট্ট করে 'হুঁ' বলল। আনমনাভাবে পা ফেলতে লাগল সামনের দিকে। ক'দিনের মধ্যেই চারপাশটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। জীবনটাকে যে যার মতন করে সাজাবে বলে ভাবছিল, কিন্তু...।

এমন সময় কালো ছায়ার মতো চারটে লোক ওদের কাছে এগিয়ে এল। ওদের একরকম ঘিরে দাঁড়াল।

ওরা দুজনে সবে অরবিন্দ সেতু ধরে দশ-বারো পা উঠেছে, তখনই ধোঁয়াশার আড়াল থেকে লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে। ঘোলাটে আলোয় ওদের মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

'আবে, মালকড়ি যা আছে বের কর—।'

সামনের লোকটা কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে মদের উগ্র বাষ্প নয়না আর আদিত্যর চোখেমুখে এসে ঝাপটা মেরেছে।

ডানপাশের ছায়াটা একটা লম্বা ছুরি বের করে আদিত্যর পাঁজরের কাছে ধরল।

নয়না একটা চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল। শুধু অদ্ভুত একটা শব্দের টুকরো ছিটকে বেরোল ওর মুখ থেকে। আর আদিত্যর মুখের ভেতরে জিভটা যেন শিরীষ কাগজ।

'অ্যাই সালি! চেঁচালে গলা ফাঁক করে দেব। চটপট গিনিগুলো খোল।' পিছন থেকে একজন বলল।

নয়না সঙ্গে-সঙ্গে কাঁপা হাতে কানের দুল, গলার সরু চেন, খুলে দিয়ে দিল সামনের লোকটার হাতে। লোকটার খসখসে হাতের চামড়া নয়না ছুঁয়ে ফেলল পলকের জন্য।

আদিত্য ততক্ষণে পকেটের সামান্য ক'টা টাকা আর হাতঘড়ি আর-একজনের হাতে তুলে দিয়েছে।

'আর কী আছে বের কর, নইলে সার্চ করব।'

'বস, ফুলটুসিকে আমি সার্চ করব মাইরি।' কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে পিছনের লোকটা নয়নার ঘাড়ের কাছে আলতো করে হাত দিল। নয়না শিউরে উঠে মাথা ঝাঁকুনি দিল।

আদিত্যর বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছিল। ও শুকনো গলায় কোনওরকমে বলল, 'আমাদের আর কিছু নেই। সব দিয়ে দিয়েছি।'

সামনের লোকটা জড়ানো গলায় বলল, 'চারপাশে এই লাফড়া, তার মধ্যে গান্ডু ফুর্তি করতে বেরিয়েছে। শিগগির ফোট, নয়তো মাল এঁটো হয়ে যাবে—।'

পিছনের লোকটা ওদের ধাক্কা মারল। এবং পরক্ষণেই চারটে কালো ছায়া ধোঁয়াশার মধ্যে ক্রমে আবছা হতে-হতে মিলিয়ে গেল।

নয়না ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আদিত্য কাঁপা হাতে ওর মাথায় হাত বোলাল।

ওরা যন্ত্রের মতো হাঁটছিল। কেউ কোনও কথা বলতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ পর আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'শুধু-শুধু তোমাকে ডেকে নিয়ে এসে এই ঝামেলায় ফেললাম। গয়নাগুলো...অনেক ক্ষতি হয়ে গেল...মাসিমা খুব বকাবকি করবেন...।'

নয়না হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। ঘাড় ঘুরিয়ে চেনা উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকাল আদিত্যর দিকেঃ 'আমি গয়নার জন্যে কাঁদছি না, দিতুদা। আপনার ঘড়ি আর টাকার জন্যেও না।'

'তবে কেন?'

'জানি না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপরঃ 'আমার কান্না পাচ্ছে।'

'মাসিমাকে কী জবাব দেবে?'

'আজ নয় কাল ওগুলো যেতই। আমরাই বা আর ক'দিন আছি কে জানে!'

আদিত্যর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে গেল। নয়নার শেষ কথাটায় ওর মনে হল, এই দূষিত পরিবেশে আমরা সত্যি-সত্যি এখনও বেঁচে আছি তো!

ছয়

এক ভয়ংকর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

যদি এভারেস্টের চুড়ো থেকে কয়েকহাজার প্রকাণ্ড লোহার বল গড়িয়ে-গড়িয়ে নীচে নামে, তা হলে বোধহয় অনেকটা এইরকমই শব্দ হবে। যদিও এই শব্দটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

শুধু শব্দ নয়, সেইসঙ্গে কেঁপে উঠেছে মাটি। যেন কয়েক সেকেন্ডের প্রবল ভূমিকম্প। কেঁপে উঠল খাট-বিছানা। ঝনঝন করে ভেঙে গেল জানলার কাচ। দেওয়াল থেকে খসে পড়ে গেল হলোগ্রামে ধরা ত্রিমাত্রিক নিসর্গ চিত্র।

নিশ্চয়ই ভূমিকম্প! বিছানায় উঠে বসে ঘড়ি দেখল আদিত্যঃ ছ'টা দশ। আর ঠিক তখনই শুনতে পেল সমবেত গলায় উলুধবনি আর শাঁখের আওয়াজ। কিছু-কিছু সংস্কারে সময়ের মরচে ধরে না। এটাও বোধহয় তাই।

মাথাটা সামান্য টলছিল। খুব সাবধানে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামল। দেখল, ঘরের পুবদিকের দেওয়ালে লম্বালম্বি এক চিড় ধরেছে। সুরেন্দ্র-নিলয়ে থাবা বসিয়েছে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা।

দোতলা থেকে সকলের চেঁচামেচি কলরোল শুনতে পেল আদিত্য।

প্রথমে গলির দিকের জানলা দিয়ে উঁকি মারল। কিছু বোঝা গেল না। তখন কোনওরকমে হাত-মুখ ধুয়ে জামাটা গায়ে গলিয়ে চলে গেল দোতলায়।

গিয়ে দেখল যা ভেবেছে তাইঃ প্রায় সকলেই বারান্দায়। মুন্নি আর লতা শরীরটাকে বিপজ্জনকভাবে রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। মা ওদের পাশে দাঁড়িয়ে। হতভম্ব মুখ-চোখ। বারবার শুধু বলছে, 'কীসের শব্দ? কোথা থেকে এল শব্দটা?'

আদিত্য মুখ বাড়িয়ে পুবদিকটায় জমাট কালো ধোঁয়া দেখতে পেল। লক্ষ করল, গতকালের ধোঁয়াশা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে।

গলি থেকে বেশ কয়েকজন পুরুষমানুষ রওনা দিয়েছে মারাত্মক শব্দের খোঁজে। বাড়ির বারান্দায় কিশোরী-মহিলাদের জটলা। আদিত্যর মনে হল, সবগুলো মুখের মধ্যেই কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। গত কয়েকদিনের অপুষ্টি ছাপ ফেলেছে। মুখগুলো শুকিয়ে গেছে। সঙ্কটের রেখা এলোমেলো জ্যামিতির সৃষ্টি করেছে সেখানে।

আদিত্য বলল, 'মনে হয় কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি দেখে আসছি—।'

মা ভয়ের চোখে দিতুকে দেখল।

পলাশ শয্যাশায়ী। যদিও ডাক্তারবাবু গতকাল দেখে গেছে, ওষুধ দিয়ে গেছে, আশ্বাসও দিয়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা কাজ করে চলেছে।

মা শুধু শুকনো ঠোঁট নেড়ে বলল, 'সাবধানে যাস—।'

মুন্নি হঠাৎ বলে উঠল, 'আমিও যাব তোর সঙ্গে—।'

আদিত্য মা-কে দেখল, লতাকে দেখল। তারপর ছোট্ট করে বলল, 'চল—।'

রাস্তায় নেমে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলঃ এই সাতসকালেই অনেকে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে রওনা হয়েছে। সঙ্গে বউ-বাচ্চাকাচ্চা।

মুন্নি জিগ্যেস করল, 'এরা সব কোথায় যাচ্ছেরে?'

আদিত্য ঠোঁট ওলটালঃ 'কী জানি!'

ওর মনে পড়ল ডাক্তার মণ্ডলের কথা। কিন্তু মুন্নিকে কিছু বলল না।

সরু গলির ফাঁকফোকর দিয়ে আদিত্য খালের দিকেই এগোচ্ছিল। তখনই ওর চোখে পড়ল ভোরবেলা যে সামান্য গাড়িঘোড়া চলে তারা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন কুয়াশা তেমন নেই। বরং প্রায় স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। তাই ব্যাপারটা ওর কাছে কেমন বেখাপ্পা লাগল।

উলটোডাঙ্গার খালের দিকটায় যেতে হলে একটা ছোট পার্কের মধ্যে দিয়ে গেলে খানিকটা পথ কমানো যায়। সেইজন্যই পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল মুন্নি আর ও। ভোরবেলা এই পার্কে ছেলেরা ফুটবল খেলে, ব্যায়াম করে। আজ কেউ নেই। কেউ যে থাকবে না সেটা আরও স্পষ্ট

মাঠের চেহারায়। মাঠের একটা অংশ গাঢ় সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢাকা ছিল—ক'দিন আগেও। এখন নেই। ঘাসের নীরস কঙ্কালগুলো কালচে হয়ে লেপটে রয়েছে মাটির সঙ্গে।

টিভির সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ল আদিত্যরঃ মাটির রসায়ন পালটে গেছে। সেই মাটির নানা জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা মরা পাখি, মরা প্রাণী।

মুন্নির চোখে-মুখে অসহায়ভাব ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে ছোট বোনটার জন্য মন খারাপ হচ্ছিল আদিত্যর। ও স্কুলে-কলেজে পড়া বিজ্ঞানের নানা বিষয় মনে করার চেষ্টা করছিল। কোনওভাবে কি এই অবস্থাটাকে সামাল দেওয়া যায়?

পার্কের ভেতর দিয়ে আরও অনেকে যাচ্ছিল। হঠাৎই শুভেনের গলা পেল আদিত্য।

'অ্যাই দিতু!'

আদিত্য তাকাল। শুভেন লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওর দিকেই আসছে। ওকে আরও বেশি কালো লাগছে আজ। তবে চোখের উজ্জ্বলতা কমেনি। মাথার চুল উসকো-খুসকো। ওকে দুটো নতুন প্যাড এনে দিয়েছে আদিত্য। কবিতা লেখার ফাঁকে-ফাঁকে ও চাকরির চেষ্টা করে। তবে সে ব্যাপারে খুব যে ঝোঁক আছে তা নয়।

শুভেন আদিত্যদের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। জিগ্যেস করল, 'কেসটা কী বল তো মাইরি?'

আদিত্য ঠোঁট ওলটাল। সূর্যের আলো বাড়ছে, তবে এখনও মাটিতে স্পষ্ট ছায়া ফুটছে না। কোথা থেকে ভেসে আসা ধোঁয়াশার মেঘ উড়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

'সবাই সালা—' বলেই মুন্নির দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল শুভেন, তারপর আবার বলল, 'সবাই শুনছি কেটে পড়েছে। আমার বাপটা তো দেড়বছর ধরে বিছানায় সাঁটা। জানিস তো, গলা, বুক, পেট-ফেট সব নানচাকু হয়ে গেছে। মা-টা সকাল বিকেল কাঁদছে। বলে, আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে চল। কী যে করি না—। দাদাকে পরশুদিন একটা চিঠি দিয়েছি...।'

আদিত্য সব শুনল। কথাগুলো ওর বুকের ভেতরে কেটে-কেটে বসছিল।

মুন্নি হঠাৎ বলে উঠল, 'শুভেনদা, এই পলিউশান কলকাতা ছাড়িয়ে কত দূর পর্যন্ত গেছে জানেন?'

আদিত্য বুঝল, দুর্গাপুরের অবস্থা জানতে চাইছে মুন্নি। রজত সোমবার ভোরে সেখানে রওনা হয়ে গেছে।

শুভেন বলল, 'সবাই তো বলছে, এখন নাকি কলকাতার বাইরে অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে। কীরে, তোরা কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

শেষের প্রশ্নটা আদিত্যকে লক্ষ করে। মুন্নি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাঁটছিল।

আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'এখনও ঠিক করতে পারিনি—।'

ওরা পার্কের বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তাটা এখানে একটু চওড়া। দুপাশে বাড়ি-ঘর। এর মধ্যে একটা বাড়ি অন্তত নব্বই বছরের পুরোনো। পাড়ার বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। তাঁর বয়েসও বোধহয় বাড়ির বয়েসের কাছাকাছি। সেই বাড়ির একটা অংশ ধসে পড়েছে রাস্তায়। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ইট, চুন, বালি, রাবিশ। সেখানে জনাকয়েক মানুষের জটলা। বাড়ির যে-অংশটা এখনও অর্ধেকটা ভাঙা বারান্দা নিয়ে খাড়া হয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লোলচর্ম বৃদ্ধ। কুঁজো হয়ে গেছেন বয়েসের ভারে। একহাতে বারান্দার রেলিং ধরে অন্য হাতটায় চোখ আড়াল করে দেখতে চাইছেন অকুস্থল। শরীর ও হাত ভীষণ কাঁপছে। তাঁকে সামাল দিতে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক প্রৌঢ়।

বাড়িটার নানা জায়গায় ফাঁকফোকরে বট-অশ্বত্থের রাজত্ব ছিল। আদিত্য জানে, এইসব ‘পরজীবী’ গাছ বাড়ির প্রাণ শুষে নেয়, ফাটল ধরায়। কিছুতেই এদের খতম করা যায় না। কিন্তু এখন? সবক’টা গাছই নীরস কঙ্কাল। শেকড়-বাকড় বের করে হা-হা করছে।

এবার ভিড়টা বেড়েছে, আর সেইসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচিও। আর কয়েক পা এগোলেই হয়তো চোখে পড়বে জায়গাটা। এখান থেকে কালো ধোঁয়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

খুব সাবধানে আবর্জনা এড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। দু-দিন ধরে রাস্তা সাফাই বন্ধ। জল সরবরাহ অনিয়মিত। রেশন-দোকানে প্রায় অচল অবস্থা।

আদিত্য বলল শুভেনকে, ‘প্যাড তো নিলি। কবিতা আসছে?’

শুভেন কাশল জোরে। শব্দ করে থুতু ফেলল রাস্তায়। বলল, ‘আসছে—তবে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। কোনওদিন ভাবিনি এরকম লাইন লিখব—।’

মুন্নি শাড়ির কোঁচাটা সামান্য তুলে একটা মরা বেড়াল এড়িয়ে গেল। তারপর কিছুটা আগ্রহ ফুটিয়ে তাকাল শুভেনের মুখের দিকে।

শুভেন বলল, ‘দিতু, ভাবলে কষ্ট হয়, জানিস! গত সপ্তাহে লিখেছিলামঃ

“যদি ঈশ্বর হতাম,
প্রতিটি গাছের প্রতিটি পাতায় লিখে দিতাম—
তোমার নাম।”

আর এখন কী লিখছি শুনবি?

“আজ শুধু অলৌকিক খেলা।
চারিদিকে শবের পাহাড়
বলো দেখি, কোনটা আমার?
বাজি থাক এক লক্ষ টাকা।”

মুন্নি হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠল। শুভেনের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। ও অবাক চোখে এই স্পর্শকাতর কিশোরীকে দেখছিল। আর তখনই অরবিন্দ সেতুর মাঝের অংশটা আদিত্য দেখতে পেল। অথবা বলা যেতে পারে, দেখতে পেল না। কারণ, ওটা আর নেই!

দুর্ঘটনার দৃশ্যটা ওদের স্তম্ভিত করে দিল।

একটা প্রকাণ্ড এরোপ্লেন মুখ থুবড়ে পড়েছে উলটোডাঙ্গার খালের মধ্যে। আর সেই সঙ্গে উধাও করে দিয়েছে অরবিন্দ সেতুর মাঝের অংশটা। অথচ কাল রাতেই এর ওপরে পা ফেলে হেঁটে গিয়েছিল নয়না আর আদিত্য!

আদিত্য দূর থেকেই আগুনের তাপ টের পাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে খালপাড়ের কাছটায় এগোতেই ধোঁয়ার কালো মেঘের আড়াল ভেদ করে আগুনের শিখা চোখে পড়ল। একইসঙ্গে প্লেনটার যেটুকু অংশ যে-অবস্থায় চোখে পড়ল তাতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় চালক বা যাত্রীদের কেউই বোধহয় বেঁচে নেই।

আদিত্যর চোখ জ্বালা করছিল। সেই অবস্থাতেই ও চারপাশে দেখছিল।

খালের দু-ধার ঘেঁষে সারি-সারি খোলার ঘর আর ঝুপড়ি। বহু বছর ধরেই এই ঝুপড়িগুলো এখানে রয়েছে। এর বাসিন্দারা নানা জীবিকা আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে টিকে থাকার লড়াই চালায়। কেউ কাগজ কুড়িয়ে সংসার চালায়, কেউ পুরোনো প্লাস্টিক আর পলিথিনের ব্যাবসা করে, কেউ লুকিয়ে চোলাই মদের ঠেক চালায়, আর বেশিরভাগই সাইকেলভ্যান চালানোর কাজ করে। এখানকার পুরুষদের মেয়ে-বউরা লোকের বাড়ি-বাড়ি ঠিকে কাজ করে আর বাড়তি সময়ে ফষ্টিনষ্টি করে দু-পয়সা আয় করে। এখানকার মেয়েগুলো বারো-তেরো বছর বয়সেই কপালে কাচপোকা টিপ পরে, মাথায় কুচি দিয়ে লাল ফিতে বাঁধে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়, আর চোখের নজর রগরগে নেমন্তন্নর কার্ডের মতো করে ঘুরে বেড়ায়।

আদিত্য মুন্নিদের ঘিরে ঝুপড়ির মানুষজনও জটলা করেছিল। নজর সকলেরই খালের দিকে। ওদের বেশ কয়েকজনও যে এই দুর্ঘটনায় তলিয়ে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। ওরা অনেকেই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল। ভাঙাচোরা ঘর থেকে নিজেদের সামান্য যা-কিছু জিনিসপত্র বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল।

আদিত্যর নাকে পোড়া গন্ধ আসছিল। কী-কী একসঙ্গে পুড়লে এরকম গন্ধ পাওয়া যায় আদিত্য সেটা ঠাহর করতে পারল না।

চারপাশে বেশ একটা হইচই হচ্ছিল। কিন্তু কোনও কথাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। শব্দগুলো সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। যে-সেতারটা কিছুদিন ধরে বেসুরো বাজছিল আজ সাতসকালে সেটার তারগুলো যেন ছিঁড়ে গেছে।

খালের ধার ঘেঁষে চওড়া রাস্তা। রাস্তার একপাশে গোটাচারেক বহুতল বাড়ি। সেগুলোর ছাদ আর বারান্দায় লোকজনের ভিড়।

পুলিশ এখনও এসে পৌঁছয়নি। তবে কাছাকাছি দবকল-অফিস থাকায় কয়েকজন দমকল কর্মী পোশাক পরে এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। যেন কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

জটলার মধ্যে নানা মন্তব্য কানে আসছিল। সাতসকালে প্লেনটা যাচ্ছিল কোথায়? ধোঁয়াশার জন্য বিমান চলাচল তো বন্ধ থাকার কথা! হয়তো সকালে আকাশ পরিষ্কার ছিল, তাই চলতে শুরু করেছিল।

আদিত্য একবার আকাশের দিকে দেখল। ঘোলাটে ভাবটা বাড়ছে ধীরে-ধীরে।

হঠাৎই শুভেন ওর কাছে এল। এতক্ষণ ও ভিড়ের মধ্যে কোথায় ঢুকে পড়েছিল। আদিত্যর কাঁধে টোকা দিয়ে ডেকে বলল, ‘দিতু, রীতেনটা মারা গেছে!’

রীতেন। আদিত্যর সঙ্গে চার-দশে রবারের বলে খেপ খেলত। ওদের মধ্যে একমাত্র রীতেনই ডিভিশন পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। ও এখনও থার্ড ডিভিশনে কাশীপুর স্পোর্টিং-এ খেলত। আর বডি ফিট রাখার জন্য প্রতিদিন ভোরে অরবিন্দ সেতুর ওপরে দৌড়ত।

শুভেনের পাশে রোগামতন কালো একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি, আর লাল হাফপ্যান্ট। ছেলেটাকে দেখিয়ে শুভেন বলল, ‘রীতেনের ভাই। ওর পেছন-পেছন দৌড়চ্ছিল। প্লেনটা একেবারে দৈত্যের মতো রীতেনের ঘাড়ে এসে পড়েছে। ব্যস, খেলা খতম!’

ছেলেটা শব্দ না করে কাঁদছিল। শুভেন ওকে পিঠ চাপড়ে টেনে নিয়ে গেল একদিকে।

মুন্নি কাঁপা গলায় বলল, ‘ছোড়দা, বাড়ি চল—।’

আদিত্য এবার দূর থেকে অনেকগুলো গলায় কান্নার আওয়াজ পেল।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এই সর্বনাশা দুর্ঘটনা কতজনকে শেষ করে দিয়েছে কে জানে! কত বাড়ি ধসে পড়েছে, কত বাড়িতে ফাটল ধরেছে তারও কোনও হিসেব নেই।

দূরে, খালের ওপারে, ধোঁয়ার হালকা আস্তরণ ভেদ করে চোখে পড়ল বহুতল কয়েকটা বাড়ির অবয়ব। ওপারে রাস্তার ধার ঘেঁষে বড়-বড় তিনটে বাড়ি ছিল। এখন দুটো। বাঁ-দিকের বাড়িটা মাপে এখন বামন হয়ে গেছে। লোকজনের কথাবার্তায় জানা গেল, দিশেহারা এরোপ্লেনটা নাকি প্রথমে ওই বাড়িটাকেই ধাক্কা মেরেছে।

খালের জল এমনিতেই কালো। গত ক’দিনের আবহাওয়া তাকে আরও কালো করে দিয়েছে। এখন প্রচণ্ড তাপে সে-জলে টগবগ করে যেন খই ফুটছে। ফুটন্ত তেলে একটা ভাঙা এরোপ্লেন ভাজা হচ্ছে।

মুন্নি এবার আদিত্যর জামা ধরে টান মারল। মুখে হাত চাপা দিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'ছোড়দা, বাড়ি চল। আমি আর দেখতে পারছি না।'

আদিত্যর শরীরও কেমন করছিল। ও ছোটবোনকে নিয়ে বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়।

তখনই সাইরেনের আওয়াজ ওদের কানে এল। ডপলার এফেক্টের জন্য সাইরেনের শব্দের কম্পাঙ্ক দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। দূর থেকে ছুটে আসছে কয়েকটা জিপ, ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স, আরও কত গাড়ি।

এমনসময় রামুদার চিৎকার শোনা গেলঃ 'আজ থেকে সব ছুটি। অফিস নেই। ইস্কুল-কলেজও আর খুলবে না। কী আনন্দ! সরকার থেকে খাবার বিলির কাজ শুরু হয়েছে। রোজ দু-বেলা সরকারি নেমন্তন্ন। কেন নেমন্তন্ন? বিয়ে...কুয়াশা আর কালো বৃষ্টির বিয়ে...।'

রামুদা সাইকেল চালিয়ে আসছিল। সাইরেনের কান-ফাটানো শব্দ আর লোকের ভিড় তাকে থামিয়ে দিল। কাঁচাপাকা চুল মাঝবয়েসি লোকটা হতভম্ব হয়ে খালধারের দিকে এগোল। কয়েকবার কাশল। রোজ খবরের কাগজের হেডিং মুখস্থ করা অভ্যেস। এই দুর্ঘটনার খবরটা এখনও কাগজের হেডিং হয়নি। আদিত্য লক্ষ করল, চশমার ফাঁক দিয়ে দেখা ভয়ংকর দৃশ্যটা যে রামুদা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, সেটা তার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ওরা ভাইবোনে যখন বাড়ির দিকে ফিরছে তখন প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের কয়েকটা গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অদ্ভুত দুর্ঘটনার ছবিটা সকলের বাড়িতে ঢুকে পড়বে।

আদিত্যর মন বলছিল, আর সময় নেই। আর বেশি সময় নেই। তারপরেই খতমের খেলা শুরু হয়ে যাবে।

সাত

'একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন গড়ে সাড়ে সাত হাজার লিটার বাতাস দরকার।
যদি সেই বাতাসের সঙ্গে দূষিত পদার্থ মিশে থাকে, তা হলে সেগুলো গিয়ে জমা হবে ফুসফুসে। যেসব দূষিত কণার ব্যাস দশ মাইক্রোমিটারের বেশি, তাদের বেশিরভাগই আটকা পড়ে যায় নাকের সূক্ষ্ম রোমের ছাঁকনিতে। কিন্তু আরও ছোট কণাগুলো ঢুকে যায় নাকে, গলায়, শ্বাসনালিতে ও ফুসফুসে। এবার ক্ষতির পরিমাণ কতটা হবে তা নির্ভর করবে দূষণের "থ্রেশোল্ড লিমিট ভ্যালুজ"-এর ওপরে। আগে এই মানকেই বলা হতো "ম্যাক্সিমাম অ্যালাওয়েব্ল কনসেনটেশান" বা "ম্যাক"। এখন কলকাতার বাতাস যেরকম দূষিত হয়ে পড়েছে তাতে "ম্যাক"-এর মান অনেক নেমে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিয়েছে। এখন সকলের উচিত নাকে-মুখে ভেজা কাপড় চাপা দেওয়া। আর যাদের গ্যাস-মুখোশ ব্যবহারের সুযোগ...।'

আদিত্য বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিল টিভির সুইচ। ক'দিন ধরে এই এক জিনিস চলছেঃ বিশেষজ্ঞদের মতামত।

মৃতদেহ ঘিরে বসে থাকা শ্মশানযাত্রীর মতো ছ'টা প্রাণী চুপচাপ বসে রয়েছে ঘরের এখানে-ওখানে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। ঘোলাটে আবহাওয়ায় ঘরের আলোর তেজ অনেক কম। কারও মুখই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। সকলেই বোধহয় চাইছে, অন্য কেউ কথা বলুক।

লতা মাথা নীচু করে নানকুর মাথায় হাত রেখে মেঝেতে বসে। নানকুর মুখে কোনও শব্দ নেই। ও অনেক বড় হয়ে গেছে এ-ক'দিনে, ভাবল আদিত্য। 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' অথবা মাদ্রাজি নমস্কার কিংবা 'আশকারা খাওয়ার' ব্যাপারগুলো যেন কত বছরের পুরোনো স্মৃতি।

মুন্নি মায়ের বিছানার এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা বিছানায় উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে। অন্য হাতে একটা ছোট ভিজে গামছা। পলাশ ঘরের একমাত্র ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে চোখ বুজে আছে। গত দু-দিনে শরীর মোটামুটি সেরেছে বটে, তবে মন সেরে ওঠেনি।

আদিত্য অস্পষ্ট অবয়বগুলো আর-একবার দেখল। ওর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ভেতরে-ভেতরে। দূষিত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা যেন 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি' করা। ও কয়েকটা পা ফেলে এগিয়ে গেল বাবার ফটোর কাছে। এই মানুষটা বেঁচে থাকলে আদিত্য বেঁচে যেত। ওর ওপরে কোনও সিদ্ধান্তের দায়দায়িত্ব থাকত না। পছন্দ না হলেও সবাই চুপচাপ মেনে নিত এই লোকটার কথা।

অনেক চেষ্টা করে আদিত্য কথাগুলো বের করতে পারল মুখ দিয়েঃ 'আর কোনও পথ নেই। আমাদের কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে—।'

আদিত্যর খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরা চলে যাবে এই শহর ছেড়ে। এখানে পড়ে থাকবে সুরেন্দ্র নিলয়, বাবার অস্থিভস্ম, ভক্তদাসের মৃতদেহ, বাবার ফটো, আর চোদ্দো বছরের হাজার স্মৃতিকণা। প্রবল বালিঝড়ে মরুভূমিতে যেমন বালিকণা বেপরোয়া উড়ে যায়, ছড়িয়ে যায়, এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নিষ্ঠুর হাতে ঠিক সেইরকম উড়িয়ে দেবে, ছড়িয়ে ছত্রখান করে দেবে অসংখ্য স্মৃতিকণা।

মা বিশ্রীভাবে কাশল কয়েকবার।

পলাশ চোখ খুলল, বলল, 'সবাই পালাচ্ছে—।'

মুন্নি কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'অতসীরা চলে গেছে, নরেন জেঠুরাও আজ সকালে রওনা হয়ে গেছে—।'

আদিত্য জানে।

অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ, সিনেমা হল, সব বন্ধ। দোকানে বাজারে একটুকরো খাবারের জন্য মানুষগুলো জানোয়ারের মতো লড়াই করছে। এ-ক'দিন ধরে জমানো চাল-ডাল আর দুধ খেয়ে মা কোনওরকমে টিকে আছে। কিন্তু খাবারের ভাঁড়ারও এখন প্রায় শূন্য। শুধু ওদের নয়,

লক্ষ-লক্ষ লোকের। ইতিহাসে পড়েছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল মানুষের তৈরি। এই নতুন মন্বন্তরও তাই।

গত কয়েকদিনে টিভিতে কাগজে শুধু লড়াই আর হানাহানির কথা। কেউ বলেছেন, গত বিশবছরে কলকাতাকে যে-বেপরোয়া শিল্পায়নের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে এই পরিস্থিতি অনিবার্য ছিল। তার ওপরে রয়েছে পেট্রল-ডিজেল নির্ভর যানবাহনের পরাবৃত্তীয় ক্রমবৃদ্ধি। আবার কেউ বলছেন, সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য এই শিল্পায়ন ছিল অত্যন্ত জরুরি।

শুধু অভিযোগ, আর পালটা অভিযোগ। দেশের কর্তাব্যক্তিদের ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছিল অনেক আগেই। এখন তাঁদের দাঁত-নখও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

রাত বাড়ছিল। সেইসঙ্গে আদিত্যর ভয়ও। খাওয়ার সময় এগিয়ে এলেই ওর ভয় হয়।

ও মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। মা ভিজে গামছাটা নাকে-মুখে ঘষছিল বারবার। মায়ের পিঠে আলতো হাত রেখে আদিত্য বলল, 'সামান্য যা কিছু গুছিয়ে নিয়ো, মা। কাল ভোরে আমরা রওনা হব।'

মা আর পারল না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, 'এসব ছেড়ে কোথায় যাবি, দিতু? কোথায় যাবি তুই?'

আদিত্য মাথা নাড়ল। বলল, 'এখনও জানি না। তবে কলকাতা থেকে দূরে—গ্রামের দিকে—যেখানে এখনও গাছপালা আছে, পাখি আছে।'

নানকু মায়ের কাছ থেকে হঠাৎই ছুটে এল আদিত্যর কাছে। বায়না করে বলল, 'কাকুমণি, পাখি নেব। পাখি নেব। ভক্তদাসের মতো—।'

দিতু ওর মাথায় হাত বোলাল। বলল, 'দেব রে, আমরা পাখির দেশে যাচ্ছি।'

একটু আগেই বাচ্চাটা কেমন গুম মেরে বসেছিল। 'পাখি' কথাটাই ওকে কেমন চঞ্চল করে তুলেছে এক মুহূর্তে। আদিত্য আগে কখনও বোঝেনি এই ছোট্ট শব্দটার এরকম মনোহারী গুণ আছে। অথচ মা তখনও কাঁদছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

পলাশ দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। জড়ানো গলায় বলল, 'লতা বলছিল, ওদের বাড়ি চলে যাবে...।'

বউদিদের বাড়ি সোনারপুর। সেখানে অবস্থা কীরকম আদিত্য জানে না। টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে যেটুকু জেনেছে তাতে এই দূষণ কলকাতাকে কেন্দ্র করে রোজই ছড়িয়ে পড়ছে দূরে, দূরান্তরে। সরকারের খাবার বিলির কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি ট্রাক আর লরি শহরের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহর থেকে দূরে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই গাঢ় ধোঁয়া সবকিছু ঢেকে দিয়ে যানবাহন অচল করে দিচ্ছে। দুর্ঘটনাও হচ্ছে মুড়িমুড়কির মতো। আদিত্যর মনে পড়ল দু-দিন

আগের বিমান দুর্ঘটনার কথা, রীতেনের কথা। মনে পড়ল, কান্নার শব্দ, অসংখ্য ক্রেন আর মানুষের কর্মব্যস্ততা, ধোঁয়া, আগুন—সবমিলিয়ে এক আশ্চর্য সর্বনাশ।

আদিত্য তাকাল লতার দিকেঃ 'তুমি কী করে যাবে, বউদি? চারদিকে সাংঘাতিক অবস্থা চলছে—।'

লতা কাঁদো-কাঁদো মুখে পলাশের দিকে তাকাল। মানুষটার শরীরে এখনও তেমন জোর আসেনি। লতার একটামাত্র ভাই। পরেশ। বয়েস বাইশ-চব্বিশ হবে। সে হয়তো লতার দু-বোন আর মা-বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত আছে। কিন্তু এই মারাত্মক অবস্থার কথা জেনেও পরেশ একবার খোঁজ নিতে আসেনি।

আদিত্য নানকুকে মুন্নির কাছে দিল। তারপর বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না, বউদি। আমি কাল সকালে তোমার বাড়ির খবর নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর আমরা রওনা হব। তবে যা বললাম, গোছগাছ করে নাও—এর পরে সে-সময়টুকুও আর থাকবে না।'

মুন্নি বলল, 'শুনছিলাম, সুবোধদার বাচ্চা মেয়েটা নাকি মারা গেছে—।'

সুবোধ পাল। বড় রাস্তার কোণে বইয়ের দোকান আছে ভদ্রলোকের। স্কুল-কলেজের বই পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে নানান বাংলা-ইংরেজি ম্যাগাজিন। সুবোধদার দোকানে ম্যাগাজিন দ্যাখে না, এ-পাড়ায় এমন লোক খুব কম। ওঁর মেয়েটাও মাঝে-মাঝে দোকানে বসত। বছরসাতেক বয়েস। বেশ হাসিখুশি ছিল।

মা চোখ মুছে জিগ্যেস করল, 'কী করে মারা গেল? কখন?'

মুন্নি কষ্ট করে কথা বলছিল, 'কাল সন্ধেবেলা মারা গেছে। কী হয়েছিল কেউ জানে না। ডাক্তারও বলতে পারেনি। শুধু হাঁপের টান উঠছিল বারবার।'

লতা আচমকা ছুটে এসে নানকুকে জাপটে ধরল। ভাঙা গলায় বলল, 'ছোড়দা, চলো আমরা এখুনি চলে যাই—।'

পলাশ বিরক্তভাবে বলল, 'আঃ, লতা—কী হচ্ছে? কী ছেলেমানুষি করছ!'

ঘরের মধ্যে ধোঁয়াশা গাঢ় হচ্ছিল। কে যেন কেশে উঠল দুবার।

আদিত্যর গলার ভেতরে একটা গিরগিটি নড়াচড়া করছিল। পেটের ভেতরটা নখর হাতে খামচে ধরেছে যেন কেউ। কারও মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মুখগুলো ধীরে-ধীরে আবছা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো একসময় মিলিয়ে যাবে।

মায়ের ওষুধ রাখার তাকে একটা টেবিলঘড়ি আছে। আদিত্য সময় দেখতে চাইল। কিন্তু মাত্র সাত-আট ফুট দূর থেকেও তার উপায় নেই। আদিত্য ঘড়িটার খুব কাছে গিয়ে সময় দেখলঃ ন'টা

দশ। আবার মনে পড়ল, খাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। ওর গলার ভেতরে গিরগিটিটা নখের আঁচড় কাটল।

আঁচড়ের কষ্টটা ভোলার জন্য টিভির সুইচটা অন করে দিল আদিত্য। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নানা চ্যানেলের প্রতিযোগিতা। বিপদকে কে কত বেশি বিপজ্জনক করে দেখাতে পারে তার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। নানকু ছাড়া আর সবাই টিভি দেখার জন্য টিভি সেটের আরও কাছে এগিয়ে এল।

আদিত্য ঘর ছেড়ে বেরোতেই শুনতে পেল কলিংবেল বাজছে। কে ডাকতে এল এখন? পিছন ফিরে 'আমি দেখছি' বলে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

নামতে-নামতে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপকে আজ অনেক আপন মনে হচ্ছে। ময়লা পড়া ঘোলাটে বাল্‌বটাও যেন কত চেনা। দেওয়ালের প্রত্যেকটি ক্রটি, ড্যাম্পের দাগ, সবই কত নিজের—চোদ্দো বছরের বন্ধু। ওদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। কে জানে, আর কখনও ফেরা হবে কি না। কে জানে, আরও কতদিন ধরে চলবে কুয়াশা আর কালো বৃষ্টির বিয়ে!

আদিত্য বুকে হাত বোলাল। রোজ সাড়ে সাত হাজার লিটার করে বাতাস নেয় এর ভেতরে। গত সাতদিনে বাহান্ন হাজার পাঁচশো লিটার বাতাস নিয়েছে। আদিত্য পরম আদরে পাগলের মতো হাত বোলাতে লাগল বুকে। ফুসফুসজোড়াকে উদ্দেশ্য করে অস্ফুট গলায় বলল, 'কী রে, তোরা এখনও ঠিকঠাক আছিস তো?'

আদিত্যর ফুসফুস কোনও উত্তর দিল না।

সদর দরজার কাছে এসে একটা গাঢ় ছায়া দেখতে পেল। কাছে যেতেই শুনল ছায়াটা বলছে, 'আদিত্য দাদাবাবু আছেন?'

গলার স্বরেই কিছুটা আন্দাজ করেছিল, আরও কাছে গিয়ে চিনতে পারল। দশরথ। মাঝবয়েসি মানুষ। সুনয়নাদের বাড়ি কাজ করে। খুব পান খায়, আর কারণে-অকারণে হাসে—এমনকী বকাঝকা করলেও। তবে এখন হাসছে না।

রাস্তার দুর্গন্ধ নাকে আসছিল। কিন্তু আদিত্য নাকে হাত চাপা দিল না। এভাবে কতক্ষণই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব? জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, দশরথদা?'

'দিদিমণি আপনাকে একবার ডেকেছেন—।'

আদিত্যর মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তুমি যাও—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

এখন রাতে রাস্তায় বেরোতে হলে সবাই টর্চ নিয়ে বেরোয়। নইলে গায়ে-গায়ে ধাক্কা লাগার ব্যাপারটা বেশিরভাগ সময়েই এড়ানো যায় না।

আদিত্য একতলার ঘর থেকে টর্চ নিয়ে এল। নীচ থেকে চেঁচিয়ে বলল, ‘আমি একটু বেরোচ্ছি—।’

রাস্তায় নামতেই দুর্গন্ধটা তীব্র হল আরও। মাঝে-মাঝে দরকারমতো টর্চ জ্বেলে হাঁটতে লাগল আদিত্য। আকাশের দিকে না তাকিয়েও বুঝল চাঁদ দেখা যাবে না। ঢেকে আছে গাঢ় মেঘে। হয়তো সেই মেঘ থেকেই হবে কালো বৃষ্টি। সেই পাঞ্জাবিটার কথা মনে পড়ল, যেটার ওপরে কালো বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছিল সুনয়নাদের ছাদে। কাচার পরে পাঞ্জাবিটার কয়েক জায়গায় বৃষ্টির ফোঁটার মাপে ফুটো হয়ে গিয়েছিল।

সরু গলি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানের দিকে ঘুরল আদিত্য। রাস্তা যেন গতকালের চেয়েও ফাঁকা। চায়ের দোকানেও কোনও জটলা নেই। মাঝে-মাঝে কয়েকটা প্রাইভেট কার, লরি, টেম্পো, অটো পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। সবগুলোই মানুষ বোঝাই। অরবিন্দ সেতু বিকল হওয়ার পর এই ছোট রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ব্রিজের দু-প্রান্তে আড়াআড়ি লোহার রড বেঁধে করোটি ও কাটাকুটি হাড়ের ছবিওয়ালা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ব্রিজ সারানোর কোনওরকম কাজ শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও বোধহয় নেই।

আদিত্য চলতে-চলতে এপাশ-ওপাশ টর্চ ঘোরাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একজন মানুষ রাস্তার ধারে একটা বাড়ির রোয়াকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে টর্চের আলোয় কী যেন একটা পড়ার চেষ্টা করছে।

আদিত্য চিনতে পারল। শঙ্করানন্দ চক্রবর্তী। মহাদেবদার বাবা। ও কাছে এগিয়ে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল, ‘কী করছেন, মেসোমশাই?’

বৃদ্ধ চমকে মুখ তুলে তাকালেন। ঘোলাটে চোখের মণি দেখা যাচ্ছে না। ফরসা মুখে ভাঁজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। হাতের কাগজটা লুকোতে যাচ্ছিলেন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়। মুখের ভাবও হয়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু আদিত্যকে চিনতে পেরে যেন ভরসা পেলেন। চোখ-মুখ কিছুটা উজ্জ্বল হল। চোখের মণিও যেন স্পষ্ট হল। হাতের কাগজটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, ‘দিতু, মহাদেবের চিঠি এসেছে। আজ বিকেলে।’

আদিত্য বোধহয় অবাক চোখে তাকিয়েছিল বৃদ্ধের দিকে। ছেলের চিঠি রাতের বেলা রাস্তায় এসে পড়ার দরকার কী?

শঙ্করবাবু সেটা লক্ষ করেই হয়তো অপ্রস্তুতভাবে বললেন, ‘তোমার মাসিমা কদিন ধরে খুব খিটখিটে হয়ে গেছে। দিনরাত খালি বলছে, এই বিপদে মহাদেব তো আমাদের নিয়ে যেতে পারত ওর কাছে। যত বোঝাই, ওর সেখানে কত কাজ, কিছুতেই বুঝবে না। মহাদেবের নাম শুনলেই খেপে উঠছে। আমাকে বলছে, সবাই পালাচ্ছে—চলো, আমরাও চলে যাই—’ শঙ্করবাবু হাসলেন। বড় নির্মল মজার হাসি। বললেন, ‘কী যে বলে তোমার মাসিমা। মাথাটাই বোধহয় গোলমাল হয়ে

গেছে। আরে, আমরা ভিটে ছেড়ে চলে গেলে তারপর কী হবে বুঝতে পারছ! কলকাতায় এলে আমার ছেলেটা, নাতিটা মাথায় একটা ছাদ খুঁজে পাবে না। সেটা ওকে বোঝায় কার সাধ্যি!' শঙ্করবাবু হঠাৎই কাশতে শুরু করলেন। কাশির দমকে বৃদ্ধের শরীরটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠছিল বারবার। কাশি আর
থামতেই চায় না। মুখ লাল, চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে। একটা হাত চলে গেছে গলা-বুকের কাছে।

আদিত্য ভয় পেয়ে বৃদ্ধের পিঠে হাত রাখল। শীর্ণ খাঁচাটা কাঁপছে থরথর করে। ও বলল, 'আপনি বাড়ি যান, মেসোমশাই—।'

একসময় থামল কাশি। হাঁ করে হাঁফাতে লাগলেন বৃদ্ধ। জিভ দেখা গেল। আদিত্যর মনে পড়ল, দেশবন্ধু পার্কে দৌড়োনো অ্যালসেশিয়ান কুকুরের কথা। কুকুরদের জিভ দিয়ে ঘাম ঝরে। এই মারাত্মক পরিবেশে সবকিছুই কেমন বদলে যাচ্ছে। অচেনা লাগছে সবকিছু। আদিত্য মনেপ্রাণে চাইল, গত সাতদিনের ঘটনাটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন হয়। ও যেন জেগে ওঠে ঘুম থেকে এবং দেখে যে, ও বিছানায় শুয়ে আছে। চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাক এই কঙ্কালসার বৃদ্ধের হাঁফানো চেহারার অপচ্ছায়া।

কিন্তু অপচ্ছায়াটা আদিত্যর প্রার্থনা শুনল না। কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলে উঠল, 'দিতু, বাড়িতে আমি এক মুহূর্ত টিকতে পারছি না। তাই মহাদেবের চিঠিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম পকেটে। তাও কি আমাকে বেরোতে দেয় বাড়ি থেকে! বলে, একা-একা থাকলে তোমার মাসিমার নাকি ভয় করবে। এখন খাবার জোটানোর নাম করে রাস্তায় বেরিয়েছি। শুনলাম, মানিকতলায় বস্তিতে নাকি সরকারি খাবার বিলি হচ্ছে। এদিকটায় তো খাবারের গাড়ি আসেনি, তাই ভাবছিলাম—' আবার কাশি এল। থামল একটু পরে।

আদিত্য গলা তুলে জিগ্যেস করল, 'আপনার বাড়িতে খাবার নেই?'

শঙ্করবাবু সাততাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়লেনঃ 'না, না—আছে, বার্লি আর সাবু আছে। দুপুরে বার্লি খেয়েছি। জ্বরজারি হলেই খাই। তা এমনি খারাপ লাগল না।'

আদিত্য হতভম্ব হয়ে বুড়ো মানুষটাকে দেখছিল। বুঝতে পারল, গিরগিটিটা গলা থেকে এখনও যায়নি। ও কোনওরকমে জিগ্যেস করল, 'মহাদেবদারা কেমন আছে, মেসোমশাই?'

'ভালো। খুব ভালো। ওদের ওখানে ধোঁয়া নেই, কালো বৃষ্টি নেই। বেশ নিশ্চিন্তে আছে।'

আদিত্য নীচু গলায় বলল, 'আপনি বাড়ি যান, মেসোমশাই—।'

বৃদ্ধ ওর কথা বোধহয় বুঝতে পারলেন না। উৎসুক চোখে তাকালেন।

আদিত্য মাথা নাড়ল, তারপর এগিয়ে গেল। একটু দূর থেকেও আবছা দেখা গেল, বৃদ্ধ আবার হাতের কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন।

সুনয়নাদের বাড়িটা যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই আদিত্যর আশঙ্কা অনিয়তাকার চেহারা নিতে লাগল। পরশুদিন ওদের বাড়িতে শেষবার গিয়েছিল। তখন সুনয়নার মাকে খুব সুস্থ দেখেনি। শরীরের অসুস্থতা যত না, তার চেয়ে বেশি ছিল মনের অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা। মেয়ের জন্য। মেয়ের বাবার জন্য। টোকিও থেকে ফোন এসেছিল সুখেন্দুবাবুর। ফিরতে ক'দিন দেরি হবে। টোকিও থেকে ওসাকায় যাবেন বিশেষ দরকারে। সেখান থেকে টোকিও ফিরে বাকি কাজ সেরে তারপর কলকাতা রওনা হবেন। নয়না বাবাকে জানিয়েছিল কলকাতার অবস্থা। তাতে সুখেন্দুবাবু বিচলিত হননি। শান্তভাবেই বলেছেন, বিপদ-আপদ দেখা দিলে নরোত্তম কওশিককে জানাতে। কওশিক ওদের চাঁদনি চকের দোকানের ম্যানেজার। প্রায় মাঝবয়েসি, তবে স্বাস্থ্যবান চেহারা। আদিত্য তাঁকে কয়েকবার দেখেছে নয়নাদের বাড়িতে। নয়নার মায়ের কাছেই শুনেছে, নরোত্তম খুব সৎ এবং পরিশ্রমী। আজকের দিনে এরকম মানুষ বিরল।

আদি সপ্তগ্রামে নয়নাদের এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি আছে। প্রায় পনেরো বিঘে জমি জুড়ে। আদিত্য একবার ওদের অফিস থেকে সেখানে পিকনিকে গিয়েছিল। নয়নাই বাবার কাছ থেকে অনুমতি ও চাবি জোগাড় করে দিয়েছিল। সুখেন্দুবাবু বলেছেন, অবস্থা খারাপের দিকে গেলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। নরোত্তম মা-মেয়ে ও বাড়ির লোকজনকে নিরাপদে পৌঁছে দেবে সেখানে। সেখানেও যদি বিপদ দেখা দেয়, তা হলে টাকার ব্যবস্থা করা আছে, নরোত্তমই যা ভালো বোঝে করবে। ভয়ের কিছু নেই।

'...জো ডর গয়া, সমঝো কে মর গয়া...।'

নয়নার কথাটা বেজে উঠেছিল আদিত্যর কানে। আবার একইসঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর আর-একটা প্রশ্নঃ 'দিতুদা, কী হবে বলুন তো শেষ পর্যন্ত?'

আদিত্য মন খারাপ করে ফিরে এসেছিল সেদিন। নয়না বলেছিল, 'দিতুদা, এখন পড়া-টড়া হবে না। সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর...।'

তা হলে আজ কেন এই জরুরি তলব?

দরজায় পৌঁছে কলিংবেল বাজাল আদিত্য। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সুনয়নাই দরজা খুলল।

ওদের সদরের আলোটা টিমটিম করছিল। ওর মুখটা ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

আদিত্য ইয়ারকি করেই টর্চটা জ্বেলে তাক করল সুনয়নার মুখে।

ও চোখ কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিলঃ 'কী হচ্ছে, দিতুদা!'

'ফাজলামি।' আদিত্য বলল, 'বানান করে দেব?' তারপর টর্চ সরিয়ে নিল।

সুনয়না কয়েকসেকেন্ড চুপ করে রইল। অবাক চোখে দেখতে চেষ্টা করল আদিত্যকে। দিতুদার কথায় কোনও কুয়াশা নেই, কালো বৃষ্টিও নেই। নয়না বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন—।'

বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে আদিত্য বলল, 'কী ব্যাপার? এরকম বেটাইমে তলব!'

সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজার পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল নয়না। বলল, 'আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দিতুদা। কাল সকালে।'

আদিত্য কোনও কথা বলল না। ওরা চুপচাপ ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরের টিউব লাইটের আলোয় অনেক স্পষ্ট করে দেখা গেল মেয়েটাকে। পরনে জাম রঙের ম্যাক্সি। তার মধ্যে সাদা বুটি। মাথার ছোট-ছোট চুল অবাধ্য ঢঙে এলোমেলো। চোখের নীচে ময়লা ছোপ। ঠোঁটের অভিমান আরও তীব্র। সব মিলিয়ে এক অপ্রত্যাশিত রুক্ষতা। সবুজের ছিটেফোঁটাও নেই আর।

'আমরা কাল চলে যাচ্ছি, দিতুদা।' সুনয়না আবার বলল। ও দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে।

আদিত্য লম্বা সোফাটার ওপরে বসে পড়েছিল। ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল একবার। দেখল, দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা 'আলফা' সুটকেস আর সফ্‌ট লাগেজ সাজানো। এ ছাড়া বাকি সবকিছু আগের মতোই। বালক শ্রীকৃষ্ণ এখনও হাসছে। আর প্রকৃতির ছবি দুটোয় আকাশ এখনও নীল, গাছপালা এখনও সবুজ।

আদিত্য ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ওর এখন কী করা উচিত। ও অন্য যে-ছাত্রটিকে পড়ায়—অভিজিৎ—তারা তিনদিন আগেই ঘরদোরে তালা দিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার খবরটা ওরা পৌঁছে দিয়েছিল আদিত্যকে। তবে বলেছিল, 'কোথায় যাচ্ছি জানি না। কবে ফিরব তাও জানি না।'

এই ছাত্রীও যাচ্ছে। যাবে না কেন? সবাই তো চলে যাচ্ছে। পাড়া প্রায় শ্মশান হয়ে এল।

আদিত্য বলল, 'তোমাদের আরও আগে চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'জানি। কিন্তু মায়ের শরীরটা যে খারাপ হল হঠাৎ। মিস্টার কওশিক রোজ আসছেন। আজও এসেছিলেন। আমাদের দুটো গাড়িতেই তেল ভরতি করা হয়ে গেছে। আর ছ'টা জেরিক্যানে বাড়তি ডিজেল আর পেট্রল নেওয়া হয়েছে। আর এই মালপত্র। উনি কাল সকালে আর একটা ম্যাটাডর ভ্যান নিয়ে আসবেন...।'

আদিত্য মা, মুন্নি, পলাশ, লতা, নানকুর কথা ভাবল। ভাবল শুভেনের কথা। ওর শয্যাশায়ী বাবার কথা। শঙ্করবাবুর কথা। সুবোধদার বাচ্চা মেয়েটার কথা। নয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, নয়না ওর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছে।

আঙুলের ডগায় আঙুল ঘষল আদিত্য। বলল, 'যাও। তবে সাবধানে যেয়ো। সাবধানে থেকো। সময় পেলে চিঠি দিয়ো...।'

আদিত্য টের পেল, গলার গিরগিটিটা এখনও যায়নি।

সুনয়না কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর দু-তিন পা এগিয়ে এল ঘরের ভেতরে—আদিত্যর দিকে। দু-হাত পিছনে রেখে থুতনি সামান্য উঁচু করে দাঁড়াল।

আদিত্য ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। সুনয়নার বুকের দিকে নজর গেল ওর। অপরাধবোধ মনের মধ্যে কামড় বসাচ্ছিল, কিন্তু ও তক্ষুনি চোখ ফেরাতে পারল না। নয়নার ছিপছিপে শরীরের তুলনায় বুকজোড়া উদ্ধত, বেপরোয়া। আদিত্যর অস্বস্তি হল। ছাত্রীকে এমন চোখে দেখা কি ঠিক? কিন্তু নয়না ওর তাকানো ভ্রূক্ষেপই করল না। আচমকা বলল, 'দিতুদা, আপনারাও চলুন—আমাদের সঙ্গে—।'

আদিত্য কিছুক্ষণ কোনও জবাব দিতে পারল না। ওর মনে পড়ল, নয়না কখনও ওদের বাড়িতে যায়নি। আদিত্যও যেতে বলেনি কখনও। কারণ, সবসময়েই ওর মনে পড়ে যেত দুর্বল দিকগুলোর কথা। অন্তত যে-জিনিসগুলোকে ওর নিজের দুর্বল বলে মনে হয়। বাড়ির ড্যাম্প ধরা দেওয়াল, সর্বত্র এলোমেলো ব্যাপার, নিতান্তই ছাপোষা বাড়ির ছাপোষা বাসিন্দা...ওঃ। মনে হতো, বাড়ির বাইরের জগৎটা কত সুন্দর। আর এখন? অসহ্য ধোঁয়াশার গতিপথ কেউই রুখতে পারেনি! অনায়াসে তা সিংদরজা কিংবা ফাটা ঘুণ ধরা কাঠের পাল্লা পেরিয়ে গেছে। কোনওরকম শ্রেণিবিচার করেনি।

'কী হল, দিতুদা, যাবেন না আমাদের সঙ্গে?'

গাড়ি দুটোর কথা মনে পড়ল আদিত্যর। ডিজেল আর পেট্রোলে টইটুম্বুর ট্যাঙ্ক নিয়ে যেন দু-দুটো তেজীয়ান বুড়ো ঘোড়া অপেক্ষা করছে। সামনে লম্বা দৌড়।

আদিত্য নয়নাকে বসতে বলল। আর তখনই নয়নার মা ঘরে এলেন। হাতে একটা খাম। সেটা আদিত্যর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এটা দেওয়ার জন্যেও তোমাকে ডেকেছিলাম। নয়না তো বলেছে বোধহয়—আমরা কাল সকালে চলে যাচ্ছি।'

মাসের মাত্র এগারো দিন পেরিয়েছে। ক'দিনই বা পড়াতে এসেছে আদিত্য। কিন্তু এখন টাকার দরকার। হাজার টাকা নেহাত কম নয়। বিপদের সময় টাকার দাম আরও বেড়ে যায়।

আদিত্য নিলজ্জের মতো হাত বাড়িয়ে খামটা দিল। বলল, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

'এখন তো একরকম। পরে যদি আবার খারাপ হয়, তাই আর দেরি করছি না, কালই রওনা হচ্ছি।'

সুনয়নার ধৈর্যের সীমানা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছিল মাপে। হঠাৎই ও বলল, 'মা, দিতুদারাও চলুক না আমাদের সঙ্গে—।'

ওর মা অদ্ভুত হেসে দেখলেন আদিত্যকে। বললেন, 'গেলে তো ভালোই—।'

সুনয়নার মায়ের হাসিটা দেখে কষ্ট হল আদিত্যর। পুরোপুরি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে মানুষ যখন এগোয় তখনই বোধহয় সে এরকম হাসি হাসতে পারে। এ-হাসিতে কোনও পিছুটান নেই।

আদিত্যর যে আজ কী হয়েছে! ছাত্রীকে আজই প্রথম বোধহয় ও তরুণী হিসেবে ভাবছিল। বারবার খুঁটিয়ে দেখছিল মেয়েটাকে। ইস্, ওর কপালের তিলটাকে কতদিন ভালো করে দেখা হয়নি। ও ভাবত তিলটা বোধহয় ডানদিকে। কিন্তু না, ওটা তো বাঁ-দিকে রয়েছে। বাঁ-দিকেই বেশি মানিয়েছে। দু-ভুরুর মাঝখানে গাঢ় রঙের টিপটাও কী সুন্দর! ম্যাক্সিটা কি একটু আঁটোসাঁটো লাগছে ওর গায়ে? আরে, পায়ের নখে রং দিয়েছে! বেশ দেখাচ্ছে তো! কানের লতিতে লাল-সবুজ দুলটাও চমৎকার।

'দিতুদা—' সুনয়না অন্যরকম গলায় ডাকল। ওর চোয়ালের রেখায় এখন আর নমনীয়তা নেই।

'কাল সকালে আমাকে সোনারপুর যেতে হবে—বউদিদের বাড়ি খোঁজ নিতে।' আদিত্য বলল, 'সেখান থেকে ফিরে এসে তারপর রওনা দেব। এখানে আর ভরসা পাচ্ছি না—।'

মা ও মেয়ে একইসঙ্গে বলে উঠলঃ 'ট্রেনে যাওয়া অসম্ভব!'

আদিত্য ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্নে তাকাল।

সুনয়নার মা তখন বললেন, 'কওশিকজির কাছেই শুনছিলাম। কলকাতার বাইরে থেকে ট্রেন প্রায় আসছে না বললেই চলে। সব ট্রেনই রওনা হচ্ছে কলকাতা ছেড়ে। তবে—।'

আদিত্য ধৈর্য না হারিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'—মানে, টেনে চড়ার জন্যে নাকি সাংঘাতিক ভিড়। তুমি সোনারপুর খবর নিতে যেতে পারবে না।...আর গেলেও ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ...।'

আজ, এখন, আর কেউ চা-বিস্কুট নিয়ে এল না। আসার কথাও নয়। সবকিছুরই ছন্দ নষ্ট হয়ে গেছে। আতিথেয়তারও।

সুনয়নার মা তখনও কথা বলছিলেন, '...শুরুর দিকে ভেবেছিলাম, এ-ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবে না। কিন্তু এখন...কওশিকজির কাছে শুনলাম, টিভি, রেডিয়ো আর খবরের কাগজের অফিসের লোকদের নাকি গ্যাস-মুখোশ দেওয়া হয়েছে। কোনওরকমে কাজ চলছে সেখানে। এ ছাড়া দোকানপাট, ব্যাবসা সবই প্রায় বন্ধের মুখে। রাস্তাঘাটে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ হওয়ার জন্যে নানা অসুখবিসুখ ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়। পথেঘাটে খুন-জখম-রাহাজানি বেড়ে গেছে...।'

অরবিন্দ সেতুর ওপরে সেই রাহাজানির রাতটার কথা মনে পড়ে গেল আদিত্যর। মাসিমা কি পুরো ব্যাপারটা জেনেছেন? কে জানে!

একটু সময় নিয়ে আদিত্য বলল, 'কাগজে তো এত সব লেখেনি—।'

‘বোধহয় সবাই ভয় পেয়ে যাবে, তাই। তবে প্রাইভেট চ্যানেলে কিছু-কিছু দেখিয়েছে। নয়না বলছিল, ও দেখেছে।’

শেষ কথাটা বলার সময় মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন সমর্থনের আশায়। কিন্তু সমর্থন মিলল না। সুনয়না পুরোনো কথাটাই বলল আবার, ‘দিতুদা, আপনারা তা হলে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো? কাল সকালে আমরা স্টার্ট দিচ্ছি কিন্তু—।’

‘যাব—’ আদিত্য বলল। লক্ষ করল ঘরের ধোঁয়াশা ফিকে হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

সুনয়নার মা চেয়ারে বসেছিলেন। আদিত্যর কথায় যেন স্বস্তি পেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ভালোই হল, তোমরা থাকলে আমরাও অনেকটা ভরসা পাব।’ তারপর শিথিল পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। যাওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণের ফটোর দিকে তাকালেন একবার।

সুনয়নার চোয়ালের রেখা কিছুটা নরম হয়েছিল। ও হঠাৎই বসে পড়ল সোফার কোণে—আদিত্যর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। ঘাড় তেরছা করে জিগ্যেস করল, ‘দিতুদা, আপনি আমাকে ভয় পান?’

আদিত্য মুখ তুলে বুক খালি করে শব্দ করে হেসে উঠল। হাসতেই থাকল। হাসির ছোঁয়াচ নয়নার মুখেও লাগছিল।

হাসির দমক কিছুটা কমলে পর আদিত্য বলল, ‘তোমার কথাই ঠিক। আমি ছোটবেলায় ভূত তাড়িয়ে বেড়াতাম। মাস্টারি আমাকে মানায় না।’

সুনয়না বিমূঢ়ভাবে বলল, ‘তাতে কী?’

আদিত্য হাসতে-হাসতেই বলল, ‘আজ বুঝলাম, মাস্টারিটা মানায় তোমাকেই। মাস্টারদের আমি ভয় পাই। আমি আবার ভূত তাড়ানোর চাকরিতে ফিরে যাব।’

সুনয়না দু-হাত কোলের কাছে জড়ো করে মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, ‘বলুন তো, ভূত আছে কি নেই?’

‘কী করে বলব, হয়তো আছে—।’

‘ভূতের আয়ু ক’বছর হতে পারে, দিতুদা? মানুষের সমান?’

আদিত্য ঠাট্টা করে হাত নাড়লঃ ‘ধ্যাৎ, ভূত আবার মরে গিয়ে ভূত হতে পারে নাকি! ভূত যদি থাকে তো সে অমর।’

‘বাঃ, গ্র্যান্ড। তা হলে তো বিশ লক্ষ বছরের পুরোনো আফ্রিকার আদিম মানুষ অস্ট্রালোপিথিকাস-এর ভয়ংকর আত্মা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে—।’

নয়না হাসছিল। আদিত্যও হেসে বলল, ‘ও বেচারা ঘুরে বেড়ালে তোমার মাথাব্যথা কেন বুঝতে পারছি না।’

নয়না বলল, 'আমি আমার কথা ভাবছি, দিতুদা। আমি যদি মরে যাই তাহলে ওরকম লক্ষ কোটি বছর ধরে ঘুরঘুর করতে পারব না, বাবা!'

'আমি যদি মরে যাই...'। আদিত্যর মাথার ভেতরে ধোঁয়াশায় বিভ্রান্ত একটা এরোপ্লেন পাক খেতে শুরু করল। টালমাটালভাবে উড়তে উড়তে ওটা বিপজ্জনকভাবে গোঁৎ খেয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। বহু নীচের ভূমিখণ্ড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসতে লাগল আদিত্যর কাছে। ওর খাদ্যনালির পিছল দেওয়ালে নখ বসিয়ে গিরগিটিটা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উঁকি মারতে চাইছে আলজিভের পাশ দিয়ে। বাতাস নিতে চাইছে বুক ভরে।

সুনয়না খুব হাসছিল। হাসির কুচি ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরের মধ্যে। আদিত্য গভীরভাবে দেখছিল ওকে। চেনা-অচেনা দুটো স্তরের মধ্যে দোলাচলে মগ্ন ওর ছবিটা।

বাড়ি ফেরার পথে মনে হল যেন শ্মশানের পথ ধরে হাঁটছে। শুধু আশেপাশে কোনও ছন্নছাড়া নেড়ি কুকুর নেই।

এমনসময় দূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা 'গুম-গুম' শব্দ শুনতে পেল আদিত্য। বোমার শব্দ? তারপরই তীব্র কানফাটানো শব্দ অনেকগুলোঃ ক্র্যাক-ক্র্যাক-ক্র্যাক—। গুলির আওয়াজ?

অন্য সময় হলে আদিত্যর মনে এখন অনেকরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারত। কিন্তু ও অলস পায়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। ভাবতে লাগল, বোমা, গুলি, ধোঁয়া আর কালো বৃষ্টি—এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে মারাত্মক। অরবিন্দ সেতুর মুখে লাগানো করোটির ছবিটা ভেসে উঠল আদিত্যর চোখের সামনে। ভাবল, 'আমাদের প্রত্যেকের শরীরেই একটা করে করোটি রয়েছে।'

সুনয়নার শেষ কথাটা আবার মনে পড়ে গেল ওর।

আট

এরকম ভয়ংকর দৃশ্য আদিত্য কখনও দেখেনি।

একটা দুঃস্বপ্নের নগরীর রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে ওদের গাড়ি। প্রথমে চকোলেট রঙের মারুতি গাড়ি। গাড়িতে নরোত্তম কওশিক, দশরথ, পলাশ, লতা আর নানকু। একজন ছোকরা ড্রাইভার চালাচ্ছে।

তার পিছনে সাদা জিপসিতে আদিত্য, মুন্নি, মা, সুনয়না আর সুনয়নার মা। গাড়ি চালাচ্ছে বিশু নামের একজন মোটাসোটা ড্রাইভার।

সবার পিছনে একটা সবুজ ম্যাটাডর ভ্যান। ভ্যানে মালপত্র বোঝাই। মালপত্র ছাড়া সেখানে রয়েছে ডিজেল আর পেট্রোলের জেরিক্যান। ভ্যানের ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে রয়েছে নয়নাদের বাড়ির দুজন কাজের লোক—একজন রোগা কিশোর, আর একজন প্রায় বৃদ্ধ, বহুদিন ধরে ওদের বাড়িতে রয়েছে।

মারুতি গাড়িতে বসা কওশিকের নির্দেশমতোই গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। আদিত্যদের জিপসি ও ম্যাটাডর ভ্যান শুধু মারুতিকে অনুসরণ করছে।

খুব ভোরে মালপত্র নিয়ে সুনয়নাদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল আদিত্য। ঘুমন্ত নানকু ছিল লতার কোলে। পলাশের হাত ধরে ছিল আদিত্য। আর মা নির্ভর করেছিল মুন্নির ওপরে।

জিনিসপত্র নিয়ে সবাই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসার পর সদর দরজায় তালা দিচ্ছিল আদিত্য। তখনই মা কেঁদে উঠেছিল। মুন্নিও। সুরেন্দ্র নিলয়ে তালা পড়ছে। দেওয়ালে ফাটল ধরা, ঢালাইয়ের রড বেরিয়ে থাকা এই বাড়িতে আর কখনও কি ফিরে আসতে পারবে ওরা?

আদিত্য দেওয়ালগুলো দেখল। ড্যাম্পের ছাপে তৈরি কী সুন্দর সব বিমূর্ত ছবি! সদরের মাধবীলতা গাছটা দেখে কষ্ট হল আদিত্যর। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া এক নিষ্ঠুর কঙ্কাল। তার নীচে কালচে মাটির আড়ালে বাবার অস্থিভস্ম, ভক্তদাসের দেহাবশেষ। ওগুলো ধীরে-ধীরে মিশে যাবে দূষিত মাটির অণুতে।

আশ্চর্য! ওরা চলে আসছে, তখন একটা নির্লজ্জ অপচ্ছায়া পিছন থেকে গলা ফাটিয়ে মাকে ডাকছিলঃ ‘নিভা! নিভা! কবে ফিরবে তোমরা? চিন্তা কীসের, বাড়ি দেখার জন্যে আমি তো রইলাম। নিভা—নিভা—।’

মা পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। স্মৃতি বড় বেহায়া। যেখানে-সেখানে উদোম হয়ে পাগলের মতো নাচে। কারও মানা শোনে না।

ছিন্নমূল পরিবারের মতো গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওরা। চারপাশে কোনও শব্দ নেই। পাখি নেই, গাছের পাতা নেই। আকাশ ঘোলাটে। গতকাল মাঝরাতে আবার কালো বৃষ্টি হয়েছে। তবে এখন আর কেউ ভয় পাচ্ছে না। শুধু অপেক্ষা করছে।

নাকে ভিজে কাপড় চাপা দিয়ে দুর্গন্ধ ও দূষণ আড়াল করতে চাইছিল ওরা। ধোঁয়াশার হালকা আবরণ যেন শীতের ভোর তৈরি করেছে। নির্জন পথে পা ফেলতে-ফেলতে আদিত্যর মনে হল গাড়িতে রওনা হয়ে শেয়ালদা স্টেশনের কাছটা একবার ঘুরে গেলে হয়। গতকাল লতাকে ট্রেনের ব্যাপারটা বলেছিল আদিত্য, কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হয়নি খুব একটা বিশ্বাস করেছে। তবে এটা ঠিক ওর অফিসে যারা বাইরে থেকে আসত, তারা বলেছিল, অবস্থা খারাপ দেখলে আসা বন্ধ করে দেবে। তারপর তো অফিস-দোকানপাট সব বন্ধের মতোই হয়ে গেল। কে জানে, কলকাতা থেকে দূরে যারা আছে, তারা এখনও নিশ্চিন্ত আছে কি না!

না-নিলেই-নয় এমন সব জিনিসই ওরা সঙ্গে নিয়েছে। তা ছাড়া গয়নাগাটি টাকাপয়সা। পরিস্থিতি যখন ঘোরালো হচ্ছিল তখনই ব্যাঙ্কের শতকরা নব্বই ভাগ টাকা তুলে নিয়েছিল আদিত্য। সেসময়

থেকেই সব ব্যাঙ্কে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। তবে কে জানে, এখনও যেসব বিপদের মুখোমুখি হতে হবে, টাকার বিনিময়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি না।

মুন্নি ভক্তদাসের খালি খাঁচাটা হাতে করে হাঁটছিল। মা কিছুতেই ওটা ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। খাঁচাটা অল্প-অল্প দুলছিল। পাখি নেই। একটা পুরোনো গানের কলি মনে পড়ল আদিত্যরঃ 'পাখি উড়ে যাবে বলে খাঁচা কিনি না—।' ও তাকাল চারপাশে। ওরা যে-খাঁচায় বন্দি তার দেওয়ালটা কত দূরে? তার দরজাটা খোলা আছে তো?

গাড়িতে সদলবলে গুছিয়ে ওঠা থেকে শুরু করে রওনা হওয়া পর্যন্ত সুনয়নার মেজাজ বেশ হালকা ছিল। যে-কোনও ব্যাপারের মধ্যেই একটা না একটা সুবিধের দিক খুঁজে বের করছিল মেয়েটা। কওশিকজিকে ও-ই বলেছিল কলকাতার কয়েকটা জায়গা দেখার কথা। তার সঙ্গে আদিত্য শুধু শেয়ালদার কথাটা যোগ করেছিল। কারণ, বউদির চোখের জলে ভেজা ফোলা চোখ দুটোর করুণ অবস্থা ওর নজর এড়ায়নি।

গাড়ি সরু রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়ল। কাল রাতে বৃষ্টি হওয়ায় কুয়াশা অনেকটা ফিকে। তবে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল সাবধানে। দোকানপাট সবই বন্ধ থাকায় পরিবেশ থমথমে। রাস্তায় যত রাজ্যের আবর্জনা, পশুপাখির মৃতদেহ—দুর্গন্ধের ঝাপটায় গা গুলিয়ে উঠছে। যে-ক'টা গাড়ি দেখা গেল সবই লোকজন আর মালপত্রে বোঝাই। মাঝে-মাঝে সাইরেন বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে পুলিশের জিপ, মোটরবাইক। আরোহীদের মুখে অদ্ভুত ধরনের গ্যাস-মুখোশ। এ ছাড়া খবরের কাগজ, টেলিভিশন কোম্পানি আর হাসপাতালের গাড়িও চোখে পড়ল। এখানে-ওখানে লোকজন হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের হাতে সুটকেস, ব্যাগ, পোঁটলা-পুঁটলি।

গাড়িতে সবাই চুপচাপ বসেছিল। মা চশমা খুলে চোখ মুছছিল বারবার। মুন্নি মায়ের হাঁটুর কাছটা খামচে ধরে বসে। ফ্যাকাসে আলোছায়া সকলের মুখে।

সুনয়না হঠাৎই বলল, 'দিতুদা, দেখেছেন কুয়াশা কেমন ফিকে হয়ে গেছে! আমি বেট রেখে বলতে পারি তিনদিনের মধ্যেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

আদিত্য হাসল। নয়নাকে দেখল। সাদার ওপরে নানা রঙের ছাপ দেওয়া সুইস কটনের টিশার্ট পরেছে, আর 'হারা' জিন্স। মাথার খাটো চুলে শ্যাম্পু। মুখে কীসব মেখেছে—বেশ চকচক করছে। কানে স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি আধুনিক নকশার ইয়ারিং।

কিছুক্ষণ রাস্তা দেখার পর চোখ ফিরিয়ে নিল আদিত্য। অলস চোখে দেখতে লাগল ড্যাশবোর্ডের মিটারগুলো। যন্ত্রের কাঁটা এখন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

গাড়ি নির্জন সারকুলার রোড ধরে ছুটছিল। রাস্তার দুপাশের বহুতল বাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে গাছগাছালির কঙ্কাল।

হঠাৎই অস্বাভাবিকভাবে ব্রেক চাপল বিশু। সবাই ছিটকে পড়ল এ-ওর ঘাড়ে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে আচমকা কয়েকটা লোক হাজির হয়েছে গাড়ির সামনে। ওদের দুজনের হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি। আর-একজনের হাতে একটা বড় হাতলওয়ালা কুড়ুল। সঙ্গে আরও দু-তিনজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে ঘৃণা ও হিংসার ছাপ।

নয়না 'বিশুদা! জোরে চালাও, জোরে!' বলে চিৎকার করে উঠল।

মারুতি গাড়িটা একটু আগে বেরিয়ে গেছে লোকগুলোর নাগালের বাইরে। সুতরাং আদিত্যদের জিপসিটাকে বাগে পেয়ে সামনের লোক দুটো ভয়ঙ্কর চিৎকার করে আক্রমণ করে বসল। কুড়ুলের প্রচণ্ড আঘাতে এসে পড়ল জিপসির সাদা বনেটে। তারপরই নিষ্ঠুর লাঠির সংঘাত।

মুন্নি ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ছোড়দা! সাবধান!'

বিশু প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল ডানদিকে। একটা লোক হেডলাইটের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

আদিত্য বিশুর পাশেই বলেছিল, চট করে মাথা নীচু করে আড়ালে লুকোতে চাইল। গাড়িটা টাল খেয়ে চাকায় বীভৎস ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সামনের দিকে। মারুতি গাড়িটাকে তখনও দেখা যাচ্ছে সামনে।

আদিত্য মাথা তুলে বলল, 'নয়না, দ্যাখো তো, পেছনের ম্যাটাডরটা ঠিকমতো আসছে কি না—।'

সুনয়নার মুখের রক্ত কেউ পলকের জন্য শুষে নিয়েছিল। গলা বাড়িয়ে দেখে ও ঘাড় নাড়ল, 'আসছে।'

সুনয়নার মা বললেন, 'ওই সাংঘাতিক লোকগুলো কি গুন্ডা না পাগল? আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করছে।'

আদিত্য পিছন ফিরে মা-কে দেখল। শীর্ণ বৃদ্ধা মেয়ের আরও কাছে সরে বসেছে। চোখ বোজা। বিপদ ভুলে থাকার জন্য স্মৃতি রোমন্থন, না ঈশ্বরের কাছে নিরাপত্তার নীরব প্রার্থনা?

বিশু কেশে বলল, 'পালের গোদাটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে। মাথায় চোট পেয়েছে মনে হয়—' এবং গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

আদিত্যর বড়-বড় শ্বাস পড়ছিল। খানিকটা সময় নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে তারপর বলল, 'লোকগুলো খেপে গেছে। বোধহয় শহর ছেড়ে পালানোর জন্যে মরিয়া হয়ে গাড়ি খুঁজছে।'

মুন্নি জিগ্যেস করল, 'কেন রে—?'

আদিত্য উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল। উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন হল না। কারণ সামনে তাকিয়েই দুঃস্বপ্নের দৃশ্যটা ওর নজরে পড়ল। প্রায় একইসঙ্গে গাড়ির আর সকলে দেখতে পেল

দৃশ্যটা।

বিশু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘সবাই ঠিকমতো ধরে-টরে বসুন—’ এবং পরক্ষণেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

পুলিশের অনেকগুলো জিপ ও ভ্যান রাস্তার মাঝামাঝি লাইন করে দাঁড়িয়ে। বাঁ-দিকের ফুটপাথে দাঁড়ানো ই এস আই হাসপাতালের বারোতলা বাড়ির কাছ থেকে লাইনের শুরু—সেখান থেকে এগিয়ে গেছে সোজা শেয়ালদার ফ্লাইওভারের দিকে।

কোথাও সাইরেন বাজছে তীব্র স্বরে। মাইকে চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে কেউ। আর গাড়ির লাইনের বাঁ-দিকটা জনসমুদ্রে ঠাসা। অসংখ্য মানুষ মালপত্র নিয়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। তাদের প্রচণ্ড চাপ সামলাতে পুলিশের দল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাস্তার অর্ধেকটা দখল হয়ে গেলেও বাকি অর্ধেকটার কোনও যানজটের ব্যাপার নেই। কখনও-সখনও দু-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

আদিত্যর মনে হল, মরুভূমিতে যেন জলের জন্য লাইন পড়েছে।

জনসাগরের রেখা অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। একটু পরেই ধোঁয়াশায় অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেছে ছবিটা।

নয়না বলল, ‘কওশিকজি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি সোনারপুরে যেতে পারতেন না, দিতুদা। দেখেছেন, কী সাংঘাতিক অবস্থা!’

আদিত্য মাথা নাড়ল। এই অসহায় মানুষগুলো ক’দিন ধরে লাইন দিয়ে থাকবে ট্রেনের জন্য? বুঝতে পারল, একটা গাড়ি হাতে পাওয়ার জন্য মানুষ কেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

মায়ের কাশি শুনতে পেল ও। টের পেল, ওর নিজের গলাটাও কেমন খুসখুস করছে। শঙ্করবাবুর কথা মনে পড়ল। আমেরিকাবাসী ছেলের চিঠি হাতে বসে থাকা দিশেহারা মানুষটার শেষ ছবিটা ওর চোখে পড়ল। মনে পড়ল রীতেনের কথা। রীতেন নিশ্চয়ই কখনও ভাবেনি প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাবে। কারণ প্লেনে চড়া ওর কাছে নেহাতই স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভব হল। আচ্ছা, শুভেন কী করছে এখন? কেমন আছে ওর শয্যাশায়ী বাবা?

গাড়িটা আচমকা ঝাঁকুনি খেল। কোনও গর্তে পড়ল বোধহয়। আদিত্য জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত চলে এসেছে আবর্জনা।

ইট-কাঠ হাড়গোড় সবই বোধহয় মিশে গেছে। সবকিছুর ওপরেই কালো বৃষ্টির সিলমোহর।

শেয়ালদা ফ্লাইওভার পেরিয়ে মৌলালি, তারপর এস এন ব্যানার্জি রোডে ডানদিকে ঘুরবে ভেবেছিল, কিন্তু দেখল, সামনের গাড়িটা সোজা ছুটে চলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কারণটা বুঝতে পারল। রাস্তা বন্ধ। করোটি আর কাটাকুটি হাড়ের ছবি। সব রাস্তাতেই ভয়ঙ্কর বিপদ। এরকম আরও কয়েকটা রাস্তা চোখে পড়েছে এর আগে।

একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে চুপচাপ বসেছিল গাড়ির যাত্রীরা। বিশু গাড়ি চালাচ্ছে একমনে। ওর চোখ একাগ্র, জ্বলজ্বল করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িগুলো চলে এল কলকাতার সবচেয়ে খোলামেলা জায়গায়—ময়দানে। সঙ্গে-সঙ্গে অলৌকিক অবাস্তব কোনও শক্তি আদিত্যর ঝুঁটি খামচে ধরল অমানুষের মতো। তারপর নিষ্ঠুরভাবে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল—একের পর এক।

গাড়িটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ নরোত্তম কওশিক মারুতি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। দাঁড়িয়ে পড়েছে জিপসির পিছনের ম্যাটাডর ভ্যানও।

কওশিকজি নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে। এগিয়ে আসছেন জিপসির দিকে।

আদিত্যও নামল গাড়ি থেকে। মা দুর্বল গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

মুন্নি ডাকল, 'ছোড়দা!'

আদিত্যর মাথা টলছিল। ওর ভয়াতুর চোখ অনিশ্চিত দিশেহারা ভঙ্গিতে দেখতে লাগল এপাশ-ওপাশ। এ কী সর্বনাশের ছবি দেখছে ও!

মাথার ওপরে আকাশ জুড়ে বাদামি ধোঁয়াশা। দূর দিগন্তেও তাই। স্পষ্ট আলোময় ঘোলাটে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো রঙের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। তার সারা গায়ে কালচে ছোপ। আর সেই স্মৃতিসৌধ ঘিরে সবুজের ধূসর কঙ্কাল। মাঠের পর মাঠ কালচে-বাদামি ঘাসের মৃতদেহে ঢাকা। সমস্ত গাছপালা ডাইনির আলুথালু চুলের মতো খটখটে শুকনো শাখাপ্রশাখা মেলে ভয়ঙ্কর ছায়াহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই আশ্চর্য রুক্ষ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যেন কয়েক কোটি বছরের জীর্ণ মলিন এক প্রাসাদ। তার মাথায় ডানাওয়ালা উপদেবী—লোহার পরি। পারদের ওপরে ভেসে নেচে বেড়াত ক'দিন আগেও। এখন তার পায়ের নীচে পারদের বিষ, মাথায় ধোঁয়াশার।

কওশিকজি আদিত্যর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম, দেখার কিছু নেই। সব শেষ। তা-ও আপনি দেখতে চাইছিলেন—' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমরা সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের ওপর দিয়ে বেরিয়ে জি টি রোড ধরব।

আদিত্য তখনও ওর ছোটবেলার স্বপ্নটাকে দেখছিল। বাচ্চা বয়েসে বাবার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিল ওরা। মা, পলাশ আর ও। পলাশের সঙ্গে কত ছুটোছুটি করেছিল এই সবুজ মাঠে। অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সাদা ধবধবে এই স্মৃতি-সৌধের সৌন্দর্যে। মনে হয়েছিল, স্বপ্নে দেখা কোনও রঙিন জলছবি। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। আর পশ্চিমের আকাশরেখায় কয়েকটা দীর্ঘকায় অট্টালিকা।

আদিত্যর পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। মনও। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, নয়না নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। ওদিকে পলাশও।

আদিত্যর মাথা টলে গেল। ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল রাস্তায়। দু-হাতে মুখ ঢাকল। এই মাটি, এই বাতাস মানুষের কখনও কোনও ক্ষতি করেনি। অথচ প্রকৃতির এই দুই অপরূপ দানকে বছরের পর বছর ধরে বিষ খাইয়ে-খাইয়ে আমরা কী অবস্থায় নিয়ে এসেছি আজ!

আদিত্য আর পারল না। বুকের ভেতরের চাপা হাহাকারটা কান্না হয়ে এক ধাক্কায় বেরিয়ে এল বাইরে। হা ঈশ্বর! আদিত্য কেন রুখতে পারছে না এই আবেগকে? কেন ভেঙে পড়ছে সব প্রতিরোধ?

আদিত্য হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। প্রকৃতির মৃতদেহের পাশে বসে যেন কোনও পরম আত্মীয় কাঁদছে। কাঁদছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে দু-হাতে রাস্তার কালো অ্যাসফাল্ট চাপড়াতে লাগল আদিত্য। জল ভরা চোখে পিছনে মাথা হেলিয়ে ঘুণ ধরা আকাশটাকে দেখল বারবার।

আদিত্যর রকমসকম দেখে কওশিকজি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল, ফরসা মুখের বিবর্ণ চেহারায় ফুটে উঠল এলোমেলো জ্যামিতিক রেখা। ঝুঁকে পড়ে আদিত্যর হাত ধরলেন তিনি। বললেন, 'উঠুন আদিত্যবাবু, আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে—।'

ততক্ষণে নয়না এসে পড়েছে। পলাশও।

'দিতুদা,' আদিত্যর অন্য হাতটা ধরল নয়না। জোর করে হেসে হালকা গলায় বলল, 'গব্বর সিং কী বলে গেছে ভুলে গেছেন! ওঃ কাম অন, দিতুদা, ডোন্ট বি চিকেন—।'

পলাশও বোধহয় ডাকছিল আদিত্যকে। কিন্তু নয়নার শেষ কথাটা আদিত্যর মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। সেইজন্যই পলাশের কথা স্পষ্টভাবে ও শুনতে পায়নি। ভয়! একে কি ভয় বলে?

ষাট বছর আগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল। অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তখন আইনস্টাইন বলেছিলেন, পরমাণু বোমা যদি পৃথিবীর তিনভাগের দু-ভাগ মানুষকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তা হলেও পৃথিবীতে যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ বেঁচে থাকবে, থাকবে পর্যাপ্ত বই—তারাই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সুতরাং আদিত্য ভয় পায়নি। কিন্তু ওর শরীরের ভেতরে কোথায় যেন একটা বেদনা তরঙ্গের উৎস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তা থেকেই চিনচিনে বেদনার স্রোত ছড়িয়ে যাচ্ছিল হাতে পায়ে মাথায়।

আদিত্য সুনয়নার দিকে তাকাল। ঝাপসা দেখাচ্ছে তরুণীকে। কওশিকজি ওকে টেনে তুললেন। বললেন, 'আদিত্যবাবু, প্লিজ, ডোন্ট লুজ ইওর কুল। সামনে এখনও অনেক পথ বাকি।'

কওশিকজি পলাশকে গাড়িয়ে ফিরে যেতে বললেন। ইশারা করলেন মুন্নিকে, নয়নাকেও। তারপর নির্ভরযোগ্য হাতের বাঁধনে রেখে আদিত্যকে বসিয়ে দিলেন জিপসিতে।

বিশু আদিত্যকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর বলল, 'বেকার চোখের জল ফেলছেন। চোখের জলের আজকাল কোনও দাম নেই।' একটু থেমে বিশু স্বগতোক্তির মতো বলল, 'সব শালা ফালতু —'

ওর মুখে কেমন যেন কষ্টের ছাপ পড়েছিল। সেটা দেখতে-দেখতে আদিত্য চোখ মুছছিল। পিছনে তাকিয়ে দেখল, মা মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদছে। সুনয়নার মা হাত রেখেছে মায়ের হাতে। এই বিধবা মহিলাটি অবুঝ রয়ে গেল চিরকাল। একটা তুচ্ছ সবুজ পাখি, একটা সাধারণ ড্যাম্প ধরা ফাটল ধরা দোতালা বাড়ি, কয়েকটা নয়নতারা ফুল কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

তিনটে গাড়ি চলতে শুরু করেছিল আবার। তখনই অনেকগুলো কঙ্কালসার মানুষকে ওরা দেখতে পেল।

দূরের শুকনো মরা গাছগুলোর গোড়ায় উবু হয়ে বসেছে দু-তিনজন করে। দু-হাতে খামচাচ্ছে রুক্ষ মাটি। এইভাবে উপড়ে নেওয়া গাছের শিকড় মুখে পুরে দিয়ে চিবোচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে এক বিন্দু রস। ওদের চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ। কেউ-কেউ চোখ বুজে মুখ নাড়ছে। কিন্তু এই রসের সঙ্গেই হয়তো ঢুকে পড়ছে মারাত্মক বিষ। বাতাসের বিষ, কালো বৃষ্টির বিষ।

ধুলোর ঝড় উড়িয়ে গাড়ি ছুটল দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে। কয়েকটা মোটরবাইক বিকট গর্জন তুলে ওদের পেরিয়ে গেল। আরোহীদের প্রত্যেকের মুখেই গ্যাস-মুখোশ। কোমরে বেঢপ আকারের আগ্নেয়াস্ত্র।

ব্রিজের ওপরে উঠতেই দেখল তিরিশ মিটার উঁচু হাইমাস্ট লাইটিং স্তম্ভের মাথায় কালো রঙের সোডিয়াম বাতিগুলো জ্বলছে। কমলা আরও খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল একপাশের ব্রিজের রেলিং উধাও। কোনও গাড়ি হয়তো ধাক্কা মেরেছে। আর একটা মারুতি-৪০০০ পিক্যাপ ভ্যান উলটে পড়ে আছে কিছুটা দূরে। অসংখ্য কাচের টুকরো আর পোড়া তেল ছড়িয়ে আছে রাস্তার ওপরে। ওলটানো গাড়িটার সামনের দিকটা একেবারে দুমড়েমুচড়ে গেছে।

তখনই গঙ্গার জলের দিকে নজর গেল আদিত্যর। কালচে জলে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ উঠছে। আর এখানে-সেখানে ভেসে রয়েছে মরা মাছ, জলচর প্রাণী। ভেসে থাকা দুটো স্টিমারও চোখে পড়ল। চেহারা দেখে মনে হল না ওগুলোয় কোনও প্রাণ আছে।

সামনের মারুতি গতি বাড়ানোর ফলে বিশুও গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর পিছনের ম্যাটাডর ভ্যানটাও চেষ্টা করছিল তাল রাখতে।

সুনয়না নীচু গলায় কথা বলছিল মায়ের সঙ্গে। মুন্নিও মাঝে-মাঝে কথা বলছিল। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল না আদিত্য। ও নানকুর কথা ভাবছিল। বাচ্চাটা কি পারবে ওদের মতো

বড় হয়ে উঠতে? ও কি যেতে পারবে গাছপালা-পাখির দেশে—যেখানে আকাশের ছায়া জলে মিশে জল আর আকাশ একাকার?

আদিত্যর মনে পড়ল, সুবোধদার বাচ্চা মেয়েটা পারেনি।

নয়

যে-রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে তাকে শ্মশান কিংবা মরুভূমি—অথবা দুটোই বলা যায়। ধোঁয়াশা আগের চেয়ে একটু গাঢ় হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা স্কুটার, মোটরবাইক বা গাড়ি চোখে পড়ছে। দুটো অসাড় দেহও দেখা গেল। তবে আদিত্যদের গাড়ি একটুও গতি কমাল না। দুর্ঘটনায় আহতদের পক্ষে মরে যাওয়াই এখন ভালো। এখন শুধু স্বার্থপরের মতো নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার লড়াই।

চাপা গলায় কথাবার্তা ও খুকখুক কাশির শব্দ ছাপিয়ে সুনয়নার মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'বিশু, আমরা কোন রাস্তা দিয়ে যাব?'

বিশু দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে গাড়ি চালাচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'একটু পরেই দিল্লি রোড ধরব।'

আদিত্য সিটে মাথা এলিয়ে শুয়েছিল। বিশুর কথা শুনে তাকাল হাতঘড়ির দিকে। সওয়া বারোটা। এখন গনগনে রোদ্দুর থাকার কথা, অথচ মনে হচ্ছে সন্ধে ছ'টা। শুনতে পেল, মা মুন্নিকে বলছে, 'খিদে পেলে বলবি, চিড়ে আর বাতাসা আছে।'

'আমাদের ব্যাগে বিস্কিট আছে,' সুনয়না বলল।

মুন্নি বোধহয় মাথা নেড়ে থাকবে—খিদে পায়নি ওর। কারণ, তারপর আর কোনও শব্দ বা কথা শোনা গেল না।

আদিত্যর ঝিমুনি আসছিল। ও চোখ বুজল। মনে-মনে চাইল, ও ঘুম ভেঙে উঠেই যেন দ্যাখে সবকিছু পালটে গিয়ে আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কিন্তু আচমকা ঘুম ভাঙতেই আদিত্য দেখল কিছুই পালটায়নি—শুধু রাস্তার দুপাশের দৃশ্য ছাড়া।

ওরা বোধহয় দিল্লি রোডে এসে পড়েছে। কারণ রাস্তাটা চলে গেছে সোজা, নাক বরাবর। অন্তত যতটুকু দেখা যাচ্ছে।

ধোঁয়াশার স্তর এখানে অনেকটা ঘন। সাপের মতো এঁকেবেঁকে দুপাশের ঢালু মাঠে নেমে গেছে। অসংখ্য সাদা সাপ যেন পরস্পর জড়াজড়ি করে এগিয়ে চলেছে।

কতকগুলো মোটরবাইকের গর্জন কানে আসছিল আদিত্যর। গোঁ—গোঁ—গর—গর—। যেন একপাল হিংস্র পশু একটি মৃত হরিণকে নিয়ে ভাগাভাগির লড়াইয়ে মেতে উঠেছে।

সামনের মারুতির গতি কমে এসেছিল। সুতরাং বিশু গতি কমাল। একইসঙ্গে শ্লথ হল ম্যাটাডর ভ্যান।

গাড়ির ভেতরে কেউ কথা বলছিল না। কিন্তু প্রত্যেকেই উইন্ডশিল্ডের ভেতর দিয়ে একাগ্র চোখে সামনে তাকিয়ে রয়েছে। সুতরাং মারুতির গতি কমানোর কারণ ও মোটরবাইকের শব্দের উৎস একইসঙ্গে দেখতে পেল সকলে।

খানিকটা দূরে একটা ছোট লরি কাত হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার ওপরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকজন মানুষের দেহ। কয়েকটা মোটরবাইক জায়গাটা ঘিরে রয়েছে। মোটরবাইকের আরোহীদের মুখে গ্যাস-মুখোশ অথবা কাপড়ের টুকরো। তাদের হাতে নানা অস্ত্র।

ধোঁয়াশার জন্য কোনও কিছুই খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে নানারকম। দু-তিনটে বাইক বেপরোয়া গতিতে চক্কর মারছে। কয়েকজন মানুষ প্রাণপণ ধস্তাধস্তি করছে কালো পোশাক পরা দুটো লোকের সঙ্গে। তারই মধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দ হলঃ ক্র্যাক-ক্র্যাক —।

গাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছে। চাপা অর্থহীন শব্দও বেরিয়ে এল কারও ঠোঁট চিরে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রাণভয়ে ছুটে নেমে গেল ডানদিকের মাঠে। মিলিয়ে গেল ধোঁয়াশার মধ্যে। সঙ্গে-সঙ্গে একটি লোক দৌড়ে এসে উঠে পড়ল একটা খালি মোটরবাইকে। তার হাতে এক বিশাল লম্বা ছুরি—নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে ধরা। জোরালো পায়ে এক লাথি মেরে বাইকে স্টার্ট দিল সে। তারপর বাঘের গর্জন তুলে দক্ষ ক্ষিপ্রতায় ছুটল পালিয়ে যাওয়া দুজনের পিছনে। লোকটার মুখের মুখোশ খসে পড়েছে। পুরুষ্ট গোঁফের নীচে দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। চোখে আগুন।

কালো পোশাক পরা লোকগুলোকে প্রথমটায় পুলিশের লোক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দু-এক সেকেন্ডের মধ্যেই যেসব দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে বোঝা গেল, ধারণাটা ভুল।

আদিত্য চেঁচিয়ে উঠল, 'বিশু, গাড়ি ঘোরাও!' কারণ, উলটে থাকা লরিটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বিশুর মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছিল। ও গাড়ি ঘোরানোর কাজ শুরু করতেই দেখতে পেল, তিনটে লোক এগিয়ে আসছে। দুজন বাইকে চড়ে, আর একজন দৌড়ে। তার মধ্যে দুজনের হাতে অস্ত্র চোখে পড়ল।

সামনের গাড়িটা বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে ঢালু মাঠে নেমে গেল। নামার সময় গাড়িটা এমন বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে গেল যে, মনে হল এই বুঝি উলটে যাবে।

আদিত্য জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'দাদা! দাদা!' বলে চিৎকার করে উঠল। নানকু, বউদি ওদের কিছু হবে না তো? শুনতে পেল, মা শব্দ করে জোরে কেঁদে উঠল। সুনয়না আদিত্যর পিঠের

কাছে জামাটা খামচে ধরল। মুন্নি জড়িয়ে ধরেছে মা-কে। আর সুনয়নার মা কাঠ হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন।

মারুতিটা ধোঁয়ার আড়ালে চলে যাচ্ছিল। আর ঠিক তখনই কীসের ধাক্কায় যেন জিপসির সামনের কাচটা মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেল।

নীচের জমিতে নেমে যাওয়া মারুতিকে লক্ষ করে একটা লোক রিভলভার উঁচিয়ে ফায়ার করল। লক্ষ্যভেদ হল কি না বোঝা গেল না।

জিপসিটা ডানদিকে ঘুরে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। আর তখনই ক্ষিপ্র বেগে ছুটে আসা একটা বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল সজোরে। জিপসি টাল খেয়ে ঘুরে গেল খানিকটা। কিন্তু বিশু চোয়াল শক্ত করে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে বসে আছে। চাপা গলায় খিস্তি করে গাড়িটা ও নামিয়ে দিল নীচের মাঠে।

হইচই, আর্তনাদ ও ইঞ্জিনের গর্জনে আদিত্যর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ধোঁয়াশার স্তর ভেদ করে বিপজ্জনক ঝাঁকুনি দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছিল জিপসি। আদিত্য ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখল। কয়েকটা কালো ছায়ামূর্তি ঘিরে ধরেছে ম্যাটাডর ভ্যানটাকে। শুরু হয়ে গেছে লুঠপাটের খেলা। একটু পরেই তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শোনা গেল। তার মিনিট-তিন-চার পরেই এক বিস্ফোরণ।

জিপসি ছুটছে মাতালের মতো। লাফাচ্ছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে অনবরত। গাড়ির মধ্যে কান্না আর চাপা চিৎকার জট পাকিয়ে যাচ্ছে বারবার। পিছনে তাকিয়ে ধোঁয়াশার ভেতর দিয়ে আগুন আর কালো ধোঁয়া দেখতে পেল আদিত্য। ভ্যানটা জ্বলছে। পুড়ছে।

বিশু পাগলের মতো এপাশ-ওপাশ স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করছিল গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

আদিত্য মুন্নি আর নয়নাকে বলল লক্ষ রাখতে, কোনও মোটরবাইক ওদের পিছনে আসছে কি না দেখতে।

ওরা তাকিয়ে ছিল পিছনদিকে। আদিত্য দেখল, সুনয়নার মুখে এই প্রথম ভয়ের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। সাদা টি-শার্টের নীচে ওর বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। আদিত্যর ইচ্ছে করল মেয়েটাকে কাছে টেনে নেয়। নিয়ে বলে, ‘কোনও ভয় নেই, নয়না, আমি তো আছি—।’

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অস্বাভাবিক শব্দ করে থেমে গেল জিপসির চাকা। গাড়িটা টাল খেয়ে গেল খানিকটা। বিশু মরিয়া হয়ে অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়েই চলল। ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করতে লাগল, কিন্তু গাড়ির চাকা দু-ইঞ্চিও নড়ল না।

আদিত্য চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘সবাই নেমে পড়ো। এক্ষুনি!’

ওরা সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আদিত্য আর বিশু জিপসির সামনের চাকা পরীক্ষা করল। একটা বড় গর্তে ঢুকে গেছে বাঁ-দিকের চাকাটা।

ওরা প্রাণপণে চাকাটা দু-চারবার ঠেলে দেখল। গাড়ি নড়ল, কিন্তু গর্ত ছেড়ে চাকা উঠল না। দূর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি তখন অস্পষ্টভাবে কানে আসছে। আর দেরি করা উচিত হবে না।

আদিত্যর কথায় ছোটখাটো মালপত্র যে-যার হাতে তুলে নিল। তারপর যতটা জোরে হাঁটা যায় হাঁটতে শুরু করল।

মা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল না। মুন্নি আর নয়না সাহায্য করছিল। আদিত্যর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মা বলল, 'দিতু, পলাশ—নানকু—ওরা—' মা কথা শেষ করতে পারল না। কেঁদে উঠল অসহায়ভাবে।

আদিত্য বলল, 'দেখছি—।'

সুনয়নার চোখ ফোলা-ফোলা লাগছিল। ও নীচু গলায় ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। একটু আগের বিস্ফোরণটা যে ম্যাটাডর ভ্যানের হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা বোধহয় ওকে দুর্বল করে দিচ্ছিল।

আদিত্য চারপাশটা যতদূর দেখা যায় দেখল। সেই একই দৃশ্য। বিবর্ণ গাছপালা, ঘাস, পাতা, ফল, বিষাক্ত মাটি। জনহীন শুনশান। ধোঁয়াশা কখনও ফিকে, কখনও গাঢ়।

হাঁটতে-হাঁটতে আদিত্যর মনে হল জায়গাটা বোধহয় চাষের জমি ছিল। আর বাঁ-দিকটায় ছিল বড়-বড় গাছের বিশাল বাগান। এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আম-জাম-কাঁঠাল গাছের কঙ্কাল। আর জমিটা ঝরাপাতায় ছাওয়া।

আদিত্যর চঞ্চল চোখ একটা আশ্রয় খুঁজছিল, কিন্তু তক্ষুনি কোনও বাড়িঘর বা কুটির নজরে পড়ল না।

এদিক-ওদিক করে দিশেহারার মতো হাঁটছিল সকলে। বিশু বলল, 'ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা মিটে গেলে পরে গিয়ে গাড়িটা ঠেলেঠুলে তুলে নিয়ে আসব। গাড়ি না থাকলে এখানেই বেঘোরে মরতে হবে—।'

আদিত্য বিশুর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আর ঠিক তখনই একটা মেয়ের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। একবার, দুবার, তিনবার।

আদিত্য যেন একটা ঝাঁকুনি খেল। এই চিৎকারটার মধ্যে যেন একটা নিরুপায় বেদনা ও হতাশা মিশে আছে। অথচ এই চিৎকারের মধ্যে আক্রান্তের মরিয়া সুর থাকা উচিত। যে সুর বলে, আমি বেঁচে উঠতে চাই।

কয়েকসেকেন্ড মাত্র। তারপরই আদিত্য ছুটতে চাইল চিৎকার লক্ষ করে। বিশুকে বলল ওদের নিয়ে এগিয়ে যেতে।

তখন বিশু কী একটা যেন এগিয়ে দিল আদিত্যর দিকে। বলল, ‘এটা কাছে রাখুন—।’

আদিত্য হাতে নিল জিনিসটা। একটা মাংকি-রেঞ্চ। প্রায় এক ফুট লম্বা। একটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে এই ধরনের রেঞ্চের মুখের হাঁ বাড়ানো-কমানো যায়। এটাকে কি অস্ত্র হিসেবে ভাবা যায়? সাধারণ একটা যন্ত্র। অথচ এই মুহূর্তে এটা ছোঁওয়ামাত্রই আদিত্যর গায়ে কাঁটা দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে, আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে এই ভারী যন্ত্রটা মোটেই অযোগ্য নয়।

চিৎকারটা শোনা গেল আরও দুবার।

সুতরাং আর অপেক্ষা না করে আদিত্য ছুটল।

বাঁ-দিকে একটু কোনাচে জায়গা থেকে আসছিল চিৎকারটা। পিছন থেকে মা আর মুন্নির ডাক কানে এল। কিন্তু আদিত্য থামল না। মায়ের গলা শুনতে পেল আবার, ‘দিতু, তুই যাস না। আমাদের ফেলে এভাবে যাস না—।’

‘ছোড়দা, চলে আয়! ওসব ঝামেলায় জড়াস না।’ মুন্নি।

‘দিতুদা, প্লিজ। দিতুদা—’ সুনয়না।

ওদের স্বার্থপর পিছুডাক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আর আদিত্য রুক্ষ শুকনো এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটছিল। চার-দশে খেলার কথা মনে পড়ছে। পায়ে রবারের বল, একটু দূরেই গোলপোস্ট। পাড়ার ছেলেগুলো ওর নাম ধরে হইহই করে চেঁচাচ্ছে।

এদিকটাতেও অনেকগুলো বড়-বড় গাছ। মাটি ঝরাপাতায় ঢাকা। আদিত্য ছুটতে-ছুটতে একটা গাছে ধাক্কা খেল। কারণ, ধোঁয়াশা ওকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলছিল।

ছিটকে পড়েও হাল ছাড়েনি আদিত্য। খড়খড়ে আগাছা ও পাতায় মুখ ঘষে গেল ওর। চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে দাঁড়াল। রেঞ্চটা বাগিয়ে ধরে আবার চলতে শুরু করল দ্রুত পায়ে।

কয়েক পা এগিয়েই মোটরবাইকটা দেখতে পেল। কাত হয়ে পড়ে আছে। প্রায় একইসঙ্গে আসল দৃশ্যটাও নজরে পড়ল।

একটা মেয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে। পরনে কালো আর সবুজ ছাপা শাড়ি। বয়েস বাইশ-তেইশ বছর হবে হয়তো। শ্যামলা মুখে অস্বাভাবিক আতঙ্ক। চোখ বড় করে তাকিয়ে রয়েছে।

মেয়েটার কাছ থেকে একটু দূরেই দুটি মানুষে ভয়ংকর লড়াই চলেছে। মরণপণ লড়াই। ধস্তাধস্তি, ঘুসি—একেবারে দাঁত-নখের যুদ্ধ।

গাছের কঙ্কালে ঘেরা রাজত্বে পাতাঝরা মরুভূমি জমিতে এ-লড়াই কেমন অদ্ভুত লাগল আদিত্যর। বাঁচার লড়াই, না মরার লড়াই?

আরও কাছে এগিয়ে গেল ও। তখনই গোঁফওয়ালা কালো পোশাক পরা লোকটাকে চিনতে পারল। একটু আগেই এই লোকটা খোলা ছুরি বাগিয়ে মোটরবাইক নিয়ে তাড়া করেছিল দুটি অসহায় মানুষকে। এরা দুজনই কি সেই দুজন?

কালো পোশাক পরা লোকটা হঠাৎই চিৎকার করে উঠল। তার রোগা প্রতিদ্বন্দ্বী নখের গভীর আঁচড় টেনে দিয়েছে চোখে, গালে, গলায়। লোকটা এক ভয়ংকর গর্জন করে হাতের কায়দায় কাত করে শুইয়ে দিল রোগা মানুষটাকে। ভারী পা দিয়ে চেপে ধরল তার গলা। তারপর নিজের দেহটাকে যতটা সম্ভব লম্বা করে কোনও জিনিসের খোঁজে হাত বাড়িয়ে দিল।

আদিত্য দেখল জিনিসটা। সেই লম্বা ছুরি, কিন্তু খাটো তরোয়ালও বলা যায়। ওটা হাতের নাগাল পেলে যে কী অবস্থা হবে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। সুতরাং বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আদিত্যর শরীরে। তিনটে লম্বা পা ফেলে ও এগিয়ে গেল ওদের কাছে। এবং হাতের মাংকি-রেঞ্চটা কালো পোশাক পরা লোকটার মাথায় সজোরে বসিয়ে দিল। একবার—দুবার।

ভারী দেহটা কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তখনই টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল রোগা মানুষটা। সারা মুখে ধুলোমাটি। জামা রক্তে ভেজা। লম্বা-লম্বা চুল উসকোখুসকো, নেমে এসেছে শ্যামলা মুখের ওপরে। মনে হল, বয়েস বেশি নয়।

শ্যামলা ছেলেটা এলিয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে উদভ্রান্ত চোখে একবার দেখল। তারপর চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় এক লাফে তুলে নিয়ে এল ছুরিটা। এবং পাগলের মতো কোপাতে লাগল অসাড় মানুষটাকে। একইসঙ্গে অর্থহীন চিৎকারও করে চলল।

আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এতক্ষণে ও রোগা শ্যামলা মানুষটাকে চিনতে পেরেছে। শুভেন! শুভেন এখানে কেমন করে এল? এ কী অবস্থা হয়েছে ওর!

শুভেন তখনও ছুরি চালাচ্ছিল কসাইয়ের মতো। পড়ে থাকা লোকটা বারকয়েক নড়েচড়ে উঠেছিল। আর্তনাদও করেছিল দু-একবার। কিন্তু এখন একেবারে নিথর, চুপচাপ। তবুও শুভেন এক মারাত্মক কোপ বসিয়ে দিল লোকটার মুখের ওপরে। নাক আর চোখের মাঝে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। কিন্তু শুকনো মাটি পলকেই সব শুষে নিচ্ছিল। যে-শরীর থেকে আর কোনওভাবে সাড়া পাওয়া যাবে না ভাবা গিয়েছিল সেই ভারী শরীরটা ঝটকা দিয়ে উঠল বীভৎসভাবে। বেঁকে গেল অদ্ভুত কোণে। তারপর স্থির।

হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে মুখ মুছল শুভেন। আদিত্যর দিকে দেখল। বোধহয় চিনতে পারল ওকে। সম্মোহিতের মতো শিথিল পায়ে কয়েক পা এগিয়ে এল। তারপর 'দিতু, তুই!' বলে হঠাৎই

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

হাতের রেঞ্চটা ফেলে দিয়ে চকিতে ওকে ধরে ফেলল আদিত্য। একেবারে জাপটে ধরল। ভাঙা গলায় বলল, 'শুভেন, তুই এখানে কী করে এলি? মাসিমা মেসোমশাই—ওরা কোথায়?'

শুভেন জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, 'সব শেষ!' তারপর আরও কীসব বলছিল ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না। ছুরির আঘাত ওকেও রেহাই দেয়নি।

আদিত্যর কথার উত্তর দিল কালো মেয়েটি। গাছের গুঁড়ির কাছ থেকে ও কখন যেন এগিয়ে এসেছে।

'একটা লরি জোগাড় করে আমরা সবাই কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। যে যেখান থেকে পেরেছে লরিতে উঠেছে—তবে লরিওয়ালাকে টাকা দিতে হয়েছে। এই রাস্তার প্রায় শুরু থেকেই এই লোকগুলো—' পড়ে থাকা লাশটা আঙুল দিয়ে দেখাল মেয়েটিঃ 'এই লোকগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম পুলিশের লোক, কিন্তু পরে বুঝেছি না, তা নয়...।'

আদিত্য লক্ষ করল, মেয়েটির শাড়ি নানা জায়গায় ছেঁড়া। ব্লাউজও তাই। ওর যৌবন জানান দিচ্ছে অপকটে। অল্পের জন্য শরীর-দূষণের হাত থেকে বেঁচে গেছে ও।

'জল...একটু জল দে, দিতু—' শুভেন হাঁ করে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল। ওর জিভটা কেমন ফ্যাকাসে।

আদিত্য এপাশ-ওপাশ দেখল। এখানে জল পাবে কোথায়! পেলেও কি তা মুখে দেওয়া যাবে? নয়নাদের সঙ্গে জলের বোতল রয়েছে। তা ছাড়া আশেপাশে যদি কোনও টিউবওয়েল থাকে?

'কল্পনা!' আর্ত গলায় ডাকল শুভেন।

মেয়েটি পাগলের মতো ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল শুভেনের ওপরে। ব্যাকুল স্বরে বলল, 'কী শুভেনদা, বলো...।'

শুভেনের ঠোঁট নড়ছিল, কিন্তু কোনও শব্দ হচ্ছিল না।

কল্পনা অনুনয়ের চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'একটু জল পাওয়া যাবে কোথাও?'

আদিত্য পাতা ছাওয়া জমির ওপরে ধীরে-ধীরে শুভেনকে শুইয়ে দিল। শুভেনের জামা থেকে রক্ত লেগে গেছে ওর জামায়। ও উঠে দাঁড়াল। কল্পনাকে বলল, 'তুমি ওর কাছে থাকো, আমি দেখছি জল পাওয়া যায় কি না।'

কল্পনা শুভেনের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। জ্বলজ্বলে কালো চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'আপনি শুভেনদার কে হন?'

'বন্ধু,' আদিত্য বলল। তারপর জিগ্যেস করল, 'তুমি?'

কল্পনা শুভেনের আধখোলা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কেউ না। লরিতেই আলাপ।’

আদিত্য অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত ধরে মেয়েটাকে দেখল। তারপর ক্লান্ত পায়ে হাঁটা দিল জলের সন্ধানে। বিশুরা যেদিকে এগিয়েছে, সেদিকেই হাঁটতে শুরু করল। পিছন থেকে শুভেনের অর্থহীন প্রলাপ কানে আসছিল ওর।

খানিকটা এগোতেই বিশুর দেখা পাওয়া গেল। এলোমেলো চক্করে আদিত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওকে চিৎকার করে ডাকল আদিত্য।

ওকে দেখে বিশুর যেন ধড়ে প্রাণ এল। ছুটে এসে আদিত্যর হাত চেপে ধরল। বলল, ‘আপনার জন্যে কেঁদে-কেঁদে আপনার মা হয়রান হয়ে যাচ্ছে। শিগগির চলুন—।’

আদিত্য অল্প কথায় সবকিছু খুলে বলল বিশুকে।

‘একটু জলের ব্যবস্থা করো—যে করে হোক। নইলে শুভেনটাকে...।’

পিছন থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছে কল্পনা। হাউহাউ করে কাঁদছে। আগের আর্ত-চিৎকারের তুলনায় এই সর্বহারা কান্না অনেক বেশি গভীর।

বিশু চলে যাচ্ছিল, আদিত্য ওকে ডেকে দাঁড় করাল। জলের বোধহয় আর দরকার নেই। ও অবশ হয়ে হেঁটে আবার ফিরে চলল শুভেনের কাছে। বিশুও চলল ওর পিছনে-পিছনে।

কালো মেয়েটা নির্লজ্জের মতো আছাড় খাচ্ছিল শুভেনের বুকের ওপরে। আর বিকৃত গলায় চিৎকার করে ‘শুভেনদা! শুভেনদা!’ বলে ডাকছিল। কিন্তু শুভেন কোনও সাড়া দিচ্ছিল না। ওর কবিতার সেই ‘অলৌকিক খেলা’-য় মেতে উঠেছে যেন।

আদিত্য কল্পনাকে দেখছিল। মাত্র একঘণ্টার সহযাত্রীর জন্য এত চোখের জল ফেলা যায়! এইরকম তীব্রতায় প্রকাশ করা যায় শোক-দুঃখ-তাপ!

নিরুপায় আদিত্য বিশুকে ইশারা করল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কল্পনাকে একরকম জোর করে টেনে তুলল দুজনে। শুভেনের মৃতদেহ নিয়ে কী করবে ভাবছে, এমনসময় বহু দূরে শোনা গেল বাইকের গর্জন। এদিকেই আসছে।

আদিত্য আর দেরি করল না। কল্পনার হাত ধরে টান মারল। বিশুকে তাড়া দিল একইসঙ্গেঃ ‘জলদি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই বিপদ!’

বিশু রেঞ্চটা চট করে তুলে নিল। একটা হাতিয়ার থাকা দরকার। তারপর ওরা তিনজনে একরকম ছুটতে শুরু করল।

বিশুই পথ দেখানোর কাজ করছিল।

ছুটতে-ছুটতেই আদিত্য ভাবলঃ শুভেনের দেহ অন্তত শেয়াল-কুকুর বা কাক-শকুনে ছিঁড়ে খাবে না। কারণ, এরা কেউ আর নেই। শুভেনের দেহ কেউ যদি কুরে-কুরে খায় তো সে প্রকৃতি।

প্রকৃতিই ওকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

অন্ধকার গাঢ় এবং গভীর হলে বোঝা যায় পৃথিবীর একপিঠ চলে গেছে সূর্যের আড়ালে। রাত হয়েছে। যদি এই তফাতটুকুও মুছে যায়, তা হলে?

ওঃ, কতদিন যে স্পষ্ট করে সূর্য দেখা যায়নি! দেখা হয়নি চাঁদ-তারাও। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। ভীষণ। ভাবছিল আদিত্য।

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ওদের পথ চলা শেষ হয়নি এখনও। ক্লান্ত-শ্রান্ত মুখগুলো ওর মনে ব্যথা তৈরি করছিল। রুক্ষ প্রান্তর, শুকিয়ে যাওয়া গাছপালা, কালোজল দিঘি পেরিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে ওরা।

মা আর পারছিল না। মায়ের জন্যই পথে বিশ্রাম নিতে হয়েছে বারবার।

বিশু মাঝে-মাঝেই পিছনে দেখছিল। পথের নানা চিহ্ন খুঁটিয়ে নজর করছিল। ওর মুখের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, পথ চিনে জিপসির কাছে ফিরে যাওয়াটা খুব সহজ কাজ হবে না।

এলোমেলো মেঠো পথে কয়েকটা পরিত্যক্ত কুটির যে চোখে পড়েনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো নিরাপদ বলে মনে হয়নি আদিত্যর। যে-কোনও মুহূর্তে ও বিপদের আশঙ্কা করছিল। এই বুঝি ধোঁয়াশার পরদা চিরে বেরিয়ে আসবে বাঘের দল। কারণ রাস্তার ঘটনাটা ও ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। ভুলতে পারছিল না শুভেনের কথা। 'চারিদিকে শবের পাহাড়'। সব শেষ!

কল্পনা কাঁদছিল। ছেঁড়া শাড়ি-ব্লাউজের জন্য কোনও সঙ্কোচ ছিল না ওর। কারও সঙ্গে একটাও কথা বলছিল না। পায়ে জুতো-চটি কিছু নেই। শরীরের অনেক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে।

আদিত্য উৎসাহ দিচ্ছিল সবাইকে। আর একটু! আর একটু।

কখনও ও মায়ের সঙ্গে হাঁটছিল। কখনও মুন্নির পাশে। কখনও মাসিমার পাশে। আর বেশিরভাগটাই সুনয়নার পাশে—ওর কাছাকাছি থাকতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

আদিত্য শুধু ওকেই বলেছে শুভেনের কথা। আর কাউকে বলেনি। বিশু আর কল্পনাকেও বারণ করেছে বলতে। শুভেনের কথা শুনলে ওদের মনের জোর চুরমার হয়ে যেতে পারে।

সন্ধের অন্ধকার নামতেই নয়না জিগ্যেস করল, 'আর কতদূর, দিতুদা?'

আদিত্য চারপাশ দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল, 'থাকার মতো একটা সেফ জায়গা পেলেই থাকব।'

'মা, মাসিমা—ওরা আর পারছে না।'

'জানি,' ঠোঁট কামড়াল আদিত্য। একটু থেমে বলল, 'নানকু কেমন আছে কে জানে।' আদিত্যর চোখে জল এসে গেল হঠাৎ। বাচ্চাটাকে ও পাখির দেশে নিয়ে যাবে বলেছিল। যে করে হোক একটা পাখির ডাক শোনাবে।

আদিত্য চোখের জল মোছার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আবছা আঁধারে কোন অলৌকিক দৃষ্টিতে মেয়েটা সেটা টের পেল? খাটো গলায় ডাকল, 'দিতুদা—।'

আদিত্য চোয়াল শক্ত করার চেষ্টা করে বলল, 'জানি। গব্বর সিং কী বলে গেছে, মনে আছে।'

নয়নার মুখের কমনীয়তা এরই মধ্যে অনেকটাই বনবাসী। মাথার চুলে ধুলোর ছোঁয়া। ঠোঁটে খরা লেগেছে। কিন্তু ওর হাতের স্পর্শ উত্তাপহীন নয়।

মেয়েটা আচমকা আদিত্যর হাত চেপে ধরতেই আদিত্য সেটা বুঝতে পারল। ওর ইচ্ছে হল, ডান হাতে ঝোলানো ব্যাগটা ফেলে দিয়ে কিছু একটা করে বসে।

সুনয়না বলল, 'নানকুদের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। কওশিকজি আছেন। উনি আমাদের বাগানবাড়ি চেনেন।'

আদিত্য দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। ওর হাসি পেল। এখনকার এই অবস্থায় বাগানবাড়ি কাকে বলে? বাগানই বা কাকে বলে? সুন্দর করে সাজানো মরা গাছের সারিকেই কি বাগান বলে?

অন্ধকার অনেকটাই গাঢ় হয়েছিল। টর্চ জ্বেলেছে বিশু। ও সবার আগে-আগে হাঁটছে। আদিত্যরা একেবারে পিছনে।

ও সুনয়নার কাঁধে হাত রাখল। সামান্য কাছে টানল ওকে। সুনয়না অবাক হল না। অন্তত অনুভবে আদিত্যর তাই মনে হল। গ্যালিলেও, নিউটন, আইনস্টাইনের চেয়ে ফ্রয়েড অনেক বেশি শক্তিশালী।

নয়নার কানের কাছে মুখ নিয়ে আদিত্য বলল, 'নয়না, এবার জেগে ওঠো। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, বাগানবাড়ি বলে আর কোথাও কিছু নেই।' শেষ দিকে আদিত্যর গলা বসে গেল, কথা জড়িয়ে গেল।

নয়না বলল, 'আমি তো বলেছি, আর তিনটে দিন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে—।'

আদিত্য বুঝতে পারছিল, মেয়েটার গলায় আগের সেই আস্থা আর নেই। এত কষ্টের ভ্রমণ আর পথের হানাদার দস্যুর দল সবরকম আস্থা শুষে নিয়েছে।

ও কিছু বলল না। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও 'মাদ্রাজি' নমস্কার করা হাসিখুশি বাচ্চাটাকে ভুলতে পারছিল না। নানকু! নানকু!

তখনই দূরের একটা বাড়ি ওদের চোখে পড়ল। তার দোতলার জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঘোলাটে আলো।

ঠিক একইরকম ঘোলাটে আলো ফুটে উঠল সকলের চোখে। আদিত্যরও মনে হল, এইবার হয়তো একটা নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে। হাতের ছোট-বড়-মাঝারি লাগেজগুলো অনেকক্ষণ ধরে পাথর হয়ে ঝুলছে। হাতের ও কাঁধের প্রতিটি পেশি, শিরা, বেদনায় টনটন করছে।

নয়না বলে উঠল, ‘দিতুদা! দেখেছেন?’

আদিত্য সুনয়নাকেই দেখছিল অন্ধকারে। বলল, ‘দেখেছি—।’

সামনে আর-সকলে নানা কথা বলছিল। নতুন এই আলোর ইশারায় হঠাৎই যেন সবার মধ্যে উদ্দীপনা জেগে উঠেছে।

টর্চের আলোয় কোনওরকমে পথ দেখে হোঁচট খেতে-খেতে সবাই এগোচ্ছিল।

কল্পনার কাছাকাছি পৌঁছে আদিত্যর কানে এল ফোঁপানির শব্দ। অবুঝ মেয়েটা এখনও থামতে পারেনি।

এখন ধোঁয়াশা কিছুটা কমে এসেছে। চোখও জ্বালা করছে কম। আশ্রয়ের দেখাও মিলেছে এই রুক্ষ প্রান্তরে। তবুও কল্পনা থামতে পারেনি।

অন্ধকারে আরও অন্ধকার সাতটা প্রাণী ধীরে-ধীরে পৌঁছে গেল বাড়িটার সদর দরজায়।

তখনই বুঝতে পারল, আশেপাশে আরও কয়েকটা বাড়ি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো সবই ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অন্য সবাইকে থামতে বলে আদিত্য ডেকে নিল বিশুকে। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে টর্চটা ডানহাতে বাগিয়ে ধরল।

একটা আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা এখন ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠেছে। সঙ্গে বয়ে আনা জলের সঞ্চয়ও বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে চাইছে।

ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিল আদিত্য। শুকনো জিভটা গিরগিটির লেজের মতো লাগল। ও আর বিশু সদরের কাঠের পাল্লার হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকল।

চারিদিকে খাটো পাঁচিল ঘেরা জায়গা। তার সামনের অংশে বাগান ছিল। টর্চের আলো বুলিয়ে দেখা গেল এখন যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে। নীরস শাখাপ্রশাখা আর ঝরাপাতা।

ওরা সাবধানে এগোচ্ছিল, পিছন থেকে মুন্নি ডেকে উঠল, ‘ছোড়দা, খুব জল তেষ্টা পেয়েছে রে...।’

আদিত্য টর্চ ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। সুনয়না ততক্ষণে প্লাস্টিকের ওয়াটার বটল এগিয়ে দিয়েছে ছোট বোনটার দিকে।

আদিত্য চাপা গলায় বলল, ‘দেখো তো আশেপাশে টিউবওয়েল আছে কি না। থাকলে জলের অভাবটা অন্তত মিটবে।’

সামনে টর্চ ঘোরাতেই বাড়ির দরজাটা দেখা গেল। ভেজানো। একতলায় কোনও আলো চোখে পড়ছে না। মনে হয়, সব জানলাই বন্ধ।

বিশু আর আদিত্য সামনে এগিয়ে গেল। টর্চ নিভিয়ে দরজার পাল্লায় সতর্কভাবে চাপ দিল।

আড়চোখে আদিত্য দেখল, বিশু রেঞ্চ বাগিয়ে ধরেছে।

আর তখনই ওদের অবাক করে দিয়ে দরজাটা খুলে গেল। বাড়িটার ভেতরের হা-হা অন্ধকার ওদের স্বাগত জানাল।

কারও কথার শব্দ কানে এল ওদের। তবে কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

অন্ধকারেই বিশুর চকচকে চোখ আদিত্যকে দেখল। আদিত্য বিশুর হাতে টর্চ দিল, কিন্তু ওকে টর্চ জ্বালতে বারণ করল।

দোতলার খানিকটা আলো ঠিকরে এসে পড়েছে নীচের একটা ছোট উঠোনে। প্রতিফলিত আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে ভয়ের কিছু নজরে পড়ল না।

বিশুর হাত ধরে টান মারল আদিত্য। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়িটা আবছা দেখতে পেয়েছে ও।

একতলায় উঠোন ঘিরে দুটো ঘর। দুটোই অন্ধকার। প্রাণের সাড়া নেই।

সিঁড়িতে একবার টর্চের আলো ফেলল বিশু। ধুলো, নোংরা, অপরিষ্কার।

টর্চ নিভিয়ে ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

দোতলা থেকে ভেসে আসছিল কথাগুলো। ক্রমেই জোরালো হচ্ছিল। আরও কয়েক ধাপ ওঠার পর কথাগুলো বোঝা গেল। পুরুষের গলাঃ '...যে করে হোক এ অবস্থাকে সামলাতে হবে। এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য আসতে শুরু করেছে। দরকার হলে বিদেশি সাহায্যও আসবে।'

পুরুষটি থামতেই শোনা গেল নারীকণ্ঠঃ 'শুধু সাহায্য দিয়ে কী হবে! সবুজের ছিটেফোঁটা নেই, একটা পাখি নেই, পোকামাকড় নেই, আর আইন-শৃঙ্খলা বলেও তো কিছু নেই...চারদিকে শুধু লুঠপাট খুন-জখম...।'

ওরা দুজনে দোতলায় উঠে এসেছে। দোতলার তিনটে ঘরের দুটোয় আলো জ্বলছে। শব্দ অনুসরণ করে ওরা চলে এসেছে একটা আলো-জ্বলা ঘরের সামনে।

আদিত্য আর দেরি করল না। বিশুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবং একইসঙ্গে বলতে শুরু করল, 'আমরা খুব বিপদে পড়ে—।'

থেমে গেল আদিত্য। ঘরে কোনও লোক নেই!

সাদামাঠাভাবে সাজানো একটা বসবার ঘর। চেয়ার, টেবিল, দেওয়াল-আলমারি, আর সাধারণ ক'টা আসবাব। টেবিলে কয়েকটা বই আর খবরের কাগজ। ঘরের এক দেওয়ালে একটা টিউব লাইট জ্বলছে। কিন্তু তার আলো ঘোলাটে—মরা মাছের চোখের মতো।

ঘরের সর্বত্র ধুলোর মিহি স্তর। আসবাবপত্র দেখে মনে হতে পারে এই ঘরটা একটু আগেই কেউ ব্যবহার করেছে, কিন্তু ধুলোর আস্তরণ অন্য গল্প বলছে।

পুরুষ আর নারীকণ্ঠ তখনও কথা বলছিল—টিভির ভেতর থেকে।

আদিত্য এগিয়ে গিয়ে টিভির সুইচটা অফ করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত ছমছমে নিস্তব্ধতা গোটা বাড়িটায় চেপে বসল।

বিশু ঘরের ভেতরে ঢুকে অবাক চোখে চারপাশ দেখছিল। ও আদিত্যকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, দাদা! কী বুঝছেন?'

আদিত্য বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। মাথা নাড়ল সামান্য। চুলে হাত চালাল। গলার কাছে একটা জ্বালা টের পেল।

ও বিশুকে নিয়ে গোটা বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে একবার করে উঁকি মারল। না, কেউ নেই এ-বাড়িতে। ধুলোর বহর দেখে মনে হল দু-চারদিন আগেই সবাই এ-বাড়ি ছেড়ে গেছে। সুরেন্দ্র-নিলয়ের মতো। নিরুদ্দেশের পথে চলে যাওয়া মানুষগুলো আর কখনও কি ফিরে আসতে পারবে এই ঠিকানায়?

বিশু সব দেখেশুনে বলল, 'যাকগে, রাতটা নিশ্চিন্তে এখানে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

আদিত্য ঘাড় নাড়ল। ছোট্ট করে বলল, 'হুঁ—।'

ও শিকড় ছিঁড়ে চলে যাওয়া মানুষগুলোর কথা ভাবছিল। কী ভীষণ তাড়াহুড়ো ছিল তাদের। ঘরদোর খোলা, টিভি চলছে, বাতি জ্বলছে। নাকি সেসময় অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হয়েছিল?

পরিত্যক্ত একটা স্মৃতির কোঠা এখন আদিত্যদের আশ্রয়। ও বিশুকে বলল, সবাইকে ডেকে নিয়ে আসতে। সবাই চিনে নিক তাদের রাত্রিনিবাস।

আদিত্য দোতলার টিভির ঘরে দাঁড়িয়ে নানকুদের কথা ভাবছিল, এমনসময় ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষগুলো একে-একে এল।

আদিত্য বিশুকে বলল, 'সদর আর বাড়ির দরজায় ভালো করে খিল ছিটকিনি এঁটে দাও শিগগির।'

বিশু চলে গেল। তখন আদিত্য তাকাল মায়ের দিকে।

হাতে-পায়ে শুকনো আঁচড়ের দাগ, কিন্তু মুখে প্রশান্তি। মা ভীষণ সইতে পারে—শরীরের ব্যথা। মায়ের উদাস মুখ দেখে ওর মনে হল মা এখনও বুঝি একটা ছন্নছাড়া মানুষের 'নিভা! নিভা!' ডাক শুনতে পাচ্ছে। সেইসঙ্গে নানকুর চিৎকারঃ 'ঠামা, তুমি কোথায়?'

দোতলা ও একতলায় একটা করে শোওয়ার ঘরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আদিত্য আর বিশু মিলে মোটামুটিভাবে ঝেড়েঝুড়ে দিয়েছিল বিছানাগুলো।

আদিত্য এগিয়ে গেল মায়ের কাছে। বলল, 'এসো—।'

সুনয়নার মায়ের মুখের বহু চেনা গিন্নি-বান্নিভাব অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। তাঁর চেহারায় এখন হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই।

আদিত্য তাঁকেও ডেকে নিলঃ 'আসুন, মাসিমা—' তারপর এগোল দোতলার শোওয়ার ঘরের দিকে। ওঁদের দুজনের সবচেয়ে বেশি বিশ্রাম দরকার।

বিশু ফিরে এসেছিল। আদিত্য ওকে বলল, খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এ-বাড়ির ভাঁড়ার আগেই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে ওরা। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সামান্য কিছু হয়তো পাওয়া যাবে। মুন্নি এসে জানাল যে, বাড়ির পিছনদিকে একটা টিউবওয়েলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার জলটা বেশ মিষ্টি।

নয়না টিভির সুইচ অন করে দিয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। তারপর বিশুর সঙ্গে খাবারের জোগাড়ে সাহায্য করতে গেল।

মুন্নি একটা চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল। চোখের কোলে কালি। সুন্দর মুখ অবহেলায় মলিন।

পাশের ঘরে মা শুয়ে পড়েছে বিছানায়। সুনয়নার মা-ও।

ওঁদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল আদিত্যর। শ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। লক্ষ করেছে, মা ভীষণ হাঁপাচ্ছে, আর কাশছে ক্রমাগত। শরীরটা জীর্ণ-শীর্ণ।

সুনয়না বোধহয় হাঁটাচলা করছে মনের জোরে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? আর কতদিন? আর কতমাস পরে শেষ হবে নয়নার 'তিন দিন'!

কাল সকালে ওরা সবাই যাবে জিপসিটা খুঁজতে। যে করে হোক গাড়িটাকে ঠেলে তুলতে হবে গর্ত থেকে। তারপর ওই ভাঙা উইন্ডশিল্ড নিয়েই রওনা হতে হবে।

কিন্তু কোথায়? কতদূরের গন্তব্যের দিকে? আর পলাশ-বউদি-নানকুরা?

আদিত্য এইসব উলটোপালটা ভাবছিল। তখন টিভিতে গতানুগতিক নানা কথাবার্তা হচ্ছে। পুরোনো কিছু রেকর্ডিং চালিয়ে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো দেখেশুনে আদিত্যর মনে নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া জাগছিল না। সব মানুষই ভয় ও হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এখন শুধু আক্রোশ, বিরক্তি, ক্ষোভ পড়ে আছে।

পরিত্যক্ত এই বাড়ির নানা ঘরে ঘুরে আদিত্য এতটুকু অবাক হয়নি। দেওয়ালে দু-তিনটে বাঁধানো ফটো। বাচ্চাদের স্কুলের বইপত্র। আলনায় এলোমেলো জামাকাপড়। রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি। কলতলায় এঁটো বাসনপত্র। খাওয়ার ঘরে শুকনো বাসি খাবার। উঠোনের দড়িতে দুটো ছড়ানো কাপড়।

না, কোনও তফাতই খুঁজে পায়নি আদিত্য। যদি কোনও বাস্তুহারার দল তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে সুরেন্দ্র-নিলয়ে, তারাও বোধহয় একই দৃশ্য দেখবে, একই অনুভবের শিকার

হবে।

কল্পনা এসে ঘরে ঢুকতেই আদিত্যর মনে পড়ল, অনেকক্ষণ ওকে দেখেনি। কিন্তু তা বলে এরকমভাবে দেখবে ভাবেনি। স্নান সেরে ফেলেছে মেয়েটা। অন্য শাড়ি-ব্লাউজও পরে নিয়েছে। গুনগুন করে গান গাইছিল। এসে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল ধুপ করে। বলল, 'দাদা, আপনাকে ক্লান্ত লাগছে। যান, একটু বিশ্রাম করে নিন—।'

আদিত্য মুন্নিকে দেখল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর স্বপ্নের মধ্যে দুর্গাপুর কিংবা রজত ঢুকে পড়তে পেরেছে কি না কে জানে! কারণ, এখন তো স্বপ্ন বলতে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নেই।

আদিত্য ঘড়ি দেখে বলল, 'সবে পৌনে ন'টা। আগে দেখি খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা হল, তারপর শোওয়ার কথা ভাবা যাবে।'

কল্পনা টিভি দেখছিল। অন্তত টিভির দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। মাথা হেলিয়ে ভিজে চুল আরও ভালো করে ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর। হালকা নীল সুতির শাড়ি আর হলুদ-কালো ছিটের ব্লাউজ বেশ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। কিছুক্ষণ গুনগুন করে মেয়েটা হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'এখানে ক'দিন থাকবেন?'

ওর প্রশ্নটা চমকে দিল আদিত্যকে। ওর কথার ঢঙে মনে হল ও যেন প্যাকেজ ট্যুরে বেরিয়েছে। আদিত্য ওদের টিম ম্যানেজার। কিন্তু এই ট্যুরের কি সত্যিই কোনও শেষ আছে?

টিভিতে কলকাতার নানা রাস্তাঘাট দেখানো হচ্ছিল। চোখে পড়ছিল ছোট-বড় ঘর-বাড়ি। কল্পনা সেগুলো দেখতে-দেখতে বলল, 'সব জায়গায় একই অবস্থা জানলে বাড়ি ছেড়ে বেরোতাম না। শুধু-শুধু এত ঝামেলা।'

আদিত্যর মাথার ভেতরে টনটন করে উঠল। গলার কাছটায় পুরোনো অস্বস্তিটা ফিরে এল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। চোখ জ্বালা করছে। থুতু উঠছে মুখে বারবার।

সত্যিই তো, কোথায় পালাচ্ছে ওরা?

কল্পনা হঠাৎই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। অকারণে বাড়তি হাত-মুখ নেড়ে বলল, 'দেখি গিয়ে রান্নাবান্না কী হচ্ছে...।' তারপর গুনগুন করতে-করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওর সহজ হওয়ার চেষ্টাটা এতক্ষণ পরে খেয়াল করল আদিত্য।

কল্পনা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে গিয়ে অফ করে দিল টিভির সুইচ। খবর শুনে বা পরিস্থিতি জেনে কোনও লাভ নেই। অতীত এ-অবস্থায় কোনওরকম সাহায্য করবে না।

যদি কাল সকালে জিপসিটা খুঁজে না পাওয়া যায়? তখন বড় রাস্তায় গিয়ে ওত পেতে থাকতে হবে একটা গাড়ির জন্য। তারপর কৌশলে সেই গাড়ি আটকাতে হবে। হানাদার খুনি হয়ে খতম

করে দিতে হবে গাড়ির লোকগুলোকে। এবং নিজেদের লোকজনকে গাড়িতে তুলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে যেতে হবে। বাঁচাতে হবে কয়েকটা
জীবন।

যদি বেঁচে থাকে, তা হলে এই ভয়ংকর অপরাধবোধ নিয়েই বাঁচতে হবেঃ
কয়েকটা জীবনের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছে আদিত্য। আর যদি জিপসিটা খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে গাড়ি চালিয়ে নিরাপদ গন্তব্যে ছুটে যাওয়ার আগে নানকুদের খোঁজ করতে হবে না? সম্পর্কের সুতোগুলো কি কয়েকদিনের মধ্যেই এত সরু আর পলকা হয়ে গেছে?

আদিত্যর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গলা আর বুকেও কষ্ট। ও পায়ে-পায়ে চলে এল ঘরের বাইরে। বারান্দার রেলিঙে সামান্য ঝুঁকলেই মাথার ওপরে আকাশ দেখা যায়। ধোঁয়াটে নক্ষত্রহীন আকাশ। আদিত্যর দম বন্ধ হয়ে আসছিল যেন। ও জলে ডোবা মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। ছাদে যাওয়ার সিঁড়িটা কোন দিকে? আদিত্য পা চালিয়ে এগোল সেদিকে।

ছাদ মাপে খুব ছোট। এটাও যেন সেই সুরেন্দ্র-নিলয়ের অভিন্ন প্রজাতি। অন্ধকারে তার কোনাকানাচ দেখা না গেলেও আদিত্য এই এক টুকরো ছাদটার সঙ্গে এক অদ্ভুত আত্মীয়তা অনুভব করল। এর যেন এক নিজস্ব স্পর্শ আছে, ঘ্রাণ আছে।

এই সময়ে আকাশে কত তারা থাকে, কত! মাঝে-মাঝে জল নামে আকাশ থেকে। ভরা যৌবনে ছেয়ে যায় ভূমির গাছপালা। ফুলের গন্ধ আসতে থাকে ঢেউয়ের মতো। ফুলের গন্ধ কেমন হয় আদিত্য কি ভুলে গেছে? ও চোখ বুঝে বহু লক্ষ বছর আগেকার ফুলের ঘ্রাণের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চাইল। হিলহিলে সাপের মতো পিচ্ছিল হয়ে সেই স্মৃতি লুকোচুরি খেলছিল ওর সঙ্গে। এই বুঝি ধরা দেয়, আবার অধরা থেকে যায়।

চোখ বুজে থাকায় দেখতে পায়নি আদিত্য, কিন্তু ঘ্রাণে টের পেল। ফুল? কী ফুল? টের পাওয়া সত্ত্বেও ও আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আন্দাজ করতে চাইল। পারল না। তাই চোখ খুলল।

সুনয়না। খুব কাছে দাঁড়িয়ে। ওর মুখমণ্ডল লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনের মতো ক্লোজ-আপ ছবি। কিন্তু মুখটা কেমন ঝাপসা লাগছে।

আদিত্য চোখ খুলতেই নয়না নীচু গলায় বলল, ‘এখানে কী করছেন, দিতুদা?’

আদিত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললঃ ‘মনে হচ্ছে বাড়িতেই আমরা বেশ ছিলাম—।’

‘এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। বাড়ির কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, জাপান থেকে ফিরে এসে বাবা একটানা কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে—।’

‘আমারও ভালো লাগছে না।’ আদিত্য সুনয়নার চোখ দেখলঃ ‘নয়না, বলতে পারো, এভাবে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো পালিয়ে-পালিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় যাব আমরা? আমাদের

কোনও ঘর নেই, বাড়ি নেই, ঠিকানা নেই। মা, মাসিমা ওদের কষ্ট তুমি তো দেখতে পাচ্ছ—বলো, সহ্য করা যায়? তার ওপর দাদা, বউদি, নানকু, দশরথ, কওশিকজি—কোথায় হারিয়ে গেল ওরা! ম্যাটাডর ভ্যানে আগুন লেগে তিন-তিনটে লোক শেষ হয়ে গেছে। শুভেন! শুভেনটাও! যে-ছেলেটা চাকরিবাকরির তোয়াক্কা না করে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াত, কবিতা লিখত, ওকে আমি কয়েক মিনিটের জন্যে কসাই হয়ে যেতে দেখেছি। ভয় হয়, নয়না, বাঁচার চেষ্টা করতে করতে আমিও কি ধীরে-ধীরে ওরকম বদলে যাব? আমার হাতে একটা রেঞ্চ অথবা ছুরি থাকবে, আমি অমানুষ হয়ে যাব—।'

'দিতুদা!'

মেয়েটার মুখ থেকে তীব্র বেদনার ভাষা হয়ে ছিটকে বেরোল শব্দটা। সুনয়না একটা হাত আদিত্যর কাঁধে রাখল, অন্যটা আলতো করে ওর ঠোঁটের ওপর। বলল ফিসফিসে গলায়, 'এরকম বলতে নেই, দিতুদা—তুমি কখনও পালটাবে না, কখনও না।'

আদিত্য সবকিছু ভুলে গেল। দুনিয়াজোড়া দূষণের কথা মুছে গেল ওর মন থেকে। ও সত্যিকারের ডুবে যাওয়া মানুষের মতো আঁকড়ে ধরল সুনয়নাকে। ওর পবিত্র বিশ্বাসকে। তারপর পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল ওর ঠোঁটে, নাকে, ভুরুতে, কপালে, চিবুকে, গলায়। ঠোঁটে, নাকে, ভুরুতে, কপালে, চিবুকে...।

সুনয়না মন-প্রাণ দিয়ে চুমুগুলো গ্রহণ করছিল। ভাবছিল, এভাবেই অনন্তকাল কেটে যাক। তারপর যখন সকাল হবে, তখন যেন স্পষ্টভাবে সূর্য দেখা যায়, দেখা যায় গাছপালা। তা না হলে এই ভয়ংকর দূষণ মানুষগুলোকে ধীরে-ধীরে পালটে দেবে। নিরীহ মানুষগুলো স্বার্থপরের মতো প্রাণ বাঁচাতে কাপুরুষ হানাদার হয়ে উঠবে।

আদিত্য যখন থামল তখন ওর গাল বেয়ে জল পড়ছে। সুনয়নার নিটোল মুখ ও দু-হাতে আঁজলা করে ধরল। এক অঞ্জলি ফুল। ওর মনে পড়ল শুভেনের লেখা কবিতার লাইনঃ 'তুমি চলে গেলে দিনগুলো সব রাত হয়ে যায়।' এখন অনুভব করতে পারছে, ভালোবাসা কীরকম তীব্র হলে তবে এরকম লাইন লেখা যায়। সুনয়না কাছে থাকলে তবেই দিন আসবে, দিনগুলো দিনই থাকবে—রাত হয়ে যাবে না।

ও নয়নাকে কাছে টেনে রেখেই ভাঙাচোরা গলায় বলল, 'নয়না, সামনে এখনও অনেক কাজ বাকি। দাদাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমরা সবাই মিলে বাড়ি ফিরে যাব।'

আদিত্য মনে-মনে ভাবল, নিজেদের জমিতে দাঁড়িয়ে আমরা বাঁচার জন্য লড়ব। লড়াইয়ের জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়ে কখনও লড়াই করা যায় না। কক্ষনো না।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে ওরা দুজনে ছাদের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। এলোমেলো বাজে কথা বলল অনেক। তারপর একসময়ে হাত ধরে নীচে নেমে এল।

মা-দের ঘরে গিয়ে দেখল মা বিছানায় বসে আছে। একপাশে একটা থালায় রুটি আর ডাল সেদ্ধ। আর কোলের কাছে বাবার ফটোটা। কাঁদছে নিঃশব্দে। আর সুনয়নার মা বিষণ্ণ হতাশ মুখে চুপচাপ পাশে বসে।

আদিত্য নয়নার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের চোখ মুছল।

ওকে দেখেই মা বলল, 'দিতু, এখানে আমার মন টিকছে না...' কান্না চাপতে মুখে আঁচল গুঁজে দিল মা।

আদিত্য দেখল, দেওয়ালে চার-পাঁচ বছরের একটা হাসিখুশি ছেলের ফটো। ছেলেটার মুখটা বারবারই নানকুর মতো হয়ে যাচ্ছিল।

আদিত্য এগিয়ে গিয়ে মায়ের পিঠে হাত রাখল, বলল, 'আর কোনও চিন্তা নেই, মা। কাল সকালেই আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি—সে যেভাবেই হোক। বিশু তোমাদের আগে নিয়ে যাবে, আর আমি দাদাদের খুঁজে বের করে ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরব। তুমি একটুও ভেব না।'

এরকম পরিস্থিতিতে কথাগুলো অন্তসারশূন্য মনে হওয়ার কথা। কিন্তু আদিত্যর গলার স্বর আর ওর চোয়ালের রেখা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছিল এর মধ্যে কোনও মিথ্যে আশ্বাস নেই, বরং পরিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা রয়েছে।

মায়ের মুখ যেন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল দিতুর কথায়। সুনয়নার মা মলিন হাসলেন একটু।

আদিত্য তখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, কলকাতায় কাকের ডাকে ওর ঘুম ভাঙছে। রামুদা ভোরবেলায় খবরের কাগজ বিলি করতে এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'কলিকাল শেষ হল, কলকাতায় কাক এল। কলিকাল শেষ হল, কলকাতায়...।' আর শুকিয়ে নীরস ও প্রাচীন হয়ে যাওয়া গাছপালাগুলোর শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থলে এই এত্তটুকু জোড়া-জোড়া সবুজ পাতা বেরিয়েছে। আবার আসছে সবুজের দিন। গাছপালার দিন, পাখপাখালির দিন, পোকামাকড়ের দিন। নানকুকে আর অন্য কোনও দেশে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। নিজের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়েই ওকে লড়াই শেখাতে হবে। শেখাতেই হবে!

ক্রমেই আদিত্যর চোয়াল আরও শক্ত হচ্ছিল। নয়না এসে ওর জামা ধরে এক টান মারল। বলল, 'দিতুদা, এখন আর ভয় পেলে চলবে না। গব্বর সিং কী বলে গেছে মনে আছে তো?'

আদিত্য চোখে হাসল, বলল, 'মনে আছে—।'

ও তরতর করে বয়ে যাওয়া গঙ্গার ছবি দেখতে পেল। নৌকো ভাসছে এখানে-ওখানে। হু-হু করে বাতাস দিচ্ছে। ধোঁয়াশার ছিটেফোঁটাও আর নেই। অনেকগুলো কালো-কালো ছেলেমেয়ে

হাত-পা ছুড়ে দাপিয়ে স্নান করছে বহতা নদীর জলে।

এমনসময় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির ফোঁটার টুপটাপ শব্দ ঘরে দাঁড়িয়েই টের পাওয়া যাচ্ছে।

আদিত্য সুনয়নার দিকে তাকাল। বলল, ‘চলো, ছাদে যাই—বৃষ্টিতে ভিজি—।’

সুনয়না চঞ্চল পা ফেলে এগিয়ে গেল আদিত্যর দিকে। প্রায় ছুটেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা দুজনে।

কালো বৃষ্টি হলেও বৃষ্টিতে ভিজতে ওরা এখন আর ভয় পায় না।

প্রাপ্তমনস্ক কল্পবিজ্ঞান কাহিনি

গল্প



সুন্দরী

রিঙ্কু বিছানায় বসে বই পড়ছিল। কমলেশ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, খুব সুন্দর একটা কবিতার লাইন শুনবি?'

রিঙ্কু আয়নার মধ্যে দিয়ে বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'কী, শুনি?'

কমলেশ মুচকি হেসে বলল, 'পদার্থবিদ্যা পড়ছে একটি অপদার্থ মেয়ে।'

রিঙ্কু গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতায় মনোযোগ দিয়ে মন্তব্য করল, 'বুঝেছি, আমাকে অপদার্থ বললে। আমি তো ভৌতবিজ্ঞান পড়ছি, তাই—।'

কমলেশ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'নাঃ, তোর দেখছি বুদ্ধি আছে। আমি তোর বুদ্ধি পরীক্ষা করছিলাম।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রোমি ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছিল। রুক্ষ গলায় বলল, 'তোমার আয়নার কাজ হয়েছে? তা হলে এ পাশে এসে মেয়ের সঙ্গে কবির লড়াই করো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—।'

কমলেশ বউয়ের দিকে তাকাল। সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোচ্ছে! বিউটি পারলার, কিংবা হ্যান্ডিক্র্যাফট-এর স্কুল, অথবা কুকিং রেসিপি-র স্পেশাল কোর্স অ্যাটেন্ড করতে। নয়তো অন্য কিছু। কমলেশ ঠিক জানে না। জানার তেমন একটা ইচ্ছেও আর নেই।

কমলেশ কোনও কথা না বলে আয়না ছেড়ে দিল। রোমি চটপট পা ফেলে আয়নার সামনে এসে সাজগোজের শেষ ধাপটুকু মন দিয়ে শেষ করতে লাগল।

কমলেশ আড়চোখে বউকে একবার দেখল।

রোমি দারুণ সুন্দরী। এত সাজগোজের কোনও দরকার নেই ওর। কিন্তু তবুও সাজে। রূপ নিয়ে ঠিক দেমাক না হলেও ওর একধরনের আত্মতুষ্টি আছে। মাঝে-মাঝে কমলেশকে আড়ালে কথা শোনায়, রিঙ্কু তেমন সুন্দর দেখতে হয়নি বলে।

আয়নার মধ্যে দিয়ে রোমিকে দেখতে-দেখতেই হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। আয়নার ছায়াটা ঢেউয়ের মতো কাঁপতে লাগল, তারপর সেখানে একটা অদ্ভুত বেঢপ চেহারা দেখা গেল। ধাতুর পাতে তৈরি হাত-পা-ওয়ালা একটা মানুষ যেন!

কমলেশ বুঝতে পারল, ও এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কারণ এই ঘরে রোমি বা রিঙ্কু থাকতে পারে না। অন্তত এখন।

তো চোখ খুলে ভালো করে তাকাল চারপাশে।

মাথা ঝিমঝিম করছে। ঘরের দেওয়ালগুলো দোল খাচ্ছে। বুকের ভেতর কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে। আয়নাটা মনে হল দুলছে। এমনকী আয়নার সামনে দাঁড়ানো বেঢপ চেহারার বস্তুটাও সামান্য টলছে।

ওইরকম আচ্ছন্ন অবস্থাতেও কমলেশ মোটামুটি শুনতে পাচ্ছিল। ওর কানে এল, বিচিত্র ধাতব গলায় কে যেন সুর করে গাইছেঃ

'ভোর হইল, জগৎ জাগিল

চেতনে চাহিল নারী-নর—।'

আর তার ঠিক পরেই সেই ধাতব কণ্ঠ হাঁফ ছাড়ার ভঙ্গিতে বলল, 'যাক, তোমার ঘুম ভেঙেছে তা হলে! ওঠো—দ্যাখো, ভোর হয়ে গেছে। আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল। প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহার আঁধারে। প্রভাত পাখির গান—।'

'থামো, থামো, থামো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কমলেশ। বিছানায় উঠে বসে ও হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ঘষতে লাগল। তারপর মুখের সামনে ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা 'ভি' অক্ষরের মতো করে বারকয়েক নাড়ল। না, দুটো আঙুলই দেখতে পাচ্ছে কমলেশ—চারটে নয়। এমনকী পাশের ছোট টেবিলে রাখা ভ্যাট সিক্সটিনাইনের বোতলের গায়ের লেখাটাও বাংলায় নির্ভুলভাবে 'ভ্যাট উনসত্তর' বলে পড়তে পারল। নাঃ, নেশার ঘোর তা হলে আর নেই। শুধু এই হতচ্ছাড়া মস্তক-বেদনাটি ছাড়া।

কিন্তু তবুও আয়নার সামনে দাঁড়ানো বিচিত্র রোবটটাকে কমলেশ কিছুতেই বাস্তব বলে মেনে নিতে পারছিল না। একে তো রোবট, তায় আবার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আওড়াচ্ছে!

রোবটটা আহত গলায় বলল, 'জানি, আমার পাংচুয়েশানে একটু-আধটু ডিফেক্ট আছে, তা বলে অমন মুখ করে থামিয়ে দেওয়ার কী ছিল! ভোরের রূপ দেখে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম!'

কমলেশ হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। আয়নার সামনে দাঁড়ানো রোবটটাকে দেখে ওর মনে ঠিক পাঁচটি মৌলিক প্রশ্ন জাগলঃ কে, কী, কেন, কবে, কোথায়?

এলোমেলো বিছানা থেকে নেমে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল কমলেশ। বিরক্ত গলায় পাঁচটি প্রশ্নের প্রথমটা ছুড়ে দিল রোবটটার দিকে।

'কে তুমি?'

'ও মা!' বিস্ময়ে ডানহাত তুলে গালে ঠেকাল রোবটটা। খনখনে গলায় বলল, 'আমার জন্মদাতা হয়ে আমাকেই ভুলে গেলে!'

'জন্মদাতা!'

'হ্যাঁ, কাল রাতে তুমিই তো আমাকে তৈরি করলে! ঠিক রাত বারোটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিটে আমাকে কমপ্লিট করে সুইচ অন করে দিয়েছ তুমি।'

কমলেশ এই যন্ত্রপাতিটাকে তৈরি করেছে! হতে পারে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। গত ছ'মাস ধরে যা কিছু ও আবিষ্কার করেছে তার শতকরা নব্বই ভাগই মাতাল অবস্থায়, নেশার ঘোরে। তা ছাড়া, রোবটটার চেহারার মধ্যেও কমলেশের পেটেন্ট ধাঁচ রয়েছে।

কমলেশ বেশিরভাগ সময়েই বাতিল করে দেওয়া জিনিসপত্র ব্যবহার করে নতুন-নতুন আবিষ্কার করে ফেলে। ফলে অল্প খরচে তৈরি করা অভিনব সব মেশিনপত্তর জনগণের কাছে চটজলদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন, নিমের ডাল, জামাকাপড় ছড়ানোর প্লাস্টিকের ক্লিপ আর পুঁচকে একটা মোটর দিয়ে ও তৈরি করেছে 'দন্তধাবন যন্ত্র'। এই যন্ত্রের সাহায্যে দাঁত মাজার সময়ে মাথা একটুও নাড়াতে হয় না। শুধু যন্ত্রে দাঁত ঠেকিয়ে দাঁত খিচিয়ে থাকলেই কাজ হয়। যন্ত্র নিমেষে বাকি কাজটুকু সেরে দেয়। তা ছাড়া এতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিমের দাঁতনের আয়ুর্বেদিক গুণ। আর দাম মাত্র পঁচাত্তর টাকা। শুধু মাঝে-মাঝে নিমের দাঁতনের একটা নতুন টুকরো ক্লিপের মধ্যে ফিট করে দিতে হয়।

তা এই রোবটটাও সেইরকম। ভাঙা টিনের পাত্র—তার মধ্যে মোটর গাড়ির বডি থেকে শুরু করে আমুল স্প্রে-র খালি টিন পর্যন্ত রয়েছে, পুরোনো গিয়ার, সাইকেলের চেন, কয়েকটা টুনি বাল্‌ব, খানিকটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক, কয়েকটা মোটর আর আই. সি. চিপ দিয়েই ব্যাপারটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। মেশিনটার বুকের কাছটায় একটা নব লাগানো দরজা রয়েছে। বোধহয় ব্যাটারি ভরার জন্য আর কানেকশান রিপেয়ার করার জন্য।

স্বাভাবিকভাবেই রোবটটা দেখতে তেমন একটা আহামরি কিছু হয়নি। চোখের বাল্‌ব দুটো মাঝে-মাঝেই জ্বলে উঠছে, আর তালপাতার সেপাইয়ের মতো ল্যাকপ্যাক করে টিনের হাত-পা নাড়ছে।

কিন্তু এই মালটাকে কমলেশ তৈরি করল কেন?

ওর এখন বেশ মনে পড়ছে, রোবটটা তৈরির জন্য গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুবই পরিশ্রম করেছে। তারপর গতকালই ফিনিশিং টাচ দিয়ে রোবটটাকে চালু করেছে। কিন্তু কেন?

কমলেশ সেই কথাটাই জিগ্যেস করল, 'তোমাকে হঠাৎ তৈরি করতে গেলাম কেন বলো তো?'

রোবটটা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল কমলেশের দিকে। বলল, 'কী করে জানব! হয়তো তোমার একা-একা লাগছিল, সেইজন্যে—।'

কমলেশ বিরক্তির একটা শব্দ করে ঘরের চারপাশটা দেখল। ছন্নছাড়া বলতে যা বোঝায় ঘরটার অবস্থা এককথায় তাই। একসময় এই ঘরটার নাম 'বেডরুম' ছিল—যখন রোমি-রিঙ্কু ছিল। তারপর, গত আটমাস ধরে এই ঘরটা ধীরে-ধীরে পালটে গেছে। এখন এটা বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, ল্যাবরেটরি—সবকিছু।

বিছানার পায়ের দিকটায় ড্রেসিং টেবিল, আয়না লাগানো। আর ওদিকের কোণটায় জামাকাপড়ের দুটো স্টিলের আলমারি। একটায় কমলেশের জামাকাপড় ডাঁই করা। অন্যটায় রোমি আর রিঙ্কুর পোশাক-আশাক। রোমি বলে গেছে, ওর নতুন ফ্ল্যাটে সবকিছু সাজানো-টাজানো হয়ে গেলে তখন এটা নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলেই ভালো। নইলে সবসময় পুরোনো কথাগুলো বড় বেশি করে মনে পড়ে। তখন খারাপ লাগে। একা-একা লাগে। কষ্ট হয়।

কমলেশ আয়নার পাশে দেওয়ালে ঝোলানো টুথব্রাশ কিপার থেকে ব্রাশ নিল। নানা রঙের রেক্সিন দিয়ে তৈরি জোকারের হাসি-হাসি মুখ। তার টুপিতে 'গুড মর্নিং' লেখা। রিঙ্কু পছন্দ করে এই টুথব্রাশ কিপারটা কিনেছিল। কমলেশের গোলাপি ব্রাশের পাশেই সবুজ ও নীল রঙের দুটো ব্রাশ। রোমির আর রিঙ্কুর। ওরা কখনও এলে যদি দরকার হয়, তাই ও-দুটো এখনও ফেলে দেয়নি কমলেশ।

মাঝে-মাঝে রোমি আসে, কখনও-কখনও সঙ্গে নিয়ে আসে রিঙ্কুকে। তবে এলেও বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। একমাত্র সুতপন এলে তেমন একটা তাড়াহুড়ো করে না।

সুতপন বোধহয় কমলেশকে পছন্দই করে। ও কমলেশের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্প করে। ওর টিভি সিরিয়াল তোলার কোম্পানি আছে। তার ব্যাপারে অনেক সময় কথা বলে। টিভি দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কমলেশ অভিনব কিছু আবিষ্কার করতে পারে কি না, তা জিগ্যেস করে।

রিঙ্কুর পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করে সুতপন। কিন্তু রোমির কথা কখনও তোলে না। রোমির সঙ্গে ওর সম্পর্ক নিয়ে বোধহয় মনে-মনে একটা অস্বস্তি আছে।

কমলেশ সাধারণত নিজের আবিষ্কার নিজে ব্যবহার করে না। তাই সাবেকি পদ্ধতিতে দাঁত মেজে মুখ-টুখ ধুয়ে ও চলে গেল রান্নাঘরে। ফ্রিজ খুলে দুটো মিষ্টি আর একটা স্যান্ডউইচ বের

করে নিল।

ফ্রিজ খুলতেই সুন্দর একটা মিউজিক বেজে উঠল। এটা কমলেশের বৈজ্ঞানিক কীর্তি। আর ফ্রিজের ভেতরটা যে যেমন-তেমন অগোছালো, সেটাও কমলেশের কীর্তি। ফ্রিজের ভেতরে উলটোপালটা খাবার-দাবারের সঙ্গে এখানে ওখানে আই. সি. চিপ. ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টও খুশিমতো রাখা আছে।

গত সাত-আটমাস ধরে এই ফ্রিজটা কমলেশের তত্ত্বাবধানে আছে। আর রান্নাঘরটা রয়েছে ছুটির মায়ের তত্ত্বাবধানে। ছুটির মা এখনও আসেনি। দশটা-সাড়ে দশটায় আসবে।

কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল কমলেশ। গা ম্যাজম্যাজ করছে, মাথা দপদপ করেছে। অবশ্য এ ঝামেলাগুলো আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।

শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই দেখল, রোবটটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা বেঁকিয়েচুরিয়ে দেখছে আর বারবার বলে উঠছে, 'অপূর্ব! মারভেলাস! বিউটিফুল!'

কমলেশ হাই তুলল। বিছানায় গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসল। তারপর আর থাকতে না পেরে মুখ তুলে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? কী দেখে অমন বারবার অপূর্ব, মারভেলাস আর বিউটিফুল বলছ?'

রোবটটা ঢং করে বলল, 'আ-হা, বোঝে না যেন! নিজের রূপ দেখেই বলছি! এমন সুন্দর একটা রোবট তৈরি করতে পারবে কখনও ভেবেছিলে? এটা তোমার জীবনের সেরা কীর্তি।'

কমলেশ এবার সত্যি-সত্যি হো-হো করে হেসে উঠল। সেরা কীর্তি! গত ছ'সাত মাস ধরে কমলেশের খুব টানাটানি চলছে। রোমি স্কুলে চাকরি করে। সেই আয় তো গেছেই, উপরন্তু নিজের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছে কমলেশ।

এখন এটা-ওটা আবিষ্কার করে সেগুলো বিক্রি করে দিন চালাচ্ছে।

'সুপারটয় করপোরেশন'-এর সিনিয়ার ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার ছিল কমলেশ। কিন্তু ওর মাথায় প্রতি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেসব চমৎকার আবিষ্কারের আইডিয়া আসে তার জন্য কোম্পানি কোনওরকম টাকা ঢালতে রাজি নয়। ঝগড়াঝাঁটি অনেকদিন ধরেই চলছিল। রোমি রিঙ্কুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কমলেশ কেমন দিশেহারা আর রগচটা হয়ে পড়েছিল। সেইসময়েই একদিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়। তখন কমলেশ বুকে আঙুল ঠুকে বলেছিল, 'সারাজীবন আপনার কোম্পানিতে চাকরি করার জন্যে আমার জন্ম হয়নি। এ-চাকরি আমি করব না। আমি বাড়িতে বসেই কাজ করব। একদিন আপনাকে এসে আমার জীবনের সেরা আবিষ্কার দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব!'

তা এই সেই তাক লাগানোর বস্তু! যেটার কোনদিক সোজা আর কোনদিক উলটো সেটাই ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না!

কমলেশের চিন্তায় বাধা দিয়ে রোবটটা বলে উঠল, 'আস্তে, আস্তে! তুমি যে হাসির চোটে আমার কান ফাটিয়ে দিলে!'

কমলেশ খানিকটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমার কান খুব সেনসিটিভ বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমি সাবসনিক থেকে সুপারসনিক—সবরকম শব্দ শুনতে পাই। দ্যাখো না, তোমার ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ির কাছটায় একটা বেড়াল ঘুরঘুর করছে, আমি তার পায়ের ধুপধুপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।'

কমলেশের কী যেন হল। ও একছুটে শোওয়ার ঘর পেরিয়ে ঢুকে পড়ল একফালি ড্রইংরুমে। ড্রইংরুমের নানা জায়গায় কমলেশের নানা আবিষ্কারের চেষ্টার ধবংসাবশেষ পড়ে আছে। এ ছাড়া মোটর, ট্রান্সফর্মার, পিসিবি, লোহার টুকরো, কাঠের ফ্রেম, আরও কত কী! সেগুলো ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতেই দেখল, একটা হুলো বেড়াল লেজ উঁচিয়ে ওর দিকে সবুজ চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ সদর দরজা বন্ধ করে ফিরে এল রোবটটার কাছে। সে তখন গুনগুন করে 'তোমার মুখটা কী সুন্দর, আমি বলবই বলব' গানটা গাইছে, আর গালে-কপালে আঙুল ঘষে মেকাপে পালিশ দিচ্ছে।

কমলেশের গোল-গোল চোখের দিকে তাকিয়ে রোবটটা বলল, 'কী মশাই, এবারে বিশ্বাস হল তো!'

কমলেশ কোনও উত্তর দিতে পারল না। কে জানে, মদের নেশার ঘোরে কমলেশের অবচেতন বিজ্ঞান প্রতিভা কোন-কোন আশ্চর্য গুণ আর কোন-কোন জটিল প্রোগ্রাম গুঁজে দিয়েছে এই যন্ত্রদাসের মধ্যে!

রোবটটা এবার ঘুরে দাঁড়াল কমলেশের দিকে। ধাতব শব্দ তুলে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমাকে তুমি "সুন্দরী" বলে ডেকো। অনেক ভেবে দেখলাম, নামের সঙ্গে মিল থাকাটাই ভালো। নইলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো দশা হবে।'

কমলেশ সুন্দরীকে দেখছিল।

টিন-লোহা-নাটবল্টু সারাটা শরীর জুড়ে দাঁতখিঁচিয়ে আছে। চোখজোড়া একেবারে বেমানান। কান দুটোও তাই। মাথা প্রায় ন্যাড়া। শুধু পিছনদিকটায় একগোছা পরচুলা। রোমির বাতিল করে দেওয়া নকল কেশরাশি। হাত-পায়ের আঙুলগুলো বেঢপ মাপের। হাঁটু আর কনুইয়ের জোড় কাজের চেয়ে শব্দ করে বেশি। আর এখানে-ওখানে কিছু বৈদ্যুতিক তার চোখে পড়ছে।

শুধু পরচুলাটুকু ছাড়া সুন্দরীর জেন্ডার কনফার্ম করার আর কোনও উপকরণ নেই। ওটা কি কমলেশই নেশার ঘোরে কাল রাতে জুড়ে দিয়েছে? কে জানে! কমলেশের মনে নেই। গত কয়েকমাসে ওর অবচেতন মনের যা হাল হয়েছে তাতে ওটাকে দিব্যি অপারেশান করে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়!

কমলেশ সুন্দরীর খুব কাছে এগিয়ে গেল। আর তক্ষুনি রোবটটা এক পা পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, কী হচ্ছে! হুট করে কে কখন দেখে ফেলবে। প্লিজ, কমলেশ—।'

কমলেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। শয়তান মেশিনটা বলে কী! ওর মাথার দপদপানিটা হঠাৎ সাত ডিগ্রি বেড়ে গেল। মাথার ওপরে ঢিমে তালে ফ্যান ঘুরছে, আর ফ্যানের সঙ্গে তালে-তালে লাল-নীল-হলদে বাতি জ্বলছে—কমলেশের সায়েন্টিফিক মডিফিকেশান। সেই পাখার হাওয়া কমলেশের মাথায় লাগছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এসব স্বপ্ন, না সত্যি! কমলেশ জেনুইন জেগে আছে তো!

সামনের রংচটা দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। ১৯৯৪ সাল। কোনও ভুল নেই। বড় মাপের জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। পাশের বাড়ির টিভি অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় বাংলাদেশ-টিভি প্রোগ্রাম দেখার জন্য মাছের কাঁটার মতো ছোট অ্যান্টেনা। তাতে একজোড়া পাতিকাক বসে আছে।

কোনওটাই স্বপ্ন নয়। ঘোর বাস্তব।

এমনকী ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো কমলেশ, রোমি আর রিঙ্কুর রঙিন ফটোটাও যে সত্যি!

কমলেশ তাকাল সুন্দরীর চোখে।

সে তখনও বলছে, 'না, কমলেশ, না—এখন না। তুমি নিজেকে একটু কন্ট্রোল করো, লক্ষ্মীটি—।'

কমলেশ আর সহ্য করতে পারল না। একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, 'কীসব আবোল-তাবোল বকছ!'

'না গো, তোমার চোখ দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কী দোষ বলো। সব দোষ আমার। আমার রূপই আমার কাল হয়েছে।'

কমলেশ বোধহয় মাথার চুল ছিঁড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। ঠিক আড়াইবার। দুটো লম্বা টোন, আর তারপরই একটা হাফটোন।

এরকম বিশেষ স্টাইলে কলিংবেলে সুর তোলেন একমাত্র গুরুপদবাবু। গুরুপদ সরকার। এ ফ্ল্যাটবাড়ির বাড়িওয়ালা। একেবারে ওপরতলার ফ্ল্যাটে থাকেন।

সুন্দরীর দিকে কটমট করে একবার দেখল কমলেশ। তারপর চটপটে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই তাঁকে দেখা গেল।

দশাসই চেহারা। পরনে পাজামা আর গেঞ্জি। হাতে কালচে রঙের শক্তপোক্ত প্যাঁচালো লাঠি। মাথার চুল সাদা। দু-ভুরু আর দু-কানে যেন একখাবলা করে গ্লাসউল বসানো। মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ। চোখ কুতকুতে। কানে একটু কম শোনেন। স্ত্রী গত হয়েছেন অন্তত একযুগ। তবে যাওয়ার আগে অকালকুষ্মাণ্ড একটি পুত্র রেখে গেছেন। গত পাঁচবছর ধরে ভদ্রলোকের একমাত্র খাদ্য বোধহয় চ্যবনপ্রাশ। কারণ, পরিচিত সকলকেই তিনি নিয়মিত এই বস্তুটি সেবনের উপদেশ দেন।

কমলেশকে দেখেই গুরুপদবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা কমলেশ, তোমার ভাড়াটা—।'

কমলেশ একটু অবাক হয়ে বলল, 'এখন তো সবে বিশ তারিখ...।'

গুরুপদ সরকার হেসে বললেন, 'না বাবা, আমি গতমাসের ভাড়াটার কথা বলছি। তুমি যে চেক দিয়েছিলে সেটা বাউন্স করেছে। এই ভাড়া কালেকশান যে কী ঝামেলার! নেহাত ছেলেটা অপোগণ্ড, তাই আমাকেই কালেকশানে বেরোতে হয়।'

'আমার চেক বাউন্স করেছে?' কমলেশ বেশ অবাক হল যেন।

'হ্যাঁ বাবা, তুমি যখনই চেক দাও তখনই বাউন্স করে, বারবার বাউন্স করে। কেন বলো তো?'

'বোধহয় রবারের তৈরি তাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'তা ছাড়া ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ব্যাপারটা সবসময় আমার খেয়াল থাকে না।'

শুধু ব্যাঙ্কে কেন, ব্যালেন্স বোধহয় কোথাও ঠিক নেই কমলেশের। সামান্য এই ষোলোশো টাকা মাসে-মাসে দিতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে ওর। যখনই কোনও আবিষ্কার বিক্রি করতে পারে তখনই রাজার জীবনযাত্রা শুরু করে দেয়। মনপ্রাণ ঢেলে নেশা করে। এমনকী লাগামছাড়া দাম দিয়ে ভ্যাট সিক্সটিনাইন কিংবা জনি ওয়াকার কিনে ফ্যালে। কিন্তু এখন এই ভদ্রলোককে ঠেকানো যায় কী করে? আচ্ছা, রোবটটা এঁকে বেচে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

'মেসোমশাই, কিছু মনে করবেন না, ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার ছেলের মতো—।'

'না!' গুরুপদ সরকার চেঁচিয়ে বললেন, 'তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো। ও ব্যাটা একটা—।'

সন্তান সম্পর্কে নামাবলী শুরু হওয়ার আগেই বাধা দিল কমলেশ, 'কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন, ভেতরে আসুন, আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব। একটু সাবধানে আসবেন—।'

কমলেশকে অনুসরণ করে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধ।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেই গুরুপদবাবুর নাক কুঁচকে গেল। আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করলেন, 'কীসের একটা গন্ধ পাচ্ছি—।'

চকিতে কমলেশের চোখ চলে গেল টেবিলে রাখা মদের বোতলের দিকে। একটু আগেই যিনি বলেছেন, 'তুমি আমার ছেলের চেয়ে অনেক ভালো' তাঁকে এখন কী বলবে কমলেশ!

সুন্দরী বোধহয় কমলেশকে লক্ষ করছিল। ফস করে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়, ওষুধের গন্ধ। আপনার তো দেখছি ঘ্রাণশক্তি বেশ প্রবল!'

সুন্দরীর আচমকা কণ্ঠস্বরে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন গুরুপদ সরকার। হাতের লাঠিটা দুবার ঠুকলেন মেঝেতে। তারপর কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন সুন্দরীকে। ওঁর মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল না তেমন একটা খুশি হয়েছেন।

'আপনি এই রোবটটা নিয়ে নিন, মেসোমশাই। কাজে লাগবে। বদলে শুধু আমার চারমাসের ভাড়া ইয়ে করে দেবেন—।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়লেন গুরুপদবাবুঃ 'না, বাবা, ওসব ইয়েটিয়ের মধ্যে আমি নেই। আমি বরং ও-সপ্তাহে তোমার কাছে আসব।'

সুন্দরীর মুখ দিয়ে 'হুঁঃ' গোছের একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কমলেশ গুরুপদবাবুর নজরের আড়ালে হাতজোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গি করল। সুন্দরী চাপা গলায় বলল, 'এবারের মতো ছেড়ে দিলাম।'

ছন্নছাড়া ঘরটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে গুরুপদবাবু জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ওয়াইফের ট্রেনিং এখনও শেষ হয়নি?'

ট্রেনিং? কমলেশ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারপরই ওর মনে পড়ল, রোমি ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কমলেশ এই 'ট্রেনিং'-এর গল্পটা তৈরি করেছিল। যারাই ভুরু ওপরে তুলেছে তাদেরই বলেছে, রোমিকে ওর স্কুল থেকে একটা স্পেশাল ট্রেনিং-এর জন্য বাঁকুড়া পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রায় আটমাস হয়ে গেল, ট্রেনিংটা এখনও শেষ করতে পারছে না কমলেশ।

ও মিনমিন করে বলল, 'না, মেসোমশাই, এখনও তো শেষ হয়নি দেখছি...।'

'এরকম লম্বা ট্রেনিং-এ ভরতি করলে কেন বউমাকে? একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না—।'

কমলেশের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময় বৃদ্ধ বিড়বিড় করে অনেকটা যেন আপনমনেই বলে উঠলেন, 'মেয়েসমেত এ বড় অদ্ভুত ট্রেনিং!'

দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে ফিরে এল কমলেশ। সত্যি, এ বড় অদ্ভুত ট্রেনিং! স্বামীকে ছেড়ে থাকার প্রশিক্ষণ, বাবাকে ছেড়ে থাকার প্রশিক্ষণ—আর সেইসঙ্গে কমলেশেরও বউ-মেয়েকে ছেড়ে নির্জন বসবাসের প্রশিক্ষণ।

কিন্তু এখনও কমলেশ যে এই নতুন ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না! দেওয়ালে ছবিটার দিকে চোখ গেল ওর। রোমির ছবির দিকে তাকালেই ওর বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে এখনও। আর রিঙ্কু! ও যে সবচেয়ে বেশি মিষ্টি।

রোমি-রিঙ্কুর ট্রেনিং ধীরে-ধীরে শেষ হয়ে আসছে। তারপর...তারপর ফেরার আর পথ থাকবে না। ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিল কমলেশ। বিছানায় বসে ভাবতে লাগল।

আজ বোধহয় মঙ্গলবার। আজই কিশোর আহুজার আসার কথা। বিশাল চেহারার এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বেশি বয়েসে বিপত্নীক হয়েছেন। ছেলেমেয়ে নেই কিন্তু অঢেল টাকা আছে। তাঁর খুব শখ একটা প্রমাণ মাপের মেয়ে পুতুলের। পুতুলটায় কলকবজা তেমন একটা না থাকলেও চলবে, তবে বডিটা পাঁউরুটির মতো নরম হওয়া চাই। কমলেশ বহুবার ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, এরকম খেলনা আমি তৈরি করি না। কিন্তু আহুজা নাছোড়বান্দা। বারবার শুধু বলেন, ‘আপনি রিফিউজ করলে আমার জিন্দেগিটা একদোম বরবাদ হয়ে যাবে, সায়েন্টিসবাবু। আমি যে কী লোনলি সে আপনাকে আর কী বলব! ভেরি-ভেরি লোনলি—মনে হোয় কি চারপাশে কুছু নাই—সিরফ্ বিরানি আর তনহাই...।’

কমলেশের হাসি পেয়েছিল। যার চারপাশে ‘কুছু নাই’, একটা খেলার পুতুল ধরে দিলেই তার ‘কুছু নাই’ মিছে হয়ে যাবে! আজ যদি কিশোর আহুজা আসেন তা হলে স্পষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দেবে কমলেশ।

ঠিক এমনসময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

মদের বোতল আর গেলাসের পাশেই টেলিফোন। কমলেশ টেলিফোন ধরতে উঠে দাঁড়াল। কার ফোন হতে পারে? ‘সুপারটয় করপোরেশন’-এর এম. ডি.? কমলেশকে আবার চাকরিতে জয়েন করার জন্য সাধাসাধি করতে চাইছেন? উঁহু, কমলেশ কিছুতেই রাজি হবে না। আবিষ্কারের স্বাধীনতা বলে একটা ব্যাপার আছে।

সুন্দরী যথারীতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপচর্চায় মশগুল। আপনমনে গুনগুন করে কী একটা গানের সুর ভাঁজছিল। ও ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে কমলেশকে একবার দেখল। তারপর গুনগুন করা থামিয়ে বলল, ‘ডার্লিং, যদি আমার ফোন হয় তা হলে বলে দিয়ো আমি বাড়ি নেই—।’

কমলেশ থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সুন্দরীকে দেখল। মাত্র কয়েকঘণ্টাতেই এই বকযন্ত্রটা 'ডার্লিং'-এ পৌঁছে গেছে! সত্যি, আজকের রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটলে হয়! শোওয়ার আগে এটার সুইচ অফ করতে ভুলে গেলে চলবে না।

ও কাটা-কাটা সুরে বলল, 'তোমাকে আবার কে ফোন করতে যাবে! তুমি যে আমার ফ্ল্যাটে জন্ম নিয়েছ তাই-ই তো কেউ জানে না!'

সুন্দরী প্রায় মুখঝামটা দিয়ে কমলেশকে দাবড়ে দিলঃ 'হুঁঃ! তুমি ওই আনন্দেই থাকো। আজকালকার জোয়ান ছোঁড়াগুলোকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। ওরা রূপের গন্ধ পায়—।'

কথা শেষ করেই আবার গুনগুন, আবার প্রতিবিম্বের সামনে দাঁড়িয়ে রূপচর্চা।

কমলেশের ইচ্ছে হল টেনে-টেনে নিজের মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফ্যালে।

কিন্তু টেলিফোন তখনও বাজছিল।

ও তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যালো—।'

'সুপারটয় করপোরেশন'-এর এম. ডি. নয়, ওপাশ থেকে রোমির তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ 'আজকাল কি কানেও কম শুনছ নাকি?'

'রোমি, রোমি...' কমলেশের মাথা ঝিমঝিম ভাবটা পলকে কেটে গেল। গলার ভেতরে সুপুরির একটা কুচি আটকে গেছে বলে মনে হল।

'শোনো, কাল সন্ধেবেলা সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি যাব। তুমি ঘরে থেকো। ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে হুট করে কোথাও চলে যেয়ো না।'

'না, না, থাকব।' একটু থেমে তারপর, 'রিঙ্কুকে নিয়ে আসবে তো?'

রোমি ঠান্ডা গলায় বলল, 'ওর সামনে পরীক্ষা। আজেবাজে সময় নষ্ট করলে পড়ার ক্ষতি হবে।'

'এক-দেড়ঘণ্টার জন্যে এলে কী আর এমন ক্ষতি হতো! অনেকদিন ওকে দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, বিশ্বাস করো—।'

'দেখি, পরীক্ষার পর যদি একদিন নিয়ে যেতে পারি—।'

কমলেশ মনে-মনে রিঙ্কুর মুখটা ভাবল। ও যদি আসত তা হলে কমলেশ আইসক্রিম, ক্যাডবেরি চকোলেট, ঘুগনি, ফুচকা—আরও কত কী নিয়ে আসত কে জানে! এগুলো সবই রিঙ্কুর ফেবারিট ডিশ।

কমলেশ বলল, 'কাল সন্ধেবেলা তোমার জন্যে "ফ্লুরিজ"-এর চিকেন প্যাটিস আর থাম্স আপ এনে রাখব।'

এগুলো রোমির ফেবারিট, কমলেশ জানে। 'ফ্লুরিজ'-এ ওরা একবারই খেতে গিয়েছিল। তবে কমলেশ মাঝেমধ্যে চিকেন প্যাটিস কিনে নিয়ে আসত।

রোমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, ওসব ঝামেলা করতে যেয়ো না। আমি তো যাব আর কয়েকটা শাড়ি-জামাকাপড়, ব্যাঙ্কের চেকবই-পাশবই, আর মিক্সিটা নিয়েই চলে আসব। মনে আছে, ক'বছর আগে আমাদের অ্যানিভারসারিতে ওটা বড়দি আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল?'

মনে আছে। রোমির বড়দি জামশেদপুরে থাকে। স্বামী টাটার বিশাল অফিসার। এইট্টি নাইনে ওদের বিবাহবার্ষিকীর সময়ে ওরা কলকাতায় ছিল। তখনই মিক্সিটা প্রেজেন্ট করেছিল।

রোমি মিক্সি নিতে আসবে। পাশবই-চেকবই, আর শাড়ি-জামাকাপড় নিতে আসবে। মাঝেমাঝেই ও এরকম আসে। দরকারি জিনিসগুলো নিয়ে যায়। পাশবইটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হলেও ওতে রোমিরই টাকা থাকত। আর মিক্সি দিয়ে কমলেশ এখন কী করবে! কিছুই আর মেশানোর নেই। বরং রিঙ্কু ম্যাংগো জুস খেতে খুব ভালোবাসত। রোমি নিয়ে গেলে মেয়েটা খুশি হবে।

'রোমি...রোমি...।'

রোমি ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'বলো, কী? আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কমলেশের পুরোনো কথা মনে পড়ছিল। ও প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

কমলেশ থেমে-থেমে বলল, 'রোমি—আবার সবকিছু—ঠিকঠাক করে নেওয়া যায় না? আগের মতো—।'

'অন্য কোনও কথা থাকলে বলো।'

'তোমার পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না?'

'পড়ে—তাতে কী?'

তাতে কী! কমলেশ যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের আগে রোমির সঙ্গে দু-বছরের দুরন্ত ভালোবাসা মাঠ-ময়দান, ভিক্টোরিয়া, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, বকখালি বেড়িয়ে আসা পাগলের মতো চুমু খাওয়া, আদর করা—সব এখন 'তাতে কী'!

একদিন শীতের পড়ন্ত বেলায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরপাড়ে কাঠের বেঞ্চে বসে ছিল ওরা। সূর্য ঢলে পড়ছিল ডানদিকের আকাশে, আর সামনে শান্ত জলের আয়নায় শ্বেতপাথরের স্মৃতিসৌধটির ছায়া পড়েছিল। রোমির নরম চিকন হাতের পাতা কমলেশের হাতে ধরা ছিল। কমলেশ ওর কররেখা দেখতে-দেখতে বলেছিল, 'স্মৃতির ছায়া পড়েছিল শীতল জলতলে, প্রতিশ্রুতি আঁকা ছিল তোমার করতলে।'

রোমি ওর হাতটা মুঠো করে আঁকড়ে ধরেছিল।

সেই 'প্রতিশ্রুতি'ও এখন 'তাতে কী' হয়ে গেছে!

এর আগেও রোমি কয়েকবার ফোন করেছে, এই ফ্ল্যাটেও এসেছে কোনও-না-কোনও দরকারে। কিন্তু তখন কমলেশের সংযম ছিল, আহত অভিমান ছিল, আর ভেবেছিল রোমি আবার নিজে থেকেই ফিরে আসবে। সেটা হয়নি।

ইদানীং কমলেশের কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে। এখনও করছিল।

'রোমি, আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি তা হলে—।'

'কমলেশ, কী হচ্ছে! এসব বলে বোর কোরো না। যাকগে, তোমার ইনভেনশান আর ডিসকাভারি কীরকম চলছে বলো।'

কমলেশ সুন্দরীর দিকে একবার তাকাল।

আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে তখন সেজে চলেছে। পাউডার, ক্লিনজিং মিল্ক, ময়েশ্চারাইজার, পারফিউম—রোমির উপকরণ যা কিছু আছে একের পর এক মেখে চলেছে। আর ড্রয়ার থেকে রিঙ্কুর একটা লাল রঙের বো বের করে নিয়ে মাথার একখাবলা পরচুলায় আটকে দিয়েছে। এদিক-ওদিক ঘাড় বেঁকিয়ে রোবটটা আয়নায় নিজেকে দেখছে আর গুনগুন করে গাইছে, 'আমি তোমায় বড় ভালোবাসি, তোমায় বড় ভালোবাসি—।'

টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে কমলেশের গলা ভেঙে গেল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কয়েকবার ঢোঁক গিলে ও বলল, 'কালই একটা নতুন রোবট তৈরি করেছি। খুব সুন্দর দেখতে—।'

'আমার চেয়েও!' রোমি ঠাট্টার সুরে বলল।

'তোমার চেয়ে সুন্দর আমার কাছে আর কেউ নেই, রোমি।' কমলেশের গলা ধরে যাচ্ছিল।

ওরা রাস্তায় বেরোলে সবাই হাঁ করে রোমিকে দেখত—যেন তাজমহল দেখছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। রোমি যে আপাদমস্তক সুন্দর! কতজন যে ওকে সিনেমায় নামার অফার দিয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। তবে ফিল্মের ব্যাপারে কমলেশের বরাবরই কেমন একটু অ্যালার্জি আছে। তাই রোমি উৎসাহ দেখালেও কমলেশ আপত্তি করেছে। রোমি বলেছে, 'তুমি চাও না, টিভি-সিনেমায় সবাই আমাকে দেখুক? সবাই জানুক তোমার বউ কত রূপসী!' কমলেশ ওর ছেলেমানুষি গোঁয়ারতুমির সুরে বলেছে, 'না, চাই না। তোমার সুন্দরটুকু শুধু আমার জন্যে। সবাই তোমাকে ওভাবে দেখলে আমি হিংসেয় মরে যাব। আমার ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে, হিংসেয় আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে।' কথাটা বলে কমলেশ হেসেছে। রোমিও হেসেছে। কিন্তু সেটাই ছিল বোধহয় শুরু। তারপর একই কথা অনেকবার উঠেছে। ধীরে-ধীরে সুর কেটে গেছে। আর তখনই সুতপন এসেছে রোমির কাছাকাছি।

টেলিফোনের ও-প্রান্তে রোমি হাসল, বলল, 'তবে যে বললে খুব সুন্দর দেখতে!'

কমলেশ নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'না, না, রোবটটা নিজেই নিজেকে বিশ্বসুন্দরী খেতাব দিয়ে বসে আছে—তাই ও-কথা বলেছি।'

'তা হলে আর কী, বিউটি কনটেস্টে নামিয়ে দাও।' হাসল রোমি।

কমলেশ যেন হঠাৎ পুরোনো হাসির ছোঁয়া খুঁজে পেল। কিন্তু তাতে কী!

'কাল সন্ধেবেলা যাচ্ছি তা হলে।' বলে লাইন কেটে দিল রোমি।

কমলেশ রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্রই সুন্দরী বলে উঠল, 'কী, বাবুর প্রেমালাপ শেষ হল?'

কোনও উত্তর না দিয়ে কমলেশ বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল। সামনের ঝুলবারান্দার মেঝেতে রোদ নেমে এসে শুয়ে পড়েছে। আগেকার সময় হলে বারান্দার রেলিঙে এখন রোমির ভিজে শাড়ি শুকোত।

কমলেশের মাথার দপদপানিটা বেশ কয়েক ধাপ চাড়া দিয়েছে। একইসঙ্গে মাথার ভেতরে অসংখ্য স্মৃতিকোষে পুরোনো দিনের জলছবিগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

'কমলেশ, আমার কথায় দুঃখ পেলে?'

কমলেশ মাথা তুলে আয়নার দিকে দেখল। আমুল স্প্রে-র ভাঙা টিন ইত্যাদি এখন ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগের কথাটা বলার সময় গলার ধাতব স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করার চেষ্টা করেছে।

না, কমলেশ মোটেই দুঃখ পায়নি। একটা হতকুচ্ছিত যন্ত্রের মন্তব্যে কেই-বা দুঃখ পায়! তা ছাড়া কমলেশের এখন কোনওদিকে মন ছিল না। শুধু ভাবছিল, কাল রোমি এলে ওকে কী বলবে। নিজেকে কি বড্ড বেশি ভিখারি মনে হচ্ছে?

কমলেশ উঠে আয়নার কাছে যেতে চাইল। রোবটটা ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এটাকে বিকল করে ভেঙেচুরে শেষ করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু কাল রোমি যে এটা দেখবে। কমলেশের নতুন আবিষ্কার।

কমলেশ সুন্দরীকে পাশ কাটিয়ে আয়নার দিকে এগোনোর চেষ্টা করতেই রোবটটা আগের মতো ঢং করে আঁতকে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, 'আবার দুষ্টুমি! না, কমলেশ, না—প্লিজ, ওসব আমার ভালো লাগে না। ওঃ, রূপই হয়েছে আমার যত জ্বালা!'

কমলেশ কী করবে ভেবে পেল না। শুধু বিরক্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভয় নেই, তোমার সঙ্গে ফুলশয্যা করার কোনও বাসনা আমার নেই।'

'কামনা-বাসনাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুন্দরী।

হায় রে আবিষ্কার! কমলেশ আসলে নেশার ঘোরে নিজের জন্য একটি বাঁশ আবিষ্কার করেছে।

তখনই কমলেশ টের পেল, বেশ খিদে পেয়েছে। ও দেওয়ালে টাঙানো ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকাল। লাল-হলদে-সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলজ্বল করে জানান দিচ্ছে এখন প্রায় পৌনে এগারোটা। ছুটির মা কখন আসবে?

কমলেশের ভালো লাগছিল না। ও রাস্তায় বেরোনোর জন্য তৈরি হতে লাগল। শেভ করে, জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে যখন আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে যাচ্ছে, তখন ও খেয়াল করল, সুন্দরী বেশ মনোযোগ দিয়ে ওর প্রতিটি কাজ লক্ষ করছে।

কমলেশের কেমন যেন অস্বস্তি হল। ও নেহাত কথা বলার জন্যই বলল, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। তুমি ফ্ল্যাটে একা থাকতে যেন ভয় পেয়ো না। এখুনি অবশ্য ছুটির মা এসে পড়বে।'

সুন্দরীর চোখে আলো জ্বলছিল। ও বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, বেশি দেরি কোরো না যেন।'

সুন্দরীর কথার মধ্যে এমন একটা আপন ভাব ছিল যে, কমলেশ চুল আঁচড়াতে- আঁচড়াতে থেমে গেল। রোবটটাকে দেখল। ওটা সত্যি-সত্যি লোহালক্কড়, আই. সি. চিপ আর তার-টার দিয়ে তৈরি তো!

কমলেশ আলতো গলায় বলল, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারতাম, কিন্তু...।'

'না, না, দরকার নেই।' সুন্দরী ঝটপট বলে উঠল, 'রাস্তায় বেরোলেই আবার ছেলে-বুড়োর দল আমার ওপর একেবারে হামলে পড়বে।' রোবটটা আয়নার দিকে এক পা এগিয়ে গেলঃ 'নাও, সরো, এবার একটু আয়নাটা দেখি।'

কমলেশ আর দেরি করল না। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ছুটির মা এলে কোনও অসুবিধে নেই। তার কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

একতলার সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই গুরুপদবাবুর সঙ্গে দেখা। ফ্ল্যাটবাড়ির লাগোয়া বাগানের পাশে ভদ্রলোক ছোট-ছোট পায়ে ঘুরঘুর করছেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। পরনে একই পোশাক এবং হাতে প্যাঁচালো লাঠি।

বাতাসে নতুন শীত-শীত ভাব, আকাশ মেঘলা।

কমলেশ আকাশের দিকে একবার দেখল। তারপর বলতে হয় তাই বলল, 'মেসোমশাই, রোদ চড়া হলে আপনার বেশ আরাম লাগত।'

গুরুপদ সরকার পায়চারি থামিয়ে কমলেশের খুব কাছে এসে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, জানি, রোজ ভাড়া পেলে আমার বেশ আরাম লাগত। কিন্তু তোমরাই তো ভাড়া বাকি ফেলে-ফেলে—।'

কমলেশের হঠাৎই খেয়াল হল, ভদ্রলোক কানে কম শোনেন। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ঠিক আছে, মেসোমশাই, এ নিয়ে পরে কথা হবে—' এবং হনহন করে হাঁটা দিল। নাঃ, ভদ্রলোকের জন্য একটা ফার্স্টক্লাস হিয়ারিং এইড তৈরি করে দিতে হবে।

সবকিছু আবার যেন আগের মতো লাগছিল।

রান্নাঘরে কাপ-প্লেট-চামচের টুংটাং শব্দ। রোমি চা তৈরি করছে। কমলেশ কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছোট-ছোট শব্দগুলো শুনছিল। শব্দগুলো ওকে রান্নাঘরের দিকে টানছিল। কিন্তু সামনেই চেয়ারে সুতপন বসে আছে। তাই কমলেশ আবার এলোমেলো কথা শুরু করল ওর সঙ্গে।

'তোমার নতুন টিভি সিরিয়ালের কাজ কেমন চলছে?'

আচ্ছা, ঠিক কতদিন পর রোমির হাতে চা খাবে কমলেশ? ও মনে-মনে একটা হিসেব কষতে শুরু করল।

সুতপন বেশ উৎসাহ নিয়ে ওর সিরিয়ালের কথা বলতে লাগল। তেরোটা এপিসোডের মধ্যে চারটে এপিসোডের শুটিং শেষ। তারপর...।

রোমি ওদের চা নিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে ঢুকল। ছোট টেবিল থেকে বোতল আর গেলাস আগেই সরিয়ে ফেলেছিল কমলেশ। সেটার ওপরেই চায়ের কাপ-প্লেট রাখল রোমি। টেবিলটা টেনে দিল কমলেশ আর সুতপনের মাঝে। তারপর আবার রান্নাঘরের দিকে গেল নিজের চায়ের কাপ নিয়ে আসতে।

একটু আগেই প্যাটিস খাওয়া শেষ হয়েছে। কমলেশ রোমির বারণ শোনেনি। বিকেলে বেরিয়ে 'ফ্লুরিজ'-এর প্যাটিস নিয়ে এসেছিল।

কথা বলতে-বলতে সুতপন হাসছিল। বেশ সুন্দর চেহারা ছেলেটির। ও নিজেই তো সিরিয়ালে অভিনয় করতে পারে!

রোমি চা নিয়ে এসে বিছানায় বসল। কমলেশের কাছ থেকে একটু দূরে।

সুতপন চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'কমলেশদা, আপনার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

কমলেশ কৌতূহলী চোখে সুতপনের দিকে তাকাল। সুতপন রোমিকে একবার দেখল। চোখে হাসল। তারপর বলল, 'এখনই যে-সিরিয়ালটার কথা আপনাকে বললাম, মানে, "জীবনের সুখ-দুঃখ", ওটাতে রোমি অভিনয় করছে—হিরোইন।'

কমলেশ চা খাওয়া থামিয়ে রোমিকে দেখল। মুখে তৃপ্ত আর প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। রোমির সৌন্দর্য এবার সকলে দেখবে, তারিফ করবে। কমলেশের সেই কাল্পনিক ডেথ সার্টিফিকেটের কথা মনে পড়ল। তবে তার বেশি কিছু নয়।

রোমির কাছে কমলেশ নিতান্তই সাধারণ। একটু চটাচটি হলেই ও বলত, 'তুমি নেহাতই একটা সেকেলে ছাপোষা মানুষ—শুধু একটু বিজ্ঞান জানো।'

শত চেষ্টা করেও কমলেশ রোমির ওই ডেফিনেশান পালটাতে পারেনি। আর নিজেকেও পালটাতে পারেনি। তবে ছোট্ট রিঙ্কু সবসময় ওকে আশা জোগাত। মনে হত, এই বুঝি সব আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

'কী হল, তুমি কিছু বলছ না যে!'

রোমির কথায় সামান্য অবজ্ঞার রেশ যেন টের পেল কমলেশ। ওর পরনের গোলাপি-সাদা সিল্কের শাড়ি চকচক করছে। বড় চোখে লাগছে।

কমলেশ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'এ তো খুব ভালো খবর।'

রোমি সুতপনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুতপন, দ্যাখো না, এই সিরিয়ালটায় কমলেশের কোনও টেকনিক্যাল হেল্‌প নেওয়া যায় কি না—।'

'আমি তো কমলেশদাকে ওপেন অফার দিয়েই রেখেছি—।'

কমলেশ বলল, 'না, না, আমি এখন নতুন একটা মেশিন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ওটার পেছনে তিন-চারমাস লেগে যাবে।'

কমলেশ রোমির চোখে তাকিয়েই বুঝতে পারল, ওর মিছে কথা রোমির কাছে ধরা পড়ে গেছে।

রোমি সহজ গলায় বলল, 'কালই তো তুমি ফোনে বললে কী একটা বিউটি কুইন রোবট তৈরি করেছ—।'

'সত্যি, কমলেশদা!' সুতপনের গলায় আগ্রহ।

কমলেশের ভালো লাগল। ও চাইছিল, রোমিই সুন্দরীর প্রসঙ্গ তুলুক, কমলেশের নতুন আবিষ্কার নিয়ে প্রশ্ন করুক।

যাক, ব্যস্ত হওয়ার মতো একটা কাজ পাওয়া গেল। চায়ের কাপ রেখে কমলেশ উঠে এগিয়ে গেল আয়নার কাছে। খবরের কাগজে মুড়ে সুন্দরীকে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিল ও। কাগজের মোড়ক খুলে রোবটটাকে দাঁড় করাল। তারপর সুইচ অন করে দিয়ে বলল, 'এই হল আমার নিউ ইনভেনশান—।'

সজ্ঞান হওয়ামাত্রই সুন্দরী আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সাজগোজ শুরু করল। আর সেইসঙ্গে গুনগুন করে গান ধরল, 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব—।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল পাগলপারা হাসি। রোমি খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে। শরীর বেঁকিয়েচুরিয়ে মুখ তুলে হাসছে তো হাসছেই।

সুতপনও হাসছিল, তবে অতটা শব্দ করে নয়।

কমলেশ কেমন বোকার মতো সুন্দরীর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

রোমি হাসির দমক কমিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'এই তোমার বিউটি কুইন!' তারপর আবার হাসি।

সুন্দরী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রোমির দিকে। তারপর বলল, 'কমলেশ, ওকে থামতে বলো। আমার কানে লাগছে।'

রোমি অনেক কষ্টে থামল। বলল, 'সত্যি, কী সুন্দর! যেমন চেহারা, তেমনই গলা—কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি!'

কমলেশ বিছানার কাছে এগিয়ে এল। রোমি উঠে দাঁড়াল। সুতপনও।

রোমির যা-যা নেওয়ার সবকিছু আগেই বড় একটা শপিং ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই সুতপন ঝুঁকে পড়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। হাসতে-হাসতে বলল, 'কমলেশদা, আজ একটা দারুণ জিনিস দেখালেন। আপনার হাত খালি হলে আমাদের টেকনিক্যাল হেল্প করার ব্যাপারে একটু ভাববেন কিন্তু—।'

কমলেশ ঘাড় নাড়ল।

রোমি হেসে বলল, 'তোমার এই কিম্ভূতকিমাকার বস্তুটিকে বিউটি কনটেস্টে নামিয়ে দাও—।'

সুন্দরী জোরালো গলায় জবাব দিল, 'ধন্যবাদ, আমার কনফারমেশনের দরকার নেই। আমি জানি আমাকে তোমার চেয়েও সুন্দর দেখতে—' কথা শেষ করেই আবার গুনগুন গান।

রোমির ফরসা মুখ লাল হল। ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি তা হলে লিভ টুগেদারের ভালোই সঙ্গী পেয়েছ—।'

কমলেশ চাইছিল না রোমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাক। ও বলল, 'তুমি এই রোবটটার কথায় কিছু মনে কোরো না। এটা ভীষণ উলটো পালটা বকে। বড্ড খামখেয়ালি।'

রোমি বিরক্তভাবে বলল, 'তবে তো একেবারে রাজযোটক!'

রোমি দরজার দিকে এক-পা বাড়াতেই কমলেশ প্রায় পথ আগলে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করল, 'রিঙ্কু কেমন আছে? ওকে অনেকদিন দেখিনি—।'

'এখানকার চেয়ে অনেক ভালো আছে।'

কমলেশ সুতপনের দিকে একবার দেখল। তারপর বলল, 'সুতপন, আমি রোমির সঙ্গে কয়েকটা পারসোনাল কথা বলতে চাই—।'

সুতপন ভদ্র ছেলে। রোমি কিছু বলার আগেই ও বলল, 'আমি বাইরের ঘরে আছি—' তারপর সহজ পা ফেলে বেরিয়ে গেল শোওয়ার ঘর থেকে।

ঝুলবারান্দার দরজার দিকে চোখ গেল কমলেশের। বাইরের রাত কুচকুচে কালো। সেই কালো রাত নতুন শীতের হিমেল বাতাস পাঠিয়ে দিচ্ছিল ঘরের ভেতরে।

'রোমি—।'

'বলো।'

কী বলবে কমলেশ! নিজেকে ভীষণ খাটো মনে হচ্ছে। অথচ ও তো কোনও অন্যায় করেনি! এই অপদার্থ বেঁচে-থাকা তো সাধ করে বেছে নেয়নি!

'রোমি, এভাবে আমি আর পারছি না। তোমার সব কথা আমি মেনে নেব, কিন্তু এভাবে আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না...প্লিজ...' কমলেশের কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

রোমি কোনও জবাব দিল না।

'রোমি, তুমি...রিঙ্কু...তোমরা...হয় এখানে চলে এস, নয়তো আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও। এভাবে আমি...আমি...' কমলেশের গলায় বুকে কষ্ট হচ্ছিল।

রোমি এবার কথা বলল, 'এইজন্যেই তোমার সঙ্গে কোনওরকম রিলেশান রাখা প্রবলেম। আমাদের বনিবনা হয়নি, আলাদা আছি, ঠিক আছে। কিন্তু "হ্যালো-হাই" রিলেশান রাখতে তো কোনও ক্ষতি নেই! সেটা দেখছি তোমার এই বস্তাপচা সেন্টিমেন্টের জন্যেই রাখা যাবে না। এমন ছেলেমানুষি করো না! এরপর থেকে দরকারি জিনিসপত্র যা কিছু নেওয়ার সুতপনই এসে নিয়ে যাবে—।'

কমলেশ পাথরের মতো হয়ে গেল। আর কী বলবে ভেবে পেল না। সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই! সেটাও 'তাতে কী' হয়ে গেছে! কমলেশের চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

'কমলেশ—।'

রোমি নয়, সুন্দরী ওর নাম ধরে ডেকেছে। আয়না ছেড়ে এক-পা এগিয়েও এসেছে ওদের দিকে।

'কাকে কী বলছ, কমলেশ! তোমার কথা ও বুঝবে না। ওর...ওর শুধু বাইরেটা সুন্দর। আমার সঙ্গে ওর কোনও তুলনাই হয় না। হোপলেস বেচারি হতভাগিনী—।'

আগুন জ্বলে গেল।

রোমি চিৎকার করে উঠল, 'তুমি যেমন, ঠিক সেরকম রোবটই তৈরি করেছ। এসব তোমার শয়তানি কারিকুরি। অভদ্র, ছোটলোক! আমাকে ডেকে এনে...।'

'রোমি, প্লিজ। রোমি—' কমলেশ আকুলভাবে কিছু একটা বলতে চাইল।

সুতপন হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকল ঘরে।

রোমি ধারালো চোখে একবার সুন্দরীকে দেখল, তারপর সুতপনকে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ এ-ঘর থেকেই স্পষ্ট শুনতে পেল কমলেশ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শীতের হাওয়া অনুভব করল। তারপর রবারের পা নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। ওর ভেতরে কিছু একটা হচ্ছিল। একটা বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কমলেশ বোকার মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

আর সুন্দরী শুধু অবাক হয়ে কমলেশকে দেখছিল।

অনেক...অনেকক্ষণ পর কমলেশ যেন কারও ডাক শুনতে পেল। চোখ খুলতেই দেখল, ঘর অন্ধকার। কখন লোডশেডিং হয়েছে টের পায়নি। বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে বাইরের রাত আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আর কিছুই কমলেশ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার।

'কমলেশ—।'

খুব কাছ থেকে নরম গলায় সুন্দরী ওর নাম ধরে ডাকছে।

অন্ধকারে বাঁ-হাতের কাছটায় ধাতব ছোঁয়া টের পেল কমলেশ।

সুন্দরী আবার ডাকল, 'কমলেশ—।'

একটা সুন্দর গন্ধ কমলেশের নাকে এল। ও বড় করে শ্বাস নিল। হাত বাড়াতেই এবড়োখেবড়ো শীতল ধাতুর ছোঁয়া লাগল। কমলেশের হাত আলতো করে ছুঁয়ে যেতে লাগল রোবটটার শরীর। গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়েছে। কমলেশের নেশা ধরে যাচ্ছিল। ডানহাতটা সুন্দরীর বুকের কাছটায় যেতেই ছোট্ট দরজার নবটা টের পেল।

গন্ধটা কি ওর ভেতর থেকেই আসছে?

কমলেশের মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। চোখ জ্বালা করছিল, মাথা দপদপ করছিল।

নব টেনে দরজাটা খুলে ফেলল কমলেশ।

মনে হল, গন্ধটা আরও বেড়ে গেছে। কমলেশকে নিশির মতো টানছে।

রোবটটাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে উঠে বসল কমলেশ। অনুমানে ভর করে মুখটা নিয়ে গেল খোলা দরজার খুব কাছে। বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই চোখ মেলে সুন্দরীর ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল।

'কমলেশ—।'

দরজার ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন কমলেশ নরম গলায় ডেকে উঠল, 'সুন্দরী—। তোমার ভেতরটা কী সুন্দর...!'



পিকনিকে তিনটে বিকেল

কয়েকটা ঝোপঝাড় সরিয়ে বেরিয়ে এল বিকাশ। চোখ-মুখ যেন কীরকম, চুল ছড়িয়ে গেছে কপালে। অসহায়ভাবে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে নমিতাকে দেখতে পেল। দেখে যেন ভরসা পেল। চটপট ওর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আমার সঙ্গে চল, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব।'

নমিতা খালি পায়ে ঘাসের ওপরে হাঁটছিল। দুপুরের রোদ নিস্তেজ হয়ে বিকেল এসে পড়েছে। সেইসঙ্গে ঠান্ডা বাতাস বুঝিয়ে দিচ্ছে এখন শীতের সময়। পিছনে একটু দূরে অপর্ণা, সুজিত, সমীর, নিখিল, কেয়া, মিমি, সিতি ওরা সব গাছতলায় বসে তাস খেলছে, টেপরেকর্ডার চালিয়ে ব্যাপ শুনছে। ওদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা সবুজ বেডকভার পেতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে অরুণ। ওর নাকি জ্বর-জ্বর লাগছে।

নমিতার কিছু ভালো লাগছিল না। তাই এপাশটায় এসে একা-একা পায়চারি করছিল। গঙ্গা এখান থেকে অনেক দূরে, দেখা যায় না। তবে 'নদীর কাছাকাছি আছি' ভাবলেই মনটা কেমন হয়ে যায়। অন্তত নমিতার হয়।

বিকাশ ওর খুব কাছে এসে বলল, কী রে, কথা বল—নাকি পাত্তাই দিবি না?

নমিতা মুখ তুলে বিকাশকে ভালো করে দেখল। হায় রে আমার সহপাঠী! পাত্তা দিলে তারপর যখন পাত্তা পাও তখন কেন নিজেকে সংযত করো না!

বিকাশ এমনিতে একটু গায়ে-পড়া বোধহয়। নাকি শুধু নমিতার জন্যই গায়ে পড়া? সামান্য ছুতো পেলেই বলে, নে, হ্যান্ডশেক কর।

নমিতা এড়িয়ে যায়। বলে, এসব আমি ভালোবাসি না।

বিকাশ আবার বলল, সত্যি বলছি, নমি। চল, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব—তুই লাইফে কখনও দেখিসনি।

নমিতার কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু ওই 'নমি' শব্দটা এক অদ্ভুত বিরক্তি ছড়িয়ে দিল মনে। শুধু নামটা সংক্ষিপ্ত করে ডাকলেই কি দূরত্ব সংক্ষিপ্ত হয়!

পিকনিকের প্রস্তাবে নমিতা প্রথমটায় রাজি হয়নি। কিন্তু ক্লাসের বন্ধুদের উৎসাহে শেষ পর্যন্ত আর আপত্তি বজায় থাকেনি। তার ওপর নিখিল আবার বলেছিল, দ্যাখো বস, এটাই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে আমাদের লাস্ট ইয়ার। তারপর কে কোথায় চাকরি-বাকরি নিয়ে চলে যাবে, কার কোথায় ম্যারেজ-ফ্যারেজ হয়ে যাবে—শালা, ঝট করে স্টুডেন্ট থেকে এক্স স্টুডেন্ট হয়ে যাব। না, এই লাস্ট পিকনিক—যেতে তোমাকে হবেই।

নিখিলকে নমিতার খারাপ লাগে না। সত্যিই বন্ধু। ইয়ারকি ফাজলামির সুযোগে কখনও অসভ্যতা করে না।

ক্লাসরুমে ওদের জটলার মধ্যে কখন যেন সমীর নমিতার ঠিক ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। পিঠের কাছে সামান্য ছোঁয়া পেয়েই চাবুকের মতো ঘুরে তাকিয়েছে নমিতাঃ অ্যাই, তুই আগে আমার ঘাড়ের কাছ থেকে সরে দাঁড়া।

সমীর খানিকটা অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে বলল, কেন, আমি কী করলাম? পিকনিকের ব্যাপারে তোর ওপিনিয়ানটা শুনতে এসেছিলাম শুধু...।

নিখিল চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, সমীর, আর কতদিন তোকে মাইরি বারণ করব! সবসময় দেখি তুই নমিতার গায়ের ওপরে ঝুঁকে না পড়ে কোনও কথা বলতে পারিস না। তুই কি শালা ম্যাগনেট যে, নমিতার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লেই ঢলে পড়িস?

সমীর সরে গিয়ে ইতস্তত করে কী যেন বলছিল বিড়বিড় করে। নমিতাই নিখিলকে বাধা দিল, ওসব বাদ দে। কাজের কথা বল।

তো সকলে মিলে চেঁচামেচি হইহই করে আলোচনা হল 'কাজের কথা'। পিকনিক হবে। আগামী রবিবার—ছাব্বিশে ডিসেম্বর। স্পট ভদ্রেশ্বর। মিমি আর সুজিত ভদ্রেশ্বরে থাকে। ওরাই সব খোঁজখবর করে ঠিক করে রাখবে। কার নাকি একটা বিশাল বাগান আছে—সেটাই আইডিয়াল স্পট হবে পিকনিকের।

পিকনিকে আসার জন্য অরুণও অনেকবার বলেছিল নমিতাকে। ডিপার্টমেন্টের তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দুজনে। কাছাকাছি আর কেউ ছিল না।

তুই চল। তুই না গেলে আমিও যাব না।

নমিতা অবাক হয়ে হেসেছিলঃ এরকম খ্যাপামির মানে?

তুই কি সবসময়েই শুধু মানে জানতে চাইবি? তা হলে তো আমাকে লেখাপড়া ছেড়ে তোর জন্যে একট মোটাসোটা মানেবই লিখতে হয়।

নমিতা সামান্য নীচু গলায় বলেছিল, অরুণ, এই কয়েকটা বছর আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করছি। আর ক'টা মাস মাত্র বাকি। সহজভাবে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় না?

অরুণ মাথা নামিয়ে বলেছে, আমি পারছি না। সবসময় যে তোর কথাই মনে পড়ে।

অন্য কথা ভাব, তা হলে আর মনে পড়বে না।

তুই কোনও ব্যাপারই সিরিয়াসলি নিস না কেন বল তো?

নমিতা অরুণের দিকে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য, ওর চোখ লম্বা বারান্দায় দাঁড়ানো অরুণকে দেখতে পেল না। বরং বাইরের লন থেকে বেড়ে ওঠা কদম গাছ, রাধাচূড়া আর বুলবুলি দেখল। বিকেলের রোদ কয়েকটা বিল্ডিংয়ের ফাঁক দিয়ে এসে ওদের চুমু খাচ্ছে।

নমিতা একটু চুপ করে থেকে বলল, যেটা সিরিয়াসলি নেওয়ার সেটা সিরিয়াসলি নিই। অন্য কেউ সিরিয়াস বলে বোঝাবে তারপর সেটা সিরিয়াসলি নেব—এসব থিয়োরিতে আমি বিশ্বাস করি না।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল অরুণ। বারান্দায় এখন ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। অফ পিরিয়ডে ছেলেমেয়েরা এখানে ভিড় করে, গল্পগুজব করে। আর অনেক সময় কেউ-কেউ টিফিন খায়। যেমন মিমি আর সুজিত রোজই এই বারান্দার চওড়া রেলিঙে টিফিন বাক্স রেখে ভাগাভাগি করে টিফিন খায়।

একটা ফোঁস শব্দ করে পকেট থেকে একটা ক্যাডবেরি চকোলেট বের করল অরুণ। বলল ছোট্ট করে, তোর জন্যে এনেছি।

নমিতা হাত বাড়াল না। এটা নেওয়াই যায়। কিন্তু ও জানে, নেওয়া মানেই এর একটা ভুল অর্থ খুঁজবে অরুণ। আচ্ছা, এক ক্লাসে পড়া মানেই একটা প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার থাকতে হবে! জোড় বাঁধতে হবে! শুধু সহপাঠী হয়ে দিনগুলো কাটানো যায় না?

নমিতা জানে অরুণ ব্যথা পাবে, তবু বলল, হঠাৎ ক্যাডবেরি দিচ্ছিস?

অরুণের ফরসা মুখ লাল হল। কোনওরকমে বলল, ঠিক আছে, নিস না।

এ-কথা বলেই চকোলেটটা ও ছুড়ে ফেলে দিল নীচের লনে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটা দিল, নমিতার কাছ থেকে দূরে চলে গেল।

নমিতা ভেবেছিল অরুণ বোধহয় পিকনিকে যাবে না, কিন্তু রবিবার সকালে অরুণ এল। হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে ওরা পাঁচজন দাঁড়িয়েছিল। মিমি আর সুজিতের আসার কোনও ব্যাপার নেই। ওরা পিকনিক স্পটে গিয়ে ভোরবেলা থেকেই আয়োজন শুরু করে দেবে। আর কেয়া শ্রীরামপুরে থাকে। ও বলেছে আমি আর উলটোদিকে আসব না, সোজা সুজিতদের বাড়ি চলে যাব। তারপর স্পটে দেখা হবে।

সিতিকণ্ঠ তখন ফোড়ন কেটেছিল, হ্যাঁ, সেই ভালো, গাছপালা ঘেরা উপবনে দেখা হবে ভালোবাসা বেদনায়।

সুজিতের সম্পর্কে কেয়ার একটু দুর্বলতার ব্যাপার আছে। সেটা সবাই জানে, কিন্তু কিছু করার নেই। সিতিটা একটু ঠোঁট কাটা। ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ফস করে বলে বসল, অ্যাই, যদি মিমির আজকে জ্বর-টর হয়, যেতে না পারে, তা হলে কেয়া তো গোল করে দেবে।

অন্য অনেকে হেসে উঠল, কিন্তু নমিতা হাসতে পারল না। মানুষের অনেক সত্যিকারের ব্যথার জায়গা থাকে। ও শুধু বিরক্তভাবে বলল, সিতি, সবকিছুর একটা লিমিট আছে।

সিতি বলল, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু ভালোবাসার কোনও লিমিট নেই, সোনা। তুমি জানো না বুঝি? এখন ছোট তো, বড় হলে বুঝতে পারবে।

সিতির বলার ঢঙে প্রায় সবাই হেসে উঠল। আর তখনই নিখিল আর অরুণকে দেখা গেল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা হস্টেলে থাকে, রুমমেট। তাই একসঙ্গে এসেছে।

নিখিল বলল, অ্যাই, অরুণের মাইরি বেশ জ্বর হয়েছে। আমি বারণ করলাম, শুনল না। বলল, না, পিকনিকে আমি যাবই।

অরুণের গায়ে মোটা চাদর। চোখ একটু লাল, ছলছল করছে।

ওকে দেখে নমিতার মায়া হচ্ছিল। কাছে গিয়ে বলল, জ্বর নিয়ে এলি কেন?

তোর জন্যে।

নমিতা আর কোনও কথা বলল না। এই হচ্ছে মুশকিল। বন্ধু হিসেবে যদি স্বাভাবিক উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা হয় তা হলেও সেটার ব্যাখ্যা করা হবে অন্য সম্পর্ক দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে হইহই করে এগোল দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। বিকাশ গেল টিকিট কেটে নিয়ে আসতে।

চলতে-চলতে সমীর কখন যেন নমিতার কাছে এসে গিয়েছিল। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, আজ তোকে বিউটিফুল লাগছে।

নমিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হতবাক হয়ে। তারপরই এক ধাক্কায় কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে শাসনের গলায় বলেছিল, আমার সঙ্গে এসব অসভ্যতা কখনও করবি না। আমি কিন্তু এখান থেকেই ফিরে যাব—পিকনিকে যাব না।

নিখিল আর সিতি এগিয়ে এল সমীরের কাছে। সিতি বলল, সমীর, কী হচ্ছে! তুই দেখছি পিকনিকের মুডটাই একেবারে জন্ডিস করে দিবি!

সমীর মিনমিন করে বলল, না রে, আমি তো কিছু করিনি...মানে...।

নিখিল হাত-পা নেড়ে বলে উঠল, ওসব মানে-টানে আমাদের বুঝিও না, বাপ! শুধু জোড়হাত করে বলছি, তোমার ওই নমিতা-স্পেশাল ম্যাগনেটিক প্রপার্টিটা আজকের দিনটার জন্যে লক-আপে ভরে রাখো, কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে আবার শান দিয়ে বের কোরো।

সমীর তখনও কোনওকিছু না বোঝার ভান করে বোকা-বোকা হাসছে।

এমন সময় বিকাশ টিকিটগুলো এনে নমিতার হাতে দিল। ওর আঙুলের ছোঁয়া টের পেল নমিতা। বিকাশ সমীরের মতো বেহায়া নয়। আবার অরুণের মতো চুপচাপও নয়। ও যে ঠিক কী চায় নমিতা বুঝতে পারে না। ওর সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যেতে চায়। কেমন যেন পাগল-পাগল লাগে।

ট্রেনে উঠেই পাগলটার কথা আবার মনে পড়ল নমিতার। ওর ছোটকাকার বন্ধু। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। মোটরবাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াত দিনরাত্তির। একটা বিয়েবাড়িতে আলাপ হওয়ার পরই বলেছিল, আপনি আমার চেয়ে একযুগ ছোট।

নমিতার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিলঃ এক যুগ মানে?

মানে আর কী, সিম্‌প্‌ল ম্যাথামেটিক্স—মানে বারো বছরের ছোট।

তারপরই গলা ছেড়ে হাসি।

দেখতে-দেখতে কী যে হল, নমিতার সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ওকে দু-তিন দিন না দেখলেই খারাপ লাগত। অফিসের কাজে মাঝে-মাঝেই ট্যুরে যেতে হতো ওকে। তখন এস. টি. ডি. করে কথা বলত নমিতার সঙ্গে। তা ছাড়া এমনি ফোন তো ছিলই। কথা বলতে কী যে ভালোবাসত পাগলটা! ওর কথাগুলো নমিতার মনে পড়ছিল বারবার। আর ঠান্ডা বাতাস ট্রেনের জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে চোখেমুখে আদর করছিল।

নমিতা, জানো, একটা পাগল তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে?

আবার একদিন ফোন করে বলে, এখন কী পরে আছ—শাড়ি না ম্যাক্সি?

কিংবা আর কোনওদিনঃ তুমি আমার ভালোবাসার বালিকা। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল তক, আপাদমস্তক, তোমায় ভালোবাসি।

অথবাঃ এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, তোমাকে একবার না দেখে জলস্পর্শ করব না।

একদিন হঠাৎই পাগলটা রাত সাড়ে ন'টায় মোটরবাইক নিয়ে নমিতার বাড়িতে এসে হাজির। সে কী হেনস্তার ব্যাপার! কী লজ্জা! নমিতাকে ডেকে বলে কি না, কী করব বলো, একবার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করল যে!

নমিতাকে পিছনে বসিয়ে বেপরোয়া বাইক চালাত পাগলটা। হাওয়ায় চুল উড়ত দুজনের, নমিতার আঁচল উড়ত। কিছু বলতে গেলে বলত, একটাই তো জীবন, ম্যাডাম। তাই কেতায় বাঁচার

চেষ্টা করছি।

এইভাবে বোধহয় আটমাস আর কয়েকটা দিন কেটেছিল। তারপরই, হঠাৎ একদিন, পাগলটা উধাও হয়ে গেল। তিনদিন চারদিন কেটে গেল ফোন করে না, আসে না। এসে বলে না, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

ছোটকাকাকে বলে-কয়ে খবর নিতে রাজি করিয়েছিল নমিতা। পাঁচদিনের দিন রাতে খবর পাওয়া গেল। মোটরবাইক অ্যাকসিডেন্টে সব শেষ। ধূপকাঠি আর ফুলের মালার কাছে হার মেনেছে বেপরোয়া পাগলটা। ও কেতায় বাঁচতে চেয়েছিল।

প্রায় তিনদিন ধরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল নমিতা। চারপাশটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সঙ্গী ছিল ঘুমের ওষুধ আর রাতজাগা চোখ। তখন প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওর কান্না পেত। টেলিফোন বেজে উঠলে কান্না পেত। ম্যাক্সি পরলে কান্না পেত।

পাগলটা একদিন হাসতে-হাসতে বলেছিল, তোমার কথা ভেবে-ভেবে মরি, মরে গিয়েও তোমার কথা ভাবি।

এখন কি সত্যিই ও নমিতার কথা ভাবছে?

এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দিয়ে দেড়বছর কেটে গেছে। অন্য একটা নমিতা যেন দূর থেকে এই বিষণ্ণ নমিতাকে দ্যাখে। আর ভাবে, বাঁচতে হবে। পাগলটা বলত, বাঁচাটাই আসল, নমিতা, মৃত্যুটা ফাঁকি।

পাগলটার কথা নমিতার সহপাঠীরা কেউ স্পষ্ট করে জানে না। নমিতাও জানাতে চায়নি কখনও।

পিকনিকের রান্নাবান্না হইহুল্লোড় নাচগানের মধ্যে নিজেকে জোর করে মিশিয়ে দিতে চাইছিল নমিতা। কিন্তু কী করে যেন তাল কেটে যাচ্ছিল।

সুজিতের নিয়ে আসা টেপরেকর্ডারে 'চড় গয়া উপর রে, অটরিয়ামে লোটন কবুতর রে, গুটুর-গুটুর' বাজছিল আর অপর্ণা অদ্ভুতভাবে শরীর দুলিয়ে নাচছিল।

বিশাল বাগানের গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে কখন যেন সুজিত আর মিমি হারিয়ে গিয়েছিল। কেয়া আর নিখিল খুঁজতে যাবে বলে রওনা হচ্ছে, ঠিক তখন সিতি মেয়েলি গলায় বলে উঠল, পিকনিকে এসে জোড়ায়-জোড়ায় হারিয়ে গেলে খুঁজতে নেই, সোনা। তোমরা এখন ছোট তো, বড় হলে বুঝতে পারবে কেন খুঁজতে নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে হাসির হররা ছুটল খোলা বাগানে।

অরুণ বারবারই নমিতাকে দেখছিল। আর সমীরও নানান ছুতোনাতায় নমিতার আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। বিকাশ পাখি দেখছিল, গাছের পাতা কুড়োচ্ছিল। মাঝে-মাঝে নমিতার কাছে এসে

ডাকছিল, চল না, গাছপালার মধ্যে একটু ঘুরে আসি।

নমিতা যায়নি। ও দল থেকে সরে গিয়ে ঘাসপাতার ওপরে হাঁটছিল। পাগলটার কথা মনে পড়ছিল আবার। ওদের থেকে কত আলাদা ছিল! নমিতাকে একদিন বলেছিল, ম্যাডাম, ভগবান যে সাংঘাতিক দয়ালু সেটা কী করে বোঝা যায় জানো?

কী করে? অবাক নমিতা জিগ্যেস করেছিল।

বাঁচার জন্যে যে-তিনটে জিনিস সবচেয়ে জরুরি, ভগবান সেই তিনটে জিনিসই বিনি পয়সায় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কী জিনিস?

জল, বাতাস আর ভালোবাসা।

তারপরই খোলামেলা হাসি।

নমিতার কিছুই ভালো লাগছিল না। তবে বিকাশের কথায় ওর সামান্য কৌতূহল হচ্ছিল। মনটাকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য ও বিকাশের সঙ্গে যেতে রাজি হল। বলল, চল, কী দেখাবি...।

গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে এগোতে-এগোতে বিকাশ পকেট থেকে একটা সুন্দর চাবির রিং বের করল। নীল রঙের মোল্ডেড প্লাস্টিকের চাকতি থেকে তিনটে ছোট-ছোট রিং ঝুলছে। তাতে চারটে চাবি।

চাবির রিংটা নমিতাকে দেখিয়ে বিকাশ বলল, এটা ভালো করে দ্যাখ।

নমিতা দেখল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না বিকাশ কী বলতে চাইছে।

বিকাশ বলল, এটা আমার চাবির রিং। আমার পকেটে ছিল। আমি একটা জায়গায় ঘুরে আসতেই এটা তিনটে হয়ে গেল।

কথাটা বলেই পকেট থেকে হুবহু একইরকম আরও দুটো চাবির রিং বের করল বিকাশ। নমিতা অবাক হয়ে দেখল। সত্যি, কোনও তফাত নেই! কেউ যেন কোনও আশ্চর্য জেরক্স মেশিন দিয়ে চাবির রিংটাকে কপি করে দিয়েছে।

দুটো হেলে পড়া আমগাছের পাশ দিয়ে ওরা বাগানের আরও নির্জন অংশে চলে গেল। সেখানে শুধু নারকেল আর সুপুরি গাছ। কিন্তু তার মাঝখানটায় খানিকটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। সেখান থেকে ওপর দিকে তাকালে গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলোকে মন্দিরের চূড়ার মতো মনে হয়।

একবার পিছনদিকে তাকাল নমিতা। অনেক দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিখিল, কেয়া ওদের দেখা যাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে ইটের উনুন, এঁটো বাসনপত্র আর শালপাতার থালা। সেগুলো ঘিরে কয়েকটা কাক আর কুকুর।

নমিতা টেপরেকর্ডারের গানের মিহি গুনগুন শব্দ শুনতে পেল এতদূর থেকেও। আর ঠিক তখনই ওর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

কারণ, ওর কানের কাছে মুখ এনে বিকাশ হঠাৎই বলে উঠেছে, নমি, বল তো আমি কে?

নমিতা থতমত খেয়ে বিকাশকে দেখল। কিন্তু ভয় পেল না। বিকাশের সাহস কখনও বিপদসীমা ছাড়াতে পারে না।

কিন্তু নতুন ধরনের একটা গুনগুন শব্দ ওর কানে এল। অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল নমিতা। গাছে ঘেরা ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় কেমন যেন একটা ভারী বাতাবরণ। বাতাস নড়ছে খুব ধীরে। আর তারই মধ্যে কোনও অলৌকিক গুনগুন।

বিকাশ আবার জিগ্যেস করল, বল তো, আমি কে?

নমিতা অস্বস্তি কাটিয়ে বলে উঠলঃ যাঃ, ইয়ারকি মারিস না, বিকাশ—।

বল না, আমি কে? এবার বিকাশের গলাটা অনুনয়ের মতো শোনাল।

নমিতা জোর করে হাসলঃ তুই বিকাশ।

হাসিস না। আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেছে। এই জায়গাটায় ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই দেখি আমি...।

কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে আরও দুটো বিকাশ বেরিয়ে এল ওদের সামনে। ওই দুজন বিকাশের মুখেও কেমন বিমূঢ় ভাব। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রোদের কয়েকটা তির এসে পড়েছে ওদের মুখে, গায়ে।

নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আর্ত গলায় তিনজন বিকাশ বলে উঠল, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমাদের মধ্যে কে আসল আর কে জেরক্স কপি।

মৌমাছির গুঞ্জনের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছিল। ওদের কথাগুলো কেমন যেন অপার্থিব প্রতিধ্বনির মতো শোনাল নমিতার কানে। ওদের ঘিরে থাকা গাছগুলোর পাতা অস্বাভাবিকভাবে নড়ে উঠল বাতাসে। অদ্ভুত এক আলোর রেখা ছায়াঘেরা মাটিতে আঁকিবুকি টেনে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল নিমেষে। আর গুনগুন শব্দটাও থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।

নমি, আমি এখন নিজেকেই চিনতে পারছি না। আমার অবস্থা এখন এই চাবির রিংটার মতো।

কেমন যেন হাহাকারের সুর ভেসে উঠল বিকাশের গলায়।

সমীর আর অরুণের কথা মনে পড়ল নমিতার। এই রহস্যে ঘেরা জায়গাটা থেকে বেরোলেই কি একটা নমিতা তিনটে নমিতা হয়ে যাবে? তখন আসল নমিতাকে খুঁজে পাবে না কেউ। বিকাশ, সমীর আর অরুণ—প্রত্যেকেই একজন করে নমিতা পেয়ে যাবে। ওরা সবাই ওদের মতো করে সুখী হবে। আর আসল নমিতার মন শুধু পাগলটার কথা ভাববে। পাগলটার কথা ভাববে।

ঘরে ফেরা পাখির ডাক শুনতে পেল নমিতা। মাথার ওপর চোখ তুলে তাকাল। নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা গেল। ভিনগ্রহ থেকে কেউ এই অলৌকিক জেরক্স মেশিন নিয়ে আসেনি তো! যা দিয়ে যে-কোনও জিনিসের জেরক্স কপি করা যায়!

আবার তিনজন বিকাশের দিকে তাকাল নমিতা। বিকেলের মরা রোদ ওদের চোখে-মুখে। তিনজন বিকাশ অসহায়ভাবে তিনটে বিকেল দেখছে।



ধূমকেতু যখন আসে

মধুময় রাতের আকাশ দেখছিলেন। কালো পরদায় কাচপোকা টিপ হয়ে জ্বলছে।

চন্দ্র, গ্রহ, তারা, নীহারিকা। তারই মাঝে একটি আকর্ষণীয় উজ্জ্বল বিন্দু—ধূমকেতু সুইফ্ট-টাটল। খালি চোখে ওটাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধেই নেই। এখনকার হিসেবমতো আর পাঁচবছর পরেই, ২১২৬ সালের ১৪ আগস্ট, এই বেপরোয়া ধূমকেতু এসে পৌঁছবে পৃথিবীর কক্ষপথে। তারপর সেকেন্ডে ষাট কিলোমিটার বেগে ছুটে চলা দু-কোটি মিলিয়ন টন ওজনের বস্তুটির সঙ্গে সংঘর্ষ হবে এই প্রাচীন পৃথিবীর। ব্যস, সব গল্প শেষ। শেষ হয়ে যাবে দিন-রাতের খেলা।

'দাদাভাই, কোনটা? ওইটা—ওই যে হলদে বলের মতন?'

টুবুনের দিকে ঘুরে তাকালেন মধুময়। কিশোর মুখমণ্ডলে চাঁদের আলো পড়েছে। কী নিষ্পাপ দেখাচ্ছে! চাঁদের আলো কি পাপ ধুয়ে দেয়?

খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে মধুময়ের শীত-শীত করছিল।

এখন অঘ্রাণের শুরু। হানাদার বাতাস পাতা খসানোর কাজ করে চলেছে গোপনে। মধুময়ের সাদা চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আর জ্যোৎস্না সেই ফিনফিনে সাদা সুতোয় খেয়ালখুশি মতো নকশি-কাঁথা বুনে চলেছে একমনে।

মধুময় স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো টেলিস্কোপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে নাতিকে কাছে ডাকলেন, 'এখানে আয়, এই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখ। আরও স্পষ্ট দেখা যাবে—।'

টুবুন দাদুর কাছে এগিয়ে এল। টেলিস্কোপের ঘষা কাচের পরদায় চোখ রাখল। একটু দেখেই বলল, 'ওরে ব্বাবা, শুধু আলো আর কালো-কালো ফুটকি। এটাই কি ধূমকেতু, দাদাভাই?'

'হ্যাঁ।' আকাশের দিকে চোখ রেখে মধুময় বললেন, 'আর পাঁচবছর পর। তোমার বয়েস যখন উনিশ বছর হবে, তখন ওই ধূমকেতুটা পৃথিবীকে এসে ধাক্কা মারবে।'

টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে টুবুন জিগ্যেস করল, ‘কী হবে তখন?’

আকাশের দিকে আনমনা চোখে তাকিয়ে মধুময় বললেন, ‘সব ধ্বংস হয়ে যাবে—।’

‘বাঃ রে, কেউ পৃথিবীটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না? ধূমকেতুটাকে সামান্য ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই হয়—ওটা পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।’

‘এত বছর ধরে সবাই সেই চেষ্টাই করছে রে। আমিও করছি। এতদিনের পৃথিবীটা নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে এটা কেউ সইতে পারে!’

মধুময়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই দীপান্বিতার গলা শোনা গেল, ‘বাবা, আপনার ফোন।’ তারপর একটু থেমেইঃ ‘টুবুন, নীচে এসো। ঠান্ডা লেগে যাবে। এমনিতেই তো সারাটা দিন খকখক করে কাশছো—।’

ছাদের সিঁড়ির মুখে দীপান্বিতা ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলো ও খারাপভাবে বলেনি। কিন্তু তবুও মধুময় যেন অতৃপ্তির ছোঁওয়া টের পেলেন।

টুবুনকে নিয়ে দীপান্বিতা নীচে নেমে গেল। সিঁড়িতে যে পায়ের আওয়াজ উঠল তার মধ্যে কি বাড়তি শক্তি ছিল? নাকি শোনার ভুল?

অন্ধকার সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন মধুময়। বাল্‌বটা কেটে গেছে আজ প্রায় দিনদশেক। কিন্তু এখনও পালটানো হয়নি। অঞ্জনের সময় হয়নি। নিজের ব্যাবসা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত ও। টুবুনের পড়াশোনা নিয়েও বসতে পারে না কখনও। এই নিয়ে দীপান্বিতার সঙ্গে অঞ্জনের মাঝেমধ্যেই কথাকাটাকাটি হয়।

টেলিফোনটা অঞ্জনদের বসবার ঘরে। বাড়িটা এখনও মধুময়েরই নামে। কিন্তু তবুও কী করে যেন ঘরগুলোর নাম ‘অঞ্জনদের বসবার ঘর’, ‘টুবুনের পড়ার ঘর’, ‘দীপান্বিতার রান্নাঘর’, এইরকম হয়ে গেছে। এমনকী বারান্দা, অলিপথ, একফালি উঠোন—সবজায়গাতেই বেহিসেবিভাবে কেউ যেন ভাগাভাগির পাঁচিল তুলে দিয়েছে।

বসবার ঘরে পা দিয়েই মধুময় দেওয়াল-ঘড়িতে ন’টার মিষ্টি ঘণ্টা শুনতে পেলেন।

রোজকার সবকিছুই যদি এরকম মিষ্টি হতো!

বসবার ঘরে ঢুকে দেখলেন, অঞ্জন পারসোনাল কম্পিউটারে বসে ব্যাবসার হিসেবপত্র বা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে ব্যস্ত। সবসময় হিসেব নিয়েই থাকে ও। মাঝে-মাঝে মধুময় অবাক হয়ে ভাবেন। এই কি তাঁর একমাত্র পুত্র! একেই কি পাখির মতো মমতায় তিনি আর অঞ্জলি এই এত্তটুকুন থেকে বড় করে তুলেছিলেন! আঃ, যদি অঞ্জলি আজ থাকত কী কষ্টই না পেত! এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যই অঞ্জলি একযুগ আগে ছবি হয়ে গেছে। ওর গলায় শুকনো ফুলের মালা দোলে।

বসবার ঘরের এক কোণে কম্পিউটার, আর তার বিপরীত কোণে ভিডিয়োফোন। ঘরের দেওয়ালের সর্বত্র অঞ্জন, দীপান্বিতা আর টুবুনের ছবি। অঞ্জলি সেই কবেই চালান হয়ে গেছে মধুময়ের একতলার এক কোণের ঘরের আস্তানায়। রোজ রাতে শোওয়ার আগে মধুময় অঞ্জলির ফটোর সঙ্গে কথা বলেন।

'জানো, আর পাঁচবছর পরে পৃথিবীর দারুণ বিপদ আসছে। এখন থেকে চেষ্টা না করলে সব শেষ হয়ে যাবে।'

ফিকে হয়ে আসা রঙিন ফটোয় অঞ্জলির ভুরু ধনুকের মতো বেঁকে গেলঃ 'কেন গো? তুমি, খোকা, টুবুন, দিপু...তোমরা খুব সাবধানে থেকো।'

মধুময় হাসেন। বিষণ্ণ হাসি। ওঁর বলতে ইচ্ছে করলঃ 'অঞ্জ, কিছুই আর আগের মতো নেই। সব পালটে গেছে।'

তারপর মধুময় ওকে বলেছেন সুইফ্ট-টাটল-এর কথা।

সেই কোন ১৮৬২ সালে দুই মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিউইস সুইফ্ট আর হোরেস টাটল এই ধূমকেতুটিকে প্রথম লক্ষ করেন। খালি চোখেই পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখতে পেয়েছিল—এখনকার মতন। লোকে এই ধূমকেতুটির নাম দিয়েছিল 'গ্রেট কমেট অফ ১৮৬২'। পরে তার নাম রাখা হয় 'সুইফ্ট-টাটল'—ওই দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামে।

কে জানত, কালক্রমে এই ধূমকেতুই ডেকে আনবে পৃথিবীর শেষ দিন!

ভিডিয়োফোনে সীতাংশুর ছবি। সীতাংশু রায়। দুঁদে উকিল। মধুময়ের একরকম বন্ধুর মতো। মধুময় জানেন সীতাংশু কেন ফোন করেছেন।

'কী খবর, সীতাংশু?' ভিডিয়োফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেন মধুময়।

সীতাংশু হাসলেন। বললেন, 'খবর আর কী! এখন তো উকিলদের শ্বাস ফেলার সময় নেই। পাঁচবছর পর দুনিয়া খতম হয়ে যাবে, সেই ভেবে সবাই খালি উইল করছে। ভাবছে, সম্পত্তি ভোগ করার জন্যে ওয়ারিশ বহাল তবিয়তে দিব্যি বেঁচে থাকবে।' হো-হো করে হেসে উঠলেন সীতাংশুঃ 'এই তুই যেমন ভাবছিস।'

মধুময় হাসলেন না। বললেন, 'আমার লেখাটা তুই পড়েছিস?'

'হ্যাঁ, পড়েছি। তোর লেখা দেখে একটা খসড়া উইল আমি দাঁড় করিয়েছি। ওটা পড়ে আমাকে গ্রিন সিগন্যাল দিলেই আমি সবকিছু ফাইনাল করে দেব।'

মধুময় সামান্য আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। ভিডিয়োফোনের পাশে রাখা শো-কেসের কাচে ছেলের আবছায়া প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। অঞ্জন এই মুহূর্তে আর কম্পিউটারে কাজ করছে না। মধুময়ের কথা শুনছে, ওঁকে লক্ষ করছে।

গত ক'দিন ধরেই বাড়ির অবস্থা থমথমে। মধুময় সবই বোঝেন। কী করে যেন ওঁর উইল করতে যাওয়ার ব্যাপারটা দীপান্বিতা অথবা অঞ্জন জেনে গিয়েছিল। তারপর থেকেই ওদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। সীতাংশুর টেলিফোন এলেই ওরা আর সহজ-স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

গত কয়েকমাস ধরেই এগিয়ে আসা ধূমকেতুর কক্ষপথ যথেষ্ট খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন মধুময়। তাঁর টেলিস্কোপের ব্যাস মাত্র সাড়ে ছ'-ইঞ্চি। কিন্তু কার্ল জাইসের নিখুঁত লেন্স—চন্দ্র, গ্রহ, তারা কী স্পষ্ট দেখা যায়!

মধুময় কলকাতার একটি জ্যোতির্বিদ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। সংস্থার সাপ্তাহিক মিটিং-এ এই ভয়ংকর ধূমকেতুকে ধ্বংস করার নানান পরামর্শ দেন তিনি। সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থা এই সঙ্কট নিয়ে ভাবছে। ধূমকেতুকে ঘিরে ধ্বংসের কতরকম যে কুসংস্কার আছে! সেগুলো কি এবার সত্যি হতে চলেছে?

মধুময় কথা বলা শেষ করে ভিডিয়োফোনের সুইচ অফ করতেই অঞ্জন ডেকে উঠলঃ 'বাবা!'

মধুময় ছেলেকে দেখলেন। ওর ঘাড়ের কাছে চুলগুলো কেমন খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে। উদ্ধত ঘোড়ার কেশরের মতো।

'কিছু বলবি?'

'উইল কি না করলেই নয়?'

মধুময় ধাক্কা খেলেন। এই প্রথম বুঝি সরাসরি সংঘর্ষ হতে চলেছে। দুটি মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কের কক্ষপথের কাটাকুটি খেলা। কিছুতেই কি এই সংঘর্ষ এড়ানো যায় না?

'খোকা, আমার উইলে তোর কোনও ক্ষতি হবে না। শুধু মাইকেলনগরের বাগানটুকু আমি মানমন্দির করার জন্যে আমাদের সোসাইটিকে দান করে যেতে চাই। তা ছাড়া—।'

অঞ্জন ক্ষিপ্র হাতে চোখের চশমা খুলে এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি আর শুনতে চাই না, বাবা! তুমি সারা পৃথিবীকে ধূমকেতুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে খেপে উঠেছ, অথচ নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারছ না।' একটু থেমে চোখ নামাল অঞ্জন। চাপা অভিমানের গলায় বলল, 'আমি এতদিন কিছু বলিনি। জানতাম না, মানুষ এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে—।'

অঞ্জলি! শুনতে পাচ্ছ, খোকা কী বলছে! মধুময় ডুকরে উঠলেন মনে-মনে। একযুগের ভাত-কাপড়ের ঋণে তিনি কি খোকার কেনা জনম্‌দাস হয়ে গেছেন! ওঁর যে বড় আশা ছিল, যে-কোনও দিন, যে—কোনও দিন, খোকা আবার ছোটবেলার মতো হয়ে যাবে। এখনকার টুবুনের মতো। অঢেল কৌতূহল থাকবে, কিন্তু লিপ্সা থাকবে না।

এতদিন পর্যন্ত বড় প্রত্যাশা নিয়ে সেই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন মধুময়। স্থির প্রতিজ্ঞায় নিজের কক্ষপথে পরিক্রমা করে গেছেন অবিরাম। কিন্তু...।

মধুময়ের শরীরে এক অদ্ভুত জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কানে এল, পাশের ঘরে দীপান্বিতা রুক্ষভাবে টুবুনকে ধমকাচ্ছে। টুবুন কি ফুঁপিয়ে কাঁদছে? মধুময়ের কানে সবরকম শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছিল, জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছাদে ফিরে এলেন মধুময়। প্রত্যাশাহীন অবাঞ্ছিত এক বৃদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। যে গ্রহ-তারা চেনে, অথচ আত্মীয়দের চিনতে পারে না। মধুময় অবাক চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। গ্রহ-তারা-নীহারিকা বয়েসে কত প্রাচীন! কত প্রাচীন ওদের সংসার! কিন্তু তবুও ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এতটুকু কমে না। কী অনুগতভাবে ক্রমাগত ঘুরে যায় কক্ষপথে! সময়ের ঘড়ি ওদের এই টানে ক্ষয় ধরাতে পারে না।

ক্লান্ত মধুময় রাতের আকাশে উজ্জ্বল সুইফ্ট-টাটলকে দেখলেন। ভাঙাচোরা গলায় বললেন, 'তুই ছুটে আয়। আমার দিকে ছুটে আয়!' বাঁ-হাতে নিজের বুকে কয়েকবার আলতো আঘাত করে বৃদ্ধ বলে উঠলেনঃ 'আমি তোর জন্যে বুক পেতে অপেক্ষা করব।'

শুধু কালো রাত আর ঠান্ডা বাতাস মধুময়ের হাহাকার শুনছিল।



চিত্রার অদৃশ্য মৃতদেহ

আসুন, আমার বউ চিত্রার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ওই যে, সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেশ জোরালো গলায় গান গাইছে। গানে সুর নেই বটে, কিন্তু কথা তো আছে! কথা হল চিত্রার সবচেয়ে প্রিয়। দিনে কম করে আড়াই লক্ষ শব্দ উচ্চারণ করে এই রমণী। বোধহয় আগের জন্মে শালিখ কিংবা চড়ুই ছিল।

চিত্রার শরীরের যৌবন আছে। বড় বেশিরকম যৌবন। গায়ের রং মাজা। মুখের শ্রী মাঝারি। যখন, প্রায় এক যুগে আগে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তখনও ওর চেহারা একইরকম ছিল। না, ভুল ভেবেছেন—ভালোবেসে আমাদের বিয়ে হয়নি। বরং বলা যায়, ওই ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল প্রয়োজন থেকেই।

আমরা দুজনে সরকারি আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখতাম। তখন চিত্রা একটু বেশি আহ্লাদি আর গায়ে-পড়া ছিল। ওকে দেখে আমার সবসময়েই মনে হতো, সন্তান উৎপাদনের বকযন্ত্র। কথাটার আদৌ কোনও মানে হয় কিনা জানি না, কিন্তু মনে যে হতো সেটা সত্যি। অথচ বিয়ের পরে জেনেছিলাম চিত্রা বন্ধ্যা বসুন্ধরা।

দারুণ নম্বর পেয়ে পাশ-টাশ করার পর বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ পেলাম। এরকম স্বপ্ন আমার একটু-আধটু ছিল। কিন্তু যাতায়াতের প্লেনভাড়া জোটানোর ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। কোত্থেকে টাকা পাই? ঠিক তখনই সহপাঠী অতনু একটা মতলব শোনাল। বলল, চিত্রার বাবা নাকি জামাই খুঁজছেন।

প্রথমটা আমার লজ্জা করেছিল। অনেক নীতি-ফিতি ছিল ছোটবেলা থেকে। কিন্তু বেশ মনে আছে, কয়েকটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। মনের মধ্যে রোজই চলত লড়াই। উচ্চাশা আর

নীতির দাঁত-নখ লড়াই। আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত কে জিতবে। উচ্চাশাই জিতল। চিত্রার বাবার কাছে মাথা জমা দিয়ে বিদেশে গেলাম। না, আমি একা নয়, সঙ্গে ছিল আমার নতুন বউ চিত্রা।

কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর পর থেকেই চিত্রার ছবি আঁকার শখ মিটে গিয়েছিল। তার বদলে ওর নিত্যনতুন শখ গজাতে লাগল। দেশ বেড়ানো, সেলাই, মডেলিং, হাতের কাজ, আরও সব কতরকম কিম্ভূত শখ। আমি যখন মনপ্রাণ দিয়ে ছবি আঁকতাম তখন চিত্রা কানের কাছে ওর নতুন শখের বৃত্তান্ত বকবক করে যেত। আমার তুলির টান ভ্রষ্ট হতো। নিবিড় মনোযোগ নষ্ট হতো। কিন্তু ক্রীতদাস আমি কী-ইবা করতে পারি। সহ্য করাটাই যে আমার একমাত্র গুণ।

বিদেশ থেকে দেশে ফিরে বছর গড়াতে লাগল, আর চিত্রার কথাও বাড়তে লাগল সমানুপাতিক হারে। এ ছাড়া আমার প্রতিটি ছবির প্রথম সমালোচক হল চিত্রা। সাদা ক্যানভাসে তুলির প্রথম আঁচড়ের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কানের কাছে শুরু হয়ে যেত ওর সমালোচনার ধারাবিবরণী। এ যে কী অসহ্য যন্ত্রণা! এমনও হয়েছে, আমার অজান্তে আমার অসমাপ্ত ছবিতে নিজের খুশিমতো বেশ কিছু রদবদল করে দিয়েছে চিত্রা। তারপর ভোরবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বুক অসভ্যভাবে উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বলেছে, এবার ছবিটা অনেক বেটার দেখাচ্ছে না। আমি ছোট্ট করে ‘হুঁ’ বলে চুপ করে থেকেছি। কিন্তু মাথার ভেতর তখন টগবগ করে রক্ত ফুটছে।

গত বারোবছর তিনমাস সময়ের মধ্যে চিত্রার অন্তত সতেরোটা ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছি আমি। কখনও ওর পরনে চটুল পোশাক, কখনও-বা পোশাকহীন নিরাবরণ। কিন্তু একটা ছবিও ওর পছন্দ হয়নি। কারণ, ওর মতে ছবিগুলোতে হয় ওর ব্যক্তিত্ব ফোটেনি, কিংবা ওর চোখের অতলান্ত গভীরতা ধরা পড়েনি, নয়তো ওর সুললিত যৌবনের কোমলতা অনুপস্থিত।

হ্যাঁ, আমি জানি, ছবিগুলো ওর মতো হয়নি। কারণ, তুলির প্রথম টান শুরু করার পর থেকেই আমার বুকের ভেতরে দাস-মনোবৃত্তি তোলপাড় করত। মনে হতো, একটা শেকল বাঁধা জানোয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে। তখন ওই বিকৃত মনের অবস্থায় যে-ছবি আমি আঁকতাম তাতে চিত্রার ঠোঁটজোড়া হতো বিশাল, চোখে থাকত শয়তানি, আর শরীরে ঝরে পড়ত পাশবিক কামনা।

এখন আমার ছবি বেশ ভালোই বিক্রি হয়। শিল্পী হিসেবেও আমার নাম-ডাক হয়েছে। ইচ্ছে করলে এবং চেষ্টা করলে চিত্রার বাবার দেওয়া সেই প্লেনের টিকিটের দাম এখন আমি সুদসমেত শোধ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। চিত্রা তো থাকবে আমার কাছেই, শোবে আমার সঙ্গে, আমার প্রতিটি তুলির টানের কুৎসিত সমালোচনা করবে, নিজের বীভৎস সব শখ নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাবে, আর আমার কানের পরদা কেঁপে যাবে অবিরাম। এইভাবে চিত্রার শব্দদূষণে ক্রমাগত ডুবে যাব আমি। শেষ পর্যন্ত হয়তো পাগল হয়ে যাব।

সুতরাং এইরকম একটা মনের অবস্থায় যদি আমি চিত্রাকে খুন করার কথা ভেবে থাকি তা হলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবেন না। এও জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, অ্যাদ্দিন কী করছিলেন, মশাই? বারোবছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করেছেন! অনেক অগেই আপনার ওকে খতম করে দেওয়া উচিত ছিল।

মানছি, উচিত ছিল। বহুবার ভেবেছি ওকে খুন করার কথা, কিন্তু ক্রীতদাসের সাহসে কুলোয়নি। তা ছাড়া, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ও ছিল। আর ধরা পড়লেই তো ছবি আঁকা শেষ। যে ছবি আঁকার চর্চার জন্যে এত কাণ্ড, সেই ছবিই যদি না আঁকতে পারি, তা হলে চিত্রাকে খুন করে আর লাভ কী।

কিন্তু নিয়তি বোধহয় আমার নিঃশব্দ হাহাকার শুনতে পেয়েছিল। তাই একদিন ধর্মতলার মোড়ে দেখা হয়ে গেল অনুতোষের সঙ্গে।

অনুতোষ আমার সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়ত। এখন বিশাল বিজ্ঞানী। সবসময়েই লন্ডন-আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া অনুতোষ ছবিরও সমঝদার। ফলে আমার নাম জানত। শুধু জানত না, আমিই ওর স্কুলের সেই মুখচোরা সহপাঠী।

অনুতোষ আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। ওর নানান আবিষ্কার দেখাল। তার মধ্যে একটা যন্ত্র আমাকে অবাক করে দিল। যন্ত্রটা নিয়ে অনুতোষ এখনও গবেষণা করছে। তবে তার গুণাগুণ শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। আর তখনই চিত্রাকে খুন করার ইচ্ছেটা বাস্তব চেহারা নিতে চাইল আমার মনে। নাঃ, চিত্রাকে দেওয়ালে ঝোলানো ফটো করে দিতে আর কোনও বাধা নেই।

গত পাঁচ-সাত বছর ধরে প্রচুর খুনজখমের গল্প আমি পড়েছি। তার মধ্যে বউকে খুন করার গল্পগুলো বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। তাতে দেখেছি, এক-একটা গল্পে খুনের পদ্ধতি এক-একরকম। আবার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার চেষ্টাও নানারকমের। যেমন, একজন সাহেব তার বউয়ের মৃতদেহটা ছোট-ছোট টুকরো করে পুড়িয়ে ফেলেছে ফায়ার প্লেসে। কাজটা এতই ভয়াবহ যে, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ফায়ার প্লেস হাতের কাছে পাবই বা কোথায়? বড়জোর মৃতদেহের টুকরোগুলোকে গ্যাসের উনুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমার প্রতিবেশীরা অবশ্যই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। এমনিতেই তারা সবসময় পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, সুতরাং তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া বউ নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যাও তো খাড়া করতে হবে আমাকে।

আর-একটা গল্পে নায়ক তার বউয়ের মৃতদেহ পাতালঘরের দেওয়ালের ফাঁপা অংশে লুকিয়ে দেওয়ালটা নতুন করে গেঁথে দিয়েছিল। পুলিশ তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশ চালিয়েও সেই মৃতদেহের

হদিস পায়নি। কিন্তু অহঙ্কারী নায়ক পুলিশের সামনেই যখন পাতালঘরের দেওয়ালের গায়ে লাঠি ঠুকে গাঁথুনির প্রশংসা করতে থাকে, তখনই কোথা থেকে যেন শোনা যায় অপার্থিব এক কান্নার সুর। গাঁথুনির ভেতর থেকেই যেন ভেসে আসছে সেই কান্না। তৎপর পুলিশের দল সন্দিহান হয়ে গাঁথুনি ভেঙে ফেলে। তখনই দেখা যায়, নায়কের বউয়ের বিকৃত মৃতদেহের মাথার ওপরে বসে আছে তারই পোষা কালো বেড়াল। ভুল করে বউয়ের মৃতদেহের সঙ্গে সে এই কালো বেড়ালটিকেও জীবন্ত কবর দিয়েছিল। ফলে, একটা বেড়াল চোখের পলকে যেন ফাঁসির দড়ি হয়ে গেল।

গল্পগুলোর মধ্যে উদ্ভট গল্পও বেশ কয়েকটা ছিল। একটা লোক তো তার বউয়ের মৃতদেহ দু-বোতল চাটনি দিয়ে স্রেফ খেয়েই ফেলেছিল। এই জঘন্য কাজ করার সময় খিদে বাড়ানোর জন্যে লোকটা কুড়ুল দিয়ে তার বাগানের সবক'টা গাছ কেটে ফেলেছিল। নাঃ, পড়লে বিশ্বাস হতে চায় না। এটা শুধু গল্পেই মানায়।

তারপর চোখে পড়েছে খুব জনপ্রিয় পদ্ধতির গল্প—যেখানে বউয়ের মৃতদেহ বড় ট্রাঙ্ক কিংবা সুটকেসে ভরে পাচার করা হচ্ছে, ফেলে রেখে আসা হচ্ছে ট্রেনের কামরায়, অথবা নির্জন কোনও রাস্তার ধারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেখেছি পুলিশ মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই বিপদের শুরু। কী করে যেন গন্ধ পেয়ে ওরা ঠিক খুঁজে পায় খুনিকে। তা ছাড়া নাকগলানে পাড়াপড়শিরা যদি ট্রাঙ্ক বা সুটকেস নিয়ে রওনা হতে দ্যাখে তা হলেই চিত্তির।

আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বউ যখন খুন হয় তখন সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটি সবসময়েই তার স্বামীর। সুতরাং, চিত্রা খুন হলে আমার নামই থাকবে সবার আগে। তা ছাড়া ওর বাবা, আমার ডার্লিং শ্বশুরমশায়, বিকট বড়লোক। আদরের মেয়ের খুন হওয়াটা বা নিরুদ্দেশ হওয়াটা উনি কিছুতেই চুপচাপ মেনে নেবেন না।

দিনের পর দিন ভেবে-ভেবে মাথার চুল ছিঁড়েছি আমি। চিত্রার মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা কিংবা দুর্ঘটনা হিসেবে চালানো যায় কি না তাও ভেবেছি। কিন্তু মনের মতো কোনও প্ল্যান আসেনি মাথায়। বহু ভেবে-ভেবে সার কথা যা বুঝেছি তা হল, চিত্রাকে খুন করতে হবে, মৃতদেহ লোপাট করতে হবে, এবং সবশেষে ওর উধাও হয়ে যাওয়ার একটা জুতসই ব্যাখ্যা খাড়া করতে হবে।

তবে গল্পে হোক আর সত্যি হোক, একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করে দেখেছিঃ মৃতদেহ যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তা হলে কিছুতেই পুলিশ জুতসই কোনও কেস দাঁড় করাতে পারে না। সুতরাং কী করে চিত্রাকে খুন করব, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে ওর মৃতদেহ লোপাট করব।

এই প্রশ্নের উত্তরই আমি খুঁজে চলেছি গত পাঁচ-সাত বছর ধরে।

না, মনের মতো কোনও উত্তর পাইনি। মনে-মনে যে কত লক্ষ গল্প আমি লিখে ফেলেছি! কিন্তু সবক'টা গল্পেই শেষ পর্যন্ত স্বামী বেচারা ধরা পড়ে গেছে। আর তারপরই ইলেকট্রিক চেয়ার কিংবা ফাঁসির দড়ি।

সুতরাং অনুতোষের যন্ত্র আমাকে হাতে চাঁদ পেড়ে দিল। আমার এতদিনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেল যেন।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম আর গভীর টান মারছিলাম হাতের সিগারেটে। চোখ-কান-মন সবই অনুতোষের দিকে। ও আমাকে তখন যন্ত্রটার কথা বলছিল।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি টাইম লকার, বুঝেছিস?

আমি অবাক হয়ে বললাম, টাইম লকার? তার মানে?

যন্ত্রটা আমাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে। চেহারায় দুশো লিটার মাপের একটা রেফ্রিজারেটরের মতো। রং হালকা নীল। চকচকে ধাতুর হাতল লাগানো দরজায়। আর পাশের দিকটায় ছোট্ট একটা ডায়ালের মতো কী যেন, তার পাশেই লাল রঙের একটা বোতাম।

অনুতোষ কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে গেল টাইম লকারটার দিকে। হাতলে টান মেরে দরজাটা খুলে দিল।

ভেতরে অনেকটা জায়গা। দুটো তাকও রয়েছে। সবটাই ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি।

বুঝতেই পারছেন, যন্ত্রটার মধ্যে এমনিতে কোনও বিশেষত্ব নেই। নেহাতই সাদামাটা শৌখিন একটা আলমারি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুতোষ কী বলল জানেন?

টাইম লকার।—হাসল অনুতোষঃ এর মধ্যে কোনও জিনিস ঢুকিয়ে যদি পাশের দেওয়ালের ডায়ালটা এইদিকে কুড়ি ডিগ্রি ঘুরিয়ে বোতামটা টিপে দিস, তা হলে দরজা খুলে দেখবি ভেতরে কিছুই আর নেই। সব ফাঁকা।

যাঃ, অসম্ভব!—আমি সিগারেট গুঁজে দিয়েছি অ্যাশট্রেতে। কফির কাপ হাতে চলে গেছি বিজ্ঞানী অনুতোষের কাছে। বলেছি, না, ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনুতোষ একবার তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎই আমার হাত থেকে কফির কাপ-প্লেট একরকম কেড়ে নিল। সেটা রেখে দিল টাইম লকারের ওপরের তাকে। এবং দরজা বন্ধ করে ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিল।

অনুতোষ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নে, এবার দরজা খুলে দেখ—।

আমি অবাক চোখে আমার স্কুলজীবনের বন্ধুকে দেখতে-দেখতে টাইম লকারের হাতল ধরে টান মারলাম। এবং হতবাক হয়ে গেলাম।

টাইম লকার সেই আগের মতোই খালি।

আমার ফ্যালফ্যালে চাউনি দেখে অনুকম্পার হাসি হাসল অনুতোষ। বলল, ওই কাপ আর প্লেট এখন হাইপারস্পেসে চলে গেছে। আমাদের স্পেস-টাইম ছেড়ে চলে গেছে ফোর্থ ডায়মেনশনে।

আমার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। হাইপারস্পেস! ফোর্থ ডায়মেনশন। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য গুলিয়ে যাক, ক্ষতি নেই—শুধু টাইম লকার ঠিকমতো কাজ করলেই আমি খুশি।

অনুতোষের ভেতরে বিজ্ঞানী সত্তা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ও আপনমনেই বকবক করে বলে চলেছে ওর টাইম লকার তৈরির ইতিহাস। আমি ওর কথাগুলো শুনছিলাম, কিন্তু মনে-মনে গলা টিপে খতম করছিলাম চিত্রাকে। আমার বিষধর চিত্রসমালোচককে।

অনুতোষ বলছিল,...সুপারকন্ডাক্টর দিয়ে কয়েকটা কয়েল তৈরি করে তাতে কারেন্ট পাঠিয়ে তৈরি করেছি সুপার-ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তার ওপরে চালিয়েছি নকল মহাকর্ষ। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু করেছি, তুই সেসব বুঝবি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেরকমটা চাইছিলাম সেরকম হল না। দেখি, এরপর আর কী কারিকুরি করা যায়...।

নিকুচি করেছে অনুতোষের বৈজ্ঞানিক কচকচির। আমি তখন মনে-মনে ‘পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে...’ গাইছি।

আমার মুখচোখে বোধহয় খুশি আর উত্তেজনার ছাপ পড়েছিল। সেটা দেখে অনুতোষ একটু অবাক হয়ে গেল। টাইম লকারের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, কী ব্যাপার বল তো?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে মজা করে বলেছি, না, ভাই, এখন বলব না। আমার মতো ছবি আঁকিয়েদের এমনিতেই পাগল বলে বদনাম আছে। তবে এটুকু বলতে পারি, তোর এই যন্ত্রটা দেখে আমার একটা আইডিয়া এসেছে।

না, না, ভুলেও ভাববেন না চিত্রাকে ‘নেই’ করে দেওয়ার আইডিয়াটা আমি অনুতোষকে বলতে চাইছি। ও আমার স্কুলের বন্ধু—তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং রহস্যময় হাসি হেসে বললাম, তোর এই যন্ত্রটা ক’দিনের জন্যে আমাকে ধার দিতেই হবে।

কেন বল তো?—অনুতোষ অবাক চোখে তাকায় আমার দিকে।

আমি তখন চাপা গলায় বললাম, তোকে বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা একদম ফাঁস করবি না। আমি হাইপারস্পেস নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করব। সুররিয়েলিস্টিক ঢঙে একটা সিরিজই এঁকে ফেলব। বুঝতেই তো পারছিস, এই দারুণ আইডিয়ার ব্যাপারটা যদি অন্য কোনও আর্টিস্ট টের পেয়ে যায় তা হলে আমারই ক্ষতি। আর্টিস্টদের মধ্যে কীরকম বাজে টাইপের রেষারেষি জানিস তো!

না, অনুতোষ যে আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে তা বলব না। তবে আমি যেভাবে নাছোড়বান্দার মতো ওকে ধরেছি তাতে ওর ঠুনকো আপত্তি টিকল না। তা ছাড়া ওর গবেষণার

জন্যে বিশহাজার টাকা ডোনেশান দিতেও রাজি হয়ে গেলাম আমি। আরও বললাম, বন্ধুত্বের খাতিরেই ওর একটা অয়েল পোর্টেট করে দেব—একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে।

অনুতোষের মুখ দেখেই বুঝলাম, আমার এক-একটা অয়েল পেইন্টিং কী দামে বিক্রি হয় সে সম্পর্কে বেশ ভালোরকম ধারণাই ওর আছে। ওর মুখে প্রত্যাশা ফুটে উঠল। সেটা দেখে আমার হাসি পেল। অনুতোষ জানে না, চিত্রার জোয়াল থেকে মুক্তি পেতে আমি একটা কেন, একহাজার অয়েল পেইন্টিং ফ্রি-তে বিলোতে পারি।

সুতরাং এইভাবে, অনেক অনুনয় ও মেহনতের পর, অনুতোষের টাইম লকার পরদিনই চলে এল আমার বাড়িতে। এবং এবার যে-গল্প আমি 'লিখতে' চলেছি সারা দুনিয়া খুঁজেও যে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না সেটা আমি জানি।

চিত্রা যে বাক্সটা—মানে, টাইম লকারটা—দেখে একশো আটটা প্রশ্ন করবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন। ও প্রথমেই জানতে চাইল, এই অকেজো ফ্রিজটা আমি কোন জাহান্নাম থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

আমিও মিনমিন করে জবাব দিয়েছি, সস্তায় পেয়ে গেলাম, তাই—মানে...।

ও ঠোঁট-মুখ বেঁকিয়ে বলল, ওঃ, সেই বিয়ের আগে থেকেই তোমার এইরকম ভিখিরি মেন্টালিটি। সবসময়েই হাত পেতে ঘুরঘুর করছ।

বুঝলাম, ও সেই একযুগ আগের প্লেনভাড়ার ব্যাপারটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই চিত্রা—অথবা, বলা ভালো চিত্রার মৃতদেহ—রওনা দেবে হাইপারস্পেস না কী যেন—সেই জাহান্নামের পথে। যেখানে মা-কালীর কোলে আমার বউ চিত্রা ডাকিনী-যোগিনী সেজে বসে থাকবে।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই চিত্রার কথা বলার হার মারাত্মক রকমের বেড়ে গেল। আমি বেশ শান্তভাবেই ওকে বললাম যে, এই আলমারিতে আমার ছবি আঁকার সরঞ্জাম থাকবে, আর টুকটাক জিনিস থাকবে। তারপর মনে-মনে বললাম, আর থাকবে তোমার মৃতদেহ।

দেরি করতে চাইনি আমি। তাই সেদিন রাতেই চিত্রা যখন অচেতন ঘুমে নিঃঝুম তখন ওর গলা টিপে ধরলাম। বিশ্বাস করুন, গলা টেপার সময়ে হাসি পাচ্ছিল আমার। এই কি সেই গলা, যে-পথ বেয়ে গত বারোবছর তিন মাসে অন্তত সাড়ে সতেরো কোটি কথা বেরিয়ে এসেছে! কী ভয়ংকর অপশক্তিই না লুকিয়ে রয়েছে এই দানবীর ভোকাল কর্ডে! আমার হাত শিল্পীর হাত। কিন্তু খুনও বোধহয় এক শিল্পকলা। নইলে কী করে অমন শক্তি দিয়ে আমি চেপে ধরতে পারলাম চিত্রার গলা!

কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল ও। চোখ খুলে নাইট ল্যাম্পের আলোয় বোধহয় চিনতে পারল ওর আততায়ীকে। ওর পায়ের ঝাপটায় মশারির একটা কোণের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই

সব ছটফটানি শেষ। খেল খতম।

মনে হল আমি যেন পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে পড়েছি আকাশে। আমার স্বাধীন ডানায় কারও শাসনের ছাপ নেই। ক্রীতদাসের শেকল ছিঁড়ে গেছে চিরতরে।

স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বাকি কাজগুলো সেরে ফেললাম আমি। চিত্রার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেলাম টাইম লকারের কাছে। তারপর কোনওরকমে ঠেলেঠুলে গুঁজে দিলাম ভেতরে। ওর 'দ' হয়ে বসে থাকা দেহটা দেখে মনে হল ওটা আমার গত বারোবছর তিনমাস বিবাহিত জীবনের প্রতীক। তবে ওর মুখের কঠিন রেখাগুলো এখন ততটা স্পষ্ট নয়। বরং চিত্রাকে এখন অনেক নিরীহ মনে হচ্ছে। শুধু মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। হবেই তো। আচমকা গলা টিপে ধরেছিলাম যে!

আলমারি খুঁজে বের করে নিলাম ওর গোটাপাঁচেক প্রিয় শাড়ি-ব্লাউজ। তার সঙ্গে যোগ হল একজোড়া শৌখিন জুতো, টুথব্রাশ, স্নো-পাউডার, লিপস্টিক, ময়েশ্চারাইজার, আর কিছু মেয়েলি জিনিস। সেগুলো একে-একে ভরে দিলাম টাইম লকারে। তারপর অনুতোষের নির্দেশ মতো ডায়াল ঘুরিয়ে বোতাম টিপে দিলাম।

এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ফ্ল্যাট থেকে শুধু চিত্রা উধাও হয়ে গেলেই তো হবে না! তার সঙ্গে এই শাড়ি, জামাকাপড়, প্রসাধনের জিনিসও উধাও হওয়া দরকার। কারণ, কাল সকালেই আমি আমার সুইট ডার্লিং শ্বশুরমশায়কে টেলিফোনে জানিয়ে দেব যে, চিত্রা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে জানি না।

এই একই কথা বলব পাড়াপড়শিকে এবং পুলিশকে। তার পরই পুলিশ শুরু করে দেবে তাদের চুলচেরা অনুসন্ধানের কাজ।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। শ্বশুরমশায় এবং পুলিশ—এই দু-তরফের জেরায়-জেরায় জেরবার হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু একটুও ভেঙে পড়লাম না। কারণ, গতকাল রাতেই টাইম লকারের বোতাম টিপে দরজা খুলে দেখে নিয়েছি লকার খালি। সেখানে চিত্রার মৃতদেহ নেই, শাড়ি-ব্লাউজ নেই, স্নো-পাউডার নেই, কিচ্ছু নেই। অনুতোষ আমাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছিল টাইম লকারের মাহাত্ম্য। কিন্তু তবুও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অনেকবার হাত বোলালাম টাইম লকারের ভেতরে। আঙুলের ডগায় শুধু ঠান্ডা ধাতুর পাতের ছোঁওয়া। চিত্রা ইত্যাদি সত্যিই মিলিয়ে গেছে হাইপারস্পেসে।

সুতরাং একটুও ভেঙে পড়িনি আমি। পুলিশি জেরা চলল সারাদিন ধরে। সম্ভব-অসম্ভব নানান প্রশ্ন করল ওরা। সব প্রশ্নের উত্তরই যে ঠিকঠাক দিতে পারছিলাম তা নয়। বেশ কয়েক জায়গায় ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। আমার শ্বশুর পাইপ টানতে-টানতে পায়চারি করছিলেন ঘরে। যেন খুব

কঠিন কোনও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানের পথ খুঁজছেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার। আর সাদা পোশাকের দুজন অফিসার তন্নতন্ন করে সার্চ করছিল আমার ফ্ল্যাট। ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল ফ্ল্যাটের দরজায় পাহারায় দাঁড়িয়ে।

চিত্রার মৃতদেহ উধাও হওয়ার পর টাইম লকারের ভেতরে টুকিটাকি কিছু জিনিস সাজিয়ে রেখেছিলাম কাল রাতেই—কয়েকটা তুলি, প্যালেট, বোর্ডপিন, আর কাপ-প্লেট। পুলিশ অফিসাররা সেগুলোও খুঁটিয়ে দেখল। লকারের গায়ের ছোট ডায়াল আর বোতামটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল আমাকে, এগুলো কী?

আমি নির্বিকারভাবে জবাব দিলাম, কী জানি না। মান্ধাতার আমলের পুরোনো ফ্রিজ। আমি স্রেফ আলমারি হিসেবে ব্যবহার করব বলে জলের দরে কিনেছি। তারপর রংচং করে নিয়েছি—।

সুতরাং পুলিশের যাবতীয় তৎপরতার ফলাফল অশ্বডিম্ব। কিন্তু চলে যাওয়ার সময় আমার ডার্লিং শ্বশুর যেভাবে আমার দিকে তাকালেন তাতে বুঝলাম, উনি সহজে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। কারণ, আর কেউ না জানুক উনি জানেন, চিত্রা কখনও অন্য কোনও পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেনি। স্বামী হিসেবে আমাকে ওর খুব পছন্দ ছিল। এরকম ক্রীতদাস স্বামী যে সহজে পাওয়া যায় না!

আমার শ্বশুরের টাকাপয়সা অঢেল। ফলে নিষ্ফল তদন্ত করে-করে পুলিশ যদি ঝিমিয়ে পড়ে তা হলে তাদের চাঙ্গা করে তোলার দাওয়াই তাঁর জানা আছে। তাই মনে হয়, পুলিশ খুব সহজে চিত্রা অন্তর্ধান রহস্যের তদন্তে ক্ষান্তি দেবে না।

দেখা গেল, আমার কথাই ঠিক। দিনের পর দিন পুলিশ আমাকে বিরক্ত করে চলল। দু-চার দিন বাদেবাদেই তারা নতুন-নতুন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে লাগল। আর আমার হাসি পাচ্ছিল। একটা মৃতদেহের এত দাম! মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া গেলে পুলিশ সত্যি কত অসহায়!

যতই দিন যেতে লাগল পুলিশের প্রশ্নের সংখ্যা কমে আসতে লাগল। আমার শ্বশুরের কপালে এখন দুশ্চিন্তার বলিরেখা। মুখের সেই প্রতিজ্ঞার ছাপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। দুনিয়ার আত্মীয়স্বজনের কাছে খোঁজ করেও চিত্রার হদিস পাননি উনি। এমনকী চিত্রা বিদেশে পাড়ি দিতে পারে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে চিত্রার ফটো নিয়ে এয়ারপোর্টেও খোঁজ করেছে পুলিশ। কিন্তু সেখানেও হতাশা।

এইভাবে, বুঝলেন, যখন প্রায় একমাস কেটে গেছে, তখন একদিন সন্ধেবেলা আমার ডার্লিং এল আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে সাদা পোশাকের স্বাস্থ্যবান একজন লোক। লোকটাকে আগে দেখিনি, তবে তার চোখের চাউনি আর চোয়ালের রেখা স্পষ্ট বলে দিল, সে পুলিশের লোক।

আমরা সোফায় বসে কথা বলছিলাম। পুলিশের লোকটা আমার হাত ধরে দুঃখপ্রকাশ করল। বলল, এতদিন ধরে আমরা অকারণে আপনাকে ট্রাবল দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না।

শ্বশুরমশায়ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। ও বড় জেদি মেয়ে। কে জানে অভিমান করে কোথায় চলে গেছে। দেখো, আমার মন বলছে, ও আবার একদিন তোমার কাছে ফিরে আসবে। তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে কিছু মনে কোরো না।

ওদের অনুতাপ আমাকে খুশি করল। এতদিনের শত্রুতার ভাবটা সরে গেল মন থেকে। আমার চোখের সামনে এখন একজন অসহায় পিতা আর একজন ব্যর্থ পুলিশ অফিসার। এতদিন ওদের জন্যে আতিথেয়তার ছিটেফোঁটাও করিনি। আজ, এখন, চায়ের অনুরোধ করলাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে সাধারণ কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি আমার চিত্রাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলছিলাম। আমার শ্বশুরমশায় মাঝে-মাঝেই সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন।

হঠাৎই যে আমার কী হল কে জানে! সোফা ছেড়ে সটান উঠে চলে গেলাম টাইম লকারের কাছে। ওটার গায়ে চাপড় মেরে বললাম, এই পুরোনো বাচ্চা আলমারিটা চিত্রার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, জানেন। ও বলছিল, যদি ও সারাটা জীবন এতটুকু পুঁচকে একটা আলমারির ভেতরে কাটাতে পারত তা হলে বেশ হতো।

বুঝতেই পারছেন, অহঙ্কার, স্রেফ অহঙ্কার। খুন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মেডেল গলায় ঝুলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা তো কম কথা নয়! সুতরাং সেই অহঙ্কারের বশেই লকারের দরজাটা একটানে খুলে ফেললাম আমি। টুকিটাকি জিনিসে সাজানো ছিমছাম ভেতরটা দেখিয়ে ওদের বললাম, কী সুন্দর, না!

আর তখনই বেখাপ্পা ব্যাপারটা নজরে পড়ল আমার। এটা এল কোথা থেকে? একটা চিনেমাটির প্লেট, তার ওপরে একটা কাপ। কাপে লালচে মতন তলানি রয়েছে খানিকটা। আর সেই কাপ-প্লেটের পাশে রাখা একটা কাপ কাত হয়ে পড়ে গেছে।

বুঝতে পেরেছেন কি ব্যাপারটা? পারেননি? কী করে পারবেন! আমারই যে বুঝে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তারপর বুঝতে পারলাম, এটা হল অনুতোষের সেই কাপ-প্লেট—টাইম লকারের মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্যে যে-কাপ-প্লেট লকারের ভেতরে রেখে উধাও করে দিয়েছিল অনুতোষ। এতদিন পর আচমকাই সেই কাপ-প্লেট ফিরে এসেছে হাইপারস্পেস থেকে। এখন মনে পড়ছে, অনুতোষ বলেছিল, ওর যন্ত্রটা এখনও গবেষণা স্তরে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যেরকম চেয়েছিল সেরকমটা হয়নি। সেইজন্যেই কি টাইম লকারে রেখে উধাও করে দেওয়া জিনিস কিছুদিন পর খেয়ালখুশি মতো ফিরে আসে হাইপারস্পেস থেকে!

আমার কপালে ঘামের ফোঁটা, মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে কি ঝাপসা দেখছি সবকিছু? কোনওরকমে টাইম লকারের দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার শ্বশুরমশায় আর অফিসার ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে পড়ছে না কেন? ওদের চা খাওয়া কি এখনও শেষ হয়নি?

ঠিক তখনই টুকিটাকি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল লকারের ভেতরে। আর একটা বীভৎস উৎকট দুর্গন্ধে ভরে উঠল গোটা ঘরটা। একমাসের বাসী মৃতদেহের দুর্গন্ধ।

সঙ্গে-সঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে দু-জোড়া তীব্র চোখ তাকাল টাইম লকারের দিকে। পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়ল সোফা ছেড়ে। এগিয়ে গেল লকারের দিকে।

আমি জানি, টাইম লকারের দরজা খুললে এখন কী চোখে পড়বে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে আমার মনে হল, চিত্রাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। আমাকে শায়েস্তা করতে ও হাইপারস্পেস থেকেও ফিরে এসেছে।



জীবনের সুর

পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দু-বছর পরে স্পেসভিউতে অলককে দেখল তনুজা।

হলোগ্রাফিক পদ্ধতিতে তৈরি করা অলকের প্রতিবিম্ব যেন মায়া নয়—বাস্তব।

দেখে মনেই হয় না, আসল মানুষটা রয়েছে তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার দূরে—চাঁদে। চন্দ্রনগরীর স্থাপত্যের কাজে অলক সরকারি দায়িত্ব নিয়ে রওনা হয়েছিল দু-বছর আগে। তারপর একটানা দু-বছর মানুষটার কোনও দেখা নেই, কোনও কথা নেই। শুধু কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে স্বামীর সংক্ষিপ্ত খবর এসে পৌঁছেছে তনুজার কাছেঃ 'আপনার স্বামী অলক দত্ত ভালো আছেন।' সরকারের ছক-বাঁধা নিয়মকানুনের সিলমোহর যেন লাগানো রয়েছে এই সংক্ষিপ্ততম সংবাদের প্রতিটি শব্দে। কিন্তু নিয়ম না মেনে তনুজার উপায় নেই। তাই বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে ও শুধু অপেক্ষা করেছে। দিন গুনেছে, ঘণ্টা গুনেছে, মিনিট গুনেছে। তারপর গত সপ্তাহেই নতুন খবর এসেছেঃ স্থাপত্যের কাজে অলক দত্তের দায়িত্ব শেষ, সে ফিরে আসছে সাতদিন পরে।

চন্দ্রনগরী নির্মাণ নিয়ে কেন যে এত গোপনীয়তা বা নিয়মের কড়াকড়ি তা জানে না তনুজা। সে নিয়ে ওর কোনও মাথাব্যথাও নেই। ওর চিন্তা শুধু অলককে নিয়ে। বিয়ের পর স্বামীকে মাত্র ছ'টা মাস ও কাছে পেয়েছে, ভালোবাসতে পেরেছে—তারপরই সে দিয়েছে চাঁদে পাড়ি। নিরুপায় অলক যাওয়ার সময়ে শুধু বলে গিয়েছিল, ডার্লিং, দেখবে কয়েকটা মাস হুউস করে কেটে যাবে। তারপর এসে তোমাকে চাঁদের গল্প শোনাব—চাঁদের আলোয় বাগানে বসে। তারপর...।

স্পেসভিউতে অনেক কথা বলল অলক, কিন্তু তনুজার কিচ্ছু কানে ঢুকছিল না। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে 'সত্যিকারের প্রতিবিম্ব'টাকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড আবেগে কয়েকটা চুমু খায়, আদরে-আদরে অস্থির করে তোলে, ওর বুকে দমাদম কিল মেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, তারপর...।

অলককে আগের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তনুজা শুধু বলল, তুমি এক্ষুনি আমার কাছে ফিরে এসো।

বলেই স্পেসভিউর কানেকশান কেটে দিল।

তার পরদিনই বাড়িতে এসে হাজির হল অলক।

হোভার-মোবিল বাড়ির কাছে এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল অলক। তারপর রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় গাড়িটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

বাড়ির দরজার মুখোমুখি হয়ে আবার রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপল অলক। দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। অলক বাড়িতে ঢুকল। তারপর দেখতে পেল তনুজাকে। ও দু-হাত বাড়িয়ে ডাকল, তনু! আমি এসে গেছি।

তনুজা যেন হাওয়ায় ভেসে ছুটে এল অলকের কাছে। দু-হাতে আঁকড়ে ধরল ওকে। অলক! আমার অলক!

অলকের বুকে মাথা রেখেই প্রথম একটা অচেনা অস্বস্তি টের পেল তনুজা। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে অলককে। ওর বাহুডোরে যেন সেই আবেগ, সেই জোর আর নেই। তনুজা মুখ তুলে স্বামীকে দেখল। না, ওর মুখে সত্যিই রয়েছে বহুদিন পরে প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার তৃপ্ত, প্রিয়জন মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

তনুজা নতুন অস্বস্তিটা প্রকাশ করল না। গোপন করে রাখল বুকের মধ্যে। এমনটা বিশ্বাস করা খুব কষ্ট যে, চন্দ্রনগরীতে গিয়ে অলক দ্বিতীয় কোনও তরুণীর প্রেমে পড়েছে।

কিন্তু প্রতিদিন অস্বস্তির মাত্রা বাড়তেই থাকল। অলকের হাঁটা-চলা, শোওয়া-বসা সবই কেমন যেন অদ্ভুত। তা ছাড়া এই দুধ খেতে গিয়ে গ্লাস ভাঙছে, নয়তো চায়ের কাপ খসে পড়ছে হাত থেকে, কিংবা চলতে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে চেয়ার-টেবিলে।

তনুজা বিরক্ত হয়ে একদিন বলেই ফেলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো?

ওরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল। অলক কাপটাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে মুখ নামিয়ে একটু-একটু করে অতি সাবধানে চা খাচ্ছিল। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে ভীষণ বিরক্ত হল তনুজা। শুধু চায়ের কাপ নয়, তনুজাকে ধরার সময়েও অলকের একইরকম আতঙ্ক থাকে—এই বোধহয় বাঁধন ঢিলে হয়ে খসে পড়ে যাবে তনুজা।

তনুজার কথায় অলক চোখ নামাল। কী বলবে? এভাবে বাড়িতে ফিরে আসাটা ওর ঠিক হয়নি। হেডকোয়ার্টারে ওর জানানো উচিত। কিন্তু অলকের কথা শুনলে ওরা কি হাসাহাসি করবে না?

অলক বলল, আমার একরকম অসুখ করেছে, তনু—।

কী অসুখ? বলো তো ডাক্তারবাবুকে...।

না, না, তার দরকার নেই। সেরকম কিছু নয়।

তনুজার অদ্ভুত লাগল। এই মানুষটা দুটো বছরে এরকম বিচিত্রভাবে পালটে গেল! যখন-তখন জিনিসপত্র ভাঙছে, ঠিকমতো হাঁটা-চলা করতে পারছে না, এমনকী নতুন বিয়ে করা বউকে ঠিকঠাক আদর পর্যন্ত করতে পারছে না—অথচ বলছে, সেরকম কিছু নয়!

আশ্চর্য!

তনুজার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বুকের মধ্যে পীড়নের যন্ত্রণা। এ কোন অলক ফিরে এল চন্দ্রনগরী থেকে! এই অদ্ভুত মানুষটাকে নিয়ে একটা মসৃণ দাম্পত্য জীবন কি ভাবা যায়?

যতই সহ্য করছিল ততই বাষ্প জমছিল তনুজার মনে। চাপ বাড়ছিল ক্রমশ। অবশেষে একদিন সন্ধের মুখে অলক একটা ফুলকাটা কাচের ফুলদানি ভেঙে ফেলতেই তনুজা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একেবারে ফেটে পড়ল।

বিয়ের ঠিক পরে-পরেই একটা কিউরিয়ো শপ থেকে আড়াইশো বছরের পুরোনো একজোড়া কাচের ফুলদানি কিনেছিল তনুজা। চিনদেশে তৈরি জিনিসটার গড়ন, রং ও কারুকাজ সত্যিই মুগ্ধ করার মতো। তনুজার ভীষণ কাচের ফুলদানির শখ। বাড়িতে নানারকম মাপের, গড়নের আর রঙের ফুলদানি রয়েছে। সবই তনুজার কালেকশান। সারি-সারি সুন্দর করে ওগুলো সাজানো রয়েছে তাকে। সেখানেই ছিল এই চিনে ফুলদানি জোড়া। অলক যে কী করতে ওখানে হাত দিতে গিয়েছিল কে জানে। ওর কোন এক অসর্তক মুহূর্তে তারই একটা মাটিতে পড়ে চুরমার। একেবারে টুকরো-টুকরো।

রাগে অন্ধ হয়ে তনুজা যে ঠিক কী-কী বলেছে ওর খেয়াল নেই। এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, কথাগুলো বলার সময়ে ওর কোনও জ্ঞানগম্যি ছিল না। প্রিয় ফুলদানি চুরমার হয়ে যেতে ওর সংযম আর ধৈর্যের বাঁধও বোধহয় চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

তনুজা যখন থামল তখন অলক দু-হাতে মুখ ঢেকে একটা সোফায় বসে পড়েছে। যেন একটা জড় পদার্থ বসে আছে—ভাঙাচোরা, নিষ্প্রাণ।

তনুজা বুঝতে পারল অলক কাঁদছে। ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। শোনা যাচ্ছে অবরুদ্ধ ফোঁপানি।

তনুজা মরমে মরে গেল যেন। ওর সংবিৎ ফিরে এল। সত্যিই তো! চিনে ফুলদানির চেয়ে অলক ওর কাছে অনেক বেশি প্রিয়!

অলকের কাছে এগিয়ে গেল তনুজা। সোফার হাতলে বসে অলকের পিঠে হাত রাখল। তারপর ওর মাথাটা টেনে নিল বুকে।

অলক! অলক!

অলক তনুজার শরীর আঁকড়ে ধরতে চাইল। ভারী গলায় বলল, আমি আর সইতে পারছি না, তনু!

তনুজা কোনওরকমে বলল, কিছু মনে কোরো না, সোনা। আমার ভুল হয়ে গেছে।

অলক চোখ মুছে মুখ তুলে তাকাল। বলল, ভুল তোমার নয়—আমার। কারণ, গ্র্যাভিটির ব্যাপারটা আমি হিসেবের মধ্যে ধরিনি।

গ্র্যাভিটি? মাধ্যাকর্ষণ?—তনুজা অবাক হয়ে অলককে দেখল।

হ্যাঁ, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ।—অলক তনুজার শরীরে মিশে যেতে চাইল। বলল, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর প্রায় ছ'ভাগের এক ভাগ, তনু। আর সেই কম মাধ্যাকর্ষণের জগতে দু-দুটো বছর কাটিয়ে এসেছি আমি। তারপর ফিরে এসেছি জন্মভূমিতে—যে জন্মভূমির টান চাঁদের ছ'গুণ। মাধ্যাকর্ষণ কেন আছে আমরা এখনও জানি না। একে চোখে দেখতে পাই না, একে রুখতে পারি না, শুধু অসহায়ভাবে অনুভব করতে পারি। তাই পৃথিবীতে ফিরে এসে আর সবকিছু আবার খুব চেনা লাগলেও, মাধ্যাকর্ষণ যেন অচেনা হয়ে গেছে! তাই চাঁদের অভ্যেস থেকে পৃথিবীর অভ্যেসে আমি সহজে ফিরতে পারছি না। এখানে আমার হাঁটা-চলা, কথা বলা, এমনকী তোমাকে আদর করা পর্যন্ত ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার উচিত ছিল, হেডকোয়ার্টারে মাসখানেক কাটিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান রপ্ত করে তার পরে তোমার কাছে ফিরে আসা।

অলককে নিজের আরও কাছে টেনে নিল তনুজা। ভাবল এই অদৃশ্য মৌলিক আকর্ষণের কথা। জন্মমুহূর্ত কিংবা তারও আগে থেকে কোনও ভ্রূণ অথবা শিশু এই আকর্ষণ অনুভব করে। তারপর তার পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠে। মাধ্যাকর্ষণ তার রক্তের অণু-পরমাণুতে মিশে যায়। এর শিকড় অনেক-অনেক গভীরে।

তনুজা অলকের চোখের জল মুছিয়ে দিল। বেচারা অলক! চন্দ্রনগরী স্থাপন করতে গিয়ে ও জন্মভূমির টান ভুলে বসে আছে।

তনুজা বলল, কী বলছ তুমি! এতদিন পর আমার কাছে ছাড়া আর কোথায় তুমি ফিরবে! আর ক'টা দিন। তারপরই আবার সবকিছু আগের মতো সহজ সরল হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অলকের মুখে হাসির হালকা রেখা ফুটে উঠল। বলল, সত্যি তনু?

তনুজা বলল, সত্যি।

ওদের সুখের আকর্ষণের বাঁধনে মাধ্যাকর্ষণ যে চিড় ধরিয়েছিল তা জোড়া লেগে যাবে ধীরে-ধীরে। যতই হোক, পৃথিবীর টান যে চাঁদের ছ'গুণ।



বুকের ভেতরে

তিরি আমাকে এক ধাক্কা মারল। ওর হাত নাড়া দেখে মনে হবে যেন মাছি তাড়াচ্ছে, কিন্তু যে-প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ধাক্কাটা আমার বুকে এসে লাগল তাতে মনে হল যেন, হাত নয়, ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন।

আমি ছিটকে পড়ে গেলাম পেছনে। পড়তে-পড়তেই শুনলাম, দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো সুমিতা এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠেছে।

একটা ফাইবার গ্লাসের চেয়ার আমার শরীরের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেটা ধরে ওঠার চেষ্টা করতেই তিরির পাশে দাঁড়ানো লোকটা চকিতে ছিটকে এল কাছে। ইস্পাতের পাতে মোড়া বুটের গুঁতো মারল আমার পেটে। চোখের সামনে হাজারটা নক্ষত্র ঝলসে উঠে অলৌকিক সুপারনোভা ঘটে গেল। পাঁচকোনা ঘরের ফাইবার গ্লাসের দেওয়ালগুলো নাগরদোলার মতো বনবন করে ঘুরপাক খেতে লাগল। আর তারই মধ্যে সুমিতা একের পর এক চিৎকার করে চলল। মনে হচ্ছিল, ঘুরপাক খাওয়া নাগরদোলাটা কখনও বুঝি থামবে না। আর সুমিতার চিৎকারও বোধহয় তাই।

‘এখনও বলে দাও, ওরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে।’

তিরির রুক্ষ স্বরের প্রশ্নটা যেন সুদীর্ঘ এক টানেলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেল আমার কানে। অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল বারবারঃ ‘...কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? কোথায়...।’

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে নিলাম কয়েকবার। হঠাৎই সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কারা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? আমি তার কী জানি? সুমিতাই বা এখানে কী করছে?

আমার বুকে যে-লোকটা গুঁতো মেরেছিল তার মনে বোধহয় দয়া হল। ঝুঁকে পড়ে অনায়াসে চেপে ধরল আমার বাঁ-হাত। তারপর তার চেয়েও অনায়াসে এক ঝটকায় খাড়া করে দিল আমাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরি, বীরত্ব দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। এই ঘরে তোমাদের অনেক ইয়ার-দোস্ত বহু বীরত্ব দেখিয়ে গেছে। সেসব বীরত্বের এঁটোকাঁটা এখন যেখান-সেখানে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা কাজ শুরু করলে শেষ না করে থামি না—।'

তিরি আমার কাছে সরে এল। আলতো ধাক্কায় আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। তারপর আমার মুখের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করল, 'চৌধুরি, সত্যি করে বলো তো, এইরকম জেদের কোনও মানে হয়? কেন বেকার গোঁ ধরে বসে আছ?'

আমি জোরে-জোরে শ্বাস নিলাম। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। জিভটা বুলিয়ে নিলাম ঠোঁটের ওপর। সত্যিই কি আমি ছেলেমানুষি গোঁ ধরে বসে আছি? একটু পরেই কি আমার বীরত্বের এঁটোকাঁটা এই ঘরের মেঝেতে নয়ছয় হয়ে পড়ে থাকবে? সুমিতার দিকে একবার দেখলাম। চিৎকার থেমে গেছে, তবে চোখ-মুখ ফোলা, চোখে জল, শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। ওর সহ্যশক্তি এত কম তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি। ও আমার সঙ্গে সিকিওরিটি কন্ট্রোল ডিভিশনে কাজ করছে আজ প্রায় বারোবছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও নমনীয় রয়ে গেছে।

তিরি সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডাকল, 'ইকা, চৌধুরিকে একটু জল দাও। ওর এখন জলের দরকার।' তারপর হেসে বলল, 'আর যদি শেষ পর্যন্ত মুখ না-ই খোলে তাহলে শান্তিজলের দরকার পড়বে।'

ঘরে আমরা মোট পাঁচজন। পঞ্চম লোকটির নামই বোধহয় 'ইকা'। কারণ তিরির কথায় সে নড়ে উঠল। এতক্ষণ সুমিতার কাছাকাছি একটা টেবিলে ভর দিয়ে বসেছিল। চোখের চাউনি চতুর। বেশ মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ ধরে ঘরের কর্মকাণ্ড দেখেছে, কিন্তু কোনও কথা বলেনি। এখন, ফাইবার গ্লাসের একটা গ্লাস হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, 'তিরি, এবার ছেলেটাকে ছেড়ে মেয়েটাকে ধরো, মনে হয় তাড়াতাড়ি কাজ হবে।'

তিরি ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল। বলল, 'কথাটা এমনিতে ঠিকই, তবে এখানে লাভ নেই। ওই টানেলের ম্যাপ শুধু চৌধুরিই জানে। এই লোকটা—এর মাথার ভেতরেই রয়েছে খবরটা—' আমার মাথায় আঙুলের কয়েকটা টোকা মারল তিরিঃ 'সেটা যে করে হোক আমাদের বের করতে হবে।'

আমার পাঁজরায় তীব্র ব্যথা। মাথা ঝিমঝিম করছে—যেন মাথার ভেতরে অসংখ্য উলের বল গুঁজে দিয়েছে কেউ। কতক্ষণ এই অত্যাচার চলবে কে জানে! চলুক। যে করেই হোক মুখ বন্ধ

করে থাকতে হবে আমাকে। কারণ, শুধু আমার ওপরেই নির্ভর করছে একশো শিশুর ভবিষ্যৎ—মানবজাতির ভবিষ্যৎ।

বাড়িয়ে দেওয়া জলের গ্লাসটা কোনওরকমে মুঠোয় ধরে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলাম। খালি গ্লাসটা খসে পড়ল আমার দুর্বল হাত থেকে। ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে ফাইবার গ্লাসের ঠোকাঠুকির শব্দ হল কয়েকবার।

সুমিতা আমার কাছে এগিয়ে এল এবার। তিরি সরে গেল একপাশে। ইকাও পাশ দিল সুমিতাকে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আশার ছোঁয়া দেখতে পেলাম। সুমিতা হয়তো পারবে আমার মুখ খোলাতে। অন্তত ওরা তাই ভাবছে।

শ্যামলা রং। টানা-টানা ভুরু। দীর্ঘ চোখ। ধারালো নাক। চোয়ালের রেখা স্পষ্ট। মাথার ঘন চুল ঢলে পড়েছে গালে, চোয়ালের রেখাকে কিছুটা তরল করে তুলেছে। ওর বাঁ-কানের খুব কাছে একটা বড় তিল আছে। এখন চুলের আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না।

এই হল সুমিতা।

প্রায় বারোবছর আমরা কাছাকাছি কাজ করেছি। একসঙ্গে হেঁটেছি অনেক পথ। প্রথমে ও ছিল শুধুই সহকর্মী। তারপর বন্ধু। তারপর...।

ওর ঠান্ডা দুটো হাতের চেটো চেপে বসল আমার দু-গালে। ওর হাতে আমার আঁজলা করা মুখ। সুমি—সুমিতা। ও কান্না চাপতে পারছিল না। তার চেষ্টাও করছিল না। 'রুদ্র—।'

আমি ওকে দেখলাম ভালো করে। এখন দুর্বল হলে চলবে না। যতটা সম্ভব বেপরোয়া জেদ ফুটিয়ে তুললাম মুখে।

'বলে দাও, রুদ্র। বলে দিলে পরে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে—।'

কথাটা বলে শত্রু তিনজনের দিকে তাকাল সুমিতা। আশ্বাস চাইল।

তিরি নিষ্ঠুর হেসে মাথা ঝোঁকাল দুবার। হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে আমাদের। এখন অন্তত তাই বলছে।

ঘরের পাঁচ দেওয়ালে পাঁচটা পোলারয়েড জানলা। সূর্যের তেজ বাড়লে জানলার কাচের রং কালচে হতে থাকে। সামনের জানলা দিয়ে দূরে রুক্ষ প্রান্তর চোখে পড়ছে। আর সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা গাছের কঙ্কাল। পাতা নেই, সবুজ নেই, ক্লোরোফিল নেই।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আমার শীত করছিল। অথচ টের পাচ্ছি, কপালে ঘাম।

সামনের মসৃণ টেবিলে পড়ে রয়েছে দুটো লেজার অটোমেটিক। আর তার পাশেই একটা কম্পিউটার টার্মিনাল আর ছোট কন্ট্রোল প্যানেল। কম্পিউটারের মনিটরে সবুজ লেখার হিজিবিজি। প্রকৃতির সব সবুজ কি এখন শুধু কম্পিউটারের পরদাতেই পাওয়া যাবে?

সামনে দাঁড়ানো তিনজন শত্রুকে দেখছিলাম আমি। তিরি, ইকা—তৃতীয়জনের নাম জানি না। জেনে কোনও লাভ নেই। কারণ ওরা তিনজনই সমান হিংস্র, সমান নিষ্ঠুর। আতঙ্ক ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

তিনজনের চেহারার মধ্যেও কি কোনও তফাত আছে? বোধহয় না। সেই একইরকম লম্বাটে মুখ, হনু দুটো বড় বেশি রকমের উঁচু, চোখ দুটো যেন ছুরিতে চেরা গর্ত, ভুরু প্রায় নেই, গোঁফ-দাড়িহীন মাকুন্দ মুখ, উঁচু কপালের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে কালো চুলের শুরু—চুলগুলো যেন আঠা দিয়ে মাথার সঙ্গে চেপে সাঁটা। আর সবমিলিয়ে ভাবলেশহীন মুখ কী ভয়ংকর!

ওদের পোশাকও অদ্ভুত। চামড়া আর ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি। গায়ের সঙ্গে এমনভাবে চেপে বসে আছে যে, শরীরের শক্তিশালী পেশি দিব্যি জানান দিচ্ছে।

সুমিতা আমাকে আদর করছিল। ওর নরম হাত পরম আত্মীয়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মুখে, গালে, ঠোঁটে, চোখে, মাথার চুলে। আকুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরব মিনতি জানাচ্ছে ক্রমাগতঃ বলে দাও, রুদ্র, বলে দাও—।

কী বলে দেব? কিছুই মনে পড়ছে না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

'আমার কিছুই মনে পড়ছে না, সুমি—।'

নাম-না-জানা তৃতীয় লোকটা যেন বাতাসে ভেসে ছিটকে চলে এল আমাদের কাছে। বাঁ-হাতের এক ঝটকায় সুমিতাকে ঠেলে দিল। ও প্রায় পাঁচহাত দূরে গিয়ে পড়ল। চিৎকারও বোধহয় একটা করে থাকবে। সেটা আমি ঠিক শুনতে পাইনি, কারণ পরক্ষণেই উগ্র রাগে লোকটা আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করেছে পাগলের মতোঃ 'মনে পড়ছে না! ন্যাকা—।'

'সল, কী হচ্ছে!' তিরি এগিয়ে এসে লোকটাকে বাধা দিল।

সল গজগজ করতে-করতে সরে গেল আমার কাছ থেকে। তিরি আলতো করে কয়েকটা থাপ্পড় মারল আমার গালে—যেন আমার চেতনা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। তারপর ওর বাঁ-হাতটা তুলে ধরল আমার মুখের কাছে। হাতটাকে থাবার মতো করে আঙুলের নখগুলো দেখাল। ছোট্ট তেকোনা তীক্ষ্ণ নখ—ঈগল পাখির চেয়েও ধারালো। কড়ে আঙুলের নখটা আমার গালের ওপরে বসিয়ে টেনে দিল তিরি, বলল, 'আমি তোমাকে সব মনে করিয়ে দিচ্ছি, চৌধুরি।'

গালে জ্বালা, যন্ত্রণা। গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। বুকের ভেতরেও প্রায় একই অবস্থা। কিন্তু তাও আমাকে যে মুখ বন্ধ করে থাকতেই হবে।

তিরি বলতে শুরু করল।

আমার চোখ বুজে আসছিল অবসাদে। মাথা ঢলে পড়তে চাইছে কাঁধের ওপর। আচ্ছন্ন এক অবস্থার মধ্যে তিরির অলৌকিক ধারাবিবরণী ঢুকে পড়ছিল আমার কানে। অসংখ্য ভোমরা যেন

গুনগুন করে চলেছে কানের কাছে।

পৃথিবীতে যে পারমাণবিক যুদ্ধ একটা হবেই সেটা আমরা জানতাম। আমাদের ভয় ছিল, সেই ভয়ংকর মহাযুদ্ধে মানবজাতি হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শুধু থেকে যাবে প্রাণহীন কলকারখানা, বইপত্র, আর রুক্ষ পৃথিবী। তাই গত সত্তরবছর ধরে ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা। মাটির নীচে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। মেঠো ইঁদুর যেমন মাটির নীচে গর্ত করে বাসা বাঁধে। তারপর সুড়ঙ্গের সঙ্গে সুড়ঙ্গ জুড়ে গিয়ে তৈরি হয়ে যায় জটিল ভুলভুলাইয়া। শুধু ইঁদুররাই পথ চিনে চলতে পারে সেই গলিপথে। বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেছেন এই সুড়ঙ্গবাসী ইঁদুরদের জীবনযাপন নিয়ে। তারপর তারই অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে আমাদের মাটির নীচের জগৎ। সেখানে রাখা হয়েছে একশোজন শিশুকে। পঞ্চাশটি পুরুষ-শিশু, পঞ্চাশটি নারী-শিশু। সুস্থ, সতেজ, সবল। আপাতত তাদের দেখাশোনার কাজে রয়েছে দশজন ধাত্রী-শিক্ষিকা।

সুড়ঙ্গের মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে নিরাপদ আস্তানা। সেখানে মজুত রয়েছে কুড়িবছরের ঘন খাবার। রয়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, বই-খাতা, গবেষণাগার। পারমাণবিক যুদ্ধের কোনওরকম আঁচ পৌঁছবে না সেখানে।

সুতরাং কোনও মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—মানবসভ্যতা—শেষ হয়ে গেলেও মাটির নীচে লুকোনো ওই শিশুরা নতুন করে একদিন গড়ে তুলবে নতুন মানবসভ্যতা। স্তব্ধ কলকারখানাকে ওরা আবার সচল করে তুলবে। আবার সবুজে-সবুজে ভরিয়ে দেবে চারদিক।

মাটির নীচের ওই লুকোনো জগতের খোঁজ পাওয়া নেহাত সহজ নয়। নানা জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে প্রায় একহাজার সুড়ঙ্গের মুখ। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে যদি কেউ নীচে নেমে যায়, তাহলে সে আর ফিরবে না। পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত খিদে-তেষ্টায় প্রাণ দেবে। সুতরাং এরকম ঝুঁকি কেউ নেবে না। তিরিরাও নেয়নি।

মাত্র বছরদুয়েক হল ওই শিশুরা মাটির নীচে জীবনযাপন শুরু করেছে। ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ওরা। আর আমরা সিকিওরিটি কন্ট্রোল থেকে প্রতিটি মুহূর্তে নজর রেখেছি ওদের ওপর। এমনসময়...।

না, পারমাণবিক যুদ্ধ নয়। কোথা থেকে হাজির হল তিরি, সল আর ইকাদের দল। সবাই বলতে লাগল, ওরা এসেছে অন্য কোনও গ্রহ থেকে। কিন্তু ওদের মহাকাশযানটা আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি।

ওরা এসে সব তছনছ করে দিল। ওদের শক্তিশালী মারণাস্ত্র হাজার-হাজার মানুষকে নির্বিচারে খতম করে চলল। ওদের ক্ষমতার কাছে আমাদের সবই অকেজো।

এর মধ্যে যতটুকু জেনেছি, তিরিরা এক অদ্ভুত রাসায়নিক নিষ্কাশন পদ্ধতি নাকি বের করেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে অত্যন্ত কম খরচে ওরা পৃথিবীর মাটি থেকে বের করে নিতে পারছে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, ক্যালশিয়াম, আরও কত কী! গাছের পাতা থেকে ওরা বের করে নিচ্ছে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন। আর পশুপাখির হাড় থেকে পেয়ে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম। পশু বলতে তার মধ্যে মানুষও রয়েছে।

নিষ্কাশিত এই সব পদার্থ ব্যবহার করে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির শিল্পের পত্তন করবে ওরা। মানবসভ্যতাকে পিষে গুঁড়িয়ে খতম করে শুরু হবে উন্নয়নের কাজ। এতে বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। বাধা দিতে গিয়ে সিকিওরিটি কন্ট্রোল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের তৈরি বহু যন্ত্রমানব—রোবট ও অ্যান্ড্রয়েড। গত তিনমাস ধরে ক্রমাগত অত্যাচারের পর পৃথিবী এখন আর সবুজ গ্রহ নেই। বরং এখন তার চেহারা বাদামি অথবা লাল।

তিরিদের খতমের খেলা এখনও থামেনি। নানান গোপন তথ্য খুঁচিয়ে বের করার জন্যে কিছু লোককে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন, পরিত্যক্ত এই সিকিওরিটি বিল্ডিং-এ এখন রয়েছি আমি আর সুমিতা।

তিরির কথায় সব মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। সব।

‘...তোমাদের সিকিওরিটি কন্ট্রোলের চিফ ব্রিগেডিয়ার রাজামানি আমাদের হাতে খতম হওয়ার আগে ওই সুড়ঙ্গের কথা বলে গেছে—’ দু-আঙুলের চাপে আমার গালের ক্ষতস্থান রগড়ে দিয়ে বলল তিরি, ‘এ-ও বলে গেছে, তার লোকেশান ম্যাপ, কো-অর্ডিনেট, সব তোমার জানা। একমাত্র তুমিই জানো।’ তিরি হাসল নিষ্ঠুরভাবে। ওর লাল টুকটুকে ঠোঁট সামান্য ফাঁক হল। বলল, ‘কোনও লাভ নেই, চৌধুরি। তুমি কানাগলিতে ঢুকে পড়েছ। আর ওই খবর আমাদের জানিয়ে দিলে তোমার লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। বললাম তো, তোমার চেয়ে অনেক বড়-বড় বীর এই ঘরে অনেক বীরত্ব দেখিয়ে গেছে।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তিরি। সেটা সাপের নিশ্বাসের মতো শোনাল। আর পরক্ষণেই কোমরের বেল্টের কোন অদৃশ্য পকেট থেকে বের করে নিল সরু তীক্ষ্ণ ফলার একটা ছুরি। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ছুরি ও তিরির মুখ একইরকম দেখাল—হিংস্র নেকড়ের মতো।

তিরি আমার ওপরে ঝুঁকে পড়ে সলকে বলল, ‘সল, ভিডিয়োতে সুড়ঙ্গের মুখগুলো একে-একে দেখাতে থাকো।’

সল টেবিলে রাখা ছোট প্যানেলের বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা দেওয়াল বিশাল ভিডিয়ো পরদা হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল পৃথিবীর রঙিন রুক্ষ জমি, আর সুড়ঙ্গের মুখ। প্রতিটা মুখের নির্দিষ্ট নম্বর রয়েছে। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, তার নম্বর একত্রিশ।

ছুরির তীক্ষ্ণ মুখ আমার রগে চেপে ধরল তিরি। বলল, 'চৌধুরি, কোথা থেকে খোদাইয়ের কাজ শুরু করব বলো—।'

সুমিতা কোথা থেকে যেন ছুটে এল আমার কাছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠল। হাঁটুগেড়ে বসে মাথা ঘষতে লাগল আমার কোলে। তারপর অবুঝ মেয়েটা জড়ানো গলায় কিছুক্ষণ ধরে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না।

অবশেষে মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। চোখে সেই নীরব মিনতি। ওঃ, অসহ্য!

তিরি একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে সুমিতা বলল, 'রুদ্র, বলে দাও ওদের। তা হলে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে। লক্ষ্মীটি—' তারপর গলার স্বর প্রায় ফিসফিসের পর্যায়ে নামিয়ে এনে বলল, 'রুদ্র, আমরা তখন তৈরি করব নতুন সভ্যতা। তুমি আর আমি—।'

এত যন্ত্রণার মধ্যেও তেতো হাসি পেল আমার। অবুঝ রমণী! তোমার মা হওয়ার ক্ষমতা আর কতদিন? সাত বছর? আট বছর? তোমার কাছ থেকে মৃত পৃথিবী বড়জোর আটটি শিশু পেতে পারে। যদি তারা সবাই বাঁচে, তা হলে আবার ষোলো থেকে আঠেরোবছর অপেক্ষা। কিন্তু মাটির নীচের ওই শিশুজগৎ? মাত্র পনেরোবছর পরেই ওরা প্রতি বছরে পঁচিশজন করে বাড়বে। এইভাবেই গড়ে উঠবে নতুন মানবসভ্যতা। তা ছাড়া, এখন তিরিদের গোপন খবর বলে দিলেই যে ওরা আমাদের বাঁচতে দেবে তার কোনও মানে নেই। আর, আমি...আমি...।

না, সত্যি কথাটা এবার বলে দেওয়াই ভালো। মন শক্ত করে সেটাই স্পষ্ট গলায় বললাম সুমিতাকে। আমার কথা তিরি, সল আর ইকাও শুনতে পেল। এবং চারজনই চমকে উঠল ভীষণভাবে।

আমি বললাম, 'তুমি ভুল করছ, সুমিতা। আমি মানুষ নই—অ্যান্ড্রয়েড—যন্ত্রমানব। যার শরীর আর চেহারা হুবহু মানুষের মতো কিন্তু চলে ব্যাটারিতে।'

সুমিতা অপার বিস্ময়ে আমাকে দেখতে লাগল। ওর হাত স্পর্শ করল আমার শরীর। পরীক্ষা করতে চাইল আমার রক্ত-মাংস। জানি, পরীক্ষা করে কোনও তফাত টের পাবে না। সেটা ও ভালো করেই জানে। ও অবাক হয়েছে অন্য কারণে। সিকিওরিটি কন্ট্রোলের একজন হোমরাচোমরা কর্তা মানুষ নয়, অ্যান্ড্রয়েড, এই ব্যাপারটাই ও মেনে নিতে পারছে না। আসলে এটাও আমাদের সিকিওরিটির একটা ছক। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করার জন্যেই এই পরিকল্পনা।

আমি সাধারণ রোবট নই, কারণ তার চেহারা যন্ত্রের মতো। বরং লোকঠকানোর কাজে অ্যান্ড্রয়েড অনেক বেশি সুবিধেজনক। তবে রোবটশাস্ত্রের সব সূত্রই আমরা মেনে চলি। সেইভাবেই তৈরি আমরা। সেটাই যে নিয়ম।

ইকা এগিয়ে এসে সুমিতাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল দূরে। তিরি আর সল আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। তিরি ছুরির ফলাটা চেপে ধরল আমার বাঁ-ভুরুর নীচে। জিগ্যেস করল ঠান্ডা গলায়, 'তুমি তা হলে বলবে না?'

এইবার আমি মন খুলে হাসতে পারলাম। এবার তো ওদের বোঝা উচিত, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনও গোপন খবর আমি কখনওই ফাঁস করতে পারব না। রোবটশাস্ত্রের প্রথম সূত্র আমাকে বাধা দেবে। আমার পজিটনিক ব্রেন তখন আর কাজ করবে না। সুতরাং প্রথম সূত্রটা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিলাম ওদেরঃ 'রোবট কখনও কোনও মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না, অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনও মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না।'

আমি মাথা নাড়লাম আপনমনেই। আমার বাঁ-চোখের ওপরে চামড়া ফুটো হয়ে রক্ত গড়াল। কষ্ট করে তিরির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তিরি, তুমিই বলো, ওই সুড়ঙ্গের হালহদিস জানিয়ে কী করে আমি আগামীদিনের মানবসভ্যতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিই—।'

সল রুক্ষ গলায় তিরিকে বলল, 'এর চামড়া, রক্ত, মাংস সবই তো মানুষের মতো। অথচ বলছে রোবট, মানে অ্যান্ড্রয়েড। লোকটা ব্লাফ দিচ্ছে না তো?'

তিরি কী যেন ভাবছিল আপনমনে। অনেক অ্যান্ড্রয়েড ওদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ওরা মানুষ ভেবেই সেগুলোকে ধ্বংস করেছে। এখন আমাকে নিয়ে কী করবে ও?

তিরি বিড়বিড় করে বলল, 'না, ব্লাফ নয়। অ্যান্ড্রয়েডরা জীবকোষ দিয়ে তৈরি। ওরা রোবট হলেও হুবহু মানুষের মতো। শুধু ওই ব্যাটারিটা ছাড়া—।'

আমি বিধবস্ত সুমিতাকে দেখছিলাম আর মনে-মনে আওড়াচ্ছিলাম, 'আমি রোবট, আমি অ্যান্ড্রয়েড, প্রথম সূত্র অমান্য করতে পারি না আমি। যত কষ্টই ওরা আমাকে দিক, যত যন্ত্রণাই হোক। রোবট কখনও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। কখনও না।'

ইকা এগিয়ে এল এবার। ওর সঙ্গে সলের চোখাচাখি হল। দুজনে প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, 'তিরি, তা হলে ওই ব্যাটারিটাই খোঁজা যাক—।'

চোখের পলকে আমাকে শূন্যে তুলে নিল ইকা ও সল। সটান আছড়ে ফেলল ফাইবার গ্লাসের মেঝেতে। তারপর বেপরোয়া হাত চালিয়ে খুলে নিতে লাগল পোশাক-আশাক।

ক্রমশ আমার শীত বাড়তে লাগল। দেওয়ালের পরদায় তখনও রুক্ষ প্রান্তরের ছবি, সুড়ঙ্গের একত্রিশ নম্বর মুখ।

সুমিতার দিকে দেখলাম। ওর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এই বারোবছরে একটা রোবটকে ভালোবেসে ফেলেছিল ও! যার হৃদয় প্লাস্টিকের তৈরি! যার চোখের পলক পড়ে শরীরের গভীরে লুকোনো ব্যাটারির জোরে!

বুকের বাঁ-দিকে ছুরিটা বসিয়ে দিল তিরি। ব্যাটারি খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। ছুরির আঘাতে ছিন্ন হচ্ছে স্নায়ু, ধমনী, শিরা। অসহ্য যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে সইতে চেষ্টা করলাম আমি। আমি মানুষবেশী রোবট। প্রথম সূত্র ডিঙিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। রোবট কখনও মানুষের ক্ষতি করে না। কখ্খনও না! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করছিলাম, হাত-পা ছুড়তে চেষ্টা করছিলাম। চোখে আর বুকে অসহ্য জ্বালা।

সুমিতা তখনও অবাক চোখে আমাকে দেখছে। একটা রোবটকে আগে কখনও বোধহয় এমনভাবে শেষ হয়ে যেতে দেখেনি ও।

ইকা, সল আর তিরির ঠোঁট চিরে মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে আসছিল জান্তব গর্জনের টুকরো। আমার বুকের ভেতরে ওরা প্রাণপণে খোঁড়াখুঁড়ি করে চলেছে।

আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল, চোখ বুজে আসতে চাইছে বারবার। কিন্তু আর কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি আমি। কারণ, একবার অজ্ঞান হয়ে গেলেই আর কোনও ভয় নেই। তখন আর কোনওরকম যন্ত্রণা আমি টের পাব না। চোখের সামনে এই অমানুষগুলোকে আর দেখতে পাব না, দেখতে পাব না সুমিকে। আমার সুমিকে।

সুমিতা কোনওদিনই জানতে পারবে না, আমার বুকের ভিতরে সত্যি-সত্যি কোনও ব্যাটারি নেই। আর প্লাস্টিকও নেই ছিটেফোঁটা। প্রথম সূত্র শুধু আমাকে সহ্য করার শক্তি জোগাক, এই আমার প্রার্থনা। আমি যে রোবট, এই মিথ্যে কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে আমি তিরিদের সঙ্গে এই লড়াইয়ে জিততে চাই।

ওরা আমার বুকের ভেতরে খুঁড়ে যাক অনন্তকাল। আমার বুকের গভীরতা ওরা জানে না। ওই অতল গভীর থেকে কখনওই ওরা খুঁজে বের করতে পারবে না ভবিষ্যতের মানবসভ্যতার ঠিকানা।



মাদারি যখন খেলা দেখায়

রোগা শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দয়াল মানিক ঢুকে পড়েছিল চিচিঙ্গে মাচার নীচে। বাখারির খুঁটির ডগায় তার বেঁধে তৈরি মাচা। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, কিন্তু মাচার নীচে পঞ্চমুখী পাতার ছায়ায়-ছায়ায় শরীর ঠান্ডা।

দয়াল কুঁজো হয়ে মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রায় বুকসমান উঁচু মাচার তলায়। সুতলি দিয়ে থান ইটের টুকরো বেঁধে দিচ্ছিল চিচিঙ্গের ডগায়। ইটের টানে চিচিঙ্গেগুলো সোজা হয়ে ঝুলে পড়বে নীচের দিকে। লাঠির বাড়ি খাওয়া সাপের মতো তা হলে আর জট পাকিয়ে যাবে না। পঞ্চমুখী পাতার সঙ্গে লটকে যাবে না ফলের দেহগুলো।

আহা! ফলগুলোর চেহারা কী! যেন মোটাসোটা লাউডগা সাপ এক-একটা। শুধু গায়ে যা সাদা ডোরাকাটা দাগ। সেইসব সাপদের পাশ কাটিয়ে অদ্ভুতভাবে মাচার তলায় চলেফিরে বেড়াচ্ছিল দয়াল মানিক। ওর কালো কুষ্ঠি শরীরে শুধু হেঁটো ধুতি। আর শরীরটা ঝুঁকে পড়ায় এই আলোছায়াতেও স্পষ্ট দেখা যায় শিরদাঁড়ার গুটলির সার।

দয়াল যতই চলে-ফিরে বেড়ায় ততই খিদে পাক মারে ওর পেটে। জট পাকিয়ে যাওয়া চিচিঙ্গের মতোই পাকাতে থাকে, মোচড়াতে থাকে। সেই কোন সকালে পান্তাভাত কাঁচালঙ্কা ডলে নুন দিয়ে পাকিয়ে মুখে পুরেছে। আর সঙ্গে কাঁচকলা সেদ্ধ। নাঃ, মুখে রোচে না, তবু শিবু ডাক্তার বলেছে, কাঁচকলায় ভিটামিন, পান্তা ভাতে ভিটামিন, এমনকী শালা কাঁচালঙ্কা আর নিমকেও ভিটামিন। তুমি যা-ই খাও না কেন শালা তাতেই নাকি শুধু ভিটামিন আর ভিটামিন! এই যে দয়াল এখন চিচিঙ্গে চষে বেড়াচ্ছে তাতেও তো ভিটামিন!

কাছাকাছি সনাতন নায়কদের বাড়িতে রঙিন টিভি আছে। তাতে নাকি সরকার এসব ভিটামিনের বিজ্ঞাপন দেখায়। আলু-পেঁয়াজের খোসাতেও ভিটামিন, আবার ভাতের ফ্যান, হাতেগড়া রুটিতেও

ভিটামিন।

হাঁপাতে-হাঁপাতে মাচার তলা থেকে বেরিয়ে আসে দয়াল। অতি কষ্টে শিরদাঁড়াটা সোজা করে ধীরে-ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়ায়। শিরদাঁড়ার গুটলির সার সোজা হয়। মটমট শব্দ হয় তাতে। দয়াল ক্ষণিকের তরে ঝাপসা দ্যাখে চোখে। তারপর সরু-সরু শিরা বের করা কালো হাত দুটোর দিকে তাকায়। গরু খোঁজার মতো হন্যে হয়ে ভিটামিন খোঁজে। ওর নাভির চারপাশে খিদে পাক দেয়, হা-ডু-ডু খেলে বেপরোয়া।

সূর্য মাথার ওপরে গনগনে আগুন। কিন্তু তবুও চারপাশে দৃষ্টি দিলে সবুজের মেলা দেখে মনটা জুড়োয়।

চোখের সামনেই চিচিঙ্গের পঞ্চমুখী পাতার ঝাঁক। তার মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট সাদা ফুল। ফলন আরও বাড়বে, আরও বাড়বে।

নিজের খেত থেকে চোখ সরতেই কালু মণ্ডলের ধানখেতের দিকে নজর পড়ে দয়ালের। হাঁটু সমান ধানগাছের মেলায় খেত একেবারে সবুজ মাঠ। মাঠে বাতাস খেলা করে, রোদ্দুর খেলা করে। ধানখেতের পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে সরু নদী ঘিয়া। ঘোলা জলে টান তেমন নেই। বড়সড়ো একটা নালা যেন। তবে চাষের জল পাওয়া যায়। কখনও ঘিয়ার জল, কখনও আকাশের জল।

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশের ঝোপ। কয়েকটা সাদা ফুল ফুটেছে। দুলছে বাতাসে। তার পিছনে আবার ধানখেত। সবুজের পর সবুজ। চলে গেছে বহুদূর।

ঠিক তখনই বস্তুটি নজরে পড়ল দয়ালের। এমনধারা বিচিত্র বস্তু কখনও দেখেনি ও। না, এমন নয় যে চোখের ধন্দ। তা ছাড়া এখন গনগনে গরমের মরশুমও নয় যে, গরম ভাপ উঠবে জমি থেকে, নজর হিজিবিজি খেলবে।

দয়াল হাতের চেটো দিয়ে চোখের ওপরে টুপি তৈরি করে। তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। কোনও ভ্রম নেই।

সবুজ আর সবুজের মাঝে হঠাৎই যেন মাথা ফুঁড়ে উঠেছে একটা রংবেরঙের ঘর। ঠিক একটা বাক্সের মতো বাক্সটার গায়ে রামধনুর মতো বর্ণের খেলা। দয়ালের মনে হল, সেই রঙের নকশা যেন বহুরূপীর মতো খেয়ালখুশি পালটাচ্ছে।

রঙিন বাক্সটার মাথায় বড়সড়ো একটা বাটি বসানো। বাটিটা এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছে। স্যাটেলাইট আপিসে এরকম বাটি দেখেছে দয়াল।

দয়াল আশেপাশে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। সামনের কাঁচা সড়ক ধরে একটা ছোঁড়া সাইকেল প্যাডেল করে চলে গেল। বাক্সটার পানে ঘুরেও তাকাল না।

দয়াল মানিক রাস্তায় উঠে এল। চোখ ছোট করে দেখতে লাগল আজব রঙিন বাক্সটাকে।

ঠিক তখনই একটা প্রাণীকে দেখতে পেল। বাক্সটাকে ঘিরে লাফাচ্ছে, ঘুরে-ঘুরে নেচে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন একটা গঙ্গাফড়িং।

ধানখেতের ওপর দিয়ে দুটো ধবধবে সাদা বক উড়ে গেল। উড়ে যেতে-যেতে বাঁক নিল। তারপর এই আজব বাক্সটার পাশ দিয়ে চলে গেল দিগন্তরেখার দিকে।

হঠাৎই জোরে বাতাস বইতে লাগল। উড়তে লাগল দয়াল মানিকের কাঁচাপাকা চুল। আর তখনই ও ঠাহর করতে পারল অজানা প্রাণীটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

প্রথমটা দয়াল ঠিক বুঝতে পারেনি। কাকে ডাকছে? ও তাকাল চারপাশে। না, দয়াল ছাড়া আর তো কোনও জনপ্রাণী নেই!

দয়ালের পেটের ভেতরটা এমনিতেই ফাঁকা, সেটা আরও ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল। এবং অচেনা প্রাণীটার হাতছানির টানে ও ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল আজব বাক্সটার দিকে।

সড়ক থেকে নামল ধানখেতে। খানিকটা আল ধরে, খানিকটা কাশঝোপের পাশ দিয়ে, নদীর পাড়ের লালচে নরম মাটি মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। পায়ের তলায় কাঠি কাঁটা ফুটল কয়েকবার, কিন্তু দয়ালের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও এগোতেই থাকল।

ঘিয়ার পাড় ঘেঁষে যখন বাক্সটার পাশাপাশি পৌঁছল তখনও সেই প্রাণীটা বাক্স ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে, নাচছে, আর হাতছানি দিয়ে সুর করে ডাকছে দয়ালকে। এখন তার গলা শুনতে পাচ্ছে দয়াল মানিকঃ 'এসো ভাই, আজব খেলা দ্যাখো ভাই। এসো ভাই...।'

দয়াল ধানখেতের মধ্যে দিয়ে বাক্সটার দিকে এগিয়ে চলল। একটা চুম্বক যেন ওকে টানছে। আর চলতে-চলতেই প্রাণীটাকে খুঁটিয়ে দেখল দয়াল।

বাক্সটার মতোই আজব প্রাণীটার পরনের পোশাক। গলা থেকে ঝুলে পড়েছে এক অদ্ভুত রকমের জোব্বা। হালকা হলুদ রং। তার ওপরে লাল নীল কালো আর সবুজ রঙের তারা। গনগনে রোদ্দুরে দপদপ করছে। জোব্বার কোমরের কাছ থেকে মানুষের মতোই দুটো হাত বেরিয়ে রয়েছে।

সেই হাত দুটো নাচছে তালে-তালে, আর ডাকছে দয়াল মানিককে।

লোকটার মাথায়—হ্যাঁ, কাছ থেকে দেখার পর প্রাণীটাকে লোক বলেই মনে হয়েছে দয়ালের—লোকটার মাথায় বেখাপ্পা এক টুপি। টুপির মাথা থেকে সরু-সরু লিকলিকে দুটো তার বেরিয়ে উঠে গেছে হাতখানেক ওপরে। তাদের ডগায় দুটো ছোট-ছোট লাল রঙের বল। ঠিক যেন প্রজাপতির শুঁড়। নাচের তালে-তালে সেই শুঁড় নড়ছে, দুলছে।

লোকটার মুখে মুখোশের মতো কী একটা আঁটা। সেখানেও নানা রঙের আঁকিবুকি। শুধু চোখ আর নাকের কাছে ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখের মণি দেখা গেল বোধহয়। অন্তত

দয়ালের তাই মনে হল।

দয়ালকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটার হাত-পা ছোড়া আরও বেড়ে গেল যেন। সে গলা ফাটিয়ে তখন গাইছেঃ

'ক্ষুধাহরণের খেলা গো ভাই

ক্ষুধাহরণের খেলা—

এ খেলাটি খেললে পরে

খিদে—থাকবে না দুইবেলা—'

দয়াল অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। চোখের ভ্রম নয় মোটেই। সবুজ ধানখেতের মাঝে রোদে ঝকঝক করছে রঙিন বাক্সটা। কিন্তু লোকটা বলে কী! ক্ষুধাহরণের খেলা! এ খেলা খেললে দু-বেলা খিদে থাকবে না!

সঙ্গে-সঙ্গে দয়ালের পেটের ভেতরটা মুচড়ে উঠল খিদের টানে। এখনই তো ওর বাড়ি ফেরার কথা। ফিরে যা পায় দুটি গুঁজে দেবে মুখে। পুন্যিটা কী রেঁধেছে তা নির্ভুল বলে দিতে পারে দয়াল। দুটি ভাত, চিচিঙ্গে সেদ্ধ আর শাপলার জোলো ঝোল। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা।

পুণ্যির আর দোষ কী! এই একফালি জমি। তাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনরকম চাষ। চাষের খরচ জুগিয়ে আর থাকেটা কী! পুন্যি ইস্টিশানের কাছে ঝোপড়ি হোটেলগুলোয় রাঁধে, বাসনও মাজে। বছরের পর বছর ধরে এই কাজ করে-করে ওর হাতগুলো খোঁদল হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় বুঝি বেটাছেলের হাত। হুঁঃ, বেটাছেলেই বটে! নইলে মা হতে পারে না! দয়াল অন্তরে ভাবে, পুন্যির মধ্যে কোথাও বুঝি পাপ আছে। ওর জন্যে কম জড়িবুটি করা হয়েছে! কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

এ এক দিক দিয়ে বোধহয় ভালোই হয়েছে। এই দিনকালে দুটি পেট টেনেহিঁচড়ে চলাই যে দায়!

দয়াল মাথার ওপরে সূর্যের দিকে তাকায়। সামান্য বুঝি হেলে পড়েছে পশ্চিমে। একটু দূরেই দুটো বাচ্চা-বাচ্চা মেঘ। নরু লস্করের বাছুর দুটোর মতো। ওরা গুটিগুটি এগিয়ে আসছে সূর্যের দিকে। তখন যদি খানিক ছায়া নামে!

দয়াল ক্রমে-ক্রমে পৌঁছে গেল রঙিন বাক্সটার কাছে। বাজিকর লোকটা নাচতে-নাচতে গান গাইতে-গাইতে ঝপ করে একটা গোপন দরজা খুলে দিল। ঠিক যেন ম্যাজিক, ভোজবাজি।

এ-খেলার টিকিট লাগে না? দয়াল একবার ভাবল। তারপর নেশা করা মানুষের মতো ঢুকে পড়ল বাক্সের ভেতরে ভোজবাজির ভুলভুলাইয়ায়। নিঝুম দুপুরে লোকটার গান তখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মিনিট পনেরো পরেই বেরিয়ে এল দয়াল। দুবার ঢেঁকুর তুলল। খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। প্রথমে নটে শাক, শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে শুরু। তারপর একে-একে নারকোল দিয়ে মুগডাল, বেগুন ভাজা, মাছের মুড়ো দিয়ে অকালের বাঁধাকপির তরকারি, আর ভেটকির ঝাল। সবার শেষে দই আর মিঠে পাতা এলাচ দিয়ে পান। এ একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন।

জিভের ডগা দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল দয়াল। খাবারের কুচো মনে হয় আটকে আছে দাঁতের ফাঁকে। ডালে নুন একটু টান-টান হয়েছিল, আর বাঁধাকপির তরকারিতে হলুদটা সামান্য বাড়তি ছিল। তবে মাছের ঝালটা বেশ রান্না হয়েছে—একদম কটকটে ঝাল। দয়াল ঝাল খেতে খুব ভালোবাসে। তার জন্যে পেটও ব্যথা করে মাঝেমধ্যে। শিবু ডাক্তার দ্যাখে, ওষুধ দেয়।

ঘরে ফিরে পুন্যিকে যখন বলল যে, কিছু খাবে না, তখন পুন্যি খুশি হল, আবার অবাকও হল। খুশি এই কারণে যে, ও আজ একপেটা খেতে পারবে। আর অবাক হল স্বামীটার কথা শুনে। এই ঘোর দুপুরে কে পাত পেড়ে খাওয়াবে লোকটাকে! তাও আবার কতরকম পদ! মিছে কথা বলছে না তো?

দয়াল তখন বিশদভাবে ওর খাওয়ার গল্প করছিল, আর ঝালের চোটে মুখ সরু করে বারবার শব্দ করে বাতাস টানছিল।

খাওয়াদাওয়ার পর পুন্যি চেপে ধরল দয়ালকে।

'বলো না গো, কে তোমায় অমন খাইয়েচে।'

দয়াল মাথা নাড়লঃ 'সে বলতে পারব নারে—।'

দয়ালের মনে পড়ে গেল সেই আজব লোকটার কথাঃ 'এই ক্ষুধাহরণের খেলার কথা কাউকে বোলো না হে। একদম গোপন রাখবে। বলে যদি দাও, তা হলে আর কোনওদিন তুমি আমার দেখা পাবে না—এ কথাটি নিশ্চয় জেনো।'

সুতরাং দয়াল ঠোঁট টিপে রইল। লোকটা কোথা থেকে এসেছে কে জানে! এ-গাঁয়ের তো নয়। তা হলে হয়তো ভিন-গাঁ কি ভিন-দেশ থেকে এসে পড়েছে এখানে। কিন্তু বিনিপয়সার খেলা দেখিয়ে তার কী লাভ? সে যাই হোক, মনে-মনে বাজিকরকে গড় করে দয়াল। আর তার গানের কলি কানে বাজতে থাকেঃ 'ক্ষুধাহরণের খেলা গো ভাই, ক্ষুধাহরণের খেলা...।'

ঠিক একইরকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল নদু শেখের জীবনে।

সময়টা তখন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। আকাশের দিকে তাকালে কে বলবে দশমিনিট আগেও ঝমাঝম বৃষ্টি নেমেছিল। এ বছরে বৃষ্টি ভালো হয়নি। অথচ আকাশ-বাতাস দেখলে মনে হয় বর্ষার বুঝি যাই-যাই ভাব। আর জল যদিও বা হয় তাও আলটপকা আচমকা। তাই নদুর রোজকার কাজ জোটে না ঠিকমতো। তিনদিন আগে আবহাওয়া অনুমান করে সরল মাইতির জমিতে ধান রুয়েছে। কিন্তু

তারপরই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মাইতির জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেছে, ডুবে গেছে ধানচারা। আর দু-তিনদিনের মধ্যে যদি জল ছাড়িয়ে চারাগুলো মাথাচাড়া না দেয় তো সব শেষ। কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে।

কাল নদুর কাজ ছিল না। মাইতির আর-একফালি জমিতে লাঙল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লাঙল গেল মেরামতিতে। তাই অন্য কোনও কাজ খুঁজতে বেরিয়েছিল নদু।

কাল কাজ জোটেনি, তবে আজ জুটেছে। পাট ছাড়ানোর কাজ। সুবল চৌধুরির পাট দু-সপ্তা ধরে ডোবায় পচছে। তারই আঁশ ছাড়াতে হবে। এ-ডোবায় আগে খেপলা জাল ফেলেছে নদু। তার জন্য পয়সাও পেয়েছে সুবল চৌধুরির কাছে।

অল্পসল্প বর্ষায় ডোবার জল কিছুটা বেড়েছে। সেই ডোবাতেই ঊরু-জলে দাঁড়িয়ে ছিল নদু। পাটের গোটাসাতেক লাট তখনও ভাসছে। একটা লাট নিয়ে তার গোড়ায় কাঠের মুগুর পিটল নদু। পরপর পিটুনি খেয়ে গোড়ার আঁশগুলো ছেড়ে গেল। তখন লাটের মাঝামাঝি জায়গায় হাতের চাপে লাটটা দু-টুকরো করে ফেলল। অমনি সাদা প্যাঁকাটির ডগা বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আঁশের জোড় থেকে গেল। হাত-পা ভেঙে হাড়ের ডগা যেমন উঁকি দেয়, অথচ মাসের জোড় টিকে থাকে —সেরকম।

নদু এবার অভ্যস্ত হাতে মুগুর পিটে-পিটে প্যাঁকাটির গোছ বের করে নিতে লাগল। যখন প্রায় বেরিয়ে এসেছে তখন মুগুর জলে ভাসিয়ে হাতের টান মেরে কাজ সারল। প্যাঁকাটির গোছা দুটো ছুড়ে দিল পাড়ে। তারপর পাটের লাছি থেকে টুকরো-টাকরা ভাঙা প্যাঁকাটি বের করে ফেলে দিল। পাটের লাছি জলে বারবার ডুবিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিংড়ে নিল গামছার মতো। তারপর প্যাঁচ দিয়ে গেঁট মেরে লাছিটা ছুড়ে দিল পাড়ে।

নদুর ডানা দুটো ব্যথা করছিল। গায়ে-পিঠে চড়চড়ে রোদ্দুর। অথচ ঊরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঠান্ডা। দু-একটা মেনি মাছ আর জলপোকা নদুর পায়ে মাঝে-মাঝে ঠোকর মারছিল, ওর সেদিকে কোনও লক্ষ ছিল না। কারণ খিদের চোটে পেটের ভেতরে তখন ইঁদুরদের তাণ্ডব নৃত্য।

আর পারা যাচ্ছে না। জলের মধ্যে পাঁকের ওপর পা ফেলে-ফেলে শরীরটা পাড়ে টেনে তুলল নদু। পাটের অনেকগুলো লাছি পড়ে আছে পাড়ে। পেটটা শান্ত করে এসে তারপর সেগুলো ছড়িয়ে দেবে রাস্তার ধারের দড়িতে। প্যাঁকাটির গোছগুলোও শুকোতে দেবে।

নদু রাস্তায় উঠে এল। রাস্তার ধার ঘেঁষে ভিজে পাট শুকোচ্ছে দড়িতে। আর প্যাঁকাটির পাঁচ-ছ'টা গোছা টুপির মতো করে দাঁড় করানো সার দিয়ে।

নদু তাকাল চারপাশে। দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে দুটো ফিঙে বসে। পাশের মাঠে তিনটে গরু চরে বেড়াচ্ছে। ডাকছে মাঝে-মাঝে।

আকাশের দিকে তাকাল নদু। পরিষ্কার। দু-চারটে সাদা মেঘ। কিন্তু ধানজমির শেষ প্রান্তে একসার ঝাঁকড়া গাছের পিছনে আকাশের গায়ে কালো মেঘের পটি। বৃষ্টি আসতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যে। তা হলেই মাইতির চারা শেষ। ওই চারাগুলোয় নদুর হাতের স্পর্শ ছিল।

রাস্তা ধরে কয়েক পা ফেলামাত্রই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পেল নদু শেখ। ঠিক যে-দৃশ্য দেখেছিল দয়াল মানিক।

সুতরাং নদু যেন নেশার টানে বাঁধা পড়ল। ওর পা ওকে টেনে নিয়ে চলল ধানখেতের মাঝে দাঁড়ানো ঝকমকে রঙিন বাক্সটার দিকে। রং পালটানো বাক্স ঘিরে রঙিন পোশাক পরা ভিন-দেশি মাদারি তখন নাচছে, গাইছে, ডাকছে গান গেয়েঃ

'ক্ষুধাহরণের খেলা গো ভাই

ক্ষুধাহরণের খেলা

এ-খেলাটি খেললে পরে

খিদে—থাকবে না দুইবেলা—'

ক্রমে-ক্রমে নদু শেখ পৌঁছে গেল সেই রঙিন জগতের দরজায়। পেটের মোচড় নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ভেতরটা অন্ধকার, ছোট্ট একটা ঘরের মতো। সেই ঘরে নদু যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই একটা দেওয়ালে একটা ছবি ফুটে উঠল—বায়োস্কোপের ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা বড় স্টেইনলেস স্টিলের থালা, তার পাশে এক গ্লাস জল। থালার পাশেই একটা হাত—অপেক্ষা করছে। থালায় খাবার দেওয়ার অপেক্ষা। হাতের চেহারা কালো, শিরা ওঠা। নদু জানে, এই মুহূর্তে যদি ও নিজের হাতটা দেখতে পেত তা হলে ছবির হাতের সঙ্গে তফাত খুঁজে পেত না।

থালায় চার হাতা ভাত দিল কেউ। গরম-গরম ভাত। ভাপ উঠছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে।

নদু শেখ গরম ভাতের তাপ টের পেল। ঘ্রাণও এল নাকে। আ—ঃ! নদুর জিভে জল এসে গেল। আর ঠিক তখনই কেউ দু-চামচ ঘি দিল পাতে। একটু নুন দিল। টিয়াপাখির মতো সবুজ দুটো কাঁচালঙ্কা দিল।

কালো হাতটা ঘি দিয়ে ভাত মাখতে শুরু করল। তারপর ভাতে নুন ও কাঁচালঙ্কা মেখে নিল কালো হাতটা। আর নদু শেখ ওর জিভে গরম-গরম ঘি-ভাতের স্বাদ পেল।

ঘিয়ের পরেই গরম গরম ডাল। তাতে পেঁয়াজ ভাজা আর ফোড়ন দিয়ে সম্ভার দেওয়া। আর ডালের সঙ্গে নারকোল দিয়ে মোচার ঘণ্ট—ঘণ্ট থেকে গরম মশলার গন্ধ বেরোচ্ছে।

নদু শেখ দেখছিল কালো হাতটা কেমন পাগলের মতো ডালভাত মেখে মোচার ঘণ্ট দিয়ে খেয়ে চলেছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে নদু, গন্ধ পাচ্ছে, টের পাচ্ছে রান্নার প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বাদের কণা।

ওর মনে হচ্ছিল বুঝি ও নিজেই খেয়ে চলেছে গপগপ করে।

অন্ধকার ঘরে, এইভাবে, চলতে থাকল ক্ষুধাহরণের খেলা।

ডালের পর এল বড় পোনা মাছের কালিয়া আর সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ। পাতে আরও দু-হাতা গরম ভাত পড়ল। কালো হাতটা খেতে লাগল আয়েস করে, আয়েস করে। এবং সবশেষে থালা চেটেপুটে আঙুল চুষে শেষ করল খাওয়ার পাট।

পরপর দু-গ্লাস জল খেল বায়োস্কোপের হাতটা। কিন্তু এমনই সে-ছবির চালাকি যেন মনে হল নদু শেখই ঢকঢক করে জল খাচ্ছে, ওরই গলা থেকে খাবারের দলা নেমে গেল পাকস্থলীর দিকে।

নদু শেখ তৃিপ্তর ঢেঁকুর তুলল অন্ধকার ঘরে। ওর কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল!

একটু পরেই রঙিন ঘরের ভেতরে পরদার বায়োস্কোপ মিলিয়ে গেল আর দরজা খুলে গেল। বাইরের ধানখেতে বেরিয়ে এল নদু। আর সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

এপাশ-ওপাশ নজর চালিয়েও মাদারিকে আর দেখতে পেল না নদু। মাথার ওপরে মেঘ জেমেছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে। হলদে ফড়িং-এর ঝাঁক উড়ছে এখানে ওখানে।

ধানখেত ধরে রাস্তার দিকে এগোল নদু। সারের বস্তা বোঝাই করে গরুর গাড়ি চলেছে রাস্তা দিয়ে। তার পিছনে দুটো সাইকেল। না, ওরা কেউই দেখছে না রঙিন জাদুঘরটার দিকে।

নদু একবার তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। আশ্চর্য! ভোজবাজি যেন। কেউ নেই! না ওই রঙিন জাদুঘর, না তার রঙিন জাদুকর! হুস করে কোথায় মিলিয়ে গেছে। সে মিলিয়ে যাকগে। পরে আবার এরকম কোনও ঘোর দুপুরে তার দেখা পেলেই হল।

রাস্তায় উঠে এল নদু। বড় ঘুম পাচ্ছে ওর। চলতে-চলতে পুরোনো একটা ধানকল চোখে পড়ল। ধানকলটা এখন অচল। দরজায় জং ধরা তালা। বাইরের দাওয়ায় দুটো পুরোনো আমলের লোহার সিন্দুক। ডালা কাত হয়ে বেঁকে আছে।

ধানকলের দাওয়ায় উঠে পড়ল নদু শেখ। দাওয়ার মাথায় টিনের চাল। তার নানা জায়গায় ফুটো।

ফাটল ধরা ইট বের করা দাওয়াতে শুয়ে পড়ল নদু। আর তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। সামনের গাছপালা, খেত, খোড়ো কুঁড়েঘর সব ঝাপসা হয়ে গেল। কয়েকটা শকুনি-মুরগি রাস্তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বৃষ্টি নামতেই সামনের সাইকেল সারাইয়ের দোকানের চালার নীচে ঢুকে পড়ল। কঁক-কঁক করে ডাকতে লাগল।

বৃষ্টি আরও জোরে ঝেঁপে এল। দুটো কালো ছাগল কোথা থেকে খোঁটা উপড়ে এসে দড়ি খোঁটা সব টানতে-টানতে ম্যা-ম্যা করে ডাকতে-ডাকতে ছুটে চলল রাস্তা দিয়ে।

বৃষ্টির সঙ্গে বেড়ে উঠল বাতাসের তেজ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে তালগাছ দুলতে লাগল। বৃষ্টির ছাট নদুর গায়ে এসে লাগছিল। কিন্তু তারই মধ্যে ওর চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমের মধ্যে ও সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগল।

ঠিক ঘণ্টাখানেক পরেই খিদের তীব্র মোচড়ে নদু শেখের ঘুম ভেঙে গেল।

ও কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। ক্ষুধাহরণের খেলা খেলার পর কী করে সেই পুরোনো খিদে সাতগুণ ভয়ংকর হয়ে আবার ফিরে আসে? এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! মোচার ঘণ্ট, পোনা মাছের কালিয়া, সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ—ওগুলো সব গেল কোথায়? সবই কি তা হলে বায়োস্কোপের মায়া? ক্ষুধাহরণের খেলা তা হলে শুধুই খেলা!

ক্ষুধার্ত নদু শেখ তাজ্জব হয়ে ভাবতে থাকে। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ বাজিকর বলে দিয়েছিল বারবার করেঃ 'এ-খেলার কথা কাকপক্ষীকেও বোলো না হে। এ বড় গোপন চতুরালি। যদি গোপন রাখো তবেই আবার আমার দেখা পাবে—এ কথাটি নিশ্চয় জেনো।'

ক্ষুধাহরণের খেলা খেলার পর, ঘণ্টাখানেক পর, দয়াল মানিকেরও তীব্র খিদে পেয়েছিল। কিন্তু লজ্জায় সে-কথা ও পুন্যিকে বলতে পারেনি। অবশ্য বলেও কোনও লাভ ছিল না। কারণ ততক্ষণে পুণ্যির খাওয়া শেষ, চেটেপুটে শেষ।

সুতরাং দয়াল মানিক আবার কাজের অজুহাতে পথে বেরিয়ে পড়েছে—যদি আবার সেই অদ্ভুত মাদারির দেখা পেয়ে যায়।

না, দেখা পায়নি।

তবে দিনের পর দিন অনেকেই সেই অদ্ভুত প্রাণীটার দেখা পেল। ঘোর দুপুরের গনগনে রোদে নির্জন ধানখেতের মাঝে। আর ক্রমে-ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল এই আশ্চর্য জাদুকরের কথা। গাঁয়ের প্রায় সকলেই জেনে গেল তার ক্ষুধাহরণের খেলার কথা। যারা এই খেলা খেলতে পারেনি তারা সন্নাটা দুপুরে খুঁজতে লাগল লোকটাকে।

প্রৌঢ় খালেক মিঞা তাকে খোঁজে।

বুড়ি মতিয়া তাকে খোঁজে।

বালক নির্মল পাইক খোঁজে তাকে।

কিশোরী সরিফাও খোঁজে।

খোঁজে জোয়ান মানুষের দল।

আর দয়াল মানিক কিংবা নদু শেখও খোঁজে তাকে। আরও একটিবার যদি ওই খেলা খেলার সুযোগটি মিলে যায়।

সেদিন বিকেলে এই বর্ণচোরা মাদারিকে নিয়েই জটলা চলছিল রতনের চায়ের দোকানে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চায়ের দোকানের খড়ের চাল থেকে ছ'টা-আটটা সবুজ ধানগাছ বৃষ্টির জল পেয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে। দোকানের ভেতরে রেডিয়োতে গান চলছেঃ 'আমার গরিব নওয়াজ...ও আমার গরিব নওয়াজ...' আর বাঁশের তৈরি বেঞ্চে বসে আছে চার-পাঁচজন মানুষ। তাদের হাতে চায়ের গ্লাস।

সলিল পাত্র এখানকার হাইস্কুলের মাস্টার। কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে। সে কথা বললে আর সকলে মনোযোগ দিয়ে শোনে। এখনও শুনছিল। শ্রোতাদের মধ্যে রতনও ছিল। তক্তপোশে বসে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে বিস্কুটের বোয়েম সাফ করছিল আর কান খাড়া করে শুনছিল সলিল মাস্টারের কথা।

সলিল পাত্রের বয়েস অল্প। চোখা নাক-মুখ। চোয়ালের হাড় উঁচু। গাল সামান্য বসা। মাথায় কোঁকড়া চুল। চোখ চকচকে। আর সবসময় চেঁচিয়ে কথা বলে।

কাল দুপুরে হাইস্কুলের একটা ছাত্র সামনের পুকুরে ডুবে মারা গেছে। সাঁতার জানত ছেলেটা, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কী করে ডুবে মারা গেল কেউ জানে না। এ নিয়ে সারাটা দিন ধরে অনেক জল্পনাকল্পনা হয়েছে রতনের দোকানে। আর সত্যি কথা বলতে কি, তাতে দোকানে ভিড় বেড়েছে, বিক্রিবাটাও হয়েছে অন্যদিনের তুলনায় বেশি।

আজ সকালে ছেলেটার লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে।

এই দুর্ঘটনার জন্য হাইস্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে আজ। সকাল থেকে একটু আগে পর্যন্ত ওই ছেলেটার মৃত্যু নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল রতনের দোকানে। হঠাৎই কে যেন তুলে দিয়েছে সেই বাজিকরের কথা। আর তারপরই একে-একে এসে গেছে দয়াল মানিক, নদু শেখ ও আরও অনেকের কথা।

সলিল মাস্টার চেঁচিয়ে কথা বলছিল, '...এসবে বিশ্বাস করার কোনও মানে নেই, নারানদা। ওসব ওদের চোখের ভ্রম, মরীচিকা। কী দেখতে কী দেখেছে সে ওরাই জানে! কই, আমি তো দেখতে পাইনি! আমি তো হাটে-মাঠে কত ঘুরি—।'

নারান মণ্ডল বাঁ-হাতে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল, ডানহাতে বিড়ি। ময়লা ধুতি টেনে কোলের কাছে জোট পাকানো। ফোকলা মুখ নেড়ে বলল, 'তার মানে আপনে বলতি চান সক্কলে ভুল দেখেছে? ভুলই যদি দেখবে তা হলে ওদের খিদে তেষ্টা মরল কেমন করে, বলেন—।'

সলিল পাত্র চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে হাত নাড়ল, বলল, 'আঃ হা, আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। সত্যি-সত্যি ওদের খিদে তেষ্টা মরেছে কি? ওই কিছুক্ষণের জন্যে খিদের ব্যাপারটা শুধু ভুলিয়ে রেখেছে। ওভাবে কি খিদে চাপা দেওয়া যায়?'

আর-এক শ্রোতা হরিপদ সাহা বলে উঠল, 'তা হলে কি মাস্টারমশায় ব্যাপারটা ভূত-প্রেতের কারসাজি? কিন্তু ভূত-প্রেত দিনদুপুরে দেখা যাবে এও কি বিশ্বেস করা যায়, বলুন—।'

বোতল সাফ করা থামিয়ে রতন বলল, 'এর পেছনে কারও ফন্দি নাই তো?'

সলিল পাত্র দাঁত দিয়ে নখ কাটল। ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে বলল, 'এখন তো এইসবই চলছে। খিদের জ্বালা ভুলিয়ে রাখার কারসাজি। এভাবে জ্বালা কখনও কেউ ভোলে, নারানদা!' রতনের দিকে তাকিয়ে সলিল বলল, 'এসব যদি ওদের চোখের ভ্রম না হয় তা হলে নিশ্চয় জানবে এর পেছনে কারও মতলব আছে, কারসাজি আছে।'

সলিল পাত্রের জোরালো কথায় ঘাড় নাড়ে রতন। নারান মণ্ডল, হরিপদ সাহাও ঘাড় নাড়ে। মাস্টারমশায় ঠিকই বলেছে। কিন্তু কাল দুপুরে ওই কচি ছোঁড়াটা হঠাৎই বা অপঘাতে মারা গেল কেন? ঘোর দুপুরে কোনও জিন কি গাঁয়ের মাথায় ভর করেছে?

ওরা সকলে সলিল পাত্রের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ওদের বুকের ভেতরে একটা লালসা চুপিসারে কাজ করছিল। ইস, একটিবার যদি ওই মাদারির দেখা পাওয়া যায়! যদি একটিবার ওরা খেলতে পারে ক্ষুধাহরণের খেলা!

বাইরে তখন বৃষ্টি ও অন্ধকার—দুয়েরই তেজ বেড়েছে।

সলিল পাত্র যখন দলবল নিয়ে গাঁয়ের মাঠে-ঘাটে বনেবাদাড়ে তন্নতন্ন করে সেই শয়তান বাজিকরের তল্লাশ করছে, সে তখন গাঁয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে—ঘিয়া নদী পেরিয়ে অশ্বত্থ, পাকুড়, ইউক্যালিপটাসের জঙ্গলে আলোছায়ার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। পরনে তার সেই অদ্ভুত রঙিন পোশাক। কিন্তু বহুবর্ণ গাড়িটা—অথবা ভোজবাজির সেই ঘর—কোথাও চোখে পড়ছে না।

ভিনগ্রহীর পোশাক পরা মানুষটা গাছের ছায়ার আধোআঁধারিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎই কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার পোশাক ছাড়তে শুরু করল। গায়ের জোব্বা, মাথার অদ্ভুত টুপি ইত্যাদি খুলে ফেলতেই মাদারির সারেগামা পাঁজর দেখা গেল। তার গায়ের রং, চামড়ার ভাঁজ আর কৃশকায় চেহারা দেখে মনে হয়, তার নাম দয়াল মানিক অথবা নদু শেখ হতে পারত খুব সহজেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মাদারি হাঁপায়। মেঘ নেই একফোঁটা। সব যেন শুকনো কাঠ। শরীরের ভেতরটাও। খিদের নাগরদোলা ঘুরছে নাভিকে ঘিরে। এখন তাকে যেতে হবে আর-এক মাদারির খোঁজে—যে তাকে ভাতা দেয়, ভাত দেয়, ক্ষুধাহরণের খেলা দেখানোর গাড়ি দেয়, সাজসজ্জা দেয়।

এত খিদের মধ্যেও হাসি পায় মানুষটার। আশ্চর্য! যে আর-একজনের কথামতো ভোলাভালা মানুষগুলোকে ভরদুপুরে ধানখেতের মাঝে রোজ ক্ষুধাহরণের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় সে খিদে ভুলে থাকতে পারছে না কিছুতেই!

মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লান্ত দেহে পথ চলতে থাকে লোকটা। মনে-মনে শপথ নিতে চায়, আর কখনও এই খেলা দেখাবে না সে। বরং ওই ভোলাভালা মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর ভরদুপুরে সবাই মিলে খুঁজে বেড়াবে আসল মাদারিকে—যে সবসময় আড়ালে থেকে সবাইকে পুতুলনাচের খেলা দেখায়।



সুখ-দুঃখের সরণি

চিৎকার-চেঁচামেচি ইত্যাদি রাস্তা থেকেই শুনতে পাচ্ছিলেন সুরনাথ।

মালবিকার গলা। স্বর তীব্র করে কথা বলছে অলকার সঙ্গে। সাদা কথায় ঝগড়া। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। কারণ বলামাত্রই ছোট চোখ বড় করে অবাক গলায় চিৎকার করেই বলবে, ‘কী বলছ, দাদা! ঝগড়া কোথায়? আমি শুধু বউদিকে বলছিলাম—।’

বাকিটা আর শোনার প্রয়োজন নেই। সুরনাথের কাছে যেটা ঝগড়া মনে হয়, মালবিকার কাছে তা কোনওমতেই ঝগড়া নয়। অল্পবয়েসে স্বামী ভানুপ্রতাপ মারা যাওয়ার পর থেকেই মালবিকা রুক্ষ হয়ে গেছে। অথচ তার আগে ওর কথাবার্তা কী সুন্দর ছিল! সুরনাথের ভালো লাগত। ভালো লাগত আর সবার।

ভানুপ্রতাপের টিটেনাস হয়েছিল। একেবারে হঠাৎ। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মালবিকাকে বলেছিল, জুতোর শুকতলা ফুঁড়ে নাকি একটা পেরেক ঢুকে গেছে পায়ে। তারপর ডাক্তার দেখানোর গা করেনি। শুধু লাল ওষুধ লাগিয়ে সেঁক দিয়েছিল। কিন্তু দেড়দিন পরেই পা ফুলে ঢোল। ডাক্তার, হাসপাতাল। তারপর আড়াইদিনের টানাপোড়েনের পর সব শেষ। একটা বইয়ের অনেকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কেউ যেন আচমকা শেষের পাতাটা তুলে ধরল চোখের সামনে। সমাপ্ত।

ভানুপ্রতাপের শেষ সময়ে সুরনাথ কাছে ছিলেন। একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ দিয়েছিল কোম্পানি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। শেষশয্যায় ভানুপ্রতাপকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওঁরা তিনজনঃ সুরনাথ, মালবিকা, আর মালবিকার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আটবছরের রানা—রানাপ্রতাপ।

ভানুপ্রতাপ ঠোঁট নেড়েছিল, কিন্তু তাতে শব্দ ওঠেনি। ওর চোখ-মুখ দেখে সুরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন ওর কথা। তাই মালবিকার মাথায় আশ্বাসের হাত রেখেছিলেন। চোখের জল

লুকোনোর চেষ্টা করেননি। সুরনাথ নির্বোধ, সেইজন্যেই কিছু লুকিয়ে রাখতে পারেন না।

মালবিকা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। রানা প্রথমটায় স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু হঠাৎ মা-কে কেঁদে উঠতে দেখেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল। কান্না এত সংক্রামক যে, বলার নয়।

কাঁদতে-কাঁদতেই 'বাবা! বাবা!' বলে কীসব বলছিল রানাপ্রতাপ। একটা কথাও বোঝা যাচ্ছিল না। তবে বালকের শোকের সুর সুরনাথের বুকে গভীর দাগ কেটে দিচ্ছিল। সম্পর্কের সুতোয় মৃত্যু বেপরোয়া টান দেয় সবসময়। বড় অবাধ্য।

অফিস আর ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি থেকে ভানুপ্রতাপের পাওনাগন্ডা বুঝে পেতে মাসছয়েক মতো লেগেছিল। তারপরই বেহালার অফিসের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মালবিকা আর রানা চলে এসেছিল সুরনাথের কাছে। সে কি আজকের কথা!

দেখতে-দেখতে সাতাশটা বছর গড়িয়ে গেছে। এসেছে ছেলে অপরূপ, আর মেয়ে মমতা। সুরনাথ মাঝবয়েসি থেকে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন। আর অলকার সুন্দর মুখশ্রী ভরাট হতে-হতে, চিবুকে ভাঁজ পড়তে-পড়তে কখন যেন বার্ধক্য ছুঁয়ে ফেলেছে।

বাড়িতে ঢুকে সুরনাথ লাঠিতে ভর দিয়ে সবে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছেন, রাণুর মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি। হাতে আবর্জনার পুঁটলি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আর-এক হাতে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে চেষ্টা করল রাণুর মা।

সুরনাথ হাসলেন মনে-মনেঃ রাণুর মায়ের মাসমাইনে তিনি দেন না, দেয় রানা আর অপু। তবুও এই কাজের মহিলা সুরনাথকে সমীহ করে। এ কি বয়েসের পাওনা?

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে মালবিকার গলার স্বর ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল। বিষয়টা কী? ভাবলেন সুরনাথ। তারপর মাথা নাড়লেন। বিষয় জেনে কোনও লাভ নেই। কারণ সমাধানের পদ্ধতিটা তাঁর জানা। এ-বাড়িতে যে-সমস্যাই মাথাচাড়া দিক না কেন, দেখা গেছে তার সমাধানের পথে একমাত্র বাধা সুরনাথ। সমস্যাটা কখনও ঘরের, কখনও খাটের, কখনও টেবিলের বা বাথরুমের—অর্থাৎ, যা হোক কিছু হলেই হল। অঙ্কের উত্তর যেহেতু সবসময় জানা সেহেতু অঙ্কের ধরন-ধারণ জানার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ আর নেই। এ যেন যে-কোনও বিষয় থেকে ঘুরে-ঘুরে সেই গরু রচনায় ফিরে আসা।

সুরনাথের মাথার তালুর কাছে সাদা চুলের আস্তানায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। তবু আশ্চর্য, ওই জায়গাটাই বারবার চুলকোয়। চটি ছেড়ে পাপোশে পা মুছে ঘরে ঢুকলেন। জানলার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখলেন হাতের লাঠিটা। ঝগড়ার বিষয়টা তাঁর কানে ঢুকে পড়ছিল এবার। না, এখন অলকা নয়, অপুও নয়। মালবিকা চিৎকার করছে ছেলের সঙ্গে। রানার সঙ্গে।

'তুই আর আমাকে শেখাতে আসিস না। দিনরাত্তির খালি তনুর কথায় নাচবি।'

'মা! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' রানাপ্রতাপ গম্ভীর গলায় বলল।

তনু—তনুশ্রী রানার বউ। তনু আবার কী করল?

'তুই যা তো এখান থেকে। মেয়েদের কথায় থাকতে লজ্জা করে না তোর? আমার গয়না ভাঙব না গড়ব সে আমি ঠিক করব। কেন, তনুকে কি কম দেওয়া হয়েছে? জিগ্যেস কর না তোর মামিকে, কোন সাতনরী হার দিয়েছিল মমতাকে—।'

রানাই প্রথম সুরনাথকে দেখতে পেল। চুপ করে গেল বটে, কিন্তু মুখে বিরক্তির ছোঁওয়া লেগে রইল।

অলকা আলতো গলায় বলল, 'এখন থাক, ছোড়দি—।'

মালবিকা ঠাকুর পুজোয় বসবে বোধহয়। কারণ হাতে ক'টা শিউলি আর নয়নতারা ফুল। দোতলার পিছনদিককার বারান্দায় চার-পাঁচটা ফুলগাছের টব আছে। মালবিকা তার তদারকি করে। আর মাঝে-মাঝে সুরনাথের নাতি পলাশ। রানাপ্রতাপের ছেলে। সাড়ে সাতবছর মাত্র বয়েস, কিন্তু ভীষণ চটপটে, ফুটফুটে।

এখন সকাল সবে আটটা। নভেম্বরের শেষ। বাতাসে শীতের আলপিন। সুরনাথ রোজ উষাভ্রমণে বেরোন ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। যদি কুয়াশার আড়াল না থাকে তা হলে শুকতারাকে চিনে নেওয়া যায়। মাফলারে কান-গলা ঢেকে, পায়ে উলের মোজা পরে সুরনাথ বেরিয়ে পড়েন। কাঁপা ঠোঁটে গুনগুন গানের কলিঃ শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া করো দীনজনে...।

উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলটা গলিময়। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনে শুধু গলি। বড় রাস্তা খুঁজে পাওয়া ভার। নতুন কোনও লোক এ-অঞ্চলে এলে পথ হারিয়ে ফেলবেই। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা ঠাট্টা করে বলে ভুলভুলাইয়া সরণি। তা এই ভুলভুলাইয়া সরণির এ-গলি ও-গলি করে একসময় একটা খোলা মাঠে পৌঁছে যান সুরনাথ। একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখেন। তখন বাচ্চা বয়েসের কথা মনে পড়ে যায়। মাইকেলনগরে বাবার হাত ধরে ভোরবেলায় বেরোতেন রোজ। কী ভালো লাগত! বাবা হাঁটতেন আর নানা গল্প শোনাতেনঃ জন্তু-জানোয়ারের গল্প, মানুরে গল্প, আর গাছপালা নদীনালার গল্প। বাবা জরিপের কাজ করতেন, ঘুরে বেড়াতেন নানা জায়গায়। খুব ধার্মিক ছিলেন। অনুগত ছিলেন দেবদেবীর। অপ্রিয় সত্য বলতে সঙ্কোচ করতেন না।

বাবা চলে গেছেন প্রায় চার যুগ আগে। তবুও দীর্ঘকায় ঋজু মানুষটাকে সুরনাথ কখনও ভুলতে পারেন না। ফুল সাজানো খাটে তাঁর শোয়ানো মৃতদেহও ছিল টানটান। বাবা সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি। সুরনাথ, অলকা, মালবিকা কাঁদছিল। বাবা দুর্বল স্বরে বলেছিলেন, 'কেঁদো না। পুরোনো চলে না গেলে নতুনের জায়গা হবে কেমন করে?' তারপর

কিছুক্ষণ দম নিয়ে সুরনাথকে বলেছিলেন, 'জ্ঞানত তোমাকে কখনও কুশিক্ষা দিইনি। কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না। মালাকে তোমার দায়িত্বে রেখে গেলাম।'

সেই বাবার শেষ কথা।

ভোরের মাঠে ছেলেরা ছুটোছুটি করে বল খেলছিল। ঘাসে হিম পড়েছে। যেখানে ঘাস নেই সেখানে পায়ে-পায়ে সামান্য ধুলো উড়ছিল। এই মাঠেই একসময় বল খেলেছে অপরূপ। ধুলো তখনও উড়েছে, কিন্তু এ-ধুলো নতুন। পুরোনো ধুলো আর নেই। পুরোনো চলে না গেলে নতুনের জায়গা হবে কেমন করে?

হাত-পা নেড়েচেড়ে ব্যায়াম করছিলেন সুরনাথ, একটা ছেলে খেলা থামিয়ে হঠাৎই তাঁকে জিগ্যেস করল, 'দাদু, ক'টা বাজে?'

সুরনাথ সূর্যের অবস্থান দেখে অনুমান করে বললেন, 'সাড়ে ছ'টা হবে—'

সূর্যই এখন সুরনাথের ঘড়ি।

সূর্যের দিক থেকে চোখ নামিয়ে আকাশরেখা দেখলেন। মনটাকে মাঝে-মাঝে ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ওই আকাশরেখার দিকে, যেখানে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই—গরু রচনাও নেই।

ধীরে-ধীরে বাড়ি ফেরার পথে অদ্ভুত কতকগুলো কথা মনে হচ্ছিল সুরনাথের। দুঃখ কাকে বলে? সুখই-বা কী? আনন্দ কাকে বলে?

আজকাল এসবই মনে হয়। ছোটবেলার খেলার সাথীদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে স্কুলের কথা। মাইকেলনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় এই এতটুকু। মাঠঘাট গাছপালাটাই ছিল বেশি। বকুল গাছ থেকে বকুল ফল পাড়তেন। তারপর বকুল বিচি ঘষে-ঘষে বাঁশি। সেই বাঁশির বিনিময়ে বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া যেত অনেক কিছুঃ পেনসিল কাটার কল, রঙিন ছবি, কত কী!

চুমকির কথাও মনে পড়ে। ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে। জনার্দনস্যারের কোচিংয়ে পড়তে যেত। খুব হাসত। যে-কোনও কথাতেই হাসত। কোচিংয়েই প্রথম আলাপ হয়েছিল। তারপর নীতিন আর পরি—দু-বন্ধুর প্ররোচনায় কত না কাণ্ড করেছিলেন সুরনাথ! কাগজের বল ছোড়াছুড়ি, চুমকির প্র্যাকটিক্যাল খাতায় ছবি এঁকে দেওয়া, ওকে গল্পের বই পড়তে দেওয়া। তারপর সেই বইয়ের মধ্যে করেই একদিন চিঠি। ওঃ, কী ভয়! কী ভয়! চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বুকের ভেতরে যেন ফুটবল খেলা চলছিল। তারপর...।

এমনি করেই কেটে গিয়েছিল কয়েক মাস। বাবা-মা আত্মীয়স্বজনকে লুকিয়ে এই খেলায় এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। তারপর হঠাৎই একদিন চুমকিরা বেড়াতে গেল বসিরহাট—ওর মাসির বাড়ি। বলেছিল, ফিরে আসবে পনেরোদিন পর। চোদ্দোদিন যেতে-না-যেতেই সুরনাথ নীতিনকে সঙ্গে করে যশোর রোডের কিনারায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন সারাদিন। প্রত্যেকটা বাস থামামাত্রই

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন বাস থেকে নামা যাত্রীদের। বুকের মধ্যে জোরে-জোরে শব্দ হতো। কিন্তু সেই চেনামুখ মেয়েটা নামত না। পনেরোর পর ষোলো, সতেরো...কুড়িদিন পেরিয়ে গেল।

একদিন ফিরে এল ওরা সবাই। শুধু চুমকি ছাড়া। পরে খবর পেলেন পরির কাছে। ও নাকি বসিরহাটেই থাকবে। ওখানে থেকেই পড়াশোনা করবে।

আশ্চর্য! সেদিন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন সুরনাথ। একটা মাছ কেউ আচমকা তুলে ফেলেছে ডাঙায়। মাছটা ছটফট করছে, কিন্তু মরছে না কিছুতেই।

পরি আর নীতিনের কথায় একদিন বসিরহাটে গিয়েওছিলেন সুরনাথ। এলোমেলোভাবে খুঁজেছিলেন মেয়েটাকে। জানা কথাই, এভাবে ঠিকানা ছাড়া কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু তবুও মন মানতে চায়নি। বারবারই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হঠাৎ করে রাস্তার মাঝে দেখা হয়ে যাবে চুমকির সঙ্গে। বেনি দুলিয়ে কোচিংয়ে পড়তে যাচ্ছে।

না, দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। ফেরার সময় সারাটা পথ মুখে রুমাল গুঁজে চোখের জল ফেলেছেন সুরনাথ। পরি আর নীতিন অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

সেই সময়ে বারবারই মনে হতো আত্মহত্যার কথা। কত মানুষই তো কত দুঃখে শেষ করে দেয় নিজের জীবন। খবরের কাগজে রোজই তো থাকে কারও-না-কারওর চলে যাওয়ার খবর। কিন্তু বাবা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করতেন নিয়মিত। বলতেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। সুরনাথকে সেই পাঠ শুনতে হতো। পাঠ শুনতে-শুনতে ডুরে শাড়ি পরা হারানো মেয়েটার জন্য কাঁদতেন সুরনাথ। বাবা ভাবতেন, চোখের জল দ্রৌপদীর দুঃখের জন্য, অথবা লাঞ্ছিতা সীতার জন্য।

সুরনাথ আত্মহত্যা করেননি। কিন্তু পথেঘাটে চুমকির মতো শাড়ি পরা কোনও মেয়েকে দেখলেই তাঁর বুকে হঠাৎই হাতুড়ি পড়ত। কল্পনায় ওকে দেখতে পেতেন বসিরহাটের কোনও বাড়িতে। সে-বাড়ির বাগানে দুটো বকুল গাছ। বাতাসে নড়ছে।

ধীরে-ধীরে বয়েস বেড়েছে সুরনাথের। বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তখন নিজেকে বুঝিয়েছেন, প্রত্যেক মানুরে জীবনেই এরকম একটা ছেলেমানুষি ভালোবাসা থাকে। এর কোনও দাম নেই।

অথচ আজ কিছুদিন ধরেই চুমকির কথা খুব মনে পড়ছে। আর আত্মহত্যার কথাও। কিন্তু একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছে, এই খবরটা কেমন শোনাবে? বৃদ্ধদের আত্মহত্যা মানায় না। আত্মহত্যা করারও একটা বয়েস থাকে। সে-বয়েস সুরনাথ পেরিয়ে এসেছেন বহুদিন। তাই আত্মহত্যার কথা মনে হলেই সুরনাথ তাঁর সাদা বাক্স আর কালো বাক্স নিয়ে খেলতে বসে যান।

এ এক অদ্ভুত খেলা! সুরনাথের নিজের তৈরি।

সকলের জীবনেই সুখ-দুঃখের স্মৃতি থাকে। সুরনাথেরও আছে। এই স্মৃতিগুলো তিনি ভরে রেখেছেন দুটো কাল্পনিক বাক্সে। সুখের স্মৃতি রাখার বাক্সটার রং সাদা। আর দুঃখের স্মৃতিগুলো রেখেছেন কালো রঙের একটা বাক্সে। সন্দেহ নেই, কালো বাক্সটা সাদা বাক্সের চেয়ে মাপে অনেক বড়। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই বোধহয় তাই।

সুরনাথ মাঝে-মাঝেই এই বাক্সগুলো নিয়ে খেলতে বসে যান। রাতের অন্ধকারে অলকার পাশে চোখ চেয়ে শুয়ে থাকেন সুরনাথ। খেলতে থাকেন সাদা বাক্স কালো বাক্সের খেলা। এ-খেলায় অনেক সুবিধে। একা-একাই খেলা যায়। আর খেলার সময় কোনও শব্দ কিংবা হইচই হয় না।

কল্পনায় সাদা বাক্সটা কোলের ওপর তুলে নেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে একটা-একটা করে সুখের স্মৃতিগুলো বের করেন। সেগুলো ঘষে-মেজে ঝকঝকে করে তোলেন, যাতে কোনওদিন মলিন না হয়। এর মধ্যে রয়েছে হারানো ছেলেবেলা, মাইকেলনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চুমকি, পরি, নীতিন, বাবার হাত ধরে বেড়ানো, মায়ের আদর, অলকার সঙ্গে ফুলশয্যার রাত, ওকে নিয়ে পুরীতে বেড়িয়ে আসা দিনগুলো, মালবিকার বিয়ে, অপরূপ আর মমতার পৃথিবীতে আসা, মমতার বিয়ে, আর সবশেষে রানাপ্রতাপের ছেলে—সুরনাথের নাতি পলাশ—সবচেয়ে প্রিয় খোকাটির জন্ম।

এরকম আরও কত!

সত্যি, ভাবেন সুরনাথ, সাদা বাক্সটা বেশ বড়। সাদা বাক্সের সমস্ত অলংকার ঘষে-মেজে বাক্সে তুলে রেখে সযতনে বাক্সের ডালা আবার বন্ধ করে দেন। তারপর অন্ধকারে চোখ বোজেন।

আর তখনই কালো বাক্সটা খুলে যায় এক ঝটকায়। সুরনাথ না চাইলেও নিষ্ঠুর দুঃখের স্মৃতিগুলো একে-একে বেরিয়ে আসে, উদোম হয়ে নির্লজ্জভাবে নাচতে থাকে চোখের সামনে। চুমকির হারিয়ে যাওয়া, বাবা-মায়ের চলে যাওয়া, ভানুপ্রতাপের শেষ দিনটি, অলকার বদলে যাওয়া, রানাপ্রতাপ আর অপুর অচেনা মুখ, আর গরু রচনার সেই হতবাক বড়-বড় চোখে তাকিয়ে থাকা গরুটা।

বড় কষ্টের। সুরনাথের কালো বাক্সটা সাদা বাক্সের চেয়ে মাপে অনেক বড়, অনেক।

আজকের সাতসকালে যে-সমস্যাটা নিয়ে মালবিকা, রানা, অলকা, বা তনুশ্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে, সেটা বোধহয় সোনাদানার ভাগাভাগি নিয়ে। সুরনাথ জানেন, এ নিয়ে বিশদ আলোচনার পর দেখা যাবে, মমতার বিয়ের সময় অলকার কোনও একটা পরামর্শ তিনি আমল দেননি, তার জন্যই আজকের এই সমস্যা জন্ম নিয়েছে। তখন গরু রচনার হতভাগা গরুটা শূন্য চোখে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। আর চোখে জল কাটবে। জল কাটবে।

সমস্যা থেকে দূরে থাকার জন্য যতক্ষণ পারা যায় বাড়ির বাইরে থাকেন সুরনাথ। পাড়া-প্রতিবেশীদের ফাইফরমাশ খাটেন টুকটাক। আর লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ান, বা কারও বাড়ির রোয়াকে বসে থাকেন, সঙ্গী পেলে গল্প করেন।

নিজের প্রয়োজনের কথাটা কখনও কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তিনি নিজে যেমন অন্যের প্রয়োজন বেশিরভাগ সময়েই অন্তর দিয়ে বুঝে নেন, ঠিক তেমনটাই আশা করেন অন্যের কাছে। আর সেইজন্যই তাঁকে বঞ্চিত হতে হয় বেশি করে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতর থেকে। সয়ে গেছে, সবটাই সয়ে গেছে। এখন শুধু যাওয়ার অপেক্ষা। তাঁর শেষ শয্যায় শুধু একটা ছোট্ট মুখ দেখতে চান তিনি। পলাশের নিষ্পাপ মুখ।

ভোরবেলা স্কুলে যায় পলাশ। রানা দিয়ে আসে সাইকেলে করে। আর ছুটির সময় সুরনাথ নিয়ে আসেন ওকে। তখন অনেক গল্প করেন ওর সঙ্গে। দিলখোলা খোশগল্প।

'দাদু, সাইকেল দু-চাকায় চলে, কিন্তু মোটরগাড়ির চার চাকা লাগে কেন?'

'অতসব কি আমি জানি, দাদুভাই! ওসব বিজ্ঞানের ব্যাপার—।'

পলাশের সব জিনিসেই কৌতূহল। ওর প্রশ্নের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

সুরনাথ ছেলেটাকে নানা গল্প শোনান। রূপকথার গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প, সুখ-দুঃখের গল্প।

বিকেলে পলাশকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে যান সুরনাথ। ও হুটোপুটি করে খেলে। আর সুরনাথ বসে থাকেন গাছতলায়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয়, মাইকেলনগরের মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখের সামনে শিশু সুরনাথ খেলছে।

মাঠ থেকে ফেরার পথেও অনেক গল্প হয় দাদু-নাতিতে।

এই তো সেদিন ফেরার সময় এক দুঃখী কৃষকের গল্প শোনাচ্ছিলেন সুরনাথ, ছেলেটা ফস করে জিগ্যেস করে বসল, 'দাদু, দুঃখ কাকে বলে?'

সুরনাথ চমকে গেলেন। চুমকির কথা মনে পড়ে গেল পলকে। কাকে বলে দুঃখ? যখন চারপাশে সবকিছু হাসিখুশি থাকা সত্ত্বেও মনটা খুশি হতে পারে না, তাকেই কি দুঃখ বলে?

সুরনাথ চুপ করে ছিলেন। জবাব দিতে পারেননি। ইদানীং এই প্রশ্নগুলো মনের কোণে উঁকি মারছে বারবার।

সুখ কাকে বলে? যে-কোনও অবস্থায় তৃপ্ত পাওয়ার নামই কি সুখ? মনে পড়ে গেল, সেই ছেলেবেলায় খেলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন ইট-পাথরের ওপরে। হাঁটুর কাছে মাংস উঠে গিয়েছিল। অসহ্য জ্বালা করছিল। রক্ত পড়ছিল। সুরনাথ তখন চুমকির মুখটা মনে করার চেষ্টা

করছিলেন প্রাণপণে। স্পষ্ট মনে আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গিয়েছিল পলকে। সুরনাথ সুখী হয়েছিলেন। এরকম কত রকমফের হতে পারে সুখী হওয়ার!

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমার খুব মন খারাপ হবে। তাকেই বলে দুঃখ।'

'যাঃ, তুমি আবার কোথায় যাবে!'

পলাশ সুরনাথের চলে যাওয়ার কথা মোটেই মানতে পারেনি। সুরনাথ অবাক হয়ে বালককে দেখছিলেন। এই হতভাগাটাই এখন একমাত্র পিছুটান। ওর সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি জমা হয়ে যায় সুরনাথের সাদা বাক্সে। বাক্সটা মাপে বাড়তে থাকে। কিন্তু কালো বাক্সের চেয়ে বড় হতে পারে না কখনও।

সুতরাং ক'দিন পরে পলাশ যখন এসে মেলা দেখতে যাওয়ার বায়না ধরল তখন রাজি না হয়ে পারেননি। দেশবন্ধু পার্কে নাকি এক 'ইলেকট্রনিক ফেয়ার' শুরু হয়েছে।

রানা অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তনু সংসারের কাজকর্মের হাল ধরতে গিয়ে বেসামাল। আর মালবিকার ঠাকুরঘরই সব। অপুকেও নাকি পলাশ একবার বলেছিল। তাতে 'কাকু' বলেছে, 'আজ নয়, কাল।' ব্যস, ওই পর্যন্তই।

মেলার কথায় অনেক স্মৃতিই মনে এসে ভিড় করে। তার দু-একটা গল্প পলাশকে শোনাতেই খিলখিল করে হেসে উঠল নাতি। বলল, 'ওসব পুরোনো খেলা না, দাদু। এসব একেবারে তাক লাগানো খেলা। দেখলে তুমি চমকে যাবে।

'জানো, আমাদের ক্লাসের অর্ণব গিয়েছিল কাল। বলল, কম্পিউটারের খেলা আছে, টাইম মেশিনের খেলা আছে, রোবট ডিটেকটিভ আছে—সে তুমি না দেখলে বুঝবে না।'

আজকালকার যুগের অনেক কিছুই বুঝতে পারেন না সুরনাথ। এখন নাকি যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রই মানুষকে সুখী রাখে। সুতরাং নাতিকে নিয়ে এক সন্ধেয় বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

যে-মাঠে মেলা বসেছে, সে-মাঠটা বেশি দূরে নয়। বাসে চারটে মাত্র স্টপেজ। কিন্তু সারাটা পথ পলাশ উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে চনমন করতে লাগল। হাত-মুখ নেড়ে কত কথা বল দাদুর সঙ্গে। মেলায় গিয়ে কী-কী করবে তার লম্বা ফিরিস্তি শুনিয়ে দিল বারবার। বাবার কাছে বায়না করে দুশো টাকা পেয়েছে পলাশ—মেলায় নানা খেলা দেখার জন্য। সে-টাকা এখন দাদুর হেফাজতে।

বাস থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটতেই নানা রঙের আলোর হাতছানি। বিচিত্র আলোয় সাজানো যেন এক আরব্যরজনী। পলাশ দাদুকে একরকম টেনেই নিয়ে চলল।

সুরনাথ লাঠি ঠকঠকিয়ে তাল রাখতে পারছিলেন না ওর সঙ্গে। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় অলকা বলেছিল, 'ছেলেটার দিকে খেয়াল রেখো। এমন কাণ্ড কিছু কোরো না যাতে তনুর কাছে

মুখ খেতে হয়—।'

সুরনাথ চুপ করেছিলেন। কথার পিঠে কথা বলে লাভ নেই। তাঁর ভাষা ওরা কেউ বুঝতে পারে না—একমাত্র হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া এই দস্যি ছেলেটা ছাড়া।

টিকিট কেটে মেলায় ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন সুরনাথ। এ কোথায় এলেন তিনি! রূপকথার জগৎ যেন সত্যি হয়ে উঠেছে।

নিশি পাওয়া মানুষের মতো পলাশের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি।

টিকিট কেটে দাদুকে নিয়ে পলাশ ঢুকে পড়ল 'কথা বলা কম্পিউটার'-এর ঘরে।

সুন্দর করে সাজানো ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে কাচের বাক্স। তার ভেতরে বসানো রয়েছে একটা সুপারকম্পিউটার 'ক্রে-১০'। একটা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে যে-কোনও প্রশ্ন করলেই কম্পিউটার তার ধাতব যান্ত্রিক স্বরে উত্তর দিচ্ছে। উত্তর দেওয়ার সময় তার প্যানেলের লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো জ্বলছে নিভছে। সামনে টাঙানো ডিজিটাল বোর্ডে প্রশ্ন করার নির্দেশ লেখা রয়েছে।

সুরনাথ পড়লেনঃ কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা চলবে না, কোনও দার্শনিক প্রশ্নও করা চলবে না। শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন। যেমনঃ 'মেট্রো রেল কত ভোল্টেজে চলে?', 'শহিদ মিনারের উচ্চতা কত?', 'রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কবিতা কী?', 'মিশরের পিরামিডের বয়েস কত?' এইরকম আরও সব হরেকরকম প্রশ্ন।

পলাশের খেলার পর সুরনাথের পালা। দাদুকে পলাশ খেলাবেই। অতএব নিরুপায় সুরনাথ সুপারকম্পিউটারের সামনে ভ্যাবাচাকা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাঁর বেশিরভাগ প্রশ্নই অর্থহীন—অন্তত কম্পিউটারের কাছে। 'মানুষ এতদিন বাঁচে কেন?' 'সুখ কাকে বলে?'—এইরকম গোটাতিনেক প্রশ্ন করতেই কম্পিউটার যান্ত্রিক গলায় জানিয়ে দিল, 'অর্থহীন প্রশ্ন। নির্দেশ মেনে তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন করুন।'

পলাশও বারবার বলতে লাগল, 'কী হচ্ছে দাদু! একটা বুদ্ধির প্রশ্ন করো না!'

বুদ্ধির প্রশ্ন? সব প্রশ্ন কেবলই মাথা খাটিয়ে করতে হবে? মনের ভেতর থেকে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না? কম্পিউটারের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ!

সুতরাং সতর্ক সুরনাথ মাথা খাটিয়ে কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করতে পারলেন। কম্পিউটারও দিব্যি তার উত্তর দিল।

'কথা বলা কম্পিউটার'-এর পর 'রোবট ডিটেকটিভ'। তারপর 'মহাকাশের রোমাঞ্চ'। পলাশের পাল্লায় পড়ে সব খেলাই খেলতে লাগলেন সুরনাথ। খেলতে খেলতে তাঁর বয়েস যেন কমে

যাচ্ছিল। খেলাগুলো সম্পর্কে ডিজিটাল বোর্ডে নানা কথা লেখাঃ 'রোল প্লেয়িং গেম', 'ভারচুয়াল রিয়েলিটি', 'হলোগ্রাফিক গ্রাফিক্স', আরও অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল। পলাশকে তাড়া দিতেই ও অনুনয়ের সুরে বলে উঠল, 'ওই খেলাটাই লাস্ট, দাদু—প্লিজ।'

সুরনাথ তাকিয়ে দেখলেনঃ 'সময় সাফারি'।

আরও কাছে এগোতেই 'সত্যিকারের টাইম মেশিন' কথাটাও চোখে পড়ল। টিকিট কাটার পর একজন লোক এগিয়ে এসে খেলার নিয়মকানুন জানিয়ে দিল বিশদভাবে। লোকটির সঙ্গে পলাশ ঢুকে পড়ল একটা ঘরে। তারপর পরদা টেনে দিল কে যেন।

পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে সুরনাথ অপেক্ষা করতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, তাঁর পিছনে যারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই কমবয়েসি—সুরনাথের মতো বৃদ্ধ কেউই নেই।

সুরনাথের সঙ্কোচ হচ্ছিল। নাতির সঙ্গে মেলায় এসে এ কী বিড়ম্বনা! নিজের বয়েসটার কথা ভুলে যাওয়া মোটেই ঠিক হয়নি।

আর ঠিক তখনই পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল পলাশ, পিছনে সেই লোকটি।

পলাশ সুরনাথের হাত চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলল, 'দাদু, কী দারুণ খেলা! ডিজনিল্যান্ড দেখলাম, ব্রাজিলের পেলের খেলা দেখলাম, আইজ্যাক নিউটনকে দেখলাম অঙ্ক করছে, সিপাহি বিদ্রোহ, আইফেল টাওয়ার—আরও কত সব জিনিস দেখলাম...।'

পরদার পাশে দাঁড়ানো লোকটি সুরনাথকে তাড়া দিয়ে ডাকল, 'জলদি আসুন, দাদু, দেরি হয়ে যাচ্ছে—' তার মুখ দেখে বোঝা গেল, সুরনাথকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে।

পলাশ বলল, 'তাড়াতাড়ি যাও, দাদু। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব—তোমার কোনও চিন্তা নেই।'

সুরনাথ ইতস্তত করছিলেন। নিশ্চয়ই নানারকম ফিল্ম দেখিয়ে বাচ্চাদের ভুলিয়ে মুগ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে ভেতরে। তবে তাঁর মতো একজন বৃদ্ধকে ওরা বোধহয় ভোলাতে পারবে না।

ভেতরে ঢুকতেই পরদা টেনে দিল লোকটি। পলাশ আড়াল হয়ে গেল। তখনই ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখলেন সুরনাথ।

ছিমছাম সাজানো ঘর। লুকোনো আলোয় আলোময়। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিচিত্র চেহারার গাড়ি। গাড়িটায় কোনও চাকা নেই। গাড়ির ওপরটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ডোমে ঢাকা। গাড়িতে বসার আসন মাত্র একটাই। তবে কোনও স্টিয়ারিং নেই। তার বদলে রয়েছে একটা প্যানেল। প্যানেলের ওপরে কয়েকটা বোতাম, রঙিন বাতি, দুটো ডায়াল, আর একটা ডিজিটাল ঘড়ি রয়েছে। অন্তত সুরনাথের তাই মনে হল।

পেশাদারি সুরে লোকটি সুরনাথকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

এই গাড়িটা সাধারণ গাড়ি নয়, টাইম মেশিন। এতে চড়ে প্যানেলের ডায়াল ঘুরিয়ে অতীতে যে-সময়ে যেতে চাই তার সময়টা সেট করে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় ডায়ালটা আসলে একটা ডিজিটাল ডিকশনারি। ইতিহাসের কোনও ঘটনা বা দ্রষ্টব্য কোনও জিনিস দেখতে চাইলে তার নাম বোতাম টিপে ফুটিয়ে তুলতে হবে ডায়ালের ওপরের ছোট পরদায়। তারপর নির্দিষ্ট কয়েকটা বোতাম টিপলেই মনের মতো দৃশ্য দেখা যাবে। তবে এই সময়-ভ্রমণ শুধুমাত্র অতীতে হতে পারে, ভবিষ্যতে নয়।

সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর লাল রঙের একটা ছোট্ট বোতাম ভালো করে দেখিয়ে দিল লোকটি। এই বোতাম টিপে ফিরে আসতে হবে এই ঘরে—অর্থাৎ বর্তমান সময়ে।

সুরনাথকে গাড়িতে বসতে সাহায্য করল লোকটি। তাঁর হাতের লাঠিটা রেখে দিল ঘরের এক কোণে। বৃদ্ধকে সিটে বসিয়ে বলল, 'আপনি একটুও ভয় পাবেন না যেন। আপনি যেখানেই বেড়াতে যান না কেন, সেখানকার কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না। আর কোনওরকম অসুবিধে হলেই ওই লাল বোতামটা টিপে দেবেন, কেমন—?'

ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল লোকটি। কী যেন একটা করল, সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আলোর তেজ কমতে শুরু করল। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরের এক কোণ থেকে লোকটির আবছায়া মূর্তি বলে উঠল, 'এবারে মেশিন চালু করুন—।'

কাঁপা হাতে বোতাম টিপলেন সুরনাথ। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। শিশুদের এই খেলায় বৃদ্ধ বয়েসে কেন নাম লেখালেন তিনি? আশঙ্কা আর রোমাঞ্চ লুকোচুরি খেলছিল তাঁর মনের মধ্যে। ঠিক তখনই আবছা অন্ধকারে একটা লেখা ফুটে উঠল তাঁর চোখের সামনেঃ 'কোথায় বেড়াতে যেতে চান আপনি?' সেইসঙ্গে 'বেড়াতে' যাওয়ার জন্য কোন-কোন বোতাম কীভাবে পরপর টিপতে হবে তারও স্পষ্ট নির্দেশ ফুটে উঠল।

দিশেহারা সুরনাথ বিয়ের পরে পুরীতে বেড়াতে যাওয়ার সময়টা বেছে নিলেন। বোতামগুলো টিপে দিলেন ঠিকঠাক। বুঝতে পারছিলেন, যন্ত্র তাঁকে কিছুতেই সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। বাচ্চাদের ভোলানোর জন্য ওরা নানারকম ফিল্মের ব্যবস্থা রাখে—সুরনাথের বেলা সে তো আর সম্ভব নয়...।

ঠিক তখনই অলকাকে দেখতে পেলেন। কী আশ্চর্য!

তরুণী সদ্যবিবাহিতা অলকা পড়ন্ত বিকেলে হোটেলের সমুদ্রমুখী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হুহু সাগরিকা বাতাসে ওর চুল উড়ছে। হাতিবাগানের শ্রীমার্কেট থেকে গোলাপি সাদা ফুলকাটা একটা শাড়ি খুব পছন্দ করে কিনেছিলেন সুরনাথ। অলকা সেই শাড়িটা পরে আছে।

সুরনাথের বুকের ভেতরে কষ্ট হল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। অলকা যদি সারাজীবন এইরকম থাকত। যদি কোনও কালো বাক্স না থাকত সুরনাথের জীবনে!

সুরনাথ একবার ডেকে উঠলেন অলকার নাম ধরেঃ 'বউ।' এটা সুরনাথের দেওয়া অলকার একান্ত গোপন নাম। গত দশবছরে এই নামটা কি একবারও ব্যবহার করেছেন তিনি? মনে পড়ে না।

অলকা সুরনাথের ডাক শুনতে পেল না। ওর ঠোঁট নড়ছিল। বোধহয় গান গাইছে গুনগুনিয়ে। জীবন্ত এক ছবি।

সুরনাথ আবার হাত দিলেন বোতামে। স্মৃতিপথের গোলকধাঁধায় আজ স্বেচ্ছাচারীর মতো ঘুরে বেড়াবেন তিনি। সুতরাং পর্যটক সুরনাথ ফিরে গেলেন ছেলেবেলায়।

মাইকেলনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। একেবারে চোখের সামনে। ওই তো নীতিন, পরি! টিফিনের সময়ে খেলতে বেরোচ্ছে মাঠে। মাঠের প্রান্তে পরপর কয়েকটা বকুল গাছ। সুরনাথ জানেন, খেলার শেষে ওরা বকুল ফল পাড়বে। ওরা সবাই আছে, শুধু সুরনাথ সেখানে নেই।

এরপর শুধু বোতাম টেপার খেলা।

জনার্দনস্যারের কোচিংয়ে চুমকিকে দেখতে পেলেন সুরনাথ। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ওঃ, সেই ডুরে শাড়িটা! সারাটা জীবন ধরে এই শাড়িটার রং সুরনাথ ভুলতে পারলেন না কিছুতেই। জীবনে এক-একটা জিনিস এরকম থাকে।

চুমকিকে দেখতে-দেখতে সুরনাথ সাদা বাক্সটার কথা ভাবছিলেন। সাদা বাক্সে চুমকির অনেক স্মৃতি, অনেক গল্প। আর কালো বাক্সে চুমকির হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ। চুমকি ছিল বলেই তো ওকে হারাতে কষ্ট হল। সাদা বাক্স থেকেই কি তা হলে কালো বাক্সের জন্ম? সাদা-কালোয় কোনও তফাত নেই?

চুমকিকে দেখার দিনগুলোয় পরপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সুরনাথ। ওকে গল্পের বই পড়তে দেওয়া, চিঠি দেওয়া, পুকুরপাড়ের কলাবাগানে লুকিয়ে দু-মিনিট কথা বলা।

না, চুমকির কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছেন না সুরনাথ। আর সেইজন্যই হয়তো চুমকির ভালোবাসা-আতুর মুখের প্রতিটি খুঁটিনাটি গভীর মনোযোগে লক্ষ করতে পারছেন।

ওঃ, কী সুন্দর ছিল অতীতের এই দিনগুলো!

সুরনাথ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন স্মৃতিপথে। ভাবলেন, লাল বোতাম টিপে ফিরে না গেলে ক্ষতি কী! যদি থেকে যাই এই গাছপালা প্রকৃতিমাখা ছেলেবেলায়! চুমকির কাছে! তাঁর অভাব টের পাবে না কেউ। অলকা, মালবিকা, রানা, তনু, অপু, মমতা, রাণুর মা, কেউ টের পাবে না। শুধু পলাশ—।

ঠিক তখনই কচি গলায় একটা ডাক শুনতে পেলেন যেন।

'দাদু!' পলাশ ডাকছে!

সত্যিই কি পলাশ ডাকছে?

চুমকিকে দেখতে-দেখতেই পলাশের ডাক কানে গিয়েছিল সুরনাথের। এক অদ্ভুত টানাপোড়েন তাঁকে অস্থির করে তুলল। স্মৃতিপথে হারিয়ে যাওয়া মানুষটা অন্ধের মতো হাতড়ে-হাতড়ে ফিরে আসতে চাইল বর্তমানে। আর তখনই মনে পড়ে গেল উপেক্ষাময় জীবনের কথা, উত্তর জানা অঙ্কের কথা, গরু রচনার কথা।

লাল বোতামটার ওপরে সুরনাথের আঙুল অপেক্ষা করতে লাগল। পলাশ কি এখনও ডাকছে? আর চুমকি, নীতিন, পরি, ওরা সবাই...।

'দাদু...।'

ছিন্নবিচ্ছিন্ন সুরনাথ গভীর শূন্য চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লাল বোতামের ওপরে তাঁর আঙুল তখনও অপেক্ষা করছে...।



বিকল্পকবি সুবল বসু

সুবলকে খুব একটা কেউ চেনে না। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে খেলাধুলো করতাম দেশবন্ধু পার্কে। তারপর স্কুল পেরিয়ে কলেজ, ইউনিভারসিটি—এবং সবশেষে চাকরি। সুবল আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি সবসময়। যেমন, কলেজে আমরা একইসঙ্গে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়েছি। তারপর, নম্বর যথেষ্ট ভালো থাকা সত্ত্বেও, ও হঠাৎই একদিন জানাল, আর পড়ব না।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন? পড়বি না কেন?

মাথার কোঁকড়া চুলের গোছায় টান মেরে সুবল বলেছে, নাঃ, পড়াশোনার মধ্যে কোনও সিমেট্রি নেই—।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সিমেট্রি? প্রতিসাম্য? পড়াশোনার মধ্যে আবার সিমেট্রির খোঁজ পড়ল কেন?

ওকে অনেক করে বোঝালাম। ফিজিক্সে আমার চেয়ে ওর নম্বর বেশি ছিল। সুতরাং বারবার করে বললাম, এরকম ভুল করিস না। মাসিমা মেসোমশাই কষ্ট পাবে।

সুবল কোনও কথায় কান দিল না। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন পার্কের সীমানায় ইউক্যালিপটাস গাছের মাথায় লাল সূর্য হেলে পড়েছে। পার্কের বড় মাঠে বল খেলছে সবাই। ধুলো উড়ছে।

সুবল বলল, অতীন, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস?

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। শ্যামলা রং। চোখ উজ্জ্বল। সেখানে লালচে ছায়া পড়েছে। জিগ্যেস করলাম, কী?

এই রোজ সূর্য ওঠা আর অস্ত যাওয়ার মধ্যে কেমন একটা সিমেট্রি—।

সত্যিই তো, আগে তেমন করে ভাবিনি। ভোরের সূর্যও লাল, শেষবেলার সূর্যও লাল। আর দুপুরের সূর্য সবচেয়ে প্রখর। জ্বলন্ত এক হলদে চোখ।

সুবল আবার বলল, ঠিক একইরকম ব্যাপার চাঁদের মধ্যেও রয়েছে। আস্তে-আস্তে বাড়ে, আবার আস্তে-আস্তে কমে। অমাবস্যা-পূর্ণিমার সিমেট্রি—।

আমার ভারী অদ্ভুত লাগল। সূর্য বা চাঁদের আচরণে প্রতিসাম্য আছে বলেই পড়াশোনার মধ্যেও সিমেটি থাকতে হবে! এ কী অদ্ভুত দাবি!

সুবল বলল, অতীন, গত কয়েকমাস ধরে সিমেটি খোঁজাটা আমার একটা অসুখের মতো হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর, আমি আর পারছি না—।

ওর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা লুকিয়ে ছিল। আর সেই সময়ে ওর মুখে কেমন এক অসহায় ছেলেমানুষের ভাব ফুটে উঠেছিল। আমার খুব কষ্ট হল। ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে না তো?

সন্ধের ছায়া গাঢ় হচ্ছিল ক্রমশ। ছেলের দল খেলা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে। পাখিরা বড়-বড় ঝাঁকড়া গাছের আস্তানায় ফিরে এসে রোজকার ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিয়েছে। সুবলকে বললাম, ওসব আজেবাজে চিন্তা ছাড় তো। চল, ওঠ—।

পাড়ার দিকে ফিরতে-ফিরতে আমি জিগ্যেস করলাম, তোর হঠাৎ করে এসব সিমেটির কথা মনে হল কেন?

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, অতীন, তুই কখনও আমার পুরো নামটা খেয়াল করেছিস?

কেন করব না? সুবল বসু—।

ও গাঢ় গলায় বলল, নামটা উলটো করে পড়লে কী হয় বল তো!

আমি বিড়বিড় করে ওর নামটা আওড়ালাম। সুবল বসু...সুবল বসু...আরে! এ যে দেখছি একই নাম ফিরে পাচ্ছি!

ওকে কথাটা বলামাত্রই ও বিষণ্ণ হাসল। বলল, আমিও প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। এ ধরনের শব্দ কিংবা সেনটেন্সকে ইংরেজিতে প্যালিনড্রোম বলে। গ্রিক 'প্যালিন্ড্রোমাস' শব্দ থেকে এসেছে। এর মানে হল, এমন কোনও শব্দ, বাক্য বা সংখ্যা যা সোজা কিংবা উলটো করে পড়লেও পালটায় না। দ্বিমুখী অবিকল—

আমি একটু অবাক হয়েই ওর কথা শুনছিলাম। এতসব অ-পদার্থবিদ্যার জিনিস ও পড়ল কখন?

জিগ্যেস করতেই সুবল বলল, সাধ করে কি আর পড়েছি। এ-লাইব্রেরি সে-লাইব্রেরি ঘেঁটে সামান্য কয়েকটা লেখাপত্তর পড়তে পেরেছি। তাতেই আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে, আমাদের

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্যালিন্ড্রোমের মতো সিমেট্রি রয়েছে। যেমন তোকে বললাম চাঁদ আর সূর্যের কথা—।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

সুবল শব্দ করে হাসল। সামনে থেকে একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসছিল। ওর মুখে জোরালো আলো পড়ল। সেখানে কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ দেখতে পেলাম।

সুবল বলল, শুধু নাম নয়। নামের ব্যাপারটা টের পাওয়ার পরও আমি এ নিয়ে এতটা ভাবিনি। কিন্তু নামের সঙ্গে জন্ম-তারিখটা মেলাতেই কেমন যেন হয়ে গেলাম।

কত তোর জন্ম-তারিখ?

১৯ জানুয়ারি ১৯৯১—।

তাতে কী হল?

কাছাকাছি একটা পানের দোকানে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ও। একচিলতে কাগজ আর ডট পেন চেয়ে নিয়ে লিখলঃ ১৯-১-৯১। তারপর বলল, শুধু জন্ম সালটা যে প্যালিন্ড্রোমিক সংখ্যা তা নয়, ১৯১৯১ সংখ্যাটাও একটা দ্বিমুখী অবিকল।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটার পর সুবল আবার বলল, আমার পিসিমা আমাকে ঠাট্টা করে সবসময় বলে বাপ কা বেটা। কারণ, প্রথম কথা বলতে শিখে আমি নাকি বাবা বলেছিলাম। সাধারণত বাচ্চারা 'মা' কথাটা দিয়ে শুরু করে। এ নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি। কিন্তু প্যালিন্ড্রোম ব্যাপারটা মাথায় ঢোকার পর অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, 'বাবা' শব্দটা দ্বিমুখী অবিকল—।

আমি হেসে বললাম, এসব নিতান্ত কাকতালীয় ছাড়া আর কিস্যু না—।

সুবল হাসল না। বলল, অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিও নাকি নিছকই কাকতালীয় ঘটনা।

হেমন্তের রাতের বাতাস আমার ঘাড়-গলা ছুঁয়ে গেল। সুবলের কথায় কাঁটা দিল গায়ে।

এরপর বেশ কিছুদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। হঠাৎই একদিন হাতিবাগান বাজারে নরেনের সঙ্গে দেখা। নরেনও আমার কলেজের বন্ধু। তবে এখন বিধান সরণি আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ফোটোগ্রাফির দোকান করেছে। নিছক কুশল বিনিময় করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নরেন আমাকে ডাকল। বলল, একটু বাইরে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।

ভুরু কুঁচকে নরেনের পেছন-পেছন বাজারের বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফলের দোকানগুলোর সামনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে নরেন জিগ্যেস করল, অ্যাই, সুবলের কি মাথায় কোনও গোলমাল হয়েছে?

আমি বললাম, না তো। তবে ও আর পড়াশোনা করবে না—।

সে না করুক। আরে, এখন তো ও আমার দোকানে প্রায়ই আসে। প্রথম তো আমার নাম নিয়ে পড়েছিল। বলল, আমার নামটা নাকি প্যালিন্ড্রোম না কী যেন। তারপর মুখের আধখানা করে ফটো তোলাতে শুরু করেছে। ওর মুখের ডানদিকের ছবি তুলে, বাঁ-দিকের আধখানার সঙ্গে মিলিয়ে বলতে হবে কতটা কি তফাত। বোঝ ব্যাপার! ওর মুখের ছবি তুলে সুপারইমপোজ করে মিলিয়ে-টিলিয়ে তো দিলাম। তারপর থেকে ও বিভিন্ন লোকের ছবি নিয়ে আসতে শুরু করল। সব ছবি থেকেই শুধু মুখের ছবিটুকু তুলে নিয়ে ডান দিকের আধখানা বাঁ-দিকের আধখানার সঙ্গে মিলিয়ে কতটা গরমিল তা বলে দিতে হবে—।

তুই করে দিয়েছিস সেগুলো?

হ্যাঁ, করব না কেন। পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে ও কখনও গোলমাল করেনি। তা ছবি-টবি সব দেখে সুবল ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। কারণ, কারও মুখেরই দুটো আধখানা হুবহু মিলছিল না। আমরা তো ফটো তুলি, জানি। যে-কোনও মানুষের মুখকে লম্বালম্বি দু-ভাগে ভাগ করলে দুটো ভাগ কখনও আয়নার ছায়ার মতো একরকম দেখতে হয় না। ওকে সে-কথা বলতেই কেমন চুপসে গেল। দোকানের আর-পাঁচজন কাস্টমারের সামনেই বলল, 'আমার থিয়োরি তাহলে ভুল? হতেই পারে না।' তারপর দুমদাম করে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে।

একটু দম নিল নরেন। তারপর বলল, সেইজন্যেই তোকে জিগ্যেস করলাম সুবলের মাথায় কোনও গোলমাল হয়েছে কি না—।

আমি হতবাক হয়ে মাথা নাড়লাম। একটা অটোরিকশা আমাদের পেছনে এসে কর্কশ স্বরে হর্ন বাজাচ্ছিল। আমি 'আসি' বলে আবার বাজারে ঢুকলাম।

সেদিন বিকেলে সুবলকে দেখলাম। মাথার মাঝবরাবর সোজা করে সিঁথে কেটেছে। আর দু'পাশের চুলের ছাঁদ হুবহু একরকম। বুঝলাম, ও নিজের থিয়োরি প্রমাণ করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু থিয়োরিটা যে ঠিক কী, সেটাই আমার মগজে কখনও ঢোকেনি।

আমি ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সুবলই আমাকে ডাকল। বলল, আয় না, বোস, ক'টা কথা বলব তোকে—।

সুতরাং নিরুপায় হয়ে ওর সঙ্গে বসে পড়লাম ফুটপাথের একটা চায়ের দোকানে। ভাঁড়ে চা নিয়ে চুমুক দিতে শুরু করলাম। দু-এক চুমুক পরেই সুবল হঠাৎ বলল, জানিস, অতীন, আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করছি।

আমি চুপচাপ দেখতে লাগলাম ওকে। এখন আর সহজে অবাক হব না আমি।

সুবল ওর জামার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। তারপর সেটা খুলে দেখাল আমাকেঃ

ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা

ভালোবাসা বড়, অনেক বড়,

প্রিয়তমা হে—

ঈশ্বর, আকাশ, সাগর

সবকিছু মিছে।

ভালোবাসা এইটুকু বুকে—

যেন মহাকাশ।

মহাকাশ যেন বুকে,

এইটুকু ভালোবাসা।

মিছে সবকিছু—

সাগর, আকাশ, ঈশ্বর।

হে প্রিয়তমা,

বড়, অনেক বড় ভালোবাসা।

কবিতাটা পড়েই বুঝলাম, সুবল এর মধ্যেও সিমেটি এনেছে। কবিতার নামে তো বটেই, এমনকী প্রথম স্তবক আর দ্বিতীয় স্তবকও হুবহু এক। প্রথম স্তবকটা উলটে পড়লেই পাওয়া যাবে দ্বিতীয় স্তবক।

আমি হেসে বললাম, তুই তা হলে কবি হয়েছিস!

কবিতার কাগজটা পকেটে রেখে সুবল পালটা হাসল। মাথার মাঝবরাবর সিঁথে কাটায় ওর মুখটা একটু যেন অন্যরকম লাগছে। ও বলল, অতীন, আমি কবি নই—বিকল্পকবি।

এবারে অবাক হলাম। বিকল্পকবি কথাটার মানে কী?

সুবল বুঝল আমার প্রশ্নটা। বলল, আমার কবিতা সবই প্যালিন্ড্রোম। তাই আমার কবি-পরিচয়ও বিকল্পকবি। অর্থাৎ, সাধারণ কবির থেকে আলাদা, আর তা ছাড়া...তুই রাগ করবি না তো!

না, না, রাগ করব কেন?

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে সুবল বলল, খেয়াল করিসনি, ‘বিকল্পকবি’ শব্দটা একটা প্যালিন্ড্রোম—।

নাঃ, নরেনের কথাই দেখছি ঠিক। ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা ফেলে উঠে দাঁড়ালামঃ চলি—।

সুবল আমাকে হাত ধরে টেনে বসাল। দোকানদারকে বলল আবার চা দিতে। তারপর নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, অতীন, আমার দুঃখ কী জানিস? আমার কথা কেউ মন দিয়ে শুনতে চায় না। তুই যদি একটু শুনিস, তা হলে আমার মনটা শান্ত হয়। শুনবি?

ওর গভীর দুটো চোখে কাতর অনুনয় ফুটে উঠেছিল। পাশের বেঞ্চে বসা আর-একজন মাঝবয়েসি খদ্দের আমাদের দেখছিল। দ্বিতীয় ভাঁড় চা হাতে নিয়ে আমি বললাম, বল, শুনব।

প্রথম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় ভাঁড়ে চুমুক দিল সুবল। বলল, প্রকৃতিতে কত সিমেটি আছে দেখেছিস? একটা গাছের কথাই ধর—কাণ্ডের দু'পাশে মোটামুটি সমতা বজায় রেখে বেড়ে ওঠে। এ ছাড়া পশু-পাখি, এমনকী মানুষও। তাদের চেহারার আদলে কি সিমেট্রি নেই? যেমন, আমাদের শরীরে যেসব জিনিস জোড়সংখ্যায় আছে, সেগুলো সমানভাব দু'পাশে সাজানো। যেমন, হাত-পা, চোখ, আঙুল, মেয়েদের বুক। আর যেগুলো একটা করে রয়েছে, সেগুলো ঠিক দেহের মাঝবরাবর সাজানো। কপাল, নাক, মুখ, নাভি! তা হলে এবার তুই-ই বল, আমাদের শরীরটা একটা প্যালিড্রোম কি না?

সত্যি, এভাবে কখনও ভাবিনি। সুবলকে আমি কী বলব, পাগল, না দার্শনিক?

সুবল ভূতে পাওয়া মানুষের মতো বলে যাচ্ছিল।

এ ক'মাসে আমি অনেক বইপত্তর পড়ে ফেলেছি। তুই ভাবিস না যে, দ্বিমুখী অবিকল কবিতা আমিই প্রথম লিখেছি। বাংলায় আমার আগে কেউ লেখেনি ঠিকই, তবে বহুকাল আগে সংস্কৃতে লেখা হয়েছে। সংস্কৃতে লেখা 'শিশুপাল বধ' কবিতায় এরকম চরণ ছিল। পণ্ডিতরা এগুলোকে বলত 'সর্বোতোভদ্র'—অর্থাৎ, সবদিক থেকেই নিখুঁত। দেখ, ঠিক এইরকম ব্যাপারটাই প্রকৃতির বহু জায়গায় রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ, উপগ্রহ, তারা থেকে পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক—কোনওটাতেই এর অভাব নেই।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওঠার মুখে সুবল বিড়বিড় করে বলল, শুধু শালা আমাদের জীবনটাতেই কোনও সিমেট্রি নেই।

ওর কথাগুলো আমি শুনতে পেয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, এই প্যালিড্রোম পাগল ছেলেটা সিমেটির জন্যে কতদূর যেতে পারে।

এর বছরদেড়েক পরে সুবল কনকলতা নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করল। মেয়েটি রেলওয়েতে চাকরি করে। বিয়েটা শুনেছিলাম প্রেম করেই, কিন্তু সুবল নিজে আমাকে কখনও কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, ওর নামটাকে ছেঁটে আমি 'কনক' করে নিয়েছি। বুঝলাম, বিয়ের পরেও ওর মাথা থেকে প্যালিড্রোমের ভূত যায়নি।

এরপর সুবলের সঙ্গে খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ও বাড়ি ছেড়েই বেরোত খুব কম। তবে রাস্তায় কনকলতার সঙ্গে দেখা হলে সুবলের খবর নিতাম। শুনতাম, ও নাকি দিনরাত্তির বই আর কাগজপত্রে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া ঘরের সব জিনিসই ও নতুন করে সাজিয়েছে—যাতে মোটামুটি একটা সিমেট্রি বজায় থাকে। আর খুঁটিনাটি যে-কোনও জিনিস কেনার সময়েও তাই। যেমন, সিলিং ফ্যান কিনেছে চার ব্লেডের। গোলমরিচ ঢালার ছোট্ট শৌখিন কৌটোয় বিজোড় সংখ্যার ফুটো ছিল বলে নিজে আর-একটা ফুটো করে নিয়েছে।

কনকলতার মুখে আমি যন্ত্রণার ছাপ দেখেছিলাম। সুবল যে চাকরি-বাকরি করে না, তা নিয়ে ওর কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু ও আর-একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠলে ভালো হতো। অসহায় কনকলতাকে মেকি আশ্বাস ছাড়া আর কীই-বা আমি দিতে পারতাম!

দিন চার-পাঁচ আগে একদিন দেখা পেলাম সুবলের।

রাত সাড়ে ন'টার সময়ে অরবিন্দ সেতুর রেলিঙে একা-একা বসে রয়েছে।

আমি মুদির দোকান থেকে বিস্কুট কিনে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎই একটা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওকে চিনতে পারলাম।

কাছে গিয়ে সুবলকে দেখে খুব কষ্ট হল। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! চুল উসকোখুসকো, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চামড়ায় শুকনো ভাঁজ। শূন্য চোখে তাকিয়ে অরবিন্দ সেতুর ওপরে ছুটে চলা যানবাহনগুলো দেখছে।

সুবল।

আমার ডাকে ও চমকে উঠল। একটু দেরিতে চিনতে পারল আমাকে। তারপর ম্লান হেসে বলল, ও, তুই—।

এত রাতে এখানে বসে কী করছিস?

ও স্বাভাবিক সুরে জবাব দিল, দেখছি, যে-গাড়িগুলো এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যায়, সেগুলো আবার ফিরে আসে কি না। জানিস অতীন, নম্বর মিলিয়ে দেখেছি, বেশিরভাগ গাড়িই আবার ফিরে আসে। এটাকে নিশ্চয়ই তুই সিমেট্রি বলে মানবি?

আমি ওর হাত ধরে ওকে রেলিং থেকে নামালাম, বললাম, বাড়ি যা। তোর বউ একা রয়েছে বাড়িতে—।

সুবল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আপনমনে দু-বার ঘাড় নেড়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। মনে হল, একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে গিয়ে ও হিমসিম খাচ্ছে—কিছুতেই সেটা মিলছে না।

ঠিক এর দু-দিন পর, অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার আত্মহত্যা করেছে সুবল।

পাড়ার বেশিরভাগ লোকই এই অমিশুকে ছেলেটাকে চিনত না। কিন্তু আত্মহত্যা করার ফলে ওকে চিনে ফেলল সবাই।

চার ব্লেডের পাখার সঙ্গে নাইলনের দড়ি বেঁধে ফাঁস তৈরি করেছিল সুবল। ফাঁসের দুপাশে দড়ি দিয়ে সমান মাপের দুটো ফুল তৈরি করা—ঠিক বাচ্চা মেয়েদের বিনুনির মতো।

এ ছাড়া একটা সুইসাইড নোটও লিখে গেছে ওঃ

জীবন এইরকম সবচেয়ে ভলো—

ভ্রূণ থেকে যৌবন, যৌবন থেকে ভ্রূণ,

ভালো সবচেয়ে, এইরকম জীবন।

জীবনের সিমেটির কথা মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও ভোলেনি বিকল্পকবি সুবল বসু।



চরম অস্ত্র

কন্ট্রোল টাওয়ারের ইমার্জেন্সি ভিডিয়োফোন হঠাৎই জেগে উঠল।

জ্যামিতিক আকারের ছ'কোণা ঘর। ফাইবারগ্লাসের দেওয়ালে ঘেরা। ঘরের মাঝখানে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসেছিলেন জেনারেল ডেভিড সোয়ার্জকফ, পাশে মার্কিন অস্ত্রবিভাগের প্রধান টমাস ফাউনটেন।

সোয়ার্জকফ মুখের ওপরে হাত রেখে দুশ্চিন্তায় মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বুজে ছিলেন। আর ফাউনটেন তাকিয়ে ছিলেন প্যানেলের কম্পিউটার পরদার দিকে। তাঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ বলে দিচ্ছে যুদ্ধে তাঁরা সুবিধেজনক অবস্থায় নেই। যে-যুদ্ধ কয়েকঘণ্টায় শেষ হওয়ার কথা তা আজ গড়িয়ে কয়েকদিন, এমনকী দেড়সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। উপসাগরের একটা ছোট্ট দেশ যে এইভাবে রুখে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন লড়তে পারে এ-কথা কেউই ভাবতে পারেননি।

টমাস ফাউনটেন প্রেসিডেন্টের কথা ভাবছিলেন। জরুরি মিটিং-এ তিনি স্পষ্টই আদেশ দিয়েছেনঃ 'নিত্যনতুন মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করুন। ফ্যাক্টরিতে চব্বিশঘণ্টা কাজ চলবে। চব্বিশঘণ্টা মানে চোদ্দোশো চল্লিশমিনিট—তার একমিনিটও কম নয়।'

সুতরাং আর্মস ফ্যাক্টরির চিফ ইঞ্জিনিয়ার জোসেফ আইনস্টাইনকে ফাউনটেন সেইরকমই নির্দেশ দিয়েছেন। আইনস্টাইন এই পদে আছেন প্রায় বারোবছর। বয়েস মাত্র চল্লিশ, কিন্তু এর মধ্যেই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত ছ'টা ক্ষেপণাস্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছেন। তৈরি করেছেন লেজার নিয়ন্ত্রিত 'স্মার্ট' বোমা। নিত্যনতুন মারণাস্ত্র তৈরিতে আইনস্টাইনের জুড়ি নেই। এখন আইনস্টাইনই দেশের একমাত্র ভরসা। সারা বিশ্বের কাছে মার্কিন শক্তির ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সোয়ার্জকফ, ফাউনটেন সকলেই তাকিয়ে আছে আইনস্টাইনের অভিনব আবিষ্কারের দিকে।

ফাইবারগ্লাসের একটা দেওয়াল জুড়ে ফুটে উঠেছিল আইনস্টাইনের রঙিন ছবি। ইমার্জেন্সি ভিডিয়োফোনে আইনস্টাইন কথা বলতে চান।

মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকা সোয়ার্জকফকে খোঁচা মারলেন ফাউনটেন। তারপর কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাম টিপতেই জোসেফ আইনস্টাইনের কথা শোনা গেল।

'গুড মর্নিং, স্যার—।'

'জলদি বলো, কী খবর? নতুন কিছু বের করতে পারলে?' ফাউনটেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর প্রত্যাশা ও কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আবেগ ইত্যাদি কিছুতেই আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না।

সোয়ার্জকফ বললেন, 'একটু আগেই খবর এসেছে, আমাদের নতুন ক্ষেপণাস্ত্রগুলোও ওরা অকেজো করে দিতে পেরেছে। তার ওপর সাগরে তেল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমাদের নৌ-বাহিনী আর এগোতে পারছে না। এদিকে প্রায় দু-শো প্লেন ধ্বংস হয়ে গেছে। ওঃ, আইনস্টাইন, ডু সামথিং ফর গডস সেক, উইল যু?'

দেওয়ালে আইনস্টাইনের ছবি হাসল, তারপর কথা বলল, 'স্যার, আমাকে এত চাপ দেবেন না, আমি আর পারছি না। আসলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার শুধু পদবিটুকুরই মিল, প্রতিভার ছিটেফোঁটাও মিল নেই। তবে প্রেসিডেন্টের আদেশ, তাই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি।' আইনস্টাইন এবার ফাউনটেনকে লক্ষ করে বললেন, 'কেন স্যার, গত সপ্তাহে আপনাদের দু-দুটো নতুন ক্ষেপণাস্ত্র আমি তৈরি করে দিইনি?'

ফাউনটেন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা দিয়েছ—।'

'তবে সেগুলোকেও শত্রুপক্ষ ঘায়েল করতে পেরেছে।' বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলেন সোয়ার্জকফ, 'এখন তৃতীয় বিশ্বের সবক'টা দেশ আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছে। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রের নামে পোষা পায়রার নাম রাখছে—।'

শেষ কথাটায় যেন চমকে উঠলেন আইনস্টাইন। অপমানের সামান্য ছায়াও যেন নেমে এল মুখে।

ফাউনটেন বললেন, 'এখন সবাই ভাবছে রেগনের আমলে আমরা যে স্টার ওয়ার্স-এর জিগির তুলেছিলাম, তার সবটাই ফাঁকা আওয়াজ। আশ্চর্য, এত সব আধুনিক অস্ত্র ওইটুকু একটা পুঁচকে দেশ পেল কেমন করে?'

সোয়ার্জকফ ব্যঙ্গের সুরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'তা-ও বুঝতে পারছেন না? আমরাই গত দশবছরে যেসব অস্ত্র বেচেছি সেগুলোই এখন বুমেরাং হয়ে আমাদের ঘাড়ে ফিরে আসছে।'

'কিন্তু আমরা তো সাধারণত সেকেলে অস্ত্র বেচে থাকি—।'

ফাউনটেন কোনও জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছু একটা না করলেই নয়। তারপর মরিয়া চোখে তিনি তাকালেন জোসেফ আইনস্টাইনের ছবির দিকে। বললেন, ‘১৯৪৫-এর ৬ আগস্টের কথা মনে আছে, আইনস্টাইন? আমি চাই হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো কিছু একটা হেস্তনেস্ত হোক। এমন কিছু একটা তোমাকে তৈরি করতেই হবে যাতে এই যুদ্ধ একেবারে খতম হয়ে যায়। আর কোনও বিকল্প আমাদের হাতে নেই।

আটঘণ্টা অন্তর-অন্তর এই কন্ট্রোল টাওয়ারে আমাকে কনট্যাক্ট করবে। ওভার অ্যান্ড আউট।’

কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপলেন ফাউনটেন। আইনস্টাইনের হতবুদ্ধি মুখের ছবিটা দেওয়াল থেকে মুছে গেল। বেচারা যে-চাপের মধ্যে কাজ করছে! ওঁকে আর দোষ দিয়ে লাভ কী!

ফাউনটেনের চোখ জ্বালা করছিল। গত চব্বিশঘণ্টা দু-চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

সোয়ার্জকফের অবস্থাও তাই। তিনি জড়ানো গলায় জিগ্যেস করলেন, ‘প্রেসিডেন্টকে একটু পরেই খবর জানাতে হবে। কী বলব?’

ফাউনটেন কন্ট্রোল প্যানেলের টিভি পরদার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, বলবেন প্রগ্রেস স্যাটিসফ্যাকটরি। আশা করছি কাল সকালের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।’

রাত ঠিক একটার সময় ইমার্জেন্সি ভিডিয়োফোনে কথা বললেন জোসেফ আইনস্টাইন। সোয়ার্জকফ জেগে ছিলেন, কিন্তু ফাউনটেন কন্ট্রোল প্যানেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভিডিয়োকল বোতাম টিপে অ্যাকসেপ্ট করে সোয়ার্জকফ জাগিয়ে দিলেন ফাউনটেনকে।

আইনস্টাইন বললেন, ‘গুড নিউজ, স্যার। একটা মারাত্মক মিসাইল তৈরি করে ফেলেছি। ওটা লঞ্চ করার জন্য এক্ষুনি ব্যবস্থা করুন। আপনি যা চেয়েছিলেন একেবারে তাই। যদি এটা ফায়ার করে যুদ্ধ খতম না করতে পারি তা হলে আর কিছু করার নেই।’

সোয়ার্জকফ জিগ্যেস করলেন, ‘এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার কত টন?’

‘সেটা হিসেবের বাইরে, স্যার,’ আইনস্টাইন গর্বের সঙ্গে জানালেন, ‘তবে এর নাম দিয়েছি “ওয়ার-স্টপার”—নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন স্যার। আর আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার, কারণ আপনার জন্যেই এই ক্ষেপণাস্ত্রের আইডিয়াটা পেয়েছি।’

সোয়ার্জকফ অবাক হয়ে গেলেন। ফাউনটেন ভিডিয়ো কানেকশন অফ করে দিয়ে চারিদিকে এমার্জেন্সি রেডিয়ো মেসেজ ছড়িয়ে দিলেন।

চারঘণ্টার মধ্যেই স্পেস প্লেনে করে ‘ওয়ার-স্টপার’ পৌঁছে গেল যুদ্ধ ঘাঁটিতে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বসরা বন্দর-শহর লক্ষ করে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছুড়ে দেওয়া হল।

বহুজাতিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ খতম হতে চলেছে।

বসরার ভোরের আকাশে 'ওয়ার-স্টপার'-এর বিস্ফোরণ ঘটল। ইরাকি সমর-বিশারদরা শত চেষ্টাতেও এই অভিনব ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ঘায়েল করতে পারেননি।

কিন্তু বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে হতবাক হয়ে গেল সকলে। কোথায় চোখধাঁধানো আগুন? কোথায় বিষাক্ত ধোঁয়া? তার বদলে চোখে পড়ল তুষার-কুচির মতো অসংখ্য সাদা ফুটকি ভোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওগুলো ক্রমশই চেনা গেলঃ হাজার-হাজার সাদা পায়রা পাগলের মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। সদ্য উঁকি দেওয়া সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে ওদের ডানার পালক থেকে। রাস্তায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য জড়ো হয়ে গেল।

পায়রাগুলো আরও নীচে নেমে আসতেই ওদের কারও-কারও ঠোঁটে ধরা পলিমার দিয়ে তৈরি ইংরেজি হরফগুলো সকলের চোখে পড়ল। উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক নিজেদের সাজিয়ে নিতেই পাঁচ অক্ষরের শব্দটা সকলে পড়তে পারলঃ PEACE।

পায়রার ঝাঁক তখনও আনন্দে উড়ছে...উড়ছে...।



অশনি ও আবেগথেরাপি

ঘড়িতে সকাল আটটা। কিন্তু অশনি তখনও আড়মোড়া ভাঙছিল। ওর বড় বেড-টি-র শখ। একটু আগেই ও বেড-টি-র স্বপ্ন দেখেছে। মুক্তোমালা আদর করে ওকে ডাকছে। বিয়ের প্রথম দিককার মতো নরম ছোঁয়ায় ওর ঘুম ভাঙাচ্ছে। তারপর ঘুম-জড়ানো চোখ খুলতেই হাতে তুলে দিচ্ছে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে স্বপ্নের মধ্যেই অশনি বুঝতে পারছিল ও ভুল দেখছে—অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখছে। ওটা ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ না হয়ে হবে রোয়া-ওঠা ফুলঝাড়ু। আর বেড-টি-টা নির্ঘাত ডেথ-বেড-টি।

বিছানায় উঠে বসে সবে প্রথম হাইটা তুলছিল অশনি। হাই ইনকমপ্লিট রয়ে গেল। মুক্তোমালা কী কাজে যেন শোওয়ার ঘরে এসেছিল, ঠান্ডা গলায় ফরমান শুনিয়ে গেল, জলদি বাজারে যাও। বাবার শরীরটা ভালো নয়। দেরি হলে রান্না দেরি হবে, আর রান্না মানে অফিসে দেরি হলে শেষে কিন্তু আমার দোষ দিয়ো না।

বাবা বলতে অশনির পিতা, মুক্তোমালার শ্বশুর। কিন্তু সে কেবল ভারতীয় সামাজিক বিধি অনুসারে। অশনির বদ্ধমূল বিশ্বাস, ওর বিয়ের পর থেকেই ওর নিজের পিতা মুক্তোমালার পিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। তার ওপর মুক্তোমালার আসল পিতা মাইনাস হয়ে গেছে সেই কোন ছোটবেলায়। সেইজন্যই ও হয়তো অশনির ফাদারকে নিজের ফাদারের পুনর্জন্ম বলে ধরে নিয়েছে। কে জানে! মোট কথা ফাদার আর ডটারের স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার লড়ালড়িতে অশনির অবস্থা 'মাপ করো' উপদেশ পাওয়া ভিখিরির মতো।

অতএব মুখ বেজার করে বাজারের থলে নিয়ে অশনি বেরিয়ে পড়ল। বেরোনোর সময়ে দেখল বসবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। সামনের টেবিলে চা-বিস্কুট।

মুক্তোমালা বাবাকে আর-একটা বিস্কুট সাধছে। আর বাবা একটি হত্যারহস্য খবরের কাগজ দেখে-দেখে বউমা অথবা মেয়েকে পড়ে শোনাচ্ছে।

হুঁ! বাবার শরীর ভালো নয়! আর অশনি বুঝি দারা সিং! যখন-তখন যা খুশি হুকুম করলেই হল। কিন্তু মুক্তোমালার হুকুমের প্রতিবাদ করা অশনির সাহসে কখনও কুলোয়নি। প্রতিবাদ করার কথা ভেবেছে বহুবার, ঠিক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপ করার মতো—কিন্তু আসল কাজের সময়েই দ্যাখে ওর হাত-পাগুলো কেমন বশে থাকে না। বুকটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। আর মুক্তোমালার কথা মানতে ইচ্ছে করে। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, ওর বাধ্য হতে ইচ্ছে করে।

সুতরাং বেরোনোর মুখে অশনি বলে গেল, চা-টা গরম করে রেখো, বাজারটা সেরে আসছি।

অশনির এই করুণ কাহিনি আজকের নয়, কম সে কম আধযুগ পুরোনো। এতদিনের চেষ্টাতেও ও সিংহ হয়ে উঠতে পারেনি—সেই শশকটিই রয়ে গেছে।

অশনির চেষ্টার রকমফের ছিল মন্দ নয়। একবার বাবার সঙ্গে পিস টিটি, মুক্তোমালার সঙ্গে যুদ্ধং দেহি। এবং তার আশু ফলাফল সগৌরবে পরাজয়ঃ বরণং। তারপর শাড়ি-গয়না দিয়ে মন নরম করার চেষ্টা। তাতেও কিছুদিন পর বোঝা গেল সেটা একমুখী পরিকল্পনা। লাভের মধ্যে রানিসাহেবার মরজিমাফিক কখনও-সখনও ভালোবাসা আদান-প্রদানের লাইসেন্স। অর্থাৎ যে-কে সেই।

অতঃপর বন্ধুদের পরামর্শ নিতে গিয়ে শুনল তারাও অনেকটা একই টাইপের সাজেশান বহুদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন কে যেন বলেছিল, শোন, এটা স্রেফ তোর মনের ব্যাপার। তুই বরং একবার সাইক্রিয়াটিস্ট দেখা।

চুপিচুপি তাই করেছিল অশনি। সবকিছু শোনার পর মনের ডাক্তার ওকে খুঁটিয়ে জরিপ করেছে। তারপর আচমকা প্রশ্ন করেছে, গলার কাছটা ভারী-ভারী লাগে? এমন মনে হয় যে, কোনও মালা-টালা পরে আছেন?

অশনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলেছে, হ্যাঁ...না...মানে, মাঝে-মাঝে মনে হয়।

ডাক্তারবাবু টেবিলে চাপড় মেরে গর্বের হাসি হেসে বলে উঠেছেন, এই তো, কেস ক্লিয়ার! একটা বেঙ্গলি প্রবাদ আছে জানেন তো, বানরের গলায় মুক্তোমালা? আপনার বউয়ের নামটাই এমন যে, সেটাকে ওই প্রবাদের সঙ্গে কানেক্ট করে নিয়ে আপনি নিজেকে ইয়ে...আই মিন হীনম্মন্যতায় ভোগেন। একটা সারভেন্ট সাইকোলজি সবসময় আপনার মধ্যে কাজ করে চলে।

অশনি পাথর। গলার কাছে উঠে আসা কাতর আর্তনাদটাকে অতি কষ্টে গিলে ফেলল।

ডাক্তারবাবু সেসব গ্রাহ্যই করলেন না। বলে চললেন এক নিশ্বাসে, আপনি বউয়ের নামটার কথা ভুলে যান। তা হলেই সব ও-কে হয়ে যাবে। সিক্সটি ফোর, প্লিজ।

শেষের কথাটা যে ভিজিটের অঙ্ক সেটা বুঝতে অশনির কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গিয়েছিল।

মুক্তোমালাকে অশনি মাঝে-মধ্যে 'মালা' বলে ডাকত। ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পরই ও মালা নামটাকে পারমানেন্ট করে দিল। মুক্তোমালার বিস্ময় অথবা ভ্রূকুটি ওকে টলাতে পারেনি। কিন্তু তাতেও ফলং নাস্তি।

তখন মরিয়া হয়ে অশনি তন্ত্র-মন্ত্র-তাবিজ-কবচ খুঁজতে লাগল। বশীকরণ... খুশিকরণ সবরকম পদ্ধতিরই খানাতল্লাশ নিতে শুরু করল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো গোয়েন্দার চোখে বিশ্লেষণ করতে লাগল। অলৌকিক শক্তিওয়ালা 'মহাপুরুষদের' দোরে-দোরে গোপন ধর্নার আয়োজন শুরু করল। যে করে হোক মুক্তি চাই-ই চাই! 'স্ত্রৈণ' উপাধি নিয়ে অশনি বৈতরণী পেরোতে চায় না।

ঠিক এইরকম একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন অশনির নজরে পড়ল।

রাত্রিবেলা খবরের কাগজের দখল পেয়ে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছিল, তখনই শেষ পৃষ্ঠার ছোট্ট বিজ্ঞাপনটায় চোখ আটকে গেলঃ

বৈজ্ঞানিক যুগের নবতম অবদান

আবেগথেরাপি

দূর থেকে প্রিয় কিংবা অপ্রিয়জনের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। যন্ত্রটির আকার পকেট ট্রানজিস্টারের মতো—ব্যবহারের সু-উপযোগী। দাম মাত্র দুশো টাকা। প্রখ্যাত তান্ত্রিক বিজ্ঞানীর অমূল্য আবিষ্কার—তন্ত্র ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়। ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হলে টাকা ফেরত।

তারপর প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করে একটা ঠিকানা দেওয়া আছে।

অশনি আর দেরি করল না। পরদিন সকালেই অফিস থেকে সোজা প্রাপ্তিস্থানে গিয়ে হাজির। কড়কড়ে দুইশত টাকা প্রদান। এবং পকেট ট্রানজিস্টারের আকৃতিসম্পন্ন আবেগথেরাপি যন্ত্র আনয়ন।

বাড়িতে এসেই যন্তরটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল অশনি। ওর প্রাইভেসি বলতে এই ছয় বাই চার ঘরটুকু। অতএব সেখানে বসে নিরাপদে যন্ত্রটি দেখতে লাগল আর সঙ্গে দেওয়া নিয়মাবলীর ছাপা কাগজটা বারবার করে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

অশনি আনন্দে খুশিতে কাঁপতে শুরু করল। ছাপা কাগজটায় যা-যা লিখেছে তা যদি সত্যি-সত্যিই হয়, তা হলে তো মার দিয়া কেল্লা। এতদিনে বোধহয় ক্রীতদাস জীবনের অবসান হবে। কিন্তু অশনি কি সেরকম কপাল করে এসেছে? এইটুকু যন্ত্রের কি সত্যিই এতটা শক্তি হতে পারে?

যন্ত্রটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিয়োর মতো দেখতে। রং কালো। একদিকে আধুলি মাপের একটা ছোট্ট জানলা। মুখে জাল দেওয়া। আর উলটোদিকে কুড়িটা ছোট-ছোট 'নব'—ঠিক রেডিয়োর

ভলিয়ুম কন্ট্রোল নবের মতো। এ ছাড়া অন-অফ করার জন্য একটা খুদে সুইচ আছে।

নবগুলোর প্রত্যেকটায় এক-দুই করে কুড়ি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া আছে। নম্বরগুলো এক-একটা আবেগের সাংকেতিক নাম। যেমন নিয়মাবলী পড়ে অশনি জেনেছে পাঁচ নম্বরটার অর্থ ভালোবাসা। সাত নম্বরটা ক্রোধ। তেরো নম্বরটা উদাসীনতা। উনিশ নম্বর অশ্রদ্ধা। এরকম কুড়িরকম আবেগের কুড়িটা নম্বর। যে-ব্যক্তিকে আবেগথেরাপি করা প্রয়োজন তার মাথার দিকে প্রথমেই যন্ত্রের ওই ছোট্ট জানলাটা তাক করতে হবে। তারপর সুইচ টিপে যন্ত্রটা অন করে দরকার মতো নব ঘোরাতে হবে। যেমন সাত নম্বর নবটা পুরো ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলে সেই মানুষটি রাগে একেবারে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে। আবার পুরো না ঘুরিয়ে আধাআধি ঘোরালে রাগটাও হবে মাঝামাঝি। এভাবে প্রত্যেকটা আবেগকেই আলাদা করে খুশিমতো কন্ট্রোল করা যায়। যেমন-যেমন দরকার তেমন-তেমন করে আবেগের ডোজ খুশিমতো কমাতে বাড়াতে পারবে অশনি।

দু-একটা বিজ্ঞানের কথাবার্তাও নিয়মাবলীর কাগজটায় লেখা আছে। যেমন, যন্ত্রটা অন করলেই তার জানলা দিয়ে একরকম অদৃশ্য তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ বেরিয়ে আসে। সেটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মগজের কোশগুলোকে উত্তেজিত করে তোলে। বিভিন্ন নব ঘোরালে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আর ধরনধারণ পালটে যায়, আর সেই অনুযায়ী মগজের বিভিন্ন অংশের কোশ উত্তেজিত হয়ে মানুষটিকে বিভিন্নরকম আবেগ প্রকাশে বাধ্য করে। মানুষের মধ্যে মূল যে-কয়েকটি আবেগ রয়েছে সেগুলোকে ফ্রয়েডীয় রীতিতে আরও শাখা-প্রশাখায় ভাগ করে মোট কুড়িটি আবেগ-উপআবেগ পাওয়া গেছে। আবিষ্কারক তান্ত্রিক-বিজ্ঞানী আশা করেন যে, এতেই খদ্দেরের চাহিদা ভালোরকম মিটে যাবে।

কী ব্যাপার, বাথরুমেই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?—মুক্তোমালার ঝাঁজালো গলা শোনা গেলঃ জলদি বেরোও, বাবা যাবেন। কোনও একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই।

অশনি তখন বিশরকম আবেগের বিশরকম নম্বর মুখস্থ করছিল। চমকে উঠে যন্ত্র আর কাগজ তোয়ালের আড়ালে লুকিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই হেসে উঠে বলল, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা, বিবিজি!

মুক্তোমালা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে উঠল, পাগল আর কাকে বলে!

অশনির সেসব গ্রাহ্য হওয়ার নয়। ও তখন মনে-মনে আওড়াচ্ছেঃ...পাঁচ—ভালোবাসা, ছয়—লোভ, সাত—ক্রোধ—।

অশনি অ্যাকশন শুরু করল রাতে।

বিয়ের পরপর বেচারা বউয়ের ভালোবাসা পেত নিয়মিত। কিন্তু তারপরই অকস্মাৎ সেখানে ভাঁটা পড়েছে। প্রথম তিন-চার বছরে সন্তান না আনার পরিকল্পনা নিয়েছিল দুজনেই। অথচ পরিবার

নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীকে আদর সোহাগ করার ব্যাপারেও সরকারি রেশনিং-এর অভিশাপ লেগেছে। বউয়ের এই ভাবসাব দেখে অশনি একদিন বলেই ফেলেছিল, মালা, তুমি মাইরি ফ্রিজিড।

মালা সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মটকে বলেছে, আর তুমি বুঝি ভিসুভিয়াস!

অশনি ফিউজ হয়ে গেছে।

এরপর প্রাকৃতিক কি কৃত্রিম কারণে জানা নেই, তিন প্রাণীর সংসার তিন প্রাণীরই রয়ে গেছে—অশনি, পিতা ও পত্নী। শুধু লক্ষ্মী নামে শান্তশিষ্ট একটি কাজের মেয়ে সকাল-বিকেল আসে। মুক্তোমালা মেয়েটিকে খুবই পছন্দ করে, ভালোবাসে, আবার বকা-ঝকাও করে। বাড়িতে সবাই স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় মিলিয়ে-মিশিয়ে বেশ মাখো-মাখো হয়ে আছে, শুধু অশনিই যেন আমড়ার আঁটি—মেঝেতে দিনরাত ড্রপ খাচ্ছে।

ঘড়িতে এখন নিশ্চয়ই এগারোটা বাজে। অশনি বিছানায় গা ঢেলেছে সাড়ে দশটায়। তখন থেকেই ঘুমের ভান করে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে আছে। যন্তর বালিশের তলায় রেডি।

একটু পরেই মালা এসে আলো নিভিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল। অশনি আস্তে-আস্তে একটা হাত বাড়িয়ে মালার বাহুতে রাখল। সামান্য চাপ দিয়ে কাছে টানল। সঙ্গে-সঙ্গেই শান্ত গলায় জবাব ভেসে এল, চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো—বিরক্ত কোরো না। এবং অশনির হাতটা অহিংসপথে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

মাঝেমধ্যেই অশনি এরকম হাত ফেরত পায়। কিন্তু আজ আর নয়! অশনি একেবারে সহিংস হয়ে গেল। অন্ধকার বালিশের নীচ থেকে যন্ত্র বের করে সুইচ অন করল। তারপর সন্তর্পণে ছোট্ট জানলাটা স্ত্রীর মস্তকে তাক করে পঞ্চম বোতামটিকে পুরোটা ঘুরিয়ে দিল। ওয়ান-টু-থ্রি স্টার্ট।

মুক্তোমালা চকিতে স্বামীর দিকে ফিরল। তারপর অশনিকে একেবারে জাপটে ধরল।

অশনি কোনওরকমে যন্ত্রটাকে বালিশের খাঁজে নামিয়ে রাখল—অবশ্য যন্ত্রের জানলাটা তখনও মোটামুটি মালার মাথার দিকে তাক করা। তারপর মালার সঙ্গে অন্ধকারে সুর মেলাল।

মালা যে এরকম ভিসুভিয়াসের মতো উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে, তা অশনি কখনও কল্পনাও করেনি। এ যেন বিলিতি ফুলশয্যার রাত। তার ওপর রাতের যেন আর শেষ নেই। আনন্দে আর বিস্ময়ে অশনি কোনও কথা বলতে পারছিল না।

ঘণ্টাখানেক পর অশনি মুক্তোমালার হাত থেকে মুক্ত হল। তারপর ও যন্ত্রটাকে অফ করে অন্ধকারেই কপাল তিনবার ঠেকাল। জয় বাবা তান্ত্রিক বিজ্ঞানী! গরিবের কপাল তা হলে শেষ পর্যন্ত খুলল!

সকালবেলা অশনি লক্ষ করল, মুক্তোমালা ঠিক সহজভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। দু-একবার চোখও নামিয়ে নিল। না, গত রাতের কথা মালা ভোলেনি। ভোলার কথাও নয়।

বাজার-টাজার সেরে এসে অশনি বাবার সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দিল। বাবা এখনও খবরের কাগজ পড়ছে। খবরের কাগজের দখল না পেয়ে অশনি আজ আর অখুশি হল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে দিব্যি টুকটাক গল্প জুড়ে দিল। বারকয়েক অকারণেই বলে ফেলল, বুঝলেন বাবা, এখন হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ।

বাবা বলল, হুঁ—। চোখের নজর কিন্তু খবরের কাগজের দিকে।

মুক্তোমালা ব্যস্তভাবে একবার ঘরে ঢুকে বাবার সুবিধে-অসুবিধের কথা জিগ্যেস করল—আর কিছু লাগবে কি না, বাবা কোথাও বেরোবেন কি না, বেরোলে কখন বেরোবেন ইত্যাদি।

অশনি অনেকক্ষণ ধরে মালার শ্বশুর-ভক্তি দেখল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, আজ শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে—অফিস যাব না। রান্নার জন্যে আর তাড়াহুড়ো কোরো না।

মুক্তোমালা চুপ করেই ছিল। কিন্তু কাগজ নামিয়ে বাবা সন্তানের দিকে তাকাল। চিন্তিত সুরে জানতে চাইল, কেন, ম্যাজম্যাজ করছে কেন?

অশনি মালার দিকে তাকাল। মুক্তোমালা চকিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তখন অশনি একটু হেসে বিজ্ঞভাবে বলল, এখন হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ—। তারপর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল। অফিস কি আর ও এমনি-এমনি কামাই দেবে! আবেগথেরাপি যন্ত্র দিয়ে মালার ওপরে নতুন-নতুন অ্যাকশন করে বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়কে ও অব্যাহত রাখবেই।

ও এখন লক্ষ্মীর গলা শুনতে পাচ্ছে। বেচারি মালার তিরস্কার সবই নির্বিবাদে গ্রহণ করে। বউয়ের মুখে অশনি কত কোটিবার যে শুনেছে, এরকম মেয়ে হয় না! আর কথায়-কথায় অশনির সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা তো আছেই!

সুতরাং এটাই সেকেন্ড অ্যাকশনের মাহেন্দ্রক্ষণ।

যন্ত্রটা জামার আড়ালে লুকিয়ে অশনি রান্নাঘরের কাছাকাছি গিয়ে হাজির। মুক্তোমালা তখন লক্ষ্মীর ওপরে শাসন ফলাচ্ছে। কারণ, বাসন ঠিকমতো মাজা হয়নি। মাজা বাসনের গায়ে এঁটো লেগে আছে।

তোকে রোজ-রোজ একই কথা বলি, তবু তোর চৈতন্য হয় না।

লক্ষ্মী কাঁচুমাচু মুখে চুপ।

অশনি যন্ত্রটা লক্ষ্মীর মাথার দিকে তাক করে সুইচ টিপে সাত নম্বর নব বোঁ করে ঘুরিয়ে দিল। ক্রোধ স্টার্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মী মুখঝামটা দিয়ে ফোঁস করে উঠলঃ অত যদি তোমার ছুচিবাই, বউদিদি, তো নিজে মেজে নিলেই পারো। দিনরাত্তির অমন ট্যাঁকট্যাঁক করে কথা আর সহ্য হয় না।

মুক্তোমালা স্পিকটি নট। ওর চোখ দুটো রসোগোল্লার মতো হয়ে গেছে। যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে পাঁচ-পাওয়ালা কোনও প্রাণী আচমকা ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে।

লক্ষ্মী, এসব কী যা-তা বলছিস! তুই কি পাগল হয় গেলি?

কী বললে, বউদি, আমি পাগল! তা তুমি রোজ অমন ছাগলের মতো আমায় গুঁতোও কেন বলো দিকি? ন্যায্য কথা বললেই যত দোষ! কোথাকার লাটসাহেবের বউ এয়েছেন যেন, হুঁঃ!—লক্ষ্মী দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অশনিকে একঝলক দেখল।

যা, তুই এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা!—মুক্তোমালার মুখ টকটকে লাল। হাত-পা রাগে থরথর করে কাঁপছে।

অশনি মনে-মনে মুচকি হেসে উনিশ নম্বর নবটাকে আড়াই প্যাঁচ ঘুরিয়ে দিল। ব্যস, ক্রোধের ওপর অশ্রদ্ধার বিষফোঁড়া চেপে বসল।

হুঁঃ—বেরিয়ে যা বললেই যেন বেরিয়ে যেতে হবে। তোমার বাপের বাড়ি যে বেরিয়ে যাব?—লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে অশনির দিকে তাকিয়ে বলল, এটা দাদাবাবুর বাড়ি। দাদাবাবু বললে তবেই বেরোব—।

লক্ষ্মীর এই কথায় মুক্তোমালা চোখ কপালে তুলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে কীসব বলতে লাগল বোঝা গেল না। লক্ষ্মী তখনও সমানে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে। অশনি উলটোদিকে নব ঘুরিয়ে সুইচ টিপে যন্ত্রটা অফ করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর চোখ কপালে তোলার পালা।

তোমায় এসব কী অকথা-কুকথা বললুম গো, বউদিদি! আমার মাথায় কি শাঁকচুন্নি ভর করেছিল! এ কী পাপ করলুম গো আমি!—বলেই হাউমাউ করে কেঁদে মেয়েটা সটান মালার পা জাপটে ধরলঃ আমায় তুমি বঁটি দিয়ে কেটে ফ্যালো। আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দাও গো—।

অশনি আরও কয়েকসেকেন্ড দাঁড়িয়ে দুই লেডিজের লাগামছেঁড়া কান্নাকাটি দেখল। অকারণেই গলা তুলে বলল, বুঝলে, এ হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ। তারপর চলে যেতে গিয়েই দেখল পিছনে বাবা দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনেই বোধহয় এসেছে।

অশনি যন্ত্রটা কিছুক্ষণ আগেই লুকিয়ে ফেলেছিল। তবে বাবা দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। অশনি বাবাকে চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে গেল ভেতরের ঘরের দিকে।

অশনি লক্ষ করল, মালার পুরোনো প্রতাপ যেন ধীরে-ধীরে অনেকটা মিইয়ে গেছে। কথাবার্তা কম বলছে। প্রতি পদে অশনিকে ডাক দিতেও ভুলে যাচ্ছে। আপনমনেই কী যেন ভাবছে।

সারাদিনের সামান্য কথাবার্তায় অশনি জেনেছে লক্ষ্মী এখনও কাজে বহাল রয়েছে। অনেক করে ক্ষমা-টমা চেয়ে ও নাকি স্বীকার করেছে ওদের ফ্যামিলিতে বরাবরই ভূতে-পাওয়ার রোগ আছে। এরকম ও আর কখনও করবে না। করলে গলা টিপে বউদিদিমণি যেন ওর মুখে নুন ঠেসে দেয়। এরকম আরও কত কথা।

মুক্তোমালা এসব কথা বাবাকে বলছিল। অশনি কোনওরকমে হাসি চেপে সেখান থেকে সরে এসেছে।

বিকেলে বাবা বেরিয়েছিল। রোজই এরকম আড্ডা মারতে বা তাস-টাস খেলতে বেরোয়। সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ বিষণ্নমুখে ফিরে এসে বউমাকে খবর দিল, জানো, আজ সকালে হরিপদ মারা গেছে। স্ট্রোক হয়েছিল।

হরিপদ বোস বাবার প্রাণের বন্ধু। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই দুজনে প্রায় গলায়-গলায়। সুতরাং বাবা যে আঘাত পাবে তাতে আর সন্দেহ কী!

বাবা মুখ কালো করে চেয়ারে বসতেই মুক্তোমালা একগাল হেসে বলল, সত্যি, একটা দারুণ খবর শোনালেন, বাবা।

বাবা চমকে উঠে বউমার মুখের দিকে তাকাল।

স্নেহের বউমা তখন আপনমনেই বলে চলেছে, সত্যি, কতদিনে যে এরকম খুশির খবর শুনিনি। হরিপদ কাকা মারা গেছেন! আঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বুড়ো হয়ে কী কষ্টটাই না পাচ্ছিলেন। হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—।

বউমা! এসব কী বলছ তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

পাশের ঘরের জানলা থেকে চুপিসাড়ে অশনি সব দেখছিল। চিতাবাঘের মতো ঘাপটি মেরে যন্ত্রটাকে ও তাক করে রেখেছিল মালার মাথা লক্ষ্য করে। খুশি ও আনন্দের এক নম্বর নব পুরোটা ঘোরানো।

বাবা ও বউমার অবস্থা যখন চরমে, তখন অশনি যন্ত্রটা অফ করে ভিজে বেড়ালটি সেজে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখে আঁচল চেপে মালা তিরবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অশনি ভালোমানুষি সুরে জানতে চাইল, কী হয়েছে, বাবা?

বাবা মাথায় হাত রেখে বসেছিল। আস্তে করে শুধু বলল, বউমাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করো। তোমার সম্বন্ধ ঠিক করার সময়ে যতদূর খোঁজ নিয়েছিলাম তাতে ওদের ফ্যামিলিতে পাগলামির ধাত আছে বলে শুনিনি। অবশ্য...।

অশনি ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মালার খোঁজে শোওয়ার ঘরে এসে দেখল ঘর অন্ধকার করে বেচারি বিছানায় উপুড় হয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছে। উৎফুল্ল অশনি দরজাটা বন্ধ করে বউকে সান্ত্বনা দেওয়ার মহান কর্তব্য পালন করতে মনোযোগ দিল।

অশনি বাবাকে কখনও রাগতে দেখেনি বা চিৎকার করে কথা বলতে শোনেনি। ওর খুব সাধ হচ্ছিল আবেগথেরাপি যন্ত্রের কেরামতি দেখিয়ে বাবাকে তেলেবেগুনে আগুন করে দেয়। সেইজন্যেই তক্কে-তক্কে ছিল। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলেই সুযোগ এসে গেল।

মনে-মনে অশনি ঠিক করেছিল, আজই ও মুক্তোমালাকে শেষবারের মতো টাইট দেবে। তা হলে ওর সাধ পূর্ণ হবে। পত্নী বশ মানবে। আর অশনিও রোজ ভোরবেলা বেড-টি পাবে।

মালার অবস্থা আপাতত মোটেই সুবিধের নয়। গতকাল রাতে অশনিকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছে। না, যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়নি। কাঁদতে-কাঁদতেই মালা স্বামীকে বলেছে, আমার বোধহয় মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নইলে বাবার সামনে ওরকম আজেবাজে কথা বলি! আবার দ্যাখো, লক্ষ্মী মেয়েটাও কেমন বজ্জাত। সক্কালবেলায় পাগলের মতো কী ঝগড়াটাই না করল। আচ্ছা, আমরা সবাই কি আস্তে-আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছি?...কে জানে, হয়তো শনির দশায় ধরেছে।

অশনি বউকে আদর করতে-করতে বলেছে, তুমি ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে একটু ঘুমোও তো দেখি!

তারপর মুচকি হেসে মনে-মনে বলেছে, এসব শনির দশা নয়, ডার্লিং অশনির দশা!

মুক্তোমালার মুষড়ে পড়া অবস্থা দেখে অশনির মনের ভাব সমবেদনার দিকে টার্ন নিয়েছিল। সেইজন্যই কাল রাতে আর যন্ত্র দিয়ে ভালোবাসা আদায় করেনি। কিন্তু আজ সকালে নিজের দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত হওয়ার ইতিহাস রোমন্থন করতেই 'বাঙালি জাগো' মনোভাব ফিরে এল। তার ওপর 'বেড-টি' না পাওয়ার আক্ষেপ ও বিরক্তি। অতএব ওয়ান-টু-থ্রি, অ্যাকশন।

চায়ে পরপর ক'টা চুমুক দিয়ে বাবা বলল, বউমা, চা-টা আজ দারুণ হয়েছে। আমাকে আর-একটা বিস্কুট দাও তো।

অশনি থেরাপি যন্ত্রের ক্রোধ, বিরক্তি, তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধা—মোট চারটে নব ফুল অন করে মুক্তোমালার মস্তক তাক করে বসেছিল। অতএব বউমা মুখে নেড়ে বলে উঠল, বিস্কুট লাগলে নিজে নিয়ে নিন, আমি দিতে পারব না। বসে-বসে খালি ফরমাস।

অশনি এবার যন্ত্র তাক করল বাবার মাথার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে বাবা চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, ডটার-ইন-ল, হোল্ড ইয়োর টাং! ডোন্ট ফরগেট, আই অ্যাম ইয়োর ফাদার-ইন-ল।

বাবা একসময়ে প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি পড়াত। বেঁচে থাকতে মায়ের মুখে শুনেছিল, রেগে গেলে বাবা নাকি ক্রমশ ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বাড়াতে থাকে আর গলার স্বর উঁচু পরদায় তোলে। অশনির বালক বয়েসে মা বিদায় নিয়েছে। বাবা-ই ওকে মানুষ করেছে, কিন্তু ভদ্দরলোকের রুদ্রমূর্তি অশনির কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। আজ হচ্ছে।

ফাদার-ইন-ল আর ডটার-ইন-ল ততক্ষণে পানিপথের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। আর অশনির যন্ত্র তালে তাল মিলিয়ে একবার একে তাক করছে, আর-একবার ওকে।

এমনসময় ঘরে ঢুকে পড়ল লক্ষ্মী। বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে তো একেবারে থ। অশনিকে লক্ষ্য করে বলল, এসব কী কাণ্ড হচ্ছে গো, দাদাবাবু?

অশনি অমনি অন্য নবগুলো কমিয়ে দিয়ে ফুল ডোজে বিনয় চালিয়ে দিল। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে বাবা ও বউমা বৈষ্ণব বিনয়ে গদগদ।

বাবা কোমল সুরে তখন বলতে শুরু করেছে, আমাকে ক্ষমা করে দাও, বউমা। আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। আর কখনও এরকম হবে না।

আর বউমাও কম যায় না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে ঝপ করে শ্বশুরমশাইকে এক সাষ্টাঙ্গ প্রণামঃ অন্যায় আমার হয়েছে, বাবা। আমায় শাস্তি দিন।

তারপর একটানা অনুশোচনা, অনুতাপ, বিলাপ, প্রলাপ ইত্যাদি চলছিল, অশনি যন্তর অফ করে ঘর থেকে সটকে পড়ল।

লক্ষ্মী তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। বোধহয় গতকাল বউদিমণির সঙ্গে ওর বিচিত্র ঝগড়ার কথা ভাবছিল।

ততক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে, লক্ষ্মীকে দেখে ফাদার-ডটার দুজনের অবস্থাই ডেলিকেট।

অশনি নাটকের শেষটুকু উঁকি মেরে দেখেই শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। হাতের যন্ত্রটা লক্ষ্মী দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে!

শেষ সংশয়ের উত্তর অশনি পেয়ে গেল একটু পরেই। ফোলা চোখ নিয়ে নাক টানতে-টানতে ঘরে এসে ঢুকল মালা। ঢুকেই সটান অশনির পা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তুমি বাঁচাও।

অশনি যন্ত্রটা লুকিয়ে ফেলেছিল। বউকে দু-হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে অবাক হয়ে বলল, কীসের বাঁচানোর কথা বলছ, মালা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

অশনির বুকে মাথা রেখে মালা বলল, লক্ষ্মী আমাকে সব বলেছে। তুমি হাতে করে রেডিয়োর মতো কী একটা নাড়াচাড়া করছিলে আর তাতেই নাকি আমার আর বাবার মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। কালও যখন লক্ষ্মী আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখনও তোমার হাতে ওই কালো

রঙের যন্ত্রটা ছিল। তুমি সব জানো। সেদিন রাতেও নিশ্চয়ই ওই যন্ত্রটা তুমি কাজে লাগিয়েছিল। নইলে—।

অশনি আর কঠোর হতে পারল না। আবেগে গদগদ হয়ে মালাকে সব ফাঁস করে দিল। এমনকী বালিশের নীচ থেকে আবেগথেরাপি যন্ত্রটা বের করেও দেখাল।

মালা দুঃখ-কান্না সব ভুলে গিয়ে হাঁ করে যন্ত্রটা দেখতে লাগল। দেখা, শোনা, শেষ হলে ও বলল, তাই বলে শুধু-শুধু তুমি আমাকে এরকম নাজেহাল করলে?

অশনি পালটা প্রশ্ন করল, শুধু-শুধু মানে?

তারপর যন্ত্রসমেত হাত নেড়ে বলল, আমার দাবিদাওয়া না মিটলে এই যন্ত্রের রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাপ্লিকেশান চলতেই থাকবে।

মালা অবাক হয়ে জানতে চাইল, কীসের দাবিদাওয়া?

অশনি একে-একে সবিস্তারে নিজের বঞ্চিত জীবনের ইতিহাস বউকে শুনিয়ে দিল। এমনকী বেড-টি খাওয়ার অতৃপ্ত বাসনার কথাও বাদ দিল না।

মালা সব শুনে হেসে বলল, ব্যস, এই? কাল থেকে তুমি দেখে নিয়ো। তুমি হলে আমার সব, তোমাকে আমি কখনও হেলা-শ্রদ্ধা করতে পারি! তবে লক্ষ্মীটি, ওই যন্ত্রটা তুমি বাড়ি থেকে বিদেয় করো। নইলে সবসময় ভয়ে-ভয়েই আমি মরে যাব। বাব্বাঃ, কী লজ্জা, কী লজ্জা!

শ্বশুরের সঙ্গে এনকাউন্টারের কথা মনে করে মালা মরমে মরে গেল যেন।

অশনি এগিয়ে এসে বউকে নতুন বউয়ের মতো করে আবার কাছে টানল। মুক্তোমালা নীচু গলায় বলল, তুমি আজ আর অফিসে যেয়ো না। বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আগে ঠান্ডা করো। বাবাকে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না।

অশনি বলল, তথাস্তু। আর যন্তরটাকেও আমি আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে দিচ্ছি। তা বলে তোমার শর্ত তুমি ভুলো না যেন! কাল সকালের বেড-টি দিয়েই আমার নতুন লাইফ শুরু হোক। প্রমিস?

মুক্তোমালা ওর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে বলল, প্রমিস! প্রমিস! প্রমিস!

সঙ্গে-সঙ্গে ‘হিপ হিপ হুররে’ বলে এক কানফাটানো চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল অশনি এবং পরমুহূর্তেই আবেগথেরাপি যন্ত্রটাকে সর্বশক্তি দিয়ে এক ভয়ংকর আছাড় মারল মেঝেতে।

[মুক্তোমালা প্রতিদিনই ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিয়ো মাথার কাছে নিয়ে শুতে যায়। আজও সঙ্গে নিয়েছিল। অশনি ঘুম ভেঙে দেখল সেটা দু-টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। আর সামনের দেওয়ালে মালার বাপের বাড়ির হোল ফ্যামিলির গুরুদেবের ফটো টাঙানো ছিল—সেই ফটোর কাচ ভেঙে চৌচির। এবং গুরুদেবের ঠোঁটে যেন তান্ত্রিক-বিজ্ঞানীর হাসি।

মুক্তোমালা তখন রাগ-থমথমে মুখে সদ্য-স্বপ্ন-ভেঙে-জেগে-ওঠা স্বামীকে কটমট করে দেখছে।]



মনে পড়ার খেলা

পুকুরের জলের ওপিঠে কৃষ্ণচূড়ার পাতা বেয়ে রোজ যেমন সূর্য ওঠে তেমনি আজও উঠেছিল। ভোরবেলায় জানলার গ্রিল ঘেঁষে চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভালো লাগে, আজও লাগছিল। হঠাৎই পিছন থেকে রুবির গলা শুনতে পেলাম।

'তোমাকে একটা দরকারি কথা বলব।'

না দেখেই বুঝলাম, ও বিছানায় উঠে বসেছে। মাথার চুল এলোমেলো। কপালের টিপটা বোধহয় ঠিকঠাক নেই।

আমি গাছের পাতার নড়াচড়া দেখছিলাম। ছোট-ছোট পাখি উড়ছিল কয়েকটা। শব্দ করে কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, 'বলো—।'

'আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না—।'

হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। কাপ-প্লেট শত টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে। জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশটা পলকে ঘোলাটে হয়ে গেল। আর চনমনে সূর্যটা মুখ ভার করে গাছ বেয়ে আবার নেমে যেতে লাগল দিগন্তের ও-পিঠে।

আমি অসহায়ভাবে ঘুরে তাকালাম রুবির দিকে। ওর সুন্দর মুখটাকে অবাক চোখে দেখলাম। চার বছর ধরে ছন্নছাড়া পাগলের মতো ওকে ভালোবেসেছি। আর আজ, এখন, ভালোবাসা আর নেই! সব শেষ!

'রুবি, কী বলছ তুমি! আমি—' আমার গলা বুজে গেল। চোখ করকর করছিল।

রুবি এতটুকু বিচলিত হল না। বাঁ-হাত দিয়ে ওর মাথায় কী যেন খুঁজছিল। তারপর হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। বলল, 'শান্তনু, এই নাও তোমার ভালোবাসা।'

আমি হাত পেতে আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে নিলাম। আমার হাতের ফরসা তালুর ওপরে একটা সিলিকন মাইক্রোচিপ। তার গা থেকে বেরিয়ে রয়েছে চোদ্দোটা ধাতুর পিন। ভালোবাসায় কাঁটা আছে।

রুবি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। এখন সাততাড়াতাড়ি নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। সুটকেসে ভরে নিচ্ছে শাড়ি-জামাকাপড়। এইসব কাজের মধ্যেই ও কথা বলছিল।

'আমার স্মৃতিকোশে আমাদের ভালোবাসার ব্যাপারে যা-কিছু স্মৃতি ছিল সবই জমা আছে ওই চিপের ভেতরে। তুমি অন্য কোনও রোবট-মেয়ে নিয়ে এলে তার মাথায় ওই চিপটা বসিয়ে দিয়ো। তা হলে সে তোমাকে আমার মতোই ভালোবাসবে।'

আমি কাঁদছিলাম। ভালোবাসা হারিয়ে গেলে এত কষ্ট হয় জানতাম না। রুবি পুরোপুরি রোবট নয়। অর্ধেক মানবী, অর্ধেক রোবট। ওরা রূপে গুণে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। ওরা ভালোবাসতে জানে অদ্ভুতভাবে। ওদের ভালোবাসার টান অলৌকিক। সেইজন্যেই রুবিকে নিয়ে এসেছিলাম 'অ্যানড্রয়েড সেন্টার' থেকে। ভালোবেসেছিলাম মন আর শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে। ওকে ঘিরে আমার স্মৃতির সবটাই সুখের।

সেন্টারের ডিরেক্টর আমাকে ভয়ের কথাটাও শুনিয়েছিলেন। যে-কোনওদিন যে-কোনও মুহূর্তে এই অর্ধমানবীরা ভালোবাসাহীন হয়ে যেতে পারে। সেই আঘাত আমি সইতে পারব তো? মনে আছে, আমি বলেছিলাম, আমার ভালোবাসার ওপরে আমার আস্থা আছে। অথচ আজ, এই অপরূপ সকালে, আমাকে কাঁদিয়ে রুবি ভালোবাসাহীন হয়ে গেল।

রুবি আর কোনও কথা বলছিল না। শুধু যান্ত্রিক ঢঙে একটার পর একটা কাজ সারছিল। আর আমি বোকার মতো সিলিকন চিপটা মুঠো করে ধরে বসেছিলাম।

একটু পরে চোখ মুছে ধরা গলায় ওকে বললাম, 'রুবি, মনে পড়ে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে একটা গোটা দিন কীভাবে আমরা কাটিয়েছিলাম? গঙ্গায় ভেসে ছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা—।'

রুবি কাজ থামিয়ে ভাবলেশহীন মুখে আমাকে দেখল। একটু থেমে বলল, 'তুমি কি পুরোনো কোনও কথা বলছ? আমার কিচ্ছু মনে নেই। সব ধরা আছে ওই মাইক্রোচিপের ভেতরে। নতুন কাউকে এনে ওই চিপটা লাগিয়ে দিয়ো, তার সব মনে পড়ে যাবে।' রুবি আবার গোছগাছে মন দিল। ব্যস্ত পায়ে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগল।

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম। মাথার ভেতরে আলপিন ফোটাচ্ছে কেউ। এক কথায় চার বছরের ভালোবাসা শেষ! রুবি তো সব ভুলে গেল। কিন্তু আমি তো মানুষ! আমি এত সহজে সব ভুলে যাই কেমন করে? আমার মাথার ভেতরে তো আর মাইক্রোচিপ নেই!

একটু পরেই সাদামাটা 'যাচ্ছি' বলে রুবি চলে গেল। ওর পরনে নীল-সাদা ফুলকাটা সিল্কের শাড়ি। সাউথ ইন্ডিয়ায় বেড়াতে গিয়ে ওকে কিনে দিয়েছিলাম। রংটা ওর খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু জানি, এখন আর ওর কিছু মনে নেই। সেইসব 'অপ্রয়োজনীয়' স্মৃতি জমা রয়েছে আমার হাতের এই মাইক্রোচিপের ভেতরে।

আমি যে এখন কী করি!

সামনেই বিমূর্ত গ্রাফিক ঢঙের স্তম্ভের ওপরে বাসানো রয়েছে আমার আর রুবির রঙিন হলোগ্রাম। হাত মুঠো করে আমি সেই স্তম্ভ ঘিরে ঘুরতে লাগলাম। চারপাশ থেকে দেখতে থাকলাম রুবিকে। স্বপ্নের মতো চোখ, সবুজ টিপ, আর ঘন কালো চুলে নিয়ম-ছাড়া ঢেউ।

আমার বুকের ভেতরে পাগলের মতো কুড়ুল চালিয়ে কেউ কাঠ কাটছিল। হাহাকার ভরা চোখে হাতের মাইক্রোচিপটাকে দেখলাম। চার বছরের এত ভালোবাসা এইটুকু সিলিকন চিপের ভেতরে ধরে গেল! ভালোবাসা এতই নমনীয়!

সারাটা দিন ধরে অসহ্য যন্ত্রণা আর ছটফটানির পর ঠিক করলাম, বাঁচতে গেলে আমাকে ভুলতে হবে। যে-করেই হোক এই ভালোবাসার স্মৃতি আমাকে ভুলতে হবে। তখনই আমার 'মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার'-এর কথা মনে পড়ল।

সেন্টারের রিসেপশান রুমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটি সুবেশা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মাথার ওপরে ডিজিটাল ডিসপ্লে প্যানেলে আমার নাম জ্বলে উঠেছে, তার পাশেই একটা কোড নম্বরঃ সি-ফোর।

মেয়েটি আমাকে হাসিমুখে ইশারা করল। ওর হাসির সঙ্গে রুবির কিছুটা মিল লক্ষ করলাম। ওরও জন্ম কি অ্যানড্রয়েড সেন্টারে?

শব্দ-হয়-না-এমন মেঝেতে পা ফেলে নানান করিডর ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। গোলকধাঁধার বহু জটিল পথ পেরিয়ে অবশেষে একটা বিশাল কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামান্য হেসে তরুণী আমাকে ভেতরে ঢোকার জন্য ইশারা করল। তারপর ঘুরে রওনা হল করিডর ধরে। আমি কয়েকসেকেন্ড ওর সুন্দর ঢঙে হেঁটে যাওয়া দেখলাম। তারপর কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এলাকায়।

সাদা পোশাক পরা জনাতিনেক মানুষের হাত ঘুরে শেষপর্যন্ত একটা ছোট মাপের ঘরে এসে হাজির হলাম। ঘরে সাদা আলখাল্লা পরা একজন মানুষ পারসোনাল কম্পিউটারের সামনে বসে কীসব কাজ করছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেনঃ 'আসুন, মিস্টার সরকার। আপনার কেসটা আমার হাতে পড়েছে। আমার নাম শ্যামল দত্ত। আশা করি আপনাকে সাহায্য করতে পারব—।'

ডক্টর দত্ত বয়স্ক মানুষ। গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। জুলপি নুন-মরিচ। চোখে চশমা। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট। ওঁকে দেখে ভরসা পাওয়া যায়।

ডক্টর দত্তর নির্দেশমতো একটা এয়ার কুশনে বসলাম। বাতাসের চাপে ভেসে থাকা গদি-চেয়ারে বসলেই কেমন যেন ঘুম পায়। উনি আমার খুব কাছে এগিয়ে এলেন। কতকগুলো যন্ত্রের বোতাম নিয়ে নাড়াচড়া করলেন। তারপর আমার মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার সরকার, এবারে গোটা গল্পটা ধীরে-ধীরে বলুন। আপনি কী ভুলতে চান, কেন ভুলতে চান...সব খুলে বলুন।'

আমি রুবির কথা বলতে শুরু করলাম। আমার চোখ বুজে এসেছিল। মাঝে-মাঝে ডক্টর দত্তের সহানুভূতি মাখা গলা শুনতে পাচ্ছি। যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। আমি সম্মোহিতের মতো চার বছরের প্রেমের উপন্যাস স্মৃতি থেকে পড়ে গেলাম। বললাম, আমি রুবিকে ভুলতে চাই। ওর ভালোবাসা ভুলতে চাই।

আমার কথা শেষ হলে ডক্টর দত্ত বললেন, 'আপনি যেমন হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছেন সেরকমই থাকুন। তবে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনবেন, আর দরকার মতো জবাব দেবেন।'

আমি রুবির কথা ভাবছিলাম। চোখ বুজে থাকা অবস্থাতেই ছোট্ট করে বললাম, 'হুঁ—।'

'মেমোরি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে কয়েকটা দরকারি কথা আপনাকে বলে নিতে চাই, মিস্টার সরকার।'

'বলুন—।'

ডক্টর দত্ত একটানা একঘেয়ে সুরে বলে চললেন। মনে হচ্ছিল, আমার মাথার চারপাশে একটা ভোমরা গুনগুন শব্দ তুলে উড়ছে...উড়ছে।

'আমাদের স্মৃতি মানে হচ্ছে কোনও ঘটনায় অংশ নেওয়া—অর্থাৎ, সেই ঘটনার অভিজ্ঞতা হওয়া। তারপর সেই ঘটনাকে দীর্ঘদিন ধরে স্মৃতিকোশে ধরে রাখা, এবং প্রয়োজনমতো তা মনে করতে পারা। পরিভাষায় একেই বলা হয় লার্নিং, রিটেইনিং অ্যান্ড রিমেমবারিং। সব মিলিয়ে মেমোরি। অনেক বছর আগেই জানা গেছে, স্মৃতি ব্রেনের একটি বিশেষ অংশে রাসায়নিক গঠন নিয়ে সঞ্চিত থাকে...রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড...মানে, আর. এন. এ. অণুর মধ্যে। ঘটনার পর যত দিন যায় স্মৃতি ততই ক্ষয়ে যেতে থাকে, ঝাপসা হয়। প্রথমদিকে যত তাড়াতাড়ি ঝাপসা হয় পরের দিকে হয় অনেক ধীরে-ধীরে। এ ছাড়া অন্যান্য বহু নতুন ঘটনার স্মৃতিও এসে জমা হয় স্মৃতিকোশে। আর অনেকদিন ধরে ব্যবহার না করলে স্মৃতিকোশের ক্ষমতাও কমে আসে। ফলে আমরা যে-কোনও ঘটনা ভুলে যাই তা হল নতুন-নতুন ঘটনার স্মৃতির চাপে, অথবা, সেই বিশেষ ঘটনা যেসব স্মৃতিকোশে জমা আছে সেগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার না করে।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন ডক্টর দত্ত, 'সুতরাং মিস্টার সরকার, রুবিকে ভুলতে গেলে স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে নতুন-নতুন নানারকমের কাজে মেতে ওঠা। আর রুবির কথা একবারও না ভাবা—অর্থাৎ, রুবির ভালোবাসা সংক্রান্ত স্মৃতিকোশগুলোকে একটুও ব্যবহার না করা। আপনি কি সেটা পারবেন?'

আমি রুবির সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতার কথা ভাবছিলাম। ডক্টর দত্তের প্রশ্নটা তৃতীয়বারে আমার কানে ঢুকল। বললাম, 'অসম্ভব—।'

শ্যামল দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমারও সে-কথাই মনে হয়েছে। তা হলে এখন আর. এন. এ. মলিকিউল এক্সাইটেশান ম্যাপিং ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

আমি চোখ খুলে জিগ্যেস করলাম, 'তার মানে?'

ডক্টর দত্ত কাশলেন। বললেন, 'স্মৃতির ধরনের ওপরে নির্ভর করে বিভিন্ন আর. এন. এ. অণুতে বিভিন্ন অ্যামপ্লিচিউডের সিগনাল পাওয়া যায়। একে বলে মেমোরি ভ্যালু। আপনার ব্রেন-এ কয়েকটা ইলেকট্রোড লাগিয়ে দেব আমি। তারপর সেগুলোর আউটপুট জুড়ে দেব মেমোরি ম্যাপিং যন্ত্রের সঙ্গে—' আঙুল তুলে একটা জটিল যন্ত্রের দিকে দেখালেন ডক্টর দত্ত, বললেন, 'তা হলে ওই ভিডিয়ো পরদায় উঁচু-নীচু চাদরের মতো একটা ছবি দেখা যাবে। সেটাই মেমোরি ম্যাপ। সুখের স্মৃতি হলে চাদরটা সেই জায়গায় উঁচু হয়ে থাকবে। আর দুঃখের স্মৃতি হলে চারদটা টোল খেয়ে যাবে নীচের দিকে। সুখ বা দুঃখের তীব্রতা অনুযায়ী উঁচু-নীচু জায়গাগুলোর উচ্চতা বা গভীরতা কম-বেশি হয়, আবার চেহারাতেও ওগুলো চোখা কিংবা ভোঁতা হয়। আপনার মেমোরি ম্যাপ এঁকে নেওয়ার পর বাইরে থেকে ব্রেনের আর. এন. এ. মলিকিউলে এক্সাইটেশান সিগনাল পাঠিয়ে ম্যাপের উঁচু জায়গাগুলো আমি সমান করে দেব। তা হলেই আপনার সুখের স্মৃতি মোটামুটি মুছে যাবে। সেইসঙ্গে রুবিও।' একটু থেমে ডক্টর দত্ত প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আপত্তি নেই তো?'

আমি দু-হাতে মাথা টিপে ধরলাম, বললাম, 'একটুও না, ডক্টর। রুবিকে আমি ভুলতে চাই।'

ডক্টর দত্ত কাজ শুরু করলেন। আমাকে চোখ বুজতে বললেন। আমি চোখ বুজলাম। একটু পরেই কেমন যেন ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেলাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার মাথায় ছুঁচের মতো কীসব ফোটানো হচ্ছে। তবে কোনও ব্যথা নেই। আমার চোখের সামনে আমার আর রুবির হলোগ্রামটা ভাসছিল।

'মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' থেকেই গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিল বাড়িতে। তারপর ওরাই বোধহয় আমাকে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন এক অপরূপ দৃশ্য আমার মন ভরিয়ে দিল। কৃষ্ণচূড়ার পাতার ফাঁকে ভোরবেলায় সূর্য। নীচের পুকুরের

জলে ওদের ছায়া। ভাসা-ভাসা মনে পড়ছিল, এরকম দৃশ্য আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন দেখেছি...।

হঠাৎ চোখ ফেরাতেই দেখি একটা রঙিন হলোগ্রাম। আমার সঙ্গে এক যুবতী। কপালে সবুজ টিপ। কোথায় যেন দেখেছি ওকে? কোথায় যেন...?

আমার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছিল। মাথার ভেতরে উড়ে বেড়াচ্ছিল দুর্জ্ঞেয় কুয়াশা। কত কী মনে পড়তে চাইছে, অথচ মনে পড়ছে না। কাকে যেন আমি পাগলের মতো ভালোবেসেছিলাম...কিন্তু কিছুতেই তার নাম অথবা মুখ মনে পড়ছে না।

গঙ্গার বুকে ভেসে পড়েছিলাম এক তীব্র সুখের দিনে। কিন্তু কে যেন ছিল আমার পাশে...?

একটা গোলকধাঁধার ভেতরে চোখ বাঁধা অবস্থায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম আমি। মনে পড়ছিল নানান কথা। স্কুলের খেলার মাঠে কী যেন একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু আর কিছু মনে করতে পারছি না। আমার মা কত ভালোবাসত আমায়—এই সত্যিটা বেশ মনে আছে। কিন্তু মায়ের মুখ? মায়ের নাম? আমি সাগরের নোনা জলে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। এরকম একটা, দুটো, তিনটে...অসংখ্য সুখের স্মৃতির টুঁটি টিপে ধরেছে কেউ। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

এ-কথা সত্যি যে, জীবনের যাবতীয় ভালোবাসার স্মৃতি আমি ভুলতে চেয়েছিলাম। তা নইলে কষ্টে যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যেতাম আমি। কিন্তু এখন? স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমি কাউকে ভালোবেসেছি, কিন্তু কাকে তা জানি না। মনে পড়ছে, আমার সাধারণ জীবনে কত অসাধারণ সুখের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু একটা ঘটনাও মনে পড়ছে না আমার। হা ভগবান! আমার মায়ের নাম, মায়ের মুখ, স্কুলের হাসিখুশির দিনগুলো...সব মুছে গেছে স্মৃতির মানচিত্র থেকে। সুখের স্মৃতির ছিটেফোঁটাও আর নেই!

এ যন্ত্রণা যে আরও অসহ্য, আরও কষ্টের।

সামনেই টেবিলের ওপরে পড়ে রয়েছে একটা সিলিকন মাইক্রোচিপ। চিপটা হাতে তুলে নিলাম। প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরলাম মুঠোয়। ওটার সরু-সরু ধাতব পিনগুলো গেঁথে গেল হাতের তালুতে।

মাথার ভেতরে আমার তখন আর. এন. এ. অণুগুলো পাগলের মতো দাপাদাপি করছে। ফিরে পেতে চাইছে ওদের হারানো সুখের স্মৃতি।



আকাশে কীসের শব্দ

আপনারা সকলেই জানেন, গত ১১ নভেম্বর, শনিবার, বেলা বারোটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণের শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকায় এক ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এই শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগে গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ থেকে শুরু করে আমতলা, নরেন্দ্রপুর পর্যন্ত সবাইকে জানান দিয়ে গেছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুতেই এই শব্দের উৎসের হদিস পাওয়া যায়নি। কোনও বিস্ফোরণের ঘটনাও টের পাননি কেউ, অথবা কেউ যে হতাহত হয়েছেন এমন খবরও শোনা যায়নি। ফোর্ট উইলিয়ামের চিফ অফ স্টাফ জে. কৌশিক বলেছেন, সেদিন কোনও শব্দ তাঁরা শোনেননি। আওয়াজের ধরনের বিবরণ শুনে তিনি বলেন, ব্যাপারটা সনিক বুম হতে পারে। সুপারসনিক কোনও প্লেন আকাশপথে উড়ে গেলে একটা শক ওয়েভ তৈরি হয়। তার ফলে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় বাজ পড়ার মতো জোরালো শব্দ হতে পারে। অথচ তার আশপাশের মানুষজন সেরকম কোনও শব্দই শুনতে পাবেন না। শনিবার বারবেলার শব্দটা ছিল হয়তো তাই।

শব্দের রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে, কারণ সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ কোনও অজ্ঞাতকুলশীল সুপারসনিক প্লেন কলকাতার আকাশপথে উড়ে গেছে এমন কোনও প্রমাণ কেউই দিতে পারেননি।

অথচ প্রচণ্ড শব্দ যে একটা হয়েছে তাতে কোনও ভুল নেই। আর বহু বাড়ির কাচের জানলাও যে তখন ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়েছে তাও তো মিথ্যে নয়!

তা হলে কীসের শব্দ শোনা গিয়েছিল নভেম্বরের ১১ তারিখে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরাও বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। সনিক বুম, মাক নাম্বার, মাক কোন্ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা রচনা প্রকাশিত হয়েছে নানান পত্রপত্রিকায়। এমনকী অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী আর্নস্ট মাকের জীবনীও ছাপা হয়েছে একটি কিশোর-পত্রিকায়। তার ফলে, বিজ্ঞানী মাকের

নাম থেকেই যে মাক নাম্বার, মাক কোন্—এইসব নামকরণ করা হয়েছে, সেটাও জনসাধারণ জেনে গেছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও শব্দের কারণটা কেউই জানতে পারেনি।

কারণ, এতদিন আমি মুখ খুলিনি। আর শুভদীপের গোপন পরীক্ষার কথাও কাউকে বলিনি। সেইসঙ্গে শুভদীপের স্ত্রী রনিতার কথাও খুলে বলা হয়নি কাউকে। ফলে নিখোঁজ বিজ্ঞানী শুভদীপ পালচৌধুরীর সঙ্গে এই বিস্ফোরণের যে কোনও সম্পর্ক আছে, সে-কথা কেউ বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আর অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। কারণ, গতকালই শুভদীপের পাঠানো একটা মোটা খাম আমার ঠিকানায় এসে হাজির হয়েছে। আমাকে লেখা শুভর শেষ চিঠি।

চিঠিটা আমি যতই পড়েছি ততই অবাক হয়েছি। চিঠি তো নয়, সে যেন শুভদীপের জীবনের এক গোপন অধ্যায়ের বিবরণ। কী করে একটা সাধারণ ব্যাপার থেকে ওর জীবন এরকম বিপজ্জনক দিকে এগিয়ে গেল তা ভাবতে অবাক লাগে। অথচ শুভদীপ উচ্ছল হাসিখুশি ছিল।

ছাত্রজীবন থেকেই ওকে দেখেছি আমি। যেমনই বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা তেমনই প্রিয় ছিল সকলের। আর ওর দরাজ দিলখোলা হাসি আমি যেন এখনও শুনতে পাই। যদিও জানি, শুভদীপ আর কখনও হাসবে না, কাঁদবে না। এমনকী আমার পিঠে এক জোরালো থাপ্পড় কষিয়ে আর কখনও বলে উঠবে না, ‘বুঝলি শালা, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই কেউ বিজ্ঞানী হয় না।’

আমি ওর কথায় মোটেই আহত হতাম না। কারণ, আমরা বেশিরভাগই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করার জন্যে, ভালো-ভালো চাকরি পাওয়ার জন্যে, বিদেশে যাওয়ার জন্যে, অধ্যাপনার দায়সারা কর্তব্য পালনের জন্যে।

আর শুভদীপ? ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করত বিজ্ঞানকে ভালোবেসে।

আমি তাও মজা করে ওকে বলতাম, ‘তুই বুঝি বিজ্ঞানী!’

‘ইয়েস ব্রাদার, আমি রোজ মর্নিং-এ বিজ্ঞান দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই।’ এ-কথা বলেই শুভদীপ হো-হো করে হেসে উঠত।

শুভদীপ আমাদের অনেকের কাছেই প্রিয় ছিল, কিন্তু আমি বোধহয় ওকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। আমাদের ভালোবাসা এমনই ছিল যে, সাহেবদের দেশ হলে হয়তো অন্যায় সম্পর্কের অভিযোগে হাজতবাস করতে হতো।

শুভদীপ পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে দিব্যি ছিল। কিন্তু রনিতাকে বিয়ে করার পর ওর জীবনটা হঠাৎই বোধহয় অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকেই ধীরে-ধীরে ওর জীবনটা এগিয়ে গিয়েছিল গত ১১ নভেম্বরের দিকে।

১১ নভেম্বর সেই ভয়ংকর শব্দটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছিল। কান্না এসে গিয়েছিল গলায়। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বহুদিনের প্রিয় বন্ধু শুভদীপ আর নেই। ওই আশ্চর্য শব্দের মাধ্যমে ওর বিচিত্র মৃত্যুটাকে ও যেন ঘোষণা করে গেল।

না, শুভদীপ আত্মহত্যা করেনি। জীবনে অনেক শোক-দুঃখ ও পেয়েছে, কিন্তু কখনও আত্মহত্যার কথা ভাবেনি। বরং আমি কখনও ওই প্রসঙ্গ তুললে হেসে বলত, 'ব্রাদার, আত্মহত্যা করার সাহস যদি কারও থাকে, তা হলে তার আর আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় না।'

শুভদীপ হাসত বটে, কিন্তু ওর মুখের আড়ালে আমি অনেক শোকগাথা টের পেতাম। অথচ রনিতাকে বিয়ে করার পর তখন সবেমাত্র বছরদুয়েক কেটেছে।

শুভদীপের ব্যাপারটা নিয়ে এই এক মাস আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। কলেজ-জীবনে তোলা আমাদের গ্রুপ ফটোটা দেখেছি বারবার। ওর সুন্দর নিষ্পাপ মুখটা যেন আমার চোখে তাকিয়ে নীরবে বলেছে, 'বুঝলি, আমি চলে গেলাম। তোরা সব দুধে-ভাতে থাকিস।'

কথায়-কথায় শুভদীপ শুধু বলত, 'না ভাই, আমি দুধে-ভাতে মানুষ, আমার ওসব পোষাবে না।'

এ-কথা শুনে আমাদের আড্ডার নতুন কোনও সঙ্গী ভাবত, ও বুঝি খুব বড়লোক। তখন আমরাই হেসে ওর ঠাট্টার মর্মার্থটা বুঝিয়ে দিতাম তাকে। বলতাম, শুভদীপের কেষ্টপুরের বাড়িতে দুটো গরু ছিল। সেইজন্যেই ওর খাদ্যতালিকার প্রধান আইটেম ছিল দুধ-ভাত। বাবা-মায়ের চাপে এই মেনু ওকে প্রায় বিশ বছর সহ্য করতে হয়েছে।

তারপর ফিজিক্স নিয়ে এম. এসসি. পার্ট টু পরীক্ষা দেওয়ার সময় ও একদিন সগর্বে জানাল, ও আর দুধ-ভাত খাচ্ছে না।

আমরা সবাই জিগ্যেস করলাম, 'কেন? কেন?'

ও বেশ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে জানাল, ওদের গরু দুটো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওর বাবা বলেছেন, 'এখন তো তুই-ই বড় হয়ে গেছিস, তা হলে আমার আর ও-গরু দুটোকে রেখে লাভ কী?'

ওর কথায় আমরা হো-হো করে হেসে উঠেছি।

গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি শুভর চিঠিটা পড়েছি। চিঠি তো নয়, সুদীর্ঘ এক কাহিনি।

সেই লেখা পড়ার পর বাকি রাতটা আমি আর ঘুমোতে পারিনি। আমার কানের কাছে ১১ নভেম্বরের সেই শব্দটা আবার বেজে উঠেছিল। একবার নয়, বারবার। যেন কামান দেগে ওর মৃত্যুকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হচ্ছিল।

আজ সকালে নতুন সূর্য দেখার পর আমার মনটা যেন খানিকটা আশ্বাস পেল। মনে হল, শুভর কথা যদি আমি সবাইকে জানাই, তা হলে শুভর আত্মা বোধহয় তৃপ্ত পাবে। আর রনিতার? রনিতা বোধহয় অখুশি হবে না। কারণ, শুভকে ও ভীষণ ভালোবাসত।

অবশ্য রনিতাও তো এখন আর নেই! শুভর শেষ চিঠি পড়েই ব্যাপারটা জানতে পেরেছি আমি। কারণ, গত একবছর ধরে শুভ আমার সঙ্গে সেরকম যোগাযোগ রাখত না। শুধু মাঝে-মাঝে খেয়ালখুশি মতো ফোন করত। কিছু জিগ্যেস করলেই বলত, এখন ও একটা অদ্ভুত গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছে। তার বেশি আর কিছু কখনও বলেনি। আর কথা শেষ করার আগে বলত, 'কোনওদিন যদি একটা জোরালো এক্সপ্লোশানের শুনিস তা হলে বুঝবি আমি আর নেই।'

এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। শুভর শেষ চিঠি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে। তাই ওর সম্পূর্ণ কাহিনিটাই আমি আপনাদের কাছে পেশ করতে চাই। অন্তত আমি যেমন করে বুঝেছি। আর আগেই তো বলেছি, এখন আর চুপ করে থাকার কোনও মানে হয় না।

বারান্দার টবের গাছগুলোয় জল দিচ্ছিল রনিতা, আর আপনমনে কথা বলে যাচ্ছিল। আসলে ও প্রাণভরে গালমন্দ করছিল হতচ্ছাড়া চড়ুইপাখিগুলোকে। দুষ্টু পাখিগুলো রোজই ওর সাধের গাছগুলোর কচি পাতা আর ফুল ঠুকরে-ঠুকরে খেয়ে যায়।

শুভদীপ ওর পড়ার টেবিলে বসে বই আর কাগজপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত ছিল। ডানহাতের কাছে চায়ের কাপ। সামনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সকালের সূর্য। বারান্দার যেটুকু চোখে পড়ে তাতে রঙিন মরশুমি ফুল, দু-একটা চঞ্চল চড়ুইপাখি, সবুজ গাছের পাতা, আর রনিতাকে দেখা যাচ্ছে।

এই সকালবেলার শীতের আমেজ ঘেরা পরিবেশে সবই সুন্দর। রনিতাও। ঠিক এই সময়টা শুভদীপের মনে হয় বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও বেঁচে থাকার অন্যান্য আরও আকর্ষণ চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু রনিতার কথা ওর নরম ভাবনায় বাধা দিচ্ছিল বারবার।

'রনিতা, চড়ুইগুলো এখনও এত সভ্য হয়ে ওঠেনি যে, তোমার বাংলাভাষা বুঝবে।' শুভদীপ ঠাট্টা করে কথাটা জানলা দিয়ে ছুড়ে দিল।

'বাংলাভাষা না বুঝুক, লাঠির ভাষা তো বুঝবে—' রনিতা জানলার কাছে এগিয়ে এল। দেখা গেল ওর হাতে চড়ুইপাখি তাড়ানোর জন্য মানানসই একটা কাঠি।

সকালের মন-ভালো করা আলোয় রনিতাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শুভদীপ ওকে দেখল একটু অবাক হয়ে। রনিতা এত সুন্দর, অথচ এত কথা বলে!

বিয়ের পর বছরখানেক যেতে-না-যেতেই রনিতার কথা বলার বাড়াবাড়ি বাতিকটা টের পেয়েছে শুভ। রনিতা কখনও অল্পে থামে না। একদিন সন্ধেবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওকে জিগ্যেসও

করেছে।

‘তুমি এত কথা বলো কেন, রনিতা?’

‘আমি বেশি কথা বলি?’ অবাক হয়ে স্বামীর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে রনিতা। ও তখন নিজের শাড়ি-জামাকাপড় ঠিকঠাক করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখছিল। আলমারির কাছ থেকেই একটু চোখা স্বরে ও আরও বলেছে, ‘শেষকালে তুমি আমার এই বদনাম দিলে! জানো, সত্যি-সত্যি কাদের টকেটিভ বলে? যারা অপ্রয়োজনে বাড়তি কথা বলে। আমি তো দরকার ছাড়া একটি কথাও বলি না। আমাকে তুমি আর যাই বলো, টকেটিভ বলতে পারবে না। জানো তো, আমাদের —।’

হাত তুলে ওকে বাধা দিয়েছে শুভঃ ‘থাক, থাক, বাবা। আমারই ভুল হয়েছে। তুমি বিন্দুমাত্রও টকেটিভ নও। বরং খুবই লক্ষ্মী মেয়ে।’

‘তুমি কি চাও আমি বোবা হয়ে থাকি?’

শুভ বুঝতে পারল রনিতা একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে। তাই ও চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে উঠে গেল আলমারির কাছে। দু-হাতে আলমারির খোলা পাল্লা ধরে রনিতাকে আগলে দাঁড়াল। তারপর গাঢ় গলায় বলল, ‘এখন তোমাকে দু-চার- সেকেন্ড বোবা করে দেব।’

রনিতা একটু অবাক হয়ে বলল, ‘তার মানে?’

‘তার মানে এই।’ বলে রনিতাকে হতভম্ব করে দিয়ে চট করে ওকে চুমু খেল শুভদীপ।

সত্যি-সত্যি দু-চারসেকেন্ড পর ব্যাপারটা শেষ হতেই রনিতা আলতো রাগের ভান করে বলল, ‘এটা কী হল!’

শুভদীপ হাসতে-হাসতে জবাব দিল, ‘চুমু খাওয়া হল। এতে তোমার রাগের কী আছে। আমি তোমার অফিসিয়াল চুম্বক, মানে, ম্যাগনেট।’

‘চুম্বক!’ রনিতা আরও অবাক।

শুভ হেসে বলল, ‘ব্যাকরণ ভালো করে পড়োনি? চুম্বন করে যে সে-ই হল চুম্বক। আমি তোমার হাজব্যান্ড—সো, অফিশিয়াল ম্যাগনেট।’

এরপর রনিতা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বেশি কথা বলার অভিযোগটা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু রনিতার বেশি কথা বলার ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে শুভদীপের মাথায় বাসা বেঁধে ফেলল। ও যখন রনিতার সঙ্গে কথা বলত তখনই ওর মাথার ভেতরে বিজ্ঞানী মন তার কাজ করে যেত।

সুতরাং একদিন কাজের বউয়ের বিনা নোটিসে কামাই করা নিয়ে রনিতা যখন সুদীর্ঘ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা সবে শেষ করেছে, তখন শুভ বলে বসল, ‘রনি, একটা নতুন আইডিয়া আমার মাথায়

এসেছে।’

রনিতা প্রায় অপ্রস্তুত হয়ে জিগ্যেস করল, ‘কী আইডিয়া?’

শুভ ওকে কাছে ডেকে নিজের পাশে বসাল। তারপর আগ্রহ দেখিয়ে বলল, ‘মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করো। যদিও ব্যাপারটা বিজ্ঞানের, তবু মনে হয় না তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে—।’

রনিতার বিষয় ছিল ফিলজফি। বিজ্ঞান সম্পর্কে ওর বিচিত্র আতঙ্ক আছে। কিন্তু শুভকে ও জানে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে শুভ বেশ একরোখা। নতুন আইডিয়ার ব্যাপারটা যখন ও রনিতাকে শোনাতে চায়, তখন ও শোনাবেই।

রনিতা ছোট্ট করে ঘাড় নাড়তেই শুভ বলতে শুরু করল, ‘দ্যাখো, শব্দ হল একরকমের শক্তি। যেমন আলো, তাপ—এসবই হল শক্তি। শক্তির কোনও বিনাশ নেই, তবে রূপান্তর হতে পারে। আমাদের এই মহাবিশ্বে আদিম অবস্থায় যে-পরিমাণ শক্তি ছিল, এখনও তাই আছে। শুধু শক্তির নানারকমের রূপান্তর হয়েছে।’

রনিতা বলল, ‘আমার একটু-একটু গুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নো প্রবেলেম—তুমি বলে যাও।’

‘তোমাকে তো বললাম, শব্দ একরকম শক্তি। এই যে তুমি এতক্ষণ ধরে কাজলের মায়ের কামাই নিয়ে এত কথা বললে, তাতে অনেক শব্দ হল—।’

‘এত কথা আবার বললাম কোথায়! আমি তো শুধু বললাম, ও যে আসবে না সেটা আগে—।’

‘রনিতা, প্লিজ। আমাকে আগে বলতে দাও, তারপর যত খুশি কথা বোলো।’

রনিতার মুখ সামান্য গোমড়া হল।

শুভদীপ সেটা তেমন গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল না করে বলে চলল, ‘তোমার উচ্চারণ করা শব্দগুলোকে নিয়ে আমি যদি রূপান্তর ঘটাতে পারি তা হলে হয়তো দেখা যাবে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে। মানে, সাউন্ড এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। বলা যায় না, তোমার একটু আগের বলা কথাগুলো থেকে হয়তো ১৫ ওয়াটের একটা বাল্‌বকে মিনিটপাঁচেক জ্বালানো যাবে।’

রনিতা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ওর ফরসা মুখে কালচে ছায়া পড়েছে। শুভদীপের দিকে না তাকিয়েই ও বলল, ‘ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব মজার মনে হচ্ছে, তাই না?’

শুভদীপ একটু সাবধানী গলায় বলল, ‘হ্যাঁ, মানে একটু মজা তো আছেই। তবে...ইয়ে...আসল কথাটা শুনবে? যা বললাম, তা বোধহয় খুব একটা মিথ্যে নয়।’

রনিতা সহজ হওয়ার ভান করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। অনেকটা নিজের সঙ্গে কথা বলার ঢঙেই বলল, ‘তুমি উচ্চশিক্ষিত সায়েন্টিস্ট মানুষ। সব ব্যাপারে তোমার কথাই শেষ কথা।’

শুভও পালটা জেদ দেখিয়ে বলল, ‘বিজ্ঞান কখনও মিথ্যে কথা বলে না।’

‘বিজ্ঞানীরা কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারে।’

সেই মুহূর্তে ছন্দপতন ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু শুভদীপ একটা হিসেব কষছিল মনে-মনে। আচ্ছা, এটুকু সময়ে কতগুলো শব্দ উচ্চারণ করল রনিতা? দুশো, তিনশো, নাকি আরও বেশি শব্দ উচ্চারণ করেছে?

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে শুভদীপ ঠিক করল গুনে দেখবে। এরপর থেকে হিসেব করে দেখবে চব্বিশ ঘণ্টায় রনিতা কত কথা বলে—মানে ক’টা শব্দ উচ্চারণ করে। তারপর তা থেকে হিসেব করবে, প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণের পিছনে ঠিক কত আর্গ বা জুল শক্তি খরচ হয়। তারপর উত্তরটাকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াট-ঘণ্টা বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে। তখনই বোঝা যাবে, রনিতা ক’দিন কথা বললে সেই শব্দ-শক্তি থেকে একটা ১৫ ওয়াট পাওয়ারের বাল্‌বকে পাঁচমিনিট জ্বালানো যাবে।

এরপর থেকে রনিতার উচ্চারণ করা শব্দ গুনতে শুরু করেছে শুভদীপ। তখনই বুঝতে পেরেছে, বলা যত সহজ, বাস্তবে কাজটা তত সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষক শুভদীপ তাতে পেছপা হয়নি। একটা নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা কোনও খাঁটি গবেষকের কাছে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। শুভদীপ এই রোমাঞ্চকর নেশায় ডুবে গেল।

ও খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখল, কোনও মানুষ কথা বলার সময়ে উচ্চারণ করা শব্দগুলোর মাঝে সেভাবে কোনও ফাঁক রাখে না—যেমনটা পাওয়া যায় লেখা কথার সময়ে। রনিতার কথা গুনতে গিয়ে ও ঠিক এই সমস্যার পড়ল। কিন্তু তার চেয়েও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল রনিতার মেজাজ।

প্রথম-প্রথম শুভদীপ যখন রনিতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করত তখন মাঝপথেই কথা থামিয়ে রনিতা বলে উঠত, ‘কী আপনমনে বিড়বিড় করছ! তুমি আমার কথা কিছুই শুনছ না!’

গুনলে কখনও আর শোনা যায়! শুভ তখন তাড়াতাড়ি রনিতার কথায় মন দিয়েছে। নিজের সাফাই হিসেবে বলেছে, ‘না...ইয়ে...একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। প্লিজ, আর-একবার বলবে—।’

এভাবে বেশ কিছুদিন চেষ্টার পর শুভদীপ হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু ওর মনে কেমন একটা জেদও চেপে বসল—একটা-না-একটা পথ ওকে বের করতেই হবে। এই চিন্তায় ও দিনরাত ডুবে রইল। বইপত্র আর কাগজ নিয়ে নানান অঙ্ক কষল।

তারপর একদিন ও আর্কিমিদিসের মতো ‘ইউরেকা!’ বলে চিৎকার করে উঠল। এবং গবেষণাগারে ওর কাজ শুরু করল।

‘দুধে-ভোত মানুষ’ কথাটা শুভদীপ মজা করে ব্যবহার করলেও ওর পৈতৃক সম্পত্তি নেহাত কম ছিল না। এ ছাড়া ও নিজেও ভদ্রস্থ টাকা উপার্জন করে। সুতরাং দক্ষিণ কলকাতার ছিমছাম এলাকায় ওর এই ফ্ল্যাটের মাপ যথেষ্ট বড়। আর সেই কারণেই তার একটা ঘরকে ও একরকম ওর গবেষণাগার বানিয়ে ফেলেছে।

সমস্যাটার চলনসই একটা সমাধান খুঁজে পাওয়ার পর শুভদীপ ওর গবেষণাগারে আরও জোরালো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠল।

ও দেখেছে, রনিতা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চাররকম স্পিডে কথা বলে। আর স্পিড যতই বাড়তে থাকে ওর কথার তীব্রতা ততই উচ্চগ্রামে চড়তে থাকে। এ ছাড়া ওর কথার কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে শুভদীপ দেখেছে, কথার স্পিড বেড়ে গেলে কম্পাঙ্কের ঊর্ধ্বসীমা আরও ওপরে উঠে যায়।

সুতরাং, এইসব তথ্য এবং বেশ কয়েকবার ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরার করার পর শুভদীপ একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারল। যন্ত্রটা খুব নিখুঁত হল না বটে, কিন্তু রনিতার উচ্চারণ করা শব্দের মোটামুটি একটা হিসেব কষতে পারল।

যন্ত্রটার তত্ত্ব খুব সহজ-সরল। প্রথমে উচ্চারণ করা শব্দগুলোর কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে উচ্চতম কম্পাঙ্কটি সে নির্ণয় করে। তারপর মেপে নেয় ডেসিবেল তীব্রতা। এই দুটি তথ্য থেকে সে হিসেব কষে বের করে বক্তা কোন স্পিডে কথা বলছে। রনিতার চারটে স্পিডের জন্য প্রতি সেকেন্ডে উচ্চারণ করা শব্দের সংখ্যার চারটি গড় মান যন্ত্রটিকে আগেই জানানো আছে। সুতরাং স্পিড জানার পর যন্ত্রটা হিসেব করে বক্তা কত সেকেন্ড কথা বলল। তারপর সেই সময়কে নির্দিষ্ট গড়মান দিয়ে গুণ করে নিজের মেমোরিতে সঞ্চয় করে রাখে। এইভাবে সঞ্চিত তথ্যকে সে পরপর যোগ করে যোগফল বের করে রাখে। ফলে যে-কোনও সময় উচ্চারিত শব্দের সংখ্যা জানতে চাইলেই যন্ত্রটা সাম্প্রতিকতম যোগফল দেখিয়ে দেয়। এই যোগফলে ভুলের সম্ভাবনা বড়জোর শতকরা ১৭ ভাগ।

যন্ত্রটা যদি নির্দিষ্ট কোনও মানুষের কণ্ঠস্বরে টিউন করা থাকে তা হলে অন্য কারও কথা সে তার হিসেবের মধ্যে ধরবে না।

শুভদীপ যন্ত্রটার নাম দিল ‘ডিজিটাল অডিয়ো ওয়ার্ড কাউন্টার’।

নিজে কথা বলে ও বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যন্ত্রটির দক্ষতা যাচাই করল। যখন দেখল, যন্ত্রের ভুল কোনও সময়েই শতকরা ১৭ ভাগের বেশি হচ্ছে না, তখন ও দারুণ খুশি হল। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় রইল, কবে ও ফ্ল্যাটটাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য একা নিজের দখলে পাবে।

সুযোগ এসে গেল আটদিনের মাথায়। রনিতা নীচের ফ্ল্যাটের মিসেস সেনের সঙ্গে পাড়ার মহিলা সমিতির একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেল। বলল, ঘণ্টাতিনেক পরেই ফিরবে। শুভদীপের তখন আনন্দে সাতহাত লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল।

অতএব ন'দিনের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল আসল পরীক্ষা।

পাঁচটা খুদে-খুদে মাইক্রোফোন ও বসিয়ে দিল ফ্ল্যাটের নানা জায়গায়। সেই মাইক্রোফোনগুলো রনিতার সমস্ত কথা নিঁখুতভাবে ধরে পৌঁছে দিতে লাগল শুভদীপের মূল যন্ত্রে। আর শুভদীপ প্রতিদিন রাতে সেই যন্ত্রে জুড়ে দেওয়া কম্পিউটারের কিবোর্ডে বসে রনিতার উচ্চারণ করা শব্দের হিসেব রাখতে লাগল।

দশদিন পর একটা গড় হিসেব কষল শুভ। তাতে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতোঃ ১৬৬৪৩।

পরদিন চায়ের টেবিলে রনিতাকে খবরটা জানাল শুভ।

'জানো, লাস্ট ১০ দিনে তুমি অ্যাভারেজে ডেইলি সাড়ে ১৬ হাজার শব্দ বলেছ।'

রনিতা খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। চোখ না তুলেই বলল, 'সবসময় ইয়ারকি ভাল্লাগে না।'

'না, ইয়ারকি না। সিরিয়াসলি বলছি।'

এইবার খবরের কাগজ রেখে শুভর দিকে সরাসরি তাকাল রনিতা। কিছুক্ষণ স্বামীকে জরিপ করে জিগ্যেস করল, 'কী করে গুনলে?'

শুভদীপ ওর যন্ত্রের ব্যাপারটা রনিতার কাছে একটুও ভাঙেনি। এখনও ভাঙতে চাইল না। তাই চোখ মটকে বলল, 'সে একটা কায়দা আছে। এখন বলব না। পরে বলব।'

রনিতা আর কোনও কথা বলেনি। আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওর ভাবভঙ্গিতে শুভদীপ এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, রনিতা ব্যাপারটা খুব খুশি মনে নেয়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শুভদীপ এই রোমাঞ্চকর নেশায় ডুবে যাচ্ছিল। ওর যন্ত্রে রনিতার সমস্ত কথা টেপ করার ব্যবস্থাও ছিল। কখনও-কখনও ও গভীর রাত পর্যন্ত টেপরেকর্ডার চালিয়ে রনিতার কথাগুলো শুনত আর নিজের নানান বৈজ্ঞানিক হিসেব-নিকেশ করত। রনিতার কথার শব্দ শোনা আর শব্দ গোনা ওকে ক্রমশ যেন পাগল করে তুলল।

রনিতাকে ও ঠাট্টা করে মাঝে-মাঝেই ওর কথা বলার হিসেবটা শুনিয়ে দেয়। বলে, 'ডার্লিং, এই উইকে তোমার টকিং অ্যাভারেজ ১৫ হাজারের কিছু কম।'

রনিতা কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু দিনের-পর-দিন একই ধরনের হিসেব শুনতে-শুনতে ও ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসে। শুভদীপের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। শুভদীপ কিছু জিগ্যেস করলে

দায়সারা ছোট্ট জবাব দেয়। কিন্তু তাতে ওর দৈনিক গড় হিসেবে তেমন কোনও হেরফের হয় না। কারণ শুভদীপ যখন থাকে না, তখন রনিতা কাজের বউ, বারান্দার চড়ুইপাখি, বাথরুমে ঢুকে পড়া পায়রা, আচমকা বৃষ্টি, কিংবা চড়া রোদ্দুর—এদের সঙ্গে বকবক করে ওর ঘাটতি পুষিয়ে নেয়।

রনিতার সুন্দর চোখের তলায় ধীরে-ধীরে একটা কালচে ছোপ পড়ছিল। এখন ও সারাটা দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। সে ব্যস্ততা এমনই যে, কাজ না থাকলেও ও সর্বক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করতে থাকে আর আপনমনেই বকবক করে যায়। শুভদীপ যখন ওকে কিছু বলতে চায় তখন কেমন রুক্ষভাবে জবাব দেয়। চেহারা আগের তুলনায় অনেক ভেঙে গেছে। প্রায়ই হজমের গোলমালে ভোগে।

শুভদীপ একদিন ওকে ডাক্তার দেখানোর কথা বলতেই রনিতা একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল, বলল, ‘আমি ঠিক আছি, ডাক্তার আমার দরকার নেই, দরকার আসলে—’ কথা শেষ করেনি রনিতা।

একদিন রাতে, অন্ধকারে, শুভকে পরম আগ্রহে অকূলপাথারে খড়কুটোর মতো জড়িয়ে রনিতা বলল, ‘তোমাকে একটা কথা বলব?’

‘বলো—।’

‘মেনে নিচ্ছি, আমি বেশি কথা বলি। তুমিই জিতলে, আমি হারলাম। কাল থেকে তোমার ওই এক্সপেরিমেন্ট তুমি বন্ধ করবে?’

অন্ধকারে মশারির ছাদের দিকে তাকিয়ে শুভ বলল, ‘দেখি।’

কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শুভদীপ টের পাচ্ছিল, এই নেশাটা ময়াল সাপের মতো ওকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে। ১৫ ওয়াটের একটা বাল্‌ব পাঁচমিনিট না জ্বালানো পর্যন্ত ওর নিস্তার নেই। একটা বিকৃত জেদ ভেতর থেকে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

রনিতার উচ্চারণ করা কথা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য পাগলের মতো মেতে উঠল শুভদীপ। প্রায় সাড়ে চারমাসের অক্লান্ত গবেষণায় ও তৈরি করল একটা অভিনব যন্ত্র—তার নাম দিল ‘এনার্জি ট্যাপার’। এনার্জি ট্যাপার বা ‘শক্তি-ফাঁদ’ ওকে এতই খুশি করল যে, ও পাঁচদিন বিজ্ঞানের কাছ থেকে ছুটি নিল আর রনিতার কথাও শুনল না।

কিন্তু তারপর থেকেই ও আবার মেতে উঠল শক্তি-ফাঁদ নিয়ে।

রনিতার টেপ করা কথাগুলোকে ও স্বাভাবিক ভলিউমে প্লে-ব্যাক করে তা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্ট্যান্ডে বসানো একটা ছোট্ট গোলকে শব্দ-শক্তিকে ফোকাস করে কেন্দ্রীভূত করল শুভদীপ। তারপর অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্স ফিল্ড প্রয়োগ করে সেই শক্তিকে বন্দি করল। আর তখনই চকচকে গোলকটা ভেসে উঠল

শূন্যে। তার গায়ে আলো পড়ে অদ্ভুত এক বর্ণালী তৈরি করে ওটা যেন একটা স্বপ্নের বুদবুদ হয়ে ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।

শুভদীপ অবাক হয়ে দেখতে লাগল রনিতার 'কথা' ভেসে বেড়াচ্ছে ওর ল্যাবরেটরিতে। তার গায়ে বর্ণালীর খেলা।

এরপর অন্তত মাসখানেক ধরে শুভদীপ ওর এনার্জি ট্যাপার নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলল।

এখন ওর ল্যাবরেটরি দরজা খুললেই দেখা যায় ছোট-বড় অসংখ্য রঙিন বুদবুদ স্থির হয়ে ভেসে আছে ঘরের ভেতরে। বাতাসে সামান্য আলোড়ন তুললেই সেগুলো হেলেদুলে নড়েচড়ে বেড়ায়। শুভদীপ ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওগুলোকে দ্যাখে। আর একটা অদ্ভুত তৃপ্ত ওর বুকের ভেতরে উঁকিঝুকি মারতে থাকে।

একদিন সন্ধেবেলা কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে শুভদীপ রনিতাকে বলল, 'রনি, আজ একটা গুড নিউজ আছে।'

রনিতা নীচুগলায় যান্ত্রিকভাবে বলল, 'কী?'

'ডক্টর দত্ত, আমাদের ইন্সটিটিউটের ডিরেকটর, বলেছেন আমার রিসার্চের থার্ড স্টেজ সাকসেসফুল হলে এই বিষয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট শুরু করবেন—আমি হব তার চিফ ইনভেস্টিগেটর।'

'শুনে খুশি হলাম।' রনিতার স্বরে কোনও প্রাণ ছিল না।

'জানো, থার্ড স্টেজ মানে কী?'

'না, জানি না।'

শুভদীপের মনে হল, ও যেন কোনও রোবটের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু তাতেও ও দমে না গিয়ে বলল, 'থার্ড স্টেজ মানে একটা বাল্‌ব জ্বালানো—পাঁচ মিনিটের জন্যে।'

রনিতা কোনও কথা বলল না। কোনওরকম প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না ওর চোখেমুখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রনিতা বলল, 'যাই, তোমার জন্যে চা করি গিয়ে—।'

শুভ ওকে খুশি করার জন্য বলল, 'একবার ও-ঘরে গিয়ে দেখবে চলো, ঘরময় কতকগুলো রঙিন বল ভেসে বেড়াচ্ছে। ওই বলগুলোর ভেতরে তোমার কথার শক্তি লুকিয়ে আছে। ভাবতেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয় না?'

রনিতা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি যখন থাকব না, তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি তো জানো, বিজ্ঞানীরা চলে যায় একের-পর-এক—কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।'

রনিতা হঠাৎই গলা পালটে কেমন অসহায় সুরে বলল, ‘আমার কথা তুমি একটুও ভাবো না—।’

শুভদীপ মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বলল, ‘ভাবি। কিন্তু আমার রিসার্চটা যে অনেকটা সময় নিয়ে নেয়...।’

রনিতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আর শুভদীপ ওর গবেষণার তৃতীয় ধাপ নিয়ে ভাবতে লাগল।

একটা ব্যাপার শুভদীপ লক্ষ করছিল। ওর সামনে রনিতা ইদানীং ভীষণ কম কথা বললেও সারাদিনে ওর টকিং অ্যাভারেজ আগের তুলনায় অনেক বেশি।

শুভর ডিজিটাল অডিয়ো ওয়ার্ড কাউন্টার সেই তথ্যটাই রোজ-রোজ জানিয়ে দিচ্ছিল ওকে।

রনিতার টেপ করা কথাগুলো রাতে শোনার সময় বেশ তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিল শুভদীপ। আগে ওর কথাবার্তার পিছনে যদিও বা কোনও অজুহাত বা কারণ থাকত, এখন সেসবের কোনও বালাই নেই। যখন-তখন যা খুশি বকবক করে যায় ও, কথার কোনও মাথামুন্ডু নেই। একেবারে যেন পাগলের প্রলাপ।

রনিতা কথা বলতে এত ভালোবাসে!

শুভদীপ মাঝে-মাঝেই ভাবে, এ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করবে। কিন্তু ওর ভেতরে একটা জেদি আর কৌতূহলী মন ওকে থামতে দেয় না।

একদিন শুভদীপের গবেষণার তৃতীয় ধাপও সফল হল।

একদিন সত্যি-সত্যিই ও একটা ১৫ ওয়াটের বাল্‌বকে সাড়ে ছ’মিনিটের জন্য জ্বালিয়ে রাখতে পারল। তখন ও খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চা ছেলের মতো। ওর গবেষণা নিয়ে রনিতার সঙ্গে আবোলতাবোল অনেক কথা বলে গেল। আনন্দের ঝোঁকে ও খেয়ালই করল না, রনিতার মুখে এক থমথমে ছাপ—মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে, চোয়ালের হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সেদিন রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

রাত তখন কত হবে শুভদীপ জানে না। জিনিসপত্র ভাঙচুরের শব্দ পেয়ে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

প্রথমেই যেটা খেয়াল করল, রনিতা পাশে নেই।

তখন শুভদীপ আর দেরি করেনি। পলকে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে উঠে রওনা হয়েছে শব্দ লক্ষ করে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, শব্দগুলো ভেসে আসছে ওর ল্যাবরেটরি থেকে।

ল্যাবে গিয়ে এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখল শুভদীপ।

ঘরের বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ওলটপালট করে ভেঙেচুরে ফেলেছে রনিতা। ঘরের বুদবুদগুলো এপাশে-ওপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর অসহায় ভাঙাচোরা মেয়েটা মেঝেতে বসে হাউমাউ করে কাঁদছে।

'এসব কী হচ্ছে, রনি! কাঁদছ কেন?'

রনিতা স্বামীর কথায় ভ্রূক্ষেপই করল না, আকুল হয়ে কেঁদে চলল।

শুভদীপের কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো লাগছিল। ও অনেক করে রনিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কোনও লাভ হল না। এক প্রচণ্ড জেদ রনিতাকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। ও শুভর কোনও কথায় কান দিল না। শুধু কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে জড়ানো গলায় কীসব বলল। কথাগুলো শুভদীপ ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও দেখল ওঁর ডিজিটাল কাউন্টারের ডিসপ্লে প্যানেলে সংখ্যার মান বেড়ে যাচ্ছে।

অনেক চেষ্টার পর ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে শুভদীপ শোওয়ার ঘরে ফিরে এল। অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। তখনও ওর কানে রনিতার কান্নার গোঙানি ভেসে আসছে।

ভোরবেলা শুভদীপই রনিতার মৃতদেহ আবিষ্কার করল।

ডাইনিং হলে সিলিং পাখার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছে ও। লম্বা হয়ে থাকা নিষ্প্রাণ পায়ের নীচে ডাইনিং টেবিল উলটে পড়ে আছে। আর ডাইনিং হলে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটো শব্দের বুদবুদ। ল্যাবরেটরি থেকে কীভাবে ওরা এ-ঘরে এল কে জানে! শুভর মনে হল, এই বুদবুদজোড়া রনিতার আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী।

কয়েকটা চড়ুইপাখি ঘরের জানলায় বসে কিচিরমিচির করছিল, ওদের সঙ্গে কথা বলার আর কেউ নেই।

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সুইসাইড নোটটা দেখতে পেল শুভদীপ। ডাইনিং হলের একপাশে একটা ক্যাবিনেটের ওপরে স্টিলের গ্লাস দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল। তাতে রনিতা লিখে গেছেঃ

'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

অনেক কথা বলার ছিল—বলা হল না।'

শুভদীপ আর সইতে পারেনি। বেপরোয়া কান্নায় ভেঙে পড়েছে রনিতার পায়ের নীচে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সুইসাইড নোটের শেষ লাইনটায় রনিতা যা বলতে চেয়েছে তার মর্ম শুভদীপ ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না।

এরপর থানা-পুলিশ, পাড়া-প্রতিবেশীদের গুজব আর মন্তব্যে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। তারপর থেকে শুভদীপ একা। ওকে সবসময় ঘিরে থাকে রনিতার কথার রঙিন বুদবুদ। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি শব্দের বুদবুদ।

মাঝে-মাঝে টেপ চালিয়ে রনিতার কথা শোনে ও। মনে পড়ে, রনিতা বলেছিল, ‘আমি যখন থাকব না তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?’ আর শুভদীপ উত্তরে বলেছিল, ‘হ্যাঁ, তুমি তো জানো বিজ্ঞানীরা চলে যায় একের-পর-এক—কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।’

সবসময় এই কথাগুলোই এখন ঘুরে বেড়ায় শুভদীপের মনে। রনিতার কথা থেকে আরও অসংখ্য বুদবুদ তৈরি করতে থাকে ও। এনার্জি ট্যাপার নিয়ে কাজ করে যায় পাগলের মতো। যেন শব্দের বুদবুদ তৈরি করা ছাড়া এখন ওর নিঃসঙ্গ জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নেই।

শুভদীপ ক্রমশ মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল। তা ছাড়া ওর সবসময় মনে হতো রনিতা ওর কানের কাছে ক্রমাগত বকবক করে চলেছে। ওর বিজ্ঞানী মন বলে উঠত, ব্যাপারটা শ্রুতিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ওর মনের একটা অংশ এই সরল যুক্তি মানতে চাইত না।

রনিতাকে হারিয়ে শুভদীপ একা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও একা থাকতেই চেয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে, ও রনিতার কথার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল।

এরপর এমন একটা সময় এল যখন শুভদীপ রনিতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। ল্যাবরেটরিতে বসে রনিতার কথার টেপ চালিয়ে ওর কথার পিঠে কথা বলে যেত। কোনও-কোনও সময় একা-একাই বিড়বিড় করত আপনমনে। রনিতা যে ওর কাছে নেই সেটা ও বুঝতে পারত না।

এইরকম একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থায় ও একদিন ঘোর দুপুরে একটা শব্দের বুদবুদ সঙ্গে করে বেড়াতে গেল লেকের ধারে। প্রায় জনহীন মাঠে দুপুরের রোদে বুদবুদটাকে শূন্যে ভাসিয়ে ও তার গায়ে নানা রঙের খেলা দেখতে লাগল।

ক্রমে-ক্রমে এই দুপুরে বেড়ানোটা শুভদীপকে পেয়ে বসল নেশার মতো। বুদবুদের গায়ে রঙের খেলা দেখতে-দেখতে ও বিড়বিড় করে কথা বলত রনিতার সঙ্গে। মাঝে মাঝে ভাবত, রনিতার অসংখ্য কথা মাঠে-ঘাটে-আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিলে কেমন হয়।

‘আমি যখন থাকব না তখনও ওগুলো থেকে যাবে, তাই না?’ শুভদীপের বুকের ভেতরে রনিতা কথা বলে উঠত।

এইভাবে যখন সময় কেটে যাচ্ছে তখন একদিন শুভদীপ ঠিক করল, ঘনীভূত শব্দের বুদবুদগুলোকে দুপুরের খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে সমস্ত শব্দ-শক্তিকে এক মুহূর্তে ছড়িয়ে দেবে আকাশে-বাতাসে। তাতেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি খুশি হবে রনিতা। আর শুভদীপের অপরাধবোধও একেবারে হালকা হয়ে যাবে। এইভাবেই বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে মুক্তির পথ।

দুপুরবেলা খোলা মাঠে গাছতলায় বসে শূন্যে ভেসে থাকা দু-একটা বুদবুদের রঙিন শরীরের দিকে তাকিয়ে শুভদীপ এই মুক্তির কথা ভাবত আর রনিতার সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলত

আপনমনে।

ওর আশা ছিল শুধু একটাই, ও চলে যাবে, কিন্তু ওর বিজ্ঞান থেকে যাবে সকলের জন্য।

এখন আমি বুঝতে পেরেছি, ১১ নভেম্বর বেলা বারোটা নাগাদ কী হয়েছিল। লেকের মাঠ থেকে রনিতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে-বাতাসে। আর সেইসঙ্গে একজন ভেঙে পড়া নুয়ে পড়া আদ্যন্ত বিজ্ঞানী তরুণের ছিন্নভিন্ন দেহ ধূলিকণার মতো মিশে গিয়েছিল বাতাসে।

সেদিন দুপুরে এই ঘটনার সাক্ষীও যদি কেউ থেকে থাকে তা হলে দূর থেকে শব্দের বুদবুদগুলোকে সে নিশ্চয়ই রঙিন গ্যাস-বেলুন বলে ভেবেছে। আর গ্যাস বেলুন থেকে যে এতবড় বিস্ফোরণ হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই কেউই বিশ্বাস করেনি।

চিঠির শেষে শুভদীপ লিখেছেঃ

আমার নির্দেশ মতো এ-চিঠি তোর হাতে পৌঁছবে চরম ঘটনার বেশ কিছুদিন পর। তবে তার আগেই তুই শব্দ শুনে টের পেয়ে যাবি, আমি আর নেই। না, আমার এই ব্যাপারটাকে তুই সুইসাইড বলে ভুল বুঝিস না। এটা আমার এক্সপেরিমেন্টের একটা পার্ট। যদিও রনিতার কথা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে গেলে কী হবে তা দেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আমার গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র এই সঙ্গে পাঠালাম। এগুলো আমাদের ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর দত্তকে দিয়ে দিস।

'আমি জানি, এ চিঠি পেলে তুই দুঃখ পাবি। কিন্তু জানিসই তো, বিজ্ঞানী চলে যায়, কিন্তু বিজ্ঞান থেকে যায়।'

এটাই ছিল শুভদীপের শেষ চিঠির শেষ লাইন।



অকালের ফুল

ফুঁলকাটা পলিথিন চাদরের ওপরে শুয়ে তুতু হাত-পা ছুড়ছিল আর হাসছিল।

রাগি পায়ে চটির ফটফট শব্দ তুলে ঘরে ঢুকেছিল লাবণি। তুতুর দিকে চোখ পড়তেই মনের ভেতরে কীসব যেন হয়ে গেল। রাগের বাষ্প যেন দামাল বাতাসে এলোমেলো ফিকে হয়ে উবে গেল। অথচ একটু আগেই তো ভীষণ রেগে গিয়েছিল ও।

কথায় বলে, শাশুড়ি আর বউ ঠাঁই-ঠাঁই হলেই শান্তি থাকে। কিন্তু লাবণির যে সে উপায় নেই। খোকন—মানে, তিমির—অফিসে বেরোনোর পরই তো গোটা ফ্ল্যাটে মাত্র তিনটি প্রাণী—লাবণি, শাশুড়ি রেণুবালা আর কাজের কিশোরী মেয়ে মঞ্জু। সুতরাং দেখা-সাক্ষাৎ উঠতে বসতে হবেই, আর ঠোকাঠুকিও লাগবেই।

সর্বকাজেই রেণুবালার ডাক দেওয়া অভ্যেস। কোনও কাজ করলে বলেন, কেন করলে? আবার না করলে বলেন, করলে না কেন? এ এক বিষম জ্বালা!

বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ির সঙ্গে লাবণির লাঠালাঠি। কেন যে রেণুবালা লাবণিকে সহ্য করতে পারেন না কে জানে! অথচ তিমির ওর ভালোবেসে বিয়ের কথা মা-কে জানিয়েছিল। আশীর্বাদও পেয়েছিল। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান নিয়েও কোনও গোলমাল হয়নি। কিন্তু তার ক'দিন পর থেকেই লাবণি টের পাচ্ছিল, রেণুবালা ওকে মোটেই সুনজরে দেখছেন না। লাবণি প্রথম-প্রথম মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। অকারণ কটু কথার কোনও জবাব দেয়নি। এমনকী তিমিরের কাছেও কোনও অভিযোগ বা অনুযোগ করেনি। কিন্তু যতই ও মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছিল ততই যেন উগ্র এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন রেণুবালা।

শেষ পর্যন্ত তিমিরকে বলেছে লাবণি। প্রথমে শুধুই সংক্ষেপে ঘটনা জানানো। তারপর অনুযোগ। আর সবশেষে অভিযোগ। লাবণি বুঝতে পারছিল, রেণুবালার তোলা ঝড়গুলো ওদের সংসারের

ছিটেফোঁটা ভালোবাসার খড়কুটোগুলো নির্মম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিমির বাড়িতে থাকলেও পরিবেশ যেন পালটাচ্ছে না। লাবণিও কেমন যেন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। অল্পেতেই রেগে উঠছে। এমনকী মঞ্জুর নানান কাজে যখন-তখন খুঁত ধরছে, বকাঝকা করছে।

কথা ছিল বিয়ের ঠিক পরেই ওরা দুজনে পুরী কিংবা দীঘা বেড়াতে যাবে। কিন্তু কেমন করে যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। যেসব অজানা অচেনা সুর দেহে-মনে বাসা বেঁধেছিল সব মিলিয়ে গেল একে-একে। ছোট্ট পৃথিবীটা থমথমে হয়ে গেল লাবণির কাছে। ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তিমিরের সঙ্গে মিষ্টি সম্পর্কের সুতোটা টান পড়তে-পড়তে ছিঁড়ে গেল একসময়। কিন্তু তবুও লাবণি ছেঁড়া সুতোর মাথা দুটো হাতড়ে বেড়াতে লাগল। যদি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়, জুড়ে দেওয়া যায় নিপুণভাবে।

ঠিক এমনই একটা সঙ্কটের সময়ে তুতুর খবর পাওয়া গেল। লাবণির দেহে মোলায়েম সুষমা ফুটে উঠল। সবকিছু ভুলে গিয়ে ও খুশি হয়ে উঠল। তিমিরকে খবরটা জানাল, জানাল রেণুবালাকেও। লাবণির মনে হল, এতদিন এই একটা অপূর্ণতার জন্যই কি ও ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল নিজের ওপরে, সবার ওপরে?

তুতুর খবরটা তিমির ভালোভাবে নিলেও রেণুবালা এতটুকু পালটালেন না নিজেকে। বরং ছেলের বউকে আরও খাটুনির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে একেবারে নাজেহাল করে তুললেন। লাবণি মুখে ঘামের ফোঁটা নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করে কাজ করে। আগের মতো শাশুড়ির সব কথার পিঠে আর জবাব দেয় না। শুধু তুতুর কথা ভেবেই নিজেকে অন্যরকম করে রাখার চেষ্টা করে। আর ব্যাপার-স্যাপার যখন ভীষণরকম খারাপের দিকে চলে যায়, লাবণির সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন আঁচলে হাত মুছে সোজা তেতলার ছাদে চলে যায় ও।

ছাদে টবে বসানো দশ-বারোটা ফুল গাছ আছে। তাতে বেল, গোলাপ, নয়নতারা, জুঁই, লিলি ফুটে থাকে, গন্ধ ছড়ায়। ছাদে গেলে লাবণি ফুল গাছ দ্যাখে, আশপাশের বাড়ির ছাদে শুকোতে দেওয়া শাড়ি জামাকাপড় দ্যাখে, আর দ্যাখে কাক-পায়রা-চিল-চড়ুই।

রাতের বেলায় এই ছবিটা পালটে যায়। তখন দেখা যায় শুধুই চাঁদ আর ফুটফুটে তারা। আর একইসঙ্গে পাওয়া যায় ফুলের গন্ধ। লাবণির খুব ভালো লাগে।

বছরতিনেক আগের কথা। তুতু তখনও আসেনি। একদিন সন্ধেবেলা, লাবণির মনে আছে, ফুলগাছ নিয়ে কী একটা কথা হচ্ছিল রেণুবালার সঙ্গে। লাবণিদের বাড়ির সদরে একটা মাধবীলতা গাছ আছে। বহু বছরের গাছ হলেও তাতে কখনও কোনও ফুল আসেনি। রেণুবালা কথার পিঠে ফস করে বলে উঠেছিলেন, আমাদের বাড়িতে যত ফুল-না-ফোটা গাছের কারবার। খোকনটা গাছ চেনে না। গাছকানা।

শুনে লাবণির গা জ্বালা করে উঠেছিল। রেণুবালার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল সেটা বুঝতে ওর কষ্ট হয়নি। বিয়ের পর তিনটে বছর কেটে গেলেও লাবণির সন্তান হয়নি। প্রথম-প্রথম ওরা সন্তান চায়নি। আর পরে যখন চেয়েছে তখন পায়নি। দু-একজন ডাক্তার দেখানোর পর আরও হতাশ হয়ে পড়েছিল লাবণি। ও লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনমনে একা-একা কাঁদত। তিমির কখনও ওকে সান্ত্বনা দিত, কিন্তু এক-এক সময় তিমিরের অসন্তোষটাও চাপা থাকত না।

এইসব দুঃখের মুহূর্তে ছোট্ট ছাদটাকে খুব প্রিয় মনে হতো লাবণির। গাছের পাতা, ফুলের ঘ্রাণ, রাতের আকাশ, উড়নচণ্ডী বাতাস ওকে টানত। ভগবানের চেয়েও আপন ছিল এই অ-মানুষগুলো। কখনও-কখনও ওদের সঙ্গে কথাও বলত লাবণি। ওর মনে হতো, ওরা যেন উত্তর দিচ্ছে ওর কথায়। ওর দুঃখের দিনে ওরাই একমাত্র বন্ধু।

এরকমই এক দুঃখের রাতে ছাদে চলে গিয়েছিল লাবণি। রেণুবালার হিংস্র আক্রমণ ওকে সারাটা দিন ধরে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। আর তিমিরও অফিস থেকে ফিরে কী যেন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে কয়েকটা অভদ্র মন্তব্য করেছিল। লাবণি সারাদিন যতটা পেরেছে শাশুড়ির আক্রমণ ঠেকিয়েছে। নিজেও পালটা আক্রমণ করতে ছাড়েনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর সামনে ওকে 'বাঁজা' বলে খোঁটা দেওয়ায় ওর কান্না পেয়ে গিয়েছিল। তারপর সন্ধেবেলা, তিমির বাড়ি ফেরার পর, আবার একই ধরনের আঘাত। লাবণি কোনও প্রতি-আঘাত করেনি। ওর কান্না বুকে চেপে মুখ বুজে থেকেছে। রান্না করা, তিমিরকে খেতে দেওয়া, এইসব কর্তব্য পালন করে গেছে।

তারপর রাত গাঢ় হলে, তিমির অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে, ও ছাদে চলে গিয়েছিল। রাতের আকাশ ওর দুখী মনটাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। তারাগুলো মিটমিট করছিল, চোখের পাতা ফেলছিল বারবার।

লাবণির নাকে ফুলের ফুরফুরে গন্ধ আসছিল। ও মাথা তুলে আকাশের তারা দেখছিল। তারাদের ও নামে চেনে না। তবে দু-একটা নাম যা শুনেছে সেগুলো ওর ভালো লাগে। শ্রবণা, শতভিষা, অরুন্ধতী, মৃগশিরা। লাবণি আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল যেন। ওর চোখে-মুখে-গায়ে তারার আলো এসে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল আকাশের মনোরম আলো ওকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

লাবণি হঠাৎই ছাদে শুয়ে পড়েছিল চিত হয়ে। কত দূরে আছে ওরা? আকাশের মতো বিশাল মনের মাঝে ভালোবাসার কুচিকুচি হিরের টুকরো।

এমনসময় একটা ছুটন্ত তারা দেখতে পেল লাবণি। আকাশের সেই শীর্ষ থেকে সাবলীল ভঙ্গিমায় বাতাসে সাঁতার কেটে যেন নেমে আসতে চাইছে ওর কাছে। কবিতার মতো ছন্দ তৈরি করে ছুটে আসছে এক আলোর হরিণ।

লাবণির মন থেকে সমস্ত দুঃখ কান্না মুছে গেল। ওর ঠোঁট কাপছিল। চোখের পালক কাঁপছিল। ওর চোখ বুজে গেল এক আদুরে আবেশে। কিন্তু তখনও ও যেন দেখতে পাচ্ছিল সেই খসে পড়া তারাটা ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। আর অনুভব করতে পারছিল, অসংখ্য নক্ষত্রের মিষ্টি আলোয় ওর শরীর স্নান করছে...স্নান করছে...।

লাবণি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন নিজেকে ছাদে শোওয়া অবস্থায় আবিষ্কার করে কিছুটা অবাকই হল ও। এখানে ও কখন এল? কেমন করে এল?

একটু পরেই ওর সবকিছু মনে পড়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোনো দুঃখগুলোকে ও যেন আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

লাবণি ছাদ থেকে নেমে এল। শরীর ভারী লাগছে। কেমন এক অদ্ভুত অবসাদ ওকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। পায়ে-পায়ে সিঁড়ি নেমে এসে ও মুখে-মাথায়-ঘাড়ে জলের ছিটে দিল। তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘুমন্ত তিমিরের পাশে। ও তিমিরের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

ওই সুন্দর রাতটা বড় বেশি করে মনে আছে লাবণির।

তারপর থেকে রাতের আকাশ, রাতের তারা, ওকে আরও বেশি করে টানে। এই আশ্চর্য টান ধীরে-ধীরে গড়িয়ে গেল মারাত্মক নেশায়। এ নিয়ে রেণুবালা অথবা তিমিরের কাছ থেকে মাঝে-মাঝেই কথা শুনতে হয়েছে লাবণিকে। কিন্তু সে-কথার জবাব দেওয়ার কোনও সাধ জাগেনি ওর। লাবণির নিজেরই কেমন অবাক লেগেছে। ও কি পালটে যাচ্ছে ক্রমশ?

লাবণি প্রায়ই ওই সুন্দর রাতটার কথা ভাবত। একদিন ও যখন মনে-মনে ওই খসে পড়া তারাটার ছবি দেখছিল তখন হঠাৎই তুতুর খবর যেন টের পেল ও। গত কয়েকটা দিন ওর আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেটেছে। তারপর সেদিন নিশ্চিত ইশারাটা পাওয়ামাত্রই লাবণি খুকি হয়ে গিয়েছিল। ওর ইচ্ছে করছিল ছুটোছুটি করে, বারান্দায় যায়, এটা ভাঙে, সেটা ছোড়ে।

প্রথমে খবরটা ও জানিয়েছিল তিমিরকে, তারপর রেণুবালাকে।

তুতুর জন্মের ঠিক আগে, জন্মের সময়, অথবা জন্মের পরে লাবণি কোনও কষ্ট পায়নি। যে-প্রসব বেদনা জন্মের আসন্ন মুহূর্ত জানিয়ে দেয়, লাবণির বেলার তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। শুধু ওর মন যেন বলে উঠেছিল, সময় হয়ে গেছে।

তুতুর জন্ম অনেককেই অবাক করে দিয়েছিল। আর ওর সৌন্দর্য মুগ্ধ করে দিয়েছিল সকলকেই।

তুতু যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল ঘটনাগুলো ততই নজর কাড়ল লাবণির।

তুতুকে দেখলে অকারণেই মন ভালো হয়ে যায়। বুকের গভীরে খুশির ফুল ফুটে যায় পলকে। এমনটা হয় শুধু কি লাবণির! তিমির আর রেণুবালারও যেন একই অবস্থা। তুতুর দিকে চোখ পড়লে, কি ওকে কোলে নিলেই ওরা হয়ে যায় অন্য জগতের মানুষ।

এইভাবে, লাবণি লক্ষ করছিল, সংসারের ছোট-বড় অশান্তিগুলো যেন ক্রমশ কমে আসছে। মনের মধ্যে ফুঁসে ওঠা রাগের বাষ্প সবসময় কেমন অলৌকিকভাবে যেন ফিকে হয়ে যায়। যেমন, এই মুহূর্তে।

লাবণি বিছানার কাছে এগিয়ে এসে তুতুকে আদর করে কোলে তুলে নিল। চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিল ওর সুন্দর মুখ।

তুতু, সোনামণি আমার। আমার সোনা ছেলে!

তুতু ওর সুন্দর হাত-পা এলোমেলোভাবে নাড়তে লাগল। মিষ্টি স্বরে দুর্বোধ্য সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল।

এমনসময় পা দাপিয়ে রেণুবালা ঘরে এসে ঢুকলেন। রুক্ষ গলায় বলতে শুরু করেছিলেন, লাবণি, তোমাকে আমি—। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গলার স্বর ও সুর পালটে গেল রেণুবালার। বললেন, তুতুর খাওয়া হয়েছে, লাবণি?

লাবণি বলল, এইবারে দেব।

তারপর শুরু হল ঠাকুমা আর নাতির খেলা। আর তারই ফাঁকে তুতুকে দুধ খাওয়াতে লাগল লাবণি।

এইভাবে সংসারের ছবিটা ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছিল। আগে মন খারাপ হলে লাবণি একা ছাদে যেত। এখন তুতুকে কোলে নিয়ে ও প্রায়ই সেখানে যায়। অবাক হয়ে ও লক্ষ করেছে, ওইটুকু বাচ্চারও যেন তারার নেশা লেগেছে। অন্ধকার আকাশের উজ্জ্বল টিপগুলোর দিকে চকচকে চোখে তাকিয়ে দ্যাখে ও। অর্থহীন শব্দ তোলে মুখে। আর হাত নাড়ে। লাবণি মুগ্ধ চোখে ওর শিশুকে দ্যাখে। এক অদ্ভুত ভালোলাগা ওর বুকের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, থিতু হয়ে বাসা বাঁধে।

তিমিরের মধ্যেও যে পালটে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে সেটাও লাবণি ক্রমশ টের পাচ্ছিল। আগে অফিস থেকে ফেরার পর তিমিরের মেজাজ চড়া সুরে বাঁধা থাকত। কিন্তু এখন সেই সুর গভীর খাদে নেমে এসেছে। তিমির এখন বেশি কথা বলে। অকারণ বকবক করে লাবণির সঙ্গে, তুতুর সঙ্গে।

এইরকমই এক সন্ধেবেলা এক অবাক করা ঘটনা ঘটে গেল।

তিমিরের কাছে একটা রুবিক কিউব ছিল। অনেকগুলো চৌকোনা ছোট বাক্সের বিভিন্ন পিঠে বিভিন্ন রং। সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে তৈরি হয়েছে রুবিক কিউব। তার ছ’পিঠের ছ’টা রং মেলানো খুব কঠিন—অন্তত তিমিরের কাছে। সেদিন সন্ধেবেলা রং-এলোমেলো হওয়া কিউবটা নিয়ে তিমির নানান কসরত করে রং মেলানোর চেষ্টা করছিল, আর একইসঙ্গে তুতুর সঙ্গে গল্প করছিল। তুতু

ওর ওয়াকারে বসে ছিল। হঠাৎই ও হাত বাড়িয়ে দিল বাবার দিকে। রঙচঙে রুবিক কিউবটা আঁকড়ে ধরতে চাইল ওর কোমল হাতে। তিমির ওকে কিউবটা দিয়ে বলল, দ্যাখ তো, তুই পারিস কি না। আমি তো এতদিন ধরে চেষ্টা করে-করে নাজেহাল হয়ে গেছি।

তুতু কিউবটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। একটু পরেই ওটা ও আবার ফিরিয়ে দিল বাবার দিকে। আর তখনই তিমির চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল।

রুবিক কিউবের ছ'পিঠের রং সুন্দরভাবে মিলে গেছে!

তিমির ওর চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও লাবণিকে কিউবটা দেখিয়ে বলল, ওইটুকু বাচ্চা কীভাবে রুবিক কিউব সল্ভ করে দিল!

লাবণি অবাক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঘটনাটা ওর মন মেনে নিতে চাইছিল না। ও কিছুটা যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। হোঁচট খাওয়া গলায় ও বলল, আমার মনে হয় তুমি যখন চেষ্টা করেছিলে তখনই কোনওভাবে ওটার রং মিলে গেছে। তারপর তুমি খেয়াল না করে তুতুর হাতে ওটা দিয়েছ—।

তিমির লাবণির কথায় কর্ণপাত করল না। রুবিক কিউবটা একপাশে রেখে দু-হাতে ছেলেকে তুলে নিল কোলে। তারপর পাগলের মতো আদর করতে লাগল তুতুকে।

লাবণি চুপ করে তুতুকে দেখছিল। ওর বুকের ভেতরে এক অলৌকিক বাজনা বাজতে শুরু করেছিল।

এখনও সেই বাজনাটা অনুভব করল লাবণি।

শুধু কি বাজনা! মানুষগুলোর বুকের ভেতরে একশোটা করে টিউব লাইট জ্বলিয়ে দিয়েছে শিশুটা। তুতুকে দুধ খাওয়াতে-খাওয়াতে ওর পুরোনো আর নতুন, দুটো জীবনের কথা ভাবছিল লাবণি। ওর ভালো লাগছিল।

পরদিন ভোরবেলা লাবণির ঘুম ভাঙল শাশুড়ির চিৎকারে।

লাবণি, লাবণি,—ওঠো, দেখে যাও শিগগির। লাবণি—।

চিৎকারের মধ্যে খুশির ভাবটা চাপা ছিল না রেণুবালার। বেশবাস ঠিক করে দরজা খুলতেই রেণুবালা লাবণিকে প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন দোতলার বারান্দায়। ঝুঁকে পড়লেন রেলিঙের কোণে। তারপর আঙুল তুলে মাধবীলতা গাছটা দেখিয়ে বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো—কী আশ্চর্য ব্যাপার—।

লাবণি দেখল। মনটা সত্যিই খুশিতে ভরে গেল ওর। যে-মাধবীলতা গাছটায় গত দশ বছরে শত চেষ্টাতেও কোনও ফুল ফোটেনি, আজ সেই বন্ধ্যা তরুলতা নিজেকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে বসে আছে। তার সারা অঙ্গে সাদা আর গোলাপি রঙের বেনারসি জড়ানো।

লাবণি বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল। ওর মনে পড়ল, কাল বিকেলে তুতুকে কোলে নিয়ে ও বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পাশেই ছিল মাধবীলতার সবুজ পাতার দল। তুতু ওর কোল থেকেই নানা দিকে হাত বাড়াচ্ছিল আর বিচিত্র অর্থহীন সব আদুরে শব্দ করছিল। তখন লাবণির কী মনে হয়েছিল, ও হঠাৎ বলেছিল, তুই তো আমাদের সবাইকে ভালো করে দিলি। এই গাছটাকেও ভালো করে দে তো দেখি—দশবছর ধরে গাছটার অসুখ...।

আর তার পরই কখন যেন গাছটার পাতা খামচে ধরেছিল তুতু। ওটার সরু-সরু ডালপালা বারবার আঁকড়ে ধরছিল। নানান শব্দ করছিল মুখে।

তারপর আজ—আজ এরকম একটা অপরূপ দৃশ্য!

রেণুবালাকে তুতুর কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না লাবণি। কে জানে এ ওর কল্পনা কি না। ও শুনেছে, অনেক সময় অনেক গাছ বহু বছর রুগ্ন থাকার পরে হঠাৎ করে নিজে থেকেই সেরে ওঠে। এই মাধবীলতা গাছটার বেলায় হয়তো সেরকমই কিছু হয়েছে। কে জানে!

কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের ঘরে তুতুর কাছে ছুটে গেল লাবণি। ঘুমন্ত তুতুকে চুমু খেল দু-গালে। তারপর কী ভেবে ওর পাশে শোওয়া তিমিরের কপালেও একটা চুমু এঁকে দিল। তিমিরের ঘুম ভেঙে গেল সঙ্গে-সঙ্গেই। ও জড়ানো গলায় বলল, কী ব্যাপার?

লাবণি হেসে বলল, আজ মাধবীলতার বিয়ে। তোমাকে অফিস যেতে হবে না।—বলেই আবার হেসে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তিমির অবাক চোখে বউয়ের চলে যাওয়া দেখল।

এইভাবে খুশি ও সুখের চাদরগুলো যখন অশরীরী কেউ ওদের সামনে একে-একে মেলে দিচ্ছে তখন হঠাৎ করেই তুতুর অসুখ করল।

এমনিতে যে-কোনও দেড় বছরের শিশুর অসুখ করতেই পারে। কিন্তু যে সকলের অসুখ সারায় তার অসুখ হওয়াটা লাবণি সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। ও কেমন পাগলের মতো হয়ে উঠল।

তুতুর জন্য ডাক্তার-ওষুধ ইত্যাদি চলছিল। কিন্তু রোগটা যে ঠিক কী তা ডাক্তারবাবু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিমিরও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা-কে দেখে, স্ত্রীকে দেখে ও ভেতরে-ভেতরে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

তুতুর সুন্দর মুখটা দিনের-পর-দিন মলিন, মলিনতর হয়ে যাচ্ছে। ওর হাসিখুশি ভাব, হাত-পা ছোড়া, সবটাই হয়ে উঠছে স্তিমিত। তিমিরের চোখের সামনে অনেকগুলো সূর্য ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছিল। ওদের সকলের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছিল একইসঙ্গে। আর দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলতে চাইছিল।

বহুদিন চোখের জল নিয়ে ছাদে যায়নি লাবণি। কিন্তু তুতুর অসুখ ওকে দিশেহারা করে দিল। ডাক্তার বদল ওষুধ বদল করেও অবস্থার কোনও উন্নতি ওর চোখে পড়ছিল না। এইরকমই এক অসহায় শোকের রাতে লাবণি ছাদে গেল। আকাশের তারাদের দিকে তাকাল। শ্রবণা, শতভিষা, অরুন্ধতী, মৃগশিরা। লাবণির বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল। আগেও কষ্ট হতো, কিন্তু আজকের কষ্ট অন্যরকম।

ও গত আঠেরোটা মাসের কথা ভাবছিল। সুমধুর আঠেরোটা মাস। এই দিনগুলোর প্রতিটি পল-অনুপল ওকে ঠেলতে-ঠেলতে ক্রমে-ক্রমে নিমজ্জিত করেছে রূপকথার সুখী সরোবরে। এখন অসুখের তাপে সেই সরোবরের প্রতিটি বিন্দু কি বাষ্প হয়ে যাবে? একে-একে নিভে যাবে ওদের বুকের ভিতরের টিউব লাইটগুলো? লাবণি যেন কল্পনায় দেখছিল, তিমিরের রুবিক কিউবটা আবার এলেমেলো জটিল হয়ে যাচ্ছে। মাধবীলতা গাছটা আবার বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। আর ওর বুকের ভেতরে সাদা আলোগুলো একে-একে নিভে গিয়ে জ্বলে উঠেছে পনেরো ওয়াটের এক মলিন নির্জীব বাতি। সেই আলোয় চোখে পড়ছে কতকগুলো পলেস্তারা খসা প্রাচীন দেওয়াল। দেওয়ালগুলোয় কোনও জানলা নেই। বাতাস বইতে পারে না, রোদ ঢোকে না, তারার আলো ফোটে না সেই ঘরে। শুধু অন্ধকার কতকগুলো ছায়া সেখানে বাস করে। পরস্পরকে ঘেন্না করে, ঈর্ষা করে, কষ্ট দিয়ে তারা বেঁচে থাকে—অথবা মরে থাকে।

লাবণি জোরে শ্বাস নিল। সেই উল্কাটা যেন কবে খসে পড়েছিল আকাশ থেকে? সেই অদ্ভুত রাতের তারাময় আকাশে কোন এক জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল এক অণুকণা চোখ টেনেছিল লাবণির। আর তার পরই তুতু এল। লাবণির চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছিল। রাতের বাতাসে ওর শীত করছিল। টবে বসানো গাছের পাতাগুলো নড়ছিল। ওরা যেন মাথা ঝাঁকাচ্ছে বারবার।

লাবণি তারাদের কাছে তুতুর জীবন প্রার্থনা করছিল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে যে-পবিত্র শিশু ওর কোলে জন্ম নিয়েছিল সে ওর একার নয়—সে এসেছিল সকলের ভালো করতে। পৃথিবীর দূষিত পরিবেশ ওর নিশ্বাসে কি একটু-একটু করে নিষ্কলুষ হয়ে উঠতে পারত না?

রাতের তারাদের দিকে তাকিয়ে লাবণির নীরব অনুনয় যখন ক্রমশ নীরব হাহাকার হয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই নীচে থেকে কান্নার তীব্র চিৎকার ওর কানে এল।

পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের কোনও একটি গ্রহে স্বচ্ছ স্ফটিকের চার দেওয়ালের মাঝে মৃদু গুঞ্জন তুলে কাজ করছিল একটি যন্ত্র। যেমনই বিচিত্র তেমনিই অতিকায় তার আকার। যন্ত্রটির মস্তিষ্ক জটিল কোনও অঙ্ক নিয়ে মগ্ন ছিল। মহাবিশ্বের যাবতীয় বাসযোগ্য গ্রহ এবং তাদের অধিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করছে যন্ত্রটি। তার একমাত্র লক্ষ্য, যে-কোনওরকম সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান খুঁজে বের করা। এই মুহূর্তে যে-গ্রহটি নিয়ে সে গবেষণা করছে তাকে সেখানকার

অধিবাসীরা ‘পৃথিবী’ নামে ডাকে। সেই পৃথিবীবাসীদের সমাজ-জীবন সংক্রান্ত নানান সমস্যার সমাধান করতে সে দূর-নিয়ন্ত্রিত একটি অণুজীবের সৃষ্টি করেছিল। ভ্রূণাবস্থা থেকে শুরু করে আঠেরো মাস ধরে সেই অণুজীবটি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে, বহু পরীক্ষা চালিয়েছে। সেইসব তথ্য ও পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই নতুন অঙ্ক করছিল যন্ত্রটি। খুঁজে বের করছিল আরও নতুন-নতুন সমস্যা সমাধানের পথ। আপাতত সে দূর-নিয়ন্ত্রিত অণুজীবটিকে ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের কাছে। তবে সময় হলে আবার সে পাঠাবে তাকে। একবার...দুবার...বারবার। যে-করে হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধানগুলো তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সেটাই তার একমাত্র লক্ষ্য।



সুখের সংসার ডট কম

ভোরের আলো ফুটেছিল অনেক আগেই, কিন্তু সেটা দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠতে চাননি লাবণ্য। কেমন একটা আলসেমি ওঁকে জড়িয়ে ধরেছিল আজ। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন—তার জন্য একটা ঝিমুনিভাব থাকেই, কিন্তু গত রাতে কয়েকটা স্বপ্ন কেমন একটা বাড়তি ঘুমের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। স্বপ্নের গল্পগুলো মনে নেই, তবে তাতে প্রমথনাথকে যে দেখেছেন, সেটা মনে আছে।

স্বামী প্রমথনাথ চলে গেছেন প্রায় আটবছর। একটা অভাব তার জন্য থাকবেই —সেটা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু অন্য আরও যেসব অভাবের গল্প নানানজনের কাছে শোনেন...।

'মা, উঠে পড়ুন...অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

ঘরে ঢুকে পড়েছে মধুমিতা—এ-বাড়ির একমাত্র বউ। মিষ্টি মুখ, স্বভাবও। রোগা তরতরে চেহারা। সবসময় এ-কাজ সে-কাজ নিয়ে ছটফট করছে। এখন পুবের জানলাদুটোর পরদা সরিয়ে দিল। তারপর খুলে দিল পুবের ঝুলবারান্দার দরজা।

সঙ্গে-সঙ্গে কত কী যে ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে! পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, হুটোপুটি রোদ্দুর। প্রমথনাথের এগুলো খুব প্রিয় ছিল। বড় শখ করে পুবের এই বারান্দা তৈরি করেছিলেন। সূর্য উঠলে প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়বে বারান্দায়, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তবের মন্ত্র আওড়াবেন প্রমথনাথ।

তিনবছর চুটিয়ে শখ মিটিয়েছিলেন। তারপর চলে গেলেন। এখন লাবণ্যর এই ঘরের মার্বেল পাথরের মেঝে থেকে আলো ঠিকরে পড়ে দেওয়ালে। সেখানে টাঙানো আছে প্রমথনাথের রঙিন ফোটো। এভাবেই ভোরের আলোর শখ মিটছে মানুষটার। হয়তো মনে-মনে আওড়াচ্ছেন সূর্যস্তবের মন্ত্র। কে জানে!

'মুখটা ধুয়ে নিন, মা, আমি চা করে নিয়ে আসছি—।'

'শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।' লাবণ্য জড়ানো গলায় বললেন। ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন বিছানায়।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ছুটে কাছে চলে এল মধুমিতা। লাবণ্যর কপালে-গালে হাত রাখল 'কই, জ্বর তো নেই! ঠিক আছে, ডক্টর মুখার্জিকে একবার কল করে দিচ্ছি। ওকে বলছি—।'

মধুমিতার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল দীপ্তিমান। চুল উসকোখুসকো, পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। ফরসা চেহারা, ভারী গাল, গেঞ্জির গলার বৃত্তচাপের ওপর দিয়ে লোমশ বুক উঁকি মারছে।

ঘরে ঢুকেই সটান মায়ের কাছে চলে এল দীপ্তিমান। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মা-কে। তারপর বিছানায় বসে পড়ল।

দীপ্তিমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন লাবণ্য, বললেন, 'তোর যে কী এক ছেলেমানুষি স্বভাব। রোজ-রোজ প্রণাম করার কী আছে!'

দীপ্তিমান হেসে বলল, 'ও তুমি বুঝবে না, মাদার। সকালবেলা তোমাকে প্রণাম করে আমি সারাদিনের কাজের এনার্জি পাই।'

মধুমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে মা-ছেলের কথা শুনছিল। চট করে লাবণ্যকে প্রণাম করে ফেলল ও।

লাবণ্য বললেন, 'দ্যাখ তো, দিপু, তুই প্রণাম করিস বলে বউমাকেও প্রণাম করতে হয়! তোরা এখনও সেকেলে রয়ে গেলি!'

'কী যে বলো, মা। তোমার পা না ছুঁয়েই কি আধুনিক হওয়া যায়! আধুনিক হওয়া কী এতই সহজ ব্যাপার!'

মধুমিতা দীপ্তিমানকে বলল, 'অ্যাই, ডক্টর মুখার্জিকে একবার কল করে দাও—মায়ের শরীরটা ভালো নেই।'

'সে কী!' প্রায় আঁতকে উঠল দীপ্তিমান। লাবণ্যর কপালে হাত দিয়ে উষ্ণতা আঁচ করতে চাইল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'আমি এক্ষুনি ডক্টর মুখার্জিকে রিং করছি। উনি কলে বেরোনোর আগে আমাদের এখানে হয়ে যাবেন। তুমি আয়া-মাসিকে বোলো সবসময় মায়ের কাছে-কাছে থাকতে।'

লাবণ্যর ঘর ছেড়ে ড্রইং-ডাইনিং-এ গেল দীপ্তিমান। টেলিফোনটা সে-ঘরে একটা কর্নার টেবিলে রাখা আছে।

রিসিভার তুলে নম্বরের বোতাম টিপতে-টিপতে ও চেঁচিয়ে মধুমিতাকে বলল, 'আজ আমি একটু আর্লি অফিসে বেরোব—অ্যাবাউট সাড়ে আটটায়। আর বাবুনকে ঘুম থেকে তুলে দাও। নইলে ওর স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

মধুমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে ছুটল। চায়ের জল বসিয়ে বাবুনকে চটপট ডেকে তুলতে হবে।

আয়া-মাসি সারদা টয়লেটে গেছে। ও লাবণ্যর সবসময়ের সঙ্গী। অল্পবয়েসে স্বামী হারিয়েছে। গরিব হলেও চেহারায় একটা আভিজাত্যের প্রলেপ রয়েছে। ভীষণ কম কথা বলে। আর সেইজন্যই লাবণ্যর ওকে বেশি ভালো লাগে। লাবণ্যর যে-কোনও প্রয়োজন সারদা যেন টেলিপ্যাথিতে টের পায়। ওকে ছাড়া লাবণ্য বেশ অসহায় বোধ করতেন।

মধুমিতা চা দিয়ে গেল লাবণ্যকে। বলল, 'মা, চুমুক দিয়ে দেখুন তো ঠিক আছে কি না—।'

লাবণ্য শব্দ করে চুমুক দিলেন। তৃপ্তির একটুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বোঝাই যায় না চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়ে তৈরি। 'ইকোয়াল' না কী নাম যেন। প্রথম-প্রথম বিস্বাদ লাগত—ডাক্তারের কথা মানতে ইচ্ছে করত না। এখন সয়ে গেছে।

চা খাওয়ার সময় প্রথমনাথকে মনে পড়ে। পুবের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে দুজনে চা খেতেন। চুমুকে শব্দ হলেই প্রমথনাথ বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'কী যে বিশ্রী শব্দ করে চা খাও! চা খাবে, কোনও শব্দ হবে না—এটা এটিকেট।'

লাবণ্য হাসতেন। বলতেন, 'যতই এটিকেট হোক, চায়ে চুমুকের শব্দটাই হচ্ছে আসল! ও না হলে আমেজ আসে! শব্দ না করে চা খাওয়া মানে মনে-মনে চা খাওয়া।'

স্মৃতিবিধুর হাসি লাবণ্যর ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। মধুমিতাকে বললেন, 'চা-টা দারুণ হয়েছে।'

মধুমিতা বলল, 'সেটা আপনার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। আমি যাই—বাবুনকে রেডি করি গিয়ে। পরে এসে জেনে যাচ্ছি আজ আপনার কী-কী রান্না খেতে ইচ্ছে করছে।'

মধুমিতা প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

লাবণ্য ওর চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে ভাবলেন, বউমা তো নয়, মেয়ের চেয়েও বেশি! সারাদিন শুধু মা আর মা!

সারদা ঘরে এল। বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারটাকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে দিল। লাবণ্য রোজ এই চেয়ারে বসে চা খাওয়া শেষ করেন। সেই ফাঁকে সারদা বিছানাটা তুলে পরিপাটি করে দেয়।

লাবণ্য ইজিচেয়ারে বসে চা খাওয়া শুরু করতেই দীপ্তিমান মায়ের কাছে এল।

'মা, ডক্টর মুখার্জি ঠিক সাড়ে ন'টায় আসবেন। আমি তো অফিসে বেরিয়ে যাব—মিতা থাকবে। তোমার কী-কী কষ্ট হচ্ছে ডক্টর মুখার্জিকে ফ্র্যাঙ্কলি বলবে। আমি দশটা নাগাদ অফিস থেকে ফোন করে খবর নেব।'

পাকানো লাঠির মতো খবরের কাগজটা বারান্দায় ছিটকে এসে পড়ল।

দীপ্তিমান ওটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে লাবণ্যর হাতে দিল।

লাবণ্য বললেন, 'তুই আগে চোখ বুলিয়ে নে না—অফিসে বেরোবি...।'

'না, তুমি আগে পড়ো। আমি পরে সময় পেলে দেখব।'

লাবণ্য এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলেন। প্রমথনাথ চলে যাওয়ার পরেও দিপু বা মধুমিতা লাবণ্যর সিংহাসনে এতটুকু চিড় ধরতে দেয়নি।

দীপ্তিমান চলে যাওয়ার সময় সারদাকে বলল, 'মাসি, আপনি মায়ের কাছে-কাছে থাকবেন। ছেড়ে এদিক-ওদিক যাবেন না। শুনলেন তো, মায়ের শরীরটা ভালো নেই।'

সারদা ঘাড় নাড়ল।

লাবণ্য আলতো করে বললেন, 'না, না—সেরকম সিরিয়াস কিছু নয়।'

দীপ্তিমান বলল, 'সিরিয়াস কি না সেটা ডাক্তারবাবু বুঝবেন। কোনও শরীর খারাপকেই হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়।'

দীপ্তিমান চলে গেলে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল লাবণ্যর ঠোঁটে। এই বয়েসে এরকম সুখী জীবনের কথাই কল্পনা করে সবাই—তবে কেউ পায় কি না কে জানে! লাবণ্য পেয়েছেন। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, মেয়ে, জামাই, নাতনি—সব্বাই যেন লাবণ্যকে ঘিরে রয়েছে—সূর্যকে ঘিরে পাক খাওয়া গ্রহের মতো। সূর্যকে টুক করে সরিয়ে নিতে যদি কেউ পারে, তা হলে গ্রহগুলো সেই মুহূর্তে ওদের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ছত্রখান হয়ে যাবে। সেইজন্যই ওদের কাছে সূর্যের এত কদর।

লাবণ্যও কি অনেকটা সেইরকম?

মনে-মনে ভগবানকে প্রণাম করলেন লাবণ্য। এ অপরূপ সুখ তাঁরই দান।

একটু পরে চা খাওয়া শেষ হল, খবরের কাগজ পড়াও।

সারদা ঘরে গিয়ে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা নিয়ে এল। ও জানে, লাবণ্য এখন রোজকার মতো এফ. এম. চ্যানেল শুনবেন। বাইরের রাস্তা দেখবেন, দেখবেন গাছের পাতা, ফুল, পাখি। আর একইসঙ্গে বোধহয় পুরোনো কথাও ভাববেন।

একটু পরে দীপ্তিমান বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে বেরোবে। অফিসে যাওয়ার পথে ওর গাড়ি বাবুনকে স্কুলে নামিয়ে দেবে। আর দুপুরে ছুটির সময় মধুমিতা গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে।

সকালে এই সময়টা স্মৃতিচারণ করতে বেশ ভালো লাগে লাবণ্যর। বিয়ের পরপর হঠাৎই প্রমথনাথের চাকরি চলে গিয়েছিল। লোকসান দিয়ে-দিয়ে কোম্পানি ডকে উঠেছিল। তারপর কী কষ্ট, কী কষ্ট! প্রমথনাথ বললেন, আর চাকরি করবেন না—ব্যাবসা করবেন।

কম করেও বারোটা বছর চলল লড়াই আর লড়াই। দীপ্তিমান আর অনুরিতা বড় হয়ে উঠতে লাগল। দুঃখ-কষ্ট কেটে গিয়ে সচ্ছলতা ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়তে শুরু করল সংসারে। ঠাকুরকে

দিনরাত কত ডেকেছেন লাবণ্য! লুকিয়ে-লুকিয়ে কত চোখের জল ফেলেছেন!

আজ আর-একবার মনে হল, সেগুলো বৃথা যায়নি। লাবণ্যর জীবন-পাত্র থেকে মাধুরী সত্যিই যেন উথলে পড়ছে।

দীপ্তিমান আর বাবুন কখন এসেছে লাবণ্য টের পাননি। সারদার হঠাৎ ঘোমটা টানা থেকে ব্যাপারটা আঁচ করতে-না-করতেই বাবুন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। লাবণ্যর দু-গালে টপ-টপ করে চুমু খেয়ে বলল, 'দিদুন, টা-টা...স্কুলে যাচ্ছি। রাতে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট হলে তোমার কাছে গোস্ট স্টোরি শুনব, ও. কে.?'

ওকে চুমু খেয়ে লাবণ্য ইংরেজি ঢঙে বলতে চেষ্টা করলেন, 'ও. কে.।'

ঠিক দীপ্তিমানের মতোই সুন্দর আর দুরন্ত হয়েছে ছেলেটা।

দীপ্তিমান বলল, 'মা, অফিসে বেরোলাম। ডক্টর মুখার্জি ঠিক সাড়ে ন'টায় আসবেন।'

লাবণ্য হেসে তাকালেন ছেলের দিকে। সবসময় সবদিকে এত খেয়াল! ঠিক বাবার স্বভাব পেয়েছে।

ওরা চলে যেতেই লাবণ্য উঠে পড়লেন। এখন হাত-মুখ ধোওয়া, বাথরুম ইত্যাদি সেরে নেবেন। তারপর জলখাবার। বাবুন এই শব্দটা শুনলেই বলে, 'দিদুন, তুমি একটা হোপলেস—ব্রেকফাস্ট বলতে পারো না!'

মধুমিতা ছেলেকে ডাক দেয় সঙ্গে-সঙ্গেঃ 'বড়দের সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে! তা ছাড়া জলখাবার বলো আর ব্রেকফাস্ট বলো, খাবারটা তো একই থাকবে!'

বাবুন বলে, 'সরি, দিদুন...।'

মনে-মনে হাসলেন লাবণ্য। সুখের যে কতরকম চেহারা থাকে!

ব্রেকফাস্ট শেষ করার কিছুক্ষণ পরেই অনুরিতার ফোন এল।

'হাই মাম্মি, হাউ আর য়ু?'

'ভালো, তুই কেমন আছিস?'

'ভালো, তবে গুড্ডুটা দিনকে-দিন ভীষণ দস্যি হয়ে উঠছে—সে তুমি ভাবতে পারবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বললেন লাবণ্য। সকলের খোঁজখবর নিলেন। তবে নিজের গা ম্যাজম্যাজ করার কথা বললেন না—বললে অনু ব্যস্ত হয়ে উঠবে। হয়তো এক্ষুনি বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট ছেড়ে ছুটে আসবে এখানে।

এই 'হাই মাম্মি-টাম্মি'গুলো অনুর বিয়ের আগে ছিল না—পরে হয়েছে। লাবণ্য এ নিয়ে ওকে একদিন ঠাট্টাও করেছিলেন। তাতে অনু বলেছিল, 'কী করব বলো! আমার বরটা যে সাহেব-

কোম্পানির টপ এক্সিকিউটিভ! তা ছাড়া তিন-চারবার স্টেটস ঘুরে এসে আমারও কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে।'

লাবণ্য হেসেছিলেন। ওঁর ছেলে আর মেয়ে বড় হয়েও কেমন ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

অনুরিতা রোজ এ সময়টাতেই ফোন করে। আর প্রতি রবিবার সন্ধের সময় অরুণাভ আর গুড্ডুকে নিয়ে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বলে, 'উইকে একবার তোমাকে সামনাসামনি না দেখলে ভীষণ মনখারাপ লাগে। আর গুড্ডুও বায়না করে—বলে, দিদুনের কাছে যাব।'

অনুরিতার ফোন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ডক্টর মুখার্জি এলেন। ভালো করে লাবণ্যকে পরীক্ষা করলেন। মধুমিতা ওঁদের কাছে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত মা-পায়রার মতো ছটফট করছিল।

পরীক্ষা শেষ করে ডক্টর মুখার্জি হেসে বললেন, 'কিচ্ছু হয়নি। আপনারা শুধু-শুধু উয়ারিড হয়ে পড়েছেন। বুকে সামান্য কফ আছে। এই সিরাপ আর ট্যাবলেটটা লিখে দিলাম। ইন্সট্রাকশন মতো খাওয়াবেন। ব্যস—নিশ্চিন্ত।'

ডক্টর মুখার্জি চলে যাওয়ার পর মধুমিতা হাঁফ ছাড়লঃ 'উঃ, যা চিন্তায় পড়েছিলাম! আপনার কিছু হলেই আমার দুশ্চিন্তা হয়।'

কথাটা সত্যি। লাবণ্যর কিছু হলেই দিপু আর মধুমিতা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে লাবণ্যকে ঘিরে ধরে। অনুরিতা-অরুণাভ জানতে পারলেও সেই একই ব্যাপার।

ঠিক দশটায় দীপ্তিমান ফোন করে লাবণ্যর খবর নিল।

মধুমিতা যখন জানাল, ব্যাপারটা মোটেই সিরিয়াস কিছু নয়, তখন ও বলল, 'থ্যাংক গড। তুমি ওষুধগুলো এক্ষুনি আনিয়ে নাও।'

তারপর আরও দু-চারটে কথা বলে মা-কে ফোন দিতে বলল।

কর্ডলেসের রিসিভারটা লাবণ্যর হাতে তুলে দিল মধুমিতা, বলল, 'আপনার ছেলে।'

মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল দীপ্তিমান। তারপর ফোন রেখে দেওয়ার সময় বলল, 'ফিরতে-ফিরতে আমার সাতটা হবে।'

মধুমিতা বলল, 'যাই, আপনার ওষুধগুলো আনানোর ব্যবস্থা করি—।'

লাবণ্য এবার টিভি দেখবেন। সারদা সেটা জানে। তাই ও টিভির সুইচটা অন করে দিয়ে রিমোটটা লাবণ্যর হাতে এনে দিল।

বাবুন আর দীপ্তিমান বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িটা বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। লাবণ্যর এটা ভালো লাগে না। তাই সবসময় রবিবারের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। সেদিনটা দারুণ হইহই করে কাটে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দীপ্তিমানের দুটো শার্ট নিয়ে বসলেন লাবণ্য। একটায় বোতাম বসাতে হবে, অন্যটায় দুটো বোতাম-ঘর তৈরি করতে হবে। রেডিমেড শার্টগুলোর কবজির কাছটা যা ঢিলে থাকে!

নাকের ওপরে সোনালি ফ্রেমের চশমা বসিয়ে ছুঁচ-সুতো-কাঁচি নিয়ে কাজ করছিলেন লাবণ্য। সেলাই করতে ওঁর ভালোই লাগে। অল্পবয়েসে সেলাইয়ের শখ ছিল। প্রমথনাথের প্রশংসাও পেয়েছেন বহুবার। তাই এখনও বাড়ির সমস্ত সেলাই-ফোঁড়াইয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে ভালোবাসেন। মধুমিতাও বলে, 'মায়ের মতো সেলাই আমি জীবনেও করতে পারব না! আচ্ছা-আচ্ছা দরজি মায়ের কাছে হার মেনে যাবে।'

কিছুক্ষণ সেলাইয়ের পর চোখে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তাই সেলাই রেখে লাবণ্য বিশ্রাম নিতে চাইলেন। সারদার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ও বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিল।

বিছানায় শরীর গড়িয়ে লাবণ্য বেশ আরাম পেলেন। অথচ একটা সময় ছিল যখন দুপুরে মোটেই ঘুমোতেন না। সময় নিজেও বদলায়, মানুষকেও বদলায়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। সারদাকে বললেন, 'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, আমাকে ডাকোনি!'

সারদা মিনমিন করে বলল, 'আপনার শরীরটা ভালো নয়...বিশ্রাম দরকার...তাই...।'

বিকেলের চা নিয়ে আবার বারান্দায় বসলেন।

মধুমিতা বাবুনকে নিয়ে কাছেই পার্কে গেছে। ছ'টা নাগাদ ফিরবে।

বিকেলের আকাশের রং দেখতে লাবণ্যর ভালোই লাগছিল। একটা বিকেল মরে যায় পরদিন একটা নতুন সকাল জন্ম নেবে বলে। নতুন একটা দিন এসে আগের দিনটাকে স্মৃতিকোঠায় ঠেলে দেয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার আগেই শুনলেন একতলায় বাবুনের হইচই। পার্কে বেড়ানো সেরে মধুমিতা আর বাবুন ফিরে এসেছে।

লাবণ্য ঘরে চলে এলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দুদ্দাড় করে ঘরে ঢুকল বাবুন। ছুটে এসে লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরলঃ'দিদুন, দিদুন, বলো তো তোমার জন্যে কী এনেছি?'

'ছাড়, ছাড়—পড়ে যাব...' বলতে-বলতে লাবণ্য কোনওরকমে বিছানায় গিয়ে বসলেন।

বাবুন একটা ক্যাডবেরি চকোলেট বাড়িয়ে দিল লাবণ্যর দিকেঃ 'বলতে পারলে না তো! এই নাও...।'

মধুমিতা হেসে বলল, 'নিজে চকোলেট কেনার বায়না ধরল। তারপর কেনার সময় বলে, দিদুনের জন্যেও একটা কিনতে হবে—নইলে আমি চকোলেট খাব না। তখন...।'

লাবণ্য বাবুনের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। চকোলেটের মোড়ক ছাড়িয়ে একটুকরো ভেঙে নিলেন। তারপর বাকিটা নাতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, বাবুসোনা। আমি তো বুড়ো মানুষ—তাই বেশি চকোলেট খেতে নেই।'

বাবুন চকোলেটটা নিয়ে বলল, 'তোমাকে চকোলেট দিলাম, "থ্যাংক য়ু" বলো!'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ—থ্যাংক য়ু, বাবুসোনা।'

মধুমিতা বলল, 'এখন ওকে নিয়ে গিয়ে হোমটাস্কে বসাই। সাড়ে সাতটার সময় আপনাকে চা করে দেব।'

'দিদুন, হোমটাস্ক হয়ে গেলে গোস্ট স্টোরি—মনে থাকে যেন!'

লাবণ্য হেসে মাথা নাড়লেনঃ 'হ্যাঁ রে বাবা, মনে আছে।'

বাবুন পড়তে চলে যাওয়ার পর লাবণ্য আবার দীপ্তিমানের শার্ট নিয়ে বসলেন। সেলাইয়ের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে।

কিন্তু সেলাই করতে-করতে একটা অঘটন ঘটল।

কীভাবে যেন ছুঁচটা ফুটে গেল লাবণ্যর আঙুলে। বাঁ-হাতের তর্জনীর ডগায় রক্তের ফোঁটা দেখা দিল—ঠিক যেন একটা ছোট্ট চুনি।

সারদা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল পরিচর্যা করতে। আসার সময় একটা ছোট টেবিলে সামান্য ধাক্কা খেল। একটা স্টিলের বাটি টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝনঝন করে শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে মধুমিতা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

'কী হয়েছে, মা! কী পড়ল?'

বিছানায় বসে থাকা লাবণ্যর আঙুলের দিকে তাকিয়ে মধুমিতা একেবারে আঁতকে উঠল। লাবণ্যর আঙুলটা চট করে টেনে নিল মুখে। খানিকটা রক্ত চুষে বের করে দিল। তারপর ছুটল স্যাভলন মলম আর ব্যান্ড-এইড নিয়ে আসতে। বারবার বলতে লাগল, 'সন্ধেবেলা কেন যে সেলাই নিয়ে বসলেন! দেখুন তো, কী সব্বনেশে কাণ্ড হল!'

লাবণ্যর আঙুলটা ব্যান্ডেজ করেই দীপ্তিমানকে অফিসে ফোন করল মধুমিতা। সব শুনে দীপ্তিমান বলল, 'ও মাই গড! আমি এক্ষুনি বাড়ি আসছি।'

তারপর সে এক হইহই কাণ্ড।

ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, সারদা, ডাক্তার! অনুকে ব্যাপারটা জানাতে বারণ করলেন লাবণ্য।

সত্যি, একফোঁটা রক্তের জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত যত্ন, এত ভালোবাসা! না, না, লাবণ্যর আর কিছু চাই না। প্রমথনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বললেন, 'তুমি সব দেখছ তো! আমার কোনও দুঃখ নেই।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলল হুলস্থুল।

ছেলের কথায় সেলাই-ফোঁড়াই বন্ধ করতে হল লাবণ্যকে। মধুমিতাও ওঁকে কম-বেশি বকুনি দিল।

এই শাসন যে কী মধুর!

রাত দশটায় রাতের খাওয়া শেষ হলে লাবণ্যকে বলে মধুমিতা আর দীপ্তিমান ওদের ঘরে চলে গেল। বাবুন ভূতের গল্প শুনে দিদুনের গালে চুমু দিয়ে 'গুডনাইট' বলে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে গেল।

সারদা লাবণ্যর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর মেঝেতে নিজের বিছানা পাততে শুরু করল।

একটা দিন শেষ হল।

বিছানায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাবণ্য আচমকা হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। ওঁর বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। শরীরটা বারবার ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

সারদা একবার লাবণ্যর দিকে দেখল, তারপর নিজের মনেই বিছানা করতে লাগল—যেন কিছুই হয়নি। কারণ, এটা রোজকার ব্যাপার—সারদার সয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর কান্না সামলে উঠে দাঁড়ালেন লাবণ্য। চোখের জল মুছে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন।

সারদা হাঁটুগেড়ে বসে বিছানা ঠিক করছিল, আলতো করে জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন, মা?'

পিছন ফিরে না তাকিয়েই লাবণ্য বললেন, 'কম্পিউটার রুমে।'

সারদা আর কোনও কথা বলল না।

লম্বা বারান্দা ধরে হেঁটে দোতলার শেষ প্রান্তের ঘরটায় এসে পৌঁছলেন লাবণ্য।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, সেটা ঠেলে খুললেন। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা চিলতে ছিটকে ঘরে ঢুকে অন্ধকার মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

বাইরে নরম বাতাস বইছিল—তাতে বোধহয় একপশলা বৃষ্টির গন্ধও ছিল। লাবণ্য একটা শ্বাস নিলেন, তারপর মন শক্ত করে ঘরের আলো জ্বাললেন।

কথা-বলা পুতুলগুলো ঘরের একপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

মধুমিতা, দীপ্তিমান, বাবুন, ডক্টর মুখার্জি, অনুরিতা, অরুণাভ, গুড্ডু—সবাই হাজির। চেহারায় মানুষের মতো কথা-বলা এই রোবটগুলো লাবণ্য একটা কম্পিউটার কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। তাদের আচার-ব্যবহার কেমনতরো চান সেটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেই

কোম্পানিকে। তারা লাবণ্যর পছন্দসই সফ্‌টওয়্যার ঢুকিয়ে দিয়েছে এই অ্যানড্রয়েডগুলোর ভেতরে। ফলে সারাটাদিন এই নকল মানুষগুলো প্রোগ্রাম অনুযায়ী কথা বলে, হাঁটা-চলা করে। এই রোবটগুলোর ভেতরে সপ্তাহের সাতটা দিনের জন্য সাতরকম প্রোগ্রাম ভরা আছে। যখন ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে যায় তখন লাবণ্য সেই কোম্পানিকে একটা ই-মেইল করে দেন। যেমন এখন করবেন।

ঘরের দেওয়াল-ঘেঁষে রাখা কম্পিউটার টেবিল। তাতে সাজানো রয়েছে মনিটর, স্পিকার, কিবোর্ড, মাউস, সিস্টেম ইউনিট—সব।

কম্পিউটার অন করে চেয়ারে বসলেন লাবণ্য। কোম্পানিকে ই-মেইল করে জানালেন সফ্‌টওয়্যারগুলো এবার বদলে দিতে হবে—নইলে একঘেয়ে লাগছে।

কাজ শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। দরজার কাছে এসে আলো নেভানোর আগে যন্ত্র-মানুষগুলোকে আর-একবার দেখলেন। আসল মানুষগুলোর ফটোগ্রাফ দেখে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই মডেলগুলো তৈরি করা হয়েছে। লাবণ্যকে ঘিরে ওরা আসল মানুষের মতো ঘোরাফেরা করে, লাবণ্যর ফাঁকা বুকটা ভরাট করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আসল মানুষগুলো কোথায়? কী করছে ওরা এখন?

আবার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল।

বিয়ের পর-পরই দীপ্তিমান আলাদা হয়ে গেছে। তার দু-বছরের মধ্যেই চলে গেছে আমেরিকায়। কার মুখে যেন খবর পেয়েছিলেন আইওয়াতে আছে। প্রথম-প্রথম দু-চারবার ফোন-টোন করেছিল। তারপর...তারপর সব শেষ।

অনুরিতার গল্পটাও অনেকটা একইরকম। বালিগঞ্জে থাকলেও ব্যাপারটা আমেরিকার আইওয়ার মতন। একটা দিনও খোঁজ নেয় না, মা কেমন আছে। মাসদুয়েক আগে একবার ফোন করে জানতে চেয়েছিল টাকার দরকার আছে কি না।

না, দরকার নেই। প্রমথনাথ মারা যাওয়ার সময় ওই একটা জিনিসের অভাব রেখে যাননি। কিন্তু তা ছাড়া লাবণ্যর জীবনের বাকি দিকগুলো খাঁ-খাঁ করছে। এই শূন্যতার কথা লাবণ্য আর সারদা ছাড়া আর কেউ তেমন জানে না।

আলো নিভিয়ে পায়ে-পায়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে এলেন লাবণ্য।

সারদা ততক্ষণে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে।

লাবণ্যর খাটের পাশে একটা ছোট টেবিলে একটা ট্যাবলেটের পাতা আর এক গ্লাস জল রাখা ছিল। একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিয়ে জল দিয়ে গিলে ফেললেন লাবণ্য। খাওয়ার আগে একবার ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছেন—এখন আর-একটা। তাতে যদি ঘুম আসে!

আলো নেভানোর সময় প্রথমনাথের ছবির দিকে চোখ গেল। ছবি থেকে লাবণ্যর মৃত স্বামী চাপা গলায় জিগ্যেস করল, ‘বউ, কেমন আছ?’

লাবণ্যর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। অতি কষ্টে চোখের জল রুখে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ‘ভালো আছি...সুখের সংসার নিয়ে দারুণ আছি...।’

তারপর সুইচ টিপে অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন!



রাত ফুরোল,কথা ফুরোল

কোনও মেয়েকে একান্তে চুমু খেতে যাওয়ার মুহূর্তে যদি দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে তা হলে কে না বিরক্ত হয়!

সুতরাং আমিও বিরক্ত হলাম।

সুচরিতার প্রস্ফুটিত ঠোঁট আমার চোখের সামনে ক্লোজ আপে ভাসছিল। ঝিম ধরিয়ে দেওয়া কেমন একটা গন্ধ ওর শরীর থেকে বিকিরিত হয়ে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। কিন্তু কলিংবেলের শব্দে আমার চোয়াল শক্ত হতেই সুচরিতা সেটা টের পেল। আলতো গলায় ও বলে উঠল, 'এই ফ্ল্যাটে নয়—ওদিকের ফ্ল্যাটে কেউ বেল বাজাচ্ছে—।'

ওর অবস্থা আমি বুঝতে পারছিলাম...ঠিক আমার মতোই।

কলিংবেল অধৈর্য সুরে আবার বেজে উঠল। কোনও ভুল নেই—আমার ফ্ল্যাটেই।

এরপর আর বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না। সুতরাং বিরক্তির একটা শব্দ করে উঠে পড়লাম। ছোট্ট করে তীক্ষ্ণ শিস দিতেই অটোমেটিক অডিয়ো কন্ট্রোল ঘরের আবছা আলো ধীরে-ধীরে জোরালো করে দিল। ধবধবে সাদা বিছানায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে শুয়ে থাকা ধবধবে ফরসা সুচরিতাকে একপলক দেখলাম। তারপর মনে-মনে নিজের পছন্দের তারিফ করলাম।

আমি বাইরের ঘরের দিকে রওনা হতেই সুচরিতা অস্পষ্ট গলায় পিছন থেকে বলল, 'ম্যানেজ করে জলদি চলে এসো।'

আমি হাতঘড়ির বোতাম টিপতেই টকিং ওয়াচ মিষ্টি মেয়েলি গলায় বলে উঠল, 'এখন রাত দশটা বেজে আটাশ মিনিট বারো সেকেন্ড।'

এত রাতে কে এল আমাকে ডাকতে!

এ-কথা ভাবতে-ভাবতে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাশের স্ট্যান্ড থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা তুলে নিয়ে দরজা লক্ষ করে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার একটা অংশ চৌকো জানলার মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। এর মধ্যে দিয়ে ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় না।

বাইরে দাঁড়ানো দুজন লোককে আমি দেখতে পেলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এদের 'ম্যানেজ' করে 'জলদি' সুচরিতার কাছে ফিরে যাওয়া যাবে না। 'জানলা'টাকে আবার অস্বচ্ছ করে দিলাম।

লোক দুজন বোধহয় হোমিসাইড স্কোয়াডের সাদা পোশাকের অপারেটর। ওদের পোড় খাওয়া চেহারা, ঠান্ডা চোখ অন্তত সে-কথাই বলছে। ওরা কি তা হলে শ্রাবন্তীকে খুঁজে পেয়েছে? কিন্তু তার সঙ্গে আমাকে জড়াল কেমন করে। সেরকম কোনও চিহ্ন তো আমি ফেলে আসিনি!

রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের অন্য একটা বোতাম টিপতেই বন্ধ দরজা নিঃশব্দে পাশে সরে গেল। আমি এবার ওদের মুখোমুখি।

ওদের সাজপোশাক প্রায় একই ধাঁচের—চেহারাও অনেকটা তাই।

চাপা জিন্সের প্যান্ট, ঢোলা সুতির জামা, চোখে কালো সানগ্লাস। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কপালে ভাঁজ, চোয়ালের হাড় উঁচু। একজনের বাঁ-কানের লতিতে একটা সোনার রিং চকচক করছে।

'আপনিই অমিত মজুমদার?' দুজনের একজন জানতে চাইল।

আমি শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

'আমরা হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে আসছি—' লেজারে হলোগ্রাম করা একটা ছোট্ট কার্ড আমার চোখের সামনে তুলে ধরল প্রথমজনঃ 'এত রাতে আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত। আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।'

'কেন? কী ব্যাপার?'

'মার্ডার কেস। শ্রাবন্তী সেন নামে একটা ইয়াং মেয়ের লাশ আমরা কাল সকালে পেয়েছি। গঙ্গায় পাওয়া গেছে। গলা টিপে মার্ডার করে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। বডিটা জেটির নীচে আটকে গিয়েছিল, তাই ভেসে যায়নি।'

আমি ভেতরে-ভেতরে নিজেকে সামলে নিলাম। বিব্রতভাবে বললাম, 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন—।'

প্রথমজন ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'বসার টাইম নেই। চলুন, হেডকোয়ার্টারে গিয়ে কথা হবে।'

'এক মিনিট। আমি চট করে রেডি হয়ে আসছি।'

'মেক ইট কুইক—।'

ওদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমি সুচরিতার কাছে চলে গেলাম। ওর খোলা পিঠে একটা চুমু খেয়ে পোশাক ঠিকঠাক করে নিলাম। মাথা আঁচড়ে গায়ে বিদেশি কোলোন স্প্রে করে নিলাম। তারপর আয়নায় নিজের চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললাম, 'সাবধান, যেন কোনও ভুল না হয়। সিরিয়াল কিলারদের ভুল করলে চলে না।'

একবার সুচরিতার দিকে তাকালাম। ও একইভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। বোধহয় আমার কথাটা শুনতে পায়নি। অবশ্য পেলেও তার মানে বুঝতে পারবে না। যখন বুঝবে তখন আর কিছু করার থাকবে না—অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সুচরিতাকে বললাম, 'লাভ, আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আসছি। পুলিশ একটা মার্ডার কেসে ভুল করে আমাকে হ্যারাস করতে এসেছে। তুমি চিন্তা কোরো না—নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো—।'

সুচরিতা শরীরটাকে আধপাক ঘুরিয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'—আমি এসে তোমার ঘুম ভাঙাব।' ওর দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলাম আমি।

ফ্ল্যাটের বাইরে এসে দরজার পাশে দেওয়ালে বসানো অটোমেটিক ভয়েস লক সিস্টেমের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'ফ্ল্যাট লক করে দাও।'

যন্ত্র তার সূক্ষ্ম বিচারে মালিকের কণ্ঠস্বর নিখুঁতভাবে চিনতে পারল।

সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমার গলায় খোলার নির্দেশ না পেলে এই দরজার লক আর খুলবে না।

ওরা দুজন পাথরের মূর্তির মতো অপেক্ষা করছিল। আমি 'চলুন' বলতেই রোবট দুটো যেন সাড় ফিরে পেল। নিঃশব্দে দুজন আমার দুপাশে চলে এল। আমরা এলিভেটরের দিকে রওনা হলাম।

বাইরের রাস্তায় এসে গাড়িতে ওঠার সময় ওদের একজন আমাকে জিগ্যেস করল, 'মিস্টার মজুমদার, শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চিনতেন?'

আমি শ্রাবন্তীকে চিনতাম—বেশ অন্তরঙ্গভাবেই চিনতাম। তাই নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'না—।'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তার পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে সঙ্গীর হাতে তুলে দিল, বলল, 'বর্ধন, তুমিই জিতলে—আমি হেরে গেলাম।'

আমাকে অবাক হতে দেখে বর্ধন হেসে বলল, 'মিস্টার মজুমদার, আপনার এখানে আসার সময় বিশ্বাসকে আমি বলেছিলাম, শ্রাবন্তী সেনকে চেনার ব্যাপারটা আপনি ডিনাই করবেন। ও আমার কথা মানতে চায়নি, তাই আমার সঙ্গে একশো টাকা বাজি ধরেছিল—' জিভে দুঃখের চুকচুক শব্দ করে আবার হাসল বর্ধনঃ 'বিশ্বাস, বেকার তোমার একশোটা টাকা গেল।'

গাড়ির পেছনের সিটে আমাকে মাঝখানে রেখে বর্ধন আর বিশ্বাস দুপাশে বসল। ওদের লুকোনো ব্লাস্টার গান আমার কোমরে খোঁচা দিচ্ছিল। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগোতেই বর্ধন চাপা গলায় বলল, 'মিস্টার মজুমদার, শ্রাবন্তীকে আপনি চিনতেন...আমাদের হাতে মারাত্মক প্রমাণ রয়েছে।'

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বর্ধনের দিকে তাকাতেই বাঁ-পাশ থেকে বিশ্বাস বলে উঠল, 'অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটাকে খুন করলেন কেন বলুন তো!'

আমি অসহায়ভাবে বলে উঠলাম, 'আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে—শ্রাবন্তীকে আমি চিনি না।'

'হেডকোয়ার্টারে গিয়ে দাওয়াই দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে।' দাঁতে দাঁত চেপে বর্ধন মন্তব্য করল।

আমি নিরুপায় হয়ে গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা আমার মুখে দক্ষ হাতে তুলির আঁচড় কাটছিল। আর আমার মনে পড়ছিল ফুটফুটে মেয়েগুলোর কথা।

গত চারমাসে কলকাতার নানা জায়গায় এগারোজন তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওদের প্রত্যেককেই গলা টিপে খুন করা হয়েছে। খুন করেছি আমি। না, আসলে ঠিক আমি না—আমার ভেতর থেকে একটা অচেনা খুন-পাগল লোক এই জঘন্য কাজগুলো করে। চারমাস আগে আমার মাথার ভেতরে ওই পাগলটা প্রথম জেগে ওঠে। খুন করে রত্নাকে। তারপর একে-একে মাধুরী, সুজাতা, নয়না, সুন্দরী, প্রথমা, সাগরিকা...সব নাম আমার মনে নেই। সংখ্যাটা যে মনে আছে তার কারণ ইন্টারনেট নিউজে প্রায় প্রতিদিনই এ-নিয়ে খবর বেরোয়—তাতে বারবার করে ওরা সংখ্যাটা আমাকে জানিয়ে দেয়—পাছে আমি ভুলে যাই। ওরা আমার নাম দিয়েছে—মানে, আমার ভেতরের ওই পাগলটার নাম দিয়েছে 'সিরিয়াল কিলার'—ধারাবাহিক খুনি। একজন রসিক সাংবাদিক এমন মন্তব্যও করেছে, এই সিরিয়ালের সবে এগারোটা এপিসোড হয়েছে, কত এপিসোডে শেষ হবে কে জানে!

আমার হাসি পেল। ক'টা এপিসোডে এই সিরিয়াল যে শেষ হবে তা আমিও জানি না। জানে আমার মাথার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ওই পাগলটা। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, আজ কিংবা কাল রাতে সুচরিতাকে নিয়ে পাগলটার বারো নম্বর এপিসোড শেষ করার কথা।

শ্রাবন্তীর কথা মনে পড়ল আমার। শ্রাবন্তীকে আমি যে ভালো করেই চিনতাম তার কী মারাত্মক প্রমাণ পেয়েছে ওরা? এর আগের খুনগুলোর বেলায় পুলিশ আমাকে কোনও সন্দেহ করেনি, কোনওদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও আসেনি। কিন্তু এইবার যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই

ওদের হাতে কোনও-না-কোনও সূত্র আছে। অর্থাৎ, কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। কিন্তু কী সেই ভুল?

লালবাজারে হোমিসাইড স্কোয়াডের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতেই আমার ভাবনায় বাধা পড়ল। মনে-মনে নিজেকে তৈরি করে নিলাম। সতর্কতা বাড়িয়ে দিলাম দশ গুণ।

গাড়িতে অটোমেটিক প্রোগ্রাম করাই ছিল। তাই ড্রাইভার হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও গাড়িটা হিসেবমতো নিখুঁত বাঁক নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেসে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম বলে উঠলঃ 'আমরা গন্তব্যে এসে গেছি।'

ড্রাইভার কী-একটা বোতাম টিপতেই হাইড্রলিক কন্ট্রোল নিঃশব্দে দুটো দরজা খুলে দিল। আমরা তিনজন নেমে পড়লাম।

এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে আমি চারপাশটা দেখতে লাগলাম।

লালবাজারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আগে কখনও আমি আসিনি। এর সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বহুবার গেলেও ভেতরে এই প্রথম। কেন জানি না, আমার বুকের ভেতরে একটা অচেনা পেন্ডুলাম ঢং-ঢং করে বাজছিল।

পাথর বাঁধানো বিশাল পার্কিং স্পেসে প্রায় দেড়-দু-ডজন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জায়গায়-জায়গায় লাগানো হ্যালোজেন বাতি সুন্দর আলোর বৃত্ত তৈরি করেছে। বৃত্তের বাইরেটা আবছা অন্ধকার।

উঠোনের মাঝে একটা লাস্যময়ী নাচিয়ে ফোয়ারা। তার নাচের তালে-তালে লুকোনো বাজনা নীচু গ্রামে বাজছে। বাজনার সঙ্গে তাল রেখে চলছে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলোর খেলা।

উঠোনকে ঘিরে প্রায় বিশতলা উঁচু চারটে বিশাল বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলো যেন সানগ্লাসের কাচ দিয়ে তৈরি। বাড়ি লক্ষ্য করে অনেকগুলো হ্যালোজেন ফোকাস লাগানো রয়েছে। বাড়ির কাচের দেওয়াল সেই আলো আয়নার মতো ঠিকরে দিচ্ছে।

এই সুন্দর-সুন্দর বাড়ির ভেতরেই চলে অপরাধীকে শায়েস্তা করার নোংরা কাজ।

রাত বেড়েছে, তাই লোকজন কম চোখে পড়ল। আমি বর্ধনের দিকে তাকাতেই সে বলল, 'আমাদের সঙ্গে আসুন—।'

বিশ্বাস ওর বাঁ-কানের সোনার রিংটা নাড়াচড়া করছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই বাঁকা হাসল।

আমরা তিনজনে দ্বিতীয় বাড়িটার দিকে এগোলাম। শানবাঁধানো চাতালে আমাদের জুতোর শব্দ ফোয়ারার বাজনার সঙ্গে মিশে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দুটো ভয়েস লক দরজা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম অটোমেটিক এলিভেটরের কাছে। এলিভেটর আমাদের নিয়ে গেল এগারোতলায়। সেখানে আধুনিক ছাঁদে তৈরি গোলকধাঁধার

মতো গোটাপাঁচেক অলিন্দ পেরিয়ে পৌঁছলাম একটা ঘরে। ঘরের দরজায় লাগানো লাল রঙের ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে জানিয়ে দিচ্ছে ঘরটার নামঃ ইন্টারোগেশান রুম।

ঘরের চারদিকে অসংখ্য অচেনা যন্ত্রপাতি। তার মাঝে ন্যাড়া মাথা, পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, কুতকুতে চোখ, আর ফরসা চেহারার যে-মানুষটি বসে আছে, তাকেও প্রথমটায় যন্ত্র বলে ভুল হল আমার।

'আসুন, মিস্টার মজুমদার...বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না।' শঙ্খচূড় সাপ যদি কথা বলতে পারত তা হলে সে বোধহয় এইভাবেই কথা বলত। কথাটা বলে যন্ত্রের চেহারার মানুষটি হাসল। হাসি মানে তার ঠোঁটের রেখা সামান্য চওড়া হল, দু-একটা ভাঁজ পড়ল ঠোঁটের কোণে।

বিশ্বাস আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'এখন আপনি জোয়ারদারসাহেবের প্রপার্টি। এ-ঘরে ঢোকার আগে আর পরে মানুষ একরকম থাকে না। আমরা দুজন স্রেফ সাক্ষীগোপাল হয়ে ওঁর গান অনুযায়ী তাল দেব।'

ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উষ্ণতাকে বোধহয় দশ-বারো ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে থাকবে, কারণ আমার বেশ শীত করছিল।

জোয়ারদার তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে জরিপ করতে-করতে বলল, 'বসুন—।'

একটা আধুনিক টেবিলকে মাঝখানে রেখে আমি জোয়ারদারের মুখোমুখি বসলাম। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেলাম, বিশ্বাস আর বর্ধন আমার ঠিক পেছনে অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে।

জোয়ারদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ডানদিক ঘেঁষে রাখা একটা কম্পিউটারের কয়েকটা বোতাম টিপল। চোখ সরু করে মনিটরে কী দেখল কে জানে! তারপর সাপের মতো স্কেল লাগানো একটা মাউথপিসের মতো যন্ত্র কম্পিউটারের পাশ থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'বর্ধন, ওঁকে স্ক্যান করো—।'

বর্ধন চট করে চলে গেল জোয়ারদারের পাশে। ওর হাত থেকে মাউথপিসটা নিয়ে আমার কাছে এল। তারপর আমার বাঁ-হাতের কবজির ওপর যন্ত্রটা না ছুঁইয়ে বুলিয়ে নিল। জোয়ারদার তখনও ঠান্ডা চোখে কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে।

এখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের বাঁ-হাতের কবজিতে একটা করে পারসোনাল ইনফরমেশান মাইক্রোচিপ বসানো থাকে। সেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করলে তার যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারের পরদায় ফুটে ওঠে। আমারও উঠল।

জোয়ারদার যেন একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করল, 'মিস্টার মজুমদার, কিড স্ট্রিট ব্রাঞ্চের স্পার্ম ব্যাঙ্কে সেভেন্টি এইটে আপনার জন্ম?'

আমার জন্মতারিখ ২২ জানুয়ারি ২০৭৮ সাল। আর স্পার্ম ব্যাঙ্কে, মানে, ল্যাবরেটরিতে জন্ম হওয়াটা প্রায় ষাট বছর হল স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সুতরাং জোয়ারদারের প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলাম না। তবুও শান্তভাবে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'ইন্টারেস্টিং।' থুতনিতে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল জোয়ারদার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল আমি কোনও কথা বললাম না তখন টিভিতে খবর পড়ার মতো নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে বলল, 'সেভেন্টি এইটে কিড স্ট্রিটের ব্রাঞ্চে একটা ইনফেকশানের ব্যাপার হয়েছিল। ফলে সে-বছর ওই ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অ্যাবনর্মাল বেবির জন্ম হয়েছিল।'

'আপনি কি বলতে চান আমি অ্যাবনর্মাল?'

জোয়ারদার ঘাড় কাত করে ভুরু উঁচিয়ে আমাকে দেখল, তারপর চেয়ারে বসে
পড়লঃ 'না, না—আপনি অ্যাবনর্মাল হবেন কেন! কিন্তু গত চারমাস ধরে যে-সিরিয়াল কিলার কলকাতার আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যে অ্যাবনর্মাল সেটা তো মানবেন!'

একটা খুন-পাগল মানুষ অস্বাভাবিক হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মধ্যে তো সেরকম কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই! শুধু মাঝে-মাঝে যা একটু ওই মেয়েগুলোকে খতম করতে ইচ্ছে করে।

'সিরিয়াল কিলারের অ্যাবনর্মাল হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।' জোয়ারদারের কথার উত্তর দিলাম।

হাসল জোয়ারদার, বলল, 'তা হলে তার জন্ম আটাত্তর সালে হতেও পারে। যখন কিড স্ট্রিটের স্পার্ম ব্যাঙ্কে ওই ইনফেকশানের ব্যাপারটা হয়েছিল...।'

'আপনি কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন—' জোয়ারদারের হাসির ধরনটা আমার মাথার ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেটা বোধহয় জোয়ারদার বুঝতে পারল। তাই আরও নোংরাভাবে হেসে শক্ত গলায় বলল, 'আমি যা বলতে চাই বেশ স্পষ্ট করেই বলেছি। অন্তত আপনার না বোঝার কথা নয়। এখন আপনার স্পষ্ট উত্তর দেওয়ার পালা। আপনি শুধু স্বীকার করুন যে, শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চিনতেন।'

আমি বিদ্রোহী ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বর্ধন আর বিশ্বাসের দিকে একপলক তাকিয়ে জোয়ারদারকে বললাম, 'আমি শ্রাবন্তী সেনকে চিনি না। একটু আগেই ওঁদের সে-কথা বলেছি। আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।'

'বসুন, মিস্টার মজুমদার, অযথা উত্তেজিত হবেন না। হম্বিতম্বি করে একটু-আধটু রাগ দেখালেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আপনি যে মিস সেনকে চিনতেন তার মারাত্মক প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। কলকাতার সিরিয়াল কিলারকে ধরার চেষ্টাটা আমি

সেখান থেকেই শুরু করতে চাই। আপনি নিজে থেকে সবকিছু বলে আমাকে সাহায্য করলে আপনারও সুবিধে হবে—।'

'কীসের সুবিধে?'

হাত নেড়ে ঘরের আধুনিক সব যন্ত্রগুলোর দিকে ইশারা করে জোয়ারদার বলল, 'সুবিধে হবে এটাই যে, এইসব খারাপ-খারাপ যন্ত্রগুলো আপনার ওপরে আমাকে ব্যবহার করতে হবে না।'

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম আবার। হাত-পায়ের জোর যেন হঠাৎই কমে গেছে বলে মনে হল।

জোয়ারদার বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'বিশ্বাস, আমাদের তৈরি কম্প্যাক্ট ডিস্কটা মজুমদারবাবুকে দেখাও—।'

ওর কথার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ছুরি যেন আমার শরীরে সত্যি-সত্যিই কেটে বসল।

বিশ্বাস ঘরের একটা যন্ত্রের কাছে গেল। সেখানে কয়েকটা বোতাম টিপতেই ঘরের সামনের দেওয়ালের একটা চৌকো মাপের অংশ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে শুরু হল এগারো এপিসোডের টিভি সিরিয়াল। রত্না, মাধুরী, সুজাতাকে দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হল শ্রাবন্তীকে দিয়ে। জীবন্ত ছবির সঙ্গে সেখানে তাল মিলিয়ে চলল পেশাদারি হাতে তোলা সাউন্ডট্র্যাক।

সিডি-তে জীবন্ত ছায়াছবি দেখতে-দেখতে আমার ভেতরে একটা কষ্ট টের পাচ্ছিলাম। এগারোজন তরুণীকে খুন করেছি আমি! এ আমি কী সাংঘাতিক পাপ করেছি। ছিঃ-ছিঃ!

আমি রুমাল বের করে চোখের কোণ মুছে নিলাম। দেওয়ালের পরদায় তখন শ্রাবন্তীকে দেখা যাচ্ছে। ওর গলায় আঙুলের দাগঃ ফরসা ত্বকে কালচে ছোপ।

সিনেমা চলার সময় জোয়ারদার নিজের মতো করে বাড়তি ধারাবিবরণী দিচ্ছিল। আর একইসঙ্গে অদ্ভুত-অদ্ভুত নজরে আমাকে লক্ষ করছিল।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর সিরিয়াল শেষ হলে জোয়ারদার বিশ্বাসকে সিডি প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিতে বলল। তারপর আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বলুন, মিস্টার মজুমদার...কী ঠিক করলেন?'

'আপনি আসল খুনিকে ধরতে না পেরে শুধু-শুধু আমার মতো একজন ইনোসেন্ট সিটিজেনকে হ্যারাস করছেন। আমি হোমিসাইড স্কোয়াডের চিফের কাছে ব্যাপারটা রিপোর্ট করব—।'

কথা বলতে-বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হাত তুলে জোয়ারদারকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বর্ধন আমার বুকে সপাটে এক ধাক্কা দিয়ে আমাকে ছিটকে চেয়ারে ফেলে দিল।

অসহ্য ব্যথা, তার সঙ্গে দম আটকানো অবস্থা টের পেলাম। যন্ত্রণায় আমার মুখ কুঁচকে গেল। কাত হয়ে চেয়ারে পড়ে রইলাম আমি।

জোয়ারদার মিহি শব্দ করে হেসে বলল, 'আপনি আমাকে রূঢ় ব্যবহার করতে বাধ্য করছেন, মিস্টার মজুমদার। আমি নরমালি পেশেন্ট অনুযায়ী মেডিসিন দিই। ডোন্ট ফোর্স মি টু অ্যাডমিনিস্টার রাফ মেডিসিন। এখনও বলছি, আমার কথামতো কাজ করুন। তাতে আপনারই ভালো হবে...।'

আমি দ্রুত ভাবতে শুরু করলাম। কী অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে ওরা? কী করে ওরা বুঝতে পারল আমিই সেই সিরিয়াল কিলার?

'মিস্টার মজুমদার, লুকোচুরি করে আর লাভ নেই। এতদিন ধরে তদন্ত করেও আমরা এই খুনগুলোর কোনও কিনারা করতে পারিনি। কারণ সেরকম সলিড কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। এই সিরিয়াল কিলিং নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছিল। তারপর...ফরচুনেটলি...শ্রাবন্তী সেনের মার্ডারের ইনভেস্টিগেশানের সময় আমরা এই প্রথম আলো দেখতে পেলাম। আর সে-আলো গিয়ে পড়েছে আপনার দিকে...।' কথা বলতে-বলতে মুচকি-মুচকি হাসছিল জোয়ারদার।

আমি জোয়ারদারের কথা খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম না। বাঁ-হাতে মাথার ঝাঁকড়া চুলের ভেতরে আঙুল চালাচ্ছিলাম। একটু পরেই আঙুলের ডগায় লুকোনো ধাতব প্লেটটা খুঁজে পেলাম। সামান্য চাপ দিয়ে প্লেটটা একপাশে সরাতেই ইলেকট্রনিক্স প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেল। এর ভেতরে আছে বেশ কয়েকটা মাইক্রোচিপ। এই চিপগুলো আমার মস্তিষ্কের একটা অংশ। সতেরো বছর বয়েসে আমার মাথার গোলমাল দেখা দেয়—হয়তো ওই স্পার্ম ব্যাঙ্কের ইনফেকশানের জন্যে। তখন ডাক্তার বলেছিল, আমার মাথার গোলমালের ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত। ওটা সরীসৃপের মতো শীতঘুম দেয়। তারপর হঠাৎ করে জেগে উঠে বিনা নোটিশে মাথাচাড়া দেয়। সেটা ঠিকঠাক করতেই আমার ব্রেনে অপারেশান হয়েছিল। বসাতে হয়েছিল একমুঠো মাইক্রোচিপ।

তখন আমি ইলেকট্রনিক্স জানতাম না।

কিন্তু পরে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর, হার্ডওয়্যারে ডক্টরেট করার পর, নিজের মাথা নিয়ে আমি নিজেই মাথা ঘামিয়েছি। মাইক্রোচিপগুলোয় কিছু রদবদল করেছি। কিন্তু তাতেও যে আমি পুরোপুরি সুস্থ হইনি তার প্রমাণ শ্রাবন্তীরা।

কিন্তু শ্রাবন্তীর ব্যাপারে কী প্রমাণ পেয়েছে জোয়ারদার?

অনেক ভেবেও কোনও কূল পাচ্ছিলাম না আমি। মাঝে-মাঝে অনেক ব্যাপার আমি ভুলে যাই। তারপর হঠাৎ করেই সেগুলো আবার মনে পড়ে যায়। শ্রাবন্তীর বেলায়ও হয়তো তাই হয়েছে।

কিন্তু আমাকে কষ্ট করে সেটা আর মনে করতে হল না। জোয়ারদার আমাকে সাহায্য করল। ও ইশারা করতেই বিশ্বাস কোথা থেকে একটা পলিথিনের প্যাকেট বের করে ছুড়ে দিল আমার সামনে।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। মাথার ধাতব দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

'এই হল সেই প্রমাণ।' মন্তব্য করল জোয়ারদার, 'অ্যাবসোলিউট প্রুফ। নিন, প্যাকেটটা খুলুন—খুলে দেখুন।'

আমি কাঁপা হাতে প্যাকেটটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। ওটা ধীরে-ধীরে খুলতে শুরু করলাম। কী আছে এর ভেতরে? আমার হাত এত কাঁপছে কেন?

প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এল একগোছা চিঠি।

সেগুলো হাতে নিয়ে হতভম্বভাবে আমি জোয়ারদারের দিকে তাকালাম। হোঁচট খাওয়া গলায় কোনওরকমে বললাম, 'এ...এগুলো...ক্-কী?'

জোয়ারদার হেসে বলল, 'প্রেমপত্র। শ্রাবন্তীকে লেখা আপনার প্রেম্পত্র। অথচ আপনি বারবার বলছেন শ্রাবন্তী সেনকে আপনি চেনেন না—।'

মনে পড়েছে!

শ্রাবন্তীকে আমি বহু চিঠি লিখেছি। এর আগে কাউকে আমি কোনও প্রেমপত্র লিখিনি। কারণ আমি চাইনি পুলিশের হাতে কোনও সূত্র পৌঁছে যাক। তবে শ্রাবন্তীর বেলা আমার ভেতরে কী একটা যেন হয়ে গিয়েছিল। ওকে চিঠি না লিখে আমি পারিনি। ওকে একদিন না দেখলেই আমি চোখে অন্ধকার দেখতাম। ওকে আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু...।

কিন্তু একদিন আমার ভেতরের অসুখটা শীতঘুম ভেঙে বেরিয়ে এল। শ্রাবন্তীর দিন ফুরোল। বেশ মনে আছে, অন্ধকার মাঠে ওর মৃতদেহ সামনে নিয়ে আমি পাগলের মতো কেঁদেছিলাম। আমার অসুখটাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম বারবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

চিঠিগুলো আমি একে-একে দেখতে শুরু করলাম। আমার সুন্দর হাতের লেখায় আঁকা এক-একটি চিঠি—ভালোবাসার চিঠি। চিঠির শেষে আমার নাম লেখা। চিঠিগুলোর কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

ওরা তা হলে শুরু থেকেই এগুলোর কথা বলতে চাইছিল। মারাত্মক প্রমাণ! অকাট্য প্রমাণ! অ্যাবসোলিউট প্রুফ!

হাসি পেয়ে গেল আমার। হোমিসাইড স্কোয়াড এখনও আমাকে ততটা চিনতে পারেনি। চিনতে পারলে জোয়ারদারবাবু একেবারে তাজ্জব হয়ে যাবে।

আমার ঠোঁটের এক চিলতে হাসি বোধহয় জোয়ারদারের নজরে পড়েছিল। ও খানিকটা বাঁকা সুরে জিগ্যেস করল, 'কী, এবার শ্রাবন্তী সেনকে মনে পড়েছে তো! নাকি এখনও বলবেন এই চিঠিগুলো আপনার লেখা নয়?'

অতিচালাক গোয়েন্দার চোখে সরাসরি তাকিয়ে আমি হেসে বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন। শ্রাবন্তী সেনকে আমি চিনি না। আর এই চিঠিগুলোও আমার লেখা নয়।'

'চিঠির শেষে আপনার নাম আছে—।'

'কলকাতা শহরে আমি একাই অমিত নই। ভালো করে খোঁজ নিন, শ্রাবন্তী কোন্ অমিতের সঙ্গে প্রেম করত।'

আমার আত্মবিশ্বাস জোয়ারদারকে একটা ধাক্কা দিল। কিন্তু পেশাদার হওয়ার জন্যেই কয়েক লহমায় সেটা সামলে নিয়ে ও বলল, 'ঠিক আছে, সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না তখন আঙুল একটু-আধটু বাঁকাতেই হবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জোয়ারদারঃ 'এর মধ্যে যে-কোনও একটা চিঠি আপনি বেছে নিন, মিস্টার মজুমদার।'

আমি কথা না বাড়িয়ে দু-পৃষ্ঠার একটা চিঠি বেছে নিলাম। বাকি চিঠিগুলো রেখে দিলাম টেবিলের ওপরে।

সামনে আঙুল তুলে আমার পিছনে দাঁড়ানো বর্ধনকে নির্দেশ দিল জোয়ারদার, 'বর্ধন, ওঁকে কাগজ-কলম দাও—।'

বর্ধন যন্ত্রের মতো নিঃশব্দে এবং ক্ষিপ্রতায় কাগজ-কলম আমার সামনে এনে দিল।

টেবিলের ওপাশে পায়চারি করতে-করতে জোয়ারদার বলল, 'মিস্টার মজুমদার, ওই চিঠিটা আপনি চারমিনিটের মধ্যে কপি করে দিন। তারপর প্যাটার্ন কমপেয়ারেটরে চিঠি দুটো দিয়ে আমরা দেখে নেব দুটো হাতের লেখায় শতকরা কতটা মিল, আর কতটাই বা গরমিল।'

আমি ভয় পেলাম। এখনই এখানে বসে চিঠিটা কপি করতে হবে এটা আঁচ করতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, ওরা পরে কোনওসময় আমার ফ্ল্যাট সার্চ করে আমার হাতের লেখার স্যাম্পল নিয়ে এসে এই চিঠির সঙ্গে তুলনা করে দেখবে।

জোয়ারদারকে বললাম, 'আমার আঙুলে ব্যথা আছে। এখন লিখতে আমার অসুবিধে আছে।'

পায়চারি করতে-করতে থমকে দাঁড়াল জোয়ারদার, হিসহিস করে হেসে উঠে বলল, 'আই গট য়ু, ম্যান। আমাকে চালাকিতে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। এখনও বলছি, মিস্টার মজুমদার, আপনি কনফেস করুন, তা হলে শুধু-শুধু আপনাকে আর টরচার করব না। নাউ, কাম অন—।'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি, মিস্টার জোয়ারদার—' আমি একরোখা গলায় জবাব দিলাম, 'আমি বলেছি, আজ এখন আমার লিখতে অসুবিধে আছে। আশা করি কাল-পরশুর মধ্যে

আমার আঙুলের ব্যথা সেরে যাবে—তখন আপনি যা বলবেন তা-ই লিখে দেব—নো প্রবলেম।'

জোয়ারদার গুম হয়ে গেল। একটু আগেই ওর চোখে-মুখে যে-হিংস্র উল্লাস ফুটে উঠেছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল পলকে।

আমি জানি, আমার জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিটি মুহূর্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে নেওয়া হচ্ছে। হাতের লেখা মিলিয়ে দেখার বর্তমান আইন অনুসারে জোয়ারদার আমাকে এখনই লেখার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। আমি লিখতে গররাজি হলে অন্য কথা। কিন্তু আমি শুধু দু-একদিন সময় চেয়েছি।

আসলে দু-একদিন নয়, আড়ালে দশমিনিট সময় পেলেই আমার কাজ হয়ে যাবে। আমারই ভুল। চিঠিগুলোর কথা আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বিকল্প পথ জানা আছে বলেই বোধহয় ব্যাপারটা আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি।

'আপনি তা হলে এখন লিখবেন না?'

'না—আমার আঙুলে ব্যথা।'

'কাল সন্ধেবেলা কি আপনার অসুবিধে হবে?'

'মোটেই না। কখন আসতে হবে বলুন—।'

'রাত আটটার সময় বিশ্বাস আর বর্ধন আপনাকে নিয়ে আসবে। বাট ডোন্ট টাই এনি মাঙ্কি টিক। চালাকি ধরে ফেলা আমার হবি, মিস্টার মজুমদার—।'

আমি হাসলাম, বললাম, 'আপনি মিছিমিছি আমাকে সন্দেহ করছেন, জোয়ারদারবাবু। তা ছাড়া আমি জানি, চালাকি করে আপনার সঙ্গে পারব না।'

জোয়ারদারের চোখ ছোট হল, চোয়ালের রেখা স্পষ্ট হল। বুঝতে পারলাম, আমার 'জোয়ারদারবাবু' বলার ঢঙটা ওর পছন্দ হয়নি।

এরপর ঘরে ফেরার পালা।

বিশ্বাস আর বর্ধন যত্ন করে আমাকে বাড়ির সামনের রাস্তায় ছেড়ে দিল।

আমি আবার ফিরে গেলাম সুচরিতার কাছে।

আমার ফেরার শব্দ পেয়ে ও জেগে উঠল। আমাকে হাত ধরে টেনে নিতে চাইল বিছানায়। 'উঁ—উঁ—ম্—ম্' করে আদুরে শব্দ করল আলতো গলায়।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, 'একমিনিট, সুইটি—একটু টয়লেট থেকে আসছি—।'

টয়লেটে গিয়ে অটোমেটিক কোলোন স্প্রেয়ারের সামনে দাঁড়ালাম। সুগন্ধী ঠান্ডা বাতাস আমাকে ভাসিয়ে দিল। আমি চোখ বুজে শ্রাবন্তীর কথা ভাবতে লাগলাম।

একমাত্র ওকেই আমি ভালোবাসার চিঠি লিখেছি—আর কাউকে না। আমার ভেতরের পাগলটা শুধু ওকেই ভালোবেসে ফেলেছিল। আর সবাই ছিল ওর কাছে একরাত বা কয়েক রাতের সঙ্গিনী। রাত ফুরোলেই সব ভালোবাসা শেষ। সুচরিতাও তাই। আর কাউকে আমি ভালোবাসার চিঠি লিখব না।

যদিও বা লিখি, শ্রাবন্তীকে লেখা চিঠির মতো হাতের লেখায় লিখব না। লিখব অন্য কোনও নতুন হাতের লেখায়।

কোলোন স্প্রেয়ার বন্ধ করে দেওয়ালে লুকোনো একটা ক্যাবিনেটের দরজা খুললাম। আমার সামনের তাকে এখন অনেকগুলো মেগা স্কেল ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রোচিপ। মাথার চুলের ভেতরে হাত চালিয়ে ছোট্ট ধাতব প্লেটটা সরিয়ে দিলাম। মাথার ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে খুব সতর্কভাবে একটা চিপ বেস থেকে খুলে নিলাম। সেটা তাকে রেখে দিয়ে নতুন একটা চিপ তুলে নিলাম। তার নম্বরটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে সাবধানে সেটা বসিয়ে দিলাম মাথার ভেতরে। তারপর ধাতব ঢাকনা টেনে বন্ধ করে দিলাম।

ব্যস, আর কোনও চিন্তা নেই। আমার হাতের লেখা এবার বদলে যাবে।

আমাদের হাতের লেখার ধরন মস্তিষ্কের যে-অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই চিপটা অনেকটা যেন তারই বিকল্প। সতেরো বছর বয়েসে অপারেশানের সময় আমার মাথার ভেতরে একগাদা চিপ বসানো হয়েছিল। তার কয়েকবছর পর হার্ডওয়্যারে গবেষণা করার সময় এ ধরনের মাইক্রোচিপ আমি হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম। আর তারই একটা দিয়ে বিশেষ ধরনের সার্কিট তৈরি করে বসিয়ে দিয়েছিলাম আমার মাথার ভেতরে।

বিভিন্ন হাতের লেখার ধরনের জন্যে সারকিট ডিজাইন করার বিভিন্ন চিপ পাওয়া যায়। সেই চিপটা পালটে নিলেই আমার হাতের লেখার ধরন পালটে যায়।

সুতরাং আর আমি জোয়ারদার অ্যান্ড কোম্পানিকে ভয় পাই না।

আমার সিরিয়ালের বারো নম্বর এপিসোডের জন্যে মনে-মনে তৈরি হয়ে আমি টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলাম।



অলীক কথামালা

গোটা ব্যাপারটা ঠিক কবে থেকে যে শুরু হল অসিত তাই ভাবছিল। গলার কাছটায় যে ব্যথা সেটা প্রথম ও টের পেল কবে? এটুকু মনে আছে, কানের ব্যথাটা শুরু হয়েছিল গলার ব্যথার ঘণ্টাকয়েক পরেই। তারপরে দুটো ব্যথাই একেবারে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে নতুন উপসর্গ হিসেবে শুরু হল এই আশ্চর্য ঘটনা...।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়েই অসিত টের পেল ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। নানারকম কায়দায় নতুন ধরনের নানা চুমুক দিয়ে ও চায়ের কাপ শেষ করল। না, ব্যথাটা মোটেই মিলিয়ে গেল না। মুখটা বিচ্ছিরিরকম তেতো লাগছিল।

বাবা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে রোজকার মতো মাঠে পায়চারি করতে বেরিয়ে গেছে। ফেরার সময় কারও খেত-বাগান থেকে টুকিটাকি শাকসবজি যা পারে ম্যানেজ করে ফিরবে। নিতান্ত না কিনলেই নয় এমন জিনিস ছাড়া বাবা কিছু কেনে না। আর অসিতকেও বাজার-টাজারের দায়িত্ব কখনও দেয় না। একে ম্যানেজ-মাস্টার, তার ওপর হাড়কেপ্পন। অসিত জানে, পাড়ার কেউ সাতসক্কালে বাবার মুখ দেখতে চায় না। সুবু, ভোলা, নদে ওরাও কি কম বলতে ছাড়ে অসিতকে! বলে, তোর বাপটা মাইরি সেফ ডিপোজিট ভল্ট। পিঁপড়ের চাষ করে গুড়ের ব্যাবসা করলে পারত।

অসিত সবই হজম করে। বাবাকে কখনও কিছু বলে না। ও জানে, বাবা ম্যানেজ-মাস্টার হতে পারে, হাড়কেপ্পন হতে পারে, কিন্তু সংসারের চাকাটা ঘুরিয়ে তো যাচ্ছে! একার পেনসনের পয়সায় চাকা ঘুরতে চায় না, গোল চাকা তেকোণা হয়ে যেতে চায়, তবু ঘোরাচ্ছে তো!

মালা এসে চায়ের কাপটা নিয়ে গেল। বলে গেল, দাদা, তোকে সুবুদা একটু আগে ডাকতে এসেছিল। তুই ঘুমোচ্ছিলি। তোকে সীতেশবাবু দেখা করতে বলেছে—চায়ের দোকানে।

খাটে বসে-বসেই মালার চলে যাওয়া দেখল অসিত। এবারে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে। তবে বাবা বোধহয় আর পড়াতে পারবে না। অসিত একবার মিনমিন করে বাবাকে বলতে গিয়েছিল এ ব্যাপারে। বাবা সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত তো আমি পড়ালাম, এবারে তুমি দ্যাখো—কিছু একটা ব্যবস্থা করো।

অসিত চলে এসেছিল। ও কী ব্যবস্থা করবে? না আছে পেটে বিদ্যে, না আছে পকেটে পয়সা। ইস, মালার যদি চট করে বিয়ে হয়ে যেত! ওকে দেখতে তো ভালোই। দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পায় না, তবু স্বাস্থ্য দেখলে অবাক হতে হয়। সত্যি, অসিতের কিছু একটা করা উচিত।

খাট থেকে উঠে দেওয়ালের পেরেক থেকে জামাটা নিল অসিত। তখনই খাটের মাথার দিকের জানালা থেকে মিষ্টি শিসের শব্দ শুনতে পেল। দোয়েল ডাকছে। জানলার বাইরের খোলা জমিতে কয়েকটা করবী, শিউলি, আর একটা বড় লেবু গাছ আছে। পাখিটা প্রত্যেক বছর এই সময়টায় এসে আশেপাশে কোথায় যেন বাসা বাঁধে। একটা মাস গলা ফাটিয়ে শিস দেয়—তারপর কোথায় উধাও হয়ে যায়। অবশ্য একটাই পাখি প্রতি বছর আসে কিনা কে জানে! তবে দেখে অসিতের তাই মনে হয়। সে যাই হোক, বিনিপয়সায় দোয়েলের ঘুমভাঙানি গান—এ যে রাজার কপালেও জোটে না!

জামাটা গায়ে গলাতে-না-গলাতেই বাইরে থেকে ডাক শুনতে পেল অসিতঃ সিতু—অ্যাই, সিতু—।

অসিত বেরিয়ে এল। কলতলায় হাত-মুখ ধুয়ে নিল। বাইরের বারান্দায় মা রোজকার মতো রেডিমেডের সেলাই শুরু করে দিয়েছে। পুরোনো মেশিন ছ্যাকরাগাড়ির মতো শব্দ তুলে ঘড়ঘড় করে ঘুরছে। একপাশে উনুনে আগুন দিচ্ছে মালা। ধোঁয়ায় অসিতের চোখ জ্বালা করছিল। দেখল সুবু দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই বলল, কী বে শালা, এই ঘুম ভাঙল?

অসিত চোখ কুঁচকে ইশারা করে মায়ের দিকে দেখাল। সুবুটার বড্ড মুখ খারাপ।

ও রাস্তায় নেমে এল। সুবু বলল, সেই সক্কাল থেকে সীতেশদা তোকে খোঁজ করছে—দীনুদার চায়ের দোকানে বসে আছে।

ওরা দুজনে জলদি পা চালাল।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে। কয়েকটা বাচ্চা সাদা-সবুজ পোশাক পরে পিঠে-হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। উলটোদিক থেকে আসা দুটো সাইকেল রিকশা ওদের পেরিয়ে গেল। তার পিছনেরটায় আলোবউদি বসেছিল। ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। চলন্ত রিকশা থেকেই অসিতকে দেখল আলোবউদি। হাসল। রিকশাগুলো প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে এগিয়ে গেল।

সুবু অসিতের পিঠ চাপড়ে দিল, বলল, তোর কপাল আছে মাইরি!

অসিত মনে-মনে মজা পেল। সুবুরা ভাবে আলোবউদির সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু আসলে তা নয়। আলোবউদির বোন নীলা এ-পাড়ায় দিদির সঙ্গেই থাকে। অসিত নীলার সঙ্গে কথা-টথা বলতে ওদের বাড়িতে যায়। সেইসঙ্গে তাপসদা আর আলোবউদির সঙ্গেও আড্ডা দেয়, চা খায়। আর তাপসদা সিগারেট দিলে খায়।

একটু পরেই নীলাদের বাড়ির কাছে এসে গেল ওরা। ছোট দোতলা বাড়ি। গ্রিলের রেলিং দেওয়া সুন্দর বারান্দা। আর সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দর নীলা। গায়ে-পায়ে একটা গোলাপি ম্যাক্সি। সকালের বাতাসে ঘাঘরা হয়ে উড়তে চাইছে।

তাপসদার বাড়িটা নতুন। বছরচারেকের মতো বয়েস। পাড়ার সকলেই জানে তাপসদা কীভাবে এই বয়েসে বাড়ি করেছে। তাপসদা রেল কোম্পানির স্টোরে চাকরি করে।

সুবু মাথা উঁচু করে নীলাকে দেখল। অসিতকে টেনে বারান্দার একেবারে নীচ দিয়ে হেঁটে যেতে চাইল। অসিত ওর মতলব বুঝতে পারল। নীচ ঘেঁষে হেঁটে যেতে যেতে সুবু মুখ তুলে নীলার ম্যাক্সির দিকে দেখবে।

ও সুবুর হাত ধরে টান মারল। সুবু ছিটকে ওর কাছে সরে আসতে-আসতে বলল, যাঃ শালা!

নীলা তখন ওপর থেকে অসিতকে দেখছিল। অসিত ওর দিকে তাকাল। ঠোঁটে দুটো আঙুল ছোঁয়াল। নীলা চোখ ছোট করে এক চিলতে হাসল। ওর মুখে এখনও ঘুমের ছাপ। অসিত মাথায় আঙুল চালিয়ে চুল পরিপাটি করার চেষ্টা করল। ইস, জামাটা কেমন ময়লা লাগছে! পাজামাটাও কাচব-কাচব করে কাচা হয়নি। মুখে-গালে অকারণেই হাত চালাল। দাড়ির খোঁচা টের পাওয়া যাচ্ছে।

ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছিল। অসিত ঘাড় ঘুরিয়ে নীলাকে দেখল আর একবার। সুবু বলল, কী বে, কাটা পোনা চারা পোনা দুটোই খাবি?

অসিত বলল, কী ফালতু বকছিস!

এমনসময় বাঁকের মুখে দীনুদার দোকানটা দেখা গেল। দোকানের কাছ ঘেঁষে একটা ছাইরঙা অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে আছে। অসিত গাড়িটা চেনে। গজেন দাসের গাড়ি। স্টেশন রোডের কাছে ইট-চুন-সুরকির বড় দোকান আছে। তা ছাড়া কাকটরির কাজ করে। লোকটা কি চা খেতে এসেছে না দেখা করতে এসেছে সীতেশদার সঙ্গে?

সীতেশদা চায়ের দোকানে বসেছিল। পাটভাঙা পাঞ্জাবি-পাজামা গায়ে। চুল তেলতেলে—টানটান করে আঁচড়ানো। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে। কথাবার্তা বলে ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে। সীতেশদা কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকে পাড়ার অনেক রাস্তা

সারানো হয়েছে, অনেক টিউবওয়েল বসেছে এখানে-ওখানে। এই বর্ষায় নানা গাছপালা, চারা, লতা বসানো হয়েছে, আর কুণ্ডুদের ইট ভাঁটার একপাশে পাঁচিল ঘিরে তৈরি হয়েছে শিশু উদ্যান।

সীতেশদা চায়ের কাপে চুমক দিচ্ছিল। গজেন দাস সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। কী যেন বলছিল সীতেশদাকে। বোধহয় অনুনয়ের সুরে কোনও আর্জি পেশ করছিল। রোগাটে চেহারায় বাবরি চুল আর রিমলেস চশমা। ঠোঁটে পানের লাল ছোপ। দেখে হঠাৎ করে কীর্তনিয়া মনে হয়। নদে বলে, ও ব্যাটা বহু মেয়ের কেত্তন করে দিয়েছে।

অসিত আর সুবুকে দেখে সীতেশদা হেসে বলল, আয়, আয়। তোর ঘুম ভাঙল?

অসিত হাসল চোখ নামিয়ে। সুবু ওকে ঠেলে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল, নিজেও বসল। অসিত জানে সীতেশদা এখন ওকে কী বলবে। কিন্তু জুতসই কোনও জবাব যে ওর কাছে নেই! বাপটা খালি ম্যানেজ করার ধান্ধায় ঘোরে, অথচ সীতেশদাকে ম্যানেজ করতে পারছে না। পাড়ার যত ম্যাঁও সামলাতে হবে এই অসিতকে।

গজেন দাস তখন হাত-পা নেড়ে চোয়াল নাড়তে-নাড়তে বলছিল, ও আপনি কিছু ভাববেন, না সীতেশবাবু। যা-যা লাগবে আমি পাঠিয়ে দেব। আমি আপনার সঙ্গে আছি—নো প্রবলেম।

হেসে নমস্কার করে গজেন দাস গাড়ি নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় নির্মল পরিবেশে একরাশ কুৎসিত কালো ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে গেল।

সীতেশদা দীনুদাকে বলল, দীনুদা, দুটো চা দাও ওদের—।

পাড়ার হাই-স্কুলের ইতিহাস স্যার পরিমলবাবু দোকানের ভেতরদিকটায় বসে চা খাচ্ছিলেন, আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সুবু অসিতকে দেখে হঠাৎই যেন উঠে পড়লেন। কাগজ রেখে চায়ের দাম দিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে সীতেশদাকে একবার দেখলেন। সীতেশদা পরিমল স্যারের ছাত্র ছিল। অসিত নিজেও।

সীতেশদা অসিতকে বলল, কী রে, আমার ওই ব্যাপারটার কী হল?

অসিত অনেকক্ষণ ধরেই মনে-মনে একটা উত্তর খাড়া করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওদের বাড়িটা পুরোনো—ঠাকুরদার আমলের। একতলা মাথা গোঁজার ওই ঠাঁইটা ছিল বলেই বাড়ি ভাড়া গুনতে হয় না। বাবা সবসময় এই কথাটা শোনায়। তবে সমস্যাটা বাড়ি নিয়ে নয়—বাড়ির লাগোয়া একফালি জমিটা নিয়ে। একসময়ে ওটায় বাগান ছিল। অসিত শুনেছে, বিয়ের পরে মা ওখানে বাগান করেছিল। তখন বাবারও শখ ছিল। পরে যতই দিন গড়িয়েছে বাঁচার লড়াইয়ের তাপে শখ ততই শুকিয়ে গেছে। ফলে এখন পুরোনো যে-ক'টা গাছ টিকে গেছে, আর নিজে থেকেই যে দু-চারটে গাছ বা আগাছা হয়েছে তাই নিয়েই খুশি থাকে

এককালের বাগানটা। বর্ষায়-বসন্তে সেজেগুজে ফুলেফেঁপে ওঠে। আর বাকি সময়টা হাঁপানি ধরা বুড়ির মতো হাঁপায়। সীতেশদা ওই জমিটুকু ব্যবহার করতে চাইছে বহুদিন থেকে।

সীতেশদা কাউন্সিলর হয়েছে মাসছয়েক। তার আগে পাড়াতেই ক্লাব-টাব নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আর ক্লাবের নাম করেই নানারকম মহিলা সমিতি, বেকার যুবক কমিটি, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি তৈরি করেছিল। পরে ক্লাব উঠে গেছে, কিন্তু ওইসব সমিতি বা কমিটিগুলো দিব্যি টিকে থেকেছে। তখনই সীতেশদা অসিতকে বলেছিল, সিতু, তোদের বাড়ির লাগোয়া ওই পোড়ো জমিটা আমাদের সংগঠনের কাজের জন্যে দরকার। ঘর-টর আমরাই করে নেব—ভাড়াও দেব। তুই একটা ব্যবস্থা কর।

ক্লাব করার সময়েও সীতেশদা জমিটা চেয়েছিল। বলেছিল, ওখানে ফ্রি কোচিং সেন্টার, ব্যায়ামাগার, চিকিৎসা কেন্দ্র, লাইব্রেরি—আরও কত কী করবে। কী করে যে ওই এক চিলতে জায়গায় এতগুলো জনহিতকর কেন্দ্র খোলা সম্ভব তা অসিতের মাথায় ঢোকেনি। তবু ও বলেছিল ব্যাপারটা বাবাকে জানাবে।

কথাটা বাবাকে বলামাত্রই আগুন জ্বলে উঠেছিল। বাবা এমনিতেই সবসময় অসিতকে যা-নয়-তাই বলে। সেদিন বাবার আর কোনও জ্ঞান ছিল না। মা সবসময় চুপচাপ থাকে, রেডিমেডের সেলাই করে একমনে। সেই মা-ও সেলাই ফেলে ছুটে এসেছিল। কোনওরকমে থামিয়েছিল বাপ-ছেলের ঝগড়া।

অসিতের বক্তব্য ছিল, জমিটা তো এমনিতে পড়েই রয়েছে। তা হলে ভাড়া দিলে ক্ষতি কী! মাসে-মাসে টাকা পাওয়া যাবে। এ-কথা শুনে বাবা খেপে উঠেছিল। বলেছিল, কক্ষনো নয়। পৈতৃক ভিটের এক কণাও আমি ভাড়া দেব না। তার ওপর ওদের দিলে দুনিয়ার ছোকরাগুলো দিনরাত্তির এখানে পড়ে থাকবে, হইহুল্লোড় খিস্তিখেউড় করবে...মালা বড় হচ্ছে সে খেয়াল কি রাখো? সবসময় তো তোমার সীতেশদার এঁটুলি হয়ে টোটো করছ—।

সীতেশদাকে বাবার আপত্তির কথা জানিয়েছিল অসিত। সঙ্গে-সঙ্গে সীতেশদার মুখ থেকে পেটেন্ট হাসির ছোঁওয়াটা মিলিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলো আজেবাজে রেখা মুখটাকে বিচ্ছিরি করে দিয়েছিল। চাপা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে সীতেশদা বলেছিল, ঢ্যামনাটাকে রাজি করাতে পারলি না। দাঁড়া, দেখছি...।

বাবাকে অসিত পছন্দ করে না ঠিকই, কিন্তু সীতেশদার চাপা কথাটা শুনে ওর ভীষণ খারাপ লেগেছিল। তক্ষুনি ক্লাবের একটা ছেলে, অপু, বলেছিল, তুমি ভেবো না, সীতেশদা। ও আমরা ম্যানেজ করে নেব।

অসিত লক্ষ করেছিল, ক্লাবের যারা-যারা ওর বন্ধু তাদের অনেকেই হঠাৎ অপরিচিতের চোখে তাকিয়েছিল অসিতের দিকে।

অসিত চলে এসেছিল, এবং তারপর থেকেই ও ক্লাব থেকে কেমন যেন দলছুট হয়ে যাচ্ছিল। এরপর মালা একদিন ওকে বলেছিল, পাড়ার কিছু ছেলে ওকে দেখে অশ্লীল ইশারা করে, মন্তব্য করে। আগে এমন করত না। অসিত বুঝতে পারছিল সব, কিন্তু মালাকে কিছু বলতে পারেনি।

এইভাবে যখন আলাদা হতে-হতে ও সীতেশদার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে তখন একদিন সীতেশটাই বাড়িতে এসে পিঠ চাপড়ে ওকে আবার ডেকে নিয়ে গেছে। বলেছে, ওর চাকরির একটা ব্যবস্থা করে দেবে, আর বেকার যুবকদের ব্যাবসা করার জন্য যে-সরকারি লোন দিচ্ছে সেটাও ম্যানেজ করে দেবে।

তারপর থেকেই আবার আগের মতো হয়ে যেতে চেয়েছে অসিত। মালাও ওকে আর কোনও অসুবিধের কথা বলেনি।

ভোটে জিতে সীতেশদা কাউন্সিলর হওয়ার পর ওরা যখন উৎসব করছিল, তারই মধ্যে ভোলা হঠাৎ ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলেছিল, সিতু, এবারে জমিটার ব্যবস্থা করে দে। নইলে সীতেশদার খুব অসুবিধে হবে।

অসিত অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই শুরু। তারপর থেকে অপু, সুবু, নদে ওরা ওকে নিয়মিত তাগাদা দিয়েছে। আর গত সপ্তাহে সীতেশদা হাসি মুখে ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছে, সিতু, এবারে যাহোক একটা ব্যবস্থা কর। নইলে আমাদের কাজকর্মে অসুবিধে হচ্ছে। ফলে পাড়ার লোকেও সাফার করছে। তোরা তো শুধু-শুধু জমিটা ফেলে রেখেছিস...।

অসিত শান্তভাবে বলেছিল, বাবাকে বলব।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে সে-কথা বাবাকে আর বলেনি। জানে, বলে কোনও লাভ নেই। সুতরাং দিনের-পর-দিন ওই একটা কথা শুনে-শুনে অসিতের কান যেন ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। ও ভাবছিল, ওরা তো সরাসরি বাবাকে বলতে পারে। সীতেশদা একবার এমন কথা বলেও ছিল, তুই যখন পারলি না, তখন আমরা একবার বলে দেখি। কিন্তু তখন অসিতই বারণ করেছিল। কারণ ও জানত, বাবা একইরকম খেপে উঠবে। উলটোপালটা কথা বলবে। সেসময়ে যদি অপু, নদে ওরা পালটা অসম্মান করে বাবাকে! কিংবা হাত চালিয়ে দেয়...

অসিতের মাথাটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। কী করবে, কী করা উচিত ভেবে উঠতে পারছিল না। অথচ সীতেশদা যেরকম অধৈর্য হয়ে উঠছে, তাতে...।

সীতেশদা চশমার কাচ মুছে আবার জিগ্যেস করল, কীরে, সিতু, আমার ওটার কী করলি বল?

দীনুদা চা দিয়েছিল। সুবু চায়ে শব্দ করে চুমুক দিল। অসিত যেন সময় কাটাতেই চায়ের কাপে ঠোঁট নামাল। সুবু সীতেশদাকে লুকিয়ে অসিতের গা টিপল।

সীতেশদা আবার বলল, জানিস তো জমি ফেলে রাখাটা অন্যায়। তোদের জমিটা ওরকমভাবে প্রায় বিশবছর পড়ে আছে। বিশবছরে ওই জমিটুকুতে কতটা ধান হত জানিস? কতগুলো লোক খেয়ে বাঁচতে পারত বল!...আসলে তোরা দেশের কথা কিছু ভাবিস না। স্বার্থপর।

অসিতের গলার ব্যথাটা বেড়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে ওর কথা কেমন জড়িয়ে গেল। ও কোনওরকমে বলল, কালকে ফাইনাল বলব, সীতেশদা।

ওর বিচিত্র স্বরে সীতেশদা চমকে উঠল। ভালো করে দেখল রোগা ছেলেটাকে। তার সঙ্গে ইয়ারকি মারছে নাকি? অবশ্য মুখ দেখে তা মনে হল না।

সীতেশদা বলল, কালকের পর কিন্তু আমার ছেলেরা আর ওয়েট করতে পারবে না। ওরা ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুই যা ল্যাজে খেলাচ্ছিস...। আচ্ছা, তোর বোনটা এখন কী করছে?

হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে বসে আছে। আর পড়বে না।

অসিতের কথায় সুবুও চমকে উঠল। এর মধ্যেই অসিতের গলাটা কেমন পালটে ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেছে। কোনও কথা জোরে বেরোচ্ছে, কোনওটা আস্তে।

সীতেশদা বলল, ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। গজেন দাসের একজন অফিস সেক্রেটারি দরকার। আমাকে বলছিল। আমি একটা চিঠি দিয়ে মালাকে—মালাই তো নাম তোর বোনের?—মালাকে পাঠিয়ে দেব। দ্যাখ, যদি একটা হিল্লে হয়ে যায়।

অসিত আপত্তি জানিয়ে কী একটা বলতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল বলে মনে হল না। ও চা শেষ করে ঘাড় নেড়ে উঠে পড়ল। সুবু বসেই রইল।

চলে আসতে-আসতে অসিত দেখল, সীতেশদা সুবুকে কী যেন বলছে, আর ওরা দুজনেই তাকিয়ে আছে অসিতের দিকে।

বাড়িতে ঢোকার সময়েই অসিত টের পেল কান দুটো ব্যথা করছে। ছোটবেলায় মাঝে-মাঝে ওর কানে ব্যথা হতো। কটকটানি ব্যথা। কিন্তু এ-ব্যথার ধরনটাই অন্যরকম। ঠিক বোঝানো যায় না।

ওকে ফিরে আসতে দেখে মালা অবাক হল। সাধারণত অসিত দশটা-এগারোটায় ফেরে। তখন রুটি-তরকারি বা যা হোক কিছু মুখে গুঁজে টিফিনটা সেরে নেয়। তারপর সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বেরিয়ে যায়। ওর স্নান বা দুপুরের খাওয়ার সময় দেড়টা-দুটো।

মালা বারান্দায় তোলা উনুনে রান্না করছিল। মায়ের মেশিন একইরকমভাবে চলছে। অসিত কোনও কথা না বলে সোজা ঢুকে গেল নিজের ঘরে। জামাটা খুলে শুয়ে পড়ল আবার। কানের ব্যথাটা বাড়ছে। গলাটাও কেমন অদ্ভুত জ্বালা করছে। অসিত ক্রমশ ভয় পেয়ে যাচ্ছিল।

জানলা দিয়ে গাছের ডাল-পাতা দেখা যাচ্ছে। দোয়েল পাখিটা লেজ খাড়া করে ডাল থেকে ডালে লাফাচ্ছে। শিস দিচ্ছে। কিন্তু শিসের শব্দটা কেমন বিচিত্র শোনাচ্ছে না! অসিত দু-হাতে কান চেপে ধরল কিছুক্ষণের জন্য। দোয়েলটা যে-গাছে বসে আছে, সেই গাছের শেকড় ছড়িয়ে রয়েছে ওর পিতৃপুরুষের ভূমির অন্তরে। কালই সীতেশদাকে একটা স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে। উত্তর যদি সীতেশদার মনের মতো না হয়, তা হলে...।

মালা এসে ঘুরে ঢুকল। হাতের থালায় রুটি তরকারি। বলল, কী রে, দাদা, শুয়ে আছিস যে! খাবি না?

অসিত বলতে চাইল, আমার শরীর ভালো নেই। কিন্তু কথাগুলো কেমন অদ্ভুত শোনাল। তা ছাড়া আরও একটা জিনিস খটকা লেগেছে অসিতের। মালার বলা কথাগুলোও ওর কানে অন্যরকম শুনিয়েছে। কেমন যেন তীক্ষ্ণ, ধাতব, জড়ানো স্বর।

অসিত মাথা নাড়ল। কোনওরকমে বলল, গলায় কানে অসহ্য ব্যথা। ডাক্তার...ডাক্তার...। তারপর দু-হাতে আবার কান ঢাকল। চোখ বুজে ফেলল একইসঙ্গে।

এইভাবে শুয়ে থাকতে-থাকতে কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল মালার ধাক্কায়। মালা ওকে ডেকে-ডেকে কী যেন বলছে। অসিত সে-কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারছিল না। অসিত মালার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। কথা না বুঝতে পারলেও ও মালার ইশারা আঁচ করতে পারছিল। তাই জামাটা গায়ে দিয়ে নিল। মালা ওর কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর হয়েছে কি না। পরীক্ষা করে যেন স্বস্তি পেল। তারপর অসিতকে একরকম জোর করেই একটা রুটি আর তরকারি বলতে গেলে খাইয়েই দিল।

মা এসে ঘরে ঢুকল। কী যেন বলল মালাকে। কুড়িটা টাকা দিল ওর হাতে। মালা সেটা ব্লাউজের ফাঁকে গুঁজে দাদাকে নিয়ে বাইরে এল।

বাবা কলতলায় স্নান করছিল। মাথায় জল ঢালা থামিয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে কিছু বলল। মালা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অসিতকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

বেলা প্রায় বারোটা হলেও ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর নেই। একটা মেঘের পরত সূর্যকে প্রশমিত করে রেখেছে। একটা রিকশো ডেকে মালা অসিতকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। কোথায় যাবে বলতেই রিকশোর চাকা ঘুরতে শুরু করল।

সকালে দাদার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল মালা। তখনই ও রাস্তায় বেরিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে ভোলাকে খবর দিয়েছিল। ভোলা যে মালার ব্যাপারে দুর্বল তা মালা জানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোলা অপুকে নিয়ে হাজির হয়েছিল। তারপর মালাকে নিয়ে গিয়েছিল সীতেশদার কাছে। সীতেশদাই একেবারে শশব্যস্ত হয়ে নামজাদা এক ই-এন-টি স্পেশালিস্টকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে দিয়েছে। বলেছে, দুপুরে উনি বাড়িতে লাঞ্চ করতে আসেন। আমার চিঠি দেখালে সিতুকে দেখে দেবেন। আর তুমি আমাকে এসে বলে যেয়ো সিতু কেমন আছে। মাঝে-মাঝে এসো আমার এখানে—যোগাযোগ রেখো।

ডাক্তারবাবু নানানভাবে পরীক্ষা করলেন অসিতকে। বিভিন্ন মাপের টিউনিং ফর্ক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে অসিতের কানের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, কপালে আর মাথায় ঠেকিয়ে নানান প্রশ্ন করলেন। কিন্তু অসিতের জড়ানো গলার উত্তর কিছু বোঝা গেল না। ও শুধু মাথা নাড়ছিল।

একইরকম বিশদভাবে অসিতের জিভ-গলা-নাক পরীক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু রহস্য পুরোপুরি যে ভেদ করতে পারলেন তা নয়। অসিতকে কাগজে লিখে তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর অসিতও কাগজে লিখে উত্তর দিতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা-চল্লিশমিনিট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু কপালে ভাঁজ ফেলে যা বললেন তা শুনে মালা চমকে গেল।

তিনি বললেন, আপনার দাদা শুধু আলট্রাসনিক শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। মোটামুটিভাবে কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার পর্যন্ত কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ মানুষ শুনতে পায়। আমার মনে হচ্ছে, এই রেঞ্জের কোনও শব্দই আপনার দাদা শুনতে পাচ্ছেন না। কী করে এরকম হল বুঝতে পারছি না। আরও কিছুদিন আপনারা দেখুন। তবে ওঁর নিজের কথা উনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন। অথচ আমরা একটুও বুঝতে পারছি না। তাতেই মনে হচ্ছে ওঁর ভোকাল কর্ডও আলট্রাসনিক রেঞ্জের ভাইব্রেশন জেনারেট করছে। তবে আরও ডিটেইল্ড পরীক্ষা বা অপারেশান ছাড়া শিয়োর করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আলট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ! মালা অবাক হয়ে ভাবছিল। মানুষ যেসব শব্দ শুনতে পায় না দাদা তাই শুনছে! যে-শব্দতরঙ্গে কোনও মানুষ কথা বলতে পারে না, সেই শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে আসছে দাদার গলা থেকে। এখন তা হলে কী হবে? কে বুঝবে দাদার কথা! দাদাও তো আর কারও কথা বুঝতে পারবে না। মালার কান্না পেয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, এগুলো সাধারণ ওষুধ। জ্বর-টর হলে বা ব্যথা হলে খাইয়ে দেবেন। পুরো ব্যাপারটা ঠিকমতো না বুঝে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। বলা যায় না, যেমন হঠাৎই এটা শুরু হয়েছে তেমন হঠাৎ করেই আবার নিজে থেকে সেরে যেতে পারে।

মালা টাকা দিতে গেলে ডাক্তারবাবু নিলেন না। সীতেশদা যখন চিঠি লিখে দিয়েছেন তখন টাকাপয়সার প্রশ্নই ওঠে না। সীতেশদাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছিল মালার।

অসিতকে নিয়ে রিকশোয় ফিরতে-ফিরতে মালার গাল বেয়ে দু-এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের উত্তরে অসিত লিখে জানিয়েছিল যে, ওর গলায় বা কানে আর তেমন ব্যথা নেই। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারা, বা কারও কথা শুনতে না পাওয়ার ব্যথা কি কম!

অসিত চুপচাপ রিকশোয় বসেছিল। ওর কোনওরকম শারীরিক কষ্ট হচ্ছিল না। বরং এই নিঃশব্দ জগৎটাকে ওর বেশ ভালো লাগছিল। অবশ্য পুরোপুরি নিঃশব্দ বলা ঠিক হবে না, কারণ গাছের পাতার মৃদু আন্দোলনের কম্পন এখন ওর অতি-সুবেদী কানের পরদায় ধরা পড়ছিল। কারা যেন সমবেতভাবে বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হাহাকার তুলছে, হায়! হায়!

একটা অদ্ভুত সুর অসিতকে চমকে দিল।

মনমরা হয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল ও। বাইরে সন্ধের অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে গেছে। ঘরে একটা টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে। ইলেকট্রিকের বিল যাতে কম ওঠে সেজন্য বাবা সব ঘরেই পঁচিশ বা চল্লিশ ওয়াটের বেশি বাল্‌ব লাগায় না। এতে মালার পড়াশোনার বড় কষ্ট হতো, কিন্তু উপায় কী!

এখন সেই ঘোলাটে আলোতেই ছুঁচোটাকে দেখতে পেল অসিত। দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে ইতিউতি ঘোরাফেরা করছে। আর আশ্চর্য! ওই কুৎসিত প্রাণীটির কাছ থেকেই না ভেসে আসছে সুরেলা ধ্বনি?

অসিত বিছানায় উঠে বসল। অবাক চোখে লক্ষ করত লাগল ছুঁচোটাকে। এতক্ষণ ও ভেবেছে যে, মোটামুটি নিঃশব্দ এক জগতে ও ঢুকে পড়েছে। অথচ, এই মুহূর্তে, এখন, ও কী অদ্ভুতভাবেই না মোহময় সুরের সন্ধান পেল। এই সুর এর আগে কখনও ও শুনতে পায়নি। যদিও ছুঁচো দেখেছে, বা তাদের বিশ্রী কিচকিচ শব্দও শুনেছে বারকয়েক।

ভ্রাম্যমাণ ছুচোঁটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছিল অসিতের। বলতে ইচ্ছে করছিল, তুই আমার দোয়েল পাখি।

ঠিক সেই সময়ে বাবা ঘরে ঢুকল। জামা খুলে দেওয়ালের পেরেকে ঝোলাতে গিয়েই ছুচোঁটাকে দেখল। এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্রী মুখে হিংস্রভাবে প্রাণীটার দিকে তেড়ে গেল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কীসব বলে উঠল অসিতকে। বলতেই থাকল।

বিছানায় বসে বাবাকে দেখছিল অসিত। কৃপণ বুড়ো মানুষটা অসিতের দিকে তাকিয়ে সার্কাসের ক্লাউনের মতো অঙ্গভঙ্গি করছে। তার কথা এক বর্ণও শুনতে পাচ্ছিল না অসিত। সেই জন্যই ওর

হাসি পেয়ে গেল। ওর হাসি দেখে বাবা আরও ক্ষিপ্তভাবে হাত-পা ছুড়তে লাগল। অসিত আর অপেক্ষা করল না। ধুত্তেরি, বলে বিছানা ছেড়ে উঠে জামা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় সাইকেল, সাইকেল রিকশা, লোকজনের ভিড়, খোলা দোকানপাট ইত্যাদি মিলে জমজমাট ব্যাপার। কিন্তু কোনও শব্দ নেই।

অসিত আপনমনে হাঁটতে লাগল। পথে একটা কুকুর দেখে সেটাকে 'হুস, হুস' করে তাড়াল। কুকুরটা অসিতের দিকে পিছন ফিরে থাকলেও ওর কথা বোধহয় শুনতে পেল। কারণ, ঘুরে তাকিয়ে চট করে পথ ছেড়ে সরে গেল।

চলতে-চলতে রাস্তার লোকগুলোকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল অসিত। কী বিচিত্রই না লাগছে! কোনও কথা শুনতে না পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাবভাব দেখে ঘটনাগুলো আন্দাজ করতে পারছিল ও। আর বেশ মজা পাচ্ছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে নীলাদের বাড়ির কাছে চলে এল ও। নীলাকে চেঁচিয়ে ডাকবে নাকি? ওদের একতলার ঘরগুলো অন্ধকার। দোতলায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় অসিত চিৎকার করে উঠল, নীলা, নীলা! শিগগির নেমে এসো! তোমাকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে!

অসিত জানত, ওর কথা ও নিজে ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। সেইজন্যেই এই খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কথাগুলো বলতে পেরে ওর তৃপ্ত হল। ভালোবাসার কথা এইভাবে বলতে পারলে কত ভালো লাগে। আচ্ছা, আর কেউ ছাড়া শুধু নীলা যদি ওর কথা শুনতে পেত, বুঝতে পারত, তা হলে!

নীলার কথা ভাবতে-ভাবতেই অসিতের সাহস বেড়ে গেল। ও ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। তাপসদা নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই। শুধু নীলা আর আলোবউদি রয়েছে। নীলা কি এখনও সেই সকালের ম্যাক্সিটা পরে রয়েছে? নাকি ওর সেই লাল ছাপা শাড়িটা?

একতলার অন্ধকার ঘরগুলো পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল অসিত। চলতে-চলতেই ও ইচ্ছে করে সুর তুলে নীলার নাম ধরে ডাকছিল। এখন নীলার নাম হাজারবার উচ্চারণ করতেও কোনও ভয় নেই।

এমনসময় অন্ধকার একটা ঘরের ভেজানো দরজা খুলে গেল। ঘর থেকে পা টিপে-টিপে বেরোল নীলা। সকালের গোলাপি ম্যাক্সিটা পরে রয়েছে ও। কিন্তু ও বেরিয়ে আসতে-না-আসতেই দুটো সবল হাত ওকে আবার টেনে নিল ঘরের মধ্যে। দরজার পাল্লাটা দেওয়ালে বাড়ি খেয়ে নড়ে গেল। অসিত জানে, ভালোবাসাবাসির শব্দ ওর শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু তবুও দেওয়ালে শরীর লেপটে দু-কানে হাত চাপা দিল ও। ওর বুকের ভেতরে পাহাড় ভাঙতে লাগল হুড়মুড়

করে। অসিত একশোতলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছিল অতলে। ওর কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু সেই কান্নার শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

অসিত অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এল বাইরে। তাড়া খাওয়া দিশেহারা একটা চিতল হরিণ ছুটোছুটি করছিল ওর বুকের বাগানে। ভাবছিল, শ্রুতি আর স্বরের মতো দৃষ্টিটাও যদি যেত তা হলে বেশ হতো।

নীলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনদিকে যে ও পা চালিয়েছিল তা ওর খেয়াল নেই। খেয়াল হল ভোলা ওর পিঠে হাত রাখতে।

অসিত দেখল, ও দীনুদার চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে। দোকানের কাছাকাছি একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। গাছের প্রাচীন কাণ্ড ঘিরে গোল বাঁধানো চাতাল। গজেন দাস ইট-সিমেন্ট-বালি দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। সেই চাতাল এখন জমজমাট। সীতেশদা সেখানে বসে রয়েছে মধ্যমণি হয়ে। আর তাকে ঘিরে নদে, সুবু, অপু—সবাই। অনেকের হাতেই চায়ের কাপ। তাতে চুমুক দিচ্ছে।

ভোলা ওকে সীতেশদার কাছে নিয়ে গেল। কী যেন বলল।

অসিত লক্ষ করল, সীতেশদাসুদ্ধ সবাই অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগল। সীতেশদা অসিতকে কী যেন জিগ্যেস করল। উত্তরে অসিত মাথা নাড়ল। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

মেঘলা আকাশ বাতাসের টুঁটি টিপে ধরেছে। চারপাশ থমথমে গুমোট। তার ওপর অসিতের নিঃশব্দ জগৎ আর সকলের তীক্ষ্ণ নজর। অসিতের একটা হাত ওর অজান্তেই গলায় চলে গেল।

কোথা থেকে একটা খাতা জোগাড় করে সীতেশদা ওকে লিখে প্রশ্ন করল, কেমন আছিস এখন?

অসিতও লিখে জবাব দিল, ভালো, খুব ভালো।

কেন যে ওই কথাগুলো ও লিখল! লিখতে গিয়ে অসিতের হাত কাঁপছিল। ওর বুকের বাগানে হরিণটা ছুটোছুটি করছিল তখনও।

কিন্তু ওর উত্তরটা সীতেশদা জোরে-জোরে পড়ে শোনাতেই আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। যদিও হাসির কোনও শব্দ অসিত শুনতে পাচ্ছিল না, তবুও ওর কান লাল হয়ে গেল। ও চেঁচিয়ে বলল, সীতেশদা, বিশ্বাস করুন, আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমার গলায়-কানে আর কোনও ব্যথা নেই।

অসিতের কথা কেউ বুঝল না। হাসতে-হাসতেই সীতেশদা লিখে প্রশ্ন করল, তোর বাপকে বলেছিলি আমার লাস্ট ওয়ার্নিং-এর কথা?

প্রশ্নটা পড়ে অসিত সীতেশদাকে আবার খুঁটিয়ে দেখল। সাদা কাগজে লেখা হরফগুলো কি এই লোকটার আঙুলগুলোই লিখল? এই লোকটাই না একদিন ঢ্যামনা বলেছিল অসিতের বুড়ো

বাবাকে?

অসিতের মাথার ভেতরে কেউ যেন এক লাথি মেরে সাজানো দাবার ছক উলটে দিল। ও চিৎকার করে উঠল, জান থাকতে শালা তোমাকে ওই জমি দেব না। আমাদের বাপ-ঠাকুরদার ভিটেয় শালা তুমি ঘুঘু চড়াবে ভেবেছ? লেতা হয়ে পাবলিকের হোগায় বাঁশ দেওয়া! গজেন দাসের কেত্তনে শালা খোল বাজাও—তোমার লজ্জা করে না, জানোয়ার—।

অসিত উত্তেজনায় হাত-পা ছুড়ে কথা বলছিল। ওর কথা কেউ শুনতে না পেলেও ভাব বুঝতে পারছিল। সুতরাং আচমকাই একটা ঘুসি এসে পড়ল ওর পেটে।

অসিত ঝুঁকে পড়ল। আর তখনই অনেকগুলো চেনা কিংবা অচেনা হাত ওকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে লাগল। বারবার। পথচারী অনেকেই ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল, তবে তারা নির্বিকারে পা ফেলে চলে যাচ্ছিল।

একটা জোরালো লাথি অসিতকে ছিটকে ফেলে দিল রাস্তায়। পড়ে যেতে-যেতে একটা ছুঁচোর সুরেলা ধ্বনি শুনতে পেল ও। এটাই কি একটা কুৎসিত প্রাণীর সুন্দর প্রতিবাদ? অসিতের চোখের সামনে সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল।

একটু পরেই সচেতন হল অসিত। রাস্তার ধুলোয় ও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কানে আসছে এক অদ্ভুত মিষ্টি ডাক। খুব মিহি—যেন ঝাড়লণ্ঠনের টুংটাং।

মুখ তুলে দেখতে চেষ্টা করল ও। কাছেই ঢালু নর্দমা। তারই পাড়ে ড্যাবড্যাবে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে কুৎসিত পোকাটা। ওরই দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে এই নবীন জলতরঙ্গ।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল অসিত। হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে নিল। ঠোঁটের কোণ জ্বালা করছে। মাথায় কেউ ছুঁচ ফোটাচ্ছে যেন। কয়েকসেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পেছনে, অশ্বত্থ গাছের দিকে, আর তাকাল না। ও জানে, অপু-নদে ওরা সবাই হিংস্র অথচ অবিশ্বাসের নজরে ওকে দেখছে। ভাবছে, এই রোগা ভীতু ছেলেটার মধ্যে হঠাৎ কোন পাগলামি বাসা বাঁধল! পাগলামিতে না ধরলে কেউ এরকম বোকার মতো হঠকারী কাজ করে!

অসিত দু-পা বাড়াতেই অপু ছুটে এল ওর কাছে। একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল হাতে। ঝাপসা নজরে সেটা পড়ে ফেলল অসিতঃ তোর বাবাকে বলে রাখিস কিন্তু। কাল আমরা ফাইনাল কথা বলতে যাব।

অসিত চিরকুটটা দুমড়ে-মুচড়ে চেপে ধরল হাতের মুঠোয়। তারপর ছুড়ে ফেলে দিল নর্দমায়। অপু সেটা দেখল কি না কে জানে। অসিত ওর দিকে একটিবারের জন্যও ফিরে তাকায়নি।

গুমোট কেটে গিয়ে হঠাৎই খানিক ফুরফুরে বাতাস বইল। অসিতের রোমকূপে বাতাসের কণার ছোঁয়া লাগল। ও হাঁটতে লাগল বাড়ির দিকে। রাস্তার লোকজন কমে এসেছে, দোকানপাট বন্ধ

হচ্ছে। অসিত সব দেখেও যেন দেখতে পাচ্ছিল না। ওর চোখে ভাসছিল পিতৃপুরুষের একফালি জমিটুকু। বুকের ভেতরে একটা অলৌকিক অনুভব নিয়ে ও নীলাদের বাড়িটা পেরিয়ে গেল। নীলার কথা ওর মনে পড়ল না।

বাড়ির কাছে এসে কী যেন মনে হল অসিতের। ও দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। তারপর পাশের পতিত জমিটুকুর কাছে এগিয়ে গেল। ভাঙা বাখারির বেড়া পেরিয়ে অন্ধকার মাটিতে পা রাখল। শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। শিউলি, করবী, লেবু গাছের পাতার কাঁপুনি শুনতে পাচ্ছিল অসিত। এইসব আশ্চর্য শব্দ ও আগে কখনও শোনেনি। রাতের আঁধারে এইসব কুচিকুচি শব্দমালা ফিসফিস করে এক মোহময় সুর জাগিয়ে তুলছিল। একইসঙ্গে আরও কত বিচিত্র সঙ্গীত শুনতে পেল অসিত। আগাছার অন্তরাল থেকে নিশাচর কীটপতঙ্গের দল অসিতকে উপহার দিচ্ছে এক স্বপ্নময় জলসা। ক'দিন আগেও যা ছিল কর্কশ কান্না, আজ তা অসিতের কানে অন্যরকম এক আগমনি গান।

আনন্দে কান্না পাচ্ছিল অসিতের। এই সুর, এই গানের কথা, কোনওদিনই ও জানতে পারেনি। কেউ বলেনি ওকে। ওর অদ্ভুত অসুখটাই খুলে দিয়েছে এই নতুন জগতের দরজা। সারা জীবনের শোনা কথাগুলো একপলকে ওর কাছে অর্থহীন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছিল।

এমনসময় টিপটিপ বৃষ্টি নামল। আর একইসঙ্গে সুরেলা শিসের শব্দ শুনতে পেল অসিত। ও মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। নদীর স্রোতের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে ডানা নেড়ে বাতাস কেটে উড়ে চলেছে দুটো বাদুড়। ওরাই শিস দিচ্ছে সুরেলা আওয়াজে।

অসিত মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল রাতের আকাশে উড়ে যাওয়া প্রাণী দুটোর দিকে। ওর চোখে গালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। বাদুড়, ছুঁচো, কীটপতঙ্গ, এইসব কুৎসিত জীবগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ছিল এত মধুর গোপন সঙ্গীত!

অসিত বাদুড়ের শিস নকল করে শিস দিল। নিজের গলায়-কানে হাত বোলাল। বলল নিজের মনেই, আহামরি অসুখ রে আমার! আমায় ছেড়ে তুই যাস না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পিতৃপুরুষের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে রইল অসিত। বাবাকে হঠাৎই ওর ভীষণ ভালো লাগছিল।



আজ শেষ দিন

ডিজিটাল ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ চলে গেল। ৩১ ডিসেম্বর, ২০৯১। আজ শেষ দিন। আজই আমার শেষ দিন। আজ রাত ঠিক বারোটায়, কাঁটায়-কাঁটায় বারোটায়, আমার বুকের ভেতরে লোডশেডিং হয়ে যাবে। আর আলো জ্বলবে না।

আমি চলে যাব। তবে সুমি আর মিতা থেকে যাবে। ওদের হাতে এখনও সময় আছে। বাঁচার সময়।

চায়ের কাপ হাতে সুমি ঘরে এল। আমার হাতে কাপ তুলে দিল রোজকারের মতো। আমি কাপটা নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। স্বাভাবিক থাকার জন্যে চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। কিন্তু তবুও হাত কেঁপে গেল। কাপ আর প্লেটে ছোট-ছোট কয়েকটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সুমি জিগ্যেস করল, 'চায়ে চিনি ঠিক আছে?'

আমি ঘাড় নাড়লামঃ 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' চিনির সামান্য এদিক-ওদিক হলেও আমার কোনও অসুবিধে হয় না। সুমি এটা বরাবরই জানে, তবু এই অবান্তর প্রশ্নটা করল আজ।

সুমিকে দেখলাম ভালো করে। সিঁথির সিঁদুর আজ যেন বেশি স্পষ্ট। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কি সিঁদুর লাগিয়েছে নাকি? কোনওদিন তো লাগায় না! ওর মুখটা খুব খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিল, ওর বয়েস বোধহয় আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। দেখে মনেই হয় না, বাহান্ন পেরিয়ে তিপ্পান্নয় পা দিয়েছে। আমার সঙ্গে ওর প্রায় আট বছরের তফাত। বিয়ের সময়ে ওর ছিল উনিশ, আর আমার সাতাশ। তখন ও বয়েসের ফারাক নিয়ে ঠাট্টা করত প্রায়ই। বলত, তুমি আমার অনেক আগে বুড়ো হয়ে যাবে। কথাটা মিথ্যে নয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সকাল প্রায় আটটা। তবুও রোদের তেজ তেমন বাড়েনি। বাতাসে ঠান্ডা ছুঁচ। গত ক'দিন ধরেই শীতটা জাঁকিয়ে বসেছে কলকাতায়। আমার চাদরে, গায়ে,

হাতে রোদের আলতো রং এসে লেগেছে। সুমির কপালের বাঁ-পাশে, আটপৌরে ছাপা শাড়িতেও। ও মুখ নামিয়ে বারান্দার লাল সিমেন্ট দেখছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হল, কী ভাবছ?'

ও কেঁদে ফেলল। মুখ নামানো থাকলেও কান্নার দু-একটা টুকরো শব্দ শোনা গেল।

অন্যসময় হলে বলতাম, 'কী হচ্ছে, সুমি—চোখ মোছো। ছেলেমানুষি কোরো না—' কিন্তু আজ সে-কথা বলতে পারলাম না। শুধু বললাম, 'কেঁদে লাভ কী!'

সত্যিই কেঁদে কোনও লাভ নেই। এখন প্রতিটি মানুষের জন্মের সময় যেমন মা-বাবার হাতে বার্থ সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হয়, তেমনই দেওয়া হয় একটা লাইফ সার্টিফিকেট। দুটো সার্টিফিকেটই মাপে ছোট। তাসের মতো দেখতে দুটো ম্যাগনেটিক কার্ড। প্রথম কার্ডে রয়েছে সিটিজেন কোড নম্বর, বাবার ও মায়ের সিটিজেন কোড নম্বর, জন্ম-সময়, তারিখ আর নার্সিংহোমের নাম ও সিরিয়াল নম্বর। দ্বিতীয় কার্ডটা অনেক সংক্ষিপ্ত। তাতে নবজাত শিশুর নাম, সিটিজেন কোড নম্বর আর—আর, তার মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকে। হ্যাঁ, মৃত্যুর তারিখ! জন্মসালের সঙ্গে ষাটবছর যোগ করলে যে-সাল পাওয়া যায়, তার শেষ দিনই মৃত্যুর দিন। যেমন, আমার জন্মতারিখ ২২ অক্টোবর, ২০৩১। তাই আজই আমার মৃত্যুর দিন।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে-বাড়তে ভারসাম্যের কাঁটা চলে গিয়েছিল শেষ সীমায়। তাই ২০১০ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর সমস্ত দেশ বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তাঁরা বলেন, প্রতিটি মানুষের আয়ু কখনওই গড়ে ষাট বছরের বেশি হবে না। তাঁদের মতে, একটি জীবনের পক্ষে ষাট বছর যথেষ্ট। আর এই নিয়মের জন্যে সুবিধেও হবে অনেক। প্রত্যেকেই, তার মৃত্যুর দিন জানা থাকায়, পরিকল্পনামাফিক সমস্ত কাজ সেরে রাখতে পারবে। চলে যাওয়ার সময় কোনও কিছুই আর অগোছালো থাকবে না। বিষয়-সম্পত্তির হাতবদলের ব্যাপারে কোনওরকম জটিলতা আর থাকবে না। ফলে যন্ত্রসভ্যতার এই নিয়মের দুনিয়ায় সবকিছুই চলবে নিয়মমাফিক।

আমার হাতের মুঠোয় লাইফ সার্টিফিকেটটা ধরা ছিল। সারাজীবন এই ম্যাগনেটিক কার্ডটা আমার কত কাজে লেগেছে! ইলেকট্রনিক স্ক্যানারের নীচে ধরলেই কম্পিউটারের প্রিন্টারে এর যাবতীয় তথ্য ছাপা হয়ে যায়। স্কুল, কলেজ, চাকরি, বিদেশ যাওয়া—প্রায় সবকাজেই প্রথমে দরকার লাইফ সার্টিফিকেট।

বুকের বাঁ-দিকটায় কি একটু চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে? নাকি আমার মনের ভুল?

জন্মের পরই একটা ছোট্ট অপারেশান করে প্রতিটি শিশুর বুকে বসিয়ে দেওয়া হয় ইলেকট্রনিক 'হার্ট স্টপার', সঙ্গে একটা খুদে ডিজিটাল ঘড়ি। ওই ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময় সেট করে দেওয়া থাকে। অনেকটা টাইম-বোমার মতো। ঠিক সময়ে পৌঁছলেই হার্ট স্টপার তার কাজ করে। সে থামিয়ে দেয়

হৃৎপিণ্ডকে। আজ পর্যন্ত কখনও শোনা যায়নি, কোনও হার্ট স্টপার ঠিক সময়ে তার কাজ করতে পারেনি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে সূর্যটাকে দেখছিলাম। কত কাল ধরে জ্বলছে আকাশে। কোনও হার্ট স্টপার ওকে নেভাতে পারেনি। আজ ওটাকে কী সুন্দরই না লাগছে!

রাস্তার ওপাশে একটা বাড়ির ছাদে কয়েকটা কাক বসে আছে। ওরা বুদ্ধিমান নয়, তাই কত স্বাধীন। আকাশে উড়ছে পায়রা আর চিল। শেষ দিন নিয়ে ওদেরও কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

সুমিকে জিগ্যেস করলাম, 'মিতা কোথায়? ওঠেনি এখনও?'

ও কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'না—।'

মিতা আমার মেয়ে। আমাদের মেয়ে। আমিই ওর নাম রেখেছিলাম মিতা। সুমিতার শরীর থেকেই ওর সৃষ্টি, তাই সুমিতার নামের মধ্যেই ওর নাম লুকিয়ে থাক। কিন্তু এসব কে ভাবে! আমাদের সরকারের কাছে আমরা শুধুই তিনটে কোড নম্বর।

প্রায় আটবছর হল মিতার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে ও এখনও সেই ছোট্টটি। ছোটবেলা থেকেই ঘুম থেকে ওঠে বেলা করে। খুব বকবক করে। পড়াশুনোয় ঝোঁক ছিল কম। ছোটবয়েস থেকে ওর চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা। কথা বলত পাকা-পাকা। আমাকে বন্ধুর মতো দেখত। কত যে উপহার দিত আমাকে! মনে পড়ছে, ও যখন ক্লাস টু-তে পড়ত তখন স্কুল থেকেই হয়তো ছোট্ট একটুকরো চক নিয়ে এসেছিল। একটা চিঠি লিখে সেই চকটা চিঠিতে মুড়ে রেখে দিয়েছিল আমার টেবিলে। সেই চিঠিটা আমি আজও রেখে দিয়েছি। আর চিঠির কথাগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছেঃ

'বাবা, এই চকটা তোমাকে দিলাম৷ তোমাকে নিতেই হবে৷ আমার এই ছোট্ট কথাটা রেখ কিন্তু৷ ইতি তোমার মিতা৷ ক্রশ৷'

শেষের যোগ চিহ্নটা এঁকে ও 'গড ক্রস' বোঝাতে চেয়েছে। যাতে আমি ওর কথা অবশ্যই রাখি। চকটা নিয়েছিলাম আমি। শিশুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার সবসময়েই পবিত্র। কিন্তু আজ?

আজকের দিনটার জন্যে সুমিই খবর দিয়ে মিতাকে দু-দিনের জন্যে ডেকে এনেছে। যাতে আমি চলে গেলে মা ও মেয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরতে পারে। মিতা জানে না, আজ আমার শেষ দিন। কারণ, আমার জন্মসালটা ও সঠিকভাবে জানে না। ওর মায়েরটাও না। আমরাই কখনও জানাইনি।

প্রথম-প্রথম বছরের শেষদিনের এই চলে যাওয়া নিয়ে দেশে খুব হইচই হয়েছিল। আজকাল আর হয় না। সবই সয়ে গেছে। প্রতিবছরের শেষ দিনে রাত ঠিক বারোটায়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি হার্ট স্টপার নিখুঁতভাবে কাজ করে। আর পরদিনই জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগামী রেখাচিত্রটা ঝপ

করে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। এর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। পৃথিবী বাসযোগ্য থাকে, সুখী থাকে।

আমি জানি, আজ সারাটা দিন সুমি আমার যত্ন নেবে। বিয়ের প্রথম রাতের মধুর নজরে মুগ্ধ হয়ে দেখবে আমাকে। সুযোগ পেলে এই বুড়োটাকে এক-আধবার আদরও হয়তো করবে। তারপর...রাত ঠিক বারোটায়...ওর হাত ধরে, মিতার হাত ধরে আমি চলে যাব। বুকের ভেতরে আমার হৃৎপিণ্ড শেষবারের মতো বেজে উঠবে।

আর একইসঙ্গে শুরু হয়ে যাবে উৎসব। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসব। অথবা আমার মতো লক্ষ-লক্ষ 'অকেজো' বৃদ্ধকে বিদায় জানানোর উৎসব। তখন মিতার ছোটবেলার চিঠিতে লিখে দেওয়া যোগ চিহ্নটা পলকে বিয়োগ চিহ্ন হয়ে যাবে। কাক-চিল, এই মুহূর্তে পিঠে এসে পড়া রোদ, সুমির আটপৌরে ছাপা শাড়ি, কিংবা মিতার চশমা, কিছুই আমি আর দেখতে পাব না। সব বিয়োগের খাতায় নাম লেখাবে।

সুমি এখনও আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে অকারণে। মুখে তেতো স্বাদ টের পেলাম। বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে, তবু কেন যে ওরা ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডগুলো আমাদের শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেয়নি! তা হলে আর কারণে-অকারণে চোখে জল আসত না। চলে যাওয়ার দিন ছেলেমানুষের মতো সুমির কাছে ধরা পড়ে যেতাম না আমি।

আশ্চর্য! মনে হল আমার চোখের কোণ থেকে দু-ফোঁটা জল বলে উঠল, 'আজ তোমার শেষ দিন। তাই তো আমরা কাঁদছি!'



সময়েরে দিতে ফাঁকি

প্রিয়রূপ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কপালে তেল-সিঁদুরের তিলক এঁকে দিতে-দিতে বলল, ‘সজনী, সাবধানে থেকো।’

আড়চোখে ওর চোখের দিকে তাকালাম। জানতাম সেখানে কী দেখব। প্রিয়রূপ কান্না চাপতে চেষ্টা করছে।

ওর পাশ থেকে আমাদের ‘অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার’ ডিপার্টমেন্টের হেড গন্টিপ্রসাদ চন্দ্রশেখরন প্রিয়রূপের কাঁধে হাত রেখে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘ডোন্ট উয়ারি, সজনী। কোনও ভয় নেই। এটা এমন কোনও মারাত্মক এক্সপেরিমেন্ট নয়। তোমার আগেও অনেকে এরকম এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্ট হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ তো থাকছেই! একটা বোতাম টিপলেই ফটাফট আমরা গিয়ে হাজির হয়ে যাব। নো প্রবলেম।’

এটা এমন কোনও মারাত্মক এক্সপেরিমেন্ট নয়। শুধু একটা সময়হীন চেম্বারে আমাকে পঁচিশ-তিরিশদিন থাকতে হবে। একা!

সময়হীন মানে, সেই চেম্বারে কোনওভাবেই সময় বোঝা যাবে না। ঘড়ি, খবরের কাগজ, রেডিয়ো, টিভি—সময় বা দিনের হিসেব পাওয়া যায় এমন কোনও কিছুই নেই সেই চেম্বারে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই সময়হীন চেম্বারের নাম ‘ফ্যাসিলিটি’। ভারত ছাড়া আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং জাপানে এরকম ফ্যাসিলিটি রয়েছে।

ফ্যাসিলিটি মানে পঁচিশ-বাই-পঁচিশ একটা ঘর। তাতে কোনও জানলা বা ঘুলঘুলি নেই। মানে, দিন-রাত বোঝার কোনও উপায় নেই। সবসময় ফ্লুওরেসেন্ট বাতি জ্বলছে। আমি ইচ্ছেমতো সেগুলো অন-অফ করতে পারব।

ঘরের দেওয়ালগুলো ফাঁপা—মাঝে বালি দিয়ে ঠাসা, যাতে বাইরের এককণা শব্দও ঘরে না ঢুকতে পারে। আর ঘরের উষ্ণতা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত—সবসময় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাঁধা।

বাতাস চলাচলের জন্যে ফ্যাসিলিটিতে ঠান্ডা বাতাসের পথ করা আছে। ফলে শ্বাসকষ্টের কোনও প্রশ্ন নেই।

এ ছাড়া আছে ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর আর বাথরুম। রান্নাঘরে একা কোনও মানুষের রান্নার টুকিটাকি সরঞ্জাম আর রসদ রয়েছে।

ঘরে টেবিল-চেয়ার আছে। আছে রেফ্রিজারেটর, ভিডিয়ো ক্যাসেট প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার। আর হালকা ব্যায়ামের জন্যে রয়েছে একটা আরগোমিটার।

বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যা কিছু যোগাযোগ হবে তা সবই হাতে লেখা চিঠির মাধ্যমে। আমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে ফ্যাসিলিটির বাইরে চব্বিশ ঘণ্টাই কেউ-না-কেউ হাজির থাকবে। আমার যে-কোনও দরকারে ওরা সাততাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে।

দু-বছর আগের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। একইরকম এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্ট হয়েছিল আমাদের সহকর্মী এক রিসার্চ স্কলার—গোপাল মারিমুথু। রাত তিনটের সময় ইড্‌লি খেতে চেয়েছিল। তখন সবার সে কী অবস্থা! গোপালকে কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে, এখন রাত তিনটে—ইড্‌লি পাওয়া যাবে না। কারণ তা হলেই ও সময় আঁচ করে ফেলবে, আর এতদিন ধরে কষ্ট করে চালানো এক্সপেরিমেন্ট গোল্লায় যাবে। তাই মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে ইড্‌লি জোগাড় করে গোপালকে দেওয়া হয়েছিল।

এই এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্টের খামখেয়ালিপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুব জটিল ব্যাপার। শুনেছি এই সময়ে সাবজেক্টের মনের অবস্থা পালটে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়। কারও-কারও নার্ভাস ব্রেকডাউন পর্যন্ত হয়েছে। তবে সাবজেক্টের যে-কোনও ধরনের বিপর্যয়ের ইশারা পাওয়ামাত্রই ফ্যাসিলিটি থেকে তাকে বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। ইশারা করার জন্যে ফ্যাসিলিটির ভেতরে নানারকম বোতাম আছে।

এই ডিপার্টমেন্টে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন থেকেই ক্রোনোবায়োলজি—মানে, কালজীববিজ্ঞান—আমাকে ভীষণ টেনেছিল। আর টেনেছিল এই রিসার্চ গ্রুপের ডক্টর প্রিয়রূপ সিন্‌হারায়। প্রিয়রূপ প্রফেসর চন্দ্রশেখরনের কাছে ক্রোনোবায়োলজিতেই পিএইচ. ডি. করেছে। এখন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমাদের রিসার্চ গ্রুপের সিনিয়ার রিসার্চার।

একা থাকার এই পরীক্ষায় আমার আগ্রহ থাকলেও কখনও এই পরীক্ষায় সাবজেক্ট হওয়ার সাধ জাগেনি। কারণ, একা থাকতে আমার ভালো লাগে না।

প্রিয়রূপ সেটা জানে। আরও জানে, কেন আচমকা জেদ করে এই এক্সপেরিমেন্টের সাবজেক্ট হওয়ার জন্যে আমি প্রফেসর চন্দ্রশেখরনের কাছে আবদার করেছি। আমার আর দোকা থাকার সাধ নেই। অন্তত কিছুদিন আমি আমার ইচ্ছেমতো একা থাকতে চাই।

বলতে লজ্জা নেই, এই দু-বছর গবেষণা করতে-করতে কখন যেন আমি প্রিয়রূপকে নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছিলাম। যখন ভালোবাসার ব্যাপারটা টের পেলাম, তখন ও আমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিশোরী বয়েসের মতো ওকে একদিন না দেখলেই মনটা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। গবেষণার ফাঁকে-ফাঁকে ওর ঠাট্টা-ইয়ারকি না শুনতে পেলে দিনটা বোধহয় অপূর্ণ থেকে যায়। ও যখন বলে, ‘সজনী, তোমার নামটা ফ্যানট্যাস্টিক—কিন্তু যখনই মনে পড়ে সজনী থেকে সজনে ডাঁটা ব্যাপারটা এসেছে—তারপর সেখান থেকে ডাঁটাচচ্চড়ি, তখনই কেমন লাগে।’ কিংবা ঠোঁট উলটে, চোখ কপালে তুলে, কপট হতাশায় বলে, ‘কী করি সজনী, আসে না প্রীতম—’, তখন বেশ মজা পাই। প্রিয়রূপ আবার ব্যাখ্যা করে বলে দেয়, ‘প্রীতম’ মানে এখানে হল রিসার্চের রেজাল্ট। এই কঠিন গবেষণায়, অত সহজে কখনও রেজাল্ট আসে না।

তো এইভাবেই সব চলছিল। আমি বেশ বুঝতাম, আমার এই ছত্রিশ বছর বয়েসে যা হওয়ার কথা নয় তাই হচ্ছে। জরুরি কাজে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি, রাতে বেপরোয়া স্বপ্ন দেখছি, পাশবালিশ আঁকড়ে বিভোর হয়ে যাচ্ছি, এমনকী চেষ্টা করলে অমাবস্যাতেও বোধহয় চাঁদ দেখতে পাই, আর ডুমুর গাছে ফুল ফোটাতে পারি।

আমার ভেতরের হ্যাংলামির সঙ্গে বেশ ক’দিন ধরে দাঁত-নখ লড়াই চালালাম। তাতে লাভ কিছু হল না—উলটে প্রিয়রূপের সঙ্গে খানিকটা গায়ে-পড়া হয়েই দু-তিনটে ফিল্ম দেখে ফেললাম। কয়েক মাস আগেও বাড়িতে বসে কেব্‌ল টিভিতে যেসব প্রেমের দৃশ্য, গান-টান, বা ফুল ছোড়াছুড়ি দেখে হাসি পেত, এখন সেগুলোকে আর বোকা-বোকা বলে মনে হয় না।

অবশেষে একদিন বাথরুমে আয়নার সামনে লজ্জাহীনভাবে দাঁড়িয়ে আমার ছায়ার দিকে অপলকে তাকিয়ে স্বীকার করলাম, এতদিন যা হয়নি আজ তাই হয়েছেঃ আমি প্রেমে পড়েছি। এত গভীরে পতন হয়েছে যে, ওঠার আর উপায় নেই।

প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিজের ওপরে ঘেন্না ধরে গেল আমার। ধন্য, সজনী! এই বয়েসে এই চেহারায় প্রেমের কোনও মানে হয়! বহু ব্যবহারে পুরোনো হয়ে যাওয়া রাবার স্ট্যাম্প যেমন কাগজের ওপরে ছাড়া-ছাড়া আবছা ছাপ ফ্যালে, আমার শরীরে যৌবনের দশা যেন তাই। এখানে-ওখানে যৎকিঞ্চিৎ ছাপ রয়ে গেছে। কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স দেখে পাস্ট টেন্সের রমরমা ব্যাপারটা বেশ টের পাওয়া যায়। সেটাই আমার অহঙ্কারের আগুনে বাতাসের ঝাপটা দিল।

বাবা চলে গেছেন কোন ছোটবেলায়। ভাই-বোন কেউ নেই। মা-কে নিয়ে এতগুলো বছর কাটিয়েছি। অভাব-অনটন আর হাড়ভাঙা খাটুনি। নিজের পড়াশোনা, একরাশ টিউশানি, আর সাংঘাতিক জেদ—এই নিয়ে বছরের-পর-বছর গড়িয়ে গেছে। মা প্রাইভেট স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা পড়াতেন। যে মাইনের ভাউচার সই করতেন, প্রিন্সিপাল টাকা দিতেন তার

অর্ধেক। বলতেন, বাকি টাকাটা নাকি স্কুলের ডেভেলাপমেন্টের কাজে খরচ হবে। কে জানে, কার ডেভেলাপমেন্টে টাকাগুলো খরচ হতো!

এইভাবেই দিন গড়িয়েছে, জীবন গড়িয়েছে, যৌবন গড়িয়েছে। যখন নাম-না-জানা অসংখ্য ফুল ফোটার কথা ছিল তখন ফোটেনি। হয়তো বা ফুটেছে, আমিই টের পাইনি—আমার ধরা-ছোঁওয়ার আড়ালে থেকে গেছে। তারপর যখন ধীরে-ধীরে নিরাপদ বয়েসের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি তখন এই অপরূপ সর্বনাশ। নাকি প্রিয়রূপ সর্বনাশ!

সেই সর্বনাশে প্রিয়রূপও সাড়া দিয়েছিল। রিসার্চে যেমন ওর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, তার বাইরেও ব্যাপারটা একইরকম হয়ে গেল। একসঙ্গে আমরা অনেকটা সময় কাটাতে লাগলাম। রেস্তোরাঁয় চা-কফি-চপ-কাটলেট চলতে লাগল। টেবিলকে মাঝে রেখে অসংখ্য কথা এপার-ওপার হল। তারপর যা হয়!

একসঙ্গে আমরা সিনেমা দেখতে শুরু করলাম। সিনেমা কতটা ঠিকঠাক দেখেছি জানি না, তবে পাশাপাশি বসে অনেক কথা বলেছি। আর, অবশেষে, একে অপরকে ছুঁয়েছি।

যে-আমি সারাটা জীবন অচ্ছুৎ হয়ে কাটালাম সেই আমি একটু ছোঁয়াছুঁয়ির জন্যে পাগল হয়ে গেলাম। সবসময় আড়াল খুঁজতে লাগলাম।

বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম প্রিয়রূপ আমাকে কী একটা যেন বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। আমি ওকে অনেকবার জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে? কিছু বলবে?'

ও চোখ নামিয়ে আলতো গলায় বলল, 'না—কিছু না।'

'কী ব্যাপার! বলো না কী হয়েছে!'

'ন্-না...পরে কোনও সময় বলব।'

শেষ পর্যন্ত আমি হার মেনে গেলাম।

একদিন চন্দ্রশেখরন আমাদের রিসার্চ গ্রুপকে নিয়ে মিটিং-এ বসলেন। হিউম্যান সারকাডিয়ান রিদম্‌স নিয়ে আলোচনা চলছিল। হঠাৎই হেড বলে বসলেন, 'নেকস্ট আইসোলেশান এক্সপেরিমেন্টে সজনীকে সাবজেক্ট করলে কেমন হয়! কারণ, এ পর্যন্ত আমরা কোনও মেয়েকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারিনি। সজনী আমাদের গ্রুপের একমাত্র লেডি। যদি ও রাজি থাকে...' আমার দিকে তাকালেন চন্দ্রশেখরন, হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী, সজনী, ফ্যাসিলিটিতে নিরিবিলি একমাস থাকবে না কি?'

আমি সাততাড়াতাড়ি বলেছি, 'না, না, স্যার—আমার একা থাকতে ভীষণ ভয় করে। প্লিজ, আমাকে এ-রিকোয়েস্ট করবেন না।'

তখন মারিমুথু বলেছে, 'তুমি রাজি হলে ভালো হতো। ইন্ডিয়াতে এখনও কোনও লেডিকে সাবজেক্ট করে এই এক্সপেরিমেন্ট হয়নি। তুমি তা হলে পাইয়োনিয়ার হতে। হিউম্যান সারকাডিয়ান রিদম্স-এর রিসার্চে চিরকালের জন্যে তোমার নাম লেখা হয়ে যেত।'

আমি জানি, মারিমুথু একটুও মিথ্যে বলছে না। আমি রাজি হলে সত্যিই আমার নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার যে একা থাকতে ভয় করে!

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম।

তখন প্রিয়রূপ বলল, 'সজনী, তুমি এক্ষুনি "না" বোলো না। স্যার, যেটা বলছেন সেটা একটু ভেবে দ্যাখো। দরকার হয় দু-চারদিন সময় নাও।'

প্রিয়রূপের দিকে করুণ চোখে তাকালাম আমি। ওর কথা যে আমি ফেলতে পারি না তা ও ভালো করেই জানে।

চন্দ্রশেখরন হাতের সিগারেটে টান দিয়ে নরম গলায় বললেন, 'ও. কে. লেট মি সাজেস্ট ওয়ান থিং। সজনী, তুমি মাত্র একটা দিন ফ্যাসিলিটিতে কাটিয়ে একটা ট্রায়াল দাও। জাস্ট টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। দ্যাখো, কেমন লাগে। ট্রায়ালের পর যদি তোমার মনে হয় তুমি পারবে না, তা হলে আমি তোমাকে আর রিকোয়েস্ট করব না।'

এরপর আর 'না' বলা যায়!

প্রিয়রূপ আমার চোখে তাকিয়েছিল। চোখের ভাষায় ভরসা দিয়েছিল।

আমি ওকে দেখছিলাম। আমার মনে একা থাকার ভয়টা পলকে কোথায় যেন উবে গেল। কিন্তু তখনও জানি না, এক সর্বনাশ থেকে আমি আর-এক সর্বনাশে পা দিতে চলেছি।

টাইমলেস ফ্যাসিলিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথিকৃৎ হলেন জার্মানির দুই বিজ্ঞানী অ্যাশকফ ও ওয়েভার। ওঁদের পরীক্ষাতেই প্রথম জানা গিয়েছিল যে, সময়ের হিসেব জানা না থাকলেও মানুষের কোনও-কোনও ব্যাপারের ছন্দ-তাল-লয় একই থাকে। এই ছন্দ ঠিক রাখে মানুষের শরীরের ভেতরকার এক 'রহস্যময় ঘড়ি'—যাকে জৈবঘড়ি বলা যায়। যেমন, রোজ যে-সময়ে আমরা ঘুম থেকে উঠি তা মোটামুটি একই। অর্থাৎ, এই ঘটনার পর্যায়কাল মোটামুটিভাবে চব্বিশ ঘণ্টা। এর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার দিন-রাত বা আলো-অন্ধকার পর্যায়কালের বেশ মিল আছে। সময়হীন চেম্বারে বাস করলে এই মিলটা আর থাকে না—পর্যায়কাল ক্রমশই চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'ফ্রি রানিং'। তখন ঘুমোনো আর জেগে থাকার কালচক্র, মানে, স্লিপ-ওয়েক সাইক্‌ল, এমন হয়ে যায় যে, পর্যায়কাল বেশি হতে-হতে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টাও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অ্যাশকফ আর ওয়েভার এও প্রমাণ করেছেন যে, রোজকার পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক

ঘটনাও আমাদের এমন সব সংকেত বা ইশারা জোগায় যার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার পর্যায়কাল ঠিকঠাক থাকে।

দেখে-শুনে এক্সপেরিমেন্টটা আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই যে বললাম—একা থাকার ভয়। যার জন্যে আমি এখনও মা-কে কাছ-ছাড়া করিনি। প্রিয়রূপ সেটা জানে। তাই ঠাট্টাও করে। বলে, 'মাম্মিজ্ গার্ল।'

হেড আমাদের রিসার্চ গ্রুপের তিনজনকে বললেন ফ্যাসিলিটির ভেতরটা আমাকে যেন ভালো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো হয়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং ছেড়ে ক্যাম্পাসের পিচের রাস্তায় পা দিলাম। রাস্তাটা পেরোলেই সবুজ মাঠ। তার এখানে-ওখানে লম্বা-লম্বা গাছ। গাছগুলো পাতায়-পাতায় ঢাকা। সন্ধের মুখে পাতার ফাঁকে পাখিরা খেলা করে, কিচিরমিচির করে।

দূরে-দূরে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং চোখে পড়ছে। ছাত্র-ছাত্রীর দল হাসাহাসি করতে-করতে এ-পথ ও-পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরে যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে সেটা কেউই শুনতে পাচ্ছে না।

'ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট'টা ওরা আমাকে বেশ যত্ন করে দেখাল। সত্যিই 'ফ্ল্যাট'টা পছন্দ হওয়ার মতো। কিন্তু একা এখানে থাকা যায়!

ঘর দেখতে-দেখতে প্রিয়রূপ কীসব রসিকতাও করছিল, কিন্তু সেসব ঠিকমতো আমার কানে ঢুকছিল না।

ঘরের একটা দেওয়ালে কুড়িটা পুশ বাটন্ লাগানো একটা প্যানেল ছিল। প্রিয়রূপ ভালো করে বুঝিয়ে দিল এর চারনম্বর বোতামটা টিপে কী করে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

চারনম্বর বোতামটা টিপলেই বাইরে একটা বেল বেজে ওঠে আর ঘরে ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা ছোট্ট দরজা খুলে যায়। দরজার পেছনেই পায়রার খোপের মতো একটা খুপরি। সেখানে আমি যদি একটা চিরকুট রেখে দিই তা হলে বাইরের পাহারাদার মানুষটি চিরকুটটা পেয়ে যাবে। তারপর আমার অনুরোধ মতো কাজ করবে।

প্রিয়রূপ বলল, 'কোনও ভয় নেই। ফ্যাসিলিটির বাইরে চব্বিশঘণ্টা লোক থাকবে। আমরা প্রত্যেকে পালা করে ডিউটি দেব—মাথাপিছু চারঘণ্টা করে। তোমার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা যা হবে সবই চিরকুটের মাধ্যমে। যদি তুমি চব্বিশ ঘণ্টা কমপ্লিট হওয়ার আগেই বেরিয়ে আসতে চাও, তা হলে স্রেফ একটা চিরকুট ওই পিজিয়ন হোলে রেখে দেবে। কোনও উত্তর দেওয়ার থাকলে সেটা আর-একটা চিরকুটে লিখে আমরা ওই একই খোপে রেখে দেব—তুমি পেয়ে যাবে। ব্যস—আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম—না, নেই।

শেষ পর্যন্ত দিনক্ষণ দেখে এক শনিবার রাত আটটার সময় ফ্যাসিলিটিতে ঢুকে পড়লাম আমি।

এক কামরার ওই সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে সবই আছে, শুধু সময় বলে কিছু নেই। আর বাইরের এককণা শব্দও ভেতরে আসতে পারছে না।

প্রথম অনেকটা সময় ফ্ল্যাটের এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেই কেটে গেল। ফ্ল্যাটটা যিনি সাজিয়েছেন তাঁকে তারিফ করতেই হয়। ঘরের সর্বত্র রুচির ছাপ। সমস্ত আসবাবপত্রই ঝকঝকে তকতকে ফিটফাট।

হাতঘড়িটা বাইরে রেখে এসেছিলাম। ঘড়ি দেখতে পারছি না বলে প্রথম-প্রথম বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। যখন বুঝলাম সময় আঁচ করার কোনও উপায় নেই, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় বসে পড়লাম। বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিলে অনেক বই আর ম্যাগাজিন রাখা ছিল—সেগুলো টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

কতক্ষণ বইপত্র নিয়ে ছিলাম জানি না, একসময় উঠে পড়ে একটা তাকে রাখা টেপরেকর্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে দিলাম। ‘প্রাণ চায় চক্ষু না চায়...’ শুরু হল। আর একইসঙ্গে আমার মন খারাপ হওয়া শুরু হল। বাইরে এখন কে পাহারা দিচ্ছে? প্রিয়রূপ? নাকি অন্য কেউ?

সোজা চলে গেলাম দেওয়ালে লাগানো পুশ বাটন প্যানেলের কাছে। চার নম্বর বোতাম টিপে দিলাম। উলটোদিকের দেওয়ালে একটা ছোট্ট প্যানেল সরে গেল—একটা খুপরি দেখা গেল। টেবিল থেকে কাগজ পেন নিয়ে আমি খসখস করে ইংরেজিতে লিখলামঃ এখন ক’টা বাজে?

চিরকুটটা খুপরিতে রাখার কিছুক্ষণ পর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় বাইরে থেকে বোতাম টিপে দরজাটা খোলা-বন্ধ করা যায়।

একটু পরে আবার খুপরির দরজা খুলে গেল দেখি ভেতরে নীল রঙের একটা চিরকুট পড়ে আছে। ওরা বাইর থেকে উত্তর পাঠিয়েছে।

কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখি তাতে লেখাঃ ‘ম্যাডাম, এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর চন্দ্রশেখরন আমাদের সবসময় মিথ্যে বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন রাত বারোটা।’

এ কী রসিকতা! এটা তো সত্যিকারের এক্সপেরিমেন্ট নয়—এটা একটা খেলা! আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। চিরকুটটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ঘণ্টির শব্দে।

ঘুম ভাঙতেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। গুনগুন শব্দ তুলে এয়ার কন্ডিশনার চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘামতে শুরু করলাম। অন্ধকার যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। সেইসঙ্গে নিরাপত্তার

অভাব ছুঁচের মতো মাথায় বিঁধতে লাগল। এভাবে একা থাকা যায় না।

ঘণ্টি আবার বাজল।

বিছানায় উঠে বসলাম। আলো জ্বাললাম। তাকালাম খুপরির দিকে।

খুপরির দরজা খোলা! তার ভেতরে একটা চিরকুট।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে চিরকুটটা হাতে নিলাম। তাতে সুন্দর হরফে বাংলায় লেখা।

'এখন রাত একটা বাজে। আমি ডিউটিতে এসেছি। কেমন আছ?'

প্রিয়রূপ! ওঃ প্রিয়রূপ!

আমি পাগলের মতো একটা চিরকুট লিখতে বসলাম।

'এখানে একা-একা আমার ভীষণ ভয় করছে। এখন কি সত্যি-সত্যি রাত একটা? বাইরে আর কে-কে আছে?'

চিরকুটে উত্তর এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

'ভয় পাওয়ার কী আছে! আমি তো আছি! এখন সত্যিই রাত একটা। বাইরে আর কেউ নেই। শুধু গাছপালা আর অন্ধকার। এ ছাড়া আকাশে কিছু তারা আছে—আর চাঁদের একটা ভাঙা টুকরো দেখা যাচ্ছে।'

আমাদের কথোপকথন চলতে লাগল।

'ভীষণ একা-একা লাগছে।'

'এটা একা থাকারই এক্সপেরিমেন্ট।'

'না, এটা রিহার্সাল। আমি একা থাকতে পারব না।'

'কোনও উপায় নেই। চন্দ্রশেখরনের অর্ডার।'

'আমার উলটোপালটা সব কথা মনে পড়ছে।'

'কী কথা?'

'তোমার পাশে বসে সিনেমা দেখার কথা। সেইজন্যে একা থাকতে আরও কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও।'

'আমি আর একা থাকতে পারছি না। বাইরে বেরোতে চাই।'

'এত রাতে বাইরে বেরিয়ে তুমি কী করবে, কোথায় যাবে!'

'তা হলে তুমি ভেতরে এসো।'

আমার মুখ দিয়ে ভয়ংকর শব্দগুলো বেরিয়ে গেল। লজ্জা বিসর্জন দেওয়ার পরে যেটুকু বা লজ্জা ছিল, এখন তা-ও গেল। আমি মনে-মনে তলিয়ে গেলাম। আর একটু পরে সত্যি-সত্যি।

কারণ প্রিয়রূপ কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে ফ্যাসিলিটির ভেতরে চলে এসেছিল।

পরদিন হেডকে বললাম যে, আমার পক্ষে এই আইসোলেশন এক্সপেরিমেন্টে সামিল হওয়া সম্ভব নয়। আমার সেরকম মনের জোর নেই।

গন্টিপ্রসাদ চন্দ্রশেখরন আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন। প্রিয়রূপ আড়ালে আমার চোখে তাকিয়েছিল। ওর চোখে কেমন সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি দেখেছিলাম। মনেই হচ্ছিল না গতকাল রাতের ব্যাপারটা সত্যি।

ফ্যাসিলিটির ওই ঘটনার পর প্রিয়রূপের মধ্যে কোনওরকম অপরাধবোধের ছায়া দেখিনি। আর আমার অপরাধবোধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং মনে হয়েছিল ওই ব্যাপারটা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক আর আকর্ষণীয় ঘটনা।

কিন্তু তার কয়েকদিন পর প্রিয়রূপের কয়েকটা কথা আমার সবকিছু পালটে দিয়েছিল। ভেতরটা আপাদমস্তক ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

ওর অনেকদিন ধরে বলতে-না-পারা কথাটা আমাকে বলেছিল প্রিয়রূপ। ও বিবাহিত। দেশের বাড়িতে ওর সংসার আছে।

রেস্তোরাঁয় বসে কথা হচ্ছিল আমাদের। ওর কথাগুলো শোনার পরমুহূর্তেই রেস্তোরাঁটা যেন পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানা হয়ে গেল।

আমার উলটোদিকে একটা মাকড়সা বসে আছে। টেবিলের ওপরে একটা খোলস-ওঠা সাদা রঙের আরশোলা চলেফিরে বেড়াচ্ছে। টেবিলের পায়া বেয়ে একটা বাচ্চা অক্টোপাস ধীরে-ধীরে উঠে আসছে। গুবরেপোকা আর তেঁতুলবিছের দল হেঁটে বেড়াচ্ছে রেস্তোরাঁর মেঝেতে।

আমি জানি, নারী-পুরুষের মেলামেশায় বিয়ের কোনও শর্ত থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিয়রূপের কথাগুলো আমার কানে যেন অ্যাসিড ঢেলে দিল। আমার সেকেলে মধ্যবিত্ত মন হঠাৎই বিত্তহীন শূন্য হয়ে গেল। আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম। কী বোকার মতো কাণ্ড!

হাজার সান্ত্বনাতেও আমার অবুঝ মন বাস্তবটাকে মানতে চাইল না, বুঝতে চাইল না। আসলে একটা স্বপ্ন বোধহয় আমি তিলতিল করে গড়ে তুলছিলাম। ভেবেছিলাম ওটা রাতের স্বপ্ন। এখন বুঝতে পারলাম, স্বপ্নটা রাতের নয়—দিনের।

বাড়িতে আমার রুগ্ন মা আমাকে অবুঝের মতো কাঁদতে দেখল। কাক, শালিক, চড়ুই, ও-বাড়ির ছাদের টিভি অ্যান্টেনা—সবাই আমাকে কাঁদতে দেখল। এক নাম-না-জানা কষ্টে যখন বুকের ভেতরটা প্রতিমুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল, তখন মনে হল আমি বালিকা বা কিশোরী নই—কিন্তু প্রথম ভালোবাসা হারানোর কষ্ট সব বয়েসেই সমান।

প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে আমি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। এলোমেলো দিবাস্বপ্ন। নানান পুরুষ আসে আমার কাছে। আমার সব কথা শোনে ওরা। আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে

ভালোবাসে, আমাকে আদরও করে।

ওদের নিয়ে আর টেপরেকর্ডারে গান শুনে আমার সময় কাটতে লাগল। আমি ধীরে-ধীরে একা থাকতে শিখলাম। ডিপার্টমেন্টে যাওয়াটাও কিছুদিনের জন্যে অনিয়মিত হয়ে গেল।

প্রিয়রূপ আমাকে বাড়িতে ফোন করেছে অনেকবার। ওর সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবে সে-কথাবার্তায় পুরোনো উষ্ণতার অভাব ছিল। ও সেটা টের পেয়ে অনেক কথা বলল, অনেক কিছু বোঝাতে চাইল। আমি ওকে কথার মাঝে থামিয়ে দিইনি। ওর কথা শেষ করতে দিয়েছি। তারপর সহকর্মীর আন্তরিকতা গলায় ঢেলে জানতে চেয়েছি, 'তোমার শরীর কেমন আছে?'

এরপর প্রথম সুযোগেই আমি প্রফেসর চন্দ্রশেখরনের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করলামঃ টাইমলেস চেম্বারের এক্সপেরিমেন্টে আমি সাবজেক্ট হতে চাই। হিউম্যান সারকাডিয়ান রিদম্স-এর রিসার্চে পাইয়োনিয়ার হতে চাই।

চন্দ্রশেখরন স্বাভাবিক কারণেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রিসার্চ গ্রুপের সবাইকে ডেকে লাখটাকার খবরটা শুনিয়ে হইহই করে তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। প্রিয়রূপ তখন অসহায় শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

মায়ের কথা মনে পড়ছিল আমার। এই একমাস মতো সময় আমাকে ছেড়ে থাকতে মায়ের হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই। এই সময়টা মেজোমাসিকে মায়ের কাছে এসে থাকতে বলেছি। এ ছাড়া রাতদিনের কাজের লোক তো আছেই!

ফ্যাসিলিটির দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে দেখি প্রিয়রূপ জল ভরা করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোপন সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয় ওর আর নেই। ও বোধহয় বেপরোয়াভাবে আমাকে আবার ফিরে পেতে চায়। সত্যি কি তাই? নাকি আমার বোঝার ভুল?

ফ্যাসিলিটির দরজা বন্ধ হতেই আমি যেন অদ্ভুত এক শান্তি পেলাম। উপাসনা-গৃহ যেমন চুপচাপ হয় এটাও ঠিক সেইরকম। একটু সময় নিয়ে আমি মনটাকে একজন বিজ্ঞানীর মনে পালটে নিতে চাইলাম। অ্যাশকফ আর ওয়েভারের কথা ভাবতে শুরু করলাম।

এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে ছোটখাটো একটা প্রস্তুতিপর্ব আছে। সেই সময়ে আমাকে টানা কয়েকদিন নিয়ম করে ঘুমোতে যাওয়ার সময় ও ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় নোট করতে হয়। তারপর 'সলিকর্ডার' নামের একটা যন্ত্র দিয়ে আমার শরীরে ভেতরের উষ্ণতা, যাকে বলে 'কোর বডি টেম্পারেচার', প্রতি ছ'মিনিট অন্তর মাপতে হয়। এই উষ্ণতার তথ্য সরাসরি একটি কম্পিউটারের মেমোরিতে জমা হয়ে যায়।

উষ্ণতা মাপার একটা কারণ আছে। যদিও মানুষকে বলা হয় 'হোমিওথার্ম'—মানে, স্থির উষ্ণতাবিশিষ্ট প্রাণী—তা সত্ত্বেও দেখা গেছে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষের শরীরের উষ্ণতার দু-ডিগ্রি সেলসিয়াস মতো হেরফের হয়। দিনের মাঝামাঝি সময়ে উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি হয়। আর যখন আমরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকি তখন উষ্ণতা সবচেয়ে কম হয়। এই উষ্ণতা-চক্রের পর্যায়কাল মোটামুটিভাবে চব্বিশ ঘণ্টা।

সময়হীন পরিবেশে থাকার সময় উষ্ণতা-চক্রের কীরকম পরিবর্তন হয় সেটা ঠিকমতো জানার জন্যে পরীক্ষার আগে, পরীক্ষার সময়, আর পরীক্ষার পরে নিয়ম করে উষ্ণতা মাপা হয়।

ফ্যাসিলিটির মধ্যে ঢোকার পর আমার জীবন থেকে সময় ব্যাপারটা একেবারে মুছে গেল। ঘুমোতে যাওয়ার তাড়া নেই, জেগে ওঠার তাড়া নেই, ইন্সটিটিউটে রওনা হওয়ার জন্যে নিত্য যে স্নান-খাওয়ার হুড়োহুড়ি তা-ও নেই। আমাকে কেউ কোনওরকম কাজের তাড়া দেবে না। কারও আদেশ পালন করতে হবে না আমাকে। কারও মন রেখেও চলতে হবে না। এ আমার একার জীবন। এ শুধু নিজের জন্যে বেঁচে থাকা!

আনমনাভাবে এসব কথা ভাবতে-ভাবতে আমি পুশ বাটন বসানো প্যানেলের কাছে গেলাম। প্রত্যেকটা বোতামের নীচে তার কাজের ধরন সংক্ষেপে লেখা আছে। যেমন, আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলেই একনম্বর বোতামটা টিপে দিতে হবে।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছ'নম্বর বোতামটা টিপতে হবে। এরকম আরও নানারকম কাজের জন্যে নানান বোতাম। আমি বোতাম টিপলেই বাইরে বসানো 'ইভেন্ট রেকর্ডার' নামের একটা যন্ত্রে সেটা নিয়ম করে রেকর্ড হয়ে যাবে। একইসঙ্গে ফ্যাসিলিটির বাইরে যেসব গবেষক রয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন চেম্বারের ভেতরে আমি কী করছি। আমার প্রতিটি কাজের ওপরে তাঁরা বৈজ্ঞানিক নজরদারি করতে পারবেন।

এ ছাড়া আরও একটা কাজ আমাকে করতে হবে। সময় মাপার জন্যে দু-ঘণ্টা পার হয়েছে মনে হলেই প্যানেলের আট নম্বর বোতামটা আমাকে টিপতে হবে। আসল সময়ের সঙ্গে আমার মাপা সময় তুলনা করে বোঝা যাবে টাইমলেস চেম্বারে বসে আমি কতটা ঠিকঠাকভাবে সময় মাপতে পেরেছি।

আমার বাঁ-হাতে লাগানো রয়েছে একটা 'অ্যাক্টিভিটি মনিটর'। এটা দিয়ে আমার সবরকম চলাফেরার তথ্য পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই এক ঝকমারি। শরীরের এখানে-ওখানে যন্ত্রপাতি আর সেন্সর লাগানো অবস্থায় আমার চেহারা হয়েছে দেখার মতো।

ফ্যাসিলিটির প্রমাণ মাপের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। হাসিটা আমি বেশ তৃপ্ত করে উপভোগ করলাম।

এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে স্রেফ বোতাম টেপা ছাড়া আমার আর খুব বেশি কিছু করার ছিল না। তাই গান-বাজনা শুনে, সিনেমা দেখে, শুয়ে-বসে সময় কাটাতে লাগলাম। আর মাঝে-মাঝে গল্প-উপন্যাস কিংবা ক্রোনোবায়োলজির বইপত্র নিয়ে ডুবে গেলাম। বাকি সময়টা নতুন-নতুন রান্না নিয়ে উদ্ভট সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলাম। ফ্যাসিলিটির এক্সপেরিমেন্টে যারা সাবজেক্ট হয় তাদের সাধারণত নিজের খাবারদাবার নিজেকেই রান্না করতে বলা হয়। তা না হলে নানারকম ঝামেলা হয়। ওই যে, মারিমুথু রাত তিনটের সময় ইড্‌লি খেতে চেয়েছিল!

আমি নিজস্ব একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করে নিয়েছিলাম। তাতে আমার অনুমান অনুযায়ী রোজকার তারিখ, বার, সব লিখে রাখছিলাম। আমার হিসেবমতো চারদিন কেটে যাওয়ার পর আমার মন খারাপ হওয়া শুরু হল। তখন আমি মন ভালো করার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে লাগলাম।

'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে...।'

'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে...।'

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে...।'

অনেকক্ষণ ধরে গান শোনার পরেও যখন মন খারাপ ভাবটা পুরোপুরি গেল না তখন আমি মায়ের একটা ক্যাসেট টেপরেকর্ডারে বাজাতে শুরু করলাম।

মা নিয়মিত গীতা পাঠ করেন। তারই খানিকটা অংশ আমি ক্যাসেটে টেপ করে এনেছি। এখানে নির্জনে বসে শোনার জন্যে।

'পূর্বে আমি কখনও ছিলাম না এমন নহে, তুমি কখনও ছিলে না তাহা নহে বা এই নৃপতিগণও ছিলেন না—ইহা সত্য নহে। এই দেহধারণের পূর্বে আমরা সকলেই নিত্য আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম। এই দেহত্যাগের পরেও যে আমরা কেহ থাকিব না, ইহাও নহে। বর্তমানে দেহসত্ত্বেও আমরা নিত্য আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছি এবং দেহান্তে ভবিষ্যতেও নিত্য আত্মরূপে বিরাজমান থাকিব।...'

কিছুক্ষণ পর টেপরেকর্ডার বন্ধ করে দিলাম।

মন খারাপের এককণা কিন্তু থেকেই গেল। কারণ, প্রিয়রূপের ব্যাপারটা থেকে কিছুতেই আমি মনটাকে পুরোপুরি ফেরাতে পারছিলাম না।

প্রিয়রূপের লেখা অনেক চিঠি আমার কাছে আছে। রাগ, দুঃখ, অভিমানে ওগুলো কখনও আমি নষ্ট করিনি। এমনই আমার হতচ্ছাড়া মন যে, ফ্যাসিলিটিতে আসার সময় ওগুলো আমি সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি।

চিঠির প্যাকেটটা নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুধু মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলাম। তারপর চিঠিগুলো বের করে একে-একে পড়তে শুরু

করলাম।

প্রেমপত্র প্রেমপত্রই। তাতে কখনও বয়েসের ছাপ পড়ে না। যে লেখে, যাকে লেখে, তাদের বয়েস শুধুই প্রেমে পড়ার বয়েস। তাদের পরিচয় শুধুই প্রেমিক-প্রেমিকা।

চিঠিগুলো পড়তে-পড়তে আমার কান্না পেয়ে গেল। কান্না পাবে জানতামই। তবুও কেন যে দুঃখ পেতে চাইলাম!

টেবিল-ল্যাম্পের আলো আবছাভাবে ঘরের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন এক অদ্ভুত আলোছায়ায় গোটা ঘরটা ভাসছে। আমার চাপা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ কোথাও নেই। আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে শেষ হয়ে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে একা থাকার একটা অলৌকিক ভয় আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চিঠিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে আমি বিছানায় আর্তভাবে ছটফট করতে লাগলাম। আমার ভাঙাচোরা কান্না কেমন জন্তুর গোঙানির মতো শোনাচ্ছিল।

ঠিক তখনই ঘরের কোণে আলোছায়া মেখে দাঁড়ানো পুরুষটিকে আমার নজরে পড়ল।

কান্না থামিয়ে চমকে উঠে বসলাম বিছানায়। নজর তীক্ষ্ণ করে পুরুষটিকে দেখতে চেষ্টা করলাম।

লম্বা বেশি নয়। তবে পেশিবহুল সুপুরুষ চেহারা। সেটা গায়ের হালকা নীল জামার আড়ালেও বোঝা যাচ্ছে। নাক টিকোলো। আর চোখের নজর এতটাই তীব্র যে, অন্তর ভেদ করে যায়।

আমি সুইচ টিপে আলো জ্বালতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হাত তুলে ইশারায় বারণ করল সে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আলো জ্বেলো না, সজনী। এই হালকা আলোই ঠিক আছে।'

'কে তুমি...মানে, আপনি?'

গালে টোল ফেলে হাসল তরুণ, বলল, 'আপনি নয়, তুমি। আমি কে সেটা একটু আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। আমার নাম...ধরে নাও রূপক।'

কথা বলতে-বলতে রূপক এগিয়ে আসতে লাগল আমার বিছানার কাছে। আলতো গলায় বলল, 'তুমি কাঁদছ কেন? কীসের দুঃখ তোমার? আমি তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেব।'

রূপক আমাকে অবাক করে দিল।

ফ্যাসিলিটির ভেতরে ও কেমন করে এল? ও নিশ্চয়ই আগে থেকেই এর ভেতরে লুকিয়ে ছিল! নাকি পরে কায়দা করে এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে? কিন্তু বাইরে তো গোপাল-প্রিয়রূপের দল অতন্দ্র পাহারায় রয়েছে!

আমি অবাক হয়ে তখনও রূপকের রহস্য ভাবছি, রূপক কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর ছোঁয়ায় কোনওরকম সঙ্কোচ, দ্বিধা বা আড়ষ্টতা নেই। আর আমিও কেন যেন বাধা দিতে পারলাম না!

তারপর রূপক আমাকে চুমু খেল। বিড়বিড় করে আমার নাম বলতে লাগল বারবার, আর নামপিছু যেখানে-সেখানে একটা করে চুমু।

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোমাঞ্চিত হতে লাগলাম। আমার শরীরের যৌবনের তলানিটুকু আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল। যেন নির্বিষ সাপ অনেকদিন পর ছোবল মারা বিষ ফিরে পেয়েছে।

আনন্দে উত্তেজনায় আমি ভেসে গেলাম। ভুলে গেলাম প্রিয়রূপের দুঃখ, যে-বিছানা একটু আগেই কান্নায় ভেসে যাচ্ছিল এখন সেখানে আনন্দের বন্যা। সময়হীন ফ্যাসিলিটির ভেতরে যে এরকম সুযোগ-সুবিধে আছে সে-কথা কে জানত!

রূপককে নিয়ে আমার গোপন সংসার চলতে লাগল।

আমার যখন রান্নাবান্না বা কাপড়কাচার কাজ থাকে তখন রূপক আসে না। যখন আমি এক্সপেরিমেন্টের নানান ডেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকি তখনও ও আসে না। যখন আমি অলসভাবে অবসর সময় কাটাই তখনই ও আসে—প্রবলভাবে আসে।

আমার ক্যালেন্ডারের হিসেবমতো ঠিক পাঁচদিন পর রূপক চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, ‘সজনী, এবার ফেরার পালা। আমি যাই?’

আমার কান্না পেয়ে গেল। ওকে আঁকড়ে ধরে বললাম, ‘আমাকে একা ছেড়ে যেয়ো না। একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে।’

ও বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘কিছু করার নেই—আমাকে যেতেই হবে।...তবে আবার আমি আসব...।’

‘কবে?’

‘জানি না। হয়তো অন্য চেহারায়...অন্য নামে।’

রূপ চলে গেল। কোথায় গেল জানি না।

কিন্তু একদিন পরেই ও আবার ফিরে এল। হয়তো ঠিক ও নয়—ওরই মতো কেউ। ওর চেয়ে অনেক লম্বা, আরও ফরসা, তবে স্বাস্থ্য রূপকের মতোই—একেবারে ফেটে পড়ছে।

আমি তখন ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচার পাট শেষ করে শাওয়ার খুলে স্নান করব বলে তৈরি হচ্ছি।

হঠাৎই প্রিয়রূপের কথা মনে পড়ে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল—ঠিক তখনই নতুন পুরুষটিকে আমি দেখতে পেলাম। আরব্যরজনীর গল্পের মতো হুস করে কখন যেন স্নানঘরে এসে হাজির হয়েছে।

‘কে তুমি!’ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

উত্তরে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে বলল, 'আমি প্রিয়ব্রত। তোমাকে ভালোবাসতে এসেছি। তোমার কান্না মুছিয়ে দিতে এসেছি।'

প্রিয়ব্রত আমার ঘাড়ের কাছে চুমু খেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই স্নানঘরে জলের ঝরনার নীচে আমাদের ভালোবাসার গান শুরু হয়ে গেল।

রূপকের মতোই বেশ কয়েকটা দিন সুন্দরভাবে কেটে গেল প্রিয়ব্রতর সঙ্গে। আমার অবসর সময়ে ও দেখা দিতে লাগল। বাকি সময়টা—আমি যখন বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম—প্রিয়ব্রত আমার কাছে আসত না। আনাচেকানাচে কোথায় লুকিয়ে থাকত কে জানে!

একদিন প্রিয়ব্রত চলে গেল।

কিন্তু তার পরই আমার একা থাকার দুঃখ ভোলাতে এল স্বরূপ।

তারপর—স্বরূপের পরে—এল সুপ্রিয়।

ওদের এই নিয়মিত আসা-যাওয়ায় আমার মনটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। নানান ভুল হচ্ছিল এক্সপেরিমেন্টের কাজে। বাইরের গবেষকরা যে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন সেটা ওঁদের পাঠানো চিরকুট পড়েই বুঝতে পারছিলাম।

ওঁদের আমি রূপকের কথা বলিনি। বলিনি যে, ফ্যাসিলিটির ভেতরে আমি একা নই। আমার সঙ্গে চার-চারজন সুপুরুষ যুবক—রূপক, প্রিয়ব্রত, স্বরূপ আর সুপ্রিয়—এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

আমার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফ্যাসিলিটিতে আমার বাইশদিন কেটেছে। হেড বলেছিলেন আমাকে অন্তত একমাস একা থাকতে হবে। তখন একটা মাস অনেক লম্বা সময় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন—ওরা চারজন আসার পর—মনে হচ্ছে একমাসের বদলে একবছর হলেও বা ক্ষতি কী!

কিন্তু না। আমার রিসার্চ গ্রুপের পণ্ডিতরা বোধহয় আমার ওপরে আর ভরসা করতে পারলেন না। বাইশদিন শেষ হতেই ওঁরা আমাকে ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন।

বাইরে আসার পর ওঁরা আমাকে তারিখ জিগ্যেস করলেন। আমি বললাম, ২৬ মে। ওরা জানালেন, না, ৮ জুন। আমার জীবনের তেরোটা দিন আমি হারিয়ে ফেলেছি! অবশ্য এটা বোঝার কোনওরকম উপায় ছিল না। 'আমার' ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমি ওঁদের যে-দিন জানিয়েছি, ওঁরা আমাকে ঠিক সেইদিনের খবরের কাগজ নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমাকে ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে ওঁরা নানান প্রশ্ন করছিলেন। আমার কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যাবতীয় ডেটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন। গন্টিপ্রসাদ চন্দ্রশেখরন বললেন, 'সজনী, তুমি তো বেশ রোগা হয়ে গেছ দেখছি! হাউ ডু য়ু ফিল?'

আমি শুকনো হেসে বললাম, 'আই অ্যাম ও. কে., স্যার।'

ওজন নিয়ে দেখা গেল আমার ওজন পাঁচ কেজি কমেছে। ফ্যাসিলিটির ভেতরে 'আমার একদিন' গড়ে ছিল প্রায় ছেচল্লিশ ঘণ্টা! কিন্তু টেম্পারেচার সাইক্‌ল মোটামুটি চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল। ফলে স্লিপ-ওয়েক সাইক্‌ল আর টেম্পারেচার সাইক্‌ল ডিসিনক্রোনাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমার মেয়েলি ব্যাপারটা আটাশ দিন পরই হয়েছে। 'আমার' আটাশ দিন নয়, সত্যিকারের আটাশ দিন।

দু-দিন ধরে চলল এইসব পরীক্ষার ধকল। তার মধ্যে মা-কে একবার দেখতে গিয়েছিলাম। আর প্রিয়রূপের অসংখ্য প্রশ্ন আর কথার জবাবে কয়েকটা মাত্র 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করেছি। ওর কথা আমার তেমন করে আর মনে পড়ছে না।

চারদিনের দিন আমাদের রিসার্চ গ্রুপের মিটিং বসল।

আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে নতুন কী-কী জানা গেল তা নিয়ে টেকনিক্যাল ডিসকাশন হল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতামত জানাচ্ছিলেন। আমার সাহস আর নিষ্ঠা নিয়ে চন্দ্রশেখরন এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমাকে পনেরোদিনের ছুটি উপহার দিলেন।

প্রিয়রূপ আমার সাতকাহন প্রশংসা করার পর বলল, 'ইতিহাসে সজনীর নাম লেখা থাকবে তা নয়। সজনী হ্যাজ বিকাম হিস্ট্রি। আর আমি আরও প্রশংসা করব ওর মনের জোরের। ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে আসার পর ও যেরকম নির্লিপ্ত শান্ত রয়েছে, তা সত্যিই আশ্চর্যের। আমার ধারণা অন্য কেউ হলে এতদিন পর মানুষের সঙ্গ পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বাসে টগবগ করে ফুটত। ও যে পঁয়তিরিশটা দিন ওই টাইমলেস চেম্বারে একা কাটিয়েছে, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাবেন না!'

প্রিয়রূপ একটা হাত তুলে হাসিমুখে আমাকে বোধহয় অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিল। অন্য কেউ-কেউ সবে হাততালি দিতে শুরু করেছেন। ঠিক তখনই আমি অবাক হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ইশারায় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ফ্যাসিলিটিতে আমি তো একা ছিলাম না!'

মিটিং রুমের ভেতরে আকাশ ভেঙে পড়ল।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বিশাল টেবিল ঘিরে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখে পলকে বিস্ময় জায়গা করে নিল।

আমি ওঁদের রূপক, প্রিয়ব্রত, স্বরূপ আর সুপ্রিয়র কথা বললাম। বললাম, ওদের সঙ্গে আমি কীভাবে সময় কাটিয়েছি।

প্রিয়রূপের মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। চন্দ্রশেখরন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ধমকের সুরে বললেন, 'কীসব আবোল-তাবোল বকছ, সজনী! স্টপ অল দিজ ননসেন্স!'

প্রিয়রূপ আর্তগলায় আমার নাম ধরে ডেকে উঠল।

আমি ওদের প্রতিক্রিয়ায় কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করে রূপকদের কথা আবার বললাম। বললাম, ওরা এখনও ফ্যাসিলিটিতে রয়েছে। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি আবার ওখানে ফিরে যেতে চাই—আর কোনওদিন ওই টাইমলেস চেম্বার থেকে বেরোতে চাই না। কারণ, বাইরের চেয়ে ভেতরটা অনেক ভালো।

প্রিয়রূপের মুখ ভেঙেচুরে গেল। ও কেঁদে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছুটে চলে এল আমার কাছে। একটা হাত চেপে ধরে ডুকরে উঠল, 'সজনী! সজনী! কী হয়েছে তোমার!'

আমি প্রিয়রূপকে টের পেলাম না। একই কথা বারবার বলে চললাম।

চন্দ্রশেখরন কপালে হাত চাপড়ে বলে উঠলেন, 'মাই গড! ওর দেখছি মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। গোপাল, তুমি এক্ষুনি সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর রাওকে ফোন করো। বলো, একবার আমাদের ডিপার্টমেন্টে চলে আসতে। দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি।

গোপাল টেলিফোনের দিকে ছুটে গেল। অন্য সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ঘিরে ধরলেন আমাকে। একটা হইহই শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু কোনও কিছুই আমার মনে দাগ কাটছিল না। আমি ওই চারজন সুপুরুষের কথা ভাবছিলাম। ফ্যাসিলিটির ভেতরে ছায়া-ঘেরা আনাচেকানাচে ওরা কী আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

তাই অবাক হয়ে চন্দ্রশেখরনের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় আমি বললাম, 'স্যার, আপনারা এরকম করছেন কেন! আমার কিচ্ছু হয়নি।'

প্রিয়রূপ আর সইতে পারল না। আমার পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে টেবিলে মাথা এলিয়ে দিল। তারপর ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

ঘরের কোনও কিছুই আমার মনে কোনওরকম আঁচড় কাটছিল না।



ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে

চলমান ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে 'ফানল্যান্ড'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল স্নিগ্ধপ্রভাত। এই এলাকায় ফানল্যান্ড সাইবার-ক্যাসিনোর জুড়ি নেই। ইন্টারনেটে হরেকরকম জুয়াখেলার ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই আছে হালকা-চড়া নেশার ব্যাপক আয়োজন।

পকেট থেকে একটা 'লাভ মি' টফি বের করে মুখে পুরে দিল স্নিগ্ধপ্রভাত। এই টফিটায় ঝিমঝিমে নেশা হয়। আসল নেশার আগে এটা গৌরচন্দ্রিকার কাজ করে। যার ফলে খুব অল্পদিনেই এই টফিটা বাজার মাত করে দিয়েছে।

'লাভ মি'-র দৌলতে স্নিগ্ধপ্রভাতের মুখের ভেতরটা ঠান্ডা আর মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর মাথার ভেতরটা হালকা উলের বলের মতো লাগছিল। ও মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।

আকাশে অনেকগুলো আলোর বিন্দু উল্কার মতো ছুটোছুটি করছিল। ওগুলো 'ফ্লোট্যাক্সি'। হ্যালোজেন হেডলাইট জ্বেলে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আকাশপথে ছুটে যাচ্ছে। হেডলাইটের আভা কালো আকাশে সোনার তরোয়াল বলে মনে হচ্ছিল।

সোনা থেকেই স্বর্ণদ্যুতির কথা মনে পড়ে গেল। স্বর্ণদা। কতদিন স্বর্ণদার সঙ্গে দেখা নেই! প্রায় পাঁচবছর। কিন্তু ইদানীং রোজই কোনও-না-কোনও ছলছুতোয় স্বর্ণদ্যুতির কথা স্নিগ্ধপ্রভাতের মনে পড়ে যায়। বছর ছ'-সাত আগে ওই মাতাল মানুষটা যা-যা বলেছিল সেগুলো কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় স্নিগ্ধপ্রভাতের জীবনে সত্যি হতে শুরু করেছে।

সেসময়ে স্নিগ্ধপ্রভাত বি-ইলেভেন সিটিতে ছিল। মনের সুখে চাকরি করত আর জীবনটাকে দু-হাতে লোফালুফি করত। সন্ধে হলেই সাইবার-ক্যাসিনো। নেশার ট্যাবলেট, মদ, ইন্টারনেট জুয়া, আর হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজ।

বেশ কাটছিল দিনগুলো। এখন সেইসব দিনের কথা মনে পড়লেই ডানা ঝাপটাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওই ইচ্ছে পর্যন্তই। এখন স্নিগ্ধপ্রভাতের ডানা ভারী হয়ে গেছে।

স্বর্ণদ্যুতি ওর চেয়ে অন্তত দশবছরের বড়। কিন্তু সাইবার-ক্যাসিনোয় আলাপ হওয়ার পরই কেমন করে যেন আলাপটা খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতার দিকে বাঁক নিয়েছিল। স্বর্ণদ্যুতি রাতারাতি 'স্বর্ণদা' হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে ক্যাসিনো-ট্যাসিনোয় আলাপ-টালাপ হলে নাকি এইরকমই হয়।

স্বর্ণদ্যুতিকে সবসময় কেমন মনমরা দেখাত। নেশা করতে-করতে বিড়বিড় করে বলত, 'লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং শ্যাডো...।'

স্বর্ণদ্যুতি বিয়ে করেছে প্রায় পঁচিশ বছর। তাই নানারকম আবেগের উথালপাথাল বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন বোধহয় অবশেষটুকু আঁকড়ে ধরে ও বেঁচে আছে।

একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচতে স্বর্ণদ্যুতি জুয়াড়ি হয়েছে। আর স্নিগ্ধপ্রভাত চিরকাল একা থাকবে, স্বাধীন থাকবে, খামখেয়ালি জীবন কাটাবে—এই উদ্দাম ভাবনা থেকে জুয়ার নেশায় জড়িয়েছে।

স্বর্ণদ্যুতি প্রায়ই বলত, 'তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে একদিন নিয়ে যাব।' অথচ নিয়ে যেত না।

শহরের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার এলাকায় স্বর্ণদ্যুতির ফ্ল্যাট। স্নিগ্ধপ্রভাতের সে-ফ্ল্যাট দেখার কৌতূহলও ছিল। সুতরাং ও অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ মনে পড়ে, একদিন একফোঁটা হুইস্কি কনসেনট্রেট খেয়ে স্বর্ণদ্যুতির বেশ টালমাটাল অবস্থা—তখন হঠাৎই ও স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত ধরে টান মেরেছেঃ 'চলো, আজ তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাব। আজই সুবিধে...।'

কীসের সুবিধে কে জানে! স্নিগ্ধপ্রভাত আর আপত্তি করেনি।

সাইবার-ক্যাসিনো থেকে ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

পকেট থেকে ছোট্ট রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে সিগন্যাল দিল স্বর্ণদ্যুতি। একটা ফ্লোট্যাক্সি কোথা থেকে এসে ঝুপ করে নেমে পড়ল ওদের পায়ের কাছে।

গাড়িতে উঠে স্বর্ণদ্যুতি ফ্ল্যাটের কো-অর্ডিনেট বলল। ফ্লোট্যাক্সিটা আবার ভেসে পড়ল আকাশে।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই স্বর্ণদ্যুতি জড়ানো গলায় বলল, 'এই হল আমার ফ্ল্যাট।'

স্নিগ্ধপ্রভাত মুগ্ধ হয়ে ফ্ল্যাটটা দেখছিল।

স্বর্ণদ্যুতি বড়লোক ও জানত—তবে এরকম জঘন্য বড়লোক সেটা আগে বুঝতে পারেনি।

স্বর্ণদ্যুতির এক ছেলে, এক মেয়ে। বয়েস বাইশ আর উনিশ। ওর কাছেই শুনেছিল ছেলেমেয়ে দুজনেই খুব চৌকশ। এখন ওরা পড়াশোনা করছে। তবে ভবিষ্যতের ভাবনা-চিন্তা ওরা

আগেভাগেই সব ছকে রেখেছে।

সাইবার-ক্যাসিনোয় বসে কম্পিউটারের পরদার দিকে আনমনে তাকিয়ে স্বর্ণদ্যুতি বলেছিল, 'বুঝলে, আমার ওয়াইফ রত্নমঞ্জুষা বলে ওরও একটা ফিউচার আছে।' তেতো হাসল স্বর্ণদ্যুতিঃ 'ওদের তিনজনেরই ফিউচার আছে। আমার নেই। আমার শুধু পাস্ট। এইভাবেই কোনদিন পাস্ট টেন্স হয়ে যাব। নাকি শালা এর মধ্যেই হয়ে গেছি!'

চোখধাঁধানো ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণদ্যুতির কথাগুলো ভাবছিল স্নিগ্ধপ্রভাত।

বসবার ঘরে ঢুকে স্বর্ণদ্যুতি বলল, 'এখন ওরা কেউ নেই। ওরা যার-যার দারুণ সব জরুরি কাজে বেরিয়েছে। সব পাখি রাতে ফ্ল্যাটে ফিরবে। সেইজন্যেই তোমাকে এ সময়ে নিয়ে এসেছি।'

স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হলেও কিছু বলল না। ভাবছিল, আজ কি সাইবার-বার-এ বসে স্বর্ণদ্যুতি একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে!

'এবার তোমাকে একটা টপ সিক্রেট খবর দিই—।'

'কী, স্বর্ণদা?'

'এই ফ্ল্যাটের ভেতরে আরও চারটে ফ্ল্যাট আছে।'

'মানে!' স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হয়ে ফ্ল্যাটের চারপাশে তাকায়। অন্যান্য ঘরের দরজার দিকে দ্যাখে।

'হ্যাঁ, চারটে ফ্ল্যাট।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত ধরে টানতে-টানতে একটা ঘরের দরজার কাছে নিয়ে যায় স্বর্ণদ্যুতি।

'এ-ঘরটায় আমার ছেলে থাকে। এটা একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।'

সামান্য ভুলভাল পা ফেলে স্বর্ণদ্যুতি আর-একটা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'এ-ঘরটায় আমার মেয়ে থাকে। এটা একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট।'

তারপর স্বর্ণদ্যুতি এগিয়ে গেল সবচেয়ে বড় ঘরটার দিকে। মাতাল আঙুলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে স্নিগ্ধপ্রভাতকেও টেনে নিয়ে চলল।

ঘরের দরজায় এসে কেমন করে যেন হাসল স্বর্ণদ্যুতি। ড্বাল বেড খাটের দিকে আঙুল তুলে জড়ানো ভাঙা গলায় বলল, 'ওই খাটটায় দুটো ওয়ান রুম ফ্ল্যাট আছে। রোজ রাতে দুটো ফ্ল্যাট চুপচাপ পাশাপাশি শুয়ে থাকে—আমি আর রত্নমঞ্জুষা।'

স্নিগ্ধপ্রভাতকে টেনে এনে ড্রইংরুমের সোফায় বসাল স্বর্ণদ্যুতি। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওর দীর্ঘ শরীরটা সামান্য এপাশ-ওপাশ দুলছিল।

'ফ্ল্যাট-বাড়ির ডিফারেন্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে রিলেশানটা কেমন হয় জানো?'

মোটামুটি জানলেও স্নিগ্ধপ্রভাত চুপ করে রইল। কারণ, স্বর্ণদ্যুতি এখন বলতে চাইছে—হয়তো নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

'আমাদের মধ্যে রিলেশানটা এখন সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমরা যেন এক-একটা ফ্ল্যাট। পাশাপাশি আছি অথচ মাঝে মরুভূমির মতো বিস্তর ফাঁক। মানে, ধরো একটা মুক্তোর মালা—কিন্তু পাশাপাশি বসানো পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে যে-সুতোটা যায়, সেটাই নেই। বাইরে থেকে দেখে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না। মনে হবে মুক্তোর মালাটা ঠিকঠাকই আছে। তাই আমরা এখন ফ্ল্যাট...নাকি ত্রিশঙ্কু মুক্তো?...কে জানে!'

শেষদিকটায় স্বর্ণদ্যুতির গলা আবেগে ধরে গিয়েছিল। তারপর আচমকা ও হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাতের পায়ের কাছে। ওর কোলে মাথা রেখে কান্না-জড়ানো গলায় বলতে লাগল, 'সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে রে, সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে...।'

শেষদিকে ওর কথা জড়িয়ে গেল। স্নিগ্ধপ্রভাতকে আঁকড়ে ধরে ও বাচ্চা ছেলের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ওকে কী বিপন্ন, কী অসহায় লাগছিল!

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

ফুটপাথ ফানল্যান্ডের কাছে এসে পড়তেই নেমে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাত। কাচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের সিটিজেন কোড বলার সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

ফানল্যান্ডের ভেতরটা খুব ঠান্ডা আর চুপচাপ। শুধু হালকা মিউজিকের শব্দতরঙ্গ কোমলভাবে খেলে বেড়াচ্ছে।

সেন্টার স্টেজে হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজ চলছিল। দুটো মেয়ে—অথবা মেয়ের ছায়া—শরীর বেঁকিয়েচুরিয়ে এমনভাবে নাচছিল যেন ওরা রবারের তৈরি।

হলোগ্রাম-স্ট্রিপটিজের সুবিধে হচ্ছে উত্তেজিত দর্শক হামলে পড়ে নাচিয়েদের বিরক্ত করতে পারে না। ফলে হইচই গোলমালের কোনও ভয় নেই।

একটা টেবিলে বসে হুইস্কির অর্ডার দিল স্নিগ্ধপ্রভাত। আর তাতে প্রথম চুমুক দিতেই সুপর্ণলতিকার কথা মনে পড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা কেমন বিস্বাদ ঠেকল।

স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে সুপর্ণলতিকার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে।

গ্লাসে আবার চুমুক দিল স্নিগ্ধপ্রভাত।

ও যখন সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করে তখন স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ ছিল না। মোটামুটি চুপচাপই বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। শহরের সোল ডেটা ব্যাঙ্কে যখন ওদের বিয়ের

রেজিস্ট্রেশানটা স্টোর্ড হয় তখনই একটা নিয়ম ওদের বেঁধে ফ্যালেঃ অন্তত আট বছরের জন্যে ওদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে হবে।

গত শতকে আকছার ডিভোর্সের ব্যাপারটা এত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সরকার নতুন ম্যারেজ অ্যাক্ট চালু করতে বাধ্য হয়। সেসময়ে গড়ে এক-একজন নাগরিকের বিয়ের সংখ্যা ৩.৪-এ পৌঁছে গিয়েছিল। এত ডিভোর্স আর বিয়ের রেকর্ড রাখতে গিয়ে সরকারি দপ্তরের কাজের পরিমাণ যেমন বেড়েছিল, তেমনই বেড়েছিল হরেকরকম মামলা-মোকদ্দমা। এ ছাড়া সোল ডেটা ব্যাঙ্কের মেমোরিও লাগছিল প্রচুর।

সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করার সময় আট বছরের নিয়মটা আটশো বছরের হলেও স্নিগ্ধপ্রভাতের কোনওরকম আপত্তি ছিল না। তীব্র ভালোবেসে ও সুপর্ণলতিকাকে বিয়ে করেছিল। ওকে ভালোবেসে স্নিগ্ধপ্রভাত বুঝতে পেরেছিল, এই ভয়ংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও ভালোবাসার ব্যাপারটা একইরকম রয়ে গেছে। এই প্রবল টানকে বিজ্ঞান এখনও ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলোকেও স্নিগ্ধপ্রভাত ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেনি। বিয়ের দু-আড়াই বছর উদ্দাম মাতামাতির পর সবকিছু কেমন ধীরে-ধীরে বদলে গেল। বিকেল থেকে আকাশের রং পালটে ধীরে-ধীরে যেমন গোধূলি এবং সন্ধে হয়, ব্যাপারটা অনেকটা যেন সেইরকম।

তার পরের কয়েকটা বছরে একটা টাটকা ছটফটে মাছ ডিপ ফ্রিজের ভেতরে ঠান্ডা হিম হয়ে গেল। আর এখনও তাই।

কেন, কে জানে!

সুপর্ণলতিকা কি বড্ড বেশি কথা বলে? সবসময় কি ওর ঠোঁট নড়ে?

ঠোঁট। এই ঠোঁটের জন্য একদিন স্নিগ্ধপ্রভাতের ঠোঁট পাগল ছিল। কিন্তু দু-আড়াই বছরের মধ্যেই সে-পাগলামি স্তিমিত হয়ে গেছে। এখন ওর মনে হয় ধীরে-ধীরে ও আর সুপর্ণলতিকা দুটো ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। রাতে সেই দুটো ফ্ল্যাট পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকে। যেমন করে শুয়ে থাকত স্বর্ণদ্যুতি আর রত্নমঞ্জুষা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

নিভে যাওয়া সম্পর্ককে কি আবার দপ করে জ্বেলে দিতে পারে বিজ্ঞান? বোধহয় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার শরীরে আগুন ধরাতে পারে—মনে নয়।

একজন হলোগ্রাম-স্ট্রিপার নাচতে-নাচতে স্টেজ থেকে নেমে এসেছিল। মেয়েটা যেমন খুশি টেবিল-চেয়ার-মানুষকে ভেদ করে নাচের ভঙ্গিতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। একজন বেসামাল খদ্দের ওকে জাপটে ধরতে গিয়ে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

মেয়েটা যখন স্নিগ্ধপ্রভাতকে ভেদ করে চলে গেল তখন ও যেন সামান্য উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। মনটা ক্ষণিকের জন্য চনমনে হয়ে উঠল।

আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল জীবন কত ক্লান্তিকর, কত দীর্ঘ!

রাতে বাড়ি ফেরার সময় স্নিগ্ধপ্রভাত ভাবতে চেষ্টা করছিল ফানল্যান্ডটাই যেন ওর বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও সুপর্ণলতিকা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবনাটা তেমন জমছিল না।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে ও সুপর্ণলতিকার মুখোমুখি হল।

সুপর্ণলতিকা কোনও কথা বলল না। ঠান্ডা চোখে স্বামীর দিকে একপলক তাকিয়ে পামটপ কম্পিউটারে সেলাইয়ের গ্রাফিক্স দেখতে লাগল।

স্নিগ্ধপ্রভাত স্ত্রীকে দেখছিল।

সেই একইরকম মনোরম সৌন্দর্য মাখানো মুখ। সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি সেখানে। অথচ স্নিগ্ধপ্রভাত পলকের জন্যও কোনও টান অনুভব করল না।

ওর ভেতরে-ভেতরে কান্না পাচ্ছিল। রোজই এমন কান্না পায়।

একটা ঠান্ডা সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটানো যায় না কিছুতেই। অথচ ও চেষ্টা করেও ভেতর থেকে কোনও উষ্ণতা খুঁজে পায় না। ওর ভালোবাসা নির্ঘাত মরে গেছে। আর সেই মৃত শিশুটিকে কোলে নিয়ে ও বোকার মতো বোতল থেকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করছে।

স্নিগ্ধপ্রভাতের নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল। সুপর্ণলতিকার টান ও টের পায়। অথচ সেই টানের উত্তর দেওয়ার মতো ক্ষমতা ওর নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাত। ভাবতে চেষ্টা করল, ঠিক কবে থেকে ওরা ফ্ল্যাটে বদলে যেতে শুরু করেছে।

চোখ বুজে ডানহাত এলিয়ে দিল চোখের ওপরে।

ইস, কোনও ম্যাজিশিয়ান যদি পারত ওর ফুরিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিতে!

মাথার ভেতরে কেমন যেন দপদপ করছিল। কেউ যেন সেখানে পুঁচকে একটা হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠুক করে পেরেক ঠুকছিল। স্নিগ্ধপ্রভাতের মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন গোলাপের গন্ধ ওর নাকে এসে ঢুকছিল—এবং ওর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছিল।

দুটো ইচ্ছের লড়াই চলতে-চলতে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

সম্পূর্ণ অচেনা একটা ঘরে অচেনা একটা বিছানায় জেগে উঠল স্নিগ্ধপ্রভাত।

অবাক চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই রক্তের মতো টুকটুকে লাল একগুচ্ছ গোলাপ ওর নজরে পড়ল। বিছানার পাশেই স্বচ্ছ টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ ফুলদানি। বোধহয় অ্যাক্রিলিকের

তৈরি। ফুলদানির ওপরটা গোলাপের পাপড়িতে ঢাকা।

'ওঃ...আপনার ঘুম ভেঙেছে!'

গোলাপের দিক থেকে চোখ তুলল স্নিগ্ধপ্রভাত। চোখ পড়ল আর-এক গোলাপের দিকে।

সুন্দর লম্বাটে মুখ। ফরসা কপালে উজ্জ্বল টিপ। পরনে হালকা গোলাপি শাড়ি। পাতলা ঠোঁটে একচিলতে দুষ্টুমির হাসি। সেইসঙ্গে আবছা পারফিউমের ঘ্রাণ যেন টের পেল স্নিগ্ধপ্রভাত।

'আমি কোথায়?' প্রশ্নটা ওর নিজের কানেই কেমন বোকা-বোকা শোনাল।

'কোথায় আবার! আমার ফ্ল্যাটে!' কী সহজ স্বাভাবিক উত্তর দিল তরুণী!

'আপনি কে?'

খিলখিল করে হেসে উঠল। স্নিগ্ধপ্রভাতের শরীরের ভেতর দিয়ে ঝরনা বয়ে গেল।

'আমার নাম অঙ্গলাবণি।'

নামটা ঝংকার তুলল কানে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল ঠোঁটে। উচ্চারণ না করে স্নিগ্ধপ্রভাত সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল অঙ্গলাবণির মুখে।

এখানে ও কেমন করে এল!

জটপাকানো স্মৃতি হাতড়ে এই রহস্যের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করল।

ঝাপসাভাবে যেটুকু ও মনে করতে পারল সেটা হল, কাল রাতে ও ফানল্যান্ডে ছিল। ছোট-ছোট চুমুকে হুইস্কি খাচ্ছিল আর হলোগ্রাফিক ক্যাবারে দেখছিল। একটি রোগা মেয়ে সাপের মতো শরীরটা খেলিয়ে সিলিকোন-যৌবনের নগ্ন হাতছানি দিয়ে নাচছিল।

স্নিগ্ধপ্রভাত যখন পুরো বুঁদ হয়ে গেছে ঠিক তখনই একজন অচেনা লোক ওকে ডেকে নিয়ে গেছে ক্যাসিনোর বাইরে। বলেছে, কে একজন যেন একটা ইমার্জেন্সি খবর এনেছে স্নিগ্ধপ্রভাতের জন্য।

বাইরে বেরিয়ে একটা আলো-আঁধারি জায়গায় ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকটা হঠাৎই স্নিগ্ধপ্রভাতের নাক লক্ষ্য করে ফুঁ দিয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র কটু গন্ধ স্নিগ্ধপ্রভাতের নাকে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

'আমি এখানে কেমন করে এলাম?' অনেকক্ষণ পর ভেতরের প্রশ্নটা বাইরে বেরিয়ে এল।

'রাস্তায় আপনি সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলেন। আমি তুলে নিয়ে এসেছি। আপনার পকেটের জিনিসপত্র সব ওই টেবিলটার ড্রয়ারে আছে।'

আঙুল তুলে একটা টেবিলের দিকে দেখাল অঙ্গলাবণি। তার পাশেই একটা খোলা জানলা। তার কাচের শার্সিতে ভোরের রোদ। আর জানলার বাইরে ঝাঁকড়া গাছে দুটো বুলবুলি। অকারণেই

ডাকছে।

বুলবুলি দুটোকে কেমন যেন চেনা মনে হল।

'কোথায় পড়ে ছিলাম আমি?'

'চার নম্বর সুপারওয়ের ওপরে।—ফানল্যান্ড—সাইবার-ক্যাসিনোর পাশের একটা অন্ধকার জায়গায়...।'

একটু সময় নিল স্নিগ্ধপ্রভাত। তারপর আলতো গলায় কাল রাতের ব্যাপারটা যেটুকু মনে ছিল বলল।

'আপনি খুব জোর বেঁচে গেছেন। এই কায়দায় লুঠপাট করাটা এখন ভীষণ বেড়ে গেছে।'

'আপনার জন্যেই বেঁচে গেছি...।' কৃতজ্ঞতার সুরে বলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

হাসল অঙ্গলাবণি। কিছু বলল না। আয়ত চোখ মেলে স্নিগ্ধপ্রভাতকে দেখতে লাগল।

'আপনি ছাড়া এ-ফ্ল্যাটে আর কে-কে থাকে?'

আবার হাসলঃ 'কেউ না। আমি একা—।' তারপর কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, 'চলুন, হাত-মুখ ধোবেন চলুন—।'

অঙ্গলাবণির কথাবার্তায় কেমন যেন অধিকারের ভাব। কিন্তু স্নিগ্ধপ্রভাতের ভালো লাগল। ওর ভেতরে-ভেতরে বোধহয় বহুদিনের একটা আর্তি ছিল যে, কেউ ওকে অধিকার করুক। বাইরে থেকে নয়—ভেতর থেকে।

স্নিগ্ধপ্রভাত অঙ্গলাবণির মুখের রেখাগুলো পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

অচেনা এক পুরুষকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা বা সংশয়ের ছাপ নেই। বরং কোথায় যেন একটা কৌতুক ও কৌতূহল কাজ করছে।

হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল স্নিগ্ধপ্রভাত। অঙ্গলাবণির দেওয়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, 'আপনি খুব পরোপকারী...।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অঙ্গলাবণিঃ 'আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম নয়। নেহাত চাকরি ছাড়া আর কোনও কাজ নেই, তাই...। এই যেমন আপনার জন্যে ক'দিন অফিস ছুটি নিয়েছি...।'

নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিনটা কাটতে লাগল। কোনও কাজ নেই—শুধু বিশ্রাম আর আরাম। সেইসঙ্গে অঙ্গলাবণির মধুর শাসন, দু-একটা এলোমেলো কথা। স্নিগ্ধপ্রভাতের বেশ লাগছিল।

ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে ওদের কথা হচ্ছিল।

কাচের জানলায় রোদ এখন চড়া হয়েছে। আকাশ সকালের নীল থেকে চোখ-ধাঁধানো সাদাটে হয়ে গেছে।

মিউজিক সিস্টেমে হালকা সুর বাজছিল। তাতে কেমন একটা মিষ্টি আমেজ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।

'একা-একা এতবড় ফ্ল্যাটে থাকেন...ভয় করে না?'

'যত না ভয় তার চেয়ে বেশি মনখারাপ লাগত।'

'আপনি কি সারাজীবন একা না কি? কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আছে...।'

'জীবনের শুরুতে মা-বাবা-ভাই-বোন ছিল। তারপর স্বামী। আর তারপর...একা আমি।'

'আপনার হাজব্যান্ড এখন কোথায়?'

'এ-থ্রি সিটিতে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। বছরখানেক হল আমাদের কাটাকুটি হয়ে গেছে—।'

কাটাকুটি! শব্দটা কেমন যেন কানে বাজল।

স্নিগ্ধপ্রভাতের কপালে বোধহয় প্রশ্নের ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে অঙ্গলাবণি বলল, 'না—ডিভোর্স হয়নি। অফিসিয়ালি ডিভোর্স পেতে এখনও বছরদুয়েক বাকি।'

কথাটা বলে তেতো হাসল। স্নিগ্ধপ্রভাতের পাতে আরও একটু তরকারি দিল।

মুখে ভাত নিয়ে জড়ানো গলায় স্নিগ্ধপ্রভাত জিগ্যেস করল, 'আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?'

'ও ভীষণ বোর হয়ে গিয়েছিল। বলত, আমাদের ভালোবাসা নাকি ফুরিয়ে গেছে। এর পর তো আর একসঙ্গে থাকার কোনও মানে হয় না!'

'দারুণ!'

অঙ্গলাবণি অবাক হয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের চোখে তাকাল।

স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, 'রান্নাটা দারুণ হয়েছে।' তারপরঃ 'কী নাম আপনার হাজব্যান্ডের?'

'জেনে কী হবে!'

'তবু...জানতে ইচ্ছে করছে।'

'শোভনসুন্দর...।'

'নামটা চমৎকার—তবে মানুষটা নয়।'

'কী করে বুঝলেন?'

'আপনাকে ভালোবাসতে চায়নি, তাই।'

হাসল অঙ্গলাবণিঃ 'আমারও তো অনেক দোষ থাকতে পারে! চট করে কারও সাইড নেওয়া ঠিক নয়।'

'আপনার সাইড নিতে আমার ভালো লাগছে। এটা কিন্তু খোশামোদ নয়। আসলে প্রত্যেকের মনের ভেতরে ভালো লাগার একটা সুইচ আছে। ওটা যখন-তখন কোনও লজিক ছাড়াই অন-অফ হয়। আপনার বেলায় অন হয়ে গেছে।'

খেতে-খেতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল অঙ্গলাবণি। হাসি থামলে পর বলল, ‘সত্যি, আপনি এক অদ্ভুত মানুষ!’

শোভনসুন্দর। নামটা মনে-মনে বিড়বিড় করল স্নিগ্ধপ্রভাত। অঙ্গলাবণি আর শোভনসুন্দরের জীবনে ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে।

স্নিগ্ধপ্রভাত অবাক হয়ে যাচ্ছিল। অঙ্গলাবণির জীবনের সঙ্গে ওর এত মিল! কোন বিচিত্র এক দুর্ঘটনা দুজন সমান্তরাল মানুষকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দিল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ স্নিগ্ধপ্রভাতকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল অঙ্গলাবণি। তারপর আলতো করে ছুড়ে দিল একটি প্রশ্নঃ ‘আপনার বাড়িতে কে-কে আছে?’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নিগ্ধপ্রভাতের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল—বুকের ভেতরের প্রবল চাপটা শূন্য হয়ে গেল। মুখ সামান্য নীচু করে ও বলল, ‘সুপর্ণলতিকা—আমার ওয়াইফ।’

ও অবাক হয়ে খেয়াল করল, এতক্ষণে এই প্রথম ওর সুপর্ণলতিকার কথা মনে পড়ল। বাড়ি ফেরার জন্য ওর এতটুকুও মন টানল না।

‘আপনার বউয়ের কথা বলুন। সুপর্ণলতিকা নামটা কিন্তু দারুণ!’ অঙ্গলাবণিকে খুশি-খুশি দেখাল।

‘হ্যাঁ, দারুণ নাম—তবে অঙ্গলাবণির কাছে কিছু নয়।’

‘ওঁর কথা বলুন। কেমন মানুষ আপনার ওয়াইফ?’

‘ভালো।’ কিছুক্ষণ চুপচাপ খেতে লাগল স্নিগ্ধপ্রভাত। তারপরঃ ‘অনেকটা বোধহয় শোভনসুন্দরের মতো।’

অঙ্গলাবণি মুখ নামাল।

‘আপনাকে আর-একটুকরো মাছ দিই...।’

‘দিন।’

স্নিগ্ধপ্রভাতের কেমন অদ্ভুত লাগছিল। ঘরে ফেরার কোনও তাড়া নেই। ফিরতে ইচ্ছেও করছে না। বরং মনে-মনে ও একটা অ্যাডভেঞ্চার চাইছে। আর নিজেকে বেশ স্বাধীন মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, সুপর্ণলতিকাকে কেমন দেখতে? কাল বিকেলে ও কী যেন বলেছিল? দুটো ফ্লোট্যাক্সির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে...কোন স্পেস কো-অর্ডিনেটে যেন...?

নাঃ, ভালো করে কিছু মনে পড়ছে না।

মাথার ভেতরে টিপটিপ করে যন্ত্রণার একটা ধারা অবিরাম বয়ে চলেছিল। মাঝে-মাঝে অস্থির হয়ে ব্যথাটা জানান দিচ্ছিল।

একদিন দু-দিন করে তিনটে দিন পেরিয়ে গেল। শুয়ে-বসে অলস গল্প করে ওদের সময় কাটতে লাগল।

তিনদিনে স্নিগ্ধপ্রভাত পুরোপুরি সেরে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর এখানে থেকে যেতে মন চাইছিল। অথচ লজ্জায় সংকোচে অঙ্গলাবণিকে সে-কথা ও বলতে পারছিল না।

চারদিনের দিন অঙ্গলাবণি ওকে বলল, 'আপনি এখন ভালোই আছেন। আজ থেকে আমার অফিস যাওয়া শুরু। আপনি এই ফ্ল্যাটের পাহারায় রইলেন। কী, কোনও আপত্তি নেই তো!'

'না, আপত্তি নেই। তবে একা-একা থাকতে বোর লাগবে।'

'সেকী? শোভনসুন্দর তো উলটো কথা বলেছিল আমাকে। আমার সঙ্গে দোকা থাকতে-থাকতে ও বোর হয়ে গিয়েছিল।' হাসল অঙ্গলাবণি।

'আমি আমার কথা জানি—অন্যেরটা জানি না। তাই আমারটাই বললাম। নাকি আপনি বোর হয়ে যাচ্ছেন?'

'না, না—।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ শেষ করছিল অঙ্গলাবণি। আয়নার মধ্যে দিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন, আমার অফিস-বসটা একটা রোবট। কাজ ছাড়া আর কোনও নেশা নেই। এমনকী আমার দিকেও মুখ তুলে একপলক তাকায় না। মানে, যখন তাকায় তখন শুধু কাজের কথাই বলে।'

'আমি কিন্তু সেরকম না। বরং বেশ দুর্বল মানুষ।'

অঙ্গলাবণি আয়নায় হাসল।

আয়নাটা অ্যান্টিক। সুন্দর কারুকাজ করা।

সেদিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, 'দারুণ!'

সাজতে-সাজতে ভুরু তুলল অঙ্গলাবণিঃ 'আয়নাটা?'

'না—আয়নার ছায়াটা। আপনার ইমেজটা।'

'এটা কিন্তু ভারচুয়াল ইমেজ। একে আঙুলে ছোঁয়া যায় না।' হাসল ঠোঁটের কোণে।

'ভারচুয়াল ইমেজ থেকেই একদিন রিয়েল ইমেজে পৌঁছে যাব। তারপর সেখান থেকে অবজেক্টে। তখন ছুঁতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ভারচুয়াল রিয়েলিটি কিন্তু সত্যি নয়।'

'সত্যি না হোক—সত্যির কাছাকাছি তো বটে! তাতেই আমার সাধ মিটবে।'

'এত অল্পেতেই আপনি খুশি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে বলল স্নিগ্ধপ্রভাত, 'আসলে চেয়েছিলামই তো অল্প! তাই অল্প পেলেই খুশি। কিন্তু পেলাম কই!'

'দাঁড়ান, অফিস থেকে ফিরে এসে আপনার এই ফিলিংটা অ্যানালিসিস করতে হবে।'

ঠিক তখনই কথা-বলা-টেলিফোন মিষ্টি ধাতব গলায় বলে উঠল, 'ফোন এসেছে—ফোন ধরো।'

অঙ্গলাবণি 'ধরছি' বলতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল একজন প্রৌঢ়ের রঙিন মুখ।

চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। গালে ধপধপে সাদা চাপদাড়ি। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। নাকের নীচে সাদা পুরু গোঁফ। তারই আড়ালে একচিলতে হাসি।

'কেমন আছ, অঙ্গলাবণি?'

'এখনও পর্যন্ত ভালোই, ডক্টর—।'

'কোনও কমপ্লেন নেই?'

'না—একটুও না।'

'দ্যাখো, পেশেন্টকে আমি কিন্তু পুরোপুরি তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। হি ইজ অল ইয়োর্স। কোনও প্রবলেম হলে বলবে। আর ক'দিন যাক—তারপর তোমার বাড়িতে একদিন চা খেতে যাব।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, ডক্টর।'

'ও. কে., সি ইউ দেন...।'

পরদার ছবি মিলিয়ে গেল।

অঙ্গলাবণি বলল, 'টেলিফোন শেষ হয়েছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে পরদাটাও মিলিয়ে গেল। দেওয়ালটা আবার দেওয়ালের মতো হয়ে গেল। কথা-বলা-টেলিফোন বলল, 'ধন্যবাদ।'

এবার স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে ফিরে তাকাল অঙ্গলাবণিঃ 'উনি ডক্টর নীতিনপ্রকাশ। তোমার চিকিৎসা করছেন...।'

স্নিগ্ধপ্রভাত হাসলঃ 'ভুল বললে। আমি এখন তোমার চিকিৎসায় আছি।'

অনেক পরে, অঙ্গলাবণি 'টা-টা' করে অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর, স্নিগ্ধপ্রভাতের খেয়াল হল ওরা হঠাৎই 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছে। কিন্তু এরকম হঠাৎ নেমে এলেও ওরা কেউই কোনও হোঁচট খায়নি।

আচ্ছা, এটা কি নামা, না ওঠা?

অঙ্গলাবণি চলে যাওয়ার পর স্নিগ্ধপ্রভাতের মনখারাপ লাগছিল। এত বড় শৌখিন ফ্ল্যাটে ভীষণ একা-একা লাগছিল।

সুপর্ণলতিকাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়! কী করছে ও এখন?

সুতরাং ডাইনিং হলে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ও বলল, 'একটা ফোন করব।'

বলামাত্রই টেলিফোন জবাব দিল, 'কত নাম্বার বলো...।'

নম্বরটা ঠিকমতো মনে পড়ছিল না। কেমন যেন ঝাপসা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধপ্রভাতের মাথা টিপটিপ করছিল।

শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে একটা নম্বর বলল স্নিগ্ধপ্রভাত।

নম্বরটা বলা শেষ হতে-না-হতেই ও-প্রান্তে রিং বাজতে শুরু করল।

রিং হয়েই চলল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কেউ ফোন ধরল না। নিশ্চয়ই সুপর্ণলতিকা বাড়িতে নেই—কোথাও বেরিয়েছে। অথবা নম্বরটাই ভুলভাল হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নিগ্ধপ্রভাত বলল, 'লাইন ছেড়ে দাও।'

কথা-বলা-টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

দু-সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্গলাবণি স্নিগ্ধপ্রভাতের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। ও চোখের আড়াল হলেই স্নিগ্ধপ্রভাতের অন্তরে অসহায় পিপাসা জেগে ওঠে। এক অদ্ভুত টান ওকে অঙ্গলাবণির পরাধীন করে তোলে। সে-কথা একদিন, এক দুর্বল মুহূর্তে অঙ্গলাবণিকে বলেও ফ্যালে।

ইলেকট্রনিক অরগ্যানের মতো মিষ্টি শব্দের ঢেউ খেলিয়ে হেসে ওঠে অঙ্গলাবণি। তারপর বলে, 'এ কী ছেলেমানুষি! ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে তোমার এই ইলিউশানের কথা বলতে হবে।'

'ইলিউশান! মায়া! তোমাকে মনে-মনে চাওয়াটা স্রেফ মায়া! সত্যি নয়?'

'কী জানি! ডক্টর হয়তো তা-ই বলবেন।'

'এই যে তোমাকে ছুঁতে না পেলে আমার মন কষ্ট পাচ্ছে—এটাও মায়া?'

'হতেও তো পারে—।'

আচমকা স্নিগ্ধপ্রভাত অঙ্গলাবণির দিকে ঝুঁকে পড়ল। আকুলভাবে জড়িয়ে ধরল ওকে। এবং ঠোঁটে চুমু খেল।

এক আশ্চর্য উত্তাপ এক শরীর থেকে অন্য শরীরে বয়ে গেল। উত্তাপ না হয়ে সেটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গও হতে পারে।

দুটো শরীর গলতে শুরু করল। কেউই আর নিজের আয়ত্বে ছিল না। মন যা-যা চাইছিল শরীর তা-ই করতে শুরু করল।

এতদিন ধরে যে-সংযম দুজনে মেনে চলছিল একটি মুহূর্তে সেটা মিথ্যে হয়ে গেল।

একসময়, খানিকটা শান্ত হওয়ার পর, স্নিগ্ধপ্রভাত বলে ফেলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

'সুপর্ণলতিকা?'

'অসম্ভব।'

হাসল অঙ্গলাবণি। বলল, 'আমার অবস্থাটাও একইরকম। এখন বুঝলাম তোমার মধ্যে কতরকম অস্থির পাগলামি লুকিয়ে আছে। শোভনসুন্দর কখনও আমাকে এরকম পাগলের মতো আদর করেনি।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের কাছ থেকে সরে এল অঙ্গলাবণি। বলল, 'ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে একটা ফোন করি।'

সে-কথা শুনতে পেয়ে কথা-বলা-টেলিফোন বলে উঠল, 'নাম্বার বলো—।'

নম্বর বলল অঙ্গলাবণি। এবং ও-প্রান্তে ফোন বাজতে শুরু করল।

ডক্টর ফোন ধরতেই ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গেল। সেখানে ডক্টর নীতিনপ্রকাশকে দেখা গেল।

'হাউ আর য়ু, মাই লেডি?'

'ফাইন। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনাকে এখুনি একবার আমার ফ্ল্যাটে আসতে হবে।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আপনি এলে পর বলব।'

নীতিনপ্রকাশ হাসলেনঃ 'কী, আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে?'

'জানি না। আপনি এলে সব বলব।'

'টেলিফোন শেষ হয়েছে' বলে ফোন ছেড়ে দিল অঙ্গলাবণি। টেলিফোন ওকে যথারীতি ধন্যবাদ জানাল।

টেলিফোনের কথাবার্তা শুনে স্নিগ্ধপ্রভাত একটু অবাক হয়েছিল।

ওর যেন মনে হচ্ছিল, ডক্টর নীতিনপ্রকাশ আর অঙ্গলাবণির মধ্যে কী এক গোপন খেলা চলছে। আর সে-খেলাটা ওকে নিয়েই।

তা হলে কি নীতিনপ্রকাশই শোভনসুন্দর? আড়ালে থেকে পরকীয়া সহবাসের ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে মানতেই হবে, এ বড় নিষ্ঠুর পরীক্ষা।

নিজেকে গিনিপিগ ভাবতে স্নিগ্ধপ্রভাতের বেশ খারাপ লাগল।

'কীসের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে, অঙ্গলাবণি?'

উত্তর না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'ডক্টর এলেই সব জানতে পারবে।'

ডক্টর নীতিনপ্রকাশ চেয়ারে বসে কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে ছিলেন স্নিগ্ধপ্রভাতের দিকে। ওঁকে ঠিক টিভি-পরদার রঙিন ছবির মতোই লাগছিল।

অঙ্গলাবণি তিনজনের জন্য কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওঁদের সামনের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে ইশারায় চুমুক দিতে বলল। তারপর নিজে একটা কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল। সেই ঠোঁট, যেখানে স্নিগ্ধপ্রভাতের ঠোঁটের ছোঁয়া লেগে আছে।

'কফিটা কেমন হয়েছে?' ডক্টর স্নিগ্ধপ্রভাতকে জিগ্যেস করলেন।

'দারুণ!' মুখে তৃপ্তির শব্দ করল স্নিগ্ধপ্রভাত।

'আপনি কেমন আছেন?'

বেশ অবাক হয়ে নীতিনপ্রকাশের চোখে তাকাল স্নিগ্ধপ্রভাতঃ 'কেন, ভালোই তো আছি!'

'আমরাও তা-ই চাই।' হাসলেন ডক্টর।

তারপর চশমাটা চোখ থেকে খুলে কাচদুটোয় মুখের ভাপ দিলেন। জামার আস্তিনে ঘষে কাচদুটো পরিষ্কার করলেন।

চশমা না থাকায় নীতিনপ্রকাশের চোখদুটো ছোট-ছোট দেখাচ্ছিল।

'স্নিগ্ধপ্রভাত, আপনাকে আজ আমি একটা নতুন টেকনোলজির কথা শোনাব—এম. এম. টেকনোলজি। যার পুরো নাম হল মেমোরি ম্যাপিং টেকনোলজি। এই টেকনোলজি দিয়ে আমাদের মেমোরিকে—মানে, স্মৃতিকে বদলে দেওয়া যায়।'

'তার মানে!'

'তার মানে আর কিছুই না...' চশমাটা নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে চোখে বসালেন নীতিনপ্রকাশঃ 'আমাদের স্মৃতি হচ্ছে অনেকটা সাদা কাগজে পেনসিলের দাগের মতো। ব্রেনের কোটি-কোটি নিউরোনের মধ্যে স্মৃতি বাসা বেঁধে থাকে। আমাদের এই নতুন টেকনোলজি কাগজে আঁকা পেনসিলের দাগ সহজেই মুছে ফেলতে পারে, এবং এঁকে দিতে পারে নতুন পেনসিলের দাগ। আই মিন, টোটাল মেমোরির নানান অংশ আমরা খুশিমতো মুছে দিতে পারি। আবার আমাদের পছন্দমতো তৈরি করা মেমোরি—মানে, ফ্যাব্রিকেটেড মেমোরি—প্রিন্ট করে দিতে পারি আপনার মগজে।' হাসলেন নীতিনপ্রকাশঃ 'ইন ফ্যাক্ট আমি তাই করেছি। আপনার ওয়াইফ সুপর্ণলতিকার চেহারা আর আচরণের যে-স্মৃতি আপনার মেমোরিতে ছিল সেটা আমি টোটালি ইরেজ করে দিয়েছি। সেইজন্যেই নতুন এক লোকালিটির নতুন এই ফ্ল্যাটে ওকে দেখে আপনি চিনতে পারেননি। ওকে আপনি অন্য কারও স্ত্রী অঙ্গলাবণি বলে মেনে নিয়েছেন...।'

'স্টপ ইট, ডক্টর!' চিৎকার করে উঠল স্নিগ্ধপ্রভাত, 'প্লিজ ডোন্ট টক রাবিশ!'

ডক্টর নীতিনপ্রকাশ মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। আর অঙ্গলাবণি—নাকি সুপর্ণলতিকা?—আড়চোখে স্নিগ্ধপ্রভাতকে দেখছিল।

'আপনি এই নতুন পরিচয়কে বিশ্বাস করেছেন। আমি ফ্ল্যাটে আসামাত্রই অঙ্গলাবণি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বলেছে। কয়েক ঘণ্টা আগেই আপনি ওকে বলেছেনঃ 'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।' যে-মুহূর্তে আপনি এ-কথা বলেছেন সেই মুহূর্তেই আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে।

আপনাদের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার বেঁচে উঠেছে। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, আই হ্যাভ রিপেয়ারড আ শ্যাটারড্ রিলেশানশিপ।' নীতিনপ্রকাশ কৌতুকের চোখে তাকালেন সুপর্ণলতিকার দিকেঃ 'কী বলো, অঙ্গলাবণি?'

স্নিগ্ধপ্রভাতের সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ওই তো বসে রয়েছে অঙ্গলাবণি! কী সুন্দর ওর বসার ভঙ্গি! কী সুন্দর শান্ত ওর ভালোবাসা মাখানো মুখ! ও যে আসলে সুপর্ণলতিকা সেটা জানার পরেও স্নিগ্ধপ্রভাতের টানটা কমছে না কেন? এম. এম. টেকনোলজি কি এতই অদ্ভুত!

সুপর্ণলতিকার দিকে ফিরে হাসলেন নীতিনপ্রকাশঃ 'কী, এবারে তুমি খুশি তো! এবারে শুরু হোক তোমাদের মোস্ট হ্যাপি কনজুগাল লাইফ। যদি আবার কখনও বোর হয়ে যাও আমাকে শুধু একটা ফোন করে দিয়ো। তোমার মাথা থেকে হাজব্যান্ডের মেমোরি ম্যাপ বদলে দিয়ে ভালোবাসায় টইটম্বুর নতুন এক হাজব্যান্ড ফিরিয়ে দেব। আমার রিসার্চ টিমের লোকজন ওঁকে ফুঁ দিয়ে অ্যানেসথেসিয়া করে আবার তুলে নিয়ে আসবে আমার ল্যাবে। তারপর একটু এম. এম. টেকনোলজি—ব্যস, তার পরই পুরোনো মানুষটা একেবারে নতুন হয়ে যাবে।'

স্নিগ্ধপ্রভাতের ঘোর তখনও কাটেনি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল নীতিনপ্রকাশের দিকে।

নীতিনপ্রকাশ হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের হাত চেপে ধরলেন। হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না, স্নিগ্ধপ্রভাত। যদি সুপর্ণলতিকা—মানে, এই অঙ্গলাবণি—' আঙুল তুলে অঙ্গলাবণিকে দেখালেন তিনিঃ 'বোর হয়ে যায়, তা হলে আপনিও আমাকে কনট্যাক্ট করতে পারেন। তখন স্নিগ্ধপ্রভাতকে পালটে রাজসম্রাট করে ওর কাছে আমি হাজির করব।' হাসলেন ডক্টরঃ 'সমাজের যে-কোনও স্বামী-স্ত্রীর প্রবলেম সল্ভ করার জন্যে আমি এবং আমার এম. এম. টেকনোলজি সবসময় হাজির। অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। আমার ফোন নাম্বার আর ফিজের ব্যাপারটা আপনি পরে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নেবেন। তবে মনে হয়, তার আর দরকার হবে না।'

নীতিনপ্রকাশকে স্নিগ্ধপ্রভাতের দেবতা বলে মনে হচ্ছিল।



জীবনের চাবিকাঠি

অফিসের কোলিগ বিনীতের কাছেই দোকানটার ঠিকানা পেয়েছিলাম।

নাম ‘রোবোটিক্স কর্পোরেশন’—হরেকরকমের রোবট পাওয়া যায় দোকানটাতে। শহরতলির কোন অঞ্চলে যেন ওদের নিজস্ব কারখানা আছে। সেখানে দক্ষ সব কারিগররা নিখুঁত কলকবজা আরও নিখুঁতভাবে জুড়ে-জুড়ে তৈরি করে অপূর্ব সব রোবট। সোজা কথায় ‘জীবন্ত’ খেলনা।

আমার কঠিন সমস্যার কথা শুনে বিনীত বলেছিল, দাদা, আপনি রোবোটিক্স কর্পোরেশনে যান, আপনার সব প্রবলেম ওরা সল্ভ করে দেবে।

বিনীতকে আমার সব কথা খুলে বলিনি। শুধু এটুকু বলেছিলাম, ভাই, সংসারের টানাপোড়েন আর সইতে পারছি না। এই জোয়াল যদি অন্য কারও গর্দানে জুতে দিতে পারতাম—!

খানিকটা হতাশা খানিকটা ঠাট্টা মিশিয়েই বলেছিলাম। কিন্তু ও ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিয়ে রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা আমাকে দিয়ে দিল।

আমার পাশের টেবিলে বিনীত কাজ করে। আমার ক্লান্ত ভঙ্গি, হতাশ ভাব, রোজই ওর নজরে পড়ে। দ্যাখে, আমি যন্ত্রের মতো পা চালিয়ে অফিসে আসি, কাজ করি, ছুটি হলে আবার বাড়ির দিকে রওনা হই। আমার ভেতরের মানুষটা ধীরে-ধীরে যেন লোহালক্কর হয়ে যাচ্ছে।

এইসব লক্ষ করেই সেদিন ও চেপে ধরেছিল আমাকেঃ দাদা, বলুন তো আপনার কী হয়েছে?

আর তারপরই রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা।

রোবোটিক্স কর্পোরেশনের ঠিকানাটা খুব সাদামাটা হলেও রাস্তাটা ঘোরপ্যাঁচের। অফিস কামাই করে নাম-ঠিকানা লেখা চিরকুট হাতে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় চক্কর মেরে চললাম। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দোকানটা। যাকেই জিগ্যেস করি সে-ই ধন্দে পড়ে যায়। মাথা

চুলকোয়। ঠোঁট ওলটায়। কিংবা ইতস্তত করে বলে, অমুক রাস্তার শেষে দেখুন তো। তা না হলে তমুক গলির কাছাকাছি হবে।

এইভাবে হন্যে হয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছি, হঠাৎই একটি লোককে দেখে মনে ধরল। বিনীতের মতোই খুশিতে টগবগ করছে সে। চোখে-মুখে জীবন উপভোগের ফুর্তির ছটা। তাকে ঠিকানাটা দেখাতেই সে বলে উঠল, ও, রোবোটিক্স কর্পোরেশন? এই তো, ওই রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে ডানদিকের গলিটা ধরুন। তারপর...।

এত সহজে ঠিকানাটা সে বলে দিল যেন দোকানটা তার কতদিনের চেনা। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চিনিয়ে দেওয়া পথে রওনা হলাম। লোকটা কোমরের কাছে হাত দিয়ে কী একটা ঠিক করতে-করতে চলে গেল। একইসঙ্গে ঠোঁটে শিস বাজিয়ে গানের সুর তুলছিল সে।

রোবোটিক্স কর্পোরেশনের দরজায় হাজির হয়ে অবাক হলাম।

এ কী জরাজীর্ণ করুণ অবস্থা। দোকানের ফুটপাঁচেক চওড়া দরজা দুটো পুরোনো বাড়ির মাঝে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে আছে। দরজার মাথায় রংচটা তোবড়ানো কাত-হয়ে-থাকা সাইনবোর্ড। দোকানের নামের অর্ধেক অক্ষর মুছে গেছে। ভেতরে ঢোকার সিঁড়ির ধাপগুলোও ভাঙাচোরা। সব মিলিয়ে দোকানটা এখনও চালু, না পরিত্যক্ত, সেটা বোঝাই মুশকিল। কিন্তু এতদূর এসে তো ফিরে যাওয়া যায় না! অতএব হতাশ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দোকানে ঢুকলাম।

সদর পেরোতেই আধো-আঁধারি একটা গলিপথ। দু'পাশে নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল। নীচের ঠান্ডা মেঝে যেন জুতোর সোল ভেদ করে পায়ের চেটোয় বরফের ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

কিছুটা এগিয়ে গলিপথটা বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে আর-একটা দরজা। সেই খোলা দরজা পেরিয়েই রোবোটিক্স কর্পোরেশনের দোকান-ঘর।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই আর-এক প্রস্ত অবাক হলাম।

কম করেও চল্লিশ ফুট বাই পঞ্চাশ ফুট একটা বিশাল ঘর। তার সিলিং অন্তত বিশ ফুট উঁচুতে। অপরূপ রঙিন নরম আলোয় দোকান-ঘরে একটা মায়াময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘরের একপাশের দেওয়ালে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে থরে-থরে পুতুল। মানুষের মাপে তৈরি। নিখুঁত। তাদের চেহারা এত জীবন্ত যে, মনে হয় এক্ষুনি হাত-পা নেড়ে শোকেসের বাইরে বেরিয়ে আসবে। হেসে জিগ্যেস করবে, কী খবর? ভালো আছেন?

তারপরই চোখ চলে গেল দোকানের দেওয়ালে, সিলিংয়ে। অপূর্ব সূক্ষ্ম সব প্রাচীন কারুকাজ। যেন দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া ঐতিহ্যমণ্ডিত কোনও মন্দিরের অভ্যন্তর। বারবার মুগ্ধ চোখে দেখেও আশ মেটে না।

মসৃণ মার্বেল পাথরের মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম কাউন্টার লক্ষ্য করে। কাউন্টার বলতে একটা বেদি। কারুকাজ করা ভেলভেট কাপড়ে মোড়া। তার ঠিক পেছনে আর-একটা খাটো বেদিতে পদ্মাসনে বসে একজন মানুষ। ফরসা রং। মুণ্ডিত মস্তক। পরনে গেরুয়া বসন। কাউন্টারের একপাশে ধাতব ধূপদানিতে পাঁচটি মোটা-মোটা ধূপকাঠি জ্বলছে। তাদের সুবাসে দোকানের পবিত্র পরিবেশে যেন আরও পবিত্র কোনও ছোঁওয়া লেগেছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এ কি রোবোটিক্স কর্পোরেশন, না কোনও তৃতীয় আশ্রম! বিনীত আমাকে ভুল ঠিকানা দেয়নি তো! কিন্তু কী করেই বা হবে? এত নিশ্চিত ভঙ্গিতে ঠিকানাটা ও আমাকে লিখে দিল...।

আরও কিছু ভেবে ওঠার আগেই কাউন্টারে বসা সন্ন্যাসী অথবা দোকানদার স্পষ্ট উচ্চারণে আমাকে বললেন, চিন্তা করবেন না। ঠিক দোকানেই আপনি এসেছেন। বলুন, কী ধরনের রোবট আপনার চাই?

বিশাল দোকান-ঘরের কারুকাজ করা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর গমগম করতে লাগল।

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে মনে সাহস জোগালাম। তারপর বললাম, ঠিক আমার মতো একটা রোবট আমাকে দিতে পারেন?

সংসারধর্মে ক্লান্ত বুঝি?—স্মিত হেসে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কী করে উনি টের পেলেন মনের কথা? কোনওরকমে বললাম, হ্যাঁ, প্রভু, ভীষণ ক্লান্ত। এ-বোঝা আর বইতে পারছি না।

কী করে জানি না মুখ দিয়ে 'প্রভু' শব্দটা বেরিয়ে গেল। দোকান-ঘরের ওই অদ্ভুত পরিবেশ হয়তো আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

সন্ন্যাসী আবার হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমার চোখে চোখ রাখলেন। কী তেজোদীপ্ত দৃষ্টি! আমি ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলাম। মানুষটা যেন আমার ভেতরটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে নিচ্ছিল।

একটু পরে তিনি বললেন, আপনার সম্পর্কে যেটুকু জানার জেনে নিলাম। আপনার মতো রোবট তৈরি করতে এখন আর কোনও অসুবিধে নেই। দয়া করে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

কথা শেষ করে সন্ন্যাসী ভদ্রলোক বেদির আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। পেছনে লাল রঙের ভেলভেটের একটা ভারী পরদা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি রীতিমতো হকচকিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ন্যাসী অদৃশ্য হতেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম, এরপর কী ঘটতে পারে। কই, বিনীত তো আমাকে বলেনি যে,

এঁরা সঙ্গে-সঙ্গেই রোবট দিয়ে দেয়! তা ছাড়া দাম কত তা ও জানি না। শেষকালে অপ্রস্তুতে পড়ব না তো?

একটু পরেই পেছনের পরদা সরিয়ে সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন। হাতে হুবহু আমার মতো দেখতে প্রমাণ সাইজের একটি রোবট। আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন, মিছিমিছি দাম নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা রোবটের জন্যে কোনও দাম নিই না।

দাম নেন না?—বিস্ময়ের ধাক্কায় প্রশ্নটা জিভে জড়িয়ে যেতে চাইল।

সন্ন্যাসী ঠোঁটে হাসলেনঃ না। কারণ মানুষের উপকার করাই আমাদের ব্রত।

রোবটটা এনে কাউন্টারের ওপরে শুইয়ে দিলেন তিনি। তারপর পুতুলটার কোমরের কাছে হাত নিয়ে কী যেন করতে লাগলেন। অনেকটা চাবি ঘোরানোর মতো কর্ক্র শব্দ হচ্ছিল।

কাজ শেষ হলে সন্ন্যাসী বললেন, ব্যস, দম দেওয়া হয়ে গেছে। নিন, আপনার রোবট তৈরি।

কিন্তু...কিন্তু দম ফুরিয়ে গেলে?

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমরা যে-দম দিয়ে দিই তাতে একটা পুতুলের গোটা জীবন চলে যায়। দম ফুরিয়ে গেলেই তার জীবনের খেলা শেষ। তবে মাঝে-মাঝে দম দেওয়ার চাবিটা গোলমাল করে, আটকে যায়। সেটা মাঝে-মাঝে দেখতে হয়, পরিষ্কার রাখতে হয়। সে-কাজ রোবট নিজে-নিজেই করে নেয়। তার পরেও কোনও অসুবিধে হলে আমরা তো রয়েছি—।

রোবটটা আমার সামনে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি। আরে, কী আশ্চর্য! ওটা যে শুধু হুবহু আমার মতোই দেখতে তা নয়, ওর পরনের পোশাকও হুবহু আমার পোশাকের মতো! যাক, ভালোই হল। এই মুহূর্ত থেকেই আমার রোজকার জীবনের জোয়ালে রোবটটাকে জুতে দেওয়া যাবে।

বিচিত্র দোকানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রোবটটার হাত ধরে দোকান-ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। চৌকাঠ ডিঙোনোর সময়ে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম, তিনি চোখ বুজে ধ্যানের ভঙ্গিতে পদ্মাসনে বসে। তাঁর মাথার চারপাশে রঙিন আলোময় এক অদ্ভুত দ্যুতি। আর একইসঙ্গে অতি মৃদুলয়ে ভেসে আসছে স্তোত্র পাঠের শব্দ। প্রতিধ্বনিময় মন্দ্র স্বরে কেউ স্তোত্র পাঠ করছে। আশ্চর্য! এই রোবোটিক্স কর্পোরেশনের প্রকৃত স্বরূপ কী!

আমি হয়তো আরও কিছু ভাবছিলাম, আমার পুতুল-প্রতিবিম্ব আমার কনুই ছুঁল। বলল, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি চমকে পাশ ফিরে তাকালাম। পুতুল হাসছে। ভীষণ খুশি তার মেজাজ। কই, আমি তো এমন করে হাসতে পারি না! তবে আজ থেকে বোধহয় পারব।

আমরা দুজনে রোবোটিক্স কর্পোরেশন ছেড়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

এখন আমি বেশ আনন্দে আছি। মনে কোনও দুঃখ নেই, কোনও কষ্ট নেই, কোনও ক্লান্তি নেই, কোনও হতাশা নেই। আমি আপনমনে পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। কখনও নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখি।

আমার পুতুল দিব্যি কাজ করে চলেছে।

আমার বউ ওকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা ওকে বাবা বলে মেনে নিয়েছে। আমার অফিসের সবাই ওকে মেনে নিয়েছে সহকর্মী বলে। আমার বাড়িওয়ালাও পুতুলটাকে তার ভাড়াটে হিসেবে মেনে নিয়েছে। সোজা কথায়, মানুষ বদলের ব্যাপারটা কেউই টের পায়নি।

এদিকে পুতুলটার সঙ্গে আমার এক আশ্চর্য যোগাযোগ রয়ে গেছে। ওর কাছাকাছি আমি থাকি না। সম্ভবও নয়। কিন্তু ওর প্রতিটি কার্যকলাপ আমি মনের পরদায় স্পষ্ট দেখতে পাই। শুনতে পাই প্রতিটি কথা। সময়ে-সময়ে মনে হয় আমি যেন অশরীরী হয়ে ওর পাশে-পাশে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। কী করে এই ক্ষমতা আমার মধ্যে জন্ম নিল জানি না। একেই কি অতি-দৃষ্টি আর অতি-শ্রবণ বলে? নাকি এ-এক মন্ত্রশক্তি?

সেই মন্ত্রশক্তির জোরেই আমি দেখি অফিসে বিনীত ওকে জিগ্যেস করছেঃ কী দাদা, রোবোটিক্স কর্পোরেশনে গিয়েছিলেন?

তখন পুতুলটা জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ, ভাই, গিয়েছিলাম। আর দারুণ উপকার পেয়েছি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিনীত মুচকি হেসে বলেছে, হুম, সেইজন্যেই আপনাকে এত হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

জীবনটা এভাবেই বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎই একদিন গোলমাল বাধল।

ভোরবেলা পার্কে পায়চারি করছি, এমন সময় রোবটটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। থমকে তাকিয়ে দেখি ওর চোখে জল। মুখে বলিরেখা। আমাকে দেখে কাতর স্বরে বলল, আমি আর পারছি না।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রোবট বলে কী! রোবট যে যন্ত্র! তাকে তো পারতেই হবে!

সে-কথাই ওকে বললাম। উত্তরে ও বলল, বিশ্বাস করো, এরকম যান্ত্রিক জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

যন্ত্রের আবার যান্ত্রিক জীবন! আমি যে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন উপায় কী? রোবটটাকে বললাম, আমাকে তুমি এর মধ্যে আর টানাটানি কোরো না। যেমন করে পারো চালিয়ে নাও।

রোবট অনেকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়ের নখ দিয়ে পার্কের মাটি খুঁটল। তারপর মুখ কালো করে চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল।

লুকিয়ে লাভ নেই, ওর কষ্টের কথা শুনে আমার আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়ল। কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই! অতএব আবার পায়চারি শুরু করলাম।

ক্রমে দিন কেটে যায়, মাস কেটে যায়, বছর কেটে যায়। রোবট মাঝে-মাঝেই লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। শুনিয়ে যায় ওর অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণার কাহিনি। এক-একদিন তীব্র ক্ষোভে বলে ওঠে, আমি সুইসাইড করব।

কিন্তু আমি জানি, আত্মহত্যা অত সহজ নয়। সহজই যদি হবে তা হলে আমি আত্মহত্যা করতে পারি না কেন? সেই সময়ে হঠাৎ করে বউ-ছেলেমেয়েদের মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে! সরল সাদামাটা বউ আর নিষ্পাপ বালক-বালিকার মুখ। ওঃ ভগবান!

রোবট আসে-যায়। কখনও দেখা করে নদীর ধারে, কখনও পার্কে, কখনও বা গ্রামের মেঠো পথে। ও ঠিক জানে কখন কোথায় গেলে আমার দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা করে ওর উপকার কিছু হয় না। তবে জানি না, ওর দুঃখ-কষ্টের কাহিনি আমাকে শুনিয়ে ওর মন কিছুটা হালকা হয় কি না।

একটা জিনিস আমি বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করছি। রোবটের চোখে-মুখে ক্রমেই ক্লান্তি আর হতাশার ছাপ পড়ছে। বউ-ছেলেমেয়েকে লুকিয়ে ও যখন-তখন কান্নাকাটি করে। রোবোটিক্স কর্পোরেশনে যাওয়ার আগে আমার যেরকম দশা হয়েছিল ঠিক সেইরকম। আশ্চর্য! যন্ত্রের কি অনুভূতি আছে? হয়তো আছে। নইলে একদিন ওর হাত কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছিল কেমন করে? কেনই বা ওর চোখে-মুখে তখন ফুটে উঠেছিল যন্ত্রণার অভিব্যক্তি? মনে পড়ছে, বিনীত বলেছিল, রোবোটিক্স কর্পোরেশন একেবারে জীবন্ত রোবট তৈরি করে। হয়তো এও তাই।

একদিন শুনি আমার পুতুল অফিসে বিনীতকে বলছে, ভাই, সংসারের টানপোড়েন আর সইতে পারছি না। এই জোয়াল যদি অন্য কারও গর্দানে জুতে দিতে পারতাম!

শুনে আমি চমকে উঠলাম। বছরকয়েক আগে ঠিক এই কথা তো বিনীতকে আমি বলেছিলাম! বিনীত তখন রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা পুতুলটাকে দিল। বলল, দাদা, আপনি রোবোটিক্স কর্পোরেশনে যান, আপনার সব প্রবলেম ওরা সল্ভ করে দেবে।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এরপর কী-কী ঘটবে। এবং তাই ঘটল।

কয়েক বছরের পুরোনো দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে আবার নতুন করে অভিনীত হতে লাগল। শুধু অবাক লাগল একটা কথা ভেবে। রোবোটিক্স কর্পোরেশনের নাম-ঠিকানা তো রোবটের

অজানা ছিল না! তা হলে সেটা আবার বিনীতের থেকে নেওয়া কেন? অবশ্য এও হতে পারে, সংসারের ক্লান্তিকর জোয়াল টেনে-টেনে বেচারা নিজের জন্মদাতার নাম-ঠিকানাই ভুলে গেছে।

এর কিছুদিন পরে বিকেলে নদীর ধারে রোবটের সঙ্গে দেখা। ও আজ ভীষণ খোশমেজাজে রয়েছে। আমাকে দেখেই ও বলল, আজ থেকে আমি মুক্ত।

আমি সপ্রশ্নে তাকাতেই ও হাঁপ ছেড়ে বলে উঠলঃ রোবোটিক্স কর্পোরেশন থেকে একটা রোবট নিয়ে আমার জায়গায় ফিট করে দিয়ে এসেছি। কী মজা!

আমি অবাক হয়ে সংসারমুক্ত রোবটটাকে দেখতে লাগলাম। ও তখন কোমরে হাত দিয়ে কী একটা জিনিস খুটখাট করতে লাগল।

আমি জিগ্যেস করলাম, কী করছ?

চাবিটা দেখছি। ওটা তো আর কোনও কাজে লাগবে না।

তারপরই আমাকে চমকে দিয়ে ও জিগ্যেস করলঃ তোমার চাবিটার কী অবস্থা?

আমি বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলাম। যান্ত্রিকভাবে আমার ডানহাত চলে গেল কোমরের কাছে। চাবিটা হাতে ঠেকল।

চাবি! সত্যিই এটা চাবি? আমিও তা হলে একটা যন্ত্র। রোবোটিক্স কর্পোরেশনের তৈরি।

এতগুলো বছর আমি কার হয়ে প্রক্সি দিচ্ছিলাম? কার সংসারের জোয়াল ঘাড়ে করে ঘানির বলদের মতো পাক খাচ্ছিলাম?

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। রোবট সেটা দেখে অবাক হল।

পশ্চিমের আকাশ লাল টকটকে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমার মুখে, আমার পুতুলের মুখে লাল আলোর আভা। সেই আভা বহমান নদীর জলেও।

রোবট বলল, তুমি কাঁদছ কেন?

আমি জবাব দিলাম, কাঁদছি সেই আসল মানুষটার জন্যে। সে তা হলে কী কষ্টেই না ছিল বলো তো। কিন্তু সে গেল কোথায়?

আমার চেতনায় সব একে-একে ভেসে উঠছিল। মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী, সুগন্ধী ধূপের সুবাস, অপরূপ রঙিন আলোর ছটা, মন্দ্র স্বরে স্তোত্র পাঠ—সব। আমি—আমরা তা হলে নিছকই অকিঞ্চিৎকর নকল মানুষ। নিজেদের ঘৃণা করা ছাড়া আর আমাদের আর কোনও উপায় নেই। হা ঈশ্বর!

সেদিন নদীর ধারে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম।



হৃদয়নাথ

একঃ প্রথম রাত ও বিপন্নতা

আমি হৃদয়নাথ চৌধুরী, ভয় পেয়েছি। কারণ ঘটনাটা এই নিয়ে তৃতীয়বার ঘটল। প্রথমবারে আমি ততটা বিচলিত হইনি। ব্যাপারটাকে আমার মতো উত্তর পঞ্চাশ কোনও প্রৌঢ়ের প্রতিবন্ধী কল্পনা ভেবে স্বস্তি পেয়েছি। দ্বিতীয়বারে নিজের শরীরটাকে দায়ী করেছি। এবং দায়ী করেছি সাগরপারের সেই দক্ষ চিকিৎসক মাইকেল ইলিস ডিবেকিকে। কিন্তু তৃতীয়বারে আর কোনও সন্দেহ থাকেনি। সুষম ধকধক ছন্দটা বিশ্রীভাবে কেটে গেছে। আবার যে শ্রান্ত হৃৎপিণ্ডটা পথ চলতে পারবে কয়েক মুহূর্ত সেরকম কোনও ইঙ্গিত পাইনি। অসহ্য যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে আমার প্রাচীন শরীরের কাঠামো প্রচ্ছন্ন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। উন্মত্ত হাতির পাল দুরন্ত ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে বুকের ভেতরে। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মানসীকে ডাকতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু জিভ ও স্বরযন্ত্র যুগপৎ অসহযোগ ঘোষণা করেছে। আমার হিসেবে সংকটমুহূর্ত যখন প্রায় উপস্থিত, ঠিক তখনই কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ড আবার চলতে শুরু করেছে। এবং আমি, হৃদয়নাথ, পুনর্জীবন ফিরে পেয়েছি।

একটা ভিনদেশি প্রত্যঙ্গ নিয়ে কোনও মানুষের বেঁচে থাকাটা যে এত উৎকণ্ঠিত হতে পারে সেটা আগে কোনওদিন বুঝিনি। তাই খুব সহজেই পাড়া-প্রতিবেশী, পরিবারবর্গ এবং ডাক্তারদের অদ্বিতীয় উপদেশে সম্মত হয়েছিলাম হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে। তারপর শুরু হয়েছিল চিঠিপত্র বিনিময়, বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিদের কাছে হাঁটাহাঁটি, সব শেষে আমেরিকার হিউস্টন থেকে পাওয়া গেল ডক্টর ডিবেকির সম্মতি।

মানসীকে একা রেখে আমি জেদ করে একাই রওনা হয়েছিলাম হিউসটনের মেথডিস্ট হসপিটাল অভিমুখে। সেখানে বিচিত্র ডাক্তারি ক্রিয়াকলাপের পর আমি ‘সফল’ রোগী হিসেবে ঘোষিত হলাম। আমার উত্তর-অপারেশান জীবনযাত্রা কীভাবে বিভিন্ন দিক থেকে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, তার উপদেশও পেলাম। কোনওরকম সংক্রামক ব্যাধি, এমনকী সাধারণ সর্দি-কাশিতেও আমার অবস্থা

আশঙ্কাজনক হয়ে উঠতে পারে—কারণ 'ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ' দিয়ে-দিয়ে আমার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নইলে একটা অচেনা হৃৎপিণ্ডকে আমার দেহ বিনাযুদ্ধে মেনে নিত না।

হাসপাতালে থাকাকালীন বহুবার আমি জানতে চেয়েছি, কে সেই দেবতা, যে তাঁর অমূল্য হৃৎপিণ্ডটি আমার দীর্ঘতর জীবন কামনায় দান করছে। কিন্তু সঠিক-স্পষ্ট উত্তর কেউই দিতে পারেনি। কিন্তু শেষ দিন, অর্থাৎ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বদেশে রওনা হওয়ার দিন, সেই দেবতার পরিচয় পেলাম। যে আমাকে কবচকুণ্ডল দান করেছে সেই কর্ণের নাম কে. রায়। বিদেশি রীতির শিকার হয়ে ওই সংক্ষিপ্ত নামটুকুই জানা গেছে। যখন প্রশ্ন করেছি, কেন এই অযাচিত দান, উত্তর পেয়েছি, সেই ভদ্রলোক নাকি কোনও দুরারোগ্য অসুখে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। জনৈক দুর্বল-হৃদয় বাঙালির জন্য একটি হৃৎপিণ্ড প্রয়োজন, এই খবরটি শুনে 'ডোনর' হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।

এতদূর শুনেও আমার মনে কোনওরকম সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু একবারে শেষ মুহূর্তে একজন তরুণ সহকারী ডাক্তার হঠাৎ আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'মিস্টার রায় কি আপনার চেনা?'

আমি কোনও উত্তর দিইনি।

আকাশপথে যখন সযত্ন-লালিত হয়ে ফিরে আসছি, তখনও আমার মনে সেই প্রশ্নঃ মহান ব্যক্তিটি কি আমার পূর্ব পরিচিত? নাকি, তাঁর এই মহত্বের মূলে শুধুই স্বজনপ্রীতি?

প্রশ্নের উত্তর নানান সম্ভাবনার জটিল জলস্রোতে ভেসে গেছে। তখনও আমি বুঝিনি, কাশীকান্ত নিজের হৃদয়ের বিনিময়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

স্বদেশে ফিরে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নতুন জীবন শুরু করেছি। ডাক্তারের পরামর্শ মতো সবরকম ধকল ও উত্তেজনা সুহিসেবিভাবে এড়িয়ে চলি। এমনকী আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট ঋতুমতী মানসীর প্রলোভনও জয় করতে চেষ্টা করি। কখনও-কখনও সফল হই। কখনও, স্বাভাবিকভাবেই, হই না। এবং মানসীর দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। প্রমাণ পাই, আমাকে ও এখনও ভালোবাসে।

প্রথম ঘটনা ঘটল সাতদিন আগে।

হিউস্টন ও হাসপাতাল আমার কাছে এখন ধূসর স্মৃতি। তবে প্রতিস্থাপন অপারেশানটা যে সত্যি তার প্রমাণ পাই হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি গুনলে। মিনিটে মাত্র তেষট্টিবার। বুকের ভেতরে বসানো পেসমেকারের সহযোগিতা না পেলে কে. রায়ের হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা নিঃসন্দেহে হ্রাস পেত। সুতরাং এই মুহূর্তে আমি জীবিত, সুস্থ, সবল। খোলা বারান্দায় বসে দেখছি পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ঘোলাটে আকাশে পাখিদের দিশেহারা ব্যস্ততা।

আমার হাতে ধরা চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভাবছিলাম, মানসীর কথা, আমার নিজের কথা। এবং আমাদের সন্তানহীনতার কথা। বিয়ের ঠিক পরের বছরগুলোতে যে সন্তান-স্পৃহা জন্ম নিয়েছিল, আজ প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে সেই স্পৃহা সন্তানলিপ্সায় পরিণত হয়েছে। বাধ্যতামূলক এই অবসরজীবন এখন আরও বেশি ক্লান্তিকর মনে হয়।

ভাবনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে হঠাৎই স্তব্ধ হল আমার বদলি হৃৎপিণ্ড।

অসংখ্য ছুঁচ ফোটানোর জ্বালা অনুভব করার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের পেয়ালা-পিরিচ সশব্দে ছিটকে পড়ল। ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। মনে আছে, অকল্পনীয় আয়াসে মানসীকে ডাকতে পেরেছিলাম। তারপর সুখী-কেদারা থেকে আমি নিজেই টলে পড়ে গেছি।

মানসীর ভয়ার্ত চিৎকারে আমার সংবিৎ ফিরল। হৃৎপিণ্ড চলছে—এই তথ্যটুকুই আমার মস্তিষ্ক সর্বাগ্রে আহরণ করে আমাকে জানাল। চোখের সামনে বড় সিঁদুরের টিপ, এলোমেলো ঘন চুল, ফরসা ডিম্বাকৃতি ভাঁজহীন মুখ। ঝাপসা থেকে ক্রমে স্পষ্ট হল। মানসী।

উৎকণ্ঠাময় অভিব্যক্তি নিয়ে ও জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? কোনও কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারবাবুকে খবর দেব?'

আমি আবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক। সুতরাং গলার স্বরে ধৈর্য এনে বললাম, 'কিচ্ছু হয়নি, মানসী, কিচ্ছু হয়নি—।'

ও নিরস্ত হল। কিন্তু মনের খটকা দুজনের কারওরই কাটল না। অচেনা হৃৎপিণ্ডকে নিয়ে সামান্য হলেও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘণ্টাদুয়েক নিরাপদে পার হওয়ার পর নিজের অনুভূতির ওপরে সন্দিহান হলাম আমি। হৃৎপিণ্ডটা সত্যি-সত্যিই কি থেমে গিয়েছিল? আমার মনের ভুল নয় তো? অন্য কোনও শারীরিক যন্ত্রণাকে হয়তো ভুল বুঝেছি আমি...জানি না। যত সময় যেতে লাগল, আমার অনিশ্চয়তার দোলা কম্পাঙ্কে ততই ঊর্ধ্বগামী হয়ে উঠল। অবশেষে একরকম জোর করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিঃ ব্যাপারটা পুরোপুরি আমার মনের ভুল।

দ্বিতীয় ঘটনা মাত্র দু-দিনের পুরোনো। এবং চরিত্রে প্রথম ঘটনারই পুনরাবৃত্তি, তবে অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ।

গত পরশু রাতে দারুণ মেজাজে ছিলাম। কী এক অপ্রাকৃত কারণে মনের সবরকম অপচিন্তা উধাও হয়েছিল। রেডিয়ো শুনতে-শুনতে মানসীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। এমনকী 'কে. রায় কে?' এই জাতীয় যমক অলংকার সহকারে অতিরিক্ত ঠাট্টাকেও প্রশ্রয় দিয়েছি। এবং মানসী সহধর্মিণী-সুলভ মন্তব্য করেছে, 'লোকটা নিশ্চয়ই তোমাকে চিনত। নইলে বলা নেই কওয়া নেই হুট করে অমন উপকার করে?'

আমি হেসেছি। সেই তরুণ ডাক্তারের মন্তব্য ভাসা-ভাসা মনে পড়েছে। হেসে বলেছি, 'কে. রায় কে তা কে জানে।' ঝুঁকে পড়েছি মানসীর কাছে। ওকে ছুঁয়েছি। পুণ্য স্পর্শে আমার প্রৌঢ় শরীর যেন পরম আশ্রয় পেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিতীয়বার!

ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা। শ্বাসকষ্ট। গলা শুকিয়ে কাঠ। মানসী সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে দেখল। হতভম্ব ও বিস্ময়-প্রসারিত দু-চোখে অপলক দৃষ্টি। আমি, হৃদয়নাথ চৌধুরী, বেশ সময় নিলাম ধাতস্থ হতে। বললাম, 'কিছু হয়নি', আর একইসঙ্গে ভাবতে শুরু করলাম, ডিবেকির বদলে কেপটাউনের ক্রিশ্চান বার্নার্ড হয়তো আরও দক্ষ তথা সফল অপারেশান করতে পারতেন। নাকি, আমার এই প্রাচীন শরীরটাই কোনওরকম অপারেশানের লায়েক ছিল না?

সেই রাতে কে. রায় নামটা আমাকে জটিল রেখায় ভাবিয়েছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। অবশেষে নানান স্বপ্ন দেখে যখন কাকভোরে জেগে উঠেছি তখন কাশীকান্ত নামটা আমার মনের আটমহলা অট্টালিকায় লুকোচুরিরত।

কাশীকান্ত আমার যুবাবয়েসের বন্ধু ছিল। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু ও হঠাৎ স্বপ্নে নামটা জানিয়ে গেল কেন? তা ছাড়া, ওর পদবি কি রায় ছিল? কী জানি, মনে নেই। আতুর স্মৃতি আমাকে ঘিরে ধরে।

কাশীকান্ত...কাশীকান্ত...যদি সত্যিই কাশীকান্ত হয়? ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম, এ-হৃৎপিণ্ড কাশীকান্তের। এবং আপন্ন মুহূর্তে অত্যন্ত দুর্লভ এক পুরস্কারে সে আমাকে পুরস্কৃত করেছে। এই পুরস্কারের কোনও বিকল্প নেই। তা হলে কি হৃৎপিণ্ডের এই অদ্ভুত আচরণের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? হয়তো না।

কাশীকান্ত বিজড়িত হয়ে দেড়দিন পার হয়ে গেছে। মানসীকে এসব জানিয়ে বিচলিত করিনি। আমার দৈনন্দিন কার্যকলাপের প্রতিটি ধাপে ভুলক্রুটি জাঁকিয়ে বসেছে। আমার স্থবির মন মহাস্থবির হয়ে পড়েছে। সেই বিক্ষিপ্ত মনস্কতার মধ্যে একটু আগে যখন মানসীর কাছ ঘেঁষে শুয়েছি, তখনই ঘটেছে তৃতীয়বার। এক পৌনঃপুনিক যন্ত্রণা যেন আমার দেহে স্থায়ী হয়ে যেতে চায়।

মানসী ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগেনি। রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণার অধ্যায়টুকু যখন পার হল, তখন আমি ঘামতে শুরু করেছি। দখিনের খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা হুহু বাতাস, কিংবা জমিতে বিছিয়ে থাকা দুধের সরের মতো জ্যোৎস্নার আলো আমাকে শান্ত করতে পারেনি, আশ্বাস দিতে পারেনি। আমি, অবশেষে, ভয় পেয়েছি।

মানসীর গায়ে হাত রেখে ভাবনার স্রোত যখন সিদ্ধান্তের মোহানা খুঁজে পেয়েছে তখন ধীরে-ধীরে উঠে বসেছি। ডক্টর ডিবেকির ওপর আমি এখন অবিশ্বাসী, পেসমেকার আমাকে আর

নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় না। কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ডের শ্রান্ত দামামা মিনিটে পঞ্চান্নবার বেজে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে, হৃদয়নাথ চৌধুরী, তুমি মোটামুটি বেঁচে আছ।

কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ডের এই বেহিসেবি হঠকারিতার কারণ হয়তো আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার শরীরে ওর অস্তিত্ব বেঁচে আছে। বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে সেই অস্তিত্ব স্তব্ধ হয়ে জানান দিচ্ছে। যে-হৃদয়কে আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে বুকের মধ্যে লালিত করে নিয়ে এসেছি, সে আমাকে হয়তো এইভাবেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। অবশ্য কাশীকান্তের হৃদয়ও তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না। বরং বেশ দুর্বল ছিল। সুতরাং পথ চলতে-চলতে সে যে মাঝেমধ্যে হোঁচট খাবে সে আর আশ্চর্য কী! ওর হৃদয়ের দুর্বলতার কথা সবাই জানত। মানসীও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ওকে এখনই কিছু বলছি না।

মানসীকে লতানে গাছের মতো অবলম্বন করে আবার শুয়ে পড়লাম। তন্দ্রা যখন ক্রমে গভীর হয়ে এল তখন ফিসফিস করে উচ্চারণ করলাম, 'কাশীকান্ত, মাঝে-মাঝে থেমে গিয়ে তোর একী ছলনা? কী চাস তুই?'

কাশীকান্তের হৃৎপিণ্ড কোনও জবাব দেয়নি। শুধু মিনিটে ষাটবার বেজে উঠে বলতে চেয়েছে, হৃদয়নাথ, তুমি বেশ ভালোই বেঁচে আছ!

দুইঃ কিছু স্মৃতি—পুনর্বিবেচনা

আজ সকালে খাওয়ার টেবিলে বসে মানসীর সামনে এই প্রথম কাশীকান্ত-প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি। মানসী ঠোঁটের কাছে জলের গেলাস তুলেছিল, মুহূর্তে রাজা ট্যান্টালাস হয়ে গেল। গেলাসের জল নিস্তরঙ্গ, যেমন ওর প্রাণবতী চোখ। শুধু অনুপুঙ্খ কাঁপন ধরেছিল ওর ঠোঁটে।

'মানসী, কাশীকান্তকে মনে পড়ে?'

অনেক দেরি করে, এবং অতি ধীরে, ওর মনের আয়না বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে আমার মুখাবয়ব লক্ষ্য করে স্থাপিত হল।

'যে-হৃৎপিণ্ডটা আমার বুকের ভেতরে বেজে চলেছে, মানসী, সেটা হয়তো কাশীকান্তের—' কিছুক্ষণ নীরব থেকে সংযুক্ত করি, 'আচ্ছা, তোমার মনে আছে, ওর পদবি কি রায় ছিল?'

অসীম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অদৃশ্য তরঙ্গ শরীরের প্রতিটি আনাচেকানাচে পৌঁছে দিয়ে সহজ হল মানসী। আমার বিশেষ পরিচিত তাচ্ছিল্য ও নিরাসক্ত ভাব মুখে এঁকে বলল, 'ঠাট্টা কোরো না।'

ও টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কাজে মনোযোগ দিল। আমি আশাবাদী চোখে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর একসময় পায়ে-পায়ে চলে এলাম শোওয়ার ঘরে।

ক্রমাগত চর্চায় কাশীকান্তের ধূসর স্মৃতি ধীরে-ধীরে পুনর্জীবন ফিরে পায়। অতীতের সখ্য বর্তমানের আঁচল ধরে চোখের সামনে ছায়াছবি হয়ে ওঠে।

কাশীকান্ত মানসীকে চিনত, জানত। মহিলা-সকাশে ওর আচরণ ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল। ওর সহজ মেলামেশাকে আমি বা আমরা—অনেক সময় দুর্বলতা ভেবেছি। হয়তো সেটা ভুল। কাশীকান্ত স্বদেশি ছিল, ফুটবল খেলা ভালোবাসত, মুষ্টিযুদ্ধের আসরে স্থায়ী দর্শক ছিল। অর্থাৎ, চকিত উত্তেজনা ওকে লোভাতুর করে তুলত। দীর্ঘ সাতাশ বছরে ও পালটেছিল কি না আমার জানা নেই। ফলে ওর সেই পুরোনো ছবিটাই বারবার অমলিন হয়ে ফুটে ওঠে। ওর যৌবন কালজয়ী।

সেই অনুপাতে যুবক আমি, হৃদয়নাথ চৌধুরী, ও মানসী অনেক বেশি অস্পষ্ট। মরচে পড়া লোহা যেমন তার রাসায়নিক পরিবর্তনের রূপ লঙ্ঘন করে নিজের গর্বময় অতীতকে খুঁজে নিতে পারে না, তেমনি আমি ও মানসী। সুদীর্ঘ সাতাশ বছরের সহবাসে আমরা, দুটো ভিন্ন-ভিন্ন মৌলিক পদার্থ, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক অবিচ্ছেদ্য অচেনা যৌগে পরিণত হয়েছি। এখন অতীতের সেই মৌলিক যুবক-যুবতীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা অযৌক্তিক। তবে, এটুকু স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানসী কাশীকান্তকে মনে রেখেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

ভাবতে অবাক লাগছে, সম্ভবত সেই চকিত উত্তেজনাকামী হৃৎপিণ্ড বর্তমানে আমার হৃদয়ে স্থাপিত। শত চিন্তা করেও কাশীকান্তের পদবি আমি মনে করতে পারছি না। মানসীর কি মনে আছে?

বুকের বাঁ-দিকে আলতো করে হাত রাখলাম। জীবন স্পন্দনশীল। কাশীকান্ত জীবিত। দুরারোগ্য ব্যাধি ওকে শেষ করে দিলেও ওর মহার্ঘ প্রত্যঙ্গ এখনও জীবিত। ও কেন, কখন, কীভাবে বিদেশে গিয়েছিল? কবে আক্রান্ত হল ওই দুরারোগ্য ব্যাধিতে?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ও সত্যিই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

ওকে নিয়ে আমি নানান কল্পনা করতে থাকি। মিথ্যে ঘটনা তৈরি করে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলি। আমি আর কাশীকান্ত। কাশীকান্ত আর আমি। এক তরুণ ও এক প্রৌঢ়ের কিংবদন্তিসুলভ এক বন্ধুতা কোনও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবি করতে পারে। অতঃপর কাশীকান্তের সম্মানে আজকের দিবানিদ্রা বিসর্জন দিয়েছি।

বিকেলবেলা ওষুধ খাওয়ার প্রস্ত শেষ করে বারান্দায় দেওয়ালে ঝোলানো ছোট্ট আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ভাঁজের সংখ্যা এবং পাকা চুলের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি আমি আগে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ করতাম। গত কয়েকবছর সে-অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছি। তবে আয়নায় দেখা মুখটাকে আমার বরাবরই ভালো লাগে।

মুখের পর নজর নামিয়ে তাকালাম বুকের দিকে। অপারেশানের ক্ষতচিহ্ন খুবই সামান্য—সম্ভবত বিদেশি কারিগরির অগ্রগতির জ্বলন্ত প্রমাণ। আমার দৃষ্টি যেন বুক ভেদ করে অভ্যন্তরে

পৌঁছে গেল। আমি কাশীকান্তকে দেখতে পেলাম। ও উল্লাসে লাফাচ্ছে। মিনিটে পঁয়ষট্টিবার। অপারেশানের আগে বিদেশি ডাক্তাররা হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে যেসব সচিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলো ভাসা-ভাসা মনে পড়তে লাগল। হৃৎপিণ্ডের সংজ্ঞা কী? 'একটি ফাঁপা পেশিগঠিত অঙ্গ যা রক্তকে পাম্প করে শরীরের সর্বত্র বহমান রাখে।' বুকের দিকে তাকিয়ে, তার অভ্যন্তর রঞ্জন রশ্মি-দৃষ্টিতে পরিদর্শন করে আমি ভাবলাম, কাশীনাথের স্বাস্থ্য ভালো ছিল। পেশিগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী ছিল ও। এখন আমার শরীরে সর্বত্র রক্তসঞ্চার করছে। প্রাণসঞ্চার করছে। পরিহাসপ্রিয় অদৃষ্টদেবকে প্রণাম জানাই।

এককাপ চায়ের প্রত্যাশায় মানসীকে খুঁজতে শুরু করলাম। নানান ঘর পরিক্রমার পর শোওয়ার ঘরের বিছানায় ওর হদিস মিলল। সারাটাদিন ও যেন নিজেকে কেমন গুটিয়ে রেখেছে।

মৃদুকণ্ঠে ডাকতেই পাশ ফিরল। চোখ সামান্য ফোলা। বললাম আমার উদ্দেশ্য। ও সংক্ষিপ্তভাবে 'বারান্দায় বোসো, দিচ্ছি,' বলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার আগে একপলক আমার বুকের দিকে দেখল।

তক্ষুনি আমার হৃৎযন্ত্র চতুর্থবার হোঁচট খেল। কিন্তু আমি সর্বংসহা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারাদিনের স্মৃতিচর্চার পর এই মুহূর্তে কাশীকান্ত আমাকে আতঙ্কিত করে তুলতে ব্যর্থ হল। তারপর ও আবার চলতে শুরু করল। আমি ওর ছন্দের ধক-ধক শব্দটা গুনলাম না। মানসীর অপসৃয়মান শরীরের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মনের মধ্যে মন্দ্রস্বরে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। মানসীর প্রতি আমার উপাসনা বিরামহীন। মানসী কি জানে?

তিনঃ প্রতিক্রিয়াশীল, আমি ও মানসী

রাতে শুয়ে টের পেয়েছি আমার অনিদ্রা মানসীতেও সংক্রামিত হয়েছে। বিদ্রোহী যুগ্ম শিশুর মতো ঘুমপাড়ানি বাতাস ও রাতের অন্ধকার, নিস্তব্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণকে অবহেলা করে আমরা জেগে আছি। মানসীর এক প্রাগৈতিহাসিক অনুযোগ, ঘুমিয়ে পড়লে আমার নাক ডাকে। এখন সে ভয় নেই। তবে কাশীকান্তের পথ চলার শব্দ প্রকট হয়ে আমাদের কানে বাজছেঃ ঢিপ-ঢিপ-ঢিপ।

বহুদূর, সুদূর অতীত থেকে ও পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে। ওর পথ চলা শেষ হতে চায় না। আর পদশব্দের তীব্রতা ক্রমে উত্তাল হয়ে উঠছে। মানসী এই শব্দে অভিযোগ করবে না তো?

একসময় পাশ ফিরলাম। অভ্যাসের ক্রীতদাস হয়ে ওর গায়ে, আবরণহীন অংশে হাত রাখলাম। স্পর্শ শীতল। এবং অতিসূক্ষ্ম হলেও ওর শরীরের দ্রুত সঙ্কোচন আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম। আমার হৃৎপিণ্ডের অবাধ্য শব্দকে ছাপিয়ে বলে উঠলাম, 'মানসী, আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিই, না?'

ও আমার বুকের কাছে সরে এল। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু টের পেলাম, একটা ঠান্ডা হাতের আঙুল সন্তর্পণে আমার বুকের বাঁ-দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। অপারেশানের আঁকিবুকি পেরিয়ে সঠিক জায়গায় হাতটা থামল। দ্বিধা ভরা আঙুলে নানানভাবে আমাকে স্পর্শ করে চলল। হয়তো আমার হৃৎপিণ্ডকে অনুভব করতে চাইল।

'হৃদয়—হৃদয়নাথ—।'

আমি চমকে উঠলাম। এ কণ্ঠস্বর কার? তারুণ্যের দাপটে অহঙ্কারী এই কণ্ঠস্বর?

'হৃদয়, তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে—' বিয়ের পর যখন প্রথম দেখা হয়, তখন কাশীকান্ত আমাকে এ-কথা বলেছিল। তারপর সর্বদা হাসিখুশি উদ্ধত পুরুষটা পালটে গেছে। কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে ও ছোট্ট করে রুদ্ধ স্বরে বলেছে, 'তবে তুই এখনও আমার বন্ধু—এ-কথা ভুলিস না।' আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে কাশীকান্তের নিষ্ক্রমণ দেখেছি। ক্লান্ত পদক্ষেপে ও চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। এবং সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধিতে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি। কাশীকান্তের সহজ প্রগলভতা সবক্ষেত্রেই দুর্বলতা ছিল না। শুধু মানসীই কি ছিল ব্যতিক্রম? মানসী কি এ-কথা জানে? কখনও বুঝতে পেরেছে কাশীকান্তকে?

তারপর থেকে সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ওকে আর দেখিনি। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু, হঠাৎই, কাকতালীয় ঘটনায়, পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্মৃতি প্রমাণ করে দেয় সে কখনও মরে না, অবচেতনে লুকিয়ে থাকে মাত্র।

মানসীর কান্না এখন আমি শুনতে পাচ্ছি। অনুভব করছি ওর শরীরের হ্রস্ব তরঙ্গের কাঁপুনি। ওকে আমি কি অনেক কষ্ট দিয়েছি? অমর্যাদা করেছি? অতি সতর্ক ও অণুবীক্ষণ চিন্তাতেও নিজেকে ত্রুটিহীন মনে হয়। তবু অজানা এক অপরাধবোধে মানসীকে কাছে টেনে নিয়েছি। এই মুহূর্তে, ওর তুলনায়, আমি অনেক বেশি আশ্বাসপ্রার্থী। মানসীর ঠোঁট আমার হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে আছে। আর তখনই কাশীকান্তর পায়ের শব্দ স্তব্ধ হল।

আমার শরীরের ভিত পর্যন্ত যন্ত্রণায় টলে উঠল। এখন আমার রক্ত সঞ্চালন ক্রমশ সুধীর হয়ে একসময় নিশ্চল হবে। তারপর বাকি প্রত্যঙ্গগুলো দলনেতার অনুসারী হয়ে জেহাদ ঘোষণা করবে, বলবে, কাম বন্ধ! ওরা কি জানে, আমি ইদানীং নিষ্কাম পুরুষ?

আমার সহনশীলতা আমাকেই অবাক করল। দাঁতে ঠোঁট চেপে শরীরকে পাথরপ্রতিম করে তুললাম। মানসীর কান্না শুনতে পাচ্ছি না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি অকর্মণ্য হয়ে আসছে? কাশীকান্ত, কাশীকান্ত, তুই থামলি কেন?

প্রায় সাতটি স্পন্দন নীরবে অতিক্রম করে আমার হৃৎপিণ্ড আবার সপ্রাণ হয়েছে। তার কাছে আমার সকরুণ অধীনতা স্পষ্টভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে। আমার শরীরের উষ্ণতা অনেক

কমে গেছে। সেইসঙ্গে সাহস, আত্মবিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি।

মানসীকে ডাকলাম। ও সাড়া দিল না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ভয়ার্ত প্রহরে কেউ আমাকে নিরাপত্তা দেবে না।

চারঃ উপসংহার

এক নতুন অভিযোগ শুনতে পেলাম মানসীর কাছ থেকে।

কাল রাতে তিনবার নাকি এক অদ্ভুত শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। আমার বুকের ভেতর থেকে দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টার মতো এক তীব্র শব্দ ক্রমাগত শোনা যাচ্ছিল। সেই শব্দে গোটা ঘর যেন গমগম করে উঠেছে, ঘরের বাতাসে স্বনন সৃষ্টি হয়েছে। আমি, স্বাভাবিকভাবেই, এই অভিযোগ অস্বীকার করেছি। আবার কিছুটা শঙ্কিতও হয়েছি। পদধ্বনি কি এতই কাছে এসে পৌঁছেছে?

মানসীর কথামতো একরকম বাধ্য হয়েই স্থানীয় জনৈক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে গেলাম। বহু পরীক্ষার পর আমার নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, সব স্বাভাবিক। অর্থাৎ, হৃদয়নাথ চৌধুরী, তুমি সুস্থ হয়েই বেঁচে আছ।

ফিরে এসে ডাক্তারের অভিমত বারবার আবৃত্তি করেও মানসীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারিনি। ওর দুশ্চিন্তা ও সন্দেহের প্রলেপে এতটুকু চিড় ধরাতে পারিনি। আত্মসমীক্ষায় অবসাদগ্রস্তভাবে সারাটা দিন যখন অতিক্রান্ত হয়ে লাজুক সন্ধ্যারানির অধরে চুম্বনোদ্যত, তখন ভেতরের ঘর থেকে আনন্দের অস্ফুট স্বর হঠাৎই শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে উচ্ছল মানসী কিশোরী-চপলতা অনায়াসে আয়ত্ত করে প্রায় ছুটে এসেছে আমার কাছে। আমি অবাক চোখ তাকাতেই ও কথা বলতে শুরু করেছে। লক্ষ করলাম, ওর হাতে একটা মলিন জীর্ণ কাগজ।

'দ্যাখো, দ্যাখো, আলমারি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এই চিঠিটা খুঁজে পেলাম। তুমি ভুল ভেবেছিলে। তোমার ওই বন্ধুর নাম কাশীকান্ত রায় নয়, কাশীকান্ত সরকার। এই দ্যাখো, তোমাকে লেখা কবেকার চিঠি। মিছিমিছি তুমি—।'

ওর আনন্দ-বিহ্বলতা, খুশি, জয়োল্লাস, নিশ্চিন্ততা, কোনওটাই আমাকে স্পর্শ করতে পারল না। আমি চিঠিটা দেখার কোনও আগ্রহও পেলাম না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘশ্বাস কোনও সুদীর্ঘ পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো আমার শরীরের গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ঊষর পারিপার্শ্বিকে একমাত্র আশ্বাস খুঁজে পেতে আমি পরম আদরে বুকের বাঁ-দিকে হাত রাখলাম। এক অবরুদ্ধ তরঙ্গ আমার শরীর কাঁপিয়ে দিতে চাইছে।

মানসী হয়তো অবাক হল, উৎকণ্ঠিত হল। জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

নিজের কণ্ঠস্বরকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'কিছু হয়নি।'

মানসী চলে গেল। বাইরের অন্ধকার গাঢ় হল। আমি চোখ বুজলাম। শুনতে পাচ্ছি মানসীর গুনগুনিয়ে তোলা সুর। ওর বয়েস অনেক কমে গেছে।

পরে কখন তন্দ্রা এসেছে জানি না, তবে যখন সচেতন হলাম, তখন হৃৎপিণ্ড উথালপাতাল হয়ে বেজে চলেছে। আস্তে-আস্তে বললাম, 'তুমি তো কাশীকান্ত নও, তা হলে কেন এই অশ্লীল আচরণ?'

উত্তরে ধক-ধক-ধক-ধক শব্দের মিছিল এগিয়ে এল।

শ্লথ ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। সবক'টা ঘরই অন্ধকার। মানসী কি আলো জ্বালায়নি? ওকে কয়েকবার ডাকলাম। সাড়া নেই। কোথাও কি বেরিয়েছে? আমার দিশেহারা বিক্ষিপ্ত পায়ের শব্দের সঙ্গে কাশীকান্তের পায়ের শব্দ মিলে যেতে লাগল। আমি মানসীকে খুঁজে চলেছি। আর গন্তব্যে পৌঁছে কাশীকান্ত আমার বুকের ভেতরে অপেক্ষা করছে। কোনও প্রবল বিস্ফোরণ সহকারে আত্মপ্রকাশ করবে। আমার পুনর্জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও পুনর্জীবিত হয়েছে। পদবি যাই হোক না কেন, কাশীকান্তের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

আমার বুকের ভেতর হঠাৎই যেন এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটল। অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল। অসহ্য এই অত্যাচার। শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু উত্তাল হয়ে স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠেছে।

কোনওরকমে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বাললাম। তারপর যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থাতেই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার প্রৌঢ় মুখমণ্ডলে অসংখ্য জটিল রেখা জন্ম নিয়েছে। নিজের মুখের জ্যামিতি আমার কাছে অপরিচিত। সেইসঙ্গে বুকের যন্ত্রণাটা শতগুণ প্রবল হল। শুরু হল লক্ষ-লক্ষ উন্মত্ত হাতির তাণ্ডব। অসংখ্য ছুঁচ যেন কেউ অতি সন্তর্পণে নিপুণভাবে বিদ্ধ করে চলেছে আমার দেহে! হৃৎপিণ্ডের পাগল করা হাতুড়ি পেটার নির্ঘোষ প্রপিতামহ ঘড়ির চেয়েও শক্তিশালী। স্মৃতির টেরোড্যাক্টিল্ কর্কশ চিৎকার করে অধীরভাবে প্রকাণ্ড ডানা ঝাপটায়।

পাশের তাক থেকে শিথিলভঙ্গিতে দাড়ি কামানোর ক্ষুরটা তুলে নিলাম। ধারালো অংশকে উন্মুক্ত করে আয়নার প্রতিবিম্বে স্থির দৃষ্টি রাখলাম। শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড কোলাহলকে ছাপিয়ে প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কে?'

সে-ও একই প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

হিসেব করে দেখলাম, নিজের শরীরে প্রথম আঘাতের সঠিক স্থান নির্বাচন করতে আমার বেশি সময় লাগবে না।



একটু-একটু দেখা যায়

নীল শাড়ি পরা মেয়েটি রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই মলিন রেস্তোরাঁর পরিবেশটাই যেন বদলে গেল। কোনও সুন্দরীর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল যদি না থাকে তা হলে ওর দিকে আমি একবারের বেশি তাকাব না এটা ঠিক নয়। তাই চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া থামিয়ে আমি রূপসি মেয়েটির দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি হঠাৎই একচিলতে হাসল—তারপর আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমারই টেবিলের দিকে।

রেস্তোরাঁর নাম 'বিভূতি কেবিন'—হাতিবাগান অঞ্চলের ব্রিটিশ আমলের রেস্তোরাঁ। চা, টোস্ট, মাংসের সিঙাড়া, চপ-কাটলেট, মোগলাই ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় দুশো ছত্রিশবার হাত-বদল-হওয়া রোজকার খবরের কাগজ, নানান মাপ ও রঙের আরশোলা এবং হাফডজন টিকটিকি।

এখানে আমি প্রায়ই আসি, তবে এই সুন্দরীকে কখনও দেখিনি। এই মুহূর্তে ওকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

মেয়েটির বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল নেই—কিন্তু সেটা ও লুকিয়ে রাখার কোনওরকম চেষ্টাই করছে না। ডানহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ আর বাঁ-হাতে হালকা নীল সিনথেটিক শাড়ির মনোরম ভাঁজগুলো ধরে রেখেছে।

আজ আমি এখানে আচমকা ঢুকে পড়েছি একটু দম নেওয়ার জন্যে। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ মাথায় নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে কাদা প্যাচপেচে রাস্তায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। তারই মধ্যে হঠাৎ খেয়াল করেছি, কালো জামা-প্যান্ট পরা একটা লোক আমাকে বিচ্ছিরিভাবে ফলো করছে।

লোকটাকে আমি দিনচারেক ধরে লক্ষ করছি। ভাবলেশহীন মুখ যেন পাথর কেটে তৈরি। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। আর পরনে আধুনিক ঢঙের কালো ফুলশার্ট আর কালো জিন্স।

আমি একা মানুষ, নিজেকে নিয়েই সময় কাটিয়ে দিই। আমার কোনও শত্রু আছে বলে মনে হয় না। অথচ আমাকে ওই লোকটা ক'দিন ধরে ফলো করছে!

শ্যামবাজারে ভিড়ের মধ্যে লোকটাকে আমি ফাঁকি দিতে পেরেছিলাম। তারপর বৃষ্টির মধ্যেই ঢুকে পড়েছি হকার্স কর্নারের সরু একচিলতে গলির মধ্যে। সেখান থেকে এ-গলি ও-গলি করে অবশেষে এই 'বিভূতি কেবিন'। এবং বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় ধোঁয়া ওঠা স্পেশাল চায়ের কাপে তৃপ্তির চুমুক।

মেয়েটি সোজা এসে আমার মুখোমুখি বসে পড়ল। হাসল। অর্থপূর্ণ চোখে দেখল আমার দিকে।

মেয়েটিকে যা ভাবা উচিত, বুঝতে পারছিলাম মেয়েটি তা নয়। ওর ফরসা মুখে, নিপুণ সাজগোজে, কোথায় যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে।

আমাদের মাঝে শুধু একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের ফাঁক। সেই ফাঁক কিছুটা কমিয়ে দিতে মেয়েটি ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। দুটো সুন্দর হাতের পাখনা মেলে ধরল সাদা পাথরের বুকে। তারপর আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, 'আপনি তো ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ সেন...।'

আমি চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলাম।

সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে একবার আলাপ হলে আমি কখনও ভুলি না। এই মেয়েটিকে আমি আগে কখনও দেখিনি—কিন্তু ও আমার নাম জানল কী করে!

'আপনি—আপনি—' আমার কথা বারবার আটকে যেতে লাগল।

আবার হাসল রূপসি। বলল, 'আমার নাম অনামিকা...আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায়?' আমি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। ডানহাতটা ধীরে-ধীরে টেবিল থেকে নামিয়ে পাশের চেয়ারে রাখা ব্রিফকেসের ওপর নিয়ে গেলাম। তারপর কাঁকড়াবিছের মতো হামাগুড়ি দিয়ে আমার ডানহাত পৌঁছে গেল ব্রিফকেসের হাতলে।

যে-কোনও অবস্থার জন্যে আমি এখন তৈরি। দরকার হলে বিফ্রকেস আমাকে খুলতে হবে।

অনামিকা আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। বোধহয় বুঝতে পারল, আমি ভয় পেয়েছি। আমার কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘামও হয়তো ওর নজর এড়াল না।

ও হেসে বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, শুধু-শুধু সিন ক্রিয়েট করে কোনও লাভ নেই। চলুন, সময় হয়ে গেছে—আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

আমি বাচ্চাদের মতো জেদ করে বললাম, 'না, আমি কোথাও যাব না। এখানেই চুপচাপ বসে থাকব।'

অনামিকা হাসল—অবুঝ শিশুর জেদি কথায় সুন্দরী মা যেমন হাসে।

কিন্তু আমি পাগলের মতো ভাবছিলাম। অনামিকা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? কীসের সময় হয়ে গেছে?

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় আমি আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। চা জুড়িয়ে জল, কিন্তু তা-ই সই। যেভাবেই হোক আমাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা ওকে বুঝতে দেব না।

আমি ওকে বললাম, 'চা খাবেন? সঙ্গে টোস্ট?'

অনামিকা হেসে মাথা নাড়ল। যার মানে, চা-টোস্ট কিছু চাই না—শুধু তোমাকে চাই।

এবার একটু রূঢ় স্বরে বললাম, 'মাপ করবেন, ম্যাডাম—আপনাকে আমি চিনি না। একজন অচেনা মহিলার সঙ্গে কোথাও যেতে আমি রাজি নই।'

আবার হাসল অনামিকা। ওর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে গোল বলের মতো কী একটা বের করে আমার মুখের সামনে ধরল।

বলটা চকচকে ধাতুর তৈরি। তার ওপরে কয়েকটা রঙের রহস্যময় ছায়া।

'এবার কি কিছু মনে পড়ছে?' প্রশ্ন করল অনামিকা।

আমি পাগলের মতো মাথা ঝাঁকালাম। বললাম, 'না, না—কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

অনামিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলটা আবার ঢুকিয়ে রাখল ওর ব্যাগের ভেতরে। তারপর চোয়ালের রেখা শক্ত করে বলল, 'থ্রি এক্স ওয়ান বি ওয়ান।' কিছুক্ষণ আমাকে ভাবার সময় দিয়ে তারপরঃ 'এবার কিছু মনে পড়ছে?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম পাগলা ঘোড়ার মতো।

একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠল অনামিকার মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, সত্যি, তোমার মাথার ভেতরে বোধহয় কোনও গন্ডগোল হয়েছে।'

ওর 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে যাওয়া ওর শরীরের বাঁকগুলোর মতোই কী স্বাভাবিক!

আমি পালটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে চমকে দিল।

'বিভূতি কেবিন'-এর জীর্ণ মলিন রান্নাঘরে একটিমাত্র দরজা ও একটি বড় মাপের গরাদহীন জানলা। কিচেন থেকে চপ-কাটলেট ইত্যাদি জানলা দিয়েই বেয়ারাদের হাতে আসে। সেই জানলা এবং দরজার মাথায় বড়-বড় দুটো কাচের সাইনবোর্ড। তাতে প্রকাণ্ড মাপের লাল হরফে লেখা 'বিভূতি কেবিন' এবং 'মোগলাই পরোটা'। আমি যখনই এখানে আসি তখন এই লেখাগুলোর দিকে মুখ করে বসি। আজও তাই।

হঠাৎই দেখি ‘বিভূতি কেবিন’ লেখাটার কিছু-কিছু জায়গা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুধু পড়া যাচ্ছে ‘ভূত কেবিন’। আর দ্বিতীয় সাইনবোর্ডের ‘মোগলাই পরোটা’ হয়ে গেছে ‘গলা রাটা’।

আমার অবাক ভাবটা অনামিকার নজরে পড়েছিল। ও পেছন ফিরে তাকাল একবার। তারপর জিগ্যেস করল, ‘কী হল! কী দেখে অমন চমকে উঠলে?’

আমি ওকে ব্যাপারটা বললাম।

তাতে ও ঝরনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া একরাশ রঙিন কাচের চুড়ির মতো রিনরিন করে হেসে উঠল। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

রেস্তোরাঁর অন্যান্য আড্ডাবাজ পরচর্চা-ভক্ত লোকগুলো ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখতে লাগল।

আমি চাপা গলায় বললাম, ‘কী হচ্ছে! সবাই দেখছে!’

অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে অনামিকা বলল, ‘এবার তো মানবে যে, সময় হয়ে গেছে! কোনও লেখারই সঠিক মানে তোমার চোখে আর ধরা পড়বে না। আচ্ছা, আমার এই কড়ে আঙুলটা ধরো তো!’ বলে ও টেবিলের ওপরে রাখা বাঁ-হাতটা এগিয়ে দিল আমার কাছে।

অন্য সময় হলে ওর হাতের ছোঁয়া পাওয়ার আশায় আমার মন আবেগে উথালপাথাল হয়ে যেত, রক্তকণিকা-রক্তকণিকায় বেধে যেত মরণপণ লড়াই।

কিন্তু এখন ওর কড়ে আঙুলহীন বাঁ-হাতটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে উঠল। একটা পরদেশি ভয় ঠান্ডা শিরদাঁড়া বেয়ে কুলকুল করে নামতে লাগল।

আমি অনামিকার কথা অমান্য করতে পারলাম না।

চায়ের কাপটা আলতো করে সরিয়ে দিলাম একপাশে। তারপর আমার বাঁ-হাত গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে লাগল ওর বাঁ-হাতের দিকে—কড়ে আঙুলের শূন্যস্থান লক্ষ্য করে।

শূন্যস্থানে পৌঁছেই আমি অবাক!

আমার ছোঁয়ায় ওর কড়ে আঙুল আমি দিব্যি টের পেলাম। অথচ সেই কড়ে আঙুলটা আমি একফোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না!

আমি হতবাক হয়ে অনামিকার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, ‘ইন্দ্রজিৎ সেন, এবার বুঝতে পারছ, তোমার গল্প শেষ!’

আমি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সে-কথাই জানালাম ওকে। তারপর বললাম, ‘এসব কাণ্ডকারখানা আমার কাছে ভূতুড়ে ঠেকছে। বরং চলো, আমরা অন্য কোথাও গিয়ে একটু নিরালায় বসে গল্প করি। তোমাকে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।’

অনামিকা ওর বাঁ-হাতটা টেনে সরিয়ে নিল। তারপর শক্ত গলায় বলল, ‘তুমি দেখছি ভালো কথার মানুষ নও! তা হলে খারাপভাবেই কিছু করা যাক—।’

কথাটা বলেই ও ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আবার সেই ধাতব বলটা বের করল। ওটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কী একটা করতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে দেখি রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো ফুলশার্ট কালো জিন্স পরা ছিপছিপে লম্বা চেহারার লোকটা। মুখে অভিব্যক্তির কোনও লেশমাত্র নেই।

একটা নাম-না-জানা আতঙ্ক আমাকে পাগল করে দিল।

আমার ডানহাতটা ব্রিফকেসের ওপরেই ঘোরাফেরা করছিল। এক ঝটকায় ব্রিফকেসটা খুলে ফেললাম। চোখের পলকে জেনারেটার গান বের করে অনামিকাকে লক্ষ্য করে ফায়ার করলাম।

ও হাতের বলটা নিয়ে কী একটা করল। দেখলাম, জেনারেটার গানের তীব্রশক্তির কণার স্রোত ওকে মোটেই কাবু করতে পারল না। ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে শ্বেতপাথরের টেবিলটাকে উলটে দিল আমার ঘাড়ের ওপর। আর একইসঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে কী যেন বলল।

রেস্তোরাঁয় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। চেয়ার উলটে টেবিল কাত করে যে যেদিকে পারে ছুটছে। সেইসঙ্গে কানে আসছে আতঙ্কের চিৎকার।

কালো পোশাক পরা লোকটা এসবে ভ্রূক্ষেপও করল না। হরিণের মতো সাবলীল তিনটে লাফ দিয়ে ও চলে এল আমার কাছে।

আমি তখন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। একইসঙ্গে জেনারেটার গানটাকে নিয়ে আসতে চাইছি শত্রুর মুখোমুখি।

কালো পোশাক পরা লোকটা ঝুঁকে পড়ে ডানহাতে আমার টুঁটি টিপে ধরল। আর বাঁ-হাতে জেনারেটার গানসমেত আমার ডানহাত চেপে ধরল।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই লোকটার শক্তির সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ নেই। লোকটার হাতগুলো কি ইস্পাতের তৈরি?

এক হ্যাঁচকায় সে আমাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর এক ভয়ংকর মোচড় দিল আমার ডানহাতে। আমার কবজির জোড় যেন খুলে গেল। ব্যথার বিদ্যুৎ হাত বেয়ে ছিটকে গেল মাথায়। জেনারেটার গানটা খসে পড়ল হাত থেকে। মেঝেতে পড়ে রইল অনাথের মতো।

রেস্তোরাঁয় লোকজন সব ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু মালিক চোখ ছানাবড়া করে জরাজীর্ণ ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছে। আর তিনজন বেয়ারা আতঙ্কে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে রাঁধুনিদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

অনামিকা ওদের সবাইকে উদ্দেশ করে গলা তুলে বলল, 'আপনাদের কোনও ভয় নেই। আমরা শুধু একে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা সিক্রেট পুলিশের লোক—।'

কথাটা বলে সুন্দর করে হাসল ও।

তারপর এগিয়ে এল আমার কাছে।

আমি তখন কালো পোশাক পরা লোকটার হাতে বন্দি হয়ে বোবা চোখে ওদের দেখছি।

অনামিকা এবার হেসে জিগ্যেস করল, 'ইন্দ্রজিৎ, তুমি কি এখন সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছ?'

আমি চারপাশে তাকালাম।

'ভূত কেবিন'টা এখন 'ভূত কেন' হয়ে গেছে। আর 'গলা রাটা' হয়ে গেছে 'গলা টা'। এ ছাড়া সবকিছুই আমি অসম্পূর্ণভাবে একটু-একটু দেখতে পাচ্ছি।

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। এ আবার কোনদেশি চোখের অসুখ!

আমি যে কিছু বলতে চাই সেটা বুঝতে পেরে অনামিকা লোকটাকে ইশারা করল। লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি গলায় হাত বুলিয়ে কয়েকবার কাশলাম। তারপর কোনওরকমে বললাম, 'আমার চোখে কোনও একটা গন্ডগোল হয়েছে। আমি সবকিছুই কেমন খাপছাড়া দেখছি। তোমার ডানহাতের খানিকটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওই চেয়ারটার মাত্র দুটো পায়া দেখতে পাচ্ছি। আর তার দিয়ে ঝোলানো ওই ল্যাম্পটার তারের মাঝখানটুকুই নেই—।'

আমার কেমন অসহায় লাগছিল। চারপাশটা কেন এমন খাপছাড়াভাবে মুছে যাচ্ছে?

অনামিকা আমার থুতনি ধরে আদর করে নেড়ে দিল, বলল, 'ইন্দ্রজিৎ, সেই তখন থেকেই তো তোমাকে বলছি যে, সময় হয়ে গেছে। তোমার মাথার ভেতরে গোলমাল হতে শুরু করেছে—।'

আমার বয়েস আটাশ, স্বাস্থ্য ভালো, শরীরে কোনও অসুখ নেই। তা হলে হঠাৎই আমার এসব কী শুরু হল!

অনামিকা এবার গলা নামিয়ে সমবেদনার সুরে বলল, 'আসলে পৃথিবীতে তোমার থাকার পালা শেষ। তাই তোমার ভেতরকার সফ্‌টওয়্যার ধীরে-ধীরে মুছে যাচ্ছে। কোনও প্রোগ্রামই আর ঠিকঠাক কাজ করছে না...তাই তুমি একটু-একটু দেখতে পাচ্ছ...।'

আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। ওর কোনও কথাই আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছিলাম না। নাকি বুঝতে চাইছিলাম না?

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসল অনামিকা, বলল, 'তুমি আসলে একটা রোবট, ইন্দ্রজিৎ। রোবট নাম্বার থ্রি এক্স ওয়ান বি ওয়ান। হুবহু মানুষের মতো দেখতে রোবট—যাকে অ্যানড্রয়েড বলে। অ্যানড্রয়েডদের শরীরে ছুরি বসালে রক্ত পড়ে—মানুষের মতো। ওদের সবকিছুই মানুষের মতো—শুধু ভেতরে ব্যাটারি থাকে, মাইক্রোচিপ থাকে, মোটর থাকে। তোমাকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল নিম্নমধ্যবিত্তদের জীবনযাপন সম্পর্কে ডেটা কালেক্ট করতে।

দু-বছর ধরে তুমি সেসব জোগাড় করেছ। তোমার শরীরের ভেতরে সেগুলো অটোমেটিকভাবে স্টোর্ড হয়ে গেছে।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনামিকাঃ ‘কিন্তু গোলমাল হল, তুমি এখানকার লোয়ার মিডল ক্লাস লাইফটাকে ভালোবেসে ফেললে। ভুলে যেতে চাইলে যে, তুমি অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা রোবট। তাই তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের আসতে হয়েছে—।’

অনামিকার মুখটা আমার চোখের সামনে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিল। কালো পোশাক পরা লোকটার বাঁ-হাত আর মাথার অর্ধেকটা নেই। চারপাশের মানুষজন, চেয়ার-টেবিল, সাইনবোর্ডের লেখা, সবই ধীরে-ধীরে অসম্পূর্ণ থেকে আরও অসম্পূর্ণ হচ্ছে। আমার চোখের সামনে হারিয়ে যাচ্ছে আমার নিম্নমধ্যবিত্ত নিঃসঙ্গ জীবন—যে-জীবনকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, এই নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন, এই নিম্নমধ্যবিত্ত রেস্তোরাঁ ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

অনামিকা ওর সঙ্গীকে বলল, ‘ওকে ওই আয়নাটার কাছে নিয়ে চলো—।’

লোকটা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেল বেসিনের কাছে। সেখানে বড় মাপের একটা আয়না লাগানো আছে—বয়েসের ভারে মলিন অথচ অভিজাত আয়না।

আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলাম। আমার শরীরের অনেকটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছায়া দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অসহায়ভাবে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

আমি তা হলে শুধুই হার্ডওয়্যার আর সফ্টওয়্যার! নিছকই একটা রোবট!

কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই! যাকে আমি ভালোবাসি তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই!

আমার কান্নার মাঝেই অনামিকার গলা পেলাম। কালো পোশাক পরা লোকটাকে ও বলল, ‘ইন্দ্রজিতের ব্যাটারিটা শর্ট সার্কিট করে দাও। নইলে ফেরার সময় ঝামেলা হবে—।’

আয়নায় আমার ছায়া তখন অসম্পূর্ণ থেকে আরও অসম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।



ইন্টু-পিন্টু থারটিন

আমার নাম ইন্টু-পিন্টু। আমার বয়েস তেরো—মানে, থারটিন—তবে সামান্য প্লাস-মাইনাস হতে পারে। আমার মা-কে আমি ‘মাম’ বলে ডাকি, আর মাম আমাকে ‘ইন্টু’ বলে ডাকে। বাকি নামটুকু পাপা দিয়েছে—পাপার কাছে আমি ‘পিন্টু’। পাপাকে আমি প্রথম-প্রথম ‘বাবা’ বলে ডাকতাম। কিন্তু পাপা-ই আমাকে একদিন স্পষ্ট ইন্সট্রাকশন দিল যে, ‘বাবাকে বলবে পাপা, আর মা-কে মাম।’ ব্যস, তারপর থেকে পাপা আর মাম।

আমি দিন-রাত কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকি—পড়াশোনা করি, খেলা করি, কম্পিউটারের সঙ্গে গল্প করি। ও আমাকে নানান গল্প শোনায়, মজার-মজার কথা বলে। আর জ্ঞান দেয়।

আমার কম্পিউটারের নাম রোবোকম্প-সেভেন। একটা আর্ম-রোবট আর একটা কম্পিউটার জুড়ে তৈরি। ওর মেকানিক্যাল আর্ম দুটো মেটালের ওপরে ফাইবার কোটিং দিয়ে তৈরি। এই হাত দিয়ে ও নিজেই নিজের কিবোর্ডের বোতাম টিপে প্রোগ্রাম লিখতে পারে। ওর অনেক বুদ্ধি আছে—যদিও পাপা বলে ওসব ‘নকল’ বুদ্ধি।

আমার মাম আর পাপা খুব সিস্টেমেটিক। রোবোকম্প আমাকে প্রথম এই কথাটা জানিয়েছে। বলেছে, ‘ইন্টু-পিন্টু, আমার সিস্টেম ইউনিটের চেয়ে তোমার মাম আর পাপার সিস্টেম ইউনিট অনেক-অনেক অ্যাডভান্সড।’

তারপর থেকে আমিও ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। সত্যিই তো! আগেও দেখেছি, কিন্তু কখনও ব্যাপারটা খেয়াল করিনি।

মাম আর পাপা যেন ঘড়ি ধরে সব কাজ করে। ওদের সারাদিনের কাজ যেন কেউ তুখোড়ভাবে প্রোগ্রাম করে দিয়েছে।

মাম রোজ সকাল সাতটায় ওঠে। তারপর বেডরুমের ক্রিস্টাল মিরারে অনেকক্ষণ ধরে নিজের মুখটা দ্যাখে। চোখের পাতায় হাত দিয়ে দ্যাখে। কানের লতি টেনে-টেনে কী যেন চেক করে। মাথার চুলের স্টাইলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দ্যাখে। নানানরকম কায়দায় চোখের ভঙ্গি করে। অনেকরকমভাবে হাসে—হাসিগুলো বোধহয় পরীক্ষা করে।

তারপর—প্রায় আধঘণ্টা পর—আয়নার ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আই লাভ য়ু—' এবং ছবির ঠোঁটে শব্দ করে চুমু খায়। আমি জানি, আয়নায় ফুটে ওঠা ছবিতে ঠোঁটে ছাড়া আর কোথাও চুমু খাওয়া সম্ভব নয়।

আমার মামের ঠোঁট খুব সফ্‌ট। আমি জানলাম কী করে? পাপা একদিন মামকে বলছিল, আমি শুনেছি। আর শুধু ঠোঁট কেন, মামের সবকিছুই সফ্ট—তাইতো পাপা মামকে বলে, 'তুমি না ভীষণ সফ্‌টওয়্যার।' বলে আর খিলখিল করে হাসে।

তখন মামও কেমন একটা ঢং করে মাথা হেলিয়ে চোখ সরু করে ঠোঁটের কোণে হাসে, মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো নিয়ে আসে মুখের ওপরে। তারপর মুখ দিয়ে ঝরনার জলের মতো শব্দ করে পাপাকে কেমন পাগলের মতো খাবলাতে থাকে। আর একইসঙ্গে বিড়বিড় করে বারবার বলে, 'তুমি খুব হার্ড, বুঝলে! একেবারে হার্ডওয়্যার।'

পাপাকে তখন কেমন ঘোর-লাগা মানুষ মনে হয়। জ্বর হওয়া গলায় পাপা বলে, 'এসো...সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার না কাপল করলে সিস্টেম কাজ করবে কেমন করে! তারপর আমার ইনপুট ডিভাইস...উম্‌ম্‌...জয়স্টিক...আর তোমার পাওয়ার সকেট...।'

এইসব শোনার পর থেকে আমি মামকে সফ্‌টওয়্যার বলি, আর পাপাকে হার্ডওয়্যার। অবশ্য ওরা সেসব কিচ্ছু জানে না।

আয়না দেখা শেষ হলে মাম মুখ-হাত ধুয়ে একেবারে স্নান সেরে নেয়। তারপর চা-ব্রেকফাস্ট, টিভি নিউজ। তখন পাপা মামের কাছে বসে থাকে। অফিসের ফাইল পড়ে।

এরপর মাম ভিডিয়োফোনের কাছে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়। তখন মামের প্রচুর ফোন আসে। মামও ফোন করে কাউকে-কাউকে। মামের মুখে তখন নানান নামের খই ফুটতে থাকে। কীসব নাম! জ্যাকি, ক্রিপটন, ম্যাসি, আয়ান, রনি, অর্ঘ্যপ্রতিম, রামারাও, রাকেশ...এরকম আরও কত! এর মধ্যে কয়েকটা নাম শুনে তো অনায়াসে কুকুরের নাম বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে ওরা কুকুর নয়—মানুষ। মানুষ যে, সেটা বুঝতে পারি ভিডিয়োফোনের পরদায় ওদের ছবি দেখে। ওদের কারও চুলের রং সবুজ, কারও চোখে কালো চশমা। কারও জুলপি এমনই লম্বা-চওড়া যে, দাড়ি না জুলপি সেটা গুলিয়ে যেতে চায়। আবার কারও একটা কানে একটা প্লাটিনামের মাকড়ি।

ভিডিয়োফোনের পালা ফুরোলে মাম মোবাইল ফোন শুরু করে। তাতে ফোন আসে, ফোন যায়। কথা বলতে-বলতে মাম হেসে গড়িয়ে পড়ে। তখন আমার ভয় করতে থাকে—এই বুঝি মাম চেয়ার থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল!

আমাদের কাজের লোক দুজন। একজন ঘরকন্নার কাজ করে, আর-একজন রান্না করে। কী-কী রান্না হবে মাম সেটা একটা কাগজে লিখে কিচেনের দেওয়ালে স্টিক করে দেয়। সেটা পড়ে নিয়ে দুজন কাজের মেয়ে—রোজি আর নিনি—কাজ শুরু করে দেয়। কখনও ওরা যদি অকারণে মামকে বিরক্ত করে তা হলে মাম ওদের ইংরেজিতে যা-নয় তাই বলে। ওদের নাম রোজি আর নিনি হলেও ওরা কিন্তু একবর্ণও ইংরেজি জানে না। কারণ, ওদের আসল নাম রাজিয়া আর ননীবালা—মাম সেই সেকেলে নামদুটো পালটে ওরকম মেম-মেম করে দিয়েছে।

আমার নামটা নিয়েও পাপা আর মাম একদিন নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছিল—আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি।

তখন সন্ধে সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। মাম হঠাৎই বাড়ি ফিরে এল।

নরমালি এত তাড়াতাড়ি মাম ফেরে না। পাপা তার একটু আগেই বাড়ি ফিরেছে। রোজকার মতো আমার কম্পিরুমে একবার উঁকি মেরে 'হাই, পিন্টু' বলে নিজের রুমে চলে গেছে। কিন্তু পাপার টলোমলো হাঁটার স্টাইল দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম, পাপার মুখে সেই বিচ্ছিরি গন্ধটা পাওয়া যাবে। এত স্টিংকি মাউথ ফ্রেশনার পাপা কেন ইউজ করে কে জানে!

মাম ফ্ল্যাটে ঢুকেছে গান গাইতে-গাইতেঃ 'উই আর চিলড্রেন অফ দ্য ওরিজিনাল সিন...।' আমি কম্পিরুম থেকে মামকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সফ্‌টওয়্যার তখন গায়ের শাড়িটা খুলে ফেলেছে। শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে এমনভাবে স্টেপ ফেলছে যেন কোনও বাচ্চা প্রথম হাঁটতে শিখছে। বুঝলাম, সেই একই মাউথ ফ্রেশনারের গল্প। পাপা আর মাম কি একই দোকান থেকে মাউথ ফ্রেশনারটা কেনে?

পাপা ঘর অন্ধকার করে বিছানায় বসে টিভিতে 'ক্রাইম টাইম' প্রোগ্রামটা দেখছিল। মাম হঠাৎ এলোমেলো হেঁটে পাপার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি একটু অবাক হয়ে রোবোকম্প ছেড়ে উঠে পড়লাম। পা টিপে-টিপে পাপার রুমের দিকে গেলাম। খেয়াল রাখলাম যাতে মাম আর পাপা কিছুতেই আমাকে দেখতে না পায়।

মাম কেমন জড়ানো গলায় পাপাকে বলল, 'কী, একটু ইন্টু-পিন্টু হবে না কি?'

পাপা বলল, 'সে কী! আজ ডেট বটে, কিন্তু এখনও তো টাইম হয়নি!'

মাম বলল, 'আই অ্যাম নট ফিলিং ও. কে.। তাই রুটিন জব এক্সিকিউট করে একটু সিস্টেম শাট ডাউন করব। এখন সেরে না নিলে আমি রেস্ট নেওয়ার সময় তুমি হয়তো আবার সিস্টেম বুট

করতে চাইবে। তখন এন্টার বাটন টিপলেই সিস্টেম হ্যাং করে যাবে। যু নো হোয়াট আই মিন!' তারপরই মামের কী হাসি!

তখন হার্ডওয়্যার বলল, 'রুটিন ডিসটার্ব করা ঠিক নয়। কাম অন মাই পারসোনাল সফ্‌টওয়্যার, একটু ইন্টু-পিন্টু হয়ে যাক।'

এ-কথা শুনে সফ্‌টওয়্যার হার্ডওয়্যারের ঘরের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাচভাঙা হাসিতে পাপার ঘরের অন্ধকার ভাসিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি তোমার পারসোনাল সফ্টওয়্যার? ডু যু বিলিভ ইট?'

'ইয়েস আই ডু—যদিও এর ইউজার অনেক।'

আবার সফ্‌টওয়্যারের হাসি। এবং হার্ডওয়্যার বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাম ফ্যাশান ডিজাইনার। দুপুরে লাঞ্চের পরে সেইসব কাজ নিয়ে বসে।

কাগজে ছবি আঁকে। কম্পিউটারের সামনে বসে ফোটোশপ, কোরেল-ড্র, আর ফ্যাশানক্যাড-থ্রি নিয়ে কাজ করে। তখন মামের সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। এমনকী কোনও ফোন এলেও মাম ধরে না।

কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টা বাজলেই মাম ড্রেস করে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যায় জানি না। তারপর ফেরে রাত দশটায়। পাপার সেদিনকার কথা শুনে মনে হয়, মাম মাল্টি-ইউজার সিস্টেমের সফ্‌টওয়্যার হয়ে গেছে। কিন্তু এর মানে কী?

রোবোকম্প অনেক ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। তাই কথাটা ওকে জিগ্যেস করেছিলাম। তখন ও কিবোর্ডের বোতাম টিপে 'আন্ডারওয়াটার' গেম খেলছিল। আমার কথা শুনে গেম থামিয়ে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মোড 'অন' করে বলল, 'ওয়েলকাম, ইন্টু-পিন্টু থারটিন। বলো, আমাকে নিয়ে কী করতে চাও?'

রোবোকম্প-এর গলাটা কেমন মেটালিক। কিন্তু তাতে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আমি গালে হাত রেখে ওকে প্রশ্নটা করলাম।

ও বলল, 'ওটার মানে হল, মালটিপ্‌ল ইউজার টাইম শেয়ার করে একই সফ্‌টওয়্যার ইউজ করতে পারে।'

আমি ওকে বললাম যে, আমি আরও জানতে চাই।

উত্তরে রোবোকম্প বলল, 'ইন্সাফিশিয়েন্ট ডেটা। আরও সময় চাই, আরও তথ্য চাই।'

'ততদিনে তো আমি বড় হয়ে যাব—।'

'হ্যাঁ। তা হলেই আরও ভালো করে বুঝতে পারবে।'

আমার কেন যেন মনে হল, রোবোকম্প আরও জানে, কিন্তু আমাকে বলল না।

আমার ভেতরে কেমন একটা কষ্ট হতে লাগল।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে মাম আমাকে ডানগালে হাম খেয়ে যায়। কারণ, বাঁ-গালটা পাপার হাম খাওয়ার জন্যে। একদিন আমি পাপাকে গাল এক্সচেঞ্জ করার কথা বলেছিলাম। তাতে পাপা বলেছিল, সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার যে-সিস্টেমে কাজ করে সেই সিস্টেমকে কখনও ডিসটার্ব করতে নেই।

আমি তখন রোবোকম্প-এর সামনে বসে গল্প শুনছিলাম। পাপাকে বললাম, 'পাপা, তুমি আমাকে একটা গল্প বলো—।'

পাপা হেসে বলল, 'সিলি কিড! এসব ব্যাকডেটেড আইডিয়া তোমার মাথায় এল কী করে! তুমি সবসময় গল্প শুনবে রোবোকম্প-এর কাছে—এটাই সিস্টেম। তুমি জানো, গল্প শোনানোর জন্যে ওর মেমোরিতে তিনহাজার গল্প স্টোর করা আছে! তুমি ওর সঙ্গে আরও ইন্টেন্সলি ইন্টারঅ্যাক্ট করো, ভালো লাগবে, ও. কে.? গুডনাইট।'

পাপা শুতে চলে গেল।

রোবোকম্প আমাকে বলল, 'এসো, গল্প শুনবে। তোমাকে পুরোনো দিনের গল্প শোনাই—যখন সব ছেলেমেয়ে পাপাকে "বাবা" আর মামকে "মা" বলে ডাকত। যখন তাদের স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হতো—আজকের মতো কম্পিউটার বেসড্ হোমস্কুল ছিল না। সেসময়ে মানুষ দুঃখ পেলে তার চোখ দিয়ে জল পড়ত। তুমি জানো তো, মানুষের চোখের জল বেরোয় ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডের জন্যে। এই গ্ল্যান্ডটা হল...।'

ব্যস, এরপর রোবোকম্প লেখাপড়ার আলোচনায় ঢুকে গেল। সুযোগ পেলেই জ্ঞান দেওয়া ওর হ্যাবিট।

আমি আলতো করে চোখে হাত দিলাম। আমার ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ড আছে, নাকি নেই?

রোবোকম্প বলল, 'কী দেখছ?'

'বলো তো, আমার ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ড আছে, নাকি নেই?'

'প্রহিবিটেড কোশ্চেন। আন্সার ডিনায়েড।' রোবোকম্প বলল। তারপর ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে আমার বাঁ-গালটা আলতো করে ছুঁয়ে বিড়বিড় করল, 'সরি, ইন্টু-পিন্টু থারটিন। এসো, তোমাকে পুরোনো দিনের গল্প শোনাই। তা হলে তোমার এই ইমোশন্যাল ডিসর্ডার কেটে যাবে।'

ওর কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারলাম না, তবে ও গল্প শুরু করে দিল।

রোবোকম্প-এর গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে ওর রঙিন মনিটরে সেই গল্পের ছবি শুরু হয়ে গেল। সবুজ গ্রাম, মেঠো পথ, আঁকাবাঁকা নদী, ডিঙি নৌকো, বাচ্চা কোলে হেঁটে যাচ্ছে মা—সঙ্গে আঁচল ধরে হাটছে আরও দুটো কালো-কালো বাচ্চা ছেলে।

গল্প শুনতে-শুনতে আমার দুঃখ কেটে গেল।

এইভাবে একটার-পর-একটা দিন গড়িয়ে যায়, অথচ আমার দিনগুলো আর রাতগুলো সবসময় একইরকমঃ একটা দিন যেন আগের দিনটার ফোটোকপি। কিচ্ছু ভাল্লাগছিল না আমার।

রোবোকম্পকে একদিন সে-কথা বলতে ও বলল, 'বুঝতে পেরেছি—"সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়" সিনড্রোম।'

'তার মানে? এ আবার কী ধরনের কথা!'

রোবোকম্প হাসল। মানে, ওর মনিটরে লেখা ফুটে উঠলঃ 'আমি হাসছি।' সেইজন্যেই বুঝতে পারলাম। সবসময় এইভাবেই ও ওর হাসি-কান্না-রাগ-ভালোবাসা জানায়।

রোবোকম্প বলল, 'ওটা একটা অ্যানশিয়েন্ট বেঙ্গলি প্রোভার্ব। তার মানে হল, অ্যাব্সলিউট হ্যাপিনেস ডাজ নট এক্‌জিস্ট।'

ওর কথাবার্তা দিন-দিন আরও কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় জ্ঞান দেওয়ার অভ্যেস থেকেই এরকম হয়ে গেছে।

একদিন খাওয়ার টেবিলে বসে মাম ঘরে নতুন ফার্নিচার কেনার ব্যাপারে পাপার সঙ্গে কথা বলছিল।

'দ্যাখো, রং-টংগুলো কেমন বাজে হয়ে গেছে। গ্লসি শাইনটা যে কোনও সময় ছিল সেটা মনেই হয় না। আমাদের ফ্ল্যাটে আর পার্টি দেওয়া যাবে না। লোকজনকে ফুর্তি করার জন্যে ডেকে এসব জাংক ফার্নিচার দেখানোর কোনও মানে হয়!'

পাপা একচামচ ফ্রায়েড রাইস মুখে তুলে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'ফার্নিচারগুলো ক'বছর হয়েছে বলতে পারো?'

মাম হেসে বলল, 'তোমার হার্ড ডিস্ক দেখছি ফেইল করে গেছে! এগুলো চারবছরের বেশি হয়ে গেছে—তোমার মনে নেই? সেই যে—যখন ইন্টুকে...।'

'উম্‌ম! চারবছর মানে ইনাফ।' পাপার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সব মনে পড়ে গেছে। পাপা মাথা নেড়ে ধীরে-ধীরে বলল, 'পিন্টুরও তা হলে কিছু একটা ব্যবস্থা করো...।'

মাম আমার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কী যেন দেখল। তারপর পাপাকে বলল, 'ঠিক বলেছ, ইন্টুকে এবার চেঞ্জ করা দরকার। কারণ, ওরা বলেছিল চারবছর পরে ওর এক্সপায়ারি ডেট। এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে যাওয়ার পর ওর বিহেভিয়ারটা ইব্যাটিক হতে পারে। তখন আর কোনও গ্যারান্টি নেই। এমনকী, এ. এম. সি. কনটাক্টও ওরা আর রিনিউ করবে না।'

পাপা বলল, 'ওর ব্যাপারটা তোমার দেখার কথা। তুমিই মেইন প্রোগ্রাম—আমি স্রেফ সাবরুটিন।'

তারপর খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল।

মাম—মানে, সফ্‌টওয়্যার—আমাকে কাছে ডাকল। আমি কাছে গেলাম। সফ্‌টওয়্যার আমার পোলো নেক টি-শার্টটা তুলে বুকে-পেটে কী যেন খুঁজতে লাগল। আর একইসঙ্গে বিড়বিড় করতে লাগল, 'পাঞ্চ মার্কটা কোথায় গেল? এইখানেই কোথায় যেন লেখা ছিল...এখানেই তো...।'

টি-শার্টটা ছেড়ে দিল সফ্‌টওয়্যার। চেঁচিয়ে হার্ডওয়্যারকে বলল, 'দ্যাখো তো, ওর প্যাকিং বক্সটা কোথায়? বক্সের গায়ে এক্সপায়ারি ডেটটা প্রিন্ট করা ছিল, আমার ক্লিয়ারলি মনে আছে।'

'খুঁজে দেখছি।' ঘরের দেওয়ালের আড়াল থেকে হার্ডওয়্যার বলল, 'তুমি বরং কোম্পানির কনট্রাক্টস ম্যানজারকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাও। নইলে নতুনটা পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

আমি হাঁ করে সফ্‌টওয়্যারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মাম আর পাপা এসব কী বলছে!

আমার এক্সপায়ারি ডেট! আমার অ্যানুয়াল মেইনটিন্যান্স কনট্রাক্ট! আমার প্যাকিং বক্স!

আর 'পাঞ্চ মার্ক', 'নতুনটা পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে'—এসব কথারই বা মানে কী?

হঠাৎই আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল, কড়কড় করতে লাগল। একছুটে রোবোকম্প-এর কাছে চলে গেলাম আমি। রোবোকম্প অনেক কিছু জানে। ও নিশ্চয়ই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারবে।

ওকে হাঁপাতে-হাঁপাতে সব খুলে বললাম।

ও কিবোর্ডের বোতাম টিপে কী একটা ছাতামাথা প্রোগ্রাম লিখছিল, আমি ওর হাত চেপে ধরলাম।

'এসবের মানে কী, রোবোকম্প?'

প্রোগ্রাম লেখা থামিয়ে ও অন্য কয়েকটা বোতাম টিপল। ওর মনিটরে লেখা ফুটে উঠলঃ 'আমি কাঁদছি।'

তার একটু পরেই ও বলে উঠল, 'ইন্টু-পিন্টু থারটিন, তুমি কি জানো তুমি আসলে একটা রোবট?'

'তার মানে!'

'হ্যাঁ, রোবট। তবে তোমাকে মানুষের মতো দেখতে—তাই রোবট না বলে অ্যানড্রয়েড বলাই ভালো।'

আমি পাথর হয়ে গেলাম। সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার তা হলে ঠিকই বলেছে! আমার ভেতরেই যত সফ্‌টওয়্যার আর হার্ডওয়্যার হ্যান্ডশেক করে আমাকে চালাচ্ছে!

‘রোবোকম্প, এসব তুমি কী বলছ!’ কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। চোখের জ্বালাটা অল্প-অল্প করে বাড়ছিল।

‘ঠিকই বলছি। এখন তোমাকে বলতে আর অসুবিধে নেই—কারণ, তুমি ব্যাপারটা জেনে গেছ। এখনকার যেসব কাপ্‌ল ছেলেমেয়ে চায় না, তারাই তোমার মতো “নকল” বাচ্চা ভাড়া করে নিয়ে আসে। তবে বাচ্চা যেমন ধীরে-ধীরে বড় হয়ে ওঠে, একটা অ্যানড্রয়েড তো সেরকম পারে না, তাই চারবছর পরপর মডেলটা বদলে নিতে হয়। সেইজন্যেই তোমার বাক্সে বা বডিতে এক্সপায়ারি ডেট প্রিন্ট করা আছে। দুঃখ করার কিছু নেই—আমারও আছে।’

আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ভীষণ কান্না পেয়ে গেল আমার।

রোবোকম্প বলতেই থাকল, ‘তোমার নাম কেন ইন্টু-পিন্টু থারটিন জানো?’

আমি কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে বললাম, ‘জানি। ইন্টু নামটা মাম রেখেছে, পিন্টু নামটা পাপা—আর আমার বয়েস...।’

‘কিচ্ছু জানো না। আসলে তোমার ভেতরে প্রোগ্রাম করে ওই নলেজটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার ইন্টু এসেছে ইন্টেল থেকে, আর পেন্টিয়াম থেকে পিন্টু। তুমি ইন্টেল পেন্টিয়াম থারটিন দিয়ে তৈরি। আমার মতো তুমিও “ইন্টেল ইনসাইড”, বুঝলে? তাই তুমি ইন্টু-পিন্টু থারটিন।’

আমার কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। মনে হচ্ছিল টলে পড়ে যাব।

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে রোবোকম্প হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল।

আ-আঃ! ওর হাতটা কী মোলায়েম আর নরম! এত মায়া এত ভালোবাসা এই মেটাল আর ফাইবারের ছোঁয়ার মধ্যে!

আমার চোখ বুজে গেল আরামে।

তখনই টের পেলাম আমার গাল বেয়ে কী যেন গড়িয়ে পড়ছে।

শুনতে পেলাম রোবোকম্প দারুণ মিষ্টি গলায় বলছে, ‘এসো, তোমাকে গল্প শোনাই—এক্সপায়ারি ডেটের গল্প। তোমার আমার প্রত্যেকের এক্সপায়ারি ডেট রয়েছে। এমনকী তোমার মাম আর পাপারও। এই ডেটটা সবার গায়ে ছাপানো থাকে। কারও-কারও ডেটটা সহজে পড়ে নেওয়া যায়—যেমন, তোমার কিংবা আমারটা। আবার কারও-কারও ডেটটা পড়া যায় না—লুকোনো থাকে—তোমার মাম বা পাপার মতো। তবে সেটা পড়তে পারে শুধু একজন...যে-লোকটা মাথার ওপরে আকাশে বসে আছে...ওপর থেকে সবকিছু যে দেখতে পায়...।’



দাগের বাইরে যাবেন না

ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

রাজরীতা টিভিতে 'ক্রাইম ডট কম' প্রোগ্রামটা দেখছিল। রিমোটটা হাতে নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

ফ্ল্যাটের দরজার অন্তত বারো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রিমোটের বোতাম টিপল রাজরীতা। স্পেশাল মেটাল ফাইবারের তৈরি দরজার মাঝখানের অংশটা পলকে স্বচ্ছ হয়ে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে দেখতে পেল রাজরীতা। কিন্তু ও জানে, বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যায় না। কারণ, দরজার এই স্বচ্ছতা একমুখী।

লোকদুটোর পরনে নীল রঙের ইউনিফর্ম। নামি কোম্পানির সার্ভিস বা মেইনটিন্যান্সের লোকজনদের যেমন পোশাক হয়। ওদের একজনের হাতে একটা মাঝারি মাপের পেটমোটা ব্যাগও আছে।

রাজরীতা দোটানায় পড়লঃ দরজা খুলবে, কি খুলবে না?

এখন কলকাতায় খুন-জখম-চুরি-ডাকাতি ভীষণরকম বেড়ে গেছে। এইসব খবর নিয়েই 'ক্রাইম ডট কম' প্রোগ্রাম। তাতে রোজ আধঘণ্টা ধরে পশ্চিমবঙ্গের যত ক্রাইমের খবর দেখানো হয়। সিকিওরিটি পুলিশ যেসব ক্রিমিনালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের ছবিও দেখানো হয়। একটু আগে রাজরীতা সেইসব ছবিই দেখছিল।

দুজন লোকেরই চোখে চশমা, ঠোঁটের ওপরে পুরু গোঁফ। বয়েস খুব বেশি হলে তিরিশ-বত্রিশ। একজনের মাথায় টুপি, আর-একজনের মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কাজের একঘেয়েমিতে মানুষের মুখে যে-বিরক্তির ছাপ পড়ে ওদের দুজনের মুখেই সেই ছাপের জেরক্স কপি।

দরজার কাছে গিয়ে 'ভয়েস সিস্টেম' অন করল রাজরীতা। তারপর জিগ্যেস করল, 'কী চাই?'

উত্তরে একজন বলল, 'ম্যাডাম, আমরা "বিটা রেফ্রিজারেশান কোম্পানি" থেকে আসছি। এই ফ্ল্যাট থেকে...' পকেট থেকে একটা কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট বের করে দেখল সেঃ 'মিস্টার শত্রুজিৎ সোম আমাদের সার্ভিস কল দিয়েছিলেন। কল নাম্বার আর ডেট হল...।'

শেষ কথাগুলো আর মন দিয়ে শুনল না রাজরীতা। ওর চট করে মনে পড়ে গেল। ওদের ফ্রিজটা কিছুদিন ধরেই গন্ডগোল করছে। ফ্রিজের বাইরের পাইপ মেটিক্সে বরফ জমে যাচ্ছে। শত্রুজিৎ গত সপ্তাহে কোম্পানিতে খবর দিয়েছিল। নিশ্চয়ই তারাই লোক পাঠিয়েছে।

তা সত্ত্বেও লোকদুটোকে যাচাই করার জন্য রাজরীতা প্রশ্ন করল, 'বলুন তো, আমাদের ফ্রিজের রং কী? মডেল নাম্বার কত?'

কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট হাতে লোকটি দরজার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল। রাজরীতাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, তাই মুখে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ছাপ।

'আপনার ফ্রিজটা ব্লু রঙের, ম্যাডাম—অবশ্য যদি না আপনি ওটা এর মধ্যে প্রাইভেটলি অন্য রং করিয়ে থাকেন। আর মডেল নাম্বার বিটা-টু ওয়ান ফাইভ জিরো-এম।' প্রিন্ট-আউটটা দেখতে-দেখতে লোকটা আরও যোগ করলঃ 'আপনার ফ্রিজের সিরিয়াল নাম্বার হল...।'

রাজরীতা সিরিয়াল নম্বরের জন্য আর অপেক্ষা করল না। কারণ, অন্য দুটো প্রশ্নের উত্তরে ওরা ফুল মার্কস পেয়েছে।

রিমোটের একটা বোতাম টিপে ও বলল, 'আসুন—ভেতরে আসুন—।'

দরজার পাল্লা একপাশে সরে যেতেই মুখে সৌজন্যের হাসি নিয়ে দুজন কর্মী মসৃণ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে পড়ল।

দরজার পাল্লা আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। তারপর নিজে থেকেই লক হয়ে গেল।

বিশাল ড্রইং-ডাইনিং স্পেসের ওপরে একপলক চোখ বুলিয়ে নিল দুজনে। ওদের চাহনিতে সতর্কভাবে জরিপ করার দৃষ্টি। রাজরীতার কেমন যেন খটকা লাগল।

ঘরের একপাশে সাজানো টি-টেবেলের কাছে গিয়ে ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল একজন। তারপর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে কী যেন কথা হল। এবং দুজনেই আয়েসি ভঙ্গিতে সোফায় বসে পড়ল।

ব্যাপারটা রাজরীতার কাছে নেহাতই অসভ্যতা বলে মনে হল। তবুও ও ভাবল, হয়তো ওরা সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত—তাই সৌজন্য না দেখিয়েই সোফায় বসে পড়েছে।

ঘরের পুবদিকের দেওয়ালে টিভিতে 'ক্রাইম ডট কম' চলছিল। ওদের একজন ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে দেখছিল। আর অন্যজন রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে অশালীন ঢঙে হাসছিল।

হঠাৎই হাসি থামিয়ে টিভি-দেখা সঙ্গীর কাঁধে বাঁ-হাতে চাপড় দিল সে। বলল, 'অত কী দেখছিস! আজ নয়—কাল আমাদের পিকচার "ক্রাইম ডট কম"-এ দেখাবে।'

রাজরীতার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ল।

ও কাঁপা গলায় বলল, 'আপনাদের আই-ডি কার্ড দেখি—।'

'দেখাচ্ছি।' বলে একজন টেবিলে রাখা ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে অদ্ভুত চেহারার একটা বন্দুক বের করল।

খট করে একটা বোতাম টিপতেই বন্দুকের মাথায় লাগানো একটা চাকতির ভেতরে উজ্জ্বল লাল আলোর একটা বিন্দু জ্বলে উঠল।

রাজরীতা চিনতে পারলঃ লেজার পয়েন্টার।

আলোর বিন্দুটা রাজরীতার কপালের ঠিক মাঝখানে তাক করল সে।

রাজরীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন কপালে আগুনের টিপ পরেছে। ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরে ভারী লোহার বল পরপর গড়িয়ে দিচ্ছে কেউ।

বন্দুক-হাতে-ধরা লোকটি ঠান্ডা গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের বাধা না দিলে কোনও প্রবলেম হবে না।' তারপর টিভি-দেখা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিকি, চটপট কাজ শুরু কর।'

নিকি তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা ব্যাগটা খুলে দুটো জিনিস বের করে নিল। তার একটার চেহারা সফ্‌ট ড্রিঙ্কস্‌-এর ক্যানের মতো। তবে তার গায়ে কতকগুলো বোতাম আর বাতি রয়েছে। আর অন্যটা একটা লম্বাটে কালো বাক্স।

ক্যানের মতো যন্ত্রটা ঘরের এক কোণে বসিয়ে অন করে দিল নিকি। তারপর পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপল। ওটার গায়ে একটা ছোট্ট এল-ই-ডি বাতি লাল চোখের মতো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

নিকি রাজরীতার দিকে তাকিয়ে হাসলঃ 'এখন আর কোনও রেডিয়ো সিগনাল এ-ঘরে কাজ করবে না। সব সিগনাল জ্যাম করে দিলাম।'

নিকির সঙ্গী টেবিলে আঙুল ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'একদম চেঁচামেচি করবেন না, ম্যাডাম। করলে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না, ডাক্তারদেরও আর কিছু করার থাকবে না। আপনি হয়তো ভাবছেন, এ-ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় লুকোনো ভিডিয়ো ক্যামেরায় আমাদের ছবি উঠে গেছে। পরে সেই ছবি দেখে সিকিওরিটি পুলিশ আমাদের খুঁজে বের করবে—' বিচ্ছিরিভাবে হাসলঃ 'ওসব কিছুই হবে না। যদিও কাল "ক্রাইম ডট কম"-এ আপনি আমাদের এই ছবিই দেখতে পাবেন।' একটু থামল। তারপরঃ 'তার কারণ কী জানেন? কারণ, আসলে আমরা অন্যরকম দেখতে—।'

কথা বলতে-বলতেই মাথার টুপি খুলে ফেলল সে। তারপর একে-একে পরচুল, চশমা এবং নকল গোঁফ টেবিলে নামিয়ে রাখল।

ন্যাড়া মাথা লোকটিকে এখন সত্যি-সত্যিই একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

নিকি তখন ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কালো বাক্সটা হাতে নিয়ে কীসব খুটখাট করছিল। রাজরীতাদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'ভিকি, আমাকেও কি উইগ-টুইগ সব খুলতে হবে নাকি?'

ভিকি বলল, 'না, না, আর দরকার নেই। ম্যাডাম, বুঝতে পারছেন।'

কালো বাক্সটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে তালি দিয়ে হাত ঝাড়ল নিকিঃ 'ভিকি, এদিককার কাজ শেষ। এখন দরজার লকটাকে কেউ হাজার চেষ্টা করেও বাইরে থেকে আর খুলতে পারবে না। এবার এ-ফ্ল্যাটে আমাদের রাজ চলবে।' দেওয়ালের টিভি পরদার দিকে একপলক তাকিয়ে তারপরঃ 'ওখানে "ক্রাইম ডট কম" চলুক, আর এখানে আমাদের ফূর্তি ডট কম শুরু হোক। কী বলো, গুরু!'

'না, না! ফুর্তি ডট কম নয়—ফূর্তি ডট বেশি!' ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে মুচকি হাসল ভিকি। তারপর রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'ম্যাডাম, আপনার হাজব্যান্ড নিশ্চয়ই এখন অফিসে?'

'হ্-হ্যাঁ—।' কোনওরকমে ঘাড় নাড়ল রাজরীতা। ওর মুখের ভেতরে গিরগিটির চামড়ার তৈরি জিভটা জলের অভাবে ধুঁকছে।

'আমরা অবশ্য ক'দিন ধরেই আপনার এই একশো তিনতলার ফ্ল্যাটের ওপরে ওয়াচ রেখেছিলাম। এই মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এ আমরা আগেও কাজ করেছি। তবে তখন অন্যরকম মেকাপ নিয়েছিলাম। আপনাকে একদিন সিঁড়িতে দেখার পর থেকেই আমাদের দুজনেরই মাথা ঘুরে গেছে। আপনি যেমন সুইট তেমনই বিউটিফুল। বাগানে গোলাপফুলের জায়গায় আপনাকে দিব্যি সাজিয়ে রাখা যায়।'

'বিউটিফুল ডট কম!' নিকি বলল, রাজরীতার কাছে এসে দাঁড়াল।

'না, না, বিউটিফুল ডট বেশি!' বলেই হো-হো করে হেসে উঠল ভিকি।

ওদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই নিকি আর ভিকিকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

'আপনার ছেলে?'

প্রশ্নটা কে করল রাজরীতা ঠিক খেয়াল করল না। শুধু কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে ও জানাল, হ্যাঁ।

ওর বুকের ভেতরে তুমুল হুলস্থুল চলছিল। একটু আগেই কেমন নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছিল ও! আর এখন, মাত্র পনেরো-কুড়ি মিনিটেই, চরম বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে!

একটু আগে যখন ও এ-ঘরে টিভি দেখতে এসেছিল তখন ওর মনে শুধু স্বপ্ন ছিল—কোনও দুঃস্বপ্ন ছিল না। ও রিমোটের বোতাম টিপতেই ঘরের পুবদিকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ টিভির পরদা হয়ে গিয়েছিল। রঙিন ছবিতে একজন সুন্দরী মেয়ে নানান অনুষ্ঠানের খবর বলছিল, আর এককোণে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়ি রিয়েল টাইম জানিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তিনটে বাজতেই শুরু হল 'ক্রাইম ডট কম'—মানে, পশ্চিমবঙ্গের যত খুন-জখম-রাহাজানির খবর। রাজরীতা প্রতিদিন নিয়ম করে এই প্রোগ্রামটা দ্যাখে। এই প্রোগ্রামটা প্রতিদিন বিকেল তিনটেয় দেখানো হয়—যাতে ঘরে থাকা মানুষজন সতর্ক হতে পারে, নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে।

২০২০ সাল নাগাদ ভারতে সাইবারস্পেস বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্স, আরও কত কী! তারপর ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি যতই লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা আর খুন-জখম-রাহাজানি। এইভাবে দেড়শো বছর পেরোতে-না-পেরোতেই পুলিশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। 'ক্রাইম ডট কম' প্রোগ্রামে রোজই দু-চারটে পুলিশ খুনের ঘটনা কিংবা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার ঘটনা থাকে। তাই ব্যাঙের ছাতার মতো যত রাজ্যের সিকিওরিটি কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে। তাদের ব্যাবসা দিনকেদিন বেড়েই চলেছে। আধুনিক থেকে আরও আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

এখন রাস্তায় বেরোলে সবাইকে সিকিওরিটি ভ্যানে করে যাতায়াত করতে হয়। ওগুলোই হল বাসের বিকল্প। এ ছাড়া ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কার মানেই আর্মার্ড কার—সবসময় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'যুদ্ধ' করার জন্য তৈরি। সন্ধের অন্ধকার নেমে এলেই লোকজন যার-যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন শুরু হয় বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল ক্রিমিনালদের 'দিন'।

ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এই একই অবস্থা। রোজ কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক নিউজপেপার দেখলেই বোঝা যায় আইন-শৃঙ্খলা কী বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে।

'ক্রাইম ডট কম' দেখতে-দেখতে এসব কথাই ভাবছিল রাজরীতা।

শত্রুজিৎ অফিসে গেছে। ও 'ক্যালকাটা স্পেস রিসার্চ সেন্টার'-এ অ্যাভিয়েশান ইঞ্জিনিয়ার। ওদের একমাত্র ছেলে মনোরম পাশের ঘরে কম্পিউটার টার্মিনালে বসে স্কুলের ক্লাস করছে। ওদের 'লার্নিং নেটওয়ার্ক'-এ একসঙ্গে প্রায় দুশো ছেলে বাড়িতে বসেই ক্লাস করতে পারে। মাঝে-মাঝে শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য ওদের স্কুলে যেতে হয়।

ফুটবল-মাঠের মতো এই বিশাল ফ্ল্যাটে রাজরীতার সময় কাটে টিভি দেখে, কম্পিউটার গেম্‌স খেলে, অথবা সেলফোনে শত্রুজিতের সঙ্গে কথা বলে। বিকেলবেলা ও মনোরমকে নিয়ে কাছেই 'মিলেনিয়াম পার্ক'-এ বেড়াতে যায়। তার জন্য ওর আর্মার্ড কার রয়েছে। আর রয়েছে ঝুমকি—ওদের প্রাইভেট সিকিওরিটি গার্ড। গতমাসেই ওকে 'আলটিমেট সিকিওরিটি' কোম্পানি থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে শত্রুজিৎ। পরিস্থিতি ক্রমশ যেদিকে যাচ্ছে তাতে কোনওরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থাই আর যথেষ্ট নয়।

টিভিতে খবর থামিয়ে বিজ্ঞাপন চলছিল।

'আলফা ট্যুর' নামে একটা কোম্পানি মাত্র এক লক্ষ টাকায় চাঁদে দু-দিনের জন্য বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। 'এনার্জি পাউডার' রোজ এক চামচ খেলেই ক্লান্তি আর অবসাদ ভয়ে পালাবে। 'স্পিড শু' নাম মোটর লাগানো জুতো পায়ে দিলে বিনা পরিশ্রমে গাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটা যাবে। শনির উপগ্রহ টাইটানে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা...।

হঠাৎই ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠেছে। তারপর...।

'কী হয়েছে, মাম্মি?' অচেনা লোকদুটোকে একপলক দেখে নিয়ে মনোরম অবাক হয়ে মা-কে জিগ্যেস করল।

'কিচ্ছু হয়নি, খোকা। তোমার মায়ের সঙ্গে আমরা একটু জরুরি কথা বলছি। তুমি যাও—তোমার ঘরে চলে যাও।'

কথাগুলো বলতে-বলতে ভিকি মনোরমের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। কখন যে ও বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলেছে রাজরীতা খেয়াল করেনি।

আলতো করে মনোরমের পিঠে হাত দিয়ে ওকে ওর পড়ার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল ভিকি।'

'কী করছিলে তুমি?'

'কম্পিউটারে ইন্টারঅ্যাক্টিভ লার্নিং সেশানে বসেছিলাম।'

'বাঃ, চমৎকার। গুড বয়। যাও, পড়াশোনা করো গিয়ে। এক্ষুনি আমাদের কথা শেষ হয়ে যাবে।'

মনোরমকে পড়ার ঘরে ঢুকিয়ে ওর ঘরের দরজাটা লক করে দিল ভিকি।

আর সঙ্গে-সঙ্গে নিকি চটপট পরচুল, চশমা আর গোঁফ খুলে রেখে রাজরীতাকে পিছন থেকে হ্যাংলার মতো জড়িয়ে ধরল। ওর ঘাড়ে গলায় মুখ ঘষতে লাগল পাগলের মতো।

রাজরীতা ধস্তাধস্তি করছিল। ভয় আর ঘেন্না ওকে কাবু করে দিতে চাইছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াই করতে পারছিল।

ভিকি ছুটে এল ওদের কাছে। দু-পাশে দু-হাত ছড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'তুমি একা শেষ কোরো না/আমার জন্যে একটু রেখো। সোনা-দানা আর যা আছে/তন্নতন্ন খুঁজে দেখো।'

ছড়া কাটতে-কাটতেই রাজরীতাকে টপ করে চুমু খেল ভিকি। তারপর ওকে দু-হাতের দশ আঙুলে আদর করতে শুরু করল।

রাজরীতার পিছনে দাঁড়িয়ে নিকি ওর পিঠে-কোমরে যত্রতত্র মুখ ঘষছিল। ওর দু-হাত বেপরোয়াভাবে যেখানে-সেখানে হামলে বেড়াচ্ছিল।

ভিকির ছড়া কাটার উত্তরে ও কোনওরকমে জড়ানো গলায় বলল, 'আগে মাম্মি-সোনাকে তন্নতন্ন করে সার্চ করি, পরে মেটাল-সোনা খুঁজে দেখব।'

নিকি আর ভিকি জানে, এখানকার সব ফ্ল্যাটের দেওয়াল সাউন্ডপ্রুফ। সুতরাং রাজরীতা চিৎকার করলেও কোনও ক্ষতি নেই। পাশের ঘরে ওর ছেলেও সে চিৎকার শুনতে পাবে না। এর নাম প্রাইভেসি!

টিভিতে একটা গানবাজনার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাজনার বাজখাঁই জগঝম্পে কানে তালা লাগার জোগাড়। কিন্তু নিকি আর ভিকির তাতে সুবিধেই হচ্ছিল।

মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বশে এবার চিৎকার করে উঠল রাজরীতা।

ওর পরনের পোশাক এর মধ্যেই ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো। বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। চোখে শুধুই আতঙ্ক।

ওর চিৎকার কেউ শুনতে পেল বলে মনে হল না।

হঠাৎই ওর ঝুমকির কথা মনে পড়ল।

মহাশূন্যে ভেসে যেতে-যেতে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ও ঝুমকির নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠল।

তার দু-চার সেকেন্ডের মধ্যেই একটা বেডরুমের দরজা খুলে ঝুমকি এ-ঘরে উঁকি মারল।

বছর আঠারো কুড়ির মিষ্টি মেয়ে। রোগা, ফরসা। যৌবন চোখে পড়ার মতো। খোলা চুল কী এক শ্যাম্পুর কল্যাণে লম্বা টান-টান হয়ে ঝুলছে। কপালের ওপরেও চুলের পরদা নেমে এসেছে। পরনে আকাশ-নীল চুড়িদার।

আঙুল দিয়ে চোখ ঘষছিল ঝুমকি। বোধহয় ঘুমোচ্ছিল—রাজরীতার ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। সাউন্ডপ্রুফ দেওয়াল ওর শোনার ক্ষমতাকে কাবু করতে পারেনি। ওকে ভাড়া দেওয়ার সময় 'আলটিমেট সিকিওরিটি' কোম্পানি ওর এই দারুণ ক্ষমতার কথা জানিয়েছিল। সেইসঙ্গে জানিয়েছিল ওর আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতার কথা।

এই হল প্রাইভেট সিকিওরিটি গার্ডের দশা! একে ভাড়া করে নিয়ে এসে দিনের-পর-দিন টাকা গুনে গেছে শত্রুজিৎ! গত একমাস ধরে তো মেয়েটার খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া কোনও কাজ নেই! আজ যখন বিপদ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়েছে, তখনও সে দিব্যি ঘুমোচ্ছে!

এইজন্যই ঝুমকির কথা রাজরীতার প্রথমে মনে পড়েনি।

ঝুমকি হর্স নেবুলার কে-২০৪ গ্রহের 'মানুষ'। 'আলটিমেট সিকিওরিটি' অন্তত সেরকমই জানিয়েছিল। শত্রুজিৎকে ওরা বলেছিল, 'স্যার, আসলে এরা মানুষ নয়, হিউম্যানয়েড—মানে, সাইবারম্যানও বলতে পারেন। ওদের শরীরে আমাদের মতো রক্ত-মাংস আছে বটে, তবে ওদের হার্ট ধুকপুক করে ব্যাটারির জোরে। ওদের এমন সব আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যা আমাদের সিকিওরিটির ব্যাপারে মোক্ষম। তবে সত্যি-সত্যি দরকার না হলে ওরা সেইসব স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করে না। আপনি ওকে ভাড়া নিন—তা হলে সেফটি নিয়ে আপনার আর কোনও চিন্তা থাকবে না। ও আপনার বাড়িতে বাড়িরই একজন হয়ে থাকতে পারবে। কেউ ওকে সিকিওরিটি গার্ড বলে সন্দেহ করবে না।'

'আপনাদের চার্জটা বড্ড বেশি—।' শত্রুজিৎ অনুযোগ করে বলেছিল।

তখন 'আলটিমেট সিকিওরিটি'-র অফিসারটি হেসে বলেছে, 'উই আর বেস্ট ইন দ্য গেম। কে-২০৪-এর সঙ্গে শুধু আমাদের কোম্পানিরই ইমপোর্ট এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সুতরাং আপনি যা পাচ্ছেন তা হল সেরা নিরাপত্তা—আলটিমেট সিকিওরিটি।' তারপর গলায় বাঁধা টাইয়ের নটটা ঠিক করতে-করতে সামান্য ইতস্তত করে অফিসারটি বলেছে, 'শুধু একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে...।'

'কী প্রবলেম?' কৌতূহলে শত্রুজিতের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'মানে, ঝুমকির গলার স্বরটা মেটালিক...যেটাকে পরিভাষায় ধাতব কণ্ঠস্বর বলে—মানে, আদ্যিকালের সিনেমাগুলোর রোবটের গলা যেমন শোনায় আর কী!'

হাসল শত্রুজিৎঃ 'গলার স্বর মেটালিক হোক বা পেটালিক হোক, আমার কাজ নিয়ে কথা!'

শত্রুজিতের বলা কথাগুলো রাজরীতার মনে পড়ছিল। তবে ওই কোম্পানি থেকে এটা বলে দেয়নি যে, ঝুমকি ঘুমোতে ভীষণ ভালোবাসে। একটু ফাঁক পেলেই চট করে একপ্রস্ত ঘুমিয়ে নেয়।

ঝুমকিকে দেখেই নিকি আর ভিকি থমকে গেল। কিন্তু সে এক লহমার জন্য। তারপরই অশ্লীল উল্লাসে ওদের হাসি চওড়া হল।

'নিকি, আমাদের লাক দারুণ! ম্যাডামকে আর শেয়ার করতে হবে না।'

নিকি তখন রাজরীতার শরীরের উত্তর গোলার্ধে ব্যস্ত ছিল। হাসতে-হাসতে ও জবাব দিল, 'তুই ওকে নে। ম্যাডামকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

শেষ কথাটা ন্যাকা-ন্যাকা সুরে বলেই রাজরীতার দিকে দ্বিগুণ মনোযোগ দিল নিকি। আর ভিকি অ্যাথলিটের ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে গেল ঝুমকির দিকে। এবং কেউ কিছু আঁচ করে ওঠার আগেই এক হ্যাঁচকায় ঝুমকিকে কোলে তুলে নিল।

ভিকি মরশুম-খ্যাপা কুকুরের মতো ঝুমকিকে আদর করছিল। আর হিউম্যানয়েড ঝুমকি অবাক হয়ে লোকটার পাগলামো দেখছিল।

এদিকে রাজরীতা নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিকির সঙ্গে প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছিল। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে। রেপ, নাকি রেপ অ্যান্ড মার্ডার? কিন্তু ঝুমকির বেলায় কী হবে? ও তো মানুষ নয়! যদিও বাইরে থেকে ওর সবকিছুই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো।

'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি হিউম্যানয়েড। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি হিউম্যানয়েড। আমাকে...।' অবাক চোখে ভিকির দিকে তাকিয়ে থেকে একঘেয়ে ধাতব সুরে বলে চলল ঝুমকি।

ওর গলার স্বরে চমকে উঠল ভিকি। এক ঝটকায় ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিল।

নিকিও তখন নিজের জরুরি কাজ ছেড়ে হাঁ করে রোগা ফরসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমকি তখন বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমি এই ফ্ল্যাটের সিকিওরিটি গার্ড। আপনারা দয়া করে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান, নইলে আপনাদের বিপদ হবে। সে-বিপদ থেকে আর ফেরা যায় না। আশা করি আপনারা আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার অনুরোধ রাখবেন। আমার অনুরোধ...।'

রাজরীতাও অবাক হয়ে ঝুমকির কাণ্ড দেখছিল। ভয়ংকর দুজন ক্রিমিনালকে ও যেন নিশ্চিন্তে গীতা পাঠ করে শোনাচ্ছে!

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা ভিকি সামলে নিয়েছিল। ঝুমকির কথা শুনে ও ব্যঙ্গ করে বলল, 'আমরা দয়া করে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাব। তার আগে চটপট আমাদের কাজটা সেরে নিতে দাও। এসো, কাছে এসো—।'

'আমি মানুষ নই—হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড।' ঝুমকি নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ার মতো করে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

'আরে বাইরে তো কোনও ফারাক নেই—ওতেই আমার কাজ মিটে যাবে!' অধৈর্যভাবে বলল ভিকি।

'আমার ভেতরে ব্যাটারি আছে। আমি মানুষ নই—হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড। হিউম্যানয়েড...।'

‘এসো, ব্যাটারির সুইচটা একটু খুঁজে দেখি।’ ঝুমকির দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলল ভিকি, এবং ঝুমকিকে আবার জাপটে ধরল।

ওর গায়ে মুখ ঘষতে-ঘষতে ভিকি বলল, ‘কই, সবই তো দেখছি মানুষের মতো। এতেই আমার কাজ চলে যাবে। দেখি তো, তোমার ব্যাটারির সুইচটা কোথায়!’

ঝুমকি যান্ত্রিকভাবে আগের কথাগুলোই বারবার বলছিল, কিন্তু ভিকি ওর কথায় কোনওরকম আমল দিচ্ছিল না। একমনে নিজের কাজ করছিল।

নিকি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বিপদের জন্য আগাম সতর্ক হয়ে টেবিলে রাখা ব্যাগের দিকে দু-পা এগিয়েও গিয়েছিল—যাতে দরকার হলেই ব্যাগ থেকে একটা অস্ত্র বের করে নেওয়া যায়।

এখন ভিকিকে নিজের কাজে মত্ত হতে দেখে নিকির শরীরের টান-টান ভাবটা ঢিলে হল। ও আবার পা বাড়াল রাজরীতার দিকে।

কিন্তু ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

নির্লিপ্ত ঝুমকি ওর বাঁ-হাতের তালুটা বইয়ের পাতার মতো চোখের সামনে মেলে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে তালুটা গনগনে আঁচের মতো লাল হয়ে গেল। ওর হাতের পাতায় ফুটে উঠল কয়েকসারি বোতাম—অনেকটা ক্যালকুলেটরের মতো। ডানহাতের তর্জনী দিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল ঝুমকি।

ভিকি মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে ঝুমকিকে আঁতিপাঁতি করে আদর করছিল। হঠাৎই ও যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুমকি হাওয়ায় শিস তুলে চোখের পলকে পৌঁছে গেল সিগনাল জ্যামিং-এর যন্ত্রটার কাছে। ভিকির কাছ থেকে যন্ত্রটার কাছে পৌঁছনোর সময় রাজরীতা ওকে একটা ঝাপসা নীল ঝিলিকের মতো দেখতে পেল।

ঝুমকি ক্যানটা হাতে তুলে নিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল। ওর বাঁ-হাতের তালু তখনও লাল ফ্লুওরেসেন্ট বাতির মতো জ্বলছিল। ক্যানটা রেখে দিয়ে ও এবার হাতের তালুর কয়েকটা বোতাম টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ক্যানের গায়ে দপদপ করতে থাকা এল-ই-ডি বাতিটা নিভে গেল।

ঝুমকি রাজরীতার দিকে তাকিয়ে ধাতব গলায় বলল, ‘বউদি, সিগনাল জ্যামিংটা অকেজো করে দিলাম। অকেজো করে দিলাম। অকেজো করে...।’

ঝুমকির কাণ্ড দেখে নিকি হতভম্ব হয়ে আবার থেমে গিয়েছিল। এইবার হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলে রাখা ব্যাগটার ওপরে। হাঁকপাঁক করে কোনওরকমে ব্যাগ থেকে একটা খাটো বন্দুক বের করে নিল। ব্যাগটা উলটে পড়ে গেল টেবিল থেকে। নিকি বন্দুকের লেসার পয়েন্টারটা ঝুমকির দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল।

ঝুমকি এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ওর শরীরটা উলটোদিকে বাঁকিয়ে দিল। ওর ঝুলে পড়া রেশমি চুল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বন্দুকের চাপা শব্দে রাজরীতা কেঁপে উঠল। ওর সিকিওরিটি গার্ডের এইসব অদ্ভুত কাণ্ড ওকে অবশ করে দিচ্ছিল। ও ক্লান্ত শরীরে মেঝেতে বসে পড়ল। কপালের পাশটায় হঠাৎই দপদপ করে একটা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ঝুমকির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

নিকি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলি করল। ঝুমকি অপার্থিব ঢঙে অনায়াসে সেগুলো এড়িয়ে গেল। তারপর বাঁ-হাতের জ্বলন্ত তালু তুলে ধরল নিকিকে লক্ষ করে।

যেন ভীষণ গরম একটা কিছু ধরে হাতে ছ্যাঁকা লেগে গেছে এইরকম ভঙ্গি করে বন্দুকটা ছেড়ে দিল নিকি। তারপর ডানহাতের কবজি চেপে ধরে ছটফট করতে লাগল।

ঝুমকি তখন বাঁ-হাতের তর্জনী মেঝেতে ঠেকিয়ে চক দিয়ে গণ্ডি টানার মতো দাগ টানতে শুরু করল।

ভিকি ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। অবাক হয়ে ঝুমকির কাণ্ড দেখছে।

ঝুমকির তর্জনীর টান মেঝেতে একটা উজ্জ্বল নীল রঙের দাগ তৈরি করেছিল। বাজির সলতে পোড়ার মতো হিসহিস শব্দ হচ্ছিল একইসঙ্গে। যেন ওর আঙুলের ছোঁয়ায় ঘরের মেঝে পুড়ে যাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিকি আর ভিকিকে ঘিরে একটা আঁকাবাঁকা গণ্ডি সম্পূর্ণ করল ঝুমকি। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ-হাতের তালুর কয়েকটা বোতাম চটপট টিপে হাসিমুখে তাকাল রাজরীতার দিকে।

'আরও কোনও ভয় নেই, বউদি। টাইম লাইন দিয়ে ওদের ঘিরে দিয়েছি। ওরা এখন বন্দি। আপনি ইচ্ছে করলে সিকিওরিটি পুলিশকে খবর দিতে পারেন। খবর দিতে পারেন। খবর দিতে...।'

'টাইম লাইন মানে!' হতভম্ব রাজরীতা কোনওরকমে বলতে পারল।

ঝুমকি ধাতব গলায় জবাব দিল, 'থ্রি ডায়মেনশন থেকে ফোর্থ ডায়মেনশনে যাওয়ার বরডার। মানে, কেউ এটা পেরোলেই আমাদের এই জগৎ থেকে সোজা ফোর্থ ডায়মেনশনে চলে যাবে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া...।'

ভিকি চিৎকার করে উঠলঃ 'রাবিশ! অল বুলশিট! নিকি, এই ছুঁড়িটার একটা কথাও বিশ্বাস করবি না! সব ব্লাফ! মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখাচ্ছে!'

ঝুমকি ভিকির দিকে ঘুরে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ ধাতব গলায় বলল, 'আপনারা কেউ দাগের বাইরে যাবেন না। দাগের বাইরে যাবেন না। দাগের বাইরে...।'

ওর কথার প্রতিধ্বনি শেষ হওয়ার আগেই নিকি আর ভিকি দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে গেল ঝুমকির দিকে।

এবং দাগ পেরোনোমাত্রই ওরা দুজন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

রাজরীতা টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল।

‘ওরা কোথায় গেল! ওরা কোথায় গেল!’

ঝুমকি বাঁ-হাতের তালুর বোতাম টিপতে-টিপতে জবাব দিল, ‘ওরা ফোর্থ ডায়মেনশনে চলে গেছে। হয়তো মহাকাশের কোনও নির্জন জায়গায় ওরা অন্ধকারে ঠান্ডায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে...।’

এবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল ঝুমকি। একটু পরেই বলল, ‘দরজার লকটাকে ঠিক করে দিলাম। ঠিক করে দিলাম। ঠিক করে...।’

ততক্ষণে ঘরের মেঝেতে আঁকা নীল দাগটাও মিলিয়ে গেছে।

দেওয়ালের টিভির প্রোগ্রাম এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। কিন্তু এতক্ষণ রাজরীতার সে-খেয়াল ছিল না। এখন ও হঠাৎ করে যেন টিভির শব্দ শুনতে পেল, দেখতে পেল ছবি। ওর মনে পড়ল মনোরমের কথা, শত্রুজিতের কথা। শত্রুজিতকে এক্ষুনি একটা ফোন করতে হবে। কিন্তু তার আগে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত এই রোগা ফরসা মেয়েটাকে—থুড়ি, হিউম্যানয়েডটাকে।

‘ঝুমকি!’

ঝুমকি রাজরীতার দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজরীতা ছুটে গিয়ে ওকে একেবারে জাপটে ধরল। ওর গালে ভালোবাসার চুমু খেয়ে বলল, ‘তোমার জবাব নেই।’

ঝুমকি চোখ পিটপিট করল কয়েকবার। তারপর রাজরীতার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘আমি যাই। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে...।’



মায়াযৌবন

বছর বিশ-বাইশের যুবকটিকে দেখিয়ে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, ‘ওর আসল নাম প্রতাপ, কিন্তু আমি ওর নাম রেখেছি মৃত্যুঞ্জয়।’

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘কেন?’

হাসলেন বৃদ্ধ—মজা পাওয়ার হাসি। তারপর মাথার একরাশ সাদা চুলে আয়েস করে হাত চালিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। খসখসে গলায় বললেন, ‘কারণ, আমি চাই, জরাকে ও জয় করুক। ও কখনও আমার মতো বৃদ্ধ হবে না। ওর চামড়ায় কখনও ভাঁজ পড়বে না। ওর চুলে কখনও পাক ধরবে না। ওর শরীর কখনও আমার মতো অকেজো-অথর্ব হয়ে পড়বে না। আর ওর মনে কখনও বার্ধক্যের ভীমরতি বাসা বাঁধবে না।’

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম বৃদ্ধ মানুষটির দিকে। জরাগ্রস্ত এই মানুষটি জরাকে জয় করতে চান! ওঁর মাথার কোনও গোলমাল হয়নি তো!

বৃদ্ধের নাম প্রলয়নাথ আচার্য। বয়েস প্রায় সত্তর-বাহাত্তর। বয়েসের তুলনায় স্বাস্থ্য মন্দ নয়। শক্তপোক্ত লম্বা কাঠামো। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। চশমার পাওয়ার বোধহয় খুব বেশি। কারণ, কাচের দিকে তাকালে সাদা-সাদা রিঙের মতো দাগ দেখা যায়।

প্রলয়নাথের মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। একইরকম ভাঁজ হাতের পিঠেও। বোঝা যায়, জরা বেশ ভালোরকমই থাবা বসিয়েছে।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই মানুষটার বিচিত্র নাম আমাকে অবাক করেছিল। তারপর ওঁর কথাবার্তা যতই শুনছি, ততই যেন অবাক হচ্ছি।

একটা মাঝারি মাপের ঘরে আমরা দুজনে বসেছিলাম। ঘরের সবক’টা জানলাই বন্ধ। কারণ, তার ওপিঠেই হাড়কাঁপানো শীত। কিন্তু তবুও আমার শীত করছিল। ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার, ঠিকমতো কাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল না।

আমাদের সামনে কারুকাজ করা শৌখিন চায়ের টেবিল। টেবিলে চায়ের কাপ। কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে প্রলয়নাথ বললেনঃ 'জেরান্টোলজির নাম শুনেছেন? জরাবিজ্ঞান? মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে, জরাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন তৈরি হবে।'

প্রলয়নাথের ঘোলাটে চোখে আলোর ঝিলিক দেখা গেল। ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন তিনি। তারপর আমার চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা দারুণ হবে, না?'

আমি এই বৃদ্ধের মনে আঘাত দিতে চাই না। তা ছাড়া আজ কয়েকদিন হল উনি জোর করে আমাকে নিয়ে আসছেন ওঁর বাড়িতে। চা-বিস্কুট-জলখাবার খাওয়াচ্ছেন। গল্প-সল্প করছেন। এই আতিথেয়তার প্রতিদান কি ওঁর স্বপ্ন-চুরমার-করে-দেওয়া বাস্তবের রূঢ় আঘাত!

সুতরাং মিনমিন করে জানালাম, ব্যাপারটা সত্যিই দারুণ হবে।

প্রলয়নাথের 'ব্যাপার' কিন্তু তখনও পাথরের মূর্তির মতো ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পুরু গোঁফ, ফরসা রং রোদে পুড়ে তামাটে, নিষ্পাপ সরল মুখে প্রাণবন্ত দুটি চোখ যেন কথা বলছে।

প্রতাপের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের কথাবার্তা ও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু প্রলয়নাথ ডেকেছেন বলে ও বাড়ির অন্দর থেকে যান্ত্রিকভাবে এসে হাজির হয়েছে।

প্রলয়নাথ ওকে ডেকেছিলেন 'প্রতাপ' বলে। সেই সম্বোধন আর ওর হাবভাব মিলিয়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল, প্রতাপ বোধহয় স্থানীয় লোক—রাজপুত। এখন বৃদ্ধের কথায় বোঝা গেল সন্দেহটা সত্যি।

'মোহনবাবু—' খসখসে গলায় আমার নাম উচ্চারণ করলেন প্রলয়নাথ। শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপরঃ 'প্রতাপ'—মানে, প্রতাপ—আমার কাছে আছে আজ প্রায় আট বছর। সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি থেকে আজ ও জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছে। তাই আমি ঠিক করেছি, ওকেই দেব চিরযৌবন—রিওয়ার্ড হিসেবে।'

চা খেতে-খেতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। একটা পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল মাথার ভেতরে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, প্রলয়নাথের বাড়িতে আমার রোজকার সান্ধ্য চায়ের আমন্ত্রণের পাট এবার বোধহয় ফুরোল। তিনি কাকে রিওয়ার্ড দেবেন-না-দেবেন সেটা তাঁর মর্জির ব্যাপার। না, প্রতাপ অথবা মৃত্যুঞ্জয় 'ভারতরত্ন' উপাধি পেলেও আমার মতো ছাপোষা মানুষের কোনও আপত্তি নেই। আর থাকলেই বা পাত্তা দিচ্ছে কে! কিন্তু রোজ যদি চা-জলখাবারের বিনিময়ে জরাবিজ্ঞানের ছদ্মবেশে চিরযৌবন লাভের গল্পগাথা শুনতে হয় তা হলে বড় সমস্যা। কারণ, হাসি পেলেও গম্ভীর প্রাজ্ঞ প্রলয়নাথের সামনে আমি হাসতে পারব না।

চিরযৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা কি আজকের! মনে পড়ে গেল যযাতির কথা। তারপর সাজগোজ, রূপচর্চা, শরীরের যত্ন, মাথার চুল ধরে রাখা, সবকিছুরই আড়ালে রয়েছে চিরকাল যৌবন ধরে রাখার সাধ। মানছি, আমার তেত্রিশ বছর বয়েসটাকে ধরে রাখতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু সাধ আর সাধ্য কি এক ব্যাপার!

এ ক'দিন প্রলয়নাথ কখনও জরাবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তোলেননি। শুধু আমার সম্পর্কে কৌতূহল দেখিয়ে নানান খোঁজখবর করেছেন। বাড়িতে কে-কে আছেন? বিয়ে করেছি কি না? কলকাতা ছেড়ে রাজস্থানের এই শিল্পনগরীতে চাকরি নিয়ে চলে এসেছি কেন? সে কি বাবা-মায়ের ওপরে রাগ করে?

সত্যি কথা বলতে কি, এই বৃদ্ধ মিশুকে মানুষটি ওঁর আন্তরিক ব্যবহারে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছেন। কিন্তু আজ এই জরাবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ আলটপকা শুরু করে তিনি আমাকে বেশ একটা ধাক্কাই দিয়েছেন।

অথচ মানুষটাকে দেখে আমার কখনও পাগল বলে মনে হয়নি।

তা হলে কি তিনি চিরযৌবন পাইয়ে দেওয়ার ফাঁদ পেতে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে চান আমার কাছ থেকে?

'মোহনবাবু, প্রতাপের মধ্যে আমি ইতিমধ্যেই এমন কিছু-কিছু লক্ষণ দেখতে পেয়েছি যা দেখে বলা যায়, আমার ড্রাগগুলো ঠিকমতো কাজ করছে। ওর বয়েস বাড়ার গতি গত দু-বছরে বেশ কমে গেছে।'

আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। হঠাৎ উথলে ওঠা হাসির বেগটা সামাল দিতে গিয়ে বিষম খেলাম। কাশির দমকে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল চায়ের কাপ। ঘরের মেঝেতে বিছানো ফুল-পাতা-হরিণের নকশা কাটা জয়পুর কার্পেট তরলটুকু শুষে নিল, আর কারুকাজ করা কাচের কাপটির প্রাণ বাঁচাল।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। চেয়ার থেকে উঠে কাপটা তুলে নিতে ঝুঁকে পড়েছি, প্রলয়নাথ চাপা গলায় বাধা দিলেন আমাকে, 'থাক, থাক, ছেড়ে দিন।' তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে বললেন, 'প্রতাপ, সাফি মারো—।'

প্রতাপ যন্ত্রের মতো এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। নীচু হয়ে নীরবে কাজ সারতে লাগল।

'আপনাকে আর-এক কাপ চা দিই?'

প্রলয়নাথের প্রস্তাব আমি বিনীতভাবে ফিরিয়ে দিলাম। দুঃখপ্রকাশ করলাম দুর্ঘটনার জন্যে। তারপর বললাম, 'আজ চলি। অনেকটা পথ যেতে হবে...।'

'যাবেন?' আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে খসখসে গলায় জিগ্যেস করলেন তিনি।

আমি কোনও উত্তর না দেওয়ায় কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, ‘আচ্ছা, যান। কাল সন্ধেবেলা আসছেন তো? আপনাকে আমার ল্যাবরেটরি দেখাব। জেরান্টোলজি ভারী ইনটারেস্টিং সাবজেক্ট...।’

আমি বললাম, ‘দেখি—।’

প্রলয়নাথ আমার কাছে এগিয়ে এলেন। ওঁর জরাজীর্ণ হাতে আমার হাত চেপে ধরলেনঃ ‘মোহনবাবু, কাল আপনাকে আসতেই হবে। বিদেশ বিভুঁইয়ে আপনার মতো একজন আপনজনকে আমি একদিনের জন্যেও খোয়াতে রাজি নই। আপনি এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন একমাস। আর আমি এই কোটা শহরে আছি বাইশ বছর। বাংলা কথা প্রায় ভুলতে বসার জোগাড়। বাড়ির বউ-মেয়ের একঘেয়ে কথাবার্তা আর কাঁহাতক ভালো লাগে? কাল আসবেন কিন্তু। প্লিজ...।’

বৃদ্ধের চোখে নীরব মিনতি ছিল। কী যে হল আমার, ঘাড় নেড়ে কথা দিলাম ওঁকেঃ ‘আসব।’ কিন্তু আমি মনে-মনে জানতাম, ওঁর বাড়িতে না এসে আমার উপায় নেই। এমন একজনকে আমি এ-বাড়িতে দেখেছি, যার টানে আমাকে আসতেই হবে।

প্রলয়নাথ আমাকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বসবার ঘরে প্রতাপ, ওরফে ‘মৃত্যুঞ্জয়’, তখন কার্পেট পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত।

রাস্তায় বেরোতেই শীত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ে। মাফলারটা ভালো করে গলায় আর কানে মুড়ি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম প্ল্যান্টের দিকে।

রাজস্থানের কোটা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে চাকরি নিয়ে আমি এসেছি আজ প্রায় একমাস। চাকরি না পালটালে বাকি জীবনটা বোধহয় এখানেই কাটাতে হবে। কলকাতায় পিছুটান বলতে বাবা-মা, ছোট ভাই, আর ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি। হয়তো পুরোনো কথা ভুলতে চাই বলেই একরকম জেদ করে এই চাকরি নিয়ে আমি কলকাতা ছেড়েছি। ছোটভাই ভালোই চাকরি করে। সুতরাং সচ্ছলভাবে মা-বাবার দিন কেটে যাবে।

আমি এই নতুন জায়গায় এসে নতুন মানুষজন আর প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা করছি—যাতে কলকাতার কথা বেশি মনে না পড়ে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে কই! দুঃখ ভুলতে এত কষ্ট হয় কেন কে জানে!

থাকার জন্যে আমাকে আপাতত একটা ছোট কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। দিনের বেলা ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়া সারি, আর রাতে ডিমসেদ্ধ, আলুভাজা, আর দু-মুঠো ভাত ফুটিয়ে ম্যানেজ করি। রান্নার অভ্যেস কোনওকালেই ছিল না। সুতরাং সে যে কী মর্মান্তিক অগ্নিপরীক্ষা, তা শুধু আমিই জানি। আমার হাতে-পায়ে নানান ফোস্কার দাগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এক-একদিন বিরক্ত হয়ে মুড়ি,

পাঁউরুটি, কিংবা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়ি। সঙ্গে ঢকঢক করে দু-গ্লাস জল। তবে কষ্ট যতই হোক, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, কলকাতায় সহজে ফিরছি না।

ভোরবেলা আমি চম্বল নদীর তীরে বেড়াতে বেরোই।

সময়টা জানুয়ারির শেষ, কিন্তু তাই বলে শীতের ধার কমেনি। তা ছাড়া, আমি বরাবরই বেশ শীতকাতুরে। তাই ডবল সোয়েটার, মাফলার, মাঙ্কি ক্যাপ ইত্যাদি পরে ভোরবেলা চম্বল নদীর তীরে পায়ে হেঁটে শীতের সঙ্গে কুস্তি করি। শরীরের প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা—শুধু চোখ দুটি খোলা। ঠিক যেন দস্যু মোহন।

এইরকম সাজে রোজ পায়চারি করি, আর রংবেরঙের পাখি দেখি। ওদের পালকগুলো যেন ঈশ্বর এঁকে দিয়েছেন রামধনু-রং তুলি দিয়ে। নদীর জল, আকাশ, আর পাখি আমাকে চুম্বকের মতো টানতে থাকে। বুঝতে পারি, প্রকৃতির টান এড়ানো কী কঠিন।

এইরকম এক সকালে, তখন সবে সূর্য উঠেছে, সোনালি রং ঝিলিক মারছে চম্বলের জলে—পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'বাঙালি নাকি?'

বেশ অবাক হলাম। শুধুমাত্র চোখ দেখে বাঙালি বলে চিনতে পারে এমন প্রতিভাবান মানুষটি কে!

চোখ ফিরিয়েই দেখি, সুঠাম চেহারার এক বৃদ্ধ। পরে জেনেছি, তাঁর নাম প্রলয়নাথ আচার্য। বিশ বছরের ওপর কোটায় আছেন। কী একটা কসমেটিক্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন—রিটায়ার করেছেন প্রায় দশ-এগারো বছর।

আমার অবাক দৃষ্টির উত্তরে সামান্য হেসে লোলচর্ম প্রলয়নাথ খসখসে গলায় বলেছিলেন, 'আপনার মাফলারের আঁচলে নামের প্রথম অক্ষর "ম" সুতো দিয়ে সেলাই করা আছে। তা থেকেই আন্দাজে ঢিল ছুড়েছি।'

আদ্যক্ষর খোদাই করাটা মায়ের কাণ্ড—যাতে আমার আর ভাইয়ের জিনিস ওলটপালট না হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। একটা নগণ্য 'ম'কারান্ত ব্যাপার দেখতে পেয়েছেন!

এইভাবে প্রথম আলাপের পর প্রলয়নাথ দেখা হলেই গল্প জুড়ে দিতেন আমার সঙ্গে। আর তার সঙ্গে নানান কৌতূহল মেটাতে চাওয়া প্রশ্ন। এ দেশে বহুবছর থাকার জন্যে ভদ্রলোকের বাংলা কথায় এদিককার রাজস্থানি টান জুড়ে গেছে।

ওঁর কাছেই শুনেছি, সমুদ্রতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার মিটার উঁচু এই কোটা শহরটা এক বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'কোট'। 'কোট' থেকেই নাকি এসেছে শহরের নাম—কোটা।

এক-দু-দিন আলাপের পরই বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন। চা খেতে-খেতে প্রলয়নাথ বলেন, 'জানেন তো, মোহনবাবু, দুজন বাঙালি একজায়গায় জুটলেই চায়ের পেয়ালায় রাজা-উজির মারতে থাকে। সুতরাং আমার বাড়িতে আপনার রোজ চায়ের নেমন্তন্ন রইল। প্রতিদিন সন্ধেবেলা বসে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক রাজা-উজির মারা যাবে'খন।'

প্রলয়নাথের বাড়িটা আমার প্ল্যান্ট থেকে হাঁটাপথে মিনিটপনেরো। সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। সামনে-পেছনে খানিকটা করে বাগান। পিচের রাস্তা থেকে রুক্ষ পাথুরে রাস্তা খানিকটা ভেতরদিকে চলে গেছে, একেবারে বাড়ির কাছ পর্যন্ত। বাড়ির পাশে একটা বড়সড়ো খাদ। বোধহয় কেউ একসময় মাটি খুঁড়ে পুকুর তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।

প্রথমদিন বাড়িতে গিয়ে আলাপ হয়েছে প্রলয়নাথের বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে।

'মোহনবাবু, আমার বউ অনুরাধা—' বসবার ঘরে আমাকে বসিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, 'গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমার সহধর্মিনী—এটাই হল লিটারাল ট্রুথ। আর অনুরাধা, ইনি মোহন দাশর্শমা। পাওয়ার প্ল্যান্টে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছেন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কী, তাই তো?'

শেষ প্রশ্নটা আমাকে লক্ষ করে।

আমি নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালাম যে, উনি ঠিকই বলেছেন।

অনুরাধাকে দেখছিলাম আমি। ছোটখাটো চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ঠোঁটের ওপরে, ডানদিকে, বেশ বড় একটা কালো রঙের আঁচিল। বয়েসকালে ওটাই বোধহয় বিউটি স্পট ছিল, এখন শুধুই স্পট।

অনুরাধার গাল ভাঙা, মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ। একটা চোখে সাদাটে ভাব—বোধহয় ছানি পড়েছে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর আর কপালে বড় সিঁদুরের টিপ।

অনুরাধার গায়ে কালচে সবুজ রঙের একটা কম্বলজাতীয় শাল জড়ানো থাকায় ওঁর পরনের শাড়ির নীচটুকু দেখা যাচ্ছিল। যোধপুরী বাঁধনি শাড়ি। তাতে তেরছাভাবে লাল-হলুদ-নীল রঙের খেলা। ওঁর বয়েসের সঙ্গে শাড়ির উজ্জ্বল রং আমার বেশ বেমানান লাগছিল। তবে এমন হতে পারে যে, ওঁর স্বামী হয়তো এরকম উজ্জ্বল রং-ই পছন্দ করেন।

শুধু মুখটুকু ছাড়া অনুরাধার শরীরের আর কোনও অংশ দেখা যাচ্ছিল না। শাড়ির ওপরে শালটা এতই বড় এবং পুরু যে, ওঁকে ফোলানো-ফাঁপানো কোলবালিশ বলে মনে হচ্ছিল। এছাড়া পায়ে মোজা আর অর্ধেক পা-ঢাকা রবারের চটি।

ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারী মিষ্টি। চোখ বুজে কথা শুনলে বয়েস ঠাহর করা মুশকিল—অনেকটা লতা মঙ্গেশকরের মতো।

তিনি স্নেহমাখানো গলায় আমাকে বললেন, 'আপনি রোজ হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান?'

ওঁর কথায় একেবারে হইহই করে উঠলেন প্রলয়নাথ, 'আপনি অনায়াসে আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন।'

আমি লজ্জা পেয়ে আপত্তি জানালাম।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল, রোজ সন্ধেবেলা চা-জলখাবার খেতে ওঁদের বাড়িতে আমি আসব। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছাড়লেন প্রলয়নাথ।

অনুরাধা চলে যাওয়ার পর আমরা চা খেতে-খেতে গল্প করছিলাম।

মাঝারি মাপের ঘর ছিমছামভাবে সাজানো। দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের শয্যাকক্ষ। মেঝেতে ফুলপাতার নকশা করা কার্পেট। ঘরের একপাশে দুটো খাটো টুল। কাঠের ফ্রেমে চামড়া দিয়ে বাঁধানো। চামড়ার ওপরে ফুল আর জ্যামিতির নকশা। ঘরের একদিকের দেওয়ালে রাধা-কৃষ্ণের ফটো বাঁধানো। সেখানে দুটো ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপের উগ্র গন্ধ ছেয়ে গেছে ঘরের বাতাবরণে।

প্রলয়নাথের অনুমতি নিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

তিনি বললেন, 'আমি একসময় খুব সিগারেট খেতাম। বুকে কষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া সিগারেট খেলে বয়েসটা তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে চায়।

'আপনি পারলে এই বদ নেশাটা ছেড়ে দেবেন।'

কথায়-কথায় প্রলয়নাথ বলেছিলেন, বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে ওঁর আগ্রহ আছে। কিন্তু জেরান্টোলজির কথা স্পষ্ট করে বলেননি।

মনে পড়ছে, প্রতাপ সম্পর্কে তিনি সেদিন মাত্র একটা-দুটো কথা বলেছিলেন।

প্রতাপ চওহান বুন্দির ছেলে। আট বছর আগে দশেরার মেলায় কীভাবে কোটায় চলে আসে। তারপর আত্মীয়স্বজন কাউকে আর খুঁজে পায়নি। সোজা কথায়, একা হয়ে যায়। তখন প্রলয়নাথ ওকে আশ্রয় দেন। সেই থেকে এখানেই বড় হয়েছে। ওঁদের কাছে থেকে-থেকে মোটামুটি বাংলা শিখে গেছে।

প্রতাপ তখন বাড়িতে ছিল না। কীসব জিনিসপত্র কিনতে বাজারে গেছে।

না, তখনও 'মৃত্যুঞ্জয়' বা জেরান্টোলজির প্রসঙ্গ ওঠেনি। উঠলে সেদিন থেকেই আমি সতর্ক হতাম।

প্রলয়নাথ চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ মুছে নিলেন। তারপর চশমা চোখে দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'মোহনবাবু, আপনি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন?'

আমি সিগারেটে টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়লাম। সর্বনাশ! এই বুঝি শুরু হল কোটার ভূতের গল্প!

মনে যা-ই ভাবি, মুখে কৌতূহল ফুটিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ভূত-প্রেতের ব্যাপার?'

তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'না, ঠিক সেরকম নয়। এমন ব্যাপার, যেটা সহজে বিশ্বাস হওয়ার নয়—অথচ সত্যি।'

আমার মতো অতিথির পক্ষে বেশি তর্ক-বিতর্কে যাওয়াটা অশোভন। তাই মিনমিন করে বলেছি, 'সত্যি হলে বিশ্বাস না করে উপায় কী!'

'হুঁ—' মাথা নীচু করে ঘাড় নেড়েছিলেন প্রলয়নাথ। তবে ও-বিষয়ে আর কথা বাড়াননি।

পরে টুকিটাকি কাজে অনুরাধা ঘরে এসেছেন। যেমন চুপচাপ এসেছেন তেমনই চুপচাপ চলে গেছেন। কিন্তু প্রলয়নাথের মেয়েকে একটিবারের জন্যেও দেখিনি।

জানি, এই কৌতূহল হয়তো বয়েসের দোষ, কিন্তু স্বীকার করছি, মেয়েটিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল।

তাই উঠে আসার আগে বৃদ্ধ মানুষটিকে সে-কথা জিগ্যেস করলাম।

সামান্য চমকে উঠে তিনি বলে উঠলেন, 'কে? সুপ্রিয়া? ও হয়তো ভেতরের ঘরে পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছে। ভীষণ একাচোরা—কারও সামনে বেরোতে চায় না।'

একটু অবাক হলেও আর কোনও কথা বলিনি। কিন্তু কৌতূহলটা আমার থেকেই গিয়েছিল।

আমি চলে আসার আগে প্রলয়নাথ আরও একবার প্রতাপের কথা তুললেন। এলোমেলোভাবে যা বললেন, তার স্পষ্ট কোনও অর্থ আমার মাথায় ঢুকল না।

'ওর কথা শুনলে সবাই একেবারে চমকে যাবে...ভীষণ বাধ্য ছেলে...আমাকে খুব মানে...ওকে নিয়ে আমার অনেক আশা...।'

বৃদ্ধের প্রলাপ ভেবে সেদিনকার কথাগুলো আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেদিন প্রলয়নাথ ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন। কী সেই অলৌকিক ব্যাপার। আর, প্রতাপের কথা শুনলে সবাই কেন চমকে যাবে।

অর্থাৎ, জরাবিজ্ঞান। কসমেটিক্স কোম্পানিতে বিজ্ঞানীর চাকরি করা প্রলয়নাথ হয়তো নিজের বার্ধক্যকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই নিজের পছন্দসই গবেষণায় নেমে পড়েছেন। আর হাতের কাছে ভোলাভালা রাজপুত ছেলেটিকে পেয়ে তার ওপরেই যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলাচ্ছেন।

কিন্তু প্রতাপের পর দ্বিতীয় 'মৃত্যুঞ্জয়' হিসেবে তিনি কি আমাকে টারগেট করেছেন না কি! সেইজন্যেই কি খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, আমার বাড়িতে আর কে-কে আছে, কলকাতায় সেরকম কোনও পিছুটান আছে কি না! তারপর রয়েসয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে ভাঙবেন।

কোয়ার্টারে ফেরার পর একটা অদ্ভুত ভয় আমাকে জড়িয়ে ধরল।

জরাকে আমি ভয় পাই ঠিকই। সব মানুষই জরাকে ভয় পায়। কিন্তু জরা কি মোটরগাড়ি না কি যে, যখন খুশি প্রলয়নাথ তার ব্রেক কষে গতি কমিয়ে দেবেন! প্রতাপের বেলায় উনি নাকি সেটা করতে পেরেছেন। কোনওদিন হয়তো বলে বসবেন, তিনি ব্রেক কষে গাড়ি একেবারে থামিয়ে দিয়েছেন। প্রতাপের বয়েস আর বাড়বে না।

রাতটা আমার নানান দুশ্চিন্তায় কাটল। কিন্তু ভয় যেমন আমাকে প্রলয়নাথের বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিল, তেমনই ওঁর মেয়ে সুপ্রিয়া আমাকে পাগলের মতো টানছিল।

কারণ, সুপ্রিয়াকে আমি একদিন দেখতে পেয়েছি। তখন ও বাথরুমে গরমজলে গা ধুচ্ছিল। শীতের সময় সন্ধেবেলা এভাবে কেউ গা ধোয় বলে শুনিনি। কিন্তু আমার তখন শোনা নয়, দেখার সময়।

একতলার বাথরুমের ছোট জানলাটা খোলা ছিল। ভেতরে অন্তত চল্লিশ ওয়াটের আলো জ্বলছিল। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। প্রলয়নাথ তখন সরস্বতী ভাণ্ডার মিউজিয়াম থেকে ওঁর কপি করে আনা একটি দুষ্প্রাপ্য পুথি আমাকে দেখাবেন বলে ভেতরের ঘরে গেছেন। আর অনুরাধা বোধহয় আমাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে গেছেন। প্রতাপও ধারে-কাছে ছিল না।

আমি সুপ্রিয়ার স্নান দেখছিলাম। আর ওর ঢল নামা শরীর দেখছিলাম। জানলা দিয়ে ওর পিঠ, পিঠের নীচ, আর বুকের পাশটা দেখা যাচ্ছিল। ভেজা শাড়িটা ঠিকমতো গায়ে জড়ানো ছিল না। তাই আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিলাম।

এক মিনিট, দু-মিনিট।

তারপরই বাথরুমের আলো নিভে গিয়েছিল।

সুতরাং সারারাত বহু দোনামনা করেও সুপ্রিয়া জিতে গেল। তাই পরদিন সন্ধেবেলা আমি প্রলয়নাথের বাড়িতে গেলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, ওঁর কোনওরকম উদ্ভট চিন্তাই আমাকে আপাতত ওঁর বাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

পরদিন সন্ধেবেলা প্রলয়নাথের বাড়িতে যখন গেলাম, তখন বৃদ্ধ মানুষটি আমার জন্যে যেন তৈরিই ছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আপনার আশায় বসে আছি। আসুন, বসুন, আগে চা-টা একটু খেয়ে নিন, তারপর ল্যাবে নিয়ে যাব।'

আমি রোজকার মতোই বসলাম।

রাধা-কৃষ্ণের ফটোর কাছে ধূপ জ্বলছিল। কিন্তু ধূপের গন্ধ ছাড়াও একটা হালকা পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছিল। অনুরাধা নিশ্চয়ই সত্তর ছুঁই-ছুঁই বয়েসে পারফিউম ব্যবহার করবেন না। তা হলে আর বাকি থাকে সুপ্রিয়া। ও কি একটু আগেই এসেছিল এই ঘরে?

প্রলয়নাথ জরাবিজ্ঞান নিয়ে কিছু-কিছু কথা বলছিলেন, কিন্তু সেগুলো আমার কানে ঠিকমতো ঢুকছিল না। আমার মাথার ভেতরে তখন বাথরুমের ছোট্ট জানলাটা ভাসছিল। একজন ভরাযৌবন তরুণী সেখানে স্নান করছে।

বারবার ঘড়ি দেখছিলাম আমি। এখন ঘড়িতে প্রায় ছ'টা পঁচিশ। আগের দিন ব্যাপারটা আমি লক্ষ করেছিলাম সাড়ে ছ'টা-পৌনে সাতটা নাগাদ। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মনটা উসখুস করতে লাগল।

প্রলয়নাথ তখন কপি করে আনা পুথিটার কথা বলছিলেন।

'বুঝলেন, মোহনবাবু, পুথিটার নাম "স্থিরযৌবন"—প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে লেখা। ওটা পড়ে আমার গবেষণায় অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমাদের যখন বয়েস বাড়ে, তখন শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনটাও বুড়ো হতে থাকে। শরীরের বাইরেটায় যেমন ধীরে-ধীরে বয়েসের ছাপ পড়ে, তেমনই ভেতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বুড়ো হয়। আমাদের চামড়ার বাইরেটা ক্রমশ পুরু হতে থাকে, অথচ ডার্মিস, মানে, অন্তঃত্বক, ক্রমাগত কুঁচকে যেতে থাকে। তা ছাড়া, ডার্মিসের কলাজেন কনটেন্ট কমতে থাকে—ফলে চামড়ার জোরও কমে। এই দেখুন না, যেমনটা আমার হয়েছে—' বলে নিজের শিরা ওঠা লোলচর্ম হাতের পিঠ দেখালেন প্রলয়নাথ। একটু দম নিয়ে তারপর বললেন, 'শুধু চামড়া কেন, হাড়গুলো ক্ষয় ধরে কমজোরি হতে থাকে। তলপেটের সবচেয়ে বড় যে-ধমনি, অ্যাওর্টা, তার ইলাস্টিসিটি কমতে থাকে। রিঅ্যাকশন টাইম বাড়তে থাকে, রিফ্লেক্স ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। চোখের মণির ছোট-বড় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, ব্রেনের ওজনও যায় কমে। আর নার্ভাস সিস্টেমও ধীরে-ধীরে তার তেজ হারিয়ে ফেলে। অল্পবয়েসে...।'

প্রতাপ ঘরে ঢুকল। হাতে রোজকার মতো চা-জলখাবার। আমাদের সামনের টেবিলে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে প্রতাপ চলে গেল। যাওয়ার আগে অদ্ভুত চোখে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সে-দৃষ্টিতে সহমর্মিতার আভাস পেলাম বলে মনে হল। কিন্তু তার কারণ খুঁজে পাইনি—অন্তত তখনও।

প্রতাপ এসে পড়ায় কথা থামিয়ে দিয়েছিলেন প্রলয়নাথ। হয়তো চান না, প্রতাপ আমাদের সব আলোচনা শুনে ফেলুক। ও চলে যেতেই তিনি আগের কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন, 'অল্পবয়েসে আমাদের ব্রেইনের নিউরোন, মানে, স্নায়ুকোশ, নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন কোশ জন্মায়। কিন্তু বয়েস বাড়তে-বাড়তে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ হয়ে গেলে নতুন স্নায়ুকোশ জন্মানোর

ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এতে বুদ্ধি সত্যি-সত্যি কমে যায় কি না তা নিয়ে বির্তক আছে, তবে স্মৃতিশক্তি বেশ কমে আসে—।'

কথা বলতে-বলতে প্রলয়নাথ চায়ের কাপে বড়-বড় চুমুক দিচ্ছিলেন। চা শেষ হয়ে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেনঃ 'আপনি চা-টা শেষ করুন। আমি গিয়ে ল্যাবটা একটু গুছিয়ে আসি। আপনি ইচ্ছে করলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারেন।'

কথা শেষ করেই প্রলয়নাথ চলে গেলেন। কিন্তু শেষ কথাটা তিনি কেন বললেন কে জানে! আমিও মনে-মনে বোধহয় সেটা চাইছিলাম। তিনি চলে যেতেই তাকালাম ঘড়ির দিকেঃ পৌনে সাতটা বাজে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এলাম।

এই বারান্দা থেকে রাতের আকাশ দেখা যায়। একইসঙ্গে দেখা যায় পাকা রাস্তার আলো, আর দূরের দোকানপাট।

বারন্দায় ঠান্ডাটা বেশ জমাট, কিন্তু সেইজন্যেই বোধহয় চায়ের আমেজটা আরও ভালো লাগছিল।

বারান্দায় এসে প্রথমেই আমার চোখ গিয়েছিল একতলার কলঘরের দিকে। কিন্তু দেখলাম, চৌকো ছোট জানলাটা অন্ধকার।

হতাশ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাব, অমনই দেখি আলো জ্বলে উঠেছে সেখানে। একটি সুঠাম শরীর জানলার ফ্রেম বরাবর এসে পোশাক ছাড়তে শুরু করল।

ক্রমশ কোমল ত্বক প্রকাশিত হচ্ছিল, আর আমার কান গরম হয়ে উঠছিল। চায়ের কাপ হাতে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম আমি। আকাশ থেকে হয়তো হিম পড়ছিল, কিন্তু সেদিকে কোনও হুঁশ ছিল না আমার।

একটা ফরসা শরীর বেয়ে জলের রেখা কীভাবে উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা পথে নেমে আসে সেটাই আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, কাজটা অন্যায়, কিন্তু আমার মনের লোভী অংশটা আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে দিচ্ছিল না। সুপ্রিয়া, ওঃ সুপ্রিয়া!

ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎই কারও পায়ের শব্দে চমকে উঠে চোখ ফেরালাম আমি।

প্রলয়নাথ।

ওঁর দু-চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

আমার দিকে কয়েক লহমা স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'মোহনবাবু, চলুন...আমার ল্যাবরেটরি দেখবেন চলুন। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে।'

আমি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমি কি ধরা পড়ে গেছি প্রলয়নাথের কাছে? এই বয়েসে ‘উঁকি মারা টম’ হিসেবে ধরা পড়লে কে না লজ্জা পাবে! কিন্তু কী করব! ওই চৌকো জানলাটা এখন যেন আমার জীবন-মরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনও কথা না বলে প্রলয়নাথকে অনুসরণ করলাম আমি।

ওঁর ল্যাবরেটরিটা দোতলার একেবারে পেছনদিকটায়। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওঠা-নামা করে সরু একফালি অলিপথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ওর ল্যাবে। যাওয়ার পথে রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ পেলাম। অনুরাধা হয়তো রান্না করছেন।

প্রলয়নাথের ল্যাবরেটরিকে ঠিক প্রথাগত অর্থে ল্যাবরেটরি বলা যায় না। একটা মাঝারি মাপের ঘরে নানান সাজসরঞ্জাম জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়ানো। তবে সবমিলিয়ে তার মধ্যে একটা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান গন্ধ আছে।

ঘরের সবক’টা আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ল্যাবরেটরির দৈন্য আরও বেশি প্রকট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রলয়নাথের চোখে তৃপ্ত আর গর্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। আর একইসঙ্গে ভাবছিলাম, বৃদ্ধের মস্তিষ্কের বার্ধক্যের তীব্রতা বোধহয় ওঁর শরীরের বার্ধক্যের তুলনায় বেশি।

একপলক নজর বুলিয়ে ঘরে যা-যা আমার চোখে পড়ল সেগুলো হলঃ বিশাল কাচের বাক্সে ঢাকা কয়েকটা চারা গাছ—তার মধ্যে বনসাইও আছে, বেশ কয়েকটা শিশি-বোতল আর টেস্টটিউব, একটা কেরোসিন স্টোভ, প্রচুর বইপত্র আর কাগজ কোণের একটা টেবিলে ডাঁই করা, তিনটে ছোট-ছোট খাঁচায় সাদা ইঁদুর আর গিনিপিগ। হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে ওঠায় প্রাণীগুলো কিচকিচ করে ডাকছে।

‘আসুন, এদিকে আসুন—’ বলে প্রলয়নাথ আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারাগাছগুলোর কাছে।

লক্ষ করলাম, কাচের বাক্সের দিকে তাক করা আছে দুটো হাই পাওয়ারের স্পটলাইট।

প্রলয়নাথ বললেন, ‘মোহনবাবু, আপনি তো জানেন, গাছও বড় হয়—বুড়ো হয়। তাই প্রথমদিকটায় আমি গাছের এজিং প্রসেস স্টাডি করেছি। এই কাচের বাক্সটা হল আমার মিনিয়েচার গ্রিনহাউস। আর এই স্পটলাইট দুটো হল সূর্যের আলোর বিকল্প। দিনে আট-দশ ঘণ্টা করে এগুলো আমি জ্বেলে রাখি।’

‘ওদের ব্যাপারটা স্টাডি করে কী দেখলেন?’ আমার মধ্যে কৌতূহল ধীরে-ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

‘দেখলাম কী জানেন?’ সামান্য হাসলেন তিনি। মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ঠিকই বলেছেন। গাছের অনেক কিছুই মানুষের মতো। দেখলাম, বয়েস বাড়ার

সঙ্গে-সঙ্গে ওদের ্রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যায়। মানে, ধরুন, আপনাকে কেউ পেছন থেকে টাচ করে ডাকল। সেই স্পর্শ পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই সেদিকে ঘুরে তাকাবেন। এটাই হচ্ছে আপনার ্রিঅ্যাকশন। বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে স্পর্শের

অনুভূতি পেয়ে ঘুরে তাকাতে আমাদের সময় বেশি লাগে। রিফ্লেক্সের ব্যাপারটাও একইরকম। বয়েস বেড়ে গেলে ক্রিকেটার, ফুটবলার বা টেনিস খেলোয়াড়—সবারই রিফ্লেক্স ঢিমে হয়ে যায়—।'

এমনসময় দরজার কাছ থেকে কেউ ডাকল, 'সাব—।'

ফিরে তাকিয়ে দেখি প্রতাপ। হাতে একটা বড় প্লেট, তাতে অনেকগুলো পেঁয়াজি অথবা ফুলকপির বড়া।

'অনুরাধার সবদিকে নজর থাকে। জানে যে ল্যাব দেখতে বেশ সময় লাগবে, তাই খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে।' প্রতাপের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে একটা টেবিলে রাখলেন প্রলয়নাথ। প্রতাপ চলে যেতেই আমাকে বললেন, 'নিন, মোহনবাবু, খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে—।'

সত্যিই খিদে পাচ্ছিল। তাই সৌজন্যের লজ্জা না দেখিয়ে একটা বড়া তুলে নিলাম। যা ভেবেছিলাম তাই—ফুলকপির বড়া। তবে তার মধ্যে নানান মশলা দিয়ে অনুরাধা তাকে আরও সুস্বাদু করে তুলেছেন।

প্রলয়নাথ একটা বড়া মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'এই বয়েসে এসব বেশি সহ্য হয় না, আবার লোভও ছাড়তে পারি না। অনুরাধা সবসময় আমার খেয়াল রাখে। ও না থাকলে যে আমি কী করতাম...' একটু থেমে উদাস গলায় প্রলয়নাথ বললেন, 'ওর ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। ওকে সুখী করার জন্যে আমি চেষ্টার কোনও শেষ রাখি না।'

আমি ওঁকে প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইলাম। বললাম, 'আপনি তখন রিফ্লেক্সের কথা বলছিলেন।'

'ওহ্, হ্যাঁ—' সামান্য চমকে যেন চেতনা ফিরে পেলেন বৃদ্ধঃ 'রিফ্লেক্সের মতোই টেম্পারেচার সেন্স করার ব্যাপারেও ক্ষমতা কমে আসে। যেমন, খুব অল্প ঠান্ডা, বা খুব অল্প গরম কোনও জিনিসের উষ্ণতা ঠাহর করতে অসুবিধে হয়। তারপর ধরুন, যন্ত্রণা। বয়েস বেড়ে গেলে যন্ত্রণা টের পেতে গাছের দেরি হয়। মানুষেরও তাই। এরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে। তা সেগুলো আমি গাছের ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি। তারপর নানারকমভাবে সেগুলোকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেছি—।'

'অ্যারেস্ট মানে?' আর-একটা বড়া মুখে দিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

হাসলেন প্রলয়নাথ, বললেন, ‘বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভূতিগুলোর এইসব পরিবর্তনকে আমি থামাতে চেষ্টা করেছি। বহু বছরের পরিশ্রমের পর আমি সাকসেসফুল হয়েছি, মোহনবাবু। তখন আমি গাছ থেকে চলে এসেছি প্রাণীতে—ইঁদুর আর গিনিপিগে।’

গ্রিনহাউসের কাছ থেকে ইঁদুর-গিনিপিগের খাঁচার দিকে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রলয়নাথ। বললেন, ‘সময়ের হিসেবে এই তিনটে ইঁদুর একই বয়েসের, কিন্তু ওদের মধ্যে বয়েস বেড়ে ওঠার লক্ষণগুলো তিনরকমের। কারণ, তিনটে ইঁদুরের বয়েস বেড়ে ওঠার গতি তিন রকমের। বুঝতেই পারছেন, মোহনবাবু, আমার এক্সপেরিমেন্ট কীরকম সাকসেসফুল হয়েছে। এর জন্যে অনেকরকমের সিরাম তৈরি করতে হয়েছে। রাতের-পর-রাত জাগতে হয়েছে। রাসায়নিক সমীকরণের হিসেব কষতে হয়েছে দিনরাত...।’

কথা বলতে-বলতে বৃদ্ধের ফরসা মুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। উত্তেজিতভাবে তিনি হাত নাড়ছিলেন বারবার।

প্রলয়নাথ এরপর বললেন গিনিপিগের ওপরে তাঁর সিরামের সাফল্যের কথা। এবং সব শেষে বললেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার চরম ধাপের কথা—মানুষের ওপরে তাঁর এক্সপেরিমেন্টের কথা, পর্তাপ চওহানের কথা।

একটানা বহুক্ষণ কথা বলে এবং দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। টেবিলের কাছ থেকে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে একটায় নিজে বসলেন, আর অন্যটায় আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন।

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালামঃ প্রায় সাড়ে আটটা। আজ কপালে ডিনার বলতে নির্ঘাত বিস্কুট কিংবা পাঁউরুটি আছে।

প্রলয়নাথ বোধহয় আমাকে লক্ষ করছিলেন, এবং ওঁর নজর যে যথেষ্ট ধারালো তার পরিচয় আগেই পেয়েছি। তার প্রমাণ হিসেবেই তিনি বললেন, ‘আজ রাতে আমাদের এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যান, মোহনবাবু—।’

আমি সৌজন্য দেখিয়ে বললাম, ‘না, না—তা কী করে হয়?’

‘কেন তাতে অসুবিধের কী আছে!’ কথাটা বলে কাশলেন প্রলয়নাথ। কাশির আওয়াজ শুনে বেশ বোঝা যায়, ওঁর বুকে সর্দি বসে গেছে।

বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে আমার ওঁকে কেমন আনমনা লাগছিল। ওঁর চশমার কাচে আলো পড়ে চকচক করছিল। মনে হচ্ছিল, উনি যেন গভীরভাবে কী ভাবছেন।

একটা দুঃসাহসিক মতলব আমার মনের কোণে উঁকি মারছিল। কিন্তু আমার ভেতরের সৎ মানুষটা তাকে প্রাণপণ রুখে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

প্রলয়নাথ আমাকে রোজ চায়ের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান, সন্ধেটা আমার সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটান। এতে আমার দিব্যি কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এই নিত্যকার নিষ্কলঙ্ক রুটিনে বাদ সেধেছে সুপ্রিয়া। ওকে আমি দেখিনি, ওর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগও হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে দেখার জন্যে আমার মনটা কেমন আকুল হয়ে উঠেছে।

বাথরুমের ছোট্ট জানলাটাই কি এই আকর্ষণের কারণ? বোধহয় না। হয়তো কলকাতার মন-ভেঙে-যাওয়া ব্যাপারটার পর আমার মন যে-কোনওভাবে শূন্যতা পূরণ করতে চাইছে। তা ছাড়া সুপ্রিয়াকে সামনাসামনি দেখার জন্যে, আলাপ করার জন্যে, আমারও কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল।

প্রলয়নাথ-অনুরাধা এত মিশুকে, অথচ তা সত্ত্বেও ওঁরা সুপ্রিয়াকে পরদানশিন করে রাখবেন, এ কেমন ব্যাপার! তা হলে কি প্রতাপের সঙ্গে সুপ্রিয়ার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে?

যতই ভাবছিলাম, মতলবটা ততই বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাই শেষ পর্যন্ত উন্মুখ বৃদ্ধকে বলেই ফেললাম, 'না, সেরকম অসুবিধের কিছু নেই, তবে খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হয়ে গেলে কোয়ার্টারে ফিরতে পারব কি না তাই ভাবছি—।'

আমি জানি, রাতের খাওয়া এখানে সারলে খাওয়ার টেবিলে নিশ্চয়ই সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। তা ছাড়া, কে জানে আজকের নিঝুম রাত হয়তো চৌকো জানলার চেয়েও বাড়তি কিছু দিতে পারে আমাকে।

প্রলয়নাথের জেরান্টোলজি আমার কাছে যতই একঘেয়ে আর অসহ্য হোক, সুপ্রিয়াকে দেখার জন্যে একটু-আধটু জরাবিজ্ঞান সইতে আমি রাজি আছি।

আমার ভাবনা-চিন্তা যতই ঘূর্ণি তুলতে লাগল সবকিছু ততই যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

ল্যাবরেটরি ছেড়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। প্রলয়নাথ ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিলেন।

'আমার ল্যাবরেটরি কেমন দেখলেন?' আচমকা জানতে চাইলেন প্রলয়নাথ।

'ভালোই...বেশ অ্যাট্রাকটিভ।' বৃদ্ধের মন-রাখা জবাব দিলাম আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'এটাই আমার সব। এটার জন্যেই আমি বেঁচে আছি।'

আমি নীরবে ঘাড় নাড়লাম।

প্রলয়নাথ এবার বললেন, 'চলুন, বসবার ঘরে বসবেন চলুন। আমি অনুরাধার সঙ্গে একটু কথা বলে যাচ্ছি—।'

অলিপথ বরাবর হাতের ইশারা করে আমাকে এগোতে বললেন তিনি। আমি আধো-আঁধারি পথ ধরে রওনা হলাম।

রাতের সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডাও যে বাড়ছে সেটা এখন টের পেলাম। হাতে হাত ঘষে মুখ দিয়ে নিশ্বাস ছাড়লাম আমি। রান্নাঘরের দিক থেকে ঠিকরে আসা আলোয় দেখলাম, নিশ্বাসের বাষ্প জমাট বেঁধে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে।

নানান চিন্তা মাথায় নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিলাম আমি। আমাকে কি রাতে থেকে যেতে বলবেন প্রলয়নাথ? সে-কথা বলার আগে কি স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন? কে জানে!

হঠাৎই মিহি ফিসফিসে স্বরে কেউ আমার নাম ধরে ডেকে উঠলঃ 'মোহনবাবু—।'

আমি চমকে ফিরে তাকালাম শব্দের উৎস লক্ষ করে।

অলিপথের বাঁদিকে সিমেন্টের জাফরি বসানো একটা দেওয়াল। তার ওপাশটা অন্ধকার। কিন্তু জাফরির ফাঁকফোকর দিয়ে একটা অবয়বের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। অবয়বটা যে কোনও মহিলার সেটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কে এই অবগুণ্ঠিতা?

আমার নীরব প্রশ্ন সে বোধহয় ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে টের পেল। তাই হয়তো মিষ্টি চাপা গলায় সসঙ্কোচে সে বলল, 'আমি...সুপ্রিয়া...।'

বুকের ভেতরে ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেল পলকে। কেন জানি না, আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল।

'আপনি...আপনি...সামনে আসুন...' কাঁপা গলায় অনুনয় করে উঠলাম আমি। চেনা পারফিউমের গন্ধ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল।

'আমি কারও সামনে যাই না।' বলল মায়ারমণী, 'একটা...একটা অ্যাকসিডেন্টে আমার...আমার মুখ...পুড়ে গেছে। রান্না করার সময়...স্টোভ বার্স্ট করেছিল...।'

আশ্চর্য! এই দুর্ঘটনার কথা তো প্রলয়নাথ কখনও বলেননি!

সুপ্রিয়ার কথা শুনে আমার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ওর প্রতি অলৌকিক টানটা ক্রমেই ভয়ংকর চেহারা নিচ্ছে।

'আপনাকে আমি...আড়াল থেকে দেখেছি, মোহনবাবু—।' বলল সুপ্রিয়া, 'আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভীষণ ইচ্ছে করে।'

আমার হাত-পা তখনও কাঁপছিল। বুঝতে পারছিলাম না, কী বলব, কী বলা উচিত।

'সুপ্রিয়া—,' কাঁপা স্বরে ওর নামটা বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে।

'আ—আঃ!' তৃপ্তির মিষ্টি শব্দ করল অন্ধকারের তরুণী, 'এই প্রথম কোনও যুবকের মুখে আমার নাম শুনলাম।'

আমার মনে হচ্ছিল, এখনই ছুটে যাই জাফরির ওপাশে। তারপর...।

‘সুপ্রিয়া—,’ আবার ওর নাম ধরে ফিসফিসে স্বরে ডেকে উঠলাম আমি।

‘আজ রাতে থেকে যান, মোহনবাবু। রাতে আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করে যাব।’ একটু থেমে তারপরঃ ‘ভয় নেই, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। বরং লাভ হতে পারে—।’

কিছুটা দূরে কাশির শব্দ শুনলাম। বোধহয় প্রলয়নাথ আসছেন।

জাফরির ওপাশে সুপ্রিয়ার অবয়ব চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু পারফিউমের হালকা গন্ধটা ভারী বাতাসে অলসভাবে ভেসে রইল।

আমি তৎপর হয়ে বসবার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। পেছনে পায়ের শব্দ এবার শোনা যাচ্ছিল। এবং একটু পরেই প্রলয়নাথ ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন, ‘আপনি রাতে খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই থেকে যান, মোহনবাবু। কাল সকালে চা খেয়ে একেবারে কোয়ার্টারে ফিরবেন। তাতে আপনার মর্নিং ওয়াকটাও হয়ে যাবে।’

কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামের বিছানায় শুয়ে ছিলাম বটে কিন্তু আমার চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। নানান চিন্তা, নানান কল্পনা বেপরোয়াভাবে ঘাই মারছিল মাথার ভেতরে। সুপ্রিয়া কখন আলাপ করতে আসবে? কতক্ষণ ধরে চলবে সেই আলাপ? আলাপের পর কী হবে?

যতই এসব কথা ভাবছিলাম, ততই মনে পড়ছিল সুপ্রিয়ার কথা। দুর্ঘটনা হয়তো ওর মুখের সৌন্দর্য কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু ওর অন্যান্য সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারেনি।

রাতে খাওয়ার টেবিলে ছিলাম আমরা দুজন—প্রলয়নাথ আর আমি। অনুরাধা আমাদের খেতে দিচ্ছিলেন। প্রতাপ ওঁকে থালা-বাটি-গ্লাস এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছিল। যথারীতি সুপ্রিয়ার দেখা মেলেনি।

খেতে-খেতেই আমি জিগ্যেস করেছিলাম, ‘সুপ্রিয়া খেতে আসবে না?’

অনুরাধা আমাকে ডাল দিচ্ছিলেন, হঠাৎই থেমে গেলেন, তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে। হয়তো ভাবছিলেন, এই বোধহয় সুপ্রিয়ার অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটা প্রলয়নাথ আমাকে বলে দেবেন। কিন্তু প্রলয়নাথ চশমার ভেতর থেকে স্থির শান্ত চোখে অনুরাধাকে একবার দেখলেন, তারপর আমাকে বললেন, ‘আপনাকে তো আগেই বলেছি, সুপ্রিয়া একা-একা থাকতে ভালোবাসে। ওর চোখে একটু প্রবলেম আছে—আলো একেবারে সহ্য করতে পারে না।’

আমি বৃদ্ধের কথা এমনভাবে শুনছিলাম যেন টিভিতে খবর শুনছি। সত্যিই অদ্ভুত! একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে প্রলয়নাথকে কত মিথ্যে কথাই না বলতে হচ্ছে! সত্যি-সত্যি কী হয়েছে সুপ্রিয়ার? স্টোভ ফেটে অ্যাকসিডেন্ট? নাকি ওর চোখে সত্যিই কোনও প্রবলেম আছে?

তখনই আমার হঠাৎ সন্দেহ হল, প্রলয়নাথ জেরান্টোলজির কোনও বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট চালাননি তো সুপ্রিয়ার ওপরে! তারই প্রকোপে হয়তো মেয়েটার মুখ পুড়ে গেছে! এখন বাবার

লজ্জা ঢাকতে অপরিচিত অতিথিকে ও বলে ওর স্টোভ-অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে!

আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষ করছিলাম, অনুরাধা বারবার চোরাচাউনিতে আমাকে দেখছেন, জরিপ করার চেষ্টা করছেন যেন।

আর প্রতাপ? সেই তখন থেকে দেখছি 'মৃত্যুঞ্জয়' প্রতাপ কেমন অদ্ভুত অপছন্দের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। অথচ একইসঙ্গে মনে হয় ও যেন কিছু বলতে চায় আমাকে। অনেকক্ষণ ধরে ও আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। যেন কিছু বলার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

খাওয়ার টেবিলে বসে প্রলয়নাথের পরিবারকে আমার কেন জানি না ভীষণ রহস্যময় মনে হচ্ছিল। অনেক গোপন কথা ওঁরা লুকিয়ে রাখতে চান।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে অনুরাধা আমাকে বৃদ্ধ প্রলয়নাথের একটি লুঙ্গি ধার দিয়েছেন, তারপর আমাকে শোওয়ার ঘর দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরটা একতলায়। বাড়ির পেছনদিকে সরু মাপের একটা সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে ছোট্টমতো উঠোন। উঠোনের একদিকে কলতলা, আর-একদিকে তিনটে ঘরঃ একটা সামান্য বড়, অন্য দুটো ছোট-ছোট। বড় ঘরটায় আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরে জেনেছি শেষের ছোট ঘরটায় প্রতাপ থাকে।

ঘরে সব ব্যবস্থাই ছিমছাম। বাঁ-দিকের দেওয়ালে নকশা ছাপা পরদা টাঙানো। ডানদিকে একপাশে ছোট খাটে বিছানা পাতা। বিছানার ওপরে লাল-খয়েরি আর সাদার ছিটে দেওয়া আকোলা প্রিন্টের বেডকভার। বিছানার পাশে মেঝেতে রাখা জলের জগ আর গ্লাস।

আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অনুরাধা নিঃশব্দে চলে গেছেন।

আমি ঘড়ি দেখলামঃ প্রায় দশটা বাজে। এখানকার হিসেবে গভীর রাত। সুতরাং জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে পড়েছি। দিনের শেষ সিগারেট আরাম করে শেষ করে তারপর বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। নানান ছবি একের-পর-এক ভেসে উঠতে লাগল মনের পরদায়। একইসঙ্গে জরাবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে রাতের বয়েসও বাড়তে লাগল।

হঠাৎই দরজায় টোকার শব্দ শুনলাম।

আমার বুকের ভেতরে একটা বিশাল পাথর যেন আচমকা টাল খেয়ে গেল।

নিশ্চয়ই সুপ্রিয়া এসেছে! এতক্ষণ পর্যন্ত একমুহূর্তের জন্যেও এই মেয়েটার চিন্তা আমার মন ছেড়ে যায়নি।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চটপট নেমে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

কিন্তু সত্যিই সুপ্রিয়া এসেছে তো?

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

আমি দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কে?'

'আমি...সুপ্রিয়া...।'

দরজা খুলতেই শাল মুড়ি দেওয়া ছায়ারমণী ঢুকে পড়ল ঘরে। আমি চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম। নেশাগ্রস্তের মতো ওকে ধরতে গেলাম, কিন্তু ও চকিতে সরে গেল অন্ধকারে।

আমি দরজায় খিল তুলে দিলাম। তারপর অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগলাম। সে এক রোমাঞ্চকর বিচিত্র লুকোচুরি খেলা!

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎই যেন ওর শালের প্রান্ত আমার হাত ছুঁয়ে গেল। কিন্তু তারপরই সব শূন্য।

হঠাৎই ও ডেকে উঠল, 'মোহন, আমি এখানে...বিছানায়...।'

আমার বুকের ভেতরে অন্যরকম আগুন জ্বলে উঠল। একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিছানার দিকে।

যখন ওকে ছুঁলাম তখন আমার আঙুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া!'

কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা দুজনে তখন কাছাকাছি চলে এসেছি। ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম সব মুছে গেছে আমার মন থেকে। সুপ্রিয়াই তখন একমাত্র সত্যি, আর সব মিথ্যে।

শীতের মধ্যে সব পোশাক খুলে ফেলতে বেশ সময় লাগল আমাদের। তারপর আমি পাগলের মতো আঁকড়ে ধরলাম ওর যৌবন। আমার মাথার ভেতরে শিরা দপদপ করছে। রক্তকণিকাদের পাগল-করা দৌড় শুরু হয়ে গেছে প্রতিটি ধমনিতে।

সুপ্রিয়ার শরীর যে-কোনও পুরুষকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। মাখনের মতো মোলায়েম, মার্বেল পাথরের মতো মসৃণ, আর ভরা দিঘির মতো টইটম্বুর।

তবে ভালোবাসার সময় ও মুখটা সরিয়ে রাখছিল আমার দিক থেকে। হয়তো দুর্ঘটনার পর থেকেই ওর মুখ স্পর্শকাতর। সেইজন্যেই ওকে একটিও চুমু খেতে পারছিলাম না। কিন্তু তা ছাড়া আর সবকিছুই করতে পারছিলাম।

আমাদের ঠোঁট চিরে অর্থহীন শব্দের টুকরো বেরোচ্ছিল। শরীরের উদ্দাম ঝড়ে আমরা জগৎসংসার ভুলে গিয়েছিলাম। চরম মুহূর্তে সুপ্রিয়া চাপা চিৎকার করে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে

একেবারে শেষ করে দিল। আমার মুখ দিয়েও চাপা গোঙানি বেরিয়ে এসেছিল। আর সেই সময়কার উত্তাল জোয়ারে আমাদের মধ্যে কোনও নিয়ম, কোনও প্রতিরোধ কাজ করছিল না।

হঠাৎই আমার ঠোঁট চলে গেছে সুপ্রিয়ার গালে। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা বরফের স্রোত নেমে গেছে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। খাটটা দুলে উঠেছে অন্ধকারে। হাত-পা পাথর হয়ে গেছে চোখের পলকে।

আর তখনই, অন্ধকার ঘরে আমি কাশির শব্দ পেলাম।

এই শব্দ আমার খুব চেনা।

হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল বুকের ভেতরে। আর একইসঙ্গে আমার হাত চলে গেল বেডসুইচের দিকে।

দু-একবার দপদপ করে জ্বলে উঠল টিউবলাইট।

তখন আমি প্রলয়নাথকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম অনুরাধাকে। আর একইসঙ্গে সুপ্রিয়াকেও দেখতে পেলাম।

অনুরাধা শুয়ে আছেন আমার বিছানায়। চোখে-মুখে অপরাধবোধের ছাপ। কিন্তু এ কোন অনুরাধা! এ কি স্বপ্ন, নাকি সত্যি!

অন্ধকারে সুপ্রিয়াকে আদর করার সময় আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল অনুরাধার আঁচিল—ওঁর এককালের বিউটি স্পট। আমি অবাক হয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। কারণ, মা ও মেয়ের ঠোঁটের ওপরে একই স্থানাঙ্কে আঁচিল থাকাটা আমার কাছে অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়েছিল।

কিন্তু এখন দেখলাম, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ, অনুরাধা ও সুপ্রিয়ার শরীর একটাই। যে-অনুরাধাকে আমি আগে দেখেছি, এখন ওঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বুঝলাম, আমার এতদিনের দেখাটা অসম্পূর্ণ ছিল।

অনুরাধার জরাগ্রস্ত চেহারা শেষ হয়েছে গলার ঠিক নীচে এসে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে জরাহীন দুরন্ত যৌবন। মুখ-গলা বাদ দিয়ে এই শরীরের দিকে তাকালে এই শরীরের বয়েস পঁচিশ-ছাবিবশ বলেই মনে হয়। এই শরীরকেই আমি বাথরুমের চৌকো জানলা দিয়ে দেখেছি? এই কি তা হলে সুপ্রিয়া? আমার অনুমান অন্তত তাই। বুঝলাম, এই হল প্রলয়নাথের সেই 'অলৌকিক' ব্যাপার।

আমি অবাক হয়ে একই শরীরে জরা আর যৌবনের সহাবস্থান দেখছিলাম। চমক ভাঙল প্রলয়নাথের কথায়।

খসখসে গলায় বৃদ্ধ বললেন, 'আমাদের মাপ করবেন, মোহনবাবু...।'

আমি প্রলয়নাথের দিকে ঘুরে তাকালাম।

বন্ধ ঘরে বৃদ্ধ ঢুকলেন কোথা দিয়ে? খেয়াল করে দেখি, ঘরের সামনের দেওয়ালের পরদা খানিকটা সরানো। আর সেই পরদার পেছনে চোখে পড়ছে একটা ছোট দরজা।

প্রলয়নাথের হাতে চশমাজাতীয় একটা বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রও ছিল। সেটার দিকে তাকিয়ে আমি গোটা ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কূল পাচ্ছিলাম না।

বুঝতে পারছিলাম না, এখন আমার কী করা উচিত। আমি কি প্রাণভরে ভর্ৎসনা করব এই দম্পতিকে? কাল সকালে ব্যাপারটা নিয়ে কি শোরগোল তুলব?

প্রলয়নাথ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বিছানার কাছে এসে বসলেন। ওঁর বলিরেখাময় মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

আমি এর মধ্যে পোশাক পরে নিচ্ছিলাম। অনুরাধাও দেখলাম শাড়ি জামাকাপড় শাল গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছেন। ধীরে-ধীরে সুপ্রিয়া ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে পড়ে রইল এক পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের মহিলা, যার মাথায় কাঁচাপাকা চুল, গাল ভাঙা, মুখের চামড়ায় অগুনতি ভাঁজ, আর একটা চোখে ছানি পড়েছে।

কে বলবে, এই মহিলার শরীরে বাঁধা পড়েছে অবিশ্বাস্য দু-কূল ছাপানো যৌবন।

'মোহনবাবু—' তাকিয়ে দেখি প্রলয়নাথ মুখ তুলেছেন। চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওঁর চোখে জল—সূক্ষ্ম ধারায় সেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নাকের পাশ দিয়ে।

'মোহনবাবু, আপনার কাছে আর লুকিয়ে লাভ নেই—সব খুলেই বলি।' প্রলয়নাথ খসখসে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'সুপ্রিয়া নামে সত্যিই আমাদের একটা মেয়ে ছিল। মাত্র চার বছর বয়েসে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে ও মারা যায়। সে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল। তবে, তার সঙ্গে আমার জেরান্টোলজির এক্সপেরিমেন্টের কোনও সম্পর্ক নেই।

'জরাবিজ্ঞান নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট যখন শুরু হয়, তখন গাছপালা আর ইঁদুর-গিনিপিগের সঙ্গে-সঙ্গে অনুরাধার শরীরের ওপরেও আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকি। তবে অবশ্যই অনুরাধার অনুমতি নিয়ে। অনুরাধা আমাকে এত ভালোবাসে যে, কখনও আমার কোনও সাধে বাদ সাধেনি। তা ছাড়া বুটুন—মানে, সুপ্রিয়া—মারা যাওয়ার পর আমরা দুজনেই বেঁচে থাকার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন জরাবিজ্ঞানের গবেষণা আমাকে বাঁচিয়ে তুলল। আর অনুরাধাও তাতে সায় দিল।'

বিছানার এক কোণে বসে থাকা অনুরাধার দিকে কোমল চোখে দেখলেন প্রলয়নাথ। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'ওর ওপর দিয়ে যে কত ঝড়ঝাপটা গেছে! তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঝড় হচ্ছে আমার তৈরি করা "কাউন্টার-এজিং সিরাম"—এই সিরাম বয়েস বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বাধা দেয়। কিন্তু সিরামে মনের মতো কাজ হল না।

‘অনুরাধার শরীরের সর্বত্র আমি এই সিরাম নিয়ম করে ইনজেক্ট করতাম। আর সাত-দশ দিন পরপর অনুরাধার শরীর খুটিয়ে লক্ষ করতাম। কিন্তু গোলমালটা একটুও টের পাইনি। সেটা টের পেলাম বছরদশেক পর। দেখলাম, ওর মাথা আর গলা বাদে সিরামটা কাজ করেছে। কিন্তু তখন থামারও উপায় নেই, আর ফেরারও পথ নেই। অনুরাধার শরীরের ভেতরে কোনও-কোনও অংশে বয়েস ঠিকমতোই বাড়তে লাগল। কিন্তু শরীরের বাইরে—গলা থেকে পা পর্যন্ত ওর তিরিশের যৌবন অটুট রইল।

‘এই ব্যাপারটা লক্ষ করার পরই আমরা দুজনে স্রেফ খেলাচ্ছলে সুপ্রিয়ার “জন্ম” দিলাম আবার। অনুরাধাকে বলতাম, তোমার শরীরে সুপ্রিয়া বেঁচে আছে। আমি ওকে কখনও অনুরাধা, কখনও সুপ্রিয়া বলে ডাকি। জানি না, এ আমার পাগলামো—না মেয়েকে হারানোর শোকে তাড়া খাওয়া বাপের সেন্টিমেন্ট!’

অনুরাধা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্না চাপা দিতে মুখে কাপড় গুঁজে দিলেন।

‘দেখতে-দেখতে আমি বুড়িয়ে গেলাম। অনুরাধার মনের অনেকটাই বুড়িয়ে গেল, আর শরীরের মধ্যে শুধু মাথা, আর গলা। সুতরাং এই বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে অনুরাধার অতৃপ্ত শরীর রাতের-পর-রাত কাটাতে লাগল। ওকে পর্যবেক্ষণ করে আমি প্রতি সপ্তাহে পাতার-পর-পাতা নোট নিতাম। আমার অবাক লাগত। যে-শরীরে মা হওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই, সেই শরীরে তৃপ্তির চাহিদা কোথা থেকে আসে! কেমন হতে পারে সেই তৃপ্তির প্রতিক্রিয়া? আমার ভীষণ কৌতূহল হতো। আমার গবেষণার সম্পূর্ণ বিবরণ আমি পরের বিজ্ঞানীদের জন্যে রেখে যেতে চাই। তাই আমাকে যে জানতেই হবে!’ হাত মুঠো করে বিছানায় ঠুকলেন প্রলয়নাথ। ওঁর উত্তেজনায় লালচে মুখে সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর জেদ।

মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে প্রলয়নাথ আবার বললেন, ‘অনুরাধার অদ্ভুত শরীরের প্রতিক্রিয়া—মানে, সেক্সুয়াল রিঅ্যাকশন্স—জানার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেলাম। তখন নানানরকম ফন্দিফিকির করে কোনও যুবককে ডেকে নিয়ে আসতাম বাড়িতে। তাকে সুযোগ বুঝে লোভ দেখানো হতো। ওই বাথরুমের জানলা দিয়ে। অথবা, অন্ধকারে জাফরির আড়াল থেকে অনুরাধা ওর মিষ্টি গলায় কথা বলত অচেনা মানুষটির সঙ্গে। তারপর রাতে থেকে যেত সেই অতিথি। এই ঘরটায় তাকে শুতে দেওয়া হতো। গভীর রাতের অন্ধকারে অনুরাধা চলে আসত এই ঘরে। অতিথির সঙ্গে মিলিত হতো এক অদ্ভুত রমণী।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রলয়নাথ। মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। তারপর চাপা খসখসে গলায় অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বলে চললেন, ‘অন্ধকারে যখন সেই মিলনের খেলা শুরু হতো তখন...তখন আমি...এই হতভাগা জেরান্টোলজিস্ট—’ নিজের বুকে আঙুল ঠুকলেন তিনিঃ ‘ওই

লুকোনো দরজা দিয়ে পরদা সরিয়ে ঢুকে পড়তাম এই ঘরে। তারপর অন্ধকারে এই চশমাটা চোখে দিয়ে সব দেখতাম। দুটো শরীরের প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতাম। তারপর সেইসব তথ্য টুকে রাখতাম গবেষণার খাতায়।'

হাতের চশমাটা আমাকে দেখালেন প্রলয়নাথ। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এটার নাম স্নুপারস্কোপটা—অন্ধকারে দেখার চশমা—এটা দিয়ে ইনফ্রারেড আলো দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ছবিগুলো অন্যরকম দেখায়। স্বাভাবিক রঙিন ছবির মতো নয়। কিন্তু তাতে আমার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কোনওরকম অসুবিধে হয় না।

'মোহনবাবু, এইসব যা-যা আমরা করতাম, আপনার সঙ্গেও ঠিক তাই করেছি। আপনি...আপনি দয়া করে এই বুড়ো-বুড়িকে মাপ করবেন। বিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে আমরা আপনার কাছে অনেক কিছু গোপন করেছি, আপনাকে ঠকিয়েছি, লজ্জায় ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমাদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।'

অনুরাধার কান্নার শব্দ আমি টের পাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে অপরাধবোধ আর গ্লানি মিশে ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি প্রতাপের কথা জিগ্যেস করলাম।

প্রলয়নাথ স্নুপারস্কোপটা চাদরের আড়ালে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'প্রতাপের ওপরে আমি সিরাম ইনজেক্ট করে গবেষণা করছি। আমার বিশ্বাস, এবারে আর কোনও ভুল হবে না। অনুরাধার বেলায় যে গন্ডগোল হয়েছে এবারে যাতে সেরকম না হয় সেদিকে আমি খেয়াল রেখেছি। তা ছাড়া প্রতাপ আমাদের ছেলের মতো...'একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধঃ 'একদিন...আমার আর অনুরাধার ব্যাপারটা ও জেনে ফ্যালে। আমাদের বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্টের খবর পেয়ে যায়। তারপর থেকেই বাড়িতে কোনও তরুণ অতিথি এলে ও সেটা পছন্দ করত না। অথচ আমার মুখের ওপর প্রতিবাদও করতে পারত না। আমি ওর কষ্ট বুঝি, মোহনবাবু। অনুরাধার দুঃখও বুঝি। আর আপনার মনের অবস্থাও বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কী করব বলুন! জরাবিজ্ঞানের স্বার্থে আমাকে যে সব জানতেই হবে।'

বৃদ্ধ আবার চোখের জল ফেলছিলেন। ওঁর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎই তিনি উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন দু-হাতে। আবেগমথিত গলায় বললেন, 'মোহনবাবু, আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের এই রিসার্চের কথা আপনি কাউকে বলবেন না। কথা দিন, প্লিজ, কথা দিন...।'

আমি কথা দিয়েছিলাম।

সেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা সেদিন আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। এবং সেই বিচিত্র রজনীতে আমি ঈশ্বরের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করেছিলাম, প্রলয়নাথের অলৌকিক গবেষণা সফল

হোক। সত্যিই প্রতাপ চওহানের চিরযৌবনের কথা শুনে হতবাক হয়ে যাক সারা পৃথিবী।

পরদিন সকালে চোখের জলে ওঁরা দুজন আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।



সমাপ্ত

পড়ে ভালো লাগলে বই কিনে রাখুন, এই রকম আরো বই পড়তে আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন করুন